আশরাফুল হিদায়া

বাংলা

নির্দেশনায়

শহীদ আল্লামা ইসহাক ফরিদী (র.)

অনুবাদকবৃন্দ

মাওলানা মোহাম্মদ আবূ মূসা
মুহতামিম, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ হাফীজুদ্দীন
মুহাদ্দিস, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মুসলিমুদ্দীন
মুহাদ্দিস, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম

মাওলানা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আশরাফুল হিদায়া তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ৪৭৫.০০ টাকা মাত্র

আমাদের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষ্য প্রণীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আনন্দের কথা যে, একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালোভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব একজন উচ্চমানের ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি অদম্য স্পৃহা ও সাহস নিয়ে হিদায়া'র একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতোমধ্যে তার দু' খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। আর এটি তৃতীয় খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ আবূ মূসা, মুহতামিম চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, মাওলানা মোহাম্মদ হাফীজুদ্দীন, মুহাদ্দিস, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা, মাওলানা আনোয়ারুস সালাম, মাওলানা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ মুসলিমুদ্দীন, মুহাদ্দিস, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। "জাযাহুমুল্লাহু খায়রান ফিদ-দারাইন।" আর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি– তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!!

—ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

অর্পণ

যার অনুপ্রেরণা ও সঠিক রাহনুমায়ীতে আমাদের এই মহৎ প্রয়াস, সেই ক্ষণজন্মা মহামনীষী, বিদগ্ধ গবেষক, বিশিষ্ট আলেমে দীন, শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন শামসুল উলূম মাদরাসার সাবেক মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস শহীদ আল্লামা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা কামনায়-

প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

পূর্বকথা : নিকাহ (نِكَاحٌ) -এর আভিধানিক অর্থ- মিলানো। পরবর্তীতে একে সহবাসের অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, সহবাস মিলানোর অর্থে ব্যবহার হওয়ার কারণে। তারপর এটি বৈবাহিক চুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আকদ হলো মিলানোর কারণ। অতএব, আকদ বা চুক্তিটি مَجَازُ الْمَجَازِ হলো।

نِكَاحٌ-এর শাব্দিক ও শরয়ী অর্থ : اَلنِّكَاحُ শব্দটি ضَرَبَ ও فَتَحَ -এর মাসদার [ক্রিয়ামূল] অর্থ- মিলানো, দু'টি বস্তু একত্র করা। অতঃপর তা মৈথুন ও রতিক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কারণ তাতে দুই অঙ্গের একত্রিকরণ পাওয়া যায়। مَجَازٌ বা রূপক অর্থে বৈবাহিক চুক্তিকেও 'নিকাহ' নামে অভিহিত করা হয়। কেননা, বৈবাহিক চুক্তি হলো উক্ত মৈথুন বা একত্রিকরণের سَبَبٌ [সূত্র]। তাই সববের নামে মুসাববাবের নাম রাখা হয়েছে। নিকাহ [বিবাহ] -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ফিকহের কিতাবসমূহে বিভিন্ন রকম বর্ণিত আছে। যেমন- দুররে মুখতারে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, هُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ আবার অন্যান্য কিতাবে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে সবকটির সারনির্যাস হচ্ছে, নিকাহ হলো- "নারী-পুরুষের মধ্যে শরিয়তসম্মত এমন চুক্তি যা তারা নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ এবং সতিত্ব ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে সংঘটন করে।"

নিকাহ [বিবাহ]-এর সামাজিক গুরুত্ব : একটি পূতঃপবিত্র কৃষ্টি ও উন্নত সভ্যতা লাভের পূর্বশর্ত হলো একটি সুশীল ও উঁচুমানের সমাজ গঠন। কারণ, সভ্যতা-সংস্কৃতির পৃথক কোনো সত্তা নেই। বস্তুত তা একটি সমাজের জীবনবোধ, আদর্শিক চেতনা, চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আইন-কানুন ও প্রথা শিল্পকলা ইত্যাদির সমন্বিত বাহ্যিকরূপ। যে কারণে ঐতিহাসিক সত্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, একটি বিকৃত সমাজ দ্বারা একটি নোংরা সংস্কৃতি ও রুচিবোধ বিবর্জিত সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। পক্ষান্তরে একটি সুষম-সুন্দর সমাজ কাঠামো থেকে সুন্দর ও নৈতকাসমৃদ্ধ সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এককথায় সভ্যতার প্রশ্নে সমাজের ভূমিকা বীজতুল্য।

گندم از گندم بروید جوز جو "উৎকৃষ্ট জাতের বীজ দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলন এবং নিকৃষ্ট জাতের বীজ থেকে নিকৃষ্ট ফলই হবে।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, একটি সুস্থ পরিমার্জিত ও নৈতিকতাপূর্ণ সমাজ লাভের উপায় কি? যে সমাজের উপর ভর করে আমরা ঐ কাঙ্ক্ষিত সভ্যতার রূপালী অবয়ব দর্শন করতে সক্ষম হব। এ সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মমত কি সমাধান পেশ করেছে তার বিশ্লেষণ আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি? তা-ই আমাদের খুঁজে দেখা দরকার।

ইসলাম যে সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী তার ভিত্তি একটি মানবগোষ্ঠীর নৈতিক মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণার স্বচ্ছতা ও বস্তুবাদী জীবনে পরিবার ও পারিবারিক অন্যান্য সম্পর্কের উপর স্থাপিত। পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং এদের পারস্পরিক যোগসূত্র যত স্বচ্ছ, নির্মল ও সবল হবে তা থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত সমাজটিও তত সুন্দর ও পবিত্র হবে। অতঃপর তার উপর ভর করে জন্ম নিবে এক একটি উন্নত সভ্যতা। সে কারণেই ইসলাম তার আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও লেনদেনের পাশাপাশি পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অধিকতর পবিত্র এবং সামাজিক সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার উদ্দেশ্যে অসংখ্য বিধান প্রবর্তন করেছে এবং তা পালনের জন্য তাকে ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। ফিকহের পরিভাষায় এগুলো مُعَاشَرَاتٌ বা 'পারিবারিক বিধান' নামে পরিচিত। বর্তমানে এগুলোকে মুসলিম পারসোনাল ল' [Muslims Personal Law] নামে অভিহিত করা হয়।

সামাজিক বিধানসমূহের গুরুত্ব : সামাজিক বিধানসমূহের দুটি দিক রয়েছে– একদিক থেকে তা ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত এবং অপর দিক থেকে তা মু'আমালাহ তথা কায়কারবারের সাথে সম্পৃক্ত। ইবাদতের সাথে এর সম্পর্ক দু'ভাবে। প্রথমত এ হিসাবে যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সন্তান প্রতিপালন, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ এবং তাদের অধিকারাবলি আদায়কে কুরআন-সুন্নাতে ইবাদতের মর্যাদা এবং ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের উপায় বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তা ইবাদত এ কারণে যে, পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানুষ নগ্নতা, বেহায়াপনা এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও জুলুম থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারে এবং এ সম্পর্ক একে অপরের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এতে করে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। অপর পক্ষে এ সকল বিধান দ্বারা যেহেতু বান্দার হক আদায়ের সূত্রপাত ঘটে এবং এতে কিছু আর্থিক লেনদেনও হয়। যেমন– স্বামী মহর স্বরূপ স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে আর সে তা গ্রহণ করে বা গ্রহণের অধিকার লাভ করে। তা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় এতে ঈজাব-কবুল বিদ্যমান থাকে এবং কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তা প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় তথা দেওয়ানী মামলা রুজু করার ব্যবস্থা আছে। এ সব বিবেচনায় তা মু'আমালাভুক্ত বিষয়ও বটে।

শরিয়তে নিকাহ [বিবাহ]-এর তাৎপর্য : ইসলামি শরিয়তে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এত অধিক যে, যদি তা সঠিক নিয়মে স্থাপন এবং তারপর যথার্থভাবে এর দায়িত্বসমূহ পালন করা হয় তাহলে এ সম্পৃক্ততা নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। প্রখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ বাদায়ে'উস-সানায়ে ও দুররে মুখতারের ভাষ্য হলো–

إِنَّ الْإِشْتِغَالَ بِهِ مَعَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيْ لِنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ .

অর্থাৎ, ফরজ ও সুন্নত ঠিক রেখে বৈবাহিক জীবন যাপন, নফল ইবাদতে ডুবে থাকার চেয়ে উত্তম। বস্তুত ফিকহবিদগণের উক্ত মন্তব্য হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীসের সারমর্ম। হাদীসটি এই–

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ .

'বান্দা যখন বিবাহ করল তখন সে তার বাকি অর্ধেক ঈমানও পূর্ণ করে নিল। [যেন বিবাহ ব্যতীত ঈমান আশঙ্কার মধ্যে থাকে।]' –[বায়হাকী]

এ কথার গূঢ় রহস্য এই যে, চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকর্ষের ভিত্তি কৌমার্য ও বৈরাগ্য জীবনের উপর নয়; বরং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তার উপর যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয় যথা– সন্তান প্রতিপালন, তাদের সুশিক্ষা দান, পিতামাতা, ভাই-বন্ধু ও প্রতিবেশীর যাবতীয় হক আদায় ইত্যাদি সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার মধ্যে চরিত্র ও আত্মার উৎকর্ষ লাভ হয়। কেননা, এতে শুধু নিজেকেই ইহ ও পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয় না; বরং একটি পরিবার ও একটি সমাজকেও রক্ষা করার প্রয়াস চলে। বৈবাহিক সম্পর্ক নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ফিকহবিদগণ লিখেন–

لِمَا فِيْهِ تَهْذِيْبُ الْأَخْلَاقِ وَتَوْسِعَةُ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِيْ مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ وَتَرْبِيَةُ الْوَلَدِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَإِعْفَافُ الْحَرَمِ وَنَفْسِهِ، وَدَفْعُ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهُنَّ .

কারণ, তাতে চারিত্রিক পরিশীলন এবং সমাজের আরো দশজনের সাথে মিলেমিশে থাকা, সন্তান প্রতিপালন এবং আত্মীয় ও অসহায়দের ব্যয় নির্বাহের কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে মনের উদারতা আসে এবং আসে স্ত্রী ও নিজের আত্মিক পবিত্রতা ও স্খলনমুক্তি।'

এজন্য বৈরাগ্যবাদের মূলোৎপাটনকল্পে মহানবী ﷺ এক যুগান্তকারী ঘোষণায় বলেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

'বিবাহ আমার আদর্শ। যে তা থেকে মুখ ফিরায় সে আমার দলভুক্ত নয়।'

নিকাহ [বিবাহ]-এর প্রকারভেদ : শরয়ী বিবাহ তিন প্রকার। ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, ২. ওয়াজিব ও ৩. মাকরূহ : মহর, খোরপোষ এবং সঙ্গমের উপর সামর্থ্যের সুরতে বিবাহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। স্ত্রীলোকদের প্রতি অধিক আসক্তির সময় বিবাহ ওয়াজিব। যে সময় জুলুম-অত্যাচারের প্রবল সম্ভাবনা হবে এবং ফরজ ও সুন্নত বর্জনের আশঙ্কা হবে এ সকল সুরতে বিবাহ মাকরূহ।

قَالَ اَلنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِىْ لِاَنَّ الصِّيْغَةَ وَاِنْ كَانَتْ لِلْاَخْبَارِ وَضْعًا فَقَدْ جُعِلَتْ لِلْاِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ ـ

وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِاَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِىْ وَبِالْاٰخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ زَوِّجْنِىْ فَيَقُوْلُ زَوَّجْتُكَ لِاَنَّ هٰذَا تَوْكِيْلٌ بِالنِّكَاحِ وَالْوَاحِدُ يَتَوَلّٰى طَرْفَىِ النِّكَاحِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতীত কালবাচক দুটি বাক্যের মাধ্যমে ইজাব ও কবুল -এর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। কেননা, যদিও এ বাক্যগুলো খবর প্রদানের জন্য গঠিত, কিন্তু প্রয়োজন নিরসনের জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে [বর্তমানে তা] কিছু সৃজনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এমন দু'টি বাক্য দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে, যার একটি হবে অতীত কালবাচক আর অন্যটি হবে ভবিষ্যৎকাল বাচক। যেমন– একপক্ষ বলল, আমাকে তুমি বিবাহ কর, আর অপর পক্ষ বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। কেননা 'আমাকে বিবাহ কর' কথাটির মর্মার্থ হলো, বিবাহের জন্য উকিল নিয়োগ করা। আর বিবাহের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি উভয়পক্ষের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমরা পরবর্তীতে তা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ الخ : ইজাব ঐ শব্দকে বলা হয়, যা একজনের পক্ষ থেকে (اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) প্রথমতে উত্থাপিত হয়। কেননা, শব্দটি সম্বোধিত ব্যক্তির হ্যাঁ বা না সূচক জবাবকে ওয়াজিব করে। আর যে শব্দ একজনের পক্ষ থেকে (اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্থাপন হবে সেটাকে কবুল বলা হবে। মাতিন (مَاتِنْ) – بِلَفْظَيْنِ বলে এদিকে ইশারা করছেন যে, শুধু লিখিত ইজাব-কবুল দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। এটা আইম্মায়ে ছালাছারও অভিমত। কেননা, লিখিত ইজাব-কবুলকে চিত্রাবলি (نُقُوْشْ) তো বলা হবে; কিন্তু শব্দ বলা হবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الصِّيْغَةَ الخ : এর দ্বারা দলিলের ক্ষেত্রে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নের সারসংক্ষেপ এই যে, নিকাহ হলো ইনশা [বর্তমান] -এর থেকে। আর ইনশা বলা হয়– اِثْبَاتُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا -কে। অর্থাৎ, যে বস্তু সাবিত ছিল না, তাকে সাবিত করা এবং حُدُوْثُ الْاَمْرِ فِى الْحَالِ অর্থাৎ, বর্তমানকালে কোনো বিষয়কে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। সুতরাং বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য এমন শব্দের প্রয়োজন হবে, যা সরাসরি এর মর্ম বুঝায়। আর অভিধানে এমন শব্দ নেই, যা সরাসরি حُدُوْثُ الْاَمْرِ فِى الْحَالِ বুঝায়। কেননা, মাযী (مَاضِىْ) অতীতকাল বুঝায়। আর مُضَارِعْ যেমনিভাবে বর্তমানকাল বুঝায়, তেমনিভাবে ভবিষ্যৎকালও বুঝায়, তাই মুযা'রে দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। এখন ইজাব ও কবুলকে মাযীর সীগাহ্ দ্বারা কিভাবে তাবীর করা হলো ? এর জবাব এই যে, মাযীর সীগাহ্ খবর প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বিবাহের জরুরতকে পূর্ণ করার জন্য ইনশা -এর অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যেমন– দোয়ার বাক্য- سَقَى اللّٰهُ ثَرَاهُ এবং اَفْعَالُ مَدْحٍ نِعْمَ ও اَفْعَالُ ذَمٍّ بِئْسَ -এর মধ্যে মাযীকে ইনশা অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ الخ : মতনের (مَتَنْ) মধ্যে مُسْتَقْبِلْ দ্বারা اَمْرْ -এর সীগাহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বিবাহ মাযির সীগাহ এবং আমরের সীগাহ দ্বারাও সংঘটিত হয়ে যায়। যেমন– পুরুষ বলল, আমাকে বিবাহ কর, জবাবে স্ত্রীলোক বলল, আমি বিবাহ করলাম। বা এর উল্টো বলল। তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। কারণ, প্রথম কথাটি ইজাব বা প্রস্তাব নয়; বরং বিবাহের উকিল নিয়োগ করা। আর দ্বিতীয় কথাটি তথা زَوَّجْتُكَ ইজাব ও কবুল উভয়টিই। আর বিবাহের মধ্যে একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয়টি করতে পারে। মূল হওয়ার কারণে নিজের পক্ষ থেকে আর উকিল হওয়ার কারণে অন্যের পক্ষ থেকে। আর বিবাহপর্বে একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয় দায়িত্ব পালন করতে পারে, যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারে না। পার্থক্যের কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হক প্রত্যাবর্তিত হয় উকিলের দিকে, আর বিবাহের মধ্যে মুয়াক্কিলের দিকে। তাই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উভয়দিকের দায়িত্বশীল হওয়ার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির مُطَالِبْ ও مُطَالَبْ এবং مُتَمَلِّكْ ও مُمَلِّكْ হওয়া লাজিম আসে, যা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। আর যেহেতু বিবাহের মধ্যে হুকুম মুয়াক্কিলের দিকে ফিরে, তাই উপরিউক্ত অসুবিধা নেই। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيْجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَنْعَقِدُ اِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيْجِ لِاَنَّ التَّمْلِيْكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلَا مَجَازًا عَنْهُ لِاَنَّ التَّزْوِيْجَ لِلتَّلْفِيْقِ وَالنِّكَاحَ لِلضَّمِّ وَلَا ضَمَّ وَلَا اِزْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوْكِ اَصْلًا وَلَنَا اَنَّ التَّمْلِيْكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِيْ مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الثَّابِتُ بِالنِّكَاحِ وَالسَّبَبِيَّةُ طَرِيْقُ الْمَجَازِ ـ

অনুবাদ : নিকাহ, বিবাহ, হিবা, মালিকানা ও দান শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিকাহ ও বিবাহ ব্যতীত অন্যকোনো শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা, মালিকানা জাতীয় শব্দগুলো প্রকৃত এবং রূপক কোনো অর্থেই বিবাহ বুঝায় না। কেননা, نِكَاحٌ ও تَزْوِيْجٌ -এর মর্মার্থ হলো [দুটি সত্তার মাঝে] মিলন ও জোড় সৃষ্টি করা। অথচ মালিক ও মালিকানাধীন এ দু'টি সত্তার মাঝে মিলনের ও জোড়ের ভাব মোটেই নেই। আমাদের দলিল হলো, মালিকানা যথাক্ষেত্রে যৌনসম্ভোগের অধিকার লাভের কারণ হয় দেহের মালিকানার মাধ্যমে। আর বিবাহ দ্বারা তা-ই সাব্যস্ত হয়। আর কারণ বিদ্যমান থাকা রূপক অর্থ গ্রহণের একটি মাধ্যম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ الخ : গ্রন্থকার উপরিউক্ত ইবারতের মধ্যে বিবাহের শব্দাবলির আলোচনা করেছেন। হানাফীগণের মতে, মতনে উল্লিখিত সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যে, যে সকল শব্দ تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ فِى الْحَالِ -এর জন্য গঠন করা হয়েছে, সেগুলোর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু দু'টি শব্দ তথা নিকাহ ও বিবাহ (اَلنِّكَاحُ وَالتَّزْوِيْجُ) দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের খোলাসা হলো, 'শব্দ' যে অর্থে ব্যবহৃত হবে, তা প্রকৃত (اَلْحَقِيْقَةُ) কিংবা রূপক (اَلْمَجَازُ) হবে। আর মালিকানা (اَلتَّمْلِيْكُ) হিবা (اَلْهِبَةُ) এবং দান (اَلصَّدَقَةُ) এ শব্দগুলো নিকাহ -এর প্রকৃত অর্থেও না এবং রূপক অর্থেও না। প্রকৃত অর্থে তো এজন্য নয় যে, নিকাহ -এর প্রকৃত অর্থ হলো মিলন। আর বিবাহ (اَلتَّزْوِيْجُ)-এর প্রকৃত অর্থ হলো বন্ধন বা জোড়া-সৃষ্টি করা। তামলীক ও এর সমার্থবোধক শব্দগুলোর মধ্যে উপরিউক্ত অর্থগুলো اَلضَّمُّ) (وَالتَّلْفِيْقُ পাওয়া যায় না। আর রূপক অর্থে এ কারণে নয় যে, মালিক ও মামলুক [মালিকানাধীন]-এর মধ্যে পার্থক্য হতে হয়। আর সম্পর্ক না হওয়ার কারণে اَحَدُ الْمُتَبَايِنَيْنِ পরের জন্য রূপক হয় না।

হানাফীগণের দলিলের সারসংক্ষেপ এই যে, সম্পর্ক থাকার কারণে তামলীক ও এর সমার্থবোধক শব্দগুলো নিকাহ -এর মধ্যে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা, তামলীক দেহের মালিকানার (مِلْكُ الرَّقَبَةِ) কারণে যৌন-সম্ভোগের (مِلْكُ الْمُتْعَةِ) অধিকার লাভের কারণ হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দাসীর দেহের মালিক হয়ে যায়, তাহলে দেহের কারণে সে যৌনসম্ভোগেরও মালিক হয়ে যায়। আর যৌন সম্ভোগ অর্জন হয় নিকাহ শব্দ দ্বারা। তাই বুঝা গেল, তামলীক শব্দটি সবব হলো, আর নিকাহ শব্দটি মুসাববাব হলো। আর নীতিমালা রয়েছে যে, সবব বলে মুসাব্বাব উদ্দেশ্য নেওয়া যায়।

যদিও তার উল্টো জায়েজ নেই। তাই তামলীক প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হতে পারে।

وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُوْدِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِجَارَةِ فِىْ الصَّحِيْحِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَلَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا وَلَا بِلَفْظَةِ الْوَصِيَّةِ لِاَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا اِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

অনুবাদ : اَلْبَيْعُ [বিক্রয়] শব্দ দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, [মালিকানার সূত্রে] রূপক অর্থ গ্রহণের মাধ্যম এতে বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে, اَلْاِجَارَةُ [ভাড়া] শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা এটা যৌন-সম্ভোগের মালিকানা লাভের কারণ নয়। اَلْاِبَاحَةُ [বৈধ করে দেওয়া], اَلْاِحْلَالُ [হালাল করে দেওয়া] এবং اَلْاِعَارَةُ [ধার দেওয়া] ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। এর কারণ আমরা এইমাত্র বলে এসেছি। তদ্রূপ اَلْوَصِيَّةُ [অসিয়ত] শব্দ দ্বারা হবে না। কেননা, অসিয়ত মৃত্যুপরবর্তী মালিকানা সাব্যস্ত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ الخ : বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, বিক্রয় শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ বকর আ'মাশ (র.) বলেন, এর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কারণ, বিক্রয় শব্দটি নির্দিষ্ট হলো تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِالْمَالِ -এর জন্য। আর مَمْلُوْكٌ بِالنِّكَاحِ মাল নয়, এজন্য এর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। বিশুদ্ধ মতের কারণ হলো, এখানেও রূপক অর্থ বিদ্যমান। কেননা, বিক্রয় এমন মালিকানা ওয়াজিবকারী যা যৌনসম্ভোগের অধিকার লাভের কারণ হয়। কেননা, যখন কেউ কোনো দাসী ক্রয় করল, তখন খরিদদার তার দেহের মালিকের সাথে সাথে যৌনসম্ভোগের মালিকানাও লাভ করে। এখন ঐ দাসী থেকে খেদমত ছাড়া তার সাথে সহবাস করাও জায়েজ হবে। তবে শর্ত হলো, হারাম হওয়ার কোনো কারণ না থাকা।

قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِجَارَةِ الخ : ভাড়া (اَلْاِجَارَةُ) শব্দ দ্বারা বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী বিবাহ সংঘটিত হবে না। তবে ইমাম কারখী (র.) বলেন, সংঘটিত হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র.) দলিল হিসেবে বর্ণনা করেন যে, ভাড়া (اِجَارَةٌ) হলো উপকার লাভের মালিকানা আর যৌনসম্ভোগের মালিকানাও উপকার লাভ [তাই বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে]। কিন্তু আমরা এর জবাবে বলব, যৌনসম্ভোগের মালিকানা ভাড়ার উপকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাইতো যদি দাসীকে খেদমতের জন্য ভাড়া হিসেবে নেওয়া হয় তবে এ দাসীর সাথে ভাড়া গ্রহীতার সহবাস করা জায়েজ হবে না।

বিশুদ্ধতম অভিমতের দলিল হলো, ভাড়া বা ইজারা যৌনসম্ভোগের মালিকানার সবব বা কারণ নয়। তাই কারণ বিদ্যমান না হওয়ার কারণে রূপক অর্থ পাওয়া যায়নি। বৈধ করে দেওয়া, হালাল করে দেওয়া এবং ধার দেওয়া ইত্যাদি দ্বারা, বিবাহ সংঘটিত না হওয়ায় কারণ এটাই যে, এ শব্দগুলো যৌনসম্ভোগের মালিকানার সবব নয়। অসিয়ত শব্দ দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হবে না। কারণ অসিয়ত যদিও মালিকানার কারণ, কিন্তু এমন মালিকানার কারণ যা মৃত্যুপরবর্তী মালিকানা সাব্যস্ত করে। আর বিবাহ সংঘটিত করার জন্য এমন মালিকানার দরকার যা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যমান।

قَالَ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُوْلًا كَانُوْا اَوْ غَيْرَ عُدُوْلٍ اَوْ مَحْدُوْدَيْنِ فِى الْقَذْفِ قَالَ اِعْلَمْ اَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِىْ بَابِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلٰى مَالِكٍ (رحـ) فِىْ اِشْتِرَاطِ الْاِعْلَانِ دُوْنَ الشَّهَادَةِ وَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ فِيْهَا لِاَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ بِدُوْنِهِمَا وَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْاِسْلَامِ فِىْ اَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ لِاَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الذُّكُوْرَةِ حَتّٰى يَنْعَقِدَ بِحُضُوْرِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَسَتَعْرِفُ فِى الشَّهَادَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتّٰى يَنْعَقِدَ بِحَضْرَةِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) لَهُ اَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ وَالْفَاسِقُ مِنْ اَهْلِ الْاِهَانَةِ وَلَنَا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحْرَمِ الْوِلَايَةَ عَلٰى نَفْسِهِ لِاِسْلَامِهِ لَا يُحْرَمُ عَلٰى غَيْرِهِ لِاَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ وَلِاَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا وَكَذَا شَاهِدًا وَالْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا وَاِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْاَدَاءِ بِالنَّهْىِ لِجَرِيْمَتِهِ وَلَا يُبَالِىْ بِفَوَاتِهِ كَمَا فِىْ شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ وَابْنَىِ الْعَاقِدَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীন, মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া মুসলমানদের বিবাহ সংঘটিত হতে পারবে না। দুজনই পুরুষ হতে পারে আবার একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক হতে পারে। চাই তারা সত্যনিষ্ঠ হোক কিংবা সত্যনিষ্ঠ না হোক কিংবা অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হোক। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জেনে রেখ যে, বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী হলো শর্ত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ 'সাক্ষী ছাড়া বিবাহ নেই।' সাক্ষীর পরিবর্তে ঘোষণাকে শর্ত লাগানোর ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। সাক্ষীর ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার শর্ত অপরিহার্য। কেননা, গোলাম অধিকার বঞ্চিত হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্যের যোগ্যতা নেই। প্রাপ্তবয়স্কতা এবং সুস্থ মস্তিষ্কতা অপরিহার্য। কেননা, এ দুটি ছাড়া অধিকারপ্রাপ্ত হয় না। মুসলমানদের বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীর মুসলমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। কেননা মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা নেই। সাক্ষীর পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এর দৃষ্টান্ত ইনশা আল্লাহ তুমি শাহাদাত অধ্যায়ে জানতে পারবে। সত্যনিষ্ঠতার শর্ত নেই, সুতরাং আমাদের মতে, দুজন ফাসিক

ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো, সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার একটি সম্মানবিশেষ। অথচ ফাসিক হলো অসম্মানযোগ্য। আমাদের দলিল হলো, ফাসিক ব্যক্তি অভিভাবকত্বের যোগ্য। সুতরাং সে সাক্ষ্য প্রদানেরও যোগ্য হবে। এটা এজন্য যে, ইসলামের কারণে যখন তার নিজের উপর অভিভাবকত্ব রহিত করা হয়নি তখন অন্যের উপর তার অভিভাবকত্বের অধিকারও রহিত করা হবে না। কেননা, অন্যের উপর অভিভাবকত্ব তার নিজের উপর অভিভাবকত্বের শ্রেণীভুক্ত। আর এজন্য যে, [বিচারক] নিয়োগ করার যোগ্যতা তার রয়েছে। সুতরাং সে নিজেও বিচারক হতে পারে। তেমনি সাক্ষীও। তদ্রূপ অপবাদ আরোপের অপরাধে যে সাজাপ্রাপ্ত সে ব্যক্তি [নিজের উপর এবং অন্যের উপর] অভিভাবকত্বের অধিকারী। সুতরাং 'বহনের' পর্যায়ে সে সাক্ষীর যোগ্য হবে, যদিও সে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। কেননা, তার অপরাধের কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর [বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে] সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা না থাকার বিষয়টি গ্রাহ্য করা হবে না। যেমন– অন্ধদের এবং আকদে নিকাহ সম্পাদনকারী উভয়ের পুত্রদ্বয়ের সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে [গুরুত্ব দেওয়া হয় না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে বিবাহের শর্তের আলোচনা করছেন। তিনি বলেন, বিবাহের মধ্যে সাক্ষ্য [প্রদান করা] শর্ত। ইমাম মালেক (র.) বলেন, ঘোষণা করা (اَلْاِعْلَانُ) শর্ত; সাক্ষ্য শর্ত নয়। ইমাম মালেক (র.) দলিল হিসেবে أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, বিবাহের ঘোষণা কর, যদিও দফ দ্বারা হয়। হানাফীগণ দলিল হিসেবে لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ হাদীসটি পেশ করেন। অর্থাৎ, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মালেক (র.) -এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো, এ হাদীসটি ঘোষণা করা ওয়াজিব বুঝায়, কিন্তু ঘোষণা করা শর্ত– একথা বুঝায় না।

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এরপর সাক্ষীদের অনেকগুলো গুণের আলোচনা করেছেন–

১. উভয়ের স্বাধীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ, সাক্ষীর যোগ্য সে ব্যক্তিই হবে যার অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা রয়েছে। আর গোলাম যেহেতু তার নিজের উপর অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে না, তাহলে অন্যের উপর কিভাবে অধিকার প্রয়োগ করবে? [وِلَايَتْ বলা হয় অন্যের উপর অধিকার প্রয়োগ করাকে]।

২. উভয় সাক্ষী সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা, এগুলো ছাড়াও অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জিত হয় না, তাই সাক্ষ্যের যোগ্যও হবে না।

৩. মুসলমানদের বিবাহ-শাদিতে সাক্ষীদের মুসলমান হওয়া অতীব জরুরি। এর দলিল হলো, কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا 'আল্লাহ মু'মিনগণের উপর কাফেরদের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেননি।' হানাফীগণের মতে সাক্ষীদের পুরুষ হওয়া জরুরি নয়; বরং একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকও সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন, বিবাহের মধ্যে পুরুষদের সাথে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণই করা যাবে না। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা শাহাদাত অধ্যায়ে করা হবে।

ন্যায়পরায়ণতার শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মাযহাব হলো, উভয় সাক্ষীর ন্যায়নিষ্ঠা শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) সাক্ষীদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠাকে শর্ত করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল এই যে, সাক্ষ্য হলো সম্মানজনক বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, أَكْرِمُوا الشُّهُوْدَ 'সাক্ষীদেরকে সম্মান কর।'

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, সাক্ষ্য হলো সম্মানজনক বস্তু, আর ফাসিক হলো অসম্মানজনক বস্তু। তাই ফাসিকদেরকে সাক্ষী নির্ধারণ না করে অসম্মান করা উচিত। তাকে সাক্ষ্য নিরূপণ করে তার সম্মান করা উচিত নয়।

হানাফীগণের দলিল হলো, ফাসিক অভিভাবকত্বের যোগ্য, তাই সে সাক্ষ্য প্রদানেরও যোগ্য হবে। ফাসিক অভিভাবকত্বের যোগ্য এজন্য যে, শরিয়ত তাকে তার মুসলমান হওয়ার কারণে তার নিজের উপর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করেনি, তাই অন্যের উপরও অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কেননা, অপরও মুসলমান হওয়ার কারণে তার শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয় দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, ফাসিক ব্যক্তি বিচারক হতে পারে, আর বিচারকের জন্য বৈধ রয়েছে যে, যাকে ইচ্ছা সে সাক্ষ্য নির্ধারণ করবে। ফাসিক বিচারক যখন অন্যকে কাজি নির্ধারণ করতে পারে তখন সে নিজেও বিচারক হতে পারে। আর যখন সে কাজি হতে পারে, তখন সাক্ষীও হতে পারে। কেননা, সাক্ষ্য ও বিচার উভয়টি একই পর্যায়ভুক্ত। কারণ, উভয়টির মধ্যে অপরের উপর হুকুম প্রয়োগ করার মর্ম বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَالْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ الخ : যাকে অপবাদ আরোপের অপরাধে সাজা দেওয়া হয়েছে সেও যেহেতু অভিভাবকত্বের যোগ্য, তাই সেও সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এ ব্যক্তি সাক্ষ্য বহনের যোগ্য; সাক্ষ্য আদায়ের যোগ্য নয়। সুতরাং অপবাদ আরোপের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হবে। কেননা, বিবাহের মধ্যে সাক্ষ্য বহন যথেষ্ট। তবে যদি কখনো বিচারের মজলিসে সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا 'তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না।' এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ كَمَا فِىْ شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ الخ : উপরিউক্ত মাসআলাটি এমন যেমন, দুই অন্ধ, কিংবা আকদে নিকাহ সম্পাদনকারীর দুই পুত্রের উপস্থিতিতে বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। কারণ, এরা সাক্ষ্য বহনের যোগ্য। তবে অন্ধদের সাক্ষ্য আর আকদে নিকাহ সম্পাদনকারীর পুত্রদের সাক্ষ্য পিতার ক্ষেত্রে কবুল করা হবে না। তবে যদি পিতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে পুত্রের সাক্ষ্যও পিতার বিরুদ্ধে কবুল করা হবে।

قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ السِّمَاعَ فِى النِّكَاحِ شَهَادَةٌ وَلَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَاَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسْلِمِ وَلَهُمَا اَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ فِى النِّكَاحِ عَلَى اِعْتِبَارِ اِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُوْدِهِ عَلَى مَحَلٍّ ذِىْ خَطَرٍ لَا عَلَى اِعْتِبَارِ وُجُوْبِ الْمَهْرِ اِذْ لَا شَهَادَةَ تُشْتَرَطُ فِىْ لُزُوْمِ الْمَالِ وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الزَّوْجِ لِاَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِكَلَامَيْهِمَا وَالشَّهَادَةُ شُرِطَتْ عَلَى الْعَقْدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো মুসলমান যদি জিম্মি [কিতাবী] নারীকে দুজন জিম্মির সাক্ষীতে বিবাহ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা, বিবাহের ক্ষেত্রে [কবুল] শ্রবণের অর্থই হলো সাক্ষ্য। আর মুসলমানের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার কাফেরের নেই। সুতরাং যেন তারা মুসলমানের কথা শোনেইনি। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর বক্তব্য- [স্ত্রীর উপর স্বামীর যৌনসম্ভোগের] মালিকানা সাব্যস্ত করার প্রেক্ষিতেই বিবাহে সাক্ষীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা, তা একটি সম্মানযোগ্য ও মূল্যবান অঙ্গের উপর সাব্যস্ত হচ্ছে। মহর ওয়াজিব হওয়ার প্রেক্ষিতে সাক্ষীর শর্ত আরোপিত হয়নি। কেননা, অর্থ ধার্য হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্ত নেই। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় জিম্মি স্ত্রীলোকটির প্রতি সাক্ষী হচ্ছে। পক্ষান্তরে জিম্মি সাক্ষী দুজন যদি স্বামীর কথা শ্রবণ না করে থাকে তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, আক্দ উভয়ের কথা দ্বারা সংঘটিত হয় আর আক্দের জন্যই সাক্ষীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ الخ : পূর্বের বর্ণনায় উভয় সাক্ষী মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। এ মাসআলাটি তারই আনুষঙ্গিক (تَفَرُّعٌ) জিম্মি ঐ কাফের ব্যক্তি যে মুসলিম দেশে অনুগত হয়ে বসবাস করে- সে হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান যাই হোক। কিন্তু মতনের (مَتْنٌ) মধ্যে জিম্মি দ্বারা কিতাবী উদ্দেশ্য। সে ইহুদি বা নাসারা যাই হোক। কারণ, মুসলমানদের বিবাহ শুধু কিতাবীদের সাথে জায়েজ; কিতাবী ছাড়া অন্যদের সাথে জায়েজ নেই।

মতনের মাসআলাটির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শায়খাইন (র.) জায়েজ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) জায়েজ না হওয়ার মতামত পেশ করেন। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, বিবাহের মধ্যে ইজাব ও কবুল শ্রবণ করার নাম হলো সাক্ষ্য। আর কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। জিম্মিরা যেন মুসলমানদের কথা শুনেইনি। মোদ্দাকথা, তারা শ্রবণকে অ-শ্রবণের উপর কিয়াস করেছেন। আর যখন ইজাব ও কবুলকে শুনেইনি, তখন সাক্ষ্যও পাওয়া যায়নি, তাই বিবাহ সংঘটিত হবে না।

শায়খাইনের দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, বিবাহের মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষণীয়- ১. স্বামীর জন্য যৌনসম্ভোগের মালিকানা সাবিত করা। ২. স্বামীর উপর স্ত্রীলোকের মহর সাবিত হওয়া। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সাক্ষ্য এমন বস্তুর জন্য হয় যা সম্মানযোগ্য ও মূল্যবান। আর যৌনসম্ভোগের স্থান হলো সম্মানযোগ্য। মাল অবধারিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মর্যাদা ও সম্মান নেই। এ কারণেই যদি বিবাহের সময় অর্থের উল্লেখ না করা হয় তবুও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। উপরিউক্ত ভূমিকা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, বিবাহের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় স্বামীর জন্য স্ত্রীর যৌনসম্ভোগের মালিকানা সাবিত করার জন্য; স্বামীর উপর মাল ওয়াজিব করার জন্য নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ সাক্ষ্য মুসলমান স্বামীর ক্ষেত্রে জিম্মি স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে। আর কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানের ক্ষেত্রে কবুল করা হয়, যদিও বিপরীত কবুল করা হয় না। তাই দুই জিম্মির সাক্ষ্য দ্বারা এ বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর দলিলের জবাব হলো, শ্রবণকে অ-শ্রবণের উপর কিয়াস করা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِاَنْ يُّزَوِّجَ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْاَبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ لِاَنَّ الْاَبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا لِاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَكُوْنُ الْوَكِيْلُ سَفِيْرًا وَمُعَبِّرًا فَيَبْقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا وَاِنْ كَانَ الْاَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ لِاَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ اَنْ يُّجْعَلَ الْاَبُ مُبَاشِرًا وَعَلٰى هٰذَا اِذَا زَوَّجَ الْاَبُ اِبْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ اِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً جَازَ وَاِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوْزُ .

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে তার নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করে, আর সে [আদিষ্ট ব্যক্তি] পিতার উপস্থিতিতে তাদের দুজন ব্যতীত অন্য একজন লোকের সাক্ষীতে ঐ মেয়েকে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে। কেননা, তখন একই মজলিস হওয়ার কারণে পিতাকে প্রত্যক্ষ আকদ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে। আর উকিল নিছক দূত ও বক্তব্য উচ্চারণকারী হয়ে যাবে। ফলে বিবাহ দানকারী [দ্বিতীয়] সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকবে। পক্ষান্তরে পিতা অনুপস্থিত থাকলে জায়েজ হবে না। কেননা, মজলিস ভিন্ন হওয়ার কারণে পিতাকে আক্‌দ সম্পাদনকারীরূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে পিতা যদি তার সাবালিকা কন্যাকে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ দান করে তাহলে কন্যা উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকলে বিবাহ জায়েজ হবে। আর যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِاَنْ يُّزَوِّجَ الخ : এ মাসআলাটি ঐ মাসআলার আনুষঙ্গিক যে, বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি তার চেয়ে কম হয় তবে বিবাহ সংঘটিত হবে না। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তার নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে উকিল নির্ধারণ করে। এখন এ উকিল একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এ নাবালিকার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে। এখন লক্ষণীয় যে, বিবাহের মজলিসে নাবালিকার পিতা বিদ্যমান ছিল কি না। যদি বিদ্যমান থাকে তবে পিতাকে বিবাহের আকদ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে, আর উকিলকে সাব্যস্ত করা হবে দ্বিতীয় সাক্ষীরূপে। কেননা, বিবাহের মধ্যে বিবাহের হকগুলো মুয়াক্কিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। উকিল নিরেট দূত ও বক্তব্য উচ্চারণকারী হয়ে থাকে। তাই এখানে আকদ সম্পাদনকারী পিতা ছাড়া দুজন পাওয়া গেল। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আর যদি পিতা বিবাহ মজলিসে বিদ্যমান না থাকে, তবে মজলিসের ভিন্নতার কারণে পিতাকে বিবাহের আক্‌দ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং উকিলই আক্‌দ সম্পাদনকারী হবে। এ সুরতে শুধু একজন সাক্ষী অবশিষ্ট থাকে। এ কারণে বিবাহ সংঘটিত হবে না।

একই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মাসআলা হলো, পিতা একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজের সাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দিল। এখন কন্যা যদি বিবাহ মজলিসে উপস্থিত থাকে তাহলে বিবাহ সহীহ হবে। এতে কন্যাকে আক্‌দ সম্পাদনকারী ও পিতাকে দ্বিতীয়

সাক্ষী সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি কন্যা বিবাহ মজলিসে উপস্থিত না থাকে তবে এ সুরতে কন্যাকে আক্দ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা অসম্ভব। পিতা আক্দ সম্পাদনকারীরূপে হবে। এখন শুধু একজন সাক্ষী অবশিষ্ট থাকে। এজন্য বিবাহ সংঘটিত হবে না।

জ্ঞাতব্য : শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য পুরুষ ব্যতীত জায়েজ নেই। [কাযী খান] ইবনে হাজম যাহিরীর মতে জায়েজ। উভয় সাক্ষীর আক্দ সম্পাদনকারীর বক্তব্য একসাথে শ্রবণ করা শর্ত। সুতরাং যদি এক সাক্ষী ইজাব ও কবুল শ্রবণ করে তারপর সে দ্বিতীয় সাক্ষীকে শুনায়। কিংবা অন্য কেউ চিৎকার করে দ্বিতীয় সাক্ষীকে শুনায় তবে তা জায়েজ হবে না। তোতলা ও বোবার সাক্ষী শুনার শর্তে জায়েজ। শোয়া ব্যক্তি এবং একেবারে বধিরের সাক্ষী জায়েজ হবে না। সাক্ষীদের শুনার সাথে সাথে উপলব্ধি করাও [বুঝা] শর্ত। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। নেশাগ্রস্তের সাক্ষী উপলব্ধি করার শর্তে জায়েজ। যদিও হুঁশ আসার পর স্মরণ না থাকে। যদি আল্লাহ ও রাসূলের সাক্ষ্যের উপর বিবাহ করে, তবে তা জায়েজ নেই। কোনো স্ত্রীলোক নিজকে অপর পুরুষের বিবাহে সোপর্দ করল। কিংবা ওলী বা ফুযূলী বিবাহ দিল, আর অপর পুরুষ অনুপস্থিত থাকে, তার পক্ষ থেকে কোনো ফুযূলী বিবাহ কবুল করে এবং সাক্ষীরাও তা শুনে তারপর ঐ পুরুষের নিকট সংবাদ পৌছলে সে তার অনুমতি প্রদান করে অথচ তখন সাক্ষী উপস্থিত নেই, তবে বিবাহ জায়েজ।

মোটকথা, সাক্ষীদের ইজাব ও কবুলের সময় উপস্থিত থাকা শর্ত। আর যদি ইজাব ও কবুলের সময় সাক্ষী না থাকে তারপর যখন পুরুষ অনুমতি প্রদান করে তখন সাক্ষী উপস্থিত ছিল। তবে আকদ বিবাহ জায়েজ হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে'] বিবাহের মধ্যে খেয়ারের শর্ত, দেখার খেয়ার, দোষ-ত্রুটির খেয়ার কারো জন্য সাবিত নয়; বরং বিবাহ জায়েজ হবে আর শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি সৌন্দর্য হওয়া, বাকেরা হওয়া বা সুস্থ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে, আর কোনো শর্ত প্রমাণিত (ثَابِتٌ) হবে না। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

فَصْلٌ فِىْ بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِاُمِّهِ وَلَا جَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَالْجَدَّاتُ اُمَّهَاتٌ اِذِ الْاُمُّ هُوَ الْاَصْلُ لُغَةً اَوْ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُنَّ بِالْاِجْمَاعِ.

অনুচ্ছেদ : মাহ্‌রাম

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিজ মাকে আর দাদী ও নানীদের বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ 'তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং তোমাদের কন্যাদেরকে', আর দাদী-নানীগণও اُمَّهَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অভিধানে اُمٌّ বা মা এর অর্থ হলো মূল। অথবা দাদী ও নানীদের হারাম হওয়া ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَتَزَوَّجَ الخ : যে সকল স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা হারাম, তারা দু'ধরনের। ১. যাদের সাথে কখনো বিবাহ জায়েজ নেই; বরং সর্বদার জন্য হারাম। যেমন– মা, বোন ইত্যাদি। ২. যারা অস্থায়ীভাবে হারাম, তবে কখনো হালালও হয়ে যায়। যেমন– অন্যের বিবাহিতা নারী বা ইদ্দত পালনকারিণী নারী। হারাম হওয়ার সাতটি সবব বা কারণ রয়েছে– ১. বিশেষ আত্মীয়স্বজন (اَلْقَرَابَةُ الْخَاصَّةُ), ২. বিবাহসূত্রে আত্মীয়স্বজন (نِكَاحِيْ رِشْتَهْ), ৩. দুধপান (اَلرِّضَاعَةُ), ৪. একত্রিকরণ (اَلْجَمْعُ), ৫. মালিক হওয়া, ৬. কুফর, ৭. স্বাধীন নারীর সাথে দাসীকে বিবাহ করা। কিতাবে এ ধারাবাহিকতার সাথেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাইতো গ্রন্থকার (র.) বলেন, মা যার পেট থেকে জন্মলাভ করেছে তাকে বিবাহ করা নাজায়েজ। এমনিভাবে দাদি ও দাদির মা এবং নানি ও নানির মাকে বিবাহ করা হালাল নয়।

দলিল হিসেবে কুরআনে কারীমের আয়াতকে পেশ করা হয়েছে (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ)। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আয়াতে কারীমায় মাদের (اُمَّهَاتٌ) হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে; দাদি ও নানির কথা বর্ণনা করা হয়নি। তাহলে তাদের হারাম হওয়া কিভাবে প্রমাণিত হবে? এর জবাব হলো, কুরআনে কারীমে اُمٌّ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর অভিধানে اُمٌّ-এর অর্থ হলো– মূল ও শিকড়। এখন আয়াতের মর্ম এই দাঁড়াবে যে, উসূল (اُصُوْلٌ) -কে হারাম করা হয়েছে। আর উসূলের মধ্যে দাদী বা নানী সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় জবাব হলো, মাদের হারাম হওয়ার কথা তো কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত, আর দাদী ও নানীদের হারাম হওয়া اَلْاِجْمَاعُ [ঐকমত্য] দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকল না।

قَالَ وَلَا بِبِنْتِهِ لِمَا تَلَوْنَا وَلَا بِبِنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفِلَتْ لِلْإِجْمَاعِ وَلَا بِأُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هٰذِهِ الْآيَةِ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ لِأَنَّ جِهَةَ الْاِسْمِ عَامَّةٌ قَالَ وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ وَلِهٰذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّخُولِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আপন কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না। এর প্রমাণ হলো আমাদের উপরে বর্ণিত আয়াত। আর আপন সন্তানের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না, যত অধস্তনই হোক। এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আপন ভগ্নিকে এবং ভগ্নির কন্যাদেরকে, অদ্রূপ ভ্রাতৃকন্যাদেরকে এবং ফুফু বা খালাকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, এরা যে হারাম তা উক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এদের মধ্যে শামিল হবে সর্বপ্রকার [আপন ও সৎ] ফুফু, সর্বপ্রকার খালা এবং সর্বপ্রকার ভ্রাতৃকন্যাগণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত শব্দগুলোর মর্ম ব্যাপক। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর আপন স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা হালাল নয়, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস হোক বা না হোক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সহবাসের শর্ত ছাড়াই وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ [তোমাদের জন্য হারাম] বলেছেন। আর যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস হয়েছে, তার কন্যাকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, এক্ষেত্রে আয়াতে সহবাসের শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। ঐ মেয়ে তার প্রতিপালনে থাকুক কিংবা অন্য কারো প্রতিপালনে থাকুক। কেননা, প্রতিপালনের উল্লেখ প্রচলনের প্রেক্ষিতে হয়েছে; শর্তের প্রেক্ষিতে নয়। এজন্যই হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু সহবাস না করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بِبِنْتِهِ لِمَا تَلَوْنَا الخ : কন্যা সন্তান যা তার বীর্য দ্বারা পয়দা হয়েছে, তাকে বিবাহ করাও উপরিউক্ত আয়াতের কারণে হারাম। এমনিভাবে আপন সন্তানের কন্যাদেরকে অর্থাৎ পৌত্রী এবং আপন কন্যার কন্যাদেরকে [অর্থাৎ দৌহিত্রী] -ও বিবাহ করা হারাম। এদের হারাম হওয়া ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে বোন, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নিকন্যাগণ, ফুফু, খালা সব হারাম। তাদের হারাম হওয়ার কথাও উল্লিখিত এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগ্নিকন্যা প্রমুখ।' আয়াতের মধ্যে শর্তহীনভাবে ফুফু, খালা এবং ভ্রাতৃকন্যার উল্লেখ রয়েছে, তাই হাকীকি বৈমাত্রীয়, বৈপিত্রীয় সব শামিল থাকবে। কারণ, عَمَّةٌ ও خَالَةٌ শব্দগুলো সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بِأُمِّ اِمْرَأَتِهِ الَّتِىْ دَخَلَ بِابْنَتِهَا اَوْ لَمْ يَدْخُلْ الخ : উক্ত ইবারতে শাশুড়িকে [বিবাহ করা] হারাম হওয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস হোক বা না হোক উভয় সুরতে শাশুড়িকে বিবাহ করা হারাম। এর দলিল হলো, কুরআনের মধ্যে শাশুড়িকে বিয়ে করা হারাম হওয়াকে সহবাসের কয়েদ থেকে মুক্ত (مُطْلَقْ) রাখা হয়েছে। তাই এ হুকুম তার শর্তহীন (اِطْلَاقْ) হওয়ার উপর বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا بِبِنْتِ اِمْرَأَتِهِ الَّتِىْ الخ : দ্বিতীয় মাসআলা এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি এমন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে যার পূর্বের স্বামী কর্তৃক এক কন্যা রয়েছে। এ কন্যাকে রাবীবা তথা সৎমেয়ে বলা হয়। এ সৎমেয়েকে বিবাহ করার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো, যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে সৎমেয়েকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। আর যদি সহবাস না করে তবে বিবাহ করা জায়েজ। এর দলিল হলো, কুরআনে কারীমে "সহবাস" -এর কয়েদ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .

অর্থাৎ তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। তবে যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। -[৪ -নিসা -২৩]

قَوْلُهُ لِاَنَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন–

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, কুরআনে কারীমে دُخُوْلْ -এর قَيْد রয়েছে, এমনিভাবে حُجُوْر তথা লালন-পালন -এর قَيْد ও রয়েছে। এখন আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঐ সৎমেয়ে যদি তোমাদের লালন-পালনে থাকে তবে তো বিবাহ করা হারাম, আর দ্বিতীয় স্বামী ব্যতীত যদি অন্য কারো লালন-পালনে থাকে তবে বিবাহ হালাল হওয়া উচিত। অথচ হুকুম হলো এর বিপরীত?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হলো, আয়াতের মধ্যে حُجُوْر -এর قَيْد টি হলো قَيْد اِتِّفَاقِىْ ও قَيْد عَادِىْ ; قَيْد اِحْتِرَازِىْ নয়। অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম এই যে, এ ধরনের শিশুদের লালন-পালন দ্বিতীয় স্বামীই করে থাকে। মা তাদের ছোট শিশুদেরকে সাথে করেই নিয়ে আসে। এটাই কারণ, কুরআন যখন বিবাহ জায়েজ হওয়ার বর্ণনা করেছে, তখন শুধু دُخُوْل -এর قَيْد -এর نَفِىْ -এর উপর নির্ভর (اِكْتِفَاءْ) করেছে حُجُوْر -এর نَفِىْ -এর উল্লেখ করেনি। যদি এ قَيْد টিও লক্ষণীয় হতো তবে জায়েজ বর্ণনার সময় তারও نَفِىْ -এর উল্লেখ করা হতো।

قَالَ وَلَا بِامْرَأَةِ اَبِيْهِ وَاَجْدَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآءُكُمْ وَلَا بِامْرَأَةِ اِبْنِهِ وَبَنِىْ اَوْلَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَحَلَائِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ ذِكْرُ الْاَصْلَابِ لِاِسْقَاطِ اِعْتِبَارِ التَّبَنِّىْ لَا لِاِحْلَالِ حَلِيْلَةِ الْاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِاُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِاُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর আপন পিতার এবং নানা ও দাদার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآءُكُمْ 'তোমাদের পিতারা যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।' আর আপন পুত্রের কিংবা পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَحَلَائِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ 'এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম। 'আর ঔরসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে পালক পুত্রের বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার জন্য; দুধ পুত্রের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য নয়। আর দুধ-মা ও দুধ-বোনকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ 'তোমাদের যে মাতাগণ তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন, তাদেরকে এবং তোমাদের দুধ-বোনদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।' আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 'তোমাদের 'নসব' [রক্ত সম্পর্ক] -এর কারণে যা হারাম, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بِامْرَأَةِ اَبِيْهِ وَاَجْدَادِهِ الخ : উক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো, পিতা, দাদা এবং নানার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। দলিল হিসেবে আয়াত পেশ করা হয়েছে। এমনিভাবে আপন পুত্রের এবং পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও বিবাহ করা জায়েজ নেই। এখানেও দলিল হিসেবে আয়াত উল্লেখ রয়েছে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আয়াতের মধ্যে اَصْلَابٌ -এর قَيْد দ্বারা বুঝা যায়, দুধ সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। অথচ ব্যাপারটি এমন নয় ? হিদায়া গ্রন্থকার (র.) -এর জবাবে বলেন, اَصْلَابٌ -এর قَيْد তথা ঔরসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে পালক পুত্রের বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার জন্য; দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য নয়। মোদ্দাকথা হলো, যে সন্তানের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য হারাম তারা হলো তোমাদের ঔরসজাত। আর যারা তোমাদের ঔরসজাত নয় তারা দু ধরনের– ১. দুধ পুত্র, ২. পালক পুত্র। কিন্তু হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, দুধ পুত্র আপন পুত্রের অনুরূপ। এর দ্বারা বুঝা গেল اَصْلَابٌ -এর قَيْد দ্বারা শুধু পালক পুত্রকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল।

قَوْلُهُ وَلَا بِاُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম, তাদের বর্ণনা করছেন। দুধ-মা, যে এক ফোঁটাও দুধ পান করিয়েছে এবং দুধ-বোনকে বিবাহ করা হারাম। এর দলিল হিসেবে আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে।

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ وَطْيًا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهٗ فِيْ رِحْمِ اُخْتَيْنِ فَاِنْ تَزَوَّجَ اُخْتَ اَمَةٍ لَهٗ قَدْ وَطِيَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصُدُوْرِهٖ مِنْ اَهْلِهٖ مُضَافًا اِلٰى مَحَلِّهٖ وَاِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْاَمَةَ وَاِنْ كَانَ لَمْ يَطَأِ الْمَنْكُوْحَةَ لِاَنَّ الْمَنْكُوْحَةَ مَوْطُوْءَةٌ حُكْمًا وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوْحَةَ لِلْجَمْعِ اِلَّا اِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوْءَةَ عَلٰى نَفْسِهٖ بِسَبَبٍ مِنَ الْاَسْبَابِ فَحِيْنَئِذٍ يَطَأُ الْمَنْكُوْحَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْيًا وَيَطَأُ الْمَنْكُوْحَةَ اِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوْكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْيًا اِذِ الْمَرْقُوْقَةُ لَيْسَتْ مَوْطُوْءَةً حُكْمًا.

অনুবাদ : আর দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে এবং সহবাসসহ মালিকানার মাধ্যমে একত্র করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ 'আর দুই বোনকে একত্র করা [হারাম]।' তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهٗ فِيْ رِحْمِ اُخْتَيْنِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন দুই বোনের 'রেহেমে' আপন বীর্য একত্র না করে।' যে দাসীর সঙ্গে সহবাস করেছে, সে তার বোনকে যদি বিবাহ করে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকেই বিবাহ সংঘটিত হয়েছে এবং বৈধ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতএব বিবাহ যখন জায়েজ হলো তখন দাসীর সঙ্গে আর সহবাস করবে না, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করে থাকলেও। কেননা, বিবাহিতা স্ত্রী [শরিয়তের] হুকুম হিসেবে সহবাসকৃতারূপে গণ্য। আর এ বিবাহিতার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না একত্রিকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে। তবে যদি সহবাসকৃতা বাঁদি নিজের উপর হারাম করে দেয় [বিক্রি কিংবা হেবা ইত্যাদি] কোনো একটি সবব গ্রহণের মাধ্যমে, তখনই বিবাহিতার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে। কেননা, এ অবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে উভয়কে একত্র করা হয়নি। আর যদি দাসীর সঙ্গে সহবাস না করে থাকে তাহলে বিবাহিতার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয়কে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা হচ্ছে না। কারণ, মালিকানাধীন দাসী [শরিয়তের] হুকুম হিসেবে সহবাসকৃতারূপে গণ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ الخ : দুই বোনকে একত্র করা দুভাবে হতে পারে–

১. দুই বোনকে একসাথে কিংবা আগে-পিছে বিবাহ করা। এ বিবাহ জায়েজ-ই নেই। যদি উভয় বোনকে এক আকদে একসাথে বিবাহ করা হয় তাহলে উভয়ের বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি আগে-পিছে বিবাহ হয়, তবে প্রথম বোনের বিবাহ সহীহ এবং দ্বিতীয় বোনের বিবাহ বাতিল হবে।

. মালিকানায় দুই বাঁদি আছে। দুজন পরস্পর বোন। উভয়কে মালিকানায় একত্র করাতো জায়েজ, কিন্তু উভয়ের সাথে সহবাস করা জায়েজ নেই। মোদ্দাকথা হলো, দুই বোনকে বিবাহের দিক থেকে একত্র করা জায়েজ নেই এবং দুই বোনকে মালিকানায় একত্র করা সহবাসের দিক থেকে জায়েজ নেই। তবে উভয়ের মালিক হওয়া জায়েজ। এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- أَنْ تَجْمَعُوا অর্থাৎ, তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে দুই বোনকে বিবাহের মধ্যে একত্র করা। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো দুই বোনের রেহেমে নিজের বীর্য একত্র না করে। ফিরোজ দায়লামী কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, [ফিরোজ বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, যে আমি মুসলমান হয়েছি, আর আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি দুজনের মধ্য থেকে একজনকে পছন্দ কর।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا الخ : সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির সহবাসকৃতা হলো দাসী। এ দাসীর অপর বান অন্যের মালিকানায় আছে। এ ব্যক্তি তার অনুমতিক্রমে তাকে বিবাহ করে ফেলল –এ বিবাহ জায়েজ। দলিল হলো, এ বাহ এমন আক্দ সম্পাদনকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে যে বিবাহের যোগ্যতা রাখে এবং বৈধ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, তাই বাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। বিবাহ জায়েজ হওয়ার পর স্বীয় বাঁদির সাথেও সহবাস করতে পারবে না, যদিও বিবাহিতার সাথে হবাস না করে থাকে। কেননা, বিবাহিতা হুকুমের দিক থেকে সহবাসকৃতার অনুরূপ। এমনিভাবে বিবাহিতার সাথেও সহবাস রবে না। কেননা, উভয় সুরতে সহবাসের মাধ্যমে দুজনকে একত্র করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে যদি সহবাসকৃতাকে নজের উপর কোনো কারণে হারাম করা হয়; যেমন- বিক্রি করে দিল বা হিবা করে দিল, তাহলে এখন বিবাহিতার সাথে হবাস করতে পারবে। কেননা, এ সুরতে দুই বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা অপরিহার্য হয় না। আর যদি ালিকানাধীন দাসীর সাথে একেবারেই সহবাস না করে থাকে, তাহলে বিবাহিতার সাথে সহবাস করতে পারবে। কেননা, ালিকানাধীন দাসী বাস্তবিকপক্ষেও সহবাসকৃতা নয় এবং হুকুম হিসেবেও নয়। তাই এ সুরতে দুই বোনকে সহবাসের মাধ্যমে ়কত্র করার খারাবি আবশ্যক হবে না।

فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِيْ عَقْدَتَيْنِ وَلَا يَدْرِيْ أَيَّتُهُمَا أَوْلَى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لِأَنَّ نِكَاحَ إِحْدٰهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِيْنٍ وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَا إِلَى التَّنْفِيْذِ مَعَ التَّجْهِيْلِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلضَّرَرِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيْقُ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْأُوْلٰى مِنْهُمَا وَانْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِمَا وَقِيْلَ لَابُدَّ مِنْ دَعْوٰى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا الْأُوْلٰى أَوِ الْإِصْطِلَاحُ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ .

অনুবাদ : যদি দুই বোনকে পৃথক দুই আকদের মাধ্যমে বিবাহ করে, আর জানা না থাকে যে, কাকে প্রথমে বিবাহ করেছে তাহলে তাকেও উভয় বোনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কেননা, দুজনের একজনের বিবাহতো সুনিশ্চিতরূপেই বাতিল, কিন্তু অগ্রাধিকার [জানা] না থাকার কারণে নির্ধারণের কোনো উপায় নেই। তদ্রূপ অনির্ধারিতভাবে বিবাহ কার্যকর করারও কোনো উপায় নেই। কেননা [এ বিবাহের] কোনো সার্থকতা নেই কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বিচ্ছেদ ঘটানোই হলো অনিবার্য। আর উভয় স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। কেননা, মূলত অর্ধেক মহর তাদের প্রথম জনের প্রাপ্য হয়েছে। অথচ অজ্ঞতার কারণে অগ্রাধিকার সম্ভব নয়। সুতরাং তা উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে। কারো কারো মতে, উভয়ের প্রত্যেককে এ দাবি করতে হবে যে, সেই হলো প্রথমা। কিংবা [কে আসল] হকদার [তা] জানা না থাকার কারণে [মহর ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে] সমঝোতা থাকতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِيْ عَقْدَتَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, দুই বোনের সাথে দুই আকদের মাধ্যমে বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এ কথা জানা নেই যে, কার সাথে প্রথমে বিবাহ হয়েছে, আর কার সাথে পরে। তবে এ সুরতে কাজি সাহেব স্বামী এবং দুই বোনের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। আর এ বিচ্ছিন্ন, তালাকে বায়েন হবে। দলিল হলো, তাদের দুজনের মধ্য থেকে একজনের বিবাহতো নিশ্চিতরূপে জায়েজ, আরেকজনের নিশ্চিতরূপে বাতিল। এখন এখানে দুটি সুরত রয়েছে– ১. একজনের বিবাহকে নির্দিষ্টরূপে কার্যকর করতে হবে, আর অপরজনের বিবাহকে বাতিল করতে হবে। ২. অজ্ঞতার সাথে উভয়ের বিবাহকে কার্যকর করা। তবে এ দুই সুরত সম্ভব নয়। প্রথম সুরত তো এজন্য যে, এতে تَرْجِيْح بِلَا مُرَجِّح [অগ্রাধিকার ছাড়াই অগ্রাধিকার দেওয়া] অপরিহার্য হবে। আর দ্বিতীয় সুরত এজন্য সম্ভব নয় যে, প্রথমত এমন করার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো সহবাস বৈধ এবং বংশ-বিস্তার লাভ করা। আর এ সুরতে উভয় উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। দ্বিতীয়ত উভয় স্ত্রীলোকের এতে ক্ষতি রয়েছে। কারণ, উভয়ের একই ব্যয়ভারের উপর নির্ভর করতে হবে এবং উভয়কে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে হবে, কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الخ : দুই বোনের মহর যদি বরাবর থাকে আর সহবাসের পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তাহলে উভয়কে অর্ধেক মহর দিতে হবে। উভয়ে অর্ধেক-অর্ধেক বণ্টন করে নিবে। সুতরাং প্রত্যেকের ভাগে $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ করে পড়বে। দলিল হলো, অর্ধেক মহর তাদের দুজনের মধ্যে তার জন্য ওয়াজিব হবে, যে তাদের মধ্যে প্রথম। কিন্তু এ কথা জানা নেই যে, কে প্রথম? তাই প্রথমজনের কথা জানা না থাকার কারণে অগ্রাধিকার হবে না। সুতরাং প্রত্যেককে অর্ধেক মহর দিয়ে দেওয়া হবে। কারো কারো অভিমত হলো, উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকে দাবি করবে যে, আমি প্রথম। তবে দাবিদারকে তার দাবি অনুযায়ী দেওয়া হবে। কিংবা উভয়ে পরস্পর সন্ধি করে নেবে যে, অর্ধেকের মধ্যে উভয়ে শরিক। কারণ, আসল হকদারের কথা জানা নেই।

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا اَوْ اِبْنَةِ اَخِيْهَا اَوْ اِبْنَةِ اُخْتِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلَا عَلٰى خَالَتِهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اَخِيْهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اُخْتِهَا وَهٰذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ اِحْدٰهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْاُخْرٰى لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِىْ اِلَى الْقَطْعِيَّةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرِّضَاعِ تَحْرُمُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ لِاَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رِضَاعَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ اِبْنَةَ الزَّوْجِ لَوْ قَدَّرْتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِامْرَأَةِ اَبِيْهِ قُلْنَا امْرَأَةُ الْاَبِ لَوْ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا جَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهٰذِهِ وَالشَّرْطُ اَنْ يُصَوَّرَ ذٰلِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ -

অনুবাদ : কোনো নারীকে তার ফুফু কিংবা খালা কিংবা ভাইঝি কিংবা বোনঝি -এর সঙ্গে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلَا عَلٰى خَالَتِهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اَخِيْهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اُخْتِهَا 'কোনো নারীকে তার ফুফুর বিদ্যমানে কিংবা তার খালার বিদ্যমানে কিংবা তার ভাইঝির বিদ্যমানে কিংবা তার বোনঝির বিদ্যমানে বিবাহ করা যাবে না।' এ হাদীসটি হলো মাশহূর পর্যায়ের। আর এ ধরনের হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমের উপর বৃদ্ধি করা যায়। আর এমন দুই নারীকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না, যাদের একজনকে পুরুষ বলে ধরে নিলে তার পক্ষে অপর নারীকে বিবাহ করা জায়েজ হয় না। কেননা, এমন দুজন [বিবাহ বন্ধনে] একত্রকরণ বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। আর যে ধরনের আত্মীয়তায় নিকাহ হারাম করা হয়েছে, তা হারাম করা হয়েছে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণে। আর যদি উভয়ের মাঝে মাহ্‌রাম সম্পর্ক দুগ্ধপানের কারণে হয়ে থাকে তাহলেও [উভয়কে বিবাহ বন্ধনে] একত্র করা হারাম হবে। এর দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। কোনো নারীকে এবং তার পূর্ববর্তী স্বামীর [অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত] কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে একত্র করায় কোনো বাধা নেই। কেননা, উভয়ের মাঝে আত্মীয়তার কিংবা দুগ্ধপানের কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে তা জায়েজ নয়। কেননা, পূর্ববর্তী স্বামীর কন্যাকে যদি পুরুষ ধরা হয় তাহলে তো তার পক্ষে পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না। আমাদের দলিল হলো, পিতার স্ত্রীকে যদি পুরুষ ধরা হয় তাহলে তার পক্ষে এ মেয়েকে বিবাহ করা জায়েজ। আর শর্ত হলো, উভয় দিক থেকে পুরুষ সাব্যস্ত করার বেলায় বিবাহের অবৈধতা হতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الخ : গ্রন্থকার উক্ত ইবারতে বিবাহে একত্রকরণ হারাম হওয়ার কয়েকটি সুরত বর্ণনা করেছেন। যেমন- নারী ও তার ফুফুকে একত্র করা হারাম। এমনিভাবে নারী ও তার খালা, নারী ও তার ভাইঝি এবং নারী ও বোনঝিকে [বিবাহে] একত্র করা হারাম। দলিল হিসেবে গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস পেশ করেছেন।

প্রশ্ন: তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কুরআনে কারীমে সকল মুহাররামাত-এর (مُحَرَّمَاتٌ) কথা বর্ণনা করে- أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ বলা হয়েছে। আর কুরআন মুহাররামাতের বর্ণনায় এ সকল নারীর কথা উল্লেখ করেনি। তাহলে তো এ সকল সুরত জায়েজ হওয়ার কথা।

উত্তর: এর উত্তর হলো, এ হাদীস যাকে একত্রিতকরণ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে পেশ করা হয়েছে, তা হলো হাদীসে মাশহুর। আর হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং হাদীসের প্রেক্ষিতে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ الخ : গ্রন্থকার উক্ত ইবারতে দুই নারীর মাঝে একত্রিকরণ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। নীতিটি হলো, যে দুই নারীকে বিবাহে একত্র করা হবে তাদের মধ্যে প্রত্যেককে যদি পুরুষ ধরে নেওয়া হয়, তখন দেখতে হবে, তাদের পরস্পর শরয়ীভাবে বিবাহ জায়েজ কিনা ? যদি জায়েজ হয় তাহলে তাদেরকে একত্রে বিবাহ করা যাবে, আর যদি জায়েজ না হয় তবে এদেরকে বিবাহেও একত্রিত করা যাবে না। যেমন- কন্যা ও তার ফুফুকে একসাথে বিবাহ করা হারাম। কারণ, কন্যাকে যদি পুরুষ ধরা হয় তবে ফুফু ও ভাতিজার সম্বন্ধ হয়ে যায়। আর যদি ফুফুকে পুরুষ ধরা হয় তবে চাচা ও ভাইঝির সম্বন্ধ হয়ে যায়। উভয় সুরতে তাদের পরস্পর বিবাহ জায়েজ হয় না। তাই তাদেরকে বিবাহেও একত্র করা জায়েজ হবে না। এরই উপর অন্যান্য সুরতকে কিয়াস করা যায়। এর দলিল হলো, এ ধরনের দুই নারীকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রিকরণ বিচ্ছিন্নতার কারণ হবে। কারণ, বিবাহের পর এরা পরস্পর সতীন হবে। আর সতীনদের মাঝে সাধারণত পরস্পর শত্রুতা লেগেই থাকে। আর সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম, তাই যা হারাম হওয়ার সবব তাও হারাম হবে। অতএব, এ ধরনের দুই নারীকেও একত্র করা হারাম। একেই হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে সম্পর্ক বিবাহ হারামকারী তা সম্পর্ক ছেদনকেও হারামকারী। যে সকল সুরতে আত্মীয়তার কারণে দুই নারীকে একত্র করা হারাম, সে সকল সুরতে দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হবে। দলিল হলো ঐ হাদীস যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ الخ : এ মাসআলাটি পূর্ববর্তী নীতিমালার আনুষঙ্গিক। মাসআলাটি হলো, নারী ও তার পূর্বের স্বামী কর্তৃক প্রথম স্ত্রীর কন্যাকে একসাথে বিবাহে আবদ্ধ করা যায়। যেমন- হিন্দা যায়েদকে বিবাহ করল, আর যায়েদের প্রথম স্ত্রী ফাতিমার এক কন্যা যায়নাব রয়েছে। তারপর যায়েদ হিন্দাকে তালাকে বায়েন দিয়ে দিল। এখন যদি খালিদ যায়েদের কন্যা যায়নাব আর হিন্দাকে একই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করে, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, হিন্দা ও যায়নাবের মাঝে আত্মীয়তার ও দুগ্ধপানের কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাম যুফার (র.) বলেন, জায়েজ নয়। জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, স্বামী অর্থাৎ, যায়েদের কন্যা যায়নাবকে যদি পুত্র সন্তান ধরে নেওয়া হয় তবে তাদের পরস্পর বিবাহ জায়েজ নেই। কেননা, হিন্দা হলো তার পিতার বিবাহিতা, আর পিতার বিবাহিতাকে বিবাহ করা জায়েজ নেই, তাই একত্রকরণও জায়েজ নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, পিতার স্ত্রীকে যদি পুরুষ ধরে নেওয়া হয় তবে তাদের পরস্পরে বিবাহ জায়েজ। কারণ, ঐ কন্যা অপরিচিত পুরুষের কন্যা হবে। আর দুই নারীকে একত্রকরণ হারাম হওয়ার শর্ত হলো, উভয় দিক থেকে পুরুষ ধরে নেওয়ার সুরতে পরস্পরে বিবাহ হারাম হওয়া। অথচ এখানে এমন নয়।

وَمَنْ زَنٰى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلزِّنَاءُ لَا يُوْجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تَنَالُ بِالْمَحْظُوْرِ وَلَنَا اَنَّ الْوَطْئَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ حَتّٰى يُضَافَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا فَيَصِيْرُ اُصُوْلُهَا وَفُرُوْعُهَا كَاُصُوْلِهِ وَفُرُوْعِهِ وَكَذٰلِكَ عَلَى الْعَكْسِ وَالْاِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ اِلَّا فِيْ مَوْضِعِ الضَّرُوْرَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوْءَةُ وَالْوَطْئُ مُحَرِّمٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ زِنَاءٌ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে জেনা করল, তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটির মা এবং তার কন্যা হারাম হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জেনা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয় না। কেননা, মাহরামিয়াত একটি নিয়ামতবিশেষ। সুতরাং অবৈধ পথে তা অর্জিত হবে না। আমাদের দলিল হলো, যৌনসঙ্গম হলো সন্তানের মাধ্যমে [উভয়ের মাঝে] অংশত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। এ কারণেই তো সন্তানকে পূর্ণরূপে উভয়ের প্রত্যেকের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকটির ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনরা পুরুষটির ঊর্ধ্বতন অধস্তনের ন্যায় হয়ে যাবে। অপরদিক থেকেও সেরূপ হবে। আর আপন দেহ-অংশে যৌনসম্ভোগ করা হারাম, তবে শুধু বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে জায়েজ, আর সে ক্ষেত্র হলো সহবাসকৃতা স্ত্রী। আর যৌনসম্ভোগ মূলত সন্তান লাভের মাধ্যম হওয়ায় মাহ্‌রামিয়াতের কারণ হয়েছে; জেনা হওয়ার কারণে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ زَنٰى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ الخ : জেনা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয় কিনা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মাযহাব হলো, জেনা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাই জেনাকারীর উপর জেনাকৃতার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন হারাম হয়ে যাবে। আর জেনাকৃতার উপরও জেনাকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন হারাম হয়ে যাবে। ঊর্ধ্বতন দ্বারা দাদী, নানী প্রমুখ উদ্দেশ্য। আর অধস্তন দ্বারা পৌত্রী, দৌহিত্র প্রমুখ উদ্দেশ্য। শাফেয়ীগণের মাযহাব হলো, জেনা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়্যাত সাব্যস্ত হবে না। তাই তাঁর মতে জেনাকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন জেনাকৃতার জন্য হালাল এবং জেনাকৃতার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন জেনাকারীর জন্য হালাল হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের সারসংক্ষেপ এই যে, জেনা হলো হারাম ও অপরাধমূলক কাজ। আর বৈবাহিক সম্পর্ক হলো একটি নিয়ামতবিশেষ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইহসানাতের বর্ণনার সময় মুসাহারাতের উল্লেখ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 'আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল বানিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারাম কাজ কোনো নিয়ামত অর্জনের সবব বা কারণ হতে পারে না। তাই জেনা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে না। আমাদের দলিলের সারনির্যাস হলো, উভয়ের মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হওয়ার মূল বা আসল হলো সন্তান। অর্থাৎ, সন্তান যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে সন্তানের উপর সহবাসকারীর পিতা এবং সন্তান হারাম হবে। আর যদি সন্তান পুংলিঙ্গ হয় তবে

সহবাসকৃতার মা এবং কন্যা ঐ সন্তানের উপর হারাম হবে। তারপর এ হারাম হওয়া সংক্রমিত হবে সন্তানের দুদিক অর্থাৎ, সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার দিকে। সুতরাং সহবাসকৃতার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহবাসকারীর উপর আর সহবাসকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহবাসকৃতার উপর হারাম হবে। কারণ, সন্তান সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার মধ্যকার একত্ব ও অশত্ব সাব্যস্ত করে দিয়েছে। এ কারণে একজন সন্তানকে পূর্ণরূপে সহবাসকারীর দিকেও সম্পৃক্ত করা যায়। যেমন বলা হয়– এটি অমুকের সন্তান; আবার পরিপূর্ণভাবে সহবাসকৃতার দিকেও সম্পৃক্ত করা যায়। যেমন বলা হয়– এ বাচ্চাটি অমুক স্ত্রীলোকের। তাই এ সন্তানের কারণে সহবাসকারী অংশ হলো সহবাসকৃতার, আর সহবাসকৃতা অংশ হলো সহবাসকারীর। সুতরাং সহবাসকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহবাসকৃতার ঊর্ধ্বতন অধস্তন -এর ন্যায় হয়ে যাবে। আর সহবাসকৃতার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনও সহবাসকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনে গণ্য হবে। আর আপন দেহ-অংশ দ্বারা যৌনসম্ভোগ করা হারাম, তাই সহবাসকারীর জন্য সহবাসকৃতার মা এবং কন্যা হারাম হবে; আর সহবাসকৃতার উপর সহবাসকারীর পিতা ও সন্তান হারাম হবে।

প্রশ্ন: তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, সহবাসকৃতা সন্তানের মাধ্যমে সহবাসকারীর অংশবিশেষ, তবে তো এক বাচ্চা প্রসবের পর দ্বিতীয়বার ঐ সহবাসকৃতা তার জন্য হালাল না হওয়া উচিত। অথচ বিধান হলো এর বিপরীত?

উত্তর: এর উত্তর হলো, মূলত দেহ-অংশ দ্বারা যৌনসম্ভোগ হারাম। কিন্তু এখানে কষ্ট দূরীকরণার্থে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে বিবাহের উদ্দেশ্য বংশধারা ও বংশপরম্পরা পণ্ড না হয়ে যায়। আর এ মাসআলাটি হুবহু এমন যেমন হযরত আদম (আ.) -এর উপর তাঁর কন্যাগণ হারাম ছিল, কিন্তু হযরত হাওয়া (আ.) -কে এই নীতিমালা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব হলো, সহবাস জেনা হওয়া হিসেবে বৈবাহিক মাহরামিয়াতের সবব বা কারণ নয়; বরং সন্তান লাভের মাধ্যম হওয়ায় মাহরামিয়াতের কারণ হয়েছে। সুতরাং সহবাস সন্তানের স্থলবর্তী হবে। বাস্তবিকপক্ষে সন্তান সবব হলো হুরমতে মুসাহারার। আর সন্তানের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। অন্যায় যা আছে তা হলো মায়ের। সন্তান, যাকে সবব নির্ধারণ করা হয়েছে তার কোনো অপরাধ নেই।

وَمَنْ مَسَّتْهُ اِمْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَابْنَتُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا تَحْرُمْ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافُ مَسُّهُ اِمْرَأَةً بِشَهْوَةٍ وَنَظَرُهُ اِلٰى فَرْجِهَا وَنَظَرُهَا اِلٰى ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ لَهُ اَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ لَيْسَا فِيْ مَعْنَى الدُّخُوْلِ وَلِهٰذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْاِحْرَامِ وَ وُجُوْبُ الْاِغْتِسَالِ فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِ وَلَنَا اَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ اِلَى الْوَطْيِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ فِيْ مَوْضِعِ الْاِحْتِيَاطِ ثُمَّ اَنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ اَنْ يَنْتَشِرَ الْاٰلَةُ اَوْ تَزْدَادُ اِنْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ وَالْمُعْتَبَرُ النَّظَرُ اِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ اِلَّا عِنْدَ اِتِّكَائِهَا وَلَوْ مَسَّ فَاَنْزَلَ فَقَدْ قِيْلَ اِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُرْمَةَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَا يُوْجِبُهَا لِاَنَّهُ بِالْاِنْزَالِ تَبَيَّنَ اَنَّهُ غَيْرُ مُفْضٍ اِلَى الْوَطْيِ وَعَلٰى هٰذَا اِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِى الدُّبُرِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো নারী কাম-প্রবৃত্তির সাথে [কোনো পুরুষকে] স্পর্শ করে, তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকের মা ও কন্যা হারাম হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারাম হবে না। একই মতবিরোধ রয়েছে, যদি কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোককে কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে কিংবা স্ত্রীলোকটির লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় কিংবা স্ত্রীলোকটি তার পুরুষাঙ্গের দিকে কাম-প্রবৃত্তির সাথে তাকায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত সহবাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। এজন্যই এ দুটির কারণে রোজা বা ইহরাম নষ্ট হয় না এবং গোসলও ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এ দুটিকে সহবাসের হুকুমে মিলানো যাবে না। আমাদের দলিল হলো, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত সহবাসের প্রতি আকৃষ্ট করে। সুতরাং সতর্কতার সাথে একে সহবাসের স্থলবর্তী ধরা হবে। কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শের লক্ষণ এই যে, পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় কিংবা উত্থান বৃদ্ধি পায়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আর ধর্তব্য হলো, স্ত্রীলোকের লজ্জা স্থানের অভ্যন্তরে তাকানো আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন সে হেলান দিয়ে থাকবে। যদি স্পর্শ করার কারণে বীর্যস্খলন হয়ে যায় তাহলে কারো কারো মতে তা দ্বারা মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, তা মাহরামিয়াত সাব্যস্ত করবে না। কেননা, বীর্যস্খলন দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ স্পর্শ সহবাস পর্যন্ত নিয়ে যাবে না। এরূপই হুকুম কোনো নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করার ব্যাপারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ مَسَّتْهُ اِمْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ الخ : স্পর্শ শব্দটি আম বা ব্যাপক। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কিংবা ভুলক্রমে হোক। খুশিতে হোক বা অ-খুশিতে হোক। যদি কাম-প্রবৃত্তির সাথে হয় তাহলে আমাদের মতে, বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, হালাল স্পর্শের মতবিরোধ বর্ণনা করা হচ্ছে; হারাম স্পর্শের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, যখন ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে হারাম সহবাস হারাম হওয়ার কারণ নয় তাহলে তো হারাম স্পর্শ অবশ্যই হারাম হওয়ার কারণ হবে না। তার মতবিরোধ হলো হালাল স্পর্শের ক্ষেত্রে। এখন উপরিউক্ত

মতবিরোধের ফলাফল এই দাঁড়াল; যেমন– যায়েদ হিন্দাকে বিবাহ করার পর সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এখন যায়েদের জন্য হিন্দার মা হালাল। আর যদি তালাকের পূর্বে যায়েদ ও হিন্দা একে অপরকে কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে কিংবা প্রত্যেকে একে অপরের পুরুষাঙ্গের দিকে কামভাবের সাথে তাকায় এবং সহবাস না করে থাকে, তাহলে আমাদের মতে বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সাব্যস্ত হবে না। একই মতবিরোধ রয়েছে ঐ সুরতেও, যদি পুরুষ নারীকে কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে কিংবা পুরুষ কাম-প্রবৃত্তির সাথে নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকায়, কিংবা নারী কাম-প্রবৃত্তির সাথে পুরুষের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকায়। [আমাদের মতে হুরমতে মুসাহারাত সাবিত হবে; ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে সাবিত হবে না]।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত সহবাসের হুকুমভুক্ত নয়। কেননা, যে হুকুম হলো আহকাম সহবাসের সাথে সম্পৃক্ত তা ঐ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন– রোজার অবস্থায় সহবাস রোজা বিনষ্টকারী এবং ইহ্রাম বিনষ্টকারী। আর সহবাস দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না, ইহরাম বিনষ্ট হয় না এবং গোসলও ওয়াজিব হয় না। তাই স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতকে সহবাসের সাথে যুক্ত করা যাবে না। কারণ مُلْحَقْ -এর জন্য জরুরি مُلْحَقْ بِهِ -এর অনুরূপ হওয়া। [অর্থাৎ, যাকে যুক্ত করা হয় আর যার সাথে যুক্ত করা হয় উভয়টি একই মর্মের হয়]।

আমাদের দলিল হলো, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত এমন সবব যা সহবাসের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই আমরা সতর্কতাবশত এতে সহবাসের স্থলবর্তী নির্ধারণ করে তার উপর সহবাসের হুকুম আরোপ করে দিয়েছি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব হলো, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত দ্বারা যদি রোজা ভঙ্গ হওয়া ইত্যাদির হুকুম সাব্যস্ত করা হয় তবে তো স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত প্রকৃত সহবাস হয়ে যায়। অথচ আমরা তাকে প্রকৃত সহবাস বলি না। আমাদের মাযহাবের সমর্থনে হযরত উম্মে হানী কর্তৃক হাদীসও রয়েছে– عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَبِنْتُهَا

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ اَوْ قَبَّلَهَا اَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ اَوْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلٰى اَبِيْهِ وَابْنِهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَابْنَتُهَا . (عَيْنِىْ شَرْحُ هِدَايَةْ)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) কাম-প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা বা পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, কাম-প্রবৃত্তির লক্ষণ হলো পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়া। যখন নাকি স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের পূর্বে উত্থিত ছিল না। আর যদি পূর্ব থেকে উত্থিত থাকে তবে উত্থান আরো বৃদ্ধি পায়। ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এটাই হলো বিশুদ্ধ মত।

কোনো কোনো মাশায়িখ কাম-প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, পুরুষের মন নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়া এবং সহবাসের দিকে ধাবিত হওয়া। লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরে তাকানো ধর্তব্য; লজ্জাস্থানের বাইরের দিকে নয়। আর লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরের দিকে তাকানো তখন সাব্যস্ত হবে যখন নারী দেয়াল ইত্যাদির সাথে উলঙ্গ হয়ে হেলান দিয়ে উভয় হাঁটু খাড়া করে বসা থাকে। সুতরাং নারী যদি সোজা হয়ে বসা থাকে, কিংবা দাঁড়ানো থাকে, কিংবা হেলান দিয়ে পা বিছিয়ে বসা থাকে তখন তার দিকে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে না। অপর একটি সুরত হলো, যদি স্পর্শ করার পর বীর্যস্খলন ঘটে তবে তার দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে কিনা? এ পর্যায়ে কারো কারো অভিমত হলো, এ সুরতেও বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে। কারণ, বীর্যস্খলন সহবাসের মর্মকে আরো সুদৃঢ় করে, তাই হারাম হওয়ার ক্ষেত্রেও বৃদ্ধিই পাবে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এ সুরতে বৈবাহিক মাহরামিয়াত প্রমাণিত হবে না। কারণ, কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ সহবাসের দিকে ধাবমানকারী হওয়ার কারণে সহবাসের স্থলবর্তী ছিল। আর বীর্যস্খলন দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়ে গেল যে, এ স্পর্শ সহবাস পর্যন্ত নিয়ে যাবে না, তাই সহবাসেরও স্থলবর্তী হবে না। এরূপই হুকুম রয়েছে নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করার ব্যাপারে। অর্থাৎ, যদি নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে আর এতে বীর্যপাত ঘটে তবে হারাম হওয়ার কারণ হবে না। আর যদি বীর্যপাত না ঘটে তবে হারাম হওয়ার কারণ হবে।

وَإِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) إِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلْثٍ يَجُوْزُ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْكُلِّيَّةِ اَعْمَالًا لِلْقَاطِعِ وَلِهٰذَا لَوْ وَطِيَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ وَلَنَا اَنَّ نِكَاحَ الْأُوْلٰى قَائِمٌ لِبَقَاءِ اَحْكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْفِرَاشِ وَالْقَاطِعُ تَأَخَّرَ عَمَلُهُ وَلِهٰذَا بَقِيَ الْقَيْدُ وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلٰى اِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَعَلٰى عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدُوْدِ يَجِبُ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِيْ حَقِّ الْحِلِّ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَاءُ وَلَمْ يَرْتَفِعْ فِيْ حَقِّ مَا ذَكَرْنَا فَيَصِيْرُ جَامِعًا .

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক কিংবা রেজয়ী তালাক দেয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ঐ স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি বায়েন তালাকের কিংবা তিন তালাকের ইদ্দত হয় তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, বিবাহ-সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে, ছিন্নকারী তালাক কার্যকরি করার প্রেক্ষিতে। এ কারণেই হারাম হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ বায়েন তালাক দেওয়া স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর জেনার হদ ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হলো, প্রথমা স্ত্রীর বিবাহ এখনও বিদ্যমান, তার হুকুম-আহকাম; যেমন– খোরপোশের অধিকার, গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া এবং সন্তানের পিতৃত্ব প্রমাণিত হওয়া বিদ্যমান থাকার কারণে। [ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্যের জবাব হলো] কর্তনকারীর কার্যকারিতা বিলম্বিত হয়েছে। এ কারণেই কিছু বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে। আর মূল [মাবসূত] কিতাবের তালাক অধ্যায়ে 'হদ' ওয়াজিব না হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আর এ কিতাবের ইবারত মতে 'হদ' ওয়াজিব হবে। কেননা, হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং জেনা সাব্যস্ত হবে। আর উপরোল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়নি। সুতরাং সে দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রকারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ الخ : মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন কিংবা তালাকে রিজয়ী দিল। এখন ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে তার বোনকে বিবাহ করতে পারবে কিনা ? এ ব্যাপারে হানাফীগণের মাযহাব হলো, বিবাহ জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ঐ নারী বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকারিণী হয় তবে তার বোনকে বিবাহ করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের সারাংশ হলো, বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী। অর্থাৎ, তালাকের কারণে বিবাহ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ, যখন বিচ্ছিন্নকারী পাওয়া গেল তখন তার প্রভাবও অবশ্যই পাওয়া যাবে। বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দলিল এটাও যে, এ ব্যক্তি হারাম মনে করে যদি মু'তাদ্দার সাথে সঙ্গম করে তাহলে হদ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হলো, মু'তাদ্দার বিবাহ অবশিষ্ট আছে। কারণ, বিবাহের অনেক আহকাম এখনো বাকি আছে। যেমন– ইদ্দত পালনকালে স্বামীর উপর ঐরূপই খোরপোশ ওয়াজিব যেরূপ বিবাহিতা অবস্থায় ছিল। স্বামীর এখতিয়ার রয়েছে, তার উপর ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। এমনিভাবে যদি দুই বছরের ভিতরে বাচ্চা পয়দা হয়ে যায় তাহলে বিছানা (فِرَاش) হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তির সাথে নসবও প্রমাণিত হবে। তবে বাকি রইল এ কথা যে, বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী পাওয়া গেছে। এর জবাব হলো, বিচ্ছিন্নকারী (قَاطِع)-এর কার্যকারিতা ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে– বিবাহের হুকুম বাকি থাকার কারণে। আর সহবাস করার দ্বারা হদ ওয়াজিব হয়, এ কথার জবাব হলো, প্রথমত আমরা মানিই না যে, এর দ্বারা হদ ওয়াজিব হয়। যার ইঙ্গিত মাবসূতের তালাক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। আর যদি মেনেও নেই যে, হদ ওয়াজিব হবে [যেমন মাবসূতের হুদূদ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে]। তবে এর জবাবে আমরা বলব যে, সহবাস হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহের মালিকানা দূর হয়ে গেছে। তাই এ সহবাস জেনারূপে গণ্য হবে। আর উপরিউক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মালিকানা দূরীভূত হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল, কিছু বিবাহ বাকি আছে আর কিছু বাকি নেই। আর যখন مِنْ وَجْهٍ বিবাহ বাকি তাই এ ব্যক্তি ঐ মু'তাদ্দার বোনকে বিবাহ করে দুই বোনকে বিবাহে একত্রকারী হবে। আর বিবাহের মধ্যে দুইবোনকে একত্র করা জায়েজ নেই– যদিও তাৎক্ষণিক বিবাহ হয়েছে।

وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلٰى اَمَتَهٗ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا لِاَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ اِلَّا مُثْمِرًا بِثَمَرَاتٍ مُشْتَرِكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحِيْنَ وَالْمَمْلُوْكِيَّةُ تُنَافِي الْمَالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوْعُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اَيِ الْعَفَائِفُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অনুবাদ : মনিব তার দাসীকে এবং নারী তার দাসকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, শরিয়তে বিবাহকে অনুমোদনই করা হয়েছে এমন কিছু ফলাফল লাভের জন্য যার মধ্যে বিবাহে আবদ্ধ পক্ষদ্বয় শরিক থাকে। অথচ মালিকানাধীন হওয়া মালিক হওয়ার পরিপন্থি। কাজেই বিবাহের ফলাফলের মধ্যে শরিকানারূপে সাব্যস্ত হওয়া নিষিদ্ধ হবে। কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সতী নারী [তাদেরকে বিবাহ করা জায়েজ; কিতাবী নারীদের মধ্যে স্বাধীন ও দাসীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা শীঘ্রই তার বর্ণনা দেব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلٰى اَمَتَهٗ الخ : মনিব তার দাসীকে বিবাহ করবে না– সম্পূর্ণ দাসীর মালিক হোক বা আংশিক মালিক হোক। এমনিভাবে নারী তার দাসকে বিবাহ করবে না। নারী সম্পূর্ণ দাসের মালিক হোক বা আংশিকের মালিক হোক। উভয় সুরতে বিবাহ নিষিদ্ধ। যদি মালিক ও মালিকানা থাকা অবস্থায় বিবাহ করে তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আইম্মায়ে আরবা'আ এ অভিমত পেশ করেন। দলিল হলো, বিবাহ এমন কিছু ফলাফল লাভের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক থাকবে। কিছু ফলাফল নারীর জন্য অর্জন হয়। যেমন– নারীর দেনমোহর, কাপড়-চোপড়, ব্যয়ভার ইত্যাদি ওয়াজিব হবে। আর পুরুষের উপর হুকুম হিসেবে সহবাসও ওয়াজিব হবে। নারীর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে পুরুষের জন্য আযল করা জায়েজ নেই। পুরুষ যদি مَقْطُوْعُ الذَّكَرِ কিংবা সঙ্গমে অপরাগ ও খুনছা হয় তবে নারীর জন্য বিবাহ বিলুপ্ত করারও অধিকার রয়েছে। আর কিছু ফলাফল পুরুষের অর্জন হয়। যেমন– বিবাহের পর পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব লাভ করা, নারী পুরুষের ঘরে অবস্থান করা, গৃহাভ্যন্তরীণ কাজ করা। যথা– খানা পাকানো, কাপড়-চোপড় ধৌত করা, বাচ্চাদের লালন-পালন করা, বাচ্চাদের দুধ পান করানো ইত্যাদি। মোদ্দাকথা হলো, উপরিউক্ত বিবাহের উভয় সুরতে মালিকানা ও মালিকানাধীন একত্র হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ একটি অপরটির পরিপন্থি। কারণ, মালিকানার দাবি হলো প্রভাব সৃষ্টি করা, আর মালিকানাধীন -এর দাবি হলো প্রভাবান্বিত হওয়া। সুতরাং উভয়টির পরিপন্থি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং যখন বিষয়টি এমন তখন শরিকানার উপর ফলাফল অর্জন অসম্ভব হবে।

প্রশ্ন : তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি মালিকানাধীন মালিকানার পরিপন্থি হয় তবে তো মালিকানাধীন -এর বিবাহ একেবারেই জায়েজ না হওয়া উচিত ছিল। কারণ, মালিকানাধীন ব্যক্তি যখন কোনো স্বাধীন নারীকে বিবাহ করবে তখন তো বিবাহকারী হওয়ার কারণে তার মালিকানাও সাব্যস্ত হবে, তাহলে এ সুরতেও তো মালিকানা ও মালিকানাধীন ব্যক্তি একত্র হয়ে যাচ্ছে?

উত্তর : এর উত্তর হলো, কিয়াসের দাবি তো এটাই ছিল যে, মালিকানাধীন ব্যক্তির বিবাহ একেবারেই জায়েজ না হওয়া, কিন্তু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কিয়াস-বিরোধী জায়েজ বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْكِتٰبِيّٰتِ الخ : كِتَابِيَّاتٌ শব্দটি كِتَابِيَّةٌ -এর বহুবচন। পুংলিঙ্গ হলো কিতাবী। কিতাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নবীর উপর ঈমান রাখে আর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। চার ইমামের মধ্যে স্বাধীন কিতাবিয়ার বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে দাসী কিতাবিয়ার বিবাহের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। এর বর্ণনা সামনে করা হবে। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে কিতাবীদের ঐ সকল নারী যারা সতী।' উক্ত আয়াতের মধ্যে সতী হওয়ার قَيْدٌ স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে; বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে নয়।

وَلَا يَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِيْ نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ قَالَ وَلَا الْوَثَنِيَّاتُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَاتِ إِنْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِدِيْنٍ وَيُقِرُّوْنَ بِكِتَابٍ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَالْخِلَافُ الْمَنْقُوْلُ فِيْهِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اِشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلٰى مَا وَقَعَ عِنْدَهٗ وَعَلٰى هٰذَا حَالُ ذَبِيْحَتِهِمْ ـ

অনুবাদ : মাজূসী নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِيْ نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ 'তাদের প্রতি কিতাবীদের অনুরূপ আচরণ কর, তবে তাদের নারীদের বিবাহ করবে না ও তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করবে না।' ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর পৌত্তলিক নারীদের বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ আর মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। 'আর সাবেঈ নারীদের বিবাহ করা জায়েজ, যদি তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকে এবং কোনো আসমানি কিতাব স্বীকার করে থাকে। কেননা, তারা কিতাবী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর যদি তারা তারকাপূজারি হয় এবং কোনো আসমানি কিতাব ধারণ না করে, তাহলে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েজ নয়। কেননা, তারা মুশরিক। তাদের সম্পর্কে [ইমামগণের মধ্যে] যে মতপার্থক্য বর্ণিত, তার কারণ হলো তাদের ধর্মমত সম্পর্কে অস্পষ্টতা। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তাদের জবাইকৃত পশু সম্পর্কেও একই ধরনের বিবরণ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ الخ : অগ্নিপূজক নারীদের বিবাহ করা সকলের মতে নাজায়েজ। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিতাবীদের সাথে যে আচরণ কর তাদের সাথেও সে আচরণ কর। তবে তাদের নারীদের বিবাহ করো না এবং তাদের জবাইকৃত পশু খেয়ো না। মোটকথা, মাজূসী নারীদেরকে বিবাহ করো না এবং তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করো না। এগুলো ছাড়া নিরাপত্তা প্রদান বা কর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিতাবীদের অনুরূপ আচরণ কর। এ হাদীসটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং পৌত্তলিক নারীদের বিবাহ করাও জায়েজ নয়। দলিল কুরআনে কারীমের এ আয়াত– 'মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না।'

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَاتِ الخ : সাবিয়া নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) জায়েজ ও সাহেবাইন (র.) নাজায়েজ বলেন। কার্যত মতবিরোধটি হলো সাবেঈ -এর পরিচয় ও ব্যাখ্যার মধ্যে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সাবেঈ হলো সে লোক যে নবীগণের মধ্য থেকে কোনো নবীর উপর ঈমান রাখে এবং কোনো আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করে। সুতরাং এ হিসেবে সাবেঈ কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ, তাই সাবিয়াকেও বিবাহ করা জায়েজ হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, সাবেঈ তারকারাজি পূজা করে এবং কোনো আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করে না। সুতরাং এরা পৌত্তলিকদের অনুরূপ হবে। যেমনিভাবে পৌত্তলিক নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ নেই তেমনিভাবে সাবিয়া নারীদেরকেও বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ وَتَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ بِمَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْيِ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الْجُزْءِ عَلَى الرِّقِّ وَقَدِ انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ بِالْمُسْلِمَةِ وَلِهٰذَا جَعَلَ طَوْلَ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِنْهُ وَعِنْدَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ لِإِطْلَاقِ الْمُقْتَضِي وَفِيهِ اِمْتِنَاعٌ عَنْ تَحْصِيلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرْقَاقُهُ وَلَهُ أَنْ لَا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ لَا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইহরাম বাঁধা পুরুষ ও নারী ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ নয়। মুহরিম অভিভাবক কর্তৃক তার অভিভাবকত্বাধীন মেয়েকে বিবাহ দানের ব্যাপারে অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ 'মুহরিম বিবাহ করতে পারে না এবং বিবাহ দিতেও পারে না।' আমাদের দলিল হলো, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মায়মূনাকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণিত হাদীসে এ [নিকাহ শব্দটি] সহবাসের অর্থে প্রযুক্ত। দাসী মুসলিম হোক কিংবা কিতাবী হোক বিবাহ করা জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে স্বাধীন পুরুষের জন্য কিতাবী দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, তাঁর মতে দাসীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা হলো অনিবার্যতাপ্রসূত। কারণ, এতে আপন দেহ-অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা হয়। আর মুসলিম দাসীকে বিবাহ করার দ্বারাই প্রয়োজন বিদূরিত হতে পারে। এ কারণেই [কুরআনে] স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্যকে বিবাহের পথে বাধা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আমাদের মতে দাসীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা নিঃশর্ত। কেননা, বৈধতাদানকারী আয়াতটি নিঃশর্ত। তাছাড়া দাসী বিবাহ করার মধ্যে স্বাধীন দেহ-অংশ লাভ করা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে; দেহ-অংশ, দাস বানানো হচ্ছে না। আর তার তো মূল [দেহ অংশটুকুই] লাভ না করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং দেহ-অংশের গুণবিশেষ লাভ না করারও অধিকার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ الخ : ইহরাম বাঁধা নারী হোক বা পুরুষ হোক– ইহরামের অবস্থায় আমাদের মতে বিবাহ করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ নেই। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) ও এ মত পোষণ করেন। এমনিভাবে মুহরিম যদি কারো অভিভাবক হয়ে তাকে বিবাহ করায় তাহলে আমাদের মতে জায়েজ হবে, কিন্তু ইমাম

শাফেয়ী (র.) -এর মতে জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ – এই হাদীসের মধ্যে প্রথম يَنْكِحُ শব্দটি ضَرَبَ يَفْتَحِ الْبَاءِ বাবে থেকে। আর দ্বিতীয় يُنْكِحُ শব্দটি اِفْعَالٌ بِضَمِّ الْيَاءِ বাবে থেকে। প্রথমটির অর্থ হলো– বিবাহ করা, আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো– বিবাহ করানো। যেমন– طَعْمٌ অর্থ– আহার করা, আর اِطْعَامٌ অর্থ– আহার করানো। এখন হাদীসের অর্থ এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি না নিজের বিবাহ করবে, না ওলী হয়ে অন্যকে বিবাহ করাবে। মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় وَلَا يَخْطُبُ শব্দটিও রয়েছে। অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় বিবাহের পয়গামও দিবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর সহীহের মধ্যে রেওয়ায়েত করেছেন– وَلَا يَخْطُبُ بِمَكَّةَ অর্থাৎ, 'মক্কায় পয়গাম পাঠাবে না।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং বিবাহ করানো উভয়টি নিষিদ্ধ।

আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মায়মূন (রা.)-কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) আরো বৃদ্ধি করেছেন যে– وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ – নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূন (রা.)-কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন এবং তার সাথে বাসর রাত করেছেন হালাল অবস্থায়। আর সারিফ নামক স্থানে হযরত মায়মূনার ইন্তেকাল হয়েছিল।' কেউ কেউ কৌতুক করে বলেছেন যে, হযরত মায়মূনার বিবাহও সারিফ নামক স্থানে হয়েছে, ফুলশয্যাও সারিফে হয়েছে এবং তাঁর ইন্তেকালও সারিফে হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মায়মূন (রা.)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, উক্ত হাদীসের মধ্যে বিবাহের আভিধানিক অর্থ [সহবাস] উদ্দেশ্য। এখন হাদীসের মর্ম এই হবে যে, ইহ্রাম অবস্থায় সঙ্গম করা নিষেধ; আকদে নিকাহ নিষিদ্ধ নয়। এ সুরতে হাদীসের অর্থ হবে– মুহরিম সঙ্গম করবে না এবং মুহরিমাকেও সঙ্গম করতে দেবে না।' দ্বিতীয় জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে نَهْىٌ দ্বারা نَهْىٌ تَنْزِيْهِىٌّ উদ্দেশ্য نَهْىٌ تَحْرِيْمِىٌّ নয়। অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় বিবাহ করা ও বিবাহ করানো সমীচীন নয়। তবে যদি বিবাহ করে ফেলে তাহলে সংঘটিত হয়ে যাবে। আমাদের মাযহাবের সমর্থন কিয়াস দ্বারাও পাওয়া যায়। কারণ, বিবাহ-শাদি ও অন্যান্য চুক্তি এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি অনুরূপ। যেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ইজাব ও কবুল হয় তেমনিভাবে বিবাহের মধ্যেও ইজাব ও কবুল হয়। সুতরাং যেমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় অন্যান্য চুক্তি জায়েজ তেমনিভাবে বিবাহও জায়েজ হবে। ইনসাফের কথা হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব শক্তিশালী। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পেশকৃত হাদীস হলো قَوْلِىٌّ আর হানাফীগণের পেশকৃত হাদীস হলো فِعْلِىٌّ। দুই হাদীসের দ্বন্দ্বের সময় قَوْلِىٌّ হাদীস فِعْلِىٌّ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করার বিষয়টি বিরোধপূর্ণ। তাইতো হযরত মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা.) নিজেই বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেছেন [তখন] আমরা উভয়ে হালাল ছিলাম। মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ শরীফে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْاَمَةِ الخ : দাসীর সাথে বিবাহ জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মতে নিঃশর্তভাবে দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ– দাসী মুসলমান হোক বা কিতাবী হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব হলো, কিতাবী দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। ইমাম মালেক (র.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, দাসীদের বিবাহ করার বৈধতা জরুরতের ভিত্তিতে প্রমাণিত। কারণ দাসীর সাথে বিবাহের অর্থ হলো, নিজের দেহ-অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা। এজন্য অন্যের দাসী থেকে যে সন্তানাদি হয় শরিয়তের দৃষ্টিতে সেও অন্যের মালিকানাধীন হবে। আর দাসত্বের সম্মুখীন করা মূলত ধ্বংস করা।

তাহলে যেন দাসীকে বিবাহ করে তার অংশকে ধ্বংস করতে চায়। আর নিজের অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা অর্থাৎ ধ্বংস করা নিষেধ। তাই দাসীর সাথে বিবাহ নাজায়েজ হওয়া উচিত। তবে অধিক প্রয়োজন সাপেক্ষে অনিবার্যবশত বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, দাসীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা অনিবার্যবশত প্রমাণিত, আর নীতিমালা রয়েছে, যে বস্তু জরুরতের ভিত্তিতে সাবিত হয় তা জরুরত পরিমাণই সাবিত থাকে। [আর এখানে] একজন মুসলমান দাসীকে বিবাহ করার দ্বারা প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়, তাই কিতাবীকে বিবাহ করার আর কোনো প্রয়োজন বাকি থাকে না। এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বাধীন নারীর বিবাহ করার সামর্থ্যকে দাসীদেরকে বিবাহ করার প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করেছেন। আর আয়াতে কারীমা–

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তখন সে মু'মিন দাসীর যে-কোনো একজনকে বিবাহ করে নেবে।' এ আয়াতের مَفْهُوْم مُخَالِفْ এই দাঁড়ায় যে, যদি স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার শক্তি থাকে তবে মুসলমান দাসীকেও বিবাহ করা জায়েজ নেই। এর জবাব হলো, আয়াতের মধ্যে উত্তমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্বাধীন নারীর বিবাহের সামর্থ্য থাকাকালে দাসীকে বিবাহ করা উত্তম নয়। তবে যদি বিবাহ করা হয় তাহলে সংঘটিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ الخ : অর্থাৎ, দাসী বিবাহের বৈধতার স্বপক্ষে আমাদের দলিল হলো, দাসীদের সাথে বিবাহ করার বৈধতা নিঃশর্ত। কারণ, বৈধতা দানকারী আয়াতটি নিঃশর্ত। যেমন– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ অথবা أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ এ আয়াতগুলোর মধ্যে নিঃশর্তভাবে নারীর বিবাহের বৈধতাকে ব্যাপক রাখা হয়েছে, [নারী] স্বাধীন হোক বা দাসী হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ কথা যে, দাসীকে বিবাহ করা মানে তার আপন অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা, এর জবাব হলো, দাসীকে বিবাহ করার মধ্যে তার আপন অংশকে দাসত্বের শিকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বাধীন অংশ লাভ করা থেকে বিরত রাখা উদ্দেশ্য। আর শরিয়ত তাকে এর অনুমতি দিয়েছে যে, মূল অংশকেই লাভ করবে না। অর্থাৎ, নারীর অনুমতিসাপেক্ষে আযল করবে, যাতে মূল বাচ্চাই জন্মলাভ না করে। তাই দেহ-অংশের বিশেষ গুণ লাভ না করার অধিকার উত্তমভাবেই পারে।

وَلَا يَتَزَوَّجُ اَمَةً عَلٰى حُرَّةٍ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُنْكَحُ الْاَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَهُوَ بِاِطْلَاقِهٖ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِيْ تَجْوِيْزِ ذٰلِكَ لِلْعَبْدِ وَعَلٰى مَالِكٍ فِيْ تَجْوِيْزِهٖ بِرِضَاءِ الْحُرَّةِ وَلِاَنَّ لِلرِّقِّ اَثَرًا فِيْ تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلٰى مَا نُقَرِّرُهٗ فِي الطَّلَاقِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَيَثْبُتُ بِهٖ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِيْ حَالَةِ الْاِنْفِرَادِ دُوْنَ حَالَةِ الْاِنْضِمَامِ . وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ وَلِاَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الْحَالَاتِ اِذْ لَا مُنَصِّفَ فِيْ حَقِّهَا .

অনুবাদ : স্বাধীন স্ত্রীর উপস্থিতিতে দাসীকে বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تُنْكَحُ الْاَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ 'স্বাধীন স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাসী বিবাহ করা যাবে না।' ব্যাপকভিত্তিক হওয়ায় এ হাদীস দাসের জন্য তা জায়েজ রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিপক্ষে দলিল এবং স্বাধীন স্ত্রীর সম্মতিক্রমে জায়েজ রাখার ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) -এর বিপক্ষেও দলিল। তা ছাড়া এ কারণে যে, নিয়ামতকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব রয়েছে। ইনশাআল্লাহ তালাক অধ্যায়ে এটা আমরা প্রমাণ করব যে, দাসত্বের কারণে একা অবস্থায় তো পাত্রীর হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে, কিন্তু [স্বাধীন নারীর সঙ্গে] যুক্ত অবস্থায় সাব্যস্ত হবে না। তবে দাসী [স্ত্রী হিসেবে] বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা জায়েজ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ 'আর দাসী [স্ত্রীর] বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা যাবে।' তাছাড়া দলিল হলো, স্বাধীন নারী সর্বাবস্থায় হালাল। কেননা, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিয়ামতকে অর্ধেককারী নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَزَوَّجُ اَمَةً عَلٰى حُرَّةٍ الخ : প্রথম থেকেই যদি স্বাধীন নারী বিবাহে বিদ্যমান থাকে তবে দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না– হানাফীগণের এটাই মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বাধীন পুরুষের জন্য যদিও এটা জায়েজ নয়, কিন্তু গোলামের জন্য জায়েজ আছে, স্বাধীন নারী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করা। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি স্বাধীন নারী রাজি থাকে তাহলে তার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ। আর যদি রাজি না থাকে তবে দাসীকে স্বাধীন নারী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিবাহ করা জায়েজ হবে না। ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল হলো, দাসীর বিবাহ স্বাধীন নারীর উপর নিষিদ্ধ ছিল স্বাধীন নারীর হকের কারণে, কিন্তু যখন স্বাধীন নারী নিজেই রাজি হয়ে গেল তখন তো সে নিজেই নিজের হক বিলুপ্ত করে দিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো– نِكَاحُ الْاَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ -এর নিষিদ্ধতা তখনই ছিল যখন স্বামী স্বাধীন হয়। কেননা, এ সুরতে বিবাহ বারণকারী অর্থাৎ নিজের অংশকে দাসত্বের সম্মুখীন করা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু যখন স্বামী গোলাম হবে তখন আর এ নিষিদ্ধকারী বিদ্যমান থাকে না। কারণ, গোলাম তার সমস্ত অংশের সাথে গোলাম। তাই এ সুরতে نِكَاحُ الْاَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ জায়েজ হবে। –[আইনী শরহে হিদায়া]

হানাফীগণের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণী- 'স্বাধীন স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাসী বিবাহ না করা উচিত'. হাদীসটির মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে- স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক, রাজি হোক বা নারাজ হোক। তাই এ হাদীস তা ব্যাপকতার কারণে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক (র.) -এর বিপক্ষে দলিল হবে। দ্বিতীয়ত আকলী দলিল হলো যেমনিভাবে শাস্তি অর্ধেক হয় তেমনিভাবে নিয়ামতও অর্ধেক হয়। যেমন- জেনার অপরাধে স্বাধীন ব্যক্তি যতগুলো বেত্রাঘাত প্রাপ্য, গোলাম তার অর্ধেক প্রাপ্য। একই অবস্থা নিয়ামতেরও। সুতরাং এখানে দুটি অবস্থা রয়েছে- ১. একা অবস্থা, ২. যুক্ত অবস্থা। একা অবস্থার মর্ম হলো, শুধু দাসীকে বিবাহ করবে। আর যুক্ত অবস্থার মর্ম হলো, দাসী ও স্বাধীন উভয়কে একত্র করবে; আর স্বাধীন নারী উভয় অবস্থায় হালাল। অর্থাৎ, শুধু স্বাধীন বিবাহ করবে কিংবা দাসী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করবে- উভয় সুরত জায়েজ। তাই তার অর্ধেক করে দাসীকে শুধু একা অবস্থায় হালাল রাখা যাবে, যুক্ত অবস্থায় নয়। অর্থাৎ, শুধু দাসীকে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু স্বাধীন নারী থাকা অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করতে পারবে না। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, দাসীকে যুক্ত অবস্থায় জায়েজ করা হোক, একা অবস্থায় নয় তখন তো অর্ধেক হবে? এর জবাব হলো, এ সুরতে আভিজাত্যের অপদস্থতা আবশ্যক হয়, নিকৃষ্টের অপদস্থতা নয়। এজন্য এ সুরতকে গ্রহণ করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا الخ : এ মাসআলাটি প্রথম মাসআলার ঠিক উল্টো। অর্থাৎ প্রথম থেকে যদি দাসী বিবাহে বিদ্যমান থাকে তবে স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা জায়েজ। এতে কোনো অসুবিধা নেই। চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, দাসীর বিবাহও বাতিল হবে না। কিন্তু শাফেয়ীগণের মধ্য হতে ইমাম মুযানী (র.) বলেন, স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার সাথে সাথেই দাসীর বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে- আজাদ নারীর উপর শক্তি লাভ করার কারণে। কারণ দাসীর উপর বিবাহের বৈধতা ছিল স্বাধীন নারীর উপর সামর্থ্য না থাকার কারণে। সুতরাং এ মাসআলাটি পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার ন্যায় হবে।

আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণী "দাসী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা যাবে।" দ্বিতীয়ত আকলী দলিল হলো, স্বাধীন নারী সর্বাবস্থায় হালাল- একা অবস্থায়ও, যুক্ত অবস্থায়ও। কেননা, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এমন কোনো বস্তু নেই যা নিয়ামতকে অর্ধেক করে দেবে। দাসীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তার ক্ষেত্রে দাসত্ব অর্ধেককারী রয়েছে।

فَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ هٰذَا لَيْسَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرِّمُ وَلِهٰذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِهٰذَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ بَاقٍ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ اِحْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ لَا يُدْخِلَ غَيْرَهَا فِي قَسْمِهَا ـ

অনুবাদ : যদি স্বাধীন স্ত্রীর বায়েন তালাকের ইদ্দতের অবস্থায় কোনো দাসীকে বিবাহ করে তবে তা জায়েজ হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে তা জায়েজ রয়েছে। কেননা, [তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কারণে] এটা স্বাধীন স্ত্রীর বর্তমানে বিবাহ নয়। আর সেটাই হলো হারাম। এজন্যই তো কেউ যদি শপথ করে যে, এ স্ত্রীর বর্তমানে সে অন্যকোনো বিবাহ করবে না, [অতঃপর উক্ত স্ত্রীর বায়েন তালাকের ইদ্দতের সময় বিবাহ করে] তাহলে এই বিবাহের কারণে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, [খোরপোষ ও অন্যান্য] কিছু আহকাম বাকি থাকার কারণে স্বাধীন স্ত্রীর বিবাহ একদিক থেকে এখনও বহাল রয়েছে। সুতরাং সতর্কতাবশত অন্য দাসী বিবাহ করার নিষিদ্ধতা বহাল থাকবে। শপথের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেখানে উদ্দেশ্য হলো অন্যকে তার হিস্সায় অংশীদার না করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বাধীন স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দেওয়া হয়েছে। এখন এ স্বাধীন তালাকপ্রাপ্তা বায়েনার ইদ্দত পালনকালে দাসীকে বিবাহ করতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নাজায়েজ বলেন, আর সাহেবাইন (র.) জায়েজ বলেন। সাহেবাইনের দলিল হলো, স্বাধীন স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দেওয়ার কারণে বিবাহের মালিকানা দূর হয়ে গেছে। তাই এখন যদি দাসীকে বিবাহ করে তবে এ বিবাহ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ হবে না। আর হারাম ছিল এটাই। এজন্য আমরা এ বিবাহকে জায়েজ বলেছি।

দ্বিতীয় দলিলের সারাংশ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, আমি স্বাধীন স্ত্রীর বর্তমানে দাসীকে বিবাহ করব না। এরপর স্বাধীন স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দাসীকে বিবাহ করে, তবে কসম ভঙ্গকারী হবে না। এর দ্বারাও বুঝা গেল যে, এটি تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ নয়। অন্যথায় সে শপথ ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হতো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, স্বাধীন তালাকপ্রাপ্তা বায়েনার ইদ্দত পালনকালে একদিক থেকে তার বিবাহ এখনো বহাল রয়েছে। কারণ, বিবাহের কিছু কিছু আহকাম; যেমন– খোরপোশ ইত্যাদি এখনো বাকি। তাই সতর্কতাবশত দাসীর বিবাহ নিষেধ করা হয়েছে। সাহেবাইনের দলিলের জবাব হলো, শপথের মধ্যে প্রচলন (عُرْف) -এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর ওরফের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ বলা হয় না। আর শরিয়তের মধ্যে মর্মের (مَعْنٰى) গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর হুরমতের (حُرْمَتْ) মর্ম ইদ্দত বাকি থাকায় বাকি আছে। তাই ওরফ হিসেবে তো শপথ ভঙ্গকারী হবে না, তবে শরিয়তের হুরমতের মর্মের দিকে লক্ষ্য করে স্বাধীন তালাকপ্রাপ্তা বায়েনার ইদ্দত পালনকালে দাসীকে বিবাহ করা হারাম হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শপথের উদ্দেশ্য হলো, তোমার হিস্সায় অন্য নারীকে অংশীদার করবে না। সুতরাং যখন তাকে তালাকে বায়েন দেওয়া হলো তখন আর তার হিস্সা বাকি রইল না। তাই তালাকে বায়েনের ইদ্দতের মধ্যে যদি অন্য নারীকে বিবাহ করে ফেলে তখন তার হিস্সায় অংশীদার পাওয়া যায় না, তাই শপথভঙ্গকারীও হবে না।

لِلْحُرِّ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْاِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ وَالتَّنْصِيْصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَتَزَوَّجُ اِلَّا اَمَةً وَاحِدَةً لِاَنَّهُ ضَرُوْرِيٌّ عِنْدَهُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا اِذِ الْاَمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ يَنْتَظِمُهَا اِسْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِى الظِّهَارِ ـ

অনুবাদ : স্বাধীন ব্যক্তির একই সঙ্গে চারজন স্বাধীন নারী ও দাসীকে বিবাহ করার অধিকার রয়েছে। এর বেশি বিবাহ করার অধিকার নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ 'তোমরা যতজন নারী তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর- দুজন তিনজন এবং চারজন।' আর সংখ্যার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ তার অতিরিক্ত সংখ্যাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একটির বেশি দাসী বিবাহ করা যাবে না। কেননা, তাঁর মতে দাসী বিবাহ হলো জরুরি ভিত্তিক। তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হলো আমাদের পঠিত আয়াত। কেননা, আয়াতের মধ্যে اَلنِّسَاءُ শব্দটি বিবাহিতা দাসীকেও অর্ন্তভুক্ত করে। যেমন- যিহারের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতের মধ্যে অধিক বিবাহের ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ ছিল তা দলিল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন। হানাফীগণের মতে স্বাধীন পুরুষ একই সঙ্গে চারজন নারী বিবাহ করতে পারে। চারজন স্বাধীন হোক বা দাসী হোক, কিছু স্বাধীন হোক বা কিছু দাসী হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, এ অংশে মতবিরোধ রয়েছে যে, যদি দাসীকে বিবাহ করে তবে শুধু একজন দাসীকে বিবাহ করবে, না একাধিক দাসীকে বিবাহ করবে ? রাফিযীরা নয়জন আর খারিজীরা আঠারজন পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দেয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রথমে তাদের দলিল বর্ণনা করেছেন যারা চারজন বিবাহ করার অনুমতি দেয়। দলিল হিসেবে আয়াতে কারীমা পেশ করেছেন। এ আয়াত সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে নস (نَصٌّ) । আর সংখ্যার সুস্পষ্ট বর্ণনা অতিরিক্ত সংখ্যা নিষিদ্ধকারী। তাই চারের অধিক নারীকে বিবাহ করা একজন পুরুষের জন্য জায়েজ হবে না। তাদের মতে [হানাফীগণের] আয়াতের মধ্যে যে وَاوْ এসেছে, তা اَوْ -এর অর্থে এসেছে, যা এখতিয়ার (تَخْيِيْر) -এর জন্য আসে। এখন আয়াতের মর্ম এই হবে যে, ঐ সংখ্যার মধ্য থেকে যে সংখ্যাই মনে চায়- দুই, তিন বা চার সব জায়েজ। রাফিযীরা وَاوْ -কে جَمْع -এর অর্থে বলে। তাই তারা তিন সংখ্যাকে একত্র করে নয় পর্যন্ত জায়েজ বলে। খারিজীরা বলে- مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -এর মধ্যে তাকরারের অর্থ রয়েছে। সুতরাং مَثْنٰى অর্থ- দুই-দুই, ثُلٰثَ -এর অর্থ- তিন-তিন, এবং رُبَاعْ -এর অর্থ চার-চার। এসবগুলো একত্র করলে আঠার হয়। তাই তারা আঠারজন নারীকে বিবাহের অনুমতি দেয়। পরের মত দুটি অহেতুক। তাদের দিকে তাকানোও যাবে না। সত্য মাযহাবের সমর্থন ঐ হাদীস দ্বারাও হয় যা ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির [মর্ম] হলো, বনু সালামার গায়লানী যখন ইসলাম কবুল করেছে, তখন তার নিকট দশজন নারী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, এদের মধ্যে চারজন রাখ; বাকিদেরকে ছাটাই কর।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, দাসীর বিবাহ জরুরিভিত্তিক প্রমাণিত, তাই জরুরত অনুপাতেই বিবাহ জায়েজ হবে আর জরুরত এক দাসী দ্বারাই পুরা হয়ে যায়, তাই একাধিক দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না। যেমন- জরুরতের ভিত্তিতে মৃতকে [মুর্দার কে] হালাল করা হয়েছে। সুতরাং মুর্দার ততটুকুই হালাল হবে যার দ্বারা জীবিত থাকা যায়। উদর পূর্তি কিংবা স্বাদ-আস্বাদনকারী হিসেবে ভক্ষণ করা হারাম। কিন্তু আমরা যে আয়াত পেশ করেছি তা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিপক্ষে দলিল হবে। কেননা, আয়াতের মধ্যে نِسَاءْ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। আর نِسَاءْ শব্দটি যেমনিভাবে স্বাধীন নারীকে শামিল করে তেমনিভাবে বিবাহিতা দাসীকেও শামিল করে। যেমন- যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ এখানে نِسَاءْ দ্বারা স্বাধীন নারী ও দাসী উভয়ই উদ্দেশ্য। সুতরাং স্বাধীন স্ত্রীর সাথে যিহার করলে যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি বিবাহিতা দাসীর সাথে যিহার করে, তবুও যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

وَلَا يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوْزُ لِاَنَّهٗ فِيْ حَقِّ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهٗ حَتّٰى مَلَكَهٗ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلٰى وَلَنَا اَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ فَيَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اِثْنَتَيْنِ وَالْحُرُّ اَرْبَعًا اِظْهَارًا لِشَرْفِ الْحُرِّيَّةِ فَاِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَى الْاَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهٗ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَرْبَعَةً حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَهُوَ نَظِيْرُ نِكَاحِ الْاُخْتِ فِيْ عِدَّةِ الْاُخْتِ .

অনুবাদ : আর দাসের জন্য দুয়ের অধিক বিবাহ করা জায়েজ নয়। ইমাম মালেক (র.) বলেন, তা জায়েজ। কেননা, তাঁর মতে, বিবাহের ক্ষেত্রে দাস স্বাধীন ব্যক্তির সমতুল্য। এজন্যই সে মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারে। আমাদের দলিল হলো, দাসত্ব নিয়ামতকে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। সুতরাং স্বাধীন হওয়ার মর্যাদা প্রকাশের জন্য দাসকে দুটি এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে চারটি বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হবে। অতঃপর স্বাধীন ব্যক্তি যদি চার স্ত্রীর একজনকে বায়েন তালাক প্রদান করে, তাহলে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে চতুর্থ বিবাহ করা তার জন্য জায়েজ হবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এর নজির হলো বোনের ইদ্দতে বোনকে বিবাহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে গোলামের একাধিক বিবাহের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, দুজন নারীকে বিবাহ করা জায়েজ। দুয়ের অধিক বিবাহ করা জায়েজ নেই। ইমাম মালেক (র.) -এর মতে, স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় গোলামেরও চার বিবাহ করা জায়েজ। ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে দাস স্বাধীন ব্যক্তির অনুরূপ। কারণ, বিবাহের মালিকানা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর মনুষ্যত্বের মধ্যে দাসত্বের কোনো দখল নেই। মানুষ মানুষ সব বরাবর– স্বাধীন হোক বা দাস হোক। এ কারণে মনিবের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিবাহ করার অধিকার রয়েছে।

আমাদের দলিল হলো, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, দাসত্ব নিয়ামতকে অর্ধেকে নামিয়ে আনে। আর নারীদের হালাল হওয়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তাই এ নিয়ামতেও অর্ধেক হয়ে যাবে। সুতরাং যখন স্বাধীন ব্যক্তির জন্য একই সময়ে চারজন নারী বিবাহ করা হালাল, তখন তার অর্ধেক অর্থাৎ, দুজন নারী দাসের জন্য হালাল হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝে আসে যে, বাস্তবিকপক্ষেই শরিয়তের মধ্যে নিয়ামতগুলো বিভিন্ন রকমের। যেমন– নবুয়তের মর্যাদা সর্বোত্তম ছিল, তাই তাঁদের জন্য নয়জন স্ত্রীকে হালাল করা হয়েছে। আর স্বাধীন ব্যক্তির অবস্থা গোলামের অবস্থার চেয়ে উত্তম, তাই স্বাধীনের জন্য চার ও দাসের জন্য দুজনকে হালাল করা হয়েছে। তাহলে স্বাধীনতার মর্যাদা প্রকাশ পাবে। হানাফীগণের মাযহাবের সমর্থন হযরত ওমর (রা.) -এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো– قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ তাছাড়া হযরত আতা (র.) সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য নকল করেছেন যে, গোলাম দু'য়ের অধিক নারী রাখতে পারবে না। –[আইনী শরহে হিদায়া]

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতটি হলো নিঃশর্ত (مُطْلَقٌ) যা স্বাধীন ও গোলাম সকলকে শামিল করে? এর জবাবে আমরা বলব, ইজমা তথা اِنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ দ্বারা আয়াতকে مُقَيَّدٌ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আয়াত শুধু স্বাধীন ব্যক্তিকে শামিল করবে; গোলামকে শামিল করবে না।

قَوْلُهٗ فَاِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَى الْاَرْبَعِ الخ : অতঃপর গ্রন্থকার এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, স্বাধীন ব্যক্তি যদি তার চার স্ত্রীর কোনো একজনকে তালাকে বায়েন দিয়ে দেয়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ তালাকপ্রাপ্তা বায়েনা তার ইদ্দত অতিবাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যক্তি চতুর্থ নারীকে বিবাহ করতে পারবে না এবং পঞ্চম নারীকেও বিবাহে একত্র করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চতুর্থ নারীকে বিবাহ করতে পারবে। কারণ, বায়েন তালাকের কারণে সে একেবারে স্ত্রীত্ব থেকে বের হয়ে গেছে। তাই পঞ্চম নারীকে একত্র করা হয় না। আর এ বিবাহটির নজির হলো বোনের ইদ্দতে অপর বোনকে বিবাহ করা। যার বিস্তারিত আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে।

قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَ حُبْلٰى مِنْ زِنَاءٍ جَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَأُهَا حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ اَلنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَاِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْاِجْمَاعِ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْاِمْتِنَاعَ فِى الْاَصْلِ لِحُرْمَةِ الْحَمْلِ وَهٰذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلِهٰذَا لَمْ يَجُزْ اِسْقَاطُهٗ وَلَهُمَا اَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّصِّ وَحُرْمَةُ الْوَطْىِ كَيْلَا يَسْقِىَ مَاءُهٗ زَرْعَ غَيْرِهٖ وَالْاِمْتِنَاعُ فِىْ ثَابِتِ النَّسَبِ لِحَقِّ صَاحِبِ الْمَاءِ وَلَا حُرْمَةَ لِلزَّانِىْ ـ

অনুবাদ : [জামেউস সাগীর প্রণেতা] বলেন, জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করলে তা জায়েজ হবে, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করবে না। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসব সম্পন্ন হয়, তাহলে সকলের মতেই বিবাহ বাতিল হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) -এর দলিল হলো, আসলে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো গর্ভের মর্যাদা রক্ষা করা। আর জেনা দ্বারা সৃষ্ট গর্ভও সম্মানিত। [কেননা], এর তো কোনো অপরাধ নেই। আর এ কারণেই গর্ভপাত করা জায়েজ নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারী ঐ সকল নারীর অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা নস [শরিয়তের বিধান] দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সহবাস হারাম হওয়ার কারণ হলো, যাতে তার পানি অন্যের ফসল সিঞ্চিত না করে। আর প্রমাণিত নসবের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো বীর্যের অধিকারী ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা, আর জেনাকারীর কোনো মর্যাদা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَ حُبْلٰى مِنْ زِنَاءٍ الخ : জেনা দ্বারা যদি কোনো নারী গর্ভবতী হয়ে যায় তবে তার বিবাহ জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তরফাইনের মতে, বিবাহ জায়েজ, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, বিবাহ-ই সহীহ হয়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে জায়েজ ও নাজায়েজ উভয় ধরনের মতামত পাওয়া যায়। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসব সম্পন্ন হয়; যেমন– গর্ভবতী নারী অন্যের ইদ্দত পালনকারিণী, তবে এ সুরতে সকলের মতে বিবাহ বাতিল হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে জেনা করে এবং ঐ নারী গর্ভবতী হয়ে যায়; পরে ঐ [জেনাকারী] তাকে বিবাহ করে, তাহলে সকলের মতে বিবাহও জায়েজ এবং সহবাসও হালাল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, গর্ভস্থ সন্তান যদি প্রমাণিত নসব সম্পন্ন হয়, তখন বিবাহ নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো গর্ভের মর্যাদা রক্ষা করা। আর জেনা দ্বারা সৃষ্ট গর্ভও সম্মানিত। কারণ, গর্ভের তো কোনো অপরাধ নেই, বরং অপরাধ হলো জেনাকারী ও জেনাকৃতার। এ কারণে গর্ভপাত করাও জায়েজ নয়। তবে আমাদের জমানায়

গর্ভপাত করা জায়েজ। [হিদায়ার টীকা] সুতরাং যখন আসল অর্থাৎ مَقِيْس عَلَيْهِ -এর মধ্যে বিবাহ নাজায়েজ হওয়ার যে ইল্লত আছে একই ইল্লত ফরজ তথা مَقِيْس -এর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব مَقِيْس -এর মধ্যেও مَقِيْس عَلَيْهِ -এর হুকুম দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, বিবাহ জায়েজ না হওয়ার عِلَّةٌ مُشْتَرِكَةٌ হলো গর্ভের মর্যাদা রক্ষা করা।

তরফাইনের দলিল হলো, জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারী ঐ সকল নারীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা নস তথা أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারীর উল্লেখ মুহাররামাতের মধ্যে করা নেই। আর যারা বিবাহ বৈধতার অন্তর্ভুক্ত তাদের সাথে বিবাহ করা জায়েজ। তাই জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারীর সাথেও বিবাহ জায়েজ হবে।

প্রশ্ন: কিন্তু যদি এখানে আপনার প্রশ্ন জাগে যে, গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসব সম্পন্ন -এর উল্লেখও তো মুহাররামাতের মধ্যে নেই, তবে এর কি কারণ রয়েছে যে, তাকে أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অধীনে আনা হয়নি এবং গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসব সম্পন্ন নারীর বিবাহকে জায়েজ করা হয়নি?

উত্তর: এর উত্তর হলো, গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসবসম্পন্ন নারী আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهٗ -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, বিবাহ করার ইচ্ছা করো না যতক্ষণ না নির্ধারিত ইদ্দত শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অর্থাৎ যখন কোনো নারী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ইদ্দতে থাকাকালীন কারো পক্ষে তাকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, গর্ভবতীর ইদ্দত হলো গর্ভপাত করা। তাই গর্ভপাতের পূর্বে বিবাহ করবে না। -[আইনী শরহে হিদায়া] কিন্তু প্রশ্ন হলো, জেনা দ্বারা গর্ভবতী নারী যখন বিবাহ বৈধ নারীদের অন্তর্ভুক্ত, তখন বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গমকে কেন হারাম করা হয়েছে? এর জবাব হলো, সঙ্গম এজন্য হারাম করা হয়েছে যাতে নিজের পানি দ্বারা অন্যের ফসল সিঞ্চিত করা আবশ্যক না হয়। কেননা, এটা হারাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَسْقِيْ مَاءَهٗ زَرْعَ غَيْرِهٖ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে সে যেন নিজের পানি দ্বারা অন্যের ফসল সিঞ্চিত না করে।' অর্থাৎ, গর্ভবতীদের সাথে সঙ্গম না করে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিলের জবাব হলো, আমরা এ কথা মানি না যে, বিবাহ ভঙ্গ হয় গর্ভের মর্যাদা রক্ষার কারণে; বরং তা বীর্যের অধিকারী ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যই। আর জেনাকারীর কোনো মর্যাদা নেই হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

فَإِنْ تَزَوَّجَ حَامِلاً مِنَ السَّبْيِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ وَإِنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْحَمْلُ .

অনুবাদ : আর যদি কেউ যুদ্ধবন্দিনী কোনো গর্ভবতীকে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ বাতিল। কেননা, এর নসব প্রমাণিত। যদি কেউ আপন উম্মে ওয়ালাদকে নিজের পক্ষ থেকে গর্ভবতী অবস্থায় বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ বাতিল। কেননা, সে তার মনিবের শয্যাসঙ্গিনী। এ কারণেই [মনিবের পক্ষ হতে] দাবি উত্থান ছাড়াই মনিবের সঙ্গে উক্ত দাসীর সন্তানের নসব [পিতৃ পরিচয়] সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি এ বিবাহকে শুদ্ধ বলা হয়, তাহলে দুটি শয্যাধিকার একত্রিকরণ হয়ে যাবে। আর যেহেতু উম্মে ওয়ালাদের গর্ভস্থ সন্তানের নসব সুদৃঢ় নয়, কেননা মনিব অস্বীকার করলে লি'আন ছাড়াই সন্তানের পিতৃ পরিচয় নাকচ হয়ে যায়। সুতরাং শয্যাধিকারের সঙ্গে গর্ভসঞ্চার যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা ধর্তব্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ حَامِلاً مِنَ السَّبْيِ الخ : যদি কেউ এমন নারীকে বিবাহ করে যাকে কাফের রাষ্ট্র থেকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আনা হয়েছে এবং সে গর্ভবতী, তবে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত। দলিল হলো, তার হারবী স্বামী দ্বারা তার গর্ভের নসব প্রমাণিত। আর নসব প্রমাণিত ব্যক্তির বিবাহ ফাসেদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ তারই দ্বারা গর্ভবতী। তারপর মনিব এ উম্মে ওয়ালাদকে অন্য কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দিয়েছে, তবে এ বিবাহ বাতিল। কেননা, এ উম্মে ওয়ালাদ তার মনিবের শয্যাসঙ্গিনী। তাই মনিব থেকে তার সন্তানের নসব নসবের দাবি ছাড়াই প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখন যদি উম্মে ওয়ালাদের বিবাহকে বিশুদ্ধ বলা হয়, তবে দুটি শয্যাধিকার একত্রিকরণ আবশ্যক হয়। কারণ, মনিবের শয্যাসঙ্গিনী হবে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে, আর স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবে বিবাহের কারণে। আর দুটি শয্যাসঙ্গিনীর একত্রিকরণ বাতিল। কারণ, এর দ্বারা নসব অস্পষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ الخ : এ ইবারতটুকু দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, যখন উম্মে ওয়ালাদ মনিবের শয্যাসঙ্গিনী তখন তো গর্ভবতী না হওয়ার সুরতেও বিবাহ বাতিল হওয়া উচিত ছিল। কেননা, এর দ্বারাও তো দুটি শয্যাধিকার একত্রিকরণ আবশ্যক হয়।

উত্তর: এর উত্তর হলো, উম্মে ওয়ালাদ মনিবের অবশ্যই শয্যাসঙ্গিনী। কিন্তু সুদৃঢ় নয়; বরং দুর্বল। এজন্য উম্মে ওয়ালাদের বাচ্চা অস্বীকার করলে তা লি'আন ছাড়াই নাকচ হয়ে যায়। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ শয্যাসঙ্গিনী হওয়া তখনই ধর্তব্য হবে যখন তার সাথে গর্ভ যুক্ত হবে। আর যদি গর্ভ যুক্ত না হয় তবে শয্যাসঙ্গিনী হওয়াও ধর্তব্য হবে না।

قَالَ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا لَيْسَ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِأَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَأَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَّهُ إِحْتَمَلَ الشُّغْلُ بِمَاءِ الْمَوْلَى فَوَجَبَ التَّنَزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ إِمَارَةُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْاِسْتِبْرَاءِ لَا اِسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشُّغْلِ وَكَذَا إِذَا رَأَى إِمْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِأَهَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِأَهَا وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ তার দাসীর সঙ্গে সহবাসের পর যদি তাকে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে। কেননা, দাসী তার মনিবের [পূর্ণ] শয্যাসঙ্গিনী নয়। এ কারণেই তো দাসী সন্তান প্রসবের মনিবের দাবি বা স্বীকৃতি ছাড়া সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয় না। তবে মনিবের জন্য উচিত, আপন বীর্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য দাসীর গর্ভবিমুক্তির বিষয়টির উপর নিশ্চিত হওয়া। বিবাহ যখন জায়েজ তখন স্বামী গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বেই তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাসীর গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে স্বামীর সহবাস করা আমি পছন্দ করি না। কেননা, মনিবের বীর্য গর্ভে স্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন। যেমন– ক্রয়কৃত দাসীর ক্ষেত্রে। শায়খাইনের দলিল হলো, বিবাহের বৈধতার সিদ্ধান্ত প্রদান গর্ভাশয় খালি থাকার আলামত। সুতরাং গর্ভবিমুক্তি থেকে নিশ্চিত হওয়ার আদেশ দেওয়া যাবে না– মোস্তাহাব হিসেবেও নয়, ওয়াজিব হিসেবেও নয়। ক্রয়কৃত দাসীর ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা, গর্ভবতী অবস্থায় ক্রয় জায়েজ রয়েছে। তদ্রূপ যদি অন্য কোনো নারীকে জেনা করতে দেখে অতঃপর তাকে বিবাহ করে তাহলে তার গর্ভবিমুক্তির বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা তার জন্য হালাল। এটা শায়খাইনের অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গর্ভবিমুক্তির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তার সঙ্গে সহবাস করা আমি পছন্দ করি না। এর দলিল আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا الخ : এক ব্যক্তি তার দাসীর সঙ্গে সহবাস করল, পরে অন্যের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিল, তাহলে গর্ভবিমুক্তির পূর্বে তার বিবাহ জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, এক ঋতুস্রাবের সাথে গর্ভবিমুক্তির পূর্বে তার বিবাহ জায়েজ নেই। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিন মাসিক অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার বিবাহ জায়েজ নেই।

বিবাহ জায়েজ হওয়ার দলিল বুঝার পূর্বে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মনিব তার দাসীর সাথে সঙ্গম করল এবং বাচ্চা জন্মলাভ করল, অতঃপর মনিব নসবের দাবি করে বসল তখন এ দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হবে। দ্বিতীয়বার বাচ্চা পয়দা হলে নসবের দাবি ছাড়াই নসব প্রমাণিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা হলো– শয্যাসঙ্গিনী বলা হয়, নারী তার বাচ্চার নসব প্রমাণ করার জন্য নসবের দাবির মুখাপেক্ষী না হওয়া। এখন বিবাহ জায়েজ হওয়ার দলিলের সারাংশ হলো, এ দাসী তার মনিবের শয্যাসঙ্গিনী নয়। কারণ, নসবের দাবি ছাড়া মনিব থেকে তার বাচ্চার নসব প্রমাণিত হলো। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, এ দাসী মনিবের শয্যাসঙ্গিনী নয় তখন তার বিবাহ সহীহ হবে। কারণ, নিষেধের কারণ ছিল শয্যাসঙ্গিনী হওয়া, আর তা পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, তবে বিবাহ থেকে গর্ভবিমুক্তি করা মনিবের উপর মোস্তাহাব, তাহলে খোদ মনিবের বীর্য রক্ষা পেয়ে যাবে। যখন বিবাহ সহীহ হয়ে গেল এখন স্বামীর জন্য গর্ভবিমুক্তির পূর্বে সহবাস করা জায়েজ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। শায়খাইনের মতে জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, মনিবের বীর্য দাসীর গর্ভে স্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তাকে পাক করা উচিত। যেমন– কোনো ব্যক্তি দাসী ক্রয় করল তখন ক্রেতার গর্ভবিমুক্তির পূর্বে সহবাস না করা উচিত; বরং গর্ভবিমুক্তি ওয়াজিব।

শায়খাইনের দলিলের সারাংশ হলো শরিয়তের বৈধতার হুকুম প্রদান করা গর্ভাশয় খালি থাকার লক্ষণ বহন করে। কারণ, বিবাহের অনুমোদন তখনই দেওয়া হয়েছে যখন গর্ভাশয়ও থাকবে। আর যখন গর্ভাশয় খালি তখন আর গর্ভবিমুক্তির নির্দেশ দেওয়া যাবে না– মোস্তাহাব হিসেবেও না, ওয়াজিব হিসেবেও না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর কিয়াসের জবাব হলো, গর্ভবতী অবস্থায়ও ক্রয় করা জায়েজ আছে, তাই দাসী ক্রয় করা গর্ভাশয় খালি হওয়ার আলামত হবে না। আর যেহেতু গর্ভাশয়ের সময় বিবাহ জায়েজ নেই, তাই বিবাহের বৈধতার হুকুম গর্ভাশয় খালি হওয়ার আলামত হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا رَأَى اِمْرَأَةً تَزْنِيْ الخ : মাসআলা : কোনো নারীকে সহবাস করতে দেখল, পরে তাকে বিবাহ করে ফেলে তবে শায়খাইনের মতে গর্ভবিমুক্তির পূর্বেই সঙ্গম করা জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গর্ভবিমুক্তি ছাড়া সঙ্গম করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। উভয় দলের দলিল তা-ই যা আমরা পূর্বোক্ত মাসআলায় উল্লেখ করেছি।

وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ اَنْ يَّقُوْلَ لِاِمْرَأَةٍ اَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) هُوَ جَائِزٌ لِاَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى اِلَى اَنْ يَّظْهَرَ نَاسِخُهُ قُلْنَا ثَبَتَ النَّسْخُ بِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) صَحَّ رُجُوْعُهُ اِلَى قَوْلِهِمْ فَتَقَرَّرَ الْاِجْمَاعُ ـ

অনুবাদ : মুতা বিবাহ বাতিল। মুতা বিবাহের অর্থ– পুরুষ কোনো স্ত্রীলোককে বলল, আমি এ পরিমাণ মালের বিনিময়ে এতদিনের জন্য তোমাকে ভোগ করব। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটা জায়েজ আছে। কেননা, মূলত এটা জায়েজ ছিল, সুতরাং রহিতকারী সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত বৈধতা অব্যাহত থাকবে। আমাদের দলিল হলো, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা -এর মাধ্যমে [মুতার বৈধতা] রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ কথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মতের অনুকূলে স্বীয় মত প্রত্যাহার করেছেন। সুতরাং ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ الخ : মুতা বলা হয়, কোনো নারীকে এ কথা বলা যে– اَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ অর্থাৎ, 'নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত আমি তোমাকে ভোগ করব।' সকল ইমাম মুতা হারাম হওয়ার প্রবক্তা। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে, ইমাম মালেক (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতা জায়েজ ছিল। সুতরাং তার বৈধতা ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রহিতকারী না পাওয়া যাবে। আর যেহেতু রহিতকারী এখনো আসেনি তাই মুতা বৈধ-ই থাকবে। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এর জবাবে বলেন যে, মুতা হারাম হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। সুতরাং এটাই রহিতকারী। কিন্তু এ জবাবের উপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুতা হারাম হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বলা ঠিক নয়। কেননা, ইজমা -এর জমানায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুতা জায়েজ হওয়ার অভিমত পেশ করেছিলেন? এর জবাব হলো, একবার হযরত আলী (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -কে বলেছিলেন, আপনার কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিনে মুতাকে হারাম করে দিয়েছেন? একথা শ্রবণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর পূর্বোক্ত অভিমত প্রত্যাহার করেছেন এবং মুতা জায়েজ হওয়ার পক্ষে নিজের মতামত হতে তওবা করেছেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-ও যখন স্বীয় মত পরিত্যাগ করলেন, তখন তো মুতা হারাম হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়ে গেল।

মুতা খায়বারের পূর্বে হালাল ছিল, কিন্তু খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশত ও নারীদের সাথে মুতাকে হারাম করে দিয়েছেন। তারপর মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের দিনে তিনদিনের জন্য মুতা হালাল করা হয়েছিল। পরে চতুর্থবার কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। এখানে এ কথাও জানা থাকা আবশ্যক যে, হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মালেক (র.) -এর মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভ্রমতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, মালেকীগণের কোনো কিতাবে মুতা বৈধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। স্বয়ং ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তার মধ্যে হযরত আলী (রা.) -এর হাদীস বর্ণনা করেছেন– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ـ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ مِنْ خَيْبَرَ অর্থাৎ, 'নবী করীম ﷺ খায়বার দিবসে মুতা বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করেছেন।' –[আইনী শরহে হিদায়া]

ইমাম মালেক (র.) -এর আদত বা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর মুয়াত্তায় সে হাদীসটিই আনয়ন করেন যা তাঁর মাযহাব। সুতরাং উক্ত হাদীসটিও মুয়াত্তায় স্থান পাওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ইমাম মালেক (র.)-ও মুতা হারাম হওয়ার প্রবক্তা।

اَلنِّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلٌ مِثْلُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ اَيَّامٍ وَقَالَ زُفَرُ (رح) هُوَ صَحِيْحٌ لَازِمٌ لِاَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ وَلَنَا اَنَّهُ اَتٰى بِمَعْنَى الْمُتْعَةِ وَالْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَعَانِىْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا اِذَا طَالَتْ مُدَّةُ التَّاقِيْتِ اَوْ قَصُرَتْ لِاَنَّ التَّاقِيْتَ هُوَ الْمُعَيِّنُ لِجِهَةِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ وُجِدَ .

অনুবাদ : সাময়িক বিবাহ বাতিল। যেমন– কেউ দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দশ দিনের জন্য বিবাহ করল। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে তা স্থায়ী হয়ে যাবে। কেননা, ফাসেদ শর্তের কারণে বিবাহ বাতিল হয় না। আমাদের দলিল হলো, 'বিবাহ' শব্দটি ব্যবহার করলেও এতে মূলত মুতার অর্থ রয়েছে। আর মু'আমালার ব্যাপারে [শব্দের পরিবর্তে] অর্থের দিকই বিবেচ্য। সময়সীমা দীর্ঘ হলো কি সংক্ষিপ্ত হলো, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, সময়সীমা সাব্যস্ত করাই মুতার দিকনির্দেশনা। আর তা এখানে পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلٌ الخ : সাময়িক বিবাহ হলো, কোনো ব্যক্তির দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। যথা– দশদিনের জন্য, এক বছরের জন্য ইত্যাদি। সাময়িক বিবাহ ও মুতা বিবাহের মধ্যে দুই দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। ১. সাময়িক বিবাহের ক্ষেত্রে تَزَوُّج শব্দটি উল্লেখ থাকে; মুতার মধ্যে উল্লেখ থাকে না। ২. সাময়িক বিবাহের মধ্যে দুজন সাক্ষী বিদ্যমান থাকে, কিন্তু মুতার মধ্যে থাকে না। সকল ফকীহ সাময়িক বিবাহের হারাম হওয়ার উপর একমত। একমাত্র ইমাম যুফার (র.) -এর মতে সাময়িক বিবাহ জায়েজ। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, সাময়িক বিবাহও বিবাহ। এর মধ্যে শুধু নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর যে, নীতিমালা রয়েছে, বিবাহ শর্তে ফাসিদ দ্বারা বাতিল হয় না। বরং শর্তে ফাসিদই বাতিল হয়ে যায়। যেমন– কোনো ব্যক্তি এ শর্তের উপর বিবাহ করল যে, একমাস পর তালাক দেব না। তবে তার এ শর্ত বাতিল হয়ে যাবে আর বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে এবং এক মাস পরও স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিলের জবাব দিতে গিয়ে আমরা বলি, এক্ষেত্রে নির্ধারিত ওয়াক্ত কোনো শর্ত নয়; বরং ইজাব ও কবুলটাই হয়েছে উক্ত সময়টুকুর জন্য। আর এ ধরনের ইজাব ও কবুল সহীহ নয়।

আমাদের দলিল হলো, সাময়িক বিবাহের মধ্যে নেকাহে মুতার মর্ম পাওয়া যায়। কারণ, সাময়িক বিবাহের উদ্দেশ্যও এটাই যে, কিছুদিন উপভোগ করব। আর মু'আমালার মধ্যে অর্থের দিকই বিবেচ্য হয়, শব্দের দিক নয়। যেমন– একজন আরেকজনকে বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পর আমার উকিল, এতে সে অছি হয়ে যাবে। আর যদি বলে, তুমি আমার জীবদ্দশায় আমার অছি, এতে সে উকিল হয়ে যাবে। হয়তো আপনি পড়ে থাকবেন যে, কাফালা বারাআতের শর্তে হাওয়ালার আসীল, আর হাওয়ালা আদমে বারাআতের শর্তে কাফালার আসীল।

সুতরাং যখন মু'আমালাতের মধ্যে মর্ম ধর্তব্য আর সাময়িক বিবাহের মধ্যে মুতার মর্ম পাওয়া গেছে। আর নীতি রয়েছে যে, যার উপর মুতা আরোপিত হবে তা বাতিল। সুতরাং সাময়িক বিবাহও বাতিল।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাময়িক বিবাহের মধ্যে যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয় তা দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক, উভয় সুরতে বাতিল হওয়ার হুকুম হবে। কারণ, সময় নির্ধারণ করাটাই মুতার মর্মকে নির্দিষ্টকারী, আর তা পাওয়া গেছে। মূলত এটি ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের মতামত থেকে দূরে (اِحْتِرَازٌ)। কেননা, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যদি এত দীর্ঘ সময়সীমা উল্লেখ করা হয়, যার মধ্যে উভয়ে জীবিত না থাকতে পারে, তবে ঐ সুরতেও বিবাহ জায়েজ হবে। কেননা, এতে স্থায়িত্বের মর্ম রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ ধরনের একটি মতামত পাওয়া যায়।

وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِيْ عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِحْدٰهُمَا لَا يَحِلُّ لَهٗ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِيْ حَلَّ نِكَاحُهَا وَبَطَلَ نِكَاحُ الْاُخْرٰى لِاَنَّ الْمُبْطِلَ فِيْ اِحْدٰهُمَا بِخِلَافِ مَا اِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي الْبَيْعِ لِاَنَّهٗ يَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ وَقَبُوْلُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرْطٌ فِيْهِ ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمّٰى لِلَّتِيْ حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا يُقَسَّمُ عَلٰى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْاَصْلِ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি একই আকদে দুজন নারীকে বিবাহ করল অথচ তন্মধ্যে একজনকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয়, সেক্ষেত্রে যাকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল ছিল তার বিবাহ শুদ্ধ হবে, আর অপরজনের বিবাহ বাতিল হবে। কেননা, বিবাহ বাতিলকারী বিষয়টি তাদের একজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। একই চুক্তিতে একজন স্বাধীন ও একজন দাসকে বিক্রি করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, ফাসেদ শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর এখানে গোলামকে ক্রয় করার ব্যাপারে স্বাধীন ব্যক্তি কবুল করার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। আর যার বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে, সে নির্ধারিত পূর্ণ মহরের অধিকারী হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে। সাহেবাইনের মতে, উভয়ের উক্ত মোহর বণ্টিত হবে "মহরে মিছিল" অনুপাতে এ মাসআলা মাবসূত কিতাব থেকে গৃহীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ الخ : এক ব্যক্তি একই আকদে দুজন নারীকে বিবাহ করল। এদের মধ্য থেকে একজনের বিবাহ তার জন্য হালাল আর অপরজনের বিবাহ তার জন্য হারাম– নসব, দুগ্ধ কিংবা অন্য কোনো কারণে। এখন হুকুম হলো, যে নারী হালাল ছিল তার বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, আর যে নারী হারাম ছিল তার বিবাহ বাতিল হবে। দলিল হলো, বাতিল হওয়া বাতিলকারী পরিমাণই হয়। আর বাতিলকারী শুধু একজনের মধ্যে; দুজনের মধ্যে নয়। তাই যার মধ্যে বিবাহ বাতিলকারী বিদ্যমান, তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, আর যার মধ্যে বিবাহ বাতিলকারী নেই তার বিবাহ সহীহ হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ বিক্রির একই চুক্তিতে স্বাধীন ও দাসকে একত্র করে তবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। [উভয় মাসআলার মধ্যকার] পার্থক্যের কারণ হলো, যখন স্বাধীন ও গোলাম উভয়কে বিক্রির একই আকদে একত্র করল তখন ক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিক্রয়কে কবুল করবে কিংবা উভয়কে ছেড়ে দেবে। আর এটা জায়েজ নেই যে, কিয়দংশ কবুল করবে আর কিয়দংশ ছেড়ে দেবে। কারণ এর দ্বারা চুক্তির বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক হয়, আর চুক্তির বিচ্ছিন্নতা হারাম। সুতরাং যখন উভয়ের মধ্যে কবুল করবে তখন গোলামের মধ্যে আকদ কবুল করার জন্য স্বাধীনের মধ্যে আকদ কবুল করার শর্ত করতে হবে। আর যেহেতু স্বাধীন বিক্রির স্থান নেই তাই এ মর্ম দাঁড়াবে যে, পণ্য নয় এমন আকদ কবুল করা বিক্রির জন্য শর্ত। আর এ শর্তটি ফাসেদ, যার দাবি আকদ করে না। আর এ কথা পূর্ব থেকে জানা যে, শর্তে ফাসিদের কারণে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রি ও শর্ত থেকে নিষেধ করেছেন। তাই এখানে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে– স্বাধীনের ক্ষেত্রেও, দাসের ক্ষেত্রেও। এর বিপরীত হলো বিবাহের বিষয়টি। এর মধ্যে একই সূরত যে, হালালকারিণীর ক্ষেত্রে আকদে নিকাহ কবুল করার জন্য হারামকারিণীর থেকে কবুল হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর এটা শর্তে ফাসিদ। কিন্তু বিবাহ ফাসেদ শর্তের কারণে বাতিল হয় না; বরং খোদ শর্তে ফাসিদই বাতিল হয়ে যায়। এজন্য مُحَلَّلَةٌ -এর বিবাহ সহীহ হবে, আর مُحَرَّمَةٌ -এর বিবাহ বাতিল হবে। এরপর [গ্রন্থকার] বলেন, সকল নির্ধারিত মহর সে নারীর জন্য হবে যার বিবাহ হালাল। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে, উভয়ের মোহর "মহরে মিছিল" অনুপাতে বণ্টিত হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, স্বামী নির্ধারিত মহরকে উভয়ের যৌনাঙ্গের মোকাবিলায় নির্ধারণ করেছে; একজনের জন্য নয়, তাই আমরাও উভয়ের মুখোমুখি [উভয়ের জন্য] রাখব; একজনের জন্যে নয়। ইমাম সাহেবের দলিলের সারাংশ হলো, বণ্টন বিশুদ্ধ মোকাবিলার আহকামের অন্তর্ভুক্ত। আর যে নারী বিবাহের স্থান নয়, তার ক্ষেত্রে মোকাবিলাই বাতিল। তাই উভয়ের দিকে মহরকে অহেতুক যুক্ত করা হবে। আর مُحَرَّمَةٌ -এর উল্লেখ ও অনুল্লেখ বরাবর।

এ মাসআলাটি এমন যেমন কেউ বলল, আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করলাম এই গাধা ও নারীকে, তাহলে এখানে এক হাজার যে মহর রয়েছে তা বণ্টিত হবে না। সুতরাং এমনিভাবে মতনের মাসআলায়ও বণ্টন করা হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মাসআলাটি মাবসূত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا وَسِعَهَا الْمَقَامُ مَعَهُ وَأَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَوَّلًا وَفِي قَوْلِهِ الْآخِرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَخْطَأَ الْحُجَّةَ إِذِ الشُّهُوْدُ كَذَبَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيْدٌ أَوْ كُفَّارٌ وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ الشُّهُوْدَ صَدَقَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ الْحُجَّةُ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوْفِ عَلٰى حَقِيْقَةِ الصِّدْقِ بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ لِأَنَّ الْوُقُوْفَ عَلَيْهِمَا مُتَيَسِّرٌ وَإِذَا ابْتَنَى الْقَضَاءُ عَلَى الْحُجَّةِ وَأَمْكَنَ تَنْفِيْذُهُ بَاطِنًا بِتَقْدِيْمِ النِّكَاحِ نُفِذَ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ لِأَنَّ فِي الْأَسْبَابِ تَزَاحُمًا فَلَا إِمْكَانَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : আর কোনো স্ত্রীলোক যদি দাবি করে যে, অমুক তাকে বিবাহ করেছে, আর এর উপর সে সাক্ষ্য পেশ করে আর কাজি তাকে তার স্ত্রী বলে রায় দেয়, কিন্তু বাস্তবে সে তাকে বিবাহ করেনি, তাহলে ঐ স্ত্রীলোক তার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে এবং তাকে সহবাসের সুযোগ দিতে পারবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এরও প্রথমে এ মত ছিল। আর তাঁর শেষ মত, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এরও মত– তা হলো, সে পুরুষের পক্ষে তার সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মত। কেননা, কাজি সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণে ভুল করেছেন। কারণ সাক্ষীরা [প্রকৃতপক্ষে] মিথ্যাবাদী। সুতরাং এটি এমন হয়ে গেল যেন কাজির রায়ের পর যখন প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীরা দাস বা কাফের ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, কাজির ধারণা মতে সাক্ষীগণ সত্য। আর তা-ই হলো প্রমাণ। কেননা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন। সাক্ষীদের দাসত্ব ও কুফরির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সহজ। আর সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যখন ফয়সালা হলো এবং বিবাহকে অগ্রবর্তী করা নিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে ফয়সালাটিকে কার্যকর করা সম্ভবপর তখন বিবাদ নিরসনের স্বার্থে ফয়সালা কার্যকর করা হবে। সূত্রহীন মালিকানার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেক্ষেত্রে একাধিক কারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এখানে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক নারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা দাবি করল যে, সে আমার স্বামী, সে আমাকে বিবাহ করেছে। নিজের মিথ্যা দাবির উপর মিথ্যা সাক্ষীও পেশ করেছে। কাজি জাহিরী সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে নারীর পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিয়েছে। তখন কাজির এ ফয়সালা কার্যকর হবে কিনা – এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, উক্ত ফয়সালা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে কার্যকর হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম মতও এটাই ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, বাহ্যিকভাবে তো কার্যকর হবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দ্বিতীয় মতও এটাই। আর এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এরও মত। উল্লেখ্য যে, ফকীহগণের মতে উক্ত মাসআলার শিরোনাম হলো–

قَضَاءُ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ فِي الْعُقُوْدِ وَالْفُسُوْخِ يَنْفُذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .

"মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কাজির ফয়সালা عُقُوْد ও فُسُوْخ -এর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে কার্যকর করা হয়।"

উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ বর্ণনার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

১. মালিকানা দু' প্রকার– সূত্রহীন মালিকানা ও সূত্রওয়ালা [আবদ্ধ] মালিকানা। সূত্রহীন মালিকানা হলো, যার মধ্যে মালিকানার কারণ উল্লেখ না থাকে। যেমন– আপনি বলেছেন, এ দাসীটি আমার। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, ক্রয় সূত্রে কিংবা উত্তরাধিকারী সূত্রে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া গেছে। আর আবদ্ধ মালিকানা হলো যার মধ্যে মালিকানার কারণ উল্লেখ থাকে। যেমন– আপনি বলেছেন, এ দাসীটি আমার। আমি তাকে অমুক ব্যক্তি থেকে ক্রয় করেছি কিংবা আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। মতনের মাসআলাটি হলো আবদ্ধ মালিকানার (اَمْلَاكٌ مُقَيَّدَةٌ)-এর ক্ষেত্রে। কারণ, তার মধ্যে সবব তথা 'বিবাহ' উল্লেখ রয়েছে।

২. কার্যকারিতা দু'প্রকার– বাহ্যিক কার্যকারিতা ও অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা। বাহ্যিক কার্যকারিতা হলো, দুনিয়াবি আহকাম চালু হয়। যেমন– স্ত্রীর অধিকার দেওয়া, স্বামীর উপর খোরপোশ ইত্যাদি ওয়াজিব হওয়া। আর অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা হলো, আল্লাহর নিকট বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়।

সূত্রহীন মালিকানার ক্ষেত্রে কাজি মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর ফয়সালা দিয়েছেন। তার এ ফয়সালা সকলের মতে বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে; অভ্যন্তরীণভাবে হবে না। আর যদি আবদ্ধ মালিকানার মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর ফয়সালা প্রদান করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে কার্যকর হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে; অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম মত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে, আর দ্বিতীয় মত ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সাথে। উক্ত ব্যাখ্যার পর এখন দলিল-প্রমাণ শুনুন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের সারসংক্ষেপ এই যে, যেহেতু সাক্ষী মিথ্যা, তাই কাজি সাক্ষ্য গ্রহণে ভুল করেছেন। আর ভুল সাক্ষ্য অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতাকে নিষেধ করে দেয়। তাই কাজির এ ফয়সালা বাহ্যিকভাবে তো কার্যকর হবে যার ফলাফলে স্বামীর উপর খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে না, যার কারণে স্বামীর জন্য ঐ নারীর সাথে সহবাস করা হালাল হবে না। এর নজির হলো, যদি সাক্ষ্যের পর উভয় সাক্ষীর গোলাম হওয়া কিংবা কাফের হওয়া প্রমাণিত হয়, তখন কাজি যদি ফয়সালা দিয়ে থাকেন তার ঐ ফয়সালা বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে; অভ্যন্তরীণভাবে হবে না। আর এর উপর সকলেই একমত। তাই সাক্ষীদের মিথ্যাবাদী হওয়ার সুরতেও কাজির ফয়সালা বাহ্যিকভাবে কার্যকর হওয়া উচিত; অভ্যন্তরীণভাবে নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, যেহেতু কাজির জন্য প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন, তবে ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাক্ষী কাজীর নিকট সত্যবাদী। আর সাক্ষীদের সত্যবাদী হওয়াটাই দলিল। যখন দলিল সাব্যস্ত হয়ে গেল তখন কাজির ফয়সালা করা জরুরি। এ কারণেই যদি এ ধরনের প্রেক্ষিতে মনে করে যে, আমার উপর ফয়সালা দেওয়া জরুরি নয় তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি জরুরি মনে করে, কিন্তু ফয়সালা করতে বিলম্ব করে, তবে ফাসিক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ الخ : ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর কিয়াসের জবাব হলো, কুফর ও দাসত্বের উভয় অবগত হওয়া সহজ। কেননা, কাফের ও গোলামকে তার বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়। সুতরাং যখন ফয়সালার ভিত্তি হলো সাক্ষ্যের উপর, আর যখন সাক্ষ্য পাওয়া গেল, তখন ফয়সালা কার্যকর করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কাজা বলা হয়– إِظْهَارُ مَا كَانَ ثَابِتًا -কে إِثْبَاتُ مَا لَمْ يَكُنْ -কে নয়। অর্থাৎ, কাজা বলা হয় প্রমাণিত জিনিস প্রকাশ করাকে। অপ্রমাণিত জিনিসকে প্রমাণিত করাকে নয়। উপরিউক্ত মাসআলায় বিবাহ সাবিত ছিল না, তাই অভ্যন্তরীণভাবে কিভাবে কার্যকর করা হবে? হিদায়া গ্রন্থকার (র.) بِتَقْدِيمِ النِّكَاحِ দ্বারা উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো, দাবি হিসেবে বিবাহকে ফয়সালার উপর অগ্রবর্তী করা হবে। যেন কাজি বলল, আমি প্রথমে তোমার বিবাহ এ পুরুষের সাথে দিলাম, তারপর তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহের ফয়সালা করলাম। কিন্তু এর উপর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কাজির এই ফয়সালা তাৎক্ষণিক পর্যায়ে আক্‌দে নিকাহ। তাই সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা শর্ত হওয়া উচিত। এর জবাব হলো, কারো কারো নিকটতো শর্ত, কিন্তু কারো কারো নিকট শর্ত নয়। কারণ, এ তাৎক্ষণিক আকদ দাবি হিসেবে প্রমাণিত। আর যে জিনিস দাবি হিসেবে প্রমাণিত তার মধ্যে শর্তের দিকে লক্ষ্য করা হয় না। আমাদের সমর্থনে হযরত আলী (রা.) -এর অভিমতও রয়েছে। তাঁর সামনে এ ধরনের ঘটনা উপস্থিত হয়েছিল, যা মতনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বিবাহের ফয়সালা দিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ নারী বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে আমাকে বিবাহ করেনি। হযরত আলী (রা.) বললেন, شَاهِدَاكَ زَوَّجَاكَ 'তোমার সাক্ষীদ্বয় তোমার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে।' نَفَذَ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ দ্বারা অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الخ দ্বারা বলা হচ্ছে যে, আবদ্ধ মালিকানাকে সূত্রহীন মালিকানার উপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ, সূত্রহীন মালিকানার মধ্যে শুধু বাহ্যিকভাবে ফয়সালা কার্যকর হবে; অভ্যন্তরীণভাবে নয়। দলিল হলো, সূত্রহীন মালিকানার মধ্যে মালিকানার সবব উল্লেখ থাকে না। আর এক মালিকানার অনেকগুলো সবব থাকে। যেমন– মালিকানার সবব ক্রয়ও হতে পারে উত্তরাধিকারও হতে পারে, হেবা ও সদকাও হতে পারে। আর সকল সববের মধ্যে বাধাবিপত্তি রয়েছে।

সুতরাং যদি কাজি এক সববকে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা দেয় তাহলে অগ্রাধিকার নেই অথচ অগ্রাধিকার দেওয়া (تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ) আবশ্যক হবে। এজন্য অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা সম্ভবই নয়।

بَابٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رح) فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَنْعَقِدُ مَوْقُوْفًا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا لِأَنَّ النِّكَاحَ يُرَادُ لِمَقَاصِدِهِ وَالتَّفْوِيْضُ إِلَيْهِنَّ مُخِلٌّ بِهَا إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا (رح) يَقُوْلُ يَرْتَفِعُ الْخَلَلُ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ وَ وَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِيْ خَالِصِ حَقِّهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيِّزَةً وَلِهٰذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَلَهَا اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ وَإِنَّمَا يُطَالِبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيْجِ كَيْلَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ ثُمَّ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُفْوِ وَغَيْرِ الْكُفْوِ لٰكِنَّ لِلْوَلِيِّ الْاِعْتِرَاضُ فِيْ غَيْرِ الْكُفْوِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْ غَيْرِ الْكُفْوِ لِأَنَّهُ كَمْ مِنْ وَاقِعٍ لَا يُرْفَعُ وَيُرْوٰى رُجُوْعُ مُحَمَّدٍ إِلٰى قَوْلِهِمَا .

পরিচ্ছেদ : ওলী ও কুফু প্রসঙ্গে

অনুবাদ : আজাদ, বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্কার বিবাহ তার সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয়। যদিও কোনো ওলী এ সংঘটন সম্পন্ন না করে– কুমারী হোক কিংবা অকুমারী হোক। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত– জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অন্য এক মতে, ওলী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, বিবাহটি স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নারীদের ভাষ্যে বিবাহ কোনো পর্যায়েই সংঘটিত হবে না। কেননা, বিবাহ হয়ে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর বিবাহের ভার তাদের উপর ন্যস্ত করলে সে উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা ওলী অনুমোদনের মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে। আর জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ তার নিজ অধিকারের মধ্যে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। আর সে এর যোগ্য। কেননা, সে বিবেকবান ও ভালোমন্দের পার্থক্য করার সামর্থ্য রাখে। এ কারণেই আর্থিক বিষয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা তার রয়েছে। আর স্বামী নির্বাচন করার অধিকার পাত্রীর রয়েছে। [অর্থাৎ, স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্মতি ও অসম্মতি প্রকাশের অধিকার তার রয়েছে]। আর ওলীর উপর বিবাহ সম্পাদনের দাবি এজন্যই করা হয়, যাতে পাত্রীর প্রতি নির্লজ্জতা আরোপিত না হয়। জাহিরে রেওয়ায়েত মতে, কুফুর মধ্যে ও কুফু বহির্ভূত বিবাহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে কুফু বহির্ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, কুফু বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিবাহ-ই সম্পন্ন হবে না। কেননা, অনেক ঘটনা এমন হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে বিবাহের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভবপর হয় না। বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : أَوْلِيَاءُ শব্দটি وَلِيٌّ -এর বহুবচন। وَلِيٌّ শব্দটি নির্গত হয়েছে وِلَايَتٌ থেকে। আর وِلَايَتٌ বলা হয় تَنْفِيْذُ الْأَمْرِ عَلَى الْغَيْرِ অর্থাৎ অন্যের উপর হুকুম কার্যকর করাকে। أَكْفَاءُ - كُفُو -এর বহুবচন। كُفُو বলা হয় নজির ও সমকক্ষকে।

قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الخ : মাসআলা : আজাদ, বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্কার বিবাহ তার সম্মতিক্রমে ওলী ব্যতিরেকে সংঘটিত হবে কিনা ? তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী শায়খাইনের মতে সংঘটিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে জাহিরে রেওয়ায়েত ভিন্ন অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলী ব্যতীত বিবাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে। যদি ওলী অনুমতি প্রদান করে তবে সংঘটিত হবে; অন্যথায় হবে না। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নারীদের ভাষ্য দ্বারা কোনোভাবেই বিবাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল এই যে, বিবাহের দ্বারা বিবাহের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হয়ে থাকে। সুতরাং বিবাহের ভার নারীদের উপর ন্যস্ত করলে সে উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কারণ, নারীরা কম জ্ঞানের অধিকারী। তাই নারীদেরকে বিবাহের ভার দেওয়া যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, কথা তো ঠিক, তবে ওলীর অনুমতি দ্বারা ঐ ব্যাঘাত বিদূরিত হয়ে যাবে। কারণ, ওলী সমীচীন মনে করলে অনুমতি প্রদান করবে, আর সমীচীন মনে না করলে অনুমতি দিবে না। জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ নিজের অধিকারের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যৌনাঙ্গের বিনিময় তারই জন্য হবে। আর এ স্ত্রীলোকটি অধিকারের যোগ্যও বটে। কেননা, সে বিবেকবান। ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে সামর্থ্যবান। এ কারণে অর্থের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার তার রয়েছে। হ্যাঁ, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, যখন স্ত্রীলোকটি ক্ষমতাসম্পন্ন, তখন বিবাহের দাবি ওলীর থেকে কেন করা হয়, নারীদের থেকে কেন করা হয় না ? এর জবাব হলো, এ ধরনের করার দ্বারা নারীদের প্রতি নির্লজ্জতা আরোপ করা হয়। কেননা, নারীরা পুরুষদের মজলিসের দিকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করবে। আর এর দ্বারা লোকেরা তাদেরকে লজ্জাহীন বলবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الخ : জাহিরে রেওয়ায়েত (র.) মতে, কুফূ ও কুফূ বহির্ভূত বিবাহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ যদি আজাদ, বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্কা নিজের বিবাহ নিজে করে ফেলে– কুফূ বা কুফূ বহির্ভূত -এর মধ্যে, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে কুফূ বহির্ভূত বিবাহের ক্ষেত্রে ওলীর আপত্তি করার অধিকার থাকবে– নিজের উপর থেকে দোষকে দূরীভূত করার জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে নাওয়াদিরের মধ্যে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কুফূ বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পন্নই হবে না। কেননা, অনেক ঘটনা এমন আছে যে, বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর তা দূরীভূত করার জন্য কোনো সামর্থ্যবানই থাকে না। প্রত্যেক ওলীও দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোনো বিচারক ন্যায়পরায়ণও না। সুতরাং সতর্কতা এরই মধ্যে রয়েছে যে, কুফূ বহির্ভূত ক্ষেত্রে ওলী ছাড়া বিবাহের দরজাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) শায়খাইনের মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যা জাহিরে রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতেও ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে এবং ওলীর অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে না।

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) لَهُ الْاِعْتِبَارُ بِالصَّغِيرَةِ وَهٰذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجْرِبَةِ وَلِهٰذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَلَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَالْوَلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَقَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوغِ بِدَلِيلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ فَصَارَ كَالْغُلَامِ وَكَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَائِهَا دَلَالَةً وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا ـ

অনুবাদ : সাবালক কুমারী নারীকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করার অধিকার ওলীর নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি একে নাবালিকার উপর কিয়াস করেন। এ কিয়াসের কারণ, কুমারী নারী অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বিবাহ বিষয়ে অজ্ঞ। এ কারণেই পিতা তার অনুমতি ছাড়াই তার মহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দলিল হলো, সে স্বাধীন নারী। সুতরাং তার উপর অন্য কারো বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকতে পারে না। আর নাবালিকার উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকার কারণ হলো, তার বুদ্ধির অপরিপক্বতা। আর সাবালকত্ব দ্বারা তার বিবেক পূর্ণ হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, শরিয়তের নির্দেশাবলি তার উপর প্রযোজ্য। এর হুকুম ছেলের মতো। [যে, সাবালক হয়ে গেলে তার উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকে না] আর আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থার অধিকারের ন্যায় হলো। আর পিতা মহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্মতি রয়েছে বিধায়। এজন্যই যদি সে নিষেধ করে তার পিতা তা গ্রহণ করতে পারেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الخ : মাসআলা : আমাদের মতে, সাবালক কুমারী নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে না। তাই যদি তার সন্তুষ্টি ছাড়া বিবাহ দেওয়া হয়, তবে তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ওলীর অনুমতি গ্রহণের সময় নিশ্চুপ থাকে তবে এটি তার পক্ষ থেকে অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, সাবালক কুমারী নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, তিনি সাবালক কুমারীকে নাবালিকার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, নাবালিকা যদি কুমারী হয় তবে যেমনিভাবে তাকে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধ্য করা জায়েজ, তেমনিভাবে সাবালক কুমারীকেও বাধ্য করা জায়েজ। উভয়ের মধ্যকার একক কারণ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে অজ্ঞ। কারণ, নারীরা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের সংস্রবে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাহের উপকার-অপকার থেকে অজ্ঞ থাকে। যেহেতু সাবালক কুমারী বিবাহ বিষয়ে অজ্ঞ এ কারণে তার পিতা তার অনুমতি ছাড়াই মহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের দলিল হলো, সাবালক কুমারী স্বাধীন নারী। আর স্বাধীনের উপর কারো বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব নেই। তাই সাবালক কুমারীর উপরও কারো বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব চলবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, নাবালিকাও তো স্বাধীন নারী, সুতরাং তার উপরও বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব জায়েজ না হওয়া উচিত ? জবাব হলো, নাবালিকার উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব থাকার কারণ হলো তার অপরিপক্বতা। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দ্বারা তার বিবেক পূর্ণ হয়ে গেছে। এজন্য সাবালকের উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব করা হবে না; বরং নাবালিকার হবে। সাবালকত্ব দ্বারা বিবেক পূর্ণ হয়ে যাওয়ার দলিল হলো, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলি সাবালিকার প্রতি প্রযোজ্য হওয়া। তাইতো যতক্ষণ পর্যন্ত নাবালিকা ততক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের বিধানাবলি তার প্রতি আরোপিত হয় না। যখন সাবালক হয় তখন আরোপিত হয় [এবং সে মুকাল্লাফ হয়]। আর সাবালিকা এমন যেমন সাবালক ছেলে অর্থাৎ যেমনিভাবে সাবালকের উপর বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব চলে না তেমনিভাবে সাবালিকার উপরও বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব চলে না। আর এটি এমন যেমন আর্থিক বিষয়ের মধ্যে অধিকার। অর্থাৎ, যেমনিভাবে সাবালক কুমারী তার অর্থের মধ্যে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তার পিতার জন্য তার অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, তেমনিভাবে সাবালক কুমারীও তার সত্তার মধ্যে অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা লাভ করবে। পিতা বা অন্য কোনো ওলীতে অনুমতি শর্ত নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ কথা বলা যে, পিতা তার মেয়ের অনুমতি ব্যতীত তার মহরের অর্থ গ্রহণ করতে পারে- এর জবাব হলো, পিতা যখন মহরের অর্থ গ্রহণ করল তখন কন্যার চুপ থাকার কারণে তার সম্মতি পাওয়া গেছে। তাইতো কন্যা যদি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেয় তখন আর পিতা মহরের অর্থ গ্রহণ করার মালিক থাকেন না।

قَالَ فَإِذَا اسْتَاذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ اَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إِذْنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبِكْرُ تُسْتَامَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَلِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيهِ رَاجِحَةٌ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنِ الرَّدِّ وَالضَّحْكُ اَدَلُّ عَلَى الرِّضَاءِ مِنَ السُّكُوتِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَكَتْ لِأَنَّهُ دَلِيلُ السَّخَطِ وَالْكَرَاهَةِ وَقِيلَ إِذَا ضَحِكَتْ كَالْمُسْتَهْزِئَةِ بِمَا سَمِعَتْ لَا يَكُونُ رِضًا وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدًّا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওলী যদি সাবালিকা কুমারীর কাছে 'ইযিন' চায়, আর সে নীরব থাকে কিংবা হেসে দেয়, তাহলে একে সম্মতি ধরা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْبِكْرُ تُسْتَامَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ 'কুমারী নারীর কাছে তার ব্যাপারে সম্মতি চাইতে হবে, যদি সে নীরব থাকে তাহলে সে সম্মত আছে বলে ধরা হবে।' তাছাড়া [হাসি ও নীরবতার ক্ষেত্রে] সম্মতির দিকটি প্রবল। কেননা, সে আগ্রহ প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে; প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে নয়। আর হাসি নীরবতার চেয়ে অধিক সম্মতি প্রকাশক। আর কান্নার অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তা অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির লক্ষণ। আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি শ্রুত বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের ধরনে হেসে থাকে তাহলে সেটা সম্মতি বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি নিঃশব্দে ক্রন্দন করে, তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِذَا اسْتَاذَنَهَا الْوَلِيُّ الخ : **মাসআলা :** বিবাহের পূর্বে ওলী যদি কুমারী স্ত্রীলোকের নিকট অনুমতি চায়, আর সে এটা শুনে চুপ হয়ে যায় কিংবা হেসে পড়ে, তাহলে তার এই চুপ থাকা কিংবা হেসে পড়া তার পক্ষ থেকে সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে মুচকি হাসিও সম্মতির প্রমাণ বহন করে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) দলিল হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী পেশ করেছেন যে, কুমারী নারীর কাছে তার ব্যাপারে সম্মতি চাইতে হবে, যদি সে নীরব থাকে তাহলে সে সম্মত আছে বলে ধরা হবে।

আকলী দলিল হলো, নীরবতা ও হাসির ক্ষেত্রে সম্মতির দিকটি প্রবল। কেননা, কুমারী নারী আগ্রহ প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে; প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে নয়। তাই সে যদি নারাজ হতো তবে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে দিত। তাই অস্বীকার না করা তার সম্মতির দলিল। যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে যে, হাদীসের মধ্যে তো চুপ থাকার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু হাসির বর্ণনা তো নেই, তাহলে হাসিকে সম্মতির দলিল কিভাবে বলা হয়? হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর জবাবে বলেন, হাসি নীরবতার মোকাবিলায় অধিক সম্মতি প্রকাশক। কেননা, হাসি শ্রুত কথার আনন্দ ও খুশির লক্ষণ। সুতরাং নীরবতা যখন সম্মতির দলিল, হাসিও সম্মতির দলিল হবে। তবে কুমারীর কান্না সম্মতির দলিল নয়; বরং অখুশি ও অপছন্দের দলিল। কারো কারো মত হলো, কুমারী নারী যদি ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রকাশের ধরনে হাসে তবে এ হাসিকে কুমারীর সম্মতি বলা হবে না। কেননা, এটি ওলীর কথার ঠাট্টা বা অবজ্ঞা হবে [ওলীর] অনুমতি হবে না। আর যদি কুমারী নারী নিঃশব্দে কাঁদে, তবে এটি তার পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান বলা হবে না। কারণ, অনেক সময় মাতাপিতার বিচ্ছেদের সংবাদে অবলীলায় চোখের পানি বেরিয়ে আসে। এরই উপর ফতোয়া। অনেক সময় দেখা যায় যে, কখনো কখনো আনন্দের সংবাদেও চোখের পানি এসে যায়। তাই নিঃশব্দের কান্নাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান বলা হবে না।

قَالَ وَإِنْ فَعَلَ هٰذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ يَعْنِىْ إِسْتَامَرَ غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ أَوْلٰى مِنْهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا حَتّٰى تَتَكَلَّمَ بِهِ لِأَنَّ هٰذَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْاِلْتِفَاتِ إِلٰى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَاءِ وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَالْاِكْتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ فِىْ حَقِّ غَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَامِرُ رَسُوْلَ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَتُعْتَبَرُ فِى الْاِسْتِيْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلٰى وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيْهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ وَلَا تُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُوْنِهِ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ওলী ছাড়া যদি অন্য কেউ এটা করে, অর্থাৎ ওলী ছাড়া যদি অন্য কেউ কিংবা নিকটতম ওলীর পরিবর্তে দূরতর ওলী সম্মতি চায় তাহলে কথায় না বললে সম্মতি বোঝা যাবে না। কেননা, এই নীরবতা তার কথার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে হতে পারে। সুতরাং তা সম্মতির পরিচায়করূপে গণ্য হবে না, হলেও সম্ভাবনারূপে গণ্য হবে। আর এ ধরনের সম্মতি যে যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল [তা ছিল] প্রয়োজনের জন্য, আর ওলী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। যে সম্মতি চাইবে সে যদি ওলীর প্রেরিত দূত হয় তাহলে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা, সে তো ওলীর স্থলবর্তী। সম্মতি চাওয়ার ব্যাপারে [স্বামীর] নাম এমনভাবে উল্লেখ করা উচিত, যাতে পরিচয় লাভ হয়, যাতে সে পাত্রের ব্যাপারে আগ্রহ-অনাগ্রহ স্পষ্ট হয়ে যায়। মহরের পরিমাণ উল্লেখ করা শর্ত নয়, এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, মহর নির্ধারণ ছাড়াও বিবাহ শুদ্ধ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ فَعَلَ هٰذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ الخ : মাসআলা : সাবালক কুমারী থেকে যদি ওলী ছাড়া অন্য কেউ সম্মতি চায় কিংবা নিকটতর ওলীর পরিবর্তে দূরবর্তী ওলী বিবাহের সম্মতি চায়, তাহলে এ দুই সুরতে নিশ্চুপ থাকা কিংবা হাসি সম্মতির দলিল হবে না; বরং অনুমতি প্রদানের জন্য মুখে কথা বলতে হবে। কেননা, অপরিচিত কিংবা দূরবর্তী ওলীর কথার জবাবে চুপ থাকা কম গুরুত্ব দেওয়ার কারণে হতে পারে, যাকে সম্মতির দলিল বলা যাবে না। আর যদি সামান্য সময়ের জন্য মেনেও নেওয়া হয় যে এ চুপ থাকাও সম্মতির দলিল, তবে এর মধ্যে অসম্মতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ ধরনের সম্মতির উপর প্রয়োজনের কারণে নির্ভর করা হয়, ওলী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, সাবালক কুমারী ওলী ছাড়া অন্যের সামনে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে না। হ্যাঁ, তবে যদি অনুমতি কামনাকারী ওলীর দূত হয় তাহলে ওলীর স্থলবর্তী হয়ে ওলীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ فِى الْاِسْتِيْمَارِ الخ : মাসআলা : সাবালক কুমারীর সম্মতি চাওয়ার সময় স্বামীর এমনভাবে পরিচয় তুলে ধরা উচিত যার দ্বারা সে অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় এবং এ কথা বুঝা যায় যে, সাবালক কুমারী নারী ঐ নামকৃত স্বামীর প্রতি আগ্রহী না অনাগ্রহী। তবে সম্মতির প্রাক্কালে মহরের নাম উল্লেখ করা জরুরি নয়। কেননা, মহরের উল্লেখ ছাড়াও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। কারণ, মহরের নির্ধারণ– বিবাহের প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোনো কোনো মুতাআখ্খিরীনের মত হলো, সম্মতির সময় মহর নির্ধারণ করা জরুরি। কেননা, মহরের কমবেশির মতানৈক্যের কারণে আগ্রহের মধ্যেও বিভিন্নতা এসে যায়। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ।

وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا لِاَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِى السُّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ ثُمَّ الْمُخْبِرُ اِنْ كَانَ فُضُوْلِيًّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ كَانَ رَسُوْلًا لَا يُشْتَرَطُ اِجْمَاعًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَلَوِ اسْتَاْذَنَ الثَّيِّبَ فَلَابُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلثَّيِّبُ تُشَاوَرُ وَلِاَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ فِىْ حَقِّهَا ـ

অনুবাদ : আর যদি ওলী তাকে বিবাহ দেয় আর সে খবর তার নিকট পৌঁছে এবং সে নীরব থাকে, তাহলে এ নীরবতার হুকুম সে অনুযায়ী হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। [অর্থাৎ সংবাদদানকারী যদি ওলী বা তার দূত হয় তাহলে তার নীরবতা সম্মতিরূপে গণ্য হবে]। কেননা, নীরবতার মধ্যে বোধগম্যতার দিকটি পরিবর্তিত হয় না। খবরদানকারী ব্যক্তি যদি [ওলী বা তার প্রেরিত দূতের পরিবর্তে] ফালতু কোনো ব্যক্তি হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে সাক্ষীর সংখ্যা বা সত্যবাদিতার শর্ত আরোপ করা হবে। সাহেবাইন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে সংবাদদাতা ওলীর দূত হলে সকলের মতেই শর্ত আরোপ করা হবে না। এর আরো কতিপয় নজির রয়েছে : [যেমন– উকিলকে অব্যাহতি প্রদান বা বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া]। যদি পূর্ব বিবাহিতা নারীর নিকট সম্মতি চাওয়া হয় তাহলে তার মুখের কথা দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করা জরুরি। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন اَلثَّيِّبُ تُشَاوَرُ 'পূর্ব বিবাহিতা নারীর সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।' তা ছাড়া তার পক্ষে কথা বলাকে দূষণীয় মনে করা হয় না। আর যেহেতু এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ার কারণে লজ্জা হ্রাস পেয়েছে সেহেতু তার জন্য কথা বলায় কোনো বাধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ الخ : ওলী সাবালক কুমারীর বিবাহ দিয়ে দিল, তারপর তার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছল এবং এটা শুনে সে চুপ থাকল, তাহলে তার ব্যাপারে ঐ হুকুমই হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, খবরদাতা যদি ওলী হয় কিংবা ওলীর দূত হয় তাহলে তার চুপ থাকা বা হাসি সম্মতিরূপে গণ্য হবে; কান্না সম্মতি হবে না। আর যদি খবরদাতা ওলী ছাড়া অন্য কেউ বা দূরবর্তী ওলী হয়, তবে মুখ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করা জরুরি; অন্যথায় সম্মতি হবে না। দলিল হলো, চুপ থাকার মধ্যে সম্মতির দিকটি পরিবর্তিত হয় না– বিবাহের পূর্বে হোক বা পরে হোক। তারপর ওলী যদি ফালতু কোনো ব্যক্তি হয়– ওলীও না বা ওলীর দূতও না, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তার মধ্যে সংখ্যা কিংবা ন্যায়পরায়ণতা পাওয়া যাওয়া জরুরি। অর্থাৎ, খবরদাতা কমপক্ষে দুজন হতে হবে। আর যদি একজন হয় তবে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সাহেবাইনের মতে, তাদের মধ্যে কোনো শর্তের জরুরত নেই– খবরদাতা একজন হোক বা একাধিক হোক, ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক। আর যদি খবরদাতা ওলীর দূত হয়, তবে সকলের মতে কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই।

এ মতবিরোধের অনেক নজির রয়েছে। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার উকিলকে বরখাস্ত করে দিল কিংবা কোনো ফালতু লোক ঐ উকিলকে বরখাস্তের সংবাদ দিয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফালতুর মধ্যে সংখ্যা কিংবা ন্যায়পরায়ণতার শর্ত হবে, আর সাহেবাইনের মতে, কোনো শর্ত আরোপ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَاْذَنَ الثَّيِّبَ الخ : যদি সাবালক পূর্ব বিবাহিতা নারীর নিকট সম্মতি চাওয়া হয় তবে তার মুখের কথার দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করা জরুরি। এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– اَلثَّيِّبُ تُشَاوَرُ. تُشَاوَرُ শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ -এর مُشَاوَرَةٌ থেকে নির্গত। আর بَابُ مُفَاعَلَةٌ -এর خَاصَّةٌ হলো اِشْتِرَاكٌ। মুশাওয়ারাহ বলা হয়– طَلَبُ الرَّأْيِ بِالْقَوْلِ তথা মুখের দ্বারা মতামত চাওয়াকে। সুতরাং দুদিকের একদিকে যখন কথা (قَوْل) আছে তখন অন্যদিকেও কথা (قَوْل) হবে। সুতরাং হাদীসের দাবি হলো কথা বলা আর এটাই হলো আসল বা মূল। দ্বিতীয়ত আকলী দলিল হলো, ছায়্যিবার পক্ষে কথা বলা দূষণীয় নয়। মানুষের সাথে সংশ্রবের কারণে তার লজ্জা হ্রাস পেয়েছে। তাই তার পক্ষে কথা বলায় কোনো প্রতিবন্ধক নেই।

وَاِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ اَوْ حَيْضَةٍ اَوْ جِرَاحَةٍ اَوْ تَعْنِيْسٍ فَهِيَ فِيْ حُكْمِ الْاَبْكَارِ لِاَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيْقَةً لِاَنَّ مُصِيْبَهَا اَوَّلُ مُصِيْبٍ لَهَا وَمِنْهُ الْبَاكُوْرَةُ وَالْبُكْرَةُ وَلِاَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ فَهِيَ كَذٰلِكَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) لَايَكْتَفِيْ بِسُكُوْتِهَا لِاَنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيْقَةً لِاَنَّ مُصِيْبَهَا عَائِدٌ اِلَيْهَا وَمِنْهُ الْمَثُوْبَةُ وَالْمَثَابَةُ وَالتَّثْوِيْبُ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ النَّاسَ عَرَفُوْهَا بِكْرًا فَيُعَيِّبُوْنَهَا بِالنُّطْقِ فَتَمْتَنِعُ عَنْهُ فَيَكْتَفِيْ بِسُكُوْتِهَا كَيْلَا تَتَعَطَّلَ عَلَيْهَا مَصَالِحُهَا بِخِلَافِ مَا اِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ اَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِاَنَّ الشَّرْعَ اَظْهَرَهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِهٖ اَحْكَامًا اَمَّا الزِّنَاءُ فَقَدْ نُدِبَ اِلٰى سَتْرِهٖ حَتّٰى لَوِ اشْتَهَرَ حَالُهَا لَا يُكْتَفٰى بِسُكُوْتِهَا .

অনুবাদ : যদি লম্ফ-ঝম্ফ, হায়েজ, জখম কিংবা বিবাহের বয়স পার হয়ে যাওয়ার কারণে কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কুমারী বলেই গণ্য হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে কুমারী রয়ে গেছে। কারণ তাকে স্পর্শকারী পুরুষ প্রথম স্পর্শকারী ব্যক্তি। এ থেকেই [প্রথম ফলকে] بَاكُوْرَةٌ এবং [দিনের প্রথম অংশকে] بُكْرَةٌ বলা হয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে স্বভাবতই সে লজ্জাবোধ করবে। আর যদি জেনার কারণে তার কুমারিত্ব নষ্ট হয় তাহলেও তার হুকুম অনুরূপ। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত অনুযায়ী। সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার নীরবতা যথেষ্ট নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে ثَيِّبٌ। কারণ তাকে স্পর্শকারী পুরুষ মূলত তার প্রতি পুনরাগত। পুনঃপুন অর্থ থেকেই مَثَابَةٌ - مَثُوْبَةٌ [প্রত্যাবর্তনস্থল] ও تَثْوِيْبٌ [ঘোষণার পর ঘোষণা] শব্দের উৎপত্তি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মানুষ তো তাকে কুমারী বলেই জানে। সুতরাং মুখে বলার কারণে তারা তাকে লজ্জা দিবে। তাই স্বভাবতই সে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। তাই তার নীরবতাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হবে, যাতে তার [বিবাহ সম্পর্কিত] কল্যাণ ও স্বার্থসমূহ নষ্ট না হয়ে যায়। আর সন্দেহগ্রস্ততার কারণে কিংবা নষ্ট বিবাহের ভিত্তিতে তার সঙ্গে সহবাস করা হলে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা এর সঙ্গে বিভিন্ন আহকাম যুক্ত করার মাধ্যমে শরিয়ত এটাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে জেনার বিষয়টিকে গোপন করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন কি যদি তার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তার নীরবতাকে যথেষ্ট মনে করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا الخ : **মাসআলা :** যদি লম্ফ-ঝম্ফ, অধিক হায়েজ কিংবা কোনো জখম বা দীর্ঘ সময় অবস্থান বা বিবাহের বয়স পার হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো মেয়ের কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ সকল সূরতে এ মেয়েটির হুকুম কুমারীর হুকুমের মতো হবে। অর্থাৎ সম্মতি চাওয়ার সময় তার নীরবতা সম্মতি বলে গণ্য হবে; কথা বলা জরুরি হবে না। এর

দলিল হলো, এ নারীটি প্রকৃতপক্ষে কুমারীই রয়ে গেছে। আর بَا - كَافْ - رَا -এর ধাতুর মধ্যে প্রথম -এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমন- بَاكُوْرَةٌ - প্রথম ফল, بُكْرَةٌ - দিনের প্রথম অংশকে বলা হয়। তাই এ নারীর নিকট যা-ই পৌঁছবে তা-ই প্রথম পৌঁছেছে বলে বিবেচিত হবে। তাই এ নারীকে কুমারীর হুকুমই দেওয়া হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, এ নারীর পুরুষের সাথে মেলামেশা হয়নি, তাই সেও লজ্জার কারণে মুখ দ্বারা অনুমতি প্রদান করবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ الخ : আর যদি কুমারীর কুমারিত্ব সঙ্গম দ্বারা দূর হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, কুমারীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পূর্ব বিবাহিতা নারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তার নীরবতা যথেষ্ট মনে করা হবে না; বরং মুখ দ্বারা অনুমতি দেওয়া জরুরি। তাঁদের দলিল হলো, ب - يا - ث -এর ধাতুর মধ্যে 'প্রত্যাবর্তন' -এর অর্থ রয়েছে। যেমন- مَثُوبَةٌ নেক আমলের প্রতিদানকে বলা হয়। এখন যেন সে দ্বিতীয়বার আমলে লিপ্ত হলো। এমনিভাবে مَثَابَةٌ বারবার প্রত্যাবর্তনস্থলকে বলা হয়। এ কারণে মক্কাকে مَثَابَةٌ বলা হয়। কেননা, তথায় লোকেরা বারবার হজ ও ওমরা করার জন্য ফিরে যায়। এমনিভাবে تَثْوِيبُ ঘোষণার পর ঘোষণাকে বলা হয়। দলিলের সারকথা এই দাঁড়ায় যে, যে নারীর কুমারিত্ব সঙ্গমের কারণে দূর হয়ে গেল প্রকৃতপক্ষে সে কুমারীই। কারণ, একবার তার সাথে যা হয়েছিল তা দ্বিতীয়বারও হবে। সুতরাং যখন ঐ নারীর সাথে দ্বিতীয়বারও সে কাজই হবে যা একবার সঙ্গম দ্বারা হয়েছিল, সে-ই পূর্ব বিবাহিতা নারী (ثَيِّبَةٌ) তাই তার উপর পূর্ববিবাহিতা নারীর হুকুমই বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল, লোকেরা তাকে কুমারী বলেই জানে। এখন যদি কথা বলে তবে লোকেরা তাকে দোষারোপ করবে এবং এর দ্বারা সে লজ্জাবোধ করবে এবং কথা বলা হতে বিরত থাকবে, যার ফলে তার কল্যাণ ও স্বার্থসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তাকে কুমারীর হুকুমেই রাখা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا وُطِئَتْ الخ : তবে যদি কুমারীর সাথে নষ্টগ্রস্ততার কারণে সহবাস করা হয়, কিংবা নষ্ট বিবাহের ভিত্তিতে সহবাস করা হয়, তবে সকলের মতে সে ثَيِّبَةٌ হবে। কারণ, শরিয়ত তার উপর ছায়্যিবার আহকাম প্রয়োগ করে তাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। তাই ইদ্দত ওয়াজিব হবে, মহর ওয়াজিব হবে। তবে জেনার বিষয়টিকে গোপন করা মোস্তাহাব। এ কারণেই যদি তার হালাত-মাশহুর হয়ে যায় এবং জেনার উপর চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে তবে এও ছায়্যিবার অনুরূপ হয়ে যাবে। এবং তার নীরবতা যথেষ্ট মনে করা হবে না।

وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ السُّكُوتَ أَصْلٌ وَالرَّدُّ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُضْعِ وَالْمَرْأَةُ تَدْفَعُهُ فَكَانَتْ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ لِأَنَّ اللُّزُومَ قَدْ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْاِسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَسَيَأْتِيكَ فِي الدَّعْوَى إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অনুবাদ : স্বামী যদি বলে যে, তোমার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌছার পর তুমি নীরব ছিলে, কিন্তু স্ত্রী বলল, আমি তো প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, নীরবতা হলো মূল অবস্থা এবং প্রত্যাখ্যান হলো আরোপিত অবস্থা। সুতরাং এ ব্যাপার ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল (বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে) যার অনুকূলে তিনদিনের ইচ্ছার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর যখন সে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর [বিক্রয়চুক্তি] প্রত্যাখ্যানের দাবি করে। আমাদের দলিল হলো, স্বামী বিবাহ-চুক্তি কার্যকর হওয়ার এবং স্ত্রীর সম্ভোগ-অঙ্গের মালিক হওয়ার দাবি করছে। পক্ষান্তরে স্ত্রী তা রোধ করছে। সুতরাং সে অস্বীকারকারী হলো। যেমন- যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয়, আর সে আমানত ফেরত দেওয়ার দাবি করে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। বিক্রয়-চুক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছার শর্ত আরোপের মাসআলা এর বিপরীত। কেননা, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারাই বিক্রয়-চুক্তি অনিবার্য হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর নীরব থাকার অনুকূলে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে বিবাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, সে তার দাবিকে প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টতর করেছে। আর যদি স্বামীর পক্ষে কোনো প্রমাণ [সাক্ষী] না থাকে তাহলে] ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, শপথ করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে না। এটা হলো ঐ দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাতে শপথ গ্রহণের হুকুম আরোপিত হয় না। সামনে দাওয়া অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, যখন তোমার নিকট বিবাহের সংবাদ এসেছিল তখন তুমি নীরবতা অবলম্বন করেছিলে, তাই আমার সাথে তোমার বিবাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। স্ত্রী বলল, সংবাদ আসার সাথে সাথেই আমি তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি, তাই বিবাহ হয়নি। উভয়ের নিকট কোনো সাক্ষী নেই। তাহলে আমাদের মতে, স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

উভয় দলের দলিল-প্রমাণ পেশ করার পূর্বে বাদী-বিবাদীর পরিচয় এবং তার বিধান জেনে নেওয়া আবশ্যক। বাদী বলা হয়, যার কথা মূল -এর বিপরীত হয়, আর বিবাদী বলা হয় যার কথা মূল-এর মাফিক হয়। হাদীসের বর্ণনা মতে, বাদীর উপর প্রমাণ পেশ করা ওয়াজিব। যদি বাদীর নিকট প্রমাণ না থাকে তাহলে বিবাদীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ছয়টি জিনিস এমন আছে যার মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, বিবাদীর শপথ পেশ করতে হয় না। সাহেবাইন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে, বিবাদী থেকে শপথ নেওয়া হবে। ঐ ছয়টি জিনিস হলো– বিবাহ, রাজ'আত [পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ], ঈলার মধ্যে গনিমতের মাল, (فَيْءٌ فِى الْاِيْلَاءِ) গোলাম বানানো (اَلْاِسْتِيْلَاءُ), গোলাম (رِقٌ), বিলা তথা ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কারণে যে উত্তরাধিকার অর্জিত হয়। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, নীরবতা হলো মূল অবস্থা। কেননা, নীরবতা বলা হয় عَدَمُ كَلَامٍ তথা কথা না বলাকে, আর প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে عَدَمٌ হচ্ছে মূল, আর প্রত্যাখ্যান করা হলো আরোপিত অবস্থা (عَارِضٌ) সুতরাং স্বামী বিবাদী ও স্ত্রী বাদী হলো। আর বাদীর নিকট সাক্ষী উপস্থিত নেই, তাই বিবাদী অর্থাৎ স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ মাসআলাটি এমন হলো– যেমন, এক ব্যক্তি অপর একজন থেকে ঘোড়া ক্রয় করল, বিক্রেতার জন্য তিনদিনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তিনদিনের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করা হবে অথবা রাখা হবে। তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ক্রেতা বলল, তুমি খেয়ারের সময়সীমার মধ্যে নীরবতা অবলম্বন করেছিলে। আর বিক্রেতা বলল, আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সুতরাং উক্ত মাসআলায় বিবাদী যে নীরব থাকার দাবি তুলেছে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, নীরবতা হলো মূল অবস্থা, আর প্রত্যাখ্যান হলো আরোপিত অবস্থা। এমনিভাবে মতনের মাসআলার ক্ষেত্রেও বাদীর নীরবতা অর্থাৎ স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আমাদের দলিলের সারাংশ হলো, স্বামীর দাবি হলো বিবাহ-চুক্তি সংঘটিত হয়ে গেছে, আর আমি তার [স্ত্রীর] সম্ভোগ-অঙ্গের মালিক হয়ে গেছি, স্ত্রী তা অস্বীকার করছে। আর মূল হলো বিবাহ না হওয়া ও সম্ভোগ-অঙ্গের মালিক না হওয়া। তাই স্বামীর কথা মূলের বিপরীত ও স্ত্রীর কথা মূলের মাফিক হলো, আর যার কথা মূলের বিপরীত সে হলো বাদী এবং যার কথা মূলের মাফিক সে হলো বিবাদী। বিবাদী তথা স্বামীর কাছে সাক্ষীও নেই। তাই বিবাদী তথা স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ মাসআলাটি এমন হলো, যেমন– মুদা' (مُوْدَعٌ) অর্থাৎ যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছিল সে বলল, আমি আমানত আদায় করেছি। আর যে আমানত রেখেছে সে বলল, আদায় করেনি। তাহলে এখানে মুদা' مُوْدَعٌ যার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয়েছিল এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মুদা' জিম্মা আদায়ের দাবি করছে, আর আমানতকারী দাবি করছে জিম্মায় মশগুল হওয়ার। আর জিম্মা থেকে মুক্ত হওয়া হলো আসল বা মূল, জিম্মায় মশগুল হওয়া হলো মূলের বিপরীত। সুতরাং মুদা' বিবাদী হবে আর صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ বাদী হবে। বাদীর নিকট প্রমাণ বিদ্যমান নেই, তাই বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ الخ : ইমাম যুফার (র.) -এর কিয়াসের জবাব হলো, [চুক্তির ক্ষেত্রে] ইচ্ছার শর্ত আরোপের সুরতে বিক্রয়-চুক্তি এজন্য সাব্যস্ত হয় না যে, নীরব বাদীর কথা গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়েছে, তাই খেয়ারের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিক্রয়-চুক্তি নিজেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর ঐ মাসআলায়-ই স্বামী যদি স্ত্রীর নীরব থাকার অনুকূলে প্রমাণ পেশ করে, তাহলে বিবাহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বাদী তার দাবিকে প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর যদি তার নিকট সাক্ষী না থাকে তাহলে ইমাম সাহেবের মতে স্ত্রীর উপর শপথ পেশ করতে হবে না। আর এটি ঐ ছয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে ইমাম সাহেবের মতে শপথ আসে না, অন্যান্য ইমামের মতে আসে। এর আলোচনা আমরা ভূমিকায় করেছি।

وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ أَوْ ثَيِّـ
وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةُ وَمَالِكٌ (رحـ) يُخَالِفُنَا فِيْ غَيْرِ الْأَبِ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) فِيْ غَـ
الْأَبِ وَالْجَدِّ وَفِي الثَّيِّبِ الصَّغِيْرَةِ أَيْضًا وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ (رحـ) أَنَّ الْوَلَايَةَ عَلَى الْحُـ
بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ لِانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ إِلَّا أَنَّ وَلَايَةَ الْأَبِ ثَبَتَتْ نَصًّا بِخِلَا
الْقِيَاسِ وَالْجَدُّ لَيْسَ فِيْ مَعْنَاهُ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ قُلْنَا لَا بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ لِا
النِّكَاحَ يَتَضَمَّنُ الْمَصَالِحَ وَلَا تَتَوَفَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِيْنَ عَادَةً وَلَا يَتَّفِقُ الْكُفْوُ فِـ
كُلِّ زَمَانٍ فَأَثْبَتْنَا الْوَلَايَةَ فِيْ حَالَةِ الصِّغَرِ إِحْرَازًا لِلْكُفْوِ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) أَ
النَّظْرَ لَا يَتِمُّ بِالتَّفْوِيْضِ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِقُصُوْرِ شَفْقَتِهِ وَبُعْدِ قَرَابَتِهِ وَلِهٰذَا
يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنٰى رُتْبَةً فَلِأَنْ لَا يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَإِنَّ
أَعْلٰى وَأَوْلٰى وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظْرِ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَمَا فِيْهِ مِـ
الْقُصُوْرِ أَظْهَرْنَاهُ فِيْ سَلْبِ وَلَايَةِ الْإِلْزَامِ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ.

অনুবাদ : <u>ওলী যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাকে বিবাহ দেয়, তাহলে সে বিবাহ জায়েজ হবে– বালিকা কুমারী হোক কিংবা পূর্ব বিবাহিতা।</u> ওলী হলো আসাবাগণ। [মিরাসের ক্ষেত্রে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী পুরুষ আত্মীয়] পিতা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) আমাদের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে এবং নাবালিকা পূর্ব বিবাহিতার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল হলো, স্বাধীনা নারীর উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করা হয় প্রয়োজনের কারণে। এখানে [অর্থাৎ নাবালেগের ক্ষেত্রে] প্রয়োজন নেই, কামবৃত্তি না থাকার কারণে। তবে পিতার অভিভাবকত্ব নস [শরিয়তের বাণী] দ্বারা কিয়াসের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে। আর দাদা পিতার সমগুণসম্পন্ন নয়। সুতরাং তাকে পিতার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। এর জবাবে আমরা বলি যে, [অভিভাবকত্ব কিয়াস বিরোধী নয়;] বরং তা কিয়াসের অনুকূল। কেননা, বিবাহের মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সাধারণত উভয়ের মধ্যে কুফু ছাড়া অর্জিত হয় না। আর কুফু সবসময় পাওয়া যায় না। তাই কুফুর সুযোগ অর্জনের উদ্দেশ্যে নাবালেগ অবস্থায়ও আমরা অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছি। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যদের হাতে অভিভাবকত্ব অর্পণ করা দ্বারা কল্যাণ সংরক্ষণ পূর্ণভাবে হয় না। কেননা, অন্যদের মাঝে দেহের স্বল্পতা ও আত্মীয়তার দূরত্ব রয়েছে। এ কারণেই অন্যরা আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং দেহ-সত্তার উপর ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকা আরো স্বাভাবিক। কেননা, তা মর্যাদায় অধিকতর উচ্চ ও উত্তম। আমাদের দলিল হলো, আত্মীয়তা সম্পর্ক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি প্রেরণাদায়ক। যেমন পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে। আর তাদের মাঝে যে ত্রুটি রয়েছে, তা আমরা প্রকাশ করেছি বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব রহিত করার মাধ্যমে। আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে– ১. অভিভাবকত্বের অধিকার কার হবে? ২. কাদের উপর হবে? প্রথম মাসআলায় ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) -এর মতে, অভিভাবকত্বের অধিকার একমাত্র পিতার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পিতা ও দাদা উভয়ের হবে। আমাদের মতে প্রত্যেক ওলীর হবে– সে পিতা হোক বা দাদা হোক কিংবা অন্য কেউ হোক।

দ্বিতীয় মাসআলায় হানাফীগণের মাযহাব হলো, অভিভাবকত্বের অধিকার নাবালিকার উপর হবে। নাবালিকা কুমারী হোক বা পূর্ব বিবাহিতা হোক। শাফেয়ীগণের মাযহাব হলো, অভিভাবকত্ব কুমারীর উপর চলবে, সে নাবালিকা হোক বা বালিকা হোক। মোদ্দাকথা হলো, হানাফীগণের মতে অভিভাবকত্বের কারণ হলো ছোটত্ব, আর শাফেয়ীগণের মতে কুমারিত্ব। এর মোট চারটি সুরত হবে : দুই সুরত ঐকমত্যপূর্ণ, আর দুই সুরত বিরোধপূর্ণ। ঐকমত্যের প্রথম সুরত হলো নাবালিকা কুমারী, আর দ্বিতীয় সুরত হলো বালিকা পূর্ব বিবাহিতা। প্রথম সুরতের মধ্যে হানাফী ও শাফেয়ী উভয়ের মতে অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে। আর দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে উভয়ের মতে অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে না। বিরোধপূর্ণ প্রথম সুরত হলো বালিকা কুমারী, দ্বিতীয় সুরত হলো নাবালিকা পূর্ব বিবাহিতা। প্রথম সুরতের মধ্যে শাফেয়ীগণের মতে, অভিভাবকত্ব থাকবে; হানাফীগণের মতে থাকবে না। আর দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে হানাফীগণের মতে, অভিভাবকত্ব থাকবে; শাফেয়ীগণের মতে থাকবে না।

প্রথম মাসআলায় ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল এই যে, স্বাধীনা নারীর উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করা হয় জরুরতের ভিত্তিতে। আর নাবালক সন্তান ও নাবালিকার মধ্যে কামবৃত্তি না থাকার কারণে কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তাদের উপরও অভিভাবকত্ব চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইমাম মালেক (র.) পিতাকে অভিভাবকত্বের অধিকার কেন প্রদান করেন? এর জবাব হলো, পিতার জন্য অভিভাবকত্ব খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, হযরত আবূ বকর (রা.) তার ছয় বছরের কন্যার বিবাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সঠিক নিরূপণ করেছেন। এজন্য পিতাকে অভিভাবকত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর দাদা যেহেতু পিতার সমপর্যায়ের নয়। কেননা, দাদার মধ্যে পিতার তুলনায় স্নেহ-সোহাগ কম হয়। এজন্য পিতার সাথে দাদাকে যুক্ত করা হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করা কিয়াস বিরোধী নয়; বরং কিয়াসের অনুকূল। কেননা, বিবাহের মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন– বংশ-বিস্তার, দাম্পত্য জীবন, কামবৃত্তি মিটানো ইত্যাদি। আর এ কল্যাণগুলো ঐ দুই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাবে যাদের প্রত্যেকে একে অপরের কুফু হবে। কুফু প্রত্যেক জমানায় পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। এ কারণে আমরা নাবালেগ অবস্থায় অভিভাবকত্বকে সাব্যস্ত করেছি যাতে কুফু ঠিক থাকে। কারণ, যদি বালেগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তবে কুফু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের সারাংশ হলো, অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো স্নেহ ও সোহাগের উপর। পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যদের হাতে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তবে স্নেহ ও সোহাগ পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে না। কেননা, পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যদের মাঝে স্নেহের স্বল্পতা রয়েছে এবং আত্মীয়তার দূরত্বও রয়েছে। এ কারণে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের নাবালেগের মালে লেনদেনের ক্ষমতা রাখে না। যদিও মাল মর্যাদার দিক থেকে নিম্নমানের, তাহলে দেহ-সত্তা যা মর্যাদার দিক থেকে অধিকতর উচ্চ ও উত্তম। তার মধ্যে অধিকার প্রয়োগের এখতিয়ার পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের অবশ্যই না হওয়া উচিত।

আমাদের দলিল হলো, আত্মীয়তা সবব বা কারণ হলো স্নেহ ও সোহাগের। যেমন– পিতা ও দাদার মধ্যে। তবে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের মধ্যে স্নেহের স্বল্পতা রয়েছে। এ পার্থক্যটুকু এভাবে করতে হবে যে, পিতা এবং দাদা যাদের মধ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে, তাদেরকে বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব ও অভিযোগের অভিভাবকত্ব উভয়টির অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর পিতা ও দাদা ব্যতীত যাদের মধ্যে স্নেহের স্বল্পতা রয়েছে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব তো রয়েছে, কিন্তু অভিযোগের অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং যখন আত্মীয়তা সবব হলো স্নেহের। আর অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো স্নেহের উপর। তাই যেখানে যেখানে স্নেহ পাওয়া যাবে, সেখানে সেখানে অভিভাবকত্ব প্রমাণিত হবে– পিতা ও দাদা হোক কিংবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হোক। উল্লেখ্য যে– وَلَايَةُ اِلْزَامٍ ও وَلَايَةُ اِجْبَارٍ-এর মধ্যকার পার্থক্য হলো, যাদের وَلَايَةُ اِجْبَارٍ আছে, কিন্তু وَلَايَةُ اِلْزَامْ নেই তাদের কৃত বিবাহ আবশ্যক হবে না; বরং বালেগ হওয়ার পর নাবালেগের খেয়ারে বুলূগ হাসিল হবে। আর যার وَلَايَةُ اِجْبَارٍ -এর সাথে সাথে وَلَايَةُ اِلْزَامٍ-ও আছে তাদের কৃত বিবাহ আবশ্যক হবে। বালেগ হওয়ার পর খেয়ারে বুলূগ থাকবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর কিয়াস, 'পিতা ও দাদা ব্যতীত নাবালেগের মাঝে অন্যদের অধিকার প্রয়োগের এখতিয়ার নেই' -এর জবাব হলো, মালের মধ্যে অধিকার বারবার প্রয়োগ হয়। যেমন– ওলী একজনকে বিক্রি করল, সে দ্বিতীয়জনকে, দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে এভাবে বালেগ হওয়া পর্যন্ত অনেকবার ক্রয়বিক্রয় হবে। এখন পিতা ও দাদা ব্যতীত যদি অন্যরা মালের মধ্যে অধিকার প্রয়োগ করে, তবে এ কাজটি আয়ত্তে আনা অসম্ভব হয়ে যাবে। এ কারণে মালের মধ্যে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে وَلَايَةُ اِلْزَامٍ-ই উপকারী হবে। আর পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের وَلَايَةُ اِلْزَامٍ নেই, তাই পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের মালের মধ্যে অধিকার প্রয়োগের হকও থাকবে না।

لِاَنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا تُفِيْدُ الْوِلَايَةَ اِلَّا مُلْزِمَةً وَمَعَ الْقُصُوْرِ لَا يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْاِلْزَامِ وَجْهُ قَوْلِهِ فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ اَنَّ الثِّيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوْثِ الرَّاْيِ لِوُجُوْدِ الْمُمَارَسَةِ فَاَدَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَيْسِيْرًا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَ وُفُوْرِ الشَّفْقَةِ وَلَا مُمَارَسَةَ تُحْدِثُ الرَّاْيَ بِدُوْنِ الشَّهْوَةِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى الصِّغَرِ ثُمَّ الَّذِىْ يُؤَيِّدُ كَلَامَنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلنِّكَاحُ عَلَى الْعَصَبَاتِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَالتَّرْتِيْبُ فِى الْعَصَبَاتِ فِىْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَالتَّرْتِيْبِ فِى الْاِرْثِ وَالْاَبْعَدُ مَحْجُوْبٌ بِالْاَقْرَبِ .

অনুবাদ : কেননা, তা পরম্পরায় সংঘটিত হতে পারে। ফলে পরবর্তীতে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্বই প্রতিফলিত হবে। আর ক্রটি সহকারে বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, পূর্ব বিবাহে যেহেতু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তাই তা বিচক্ষণতা সৃষ্টির কারণ হিসেবে গণ্য। কাজেই সহজতার জন্য হুকুম ও সিদ্ধান্তকে আমরা "পূর্ব বিবাহ" -এর উপর আবর্তিত করেছি। আমাদের দলিল আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ [নাবালেগের ক্ষেত্রে] প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা এবং [পিতা ও দাদার মধ্যে] স্নেহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা। আর কামবৃত্তি ছাড়া বিবাহের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বিচক্ষণতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং হুকুমটি [নাবালেগত্বের] উপর আবর্তিত হবে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত বক্তব্যকে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিম্নোক্ত বাণী সমর্থন করছে- اَلنِّكَاحُ اِلَى الْعَصَبَاتِ 'বিবাহ দানের অধিকার আসাবাগণের হাতে অর্পিত।' এখানে অভিভাবকবৃন্দের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে আসাবাগণের ধারাবাহিকতা মিরাসের ক্ষেত্রের ধারাবাহিকতার অনুরূপ এবং দূরবর্তী আসাবা [যেমন- চাচা] নিকটতর আসাবা [যেমন- ভাই] -এর কারণে অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الخ : **দ্বিতীয় মাসআলা :** অভিভাবকত্বের হক কার উপর প্রয়োগ হবে? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, পূর্ব বিবাহিতা হওয়া অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণ বা সবব। কারণ, সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে। সুতরাং যখন পূর্ব বিবাহিতা নারী অভিজ্ঞতাসম্পন্না হয়ে গেল এবং নিজের ভালোমন্দ বুঝে, তাই তার উপর অভিভাবকত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। সেতো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই সহজতার জন্য [হুকুম ও সিদ্ধান্তকে পূর্ব বিবাহিতা -এর উপরই আবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দলিল হলো, নাবালক ও নাবালিকার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। আর পিতা ও দাদার মধ্যে স্নেহও পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। তবে অভিজ্ঞতা বিচক্ষণতা সৃষ্টির কারণ –এ পর্যায়ে আমরা বলি যে, কামবৃত্তি ব্যতীত বিবাহের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সৃষ্টি হয় না। কামবৃত্তি ছাড়া সঙ্গম করা আর দেয়ালে ঝুলিয়ে থাকা বরাবর। তাই হুকুমটি নাবালেগের উপর আবর্তিত হবে। সুতরাং যখন নাবালগত্ব পাওয়া গেছে তাই অভিভাবকত্বও প্রমাণিত হবে। তাছাড়া ওলীর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কথার সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও হয়- اَلنِّكَاحُ اِلَى الْعَصَبَاتِ – উক্ত হাদীসে পিতা-দাদা এবং অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে আসাবাতের মধ্যে ঐ ধারাবাহিকতা-ই হবে যে ধারাবাহিকতা উত্তরাধিকারের মধ্যে চলে। সুতরাং সবচে নিকটবর্তী ওলী হলো পুত্র তারপর পৌপুত্র। এমনিভাবে নীচের দিকে যাবে। তারপর পিতা, তারপর দাদা, তারপর তাদের উপরের ধারাবাহিকতা চলবে এবং দূরবর্তী ওলী [অভিভাবকত্ব থেকে] বঞ্চিত হবে। নিকটবর্তী ওলী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দূরবর্তী ওলীর অভিভাবকত্বের অধিকার অর্জিত হবে না।

فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ وَالْجَدُّ يَعْنِي الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوْغِهِمَا لِأَنَّهُمَا كَامِلَا الرَّأْيِ وَافِرَا الشَّفْقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَائِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا خِيَارَ لَهُمَا اِعْتِبَارًا بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَلَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْأَخِ نَاقِصَةٌ وَالنُّقْصَانُ يَشْعُرُ بِقُصُوْرِ الشَّفْقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسٰى وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِيْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ وَالْقَاضِيْ وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوَايَةِ لِقُصُوْرِ الرَّأْيِ فِيْ أَحَدِهِمَا وَنُقْصَانِ الشَّفْقَةِ فِي الْآخَرِ فَيَتَخَيَّرُ وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِيٍّ وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ وَلِهٰذَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِيْ حَقِّ الْآخَرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ وَخِيَارُ الْعِتْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلِهٰذَا يَخْتَصُّ بِالْأُنْثٰى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ .

অনুবাদ : পিতা কিংবা দাদা যদি তাদের [অর্থাৎ নাবালেগ বালক বা বালিকার] বিবাহ দেয়, তাহলে বালেগ হওয়ার পর তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা, তারা পূর্ণ বিচক্ষণ এবং পূর্ণ স্নেহশীল। সুতরাং তাদের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার কারণে বিবাহ চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে; যেমন– বালেগ হওয়ার পর তাদের সম্মতিক্রমে সম্পাদন করলে বাধ্যতামূলক হতো। আর যদি পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ দেয় তাহলে যখন তারা বালেগ হবে তখন তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখবে, আর ইচ্ছা করলে তা রহিত করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) পিতা ও দাদার উপর কিয়াস করে বলেন, তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। উপরিউক্ত ইমামদ্বয়ের দলিল হলো, ভাইয়ের আত্মীয়তা ত্রুটিযুক্ত। আর এই ত্রুটি স্নেহ স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং তাতে [বিবাহের] উদ্দেশ্যাবলি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ সম্ভব। পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের ক্ষেত্রে [প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে ইমাম কুদূরীর] নিঃশর্ত বক্তব্য মা ও কাজিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ হলো [ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত] বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত। কেননা, একজনের মধ্যে [অর্থাৎ মায়ের মধ্যে] বিচক্ষণতার ত্রুটি রয়েছে আর অপরজনের [কাজি সাহেবের মাঝে স্নেহের ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং ইচ্ছাধিকার

থাকবে। তবে বিবাহ রহিত করার জন্য আদালতের রায় গ্রহণ করা শর্ত। স্বাধীনতা লাভকালীন ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, প্রাপ্তবয়স্কতার ক্ষেত্রে বিবাহ রহিত করা হয় একটি সূক্ষ্ম ক্ষতি রোধ করার জন্য। আর তা হলো [বিবাহের উদ্দেশ্য লাভে] বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এ কারণেই প্রাপ্তবয়স্ক তার ইচ্ছাধিকার বালক-বালিকা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই এটা অন্যের উপর অভিযোগ আনয়নকারী হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং আদালতের ফয়সালার প্রয়োজন হবে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকার হলো একটি সুস্পষ্ট ক্ষতি রোধ করার জন্য। আর তা হলো স্ত্রীর উপর স্বামীর অতিরিক্ত মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। এ কারণেই উক্ত ইচ্ছাধিকার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এটাকে রোধ করা [আত্মরক্ষা করা] বলে বিবেচনা করা হবে। আর রোধ করার ব্যাপারে আদালতের ফয়সালার মুখাপেক্ষী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ الخ : উক্ত ইবারতে وَلَايَةُ إِلْزَامٍ থেকে নির্গত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, যদি নাবালেগ বালক-বালিকার বিবাহ পিতা দিয়ে দেয় কিংবা পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে এ বিবাহ অবধারিত হয়ে যাবে, তাই বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। এর দলিল হলো, পিতা ও দাদা পূর্ণ বিচক্ষণ ও পূর্ণ স্নেহশীলতার অধিকারী। তাই তাদের দেওয়া বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন– যদি বালেগ হওয়ার পর পিতা কিংবা দাদা তাদের সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পাদন করে, তবে বিবাহ আবশ্যক হয়ে যাবে। [এখানেও অনুরূপ]

قَوْلُهُ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ الخ : উক্ত ইবারতে وَلَايَةُ إِجْبَارٍ থেকে বের হওয়া মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলা হলো, যদি নাবালেগ বালক বা বালিকার বিবাহ পিতা এবং দাদা ছাড়া অন্য কেউ দেয় তাহলে বালেগ হওয়ার পর তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখবে ইচ্ছা করলে রহিত করে দিবে। এটা তরফাইন (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, নাবালেগ বালক ও বালিকার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যকে পিতা ও দাদার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, পিতা এবং দাদার দেওয়া বিবাহ যেমনিভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, বালেগ হওয়ার পর তা রহিত করা যায় না এমনিভাবে পিতা-দাদা ছাড়া অন্যদের দেওয়া বিবাহও আবশ্যক হয়ে যাবে। বালেগ হওয়ার পর তাদের রহিত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। مَقِيْسٌ عَلَيْهِ ও مَقِيْسٌ -এর মধ্যে পূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মোদ্দা কথা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, পিতা ও দাদার ন্যায় পিতা-দাদা ছাড়া অন্যদেরও وَلَايَةُ إِجْبَارٍ-এর সাথে وَلَايَةُ إِلْزَامٍ অবধারিত হবে।

তরফাইনের দলিল এই যে, পিতা এবং দাদা ছাড়া যেমন ভাইদের আত্মীয়তা পিতা ও দাদার আত্মীয়তার তুলনায় ত্রুটিযুক্ত, আর আত্মীয়তার ত্রুটি স্নেহ স্বল্পতার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং স্নেহ স্বল্পতার কারণে পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যদের দেওয়া বিবাহের মধ্যে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর স্নেহ স্বল্পতার কারণে বিবাহের উদ্দেশ্যাবলিতে যে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ইচ্ছাধিকার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণও সম্ভবপর। সুতরাং ঐ বিঘ্নের ক্ষতিপূরণের জন্য নাবালেগ বালক-বালিকার ইচ্ছাধিকার থাকবে এবং পিতা ও দাদা ভিন্ন অন্যদের দেওয়া বিবাহ আবশ্যক হবে না। মোদ্দাকথা, তরফাইনের মতে পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যদের وَلَايَةُ إِجْبَارٍ তো অর্জন হবে, কিন্তু وَلَايَةُ إِلْزَامٍ অর্জন হবে না।

قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ الخ : অর্থাৎ এর দাবি হলো, নিঃশর্ত হুকুমের মধ্যে পিতা এবং দাদা ছাড়া মা ও কাজিও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মা ও কাজিরও وَلَايَتُ إِجْبَارٍ হাসিল হবে وَلَايَتُ إِلْزَامٍ হাসিল হবে না, তাই তাদের দেওয়া বিবাহও আবশ্যক হবে না; বরং বালেগ হওয়ার পর তাদের বিবাহ রহিত করে দেওয়ার অধিকার থাকবে। বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত এটাই। যদিও ইমাম আবূ

হানীফা (র.) থেকে এ মর্মে একটি বর্ণনা আছে যে, কাজি যদি কোনো এতিম কন্যার বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তার [বালেগ হওয়ার পর] ইচ্ছাধিকার থাকবে না; বরং বিবাহ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, কাজির জন্য অর্থ এবং দেহ উভয়টির মধ্যে পরিপূর্ণ অভিভাবকত্ব প্রমাণিত আছে। তাই কাজির অভিভাবকত্ব শক্তির ক্ষেত্রে পিতা আর দাদার অভিভাবকত্বের অনুরূপ [বরাবর] হবে।

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দলিল হলো وِلَايَةُ اِلْزَامٍ তথা অভিযোগের অভিভাবকত্বের মধ্যে দুটি জিনিস জরুরি। পরিপূর্ণ রায় ও পরিপূর্ণ স্নেহ। যদি এ দুটি জিনিস পাওয়া যায়, তবে وِلَايَةُ اِلْزَامٍ অর্জন হবে। আর যদি দুটির মধ্যে একটি পাওয়া যায় তাহলে وِلَايَةُ اِجْبَارٍ অর্জন হবে وِلَايَةُ اِلْزَامٍ অর্জন হবে না। আর এখানে এটাই হয়েছে। কেননা, মা -এর মধ্যে পরিপূর্ণ স্নেহ আছে; পরিপূর্ণ রায় নেই; আর কাজির মধ্যে পরিপূর্ণ রায় আছে; পরিপূর্ণ স্নেহ নেই। তাই তাদের উভয়ের وِلَايَةُ اِجْبَارٍ তো অর্জন হবে, কিন্তু وِلَايَةُ اِلْزَامٍ অর্জন হবে না। তাই তাদের দেওয়া বিবাহ বাধ্যতামূলক হবে না। নাবালেগ বালক-বালিকার বিবাহ রহিত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বালেগ হওয়ার পর ইচ্ছাধিকারের কারণে যদি বিবাহ রহিত করে দেওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে কাজির রায় শর্ত। অর্থাৎ, নাবালেগ বালক-বালিকার মধ্য থেকে যে-কোনো একজনের فَسَخْتُ [আমি রহিত করেছি] বলা যথেষ্ট হবে না; বরং কাজির আদালতে মকদ্দমা পেশ করতে হবে, তারপর কাজি সাহেব বিবাহ রহিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করবে। তবে স্বাধীনতা লাভকারী ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তার মধ্যে আজাদকৃতা নিজেই তার বিবাহ রহিত করতে পারে, কাজির ফয়সালার কোনো জরুরত নেই। পার্থক্যের কারণ বুঝার পূর্বে একথা মনে রাখতে হবে নিজের উপর থেকে ক্ষতি রোধ করার জন্য কাজির ফয়সালা শর্ত নয়। তবে অন্যের উপর অভিযোগ আনয়ন করার জন্য কাজির ফয়সালা শর্ত। কেননা, অভিযোগ হলো কাজির মানসাব বা মর্যাদা; সাধারণ লোকের নয়। উল্লেখ্য যে, পার্থক্যের কারণ হলো, বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকারের মধ্যে বিবাহ রহিত করা হয় সূক্ষ্ম ক্ষতিকে রোধ করার জন্য। আর তা হলো, বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হওয়া। এ কারণেই বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকার বালক-বালিকা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যখন এ রোধ করা সূক্ষ্ম ক্ষতির রোধ করা, তখন তাকে اِلْزَامٌ عَلَى الْغَيْرِ -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহ রহিত করার ইচ্ছা করেছে যেন সে অন্যজনের উপর যে ওলী হয়ে বিবাহ করেছে তাকে অভিযোগ দিচ্ছে যে, আমার বিবাহ উপযুক্ত স্থানে দেওয়া হয়নি। আর যখন এ রোধ করাটি অভিযোগ হলো, আর অভিযোগ হলো কাজির মর্যাদা তাই বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকারের কারণে রহিত করাকে কাজির সাথে শর্ত করে দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকার হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি রোধ করার জন্য। কারণ, দাসী স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী দুই তালাকের মালিক ছিল। আর যখন স্বাধীনা হয়ে গেল তখন তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। তাহলে যেন আজাদকৃতার উপর স্বাধীনতার কারণে মালিকানা বৃদ্ধি হয়ে গেল, আর যেহেতু মালিকানার আধিক্য দাসীর মালিকানার উপর হবে; গোলামের মালিকানার উপর নয় এজন্য স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকার দাসীর সাথে খাস হবে। গোলামের স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকারের কারণে বিবাহ রহিত করার মধ্যে শুধু ক্ষতি রোধ করা হয় বাধ্যবাধকতার মর্ম একেবারেই নেই। তাই স্বাধীনতাকালীন ইচ্ছাধিকারের মধ্যে বিবাহ রহিত করলে কাজির প্রয়োজনও হবে না।

ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيْرَةُ وَقَدْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتّٰى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ شَرَطَ الْعِلْمَ بِأَصْلِ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ وَالْوَلِيُّ يَتَفَرَّدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَالدَّارُ دَارُ الْعِلْمِ فَلَمْ تُعْذَرْ بِالْجَهْلِ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ .

অনুবাদ : অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, নাবালিকা যদি সাবালিকা হয় এবং বিবাহের কথা জানার পর নীরব থাকে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। আর সে যদি বিবাহের ব্যাপারে অবগত না হয় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে যতক্ষণ না অবগত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মূল বিবাহের বিষয়ে অবগত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা, এ বিষয়ে অবগতি ছাড়া বা [বিবাহ বহাল রাখা কিংবা রহিত করার] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না, আর অভিভাবক তার অগোচরেই বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং অজ্ঞতার কারণে তাকে মাজুর ধরা হবে। কিন্তু ইচ্ছাধিকারের বিষয়ে অবগত হওয়ার শর্ত নেই। কেননা, শরিয়তের আহকাম জানার জন্য তার অবকাশ রয়েছে, আর দারুল ইসলাম হলো ইলমে দীন শিক্ষার স্থান। সুতরাং [শরিয়তের বিধানের বিষয়ে] অজ্ঞতার কারণে তাকে মাজুর ধরা হবে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসী স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, দাসী ইলম হাসিলের জন্য অবকাশ পায় না। সুতরাং ইচ্ছাধিকার লাভ হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে তাকে মাজুর ধরা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتْ الخ : তরফাইনের মতে পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত মাসআলার সূরতে মাসআলা হলো, নাবালেগ বালিকা পূর্ব থেকেই জানে যে, আমার সাথে অমুকের বিবাহ হয়েছিল। এখন বালেগ হওয়ার পর সে নীরবতা অবলম্বন করল, তার এ নীরবতা তার পক্ষ থেকে সম্মতি বলে সাব্যস্ত হবে। আর পূর্ব থেকেই যদি মূল বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে, পথিমধ্যে সে বালেগ হয়ে গেছে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত মূল বিবাহ সম্পর্কে অবগত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। অবগত হওয়ার পর যদি নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। মোদ্দাকথা, মূল বিবাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করার শর্ত আরোপ করেছেন। কারণ, ওলী নাবালেগ বালিকার সাথে পরামর্শ ছাড়াই একাকী বিবাহ দিতে পারে। আর নাবালেগ বালিকা বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকারের মধ্যে তখন অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে যখন সে একথা জ্ঞাত হবে যে, আমার বিবাহ হয়েছে। এছাড়া সে ইচ্ছাধিকারের অধিকার প্রয়োগ লাভ করবে না। কারণ, তাকে মূল বিবাহ থেকে অজ্ঞ থাকার সূরতে মাজুর সাব্যস্ত করা হবে। যখনই মূল বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে তখনই বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ شَرَطَ الْعِلْمَ الخ : বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাধিকারের বিষয়ে অবগত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। অর্থাৎ, নাবালেগ-বালিকা এ কথা জানে যে, আমার বিবাহ হয়েছে– কিন্তু এ কথা জানে না যে, বালেগ হওয়ার পর শরিয়ত আমাকে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে। অর্থাৎ, এ মাসআলা জানা নেই। এখন এ সূরতে যদি সে বালেগ হওয়ার পর নীরব থাকে, তাহলে বিবাহ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। অথচ তার প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকারের জ্ঞান নেই। দলিল হলো, দারুল ইসলাম হচ্ছে ইলমে দীন শিক্ষার স্থান। স্বাধীন হওয়ার পর এ বালিকাও শরিয়তের বিধিবিধান জানার জন্য ফারিগ ছিল। তাই তার অজ্ঞতা মাজুর হিসেবে ধরা হবে না এবং আমরা তাকে মাজুর বলে গণ্য করব না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ الخ : স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসী স্ত্রীর বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ, আজাদ হওয়ার পর তার এ কথা জানা নেই যে, আমার স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাধিকারের সময় বিবাহ রহিত করার অধিকার আছে, তাই আজাদ হওয়ার পর তার নীরবতা অবলম্বন করাকে সম্মতি ধরা হবে না; বরং অবগতি লাভ করা পর্যন্ত স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কারণ, হলো দাসী-মনিবের খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে শরিয়তের বিধিবিধান শিক্ষা লাভের জন্য সুযোগ পায়নি, তাই দাসীর স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার থেকে অজ্ঞ থাকাকে মাজুর ধরা হবে।

ثُمَّ خِيَارُ الْبِكْرِ يَبْطُلُ بِالسُّكُوْتِ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَقُلْ رَضِيْتُ أَوْ يَجِئْ مِنْهُ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ رِضًا وَكَذٰلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ اِعْتِبَارًا لِهٰذِهِ الْحَالَةِ بِحَالِ اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَخِيَارُ الْبُلُوْغِ فِيْ حَقِّ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ اِلٰى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ فِيْ حَقِّ الثَّيِّبِ وَالْغُلَامِ لِاَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِاِثْبَاتِ الزَّوْجِ بَلْ لِتَوَهُّمِ الْخَلَلِ فَاِنَّمَا يَبْطُلُ بِالرِّضَاءِ غَيْرَ اَنَّ سُكُوْتَ الْبِكْرِ رِضًا بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ لِاَنَّهُ ثَبَتَ بِاِثْبَاتِ الْمَوْلٰى وَهُوَ الْاِعْتَاقُ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا فِيْ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوْغِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لِاَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْاُنْثٰى وَلَا طَلَاقَ اِلَيْهَا وَكَذَا بِخِيَارِ الْعِتْقِ لِمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ لِاَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِيْ مَلَّكَهَا وَهُوَ مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ ـ

অনুবাদ : কুমারীর ইচ্ছাধিকার নীরবতা দ্বারাই বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু বালকের ইচ্ছাধীকার বাতিল হবে না– যতক্ষণ না সে বলে যে, 'আমি রাজি আছি।' কিংবা এমন কোনো কাজ করে, যা দ্বারা সম্মতি বুঝায়। আর এ হুকুম ঐ তরুণীর বেলায় যখন বালেগ হওয়ার পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে। এ হুকুম বিবাহ শুরুর অবস্থার উপর কিয়াস করে দেওয়া হয়েছে। কুমারীর ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার মজলিসের শেষ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে না এবং পূর্ব বিবাহিতা নারী ও বালকের ক্ষেত্রে শুধু দাঁড়িয়ে পড়ার কারণে অধিকার বাতিল হবে না। কেননা এটা স্বামীর সাব্যস্ত করার কারণে সাব্যস্ত হয়নি; বরং [স্নেহ স্বল্পতাজনিত ভিত্তিতে] বিঘ্ন সৃষ্টির ধারণার কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা সম্মতি প্রকাশ দ্বারা বাতিল হতে পারে। তবে কুমারীর ক্ষেত্রে নীরবতা সম্মতির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার এর বিপরীত। কেননা তা মনিবের সাব্যস্ত করার মাধ্যমে অর্থাৎ, আজাদ করার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তাতে মজলিস [সমাপ্ত হওয়া] বিবেচ্য হবে। স্বামী যাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে তার ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে যেমন। বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাক নয়। কেননা এ বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, অথচ স্ত্রীর হাতে তালাকের অধিকার নেই। স্বাধীনতার কারণে লব্ধ ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে বিচ্ছেদ হয়, তার এ হুকুম। এর কারণ তা-ই যা আমরা [এইমাত্র] বলেছি। তবে স্বামী যে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা, তালাকের অধিকারী স্বামীই তাকে মালিক বানিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ خِيَارُ الْبِكْرِ يَبْطُلُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার যা পুরুষ-নারী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে তার মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে। মাসআলা হলো, কুমারীর স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার নীরবতা দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। আর বালকের স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার নীরবতা দ্বারা বাতিল হয় না; বরং সুস্পষ্টভাবে 'আমি রাজি আছি' বলবে কিংবা এমন লক্ষণ পাওয়া যাবে যা সম্মতি বুঝায়। যেমন– বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীর নিকট মহর পাঠিয়ে দিয়েছে, কিংবা বন্ধুদেরকে দাওয়াত খাওয়ানো শুরু করে দিয়েছে, কিংবা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছে। এ সকল কার্য দ্বারা সম্মতি বুঝা যায়। তাই প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে পূর্ব বিবাহিতা দাসী যার সাথে স্বামী বালেগ হওয়ার পূর্বে সহবাস করেছে তার ক্ষেত্রেও নীরবতা যথেষ্ট হবে না; বরং সুস্পষ্টভাবে নীরবতা প্রকাশ করবে কিংবা তার থেকে এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যাবে যা দ্বারা সম্মতি বুঝা যায়। সম্পূর্ণতার দলিল হলো, এ অবস্থাকে বিবাহের শুরুর অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে। আর কিয়াসের ব্যাখ্যা হলো, কুমারী নাবালেগা যখন বালেগ হলো এবং ওলী তার থেকে বিবাহের অনুমতি চাইল, তখন সে

কুমারী বালেগা নীরব থাকল, তবে তার এ নীরবতা সম্মতি বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে নাবালেগার যদি প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার থাকে এবং সে বালেগা হয়ে যায় এবং নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে তার এ নীরবতা সম্মতি হিসেবে পরিগণিত হবে– ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থাকে বিবাহের সূচনার অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে। এমনিভাবে বালক এবং পূর্ব বিবাহিতা দাসীর কাছে যখন বিবাহের অনুমতি চাওয়া হয় তখন তাদের উভয়ের নীরবতা সম্মতি বলে গণ্য হবে না; বরং মুখ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করতে হবে কিংবা সম্মতির কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া যেতে হবে। একই অবস্থা হবে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকারের সময় যে, তাদের নীরবতা সম্মতি হবে না; বরং মুখ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে কিংবা সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যেতে হবে। এ অবস্থাকে বিবাহের সূচনার অবস্থার উপর কিয়াস করা হবে।

وَخِيَارُ الْبُلُوْغِ فِىْ حَقِّ الْبِكْرِ الخ দ্বারা দ্বিতীয় মাসআলা (تَفْرِيْع) আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার কুমারীর ক্ষেত্রে মজলিস সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে না। মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মধ্যে নাবালেগা-বালেগা হয়েছিল। অর্থাৎ, যে মজলিসে প্রথমবার রক্ত দেখেছিল, অথচ বিবাহের সংবাদ পূর্ব থেকেই পৌছেছিল। কিংবা বালেগা পূর্বেই হয়েছিল, এখন মজলিসে বিবাহের সংবাদ পেল, তবে উভয় সুরতে নীরবতা প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে দেবে। পূর্ব বিবাহিতা ও বালকের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল হবে না; বরং মজলিসের বাইরেও প্রলম্বিত হবে। বিশেষ করে পূর্ব বিবাহিতার ক্ষেত্রে দলিল হলো, ছায়্যিবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার স্বামীর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। আর যে জিনিস স্বামীর সাবিত করা দ্বারার সাব্যস্ত হয় না তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকল। কারণ, যে সকল জিনিস অর্পণ করার (تَفْوِيْض) পর্যায়ের সেগুলো মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

قَوْلُهُ بَلْ لِتَوَهُّمِ الْخَلَلِ الخ : এর দ্বারা এমন দলিল বর্ণনা করা হয়েছে যা কুমারী ও বালক উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধীকার সাবিত হয় অসম্মতির মাধ্যমে বিঘ্ন ঘটার কারণে। আর যে জিনিস অসম্মতি দ্বারা সাবিত হয়, তা সম্মতির বিপরীত জিনিস পাওয়া যাওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু কুমারীর নীরবতা সম্মতির পরিচায়ক; বালকের নীরবতা সম্মতির পরিচায়ক নয়। সুতরাং কুমারীর ইচ্ছাধিকার নিছক নীরবতা দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আর বালকের নীরবতা মজলিস ছাড়াও বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ : এ ইবারত দ্বারা প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার ও স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকারের বিপরীত। কেননা, স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার মনিবের সাব্যস্ত করার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, আর তা হলো আজাদ করা। কারণ, মনিব যদি আজাদ না করত তবে আজাদকৃতার জন্য স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার প্রমাণিত হতো না। তাই এতে মজলিস বিবেচ্য হবে। কেননা, পূর্বে এ নীতি অতিবাহিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ইচ্ছাধিকার যা অন্যের সাবিত করার দ্বারা প্রমাণিত হয় তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন– ইচ্ছাধিকার প্রাপ্তার ইচ্ছাধিকারের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ তবে স্ত্রীর জন্য এ ইচ্ছাধিকার মজলিস সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। মজলিস সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ রহিতও করতে পারবে কিংবা বহালও রাখতে পারবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوْغِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, বালেগ হওয়ার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, সঙ্গমের পূর্বে কিংবা পরে– তা তালাক বলে বিবেচিত হবে না। দলিল হলো, বালেগ হওয়ার খেয়ার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকেও সহীহ আছে। আর স্ত্রীর হাতে তালাকের অধিকার নেই। সুতরাং যদি তালাক মেনে নেওয়া হয় তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকেও তালাক দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা ভুল। তালাক না হওয়ার ফায়দা দু সুরতে। প্রথম সুরত হলো, বিচ্ছেদ যদি সহবাসের পূর্বে হয় তবে স্বামীর উপর নির্ধারিত মহরের অর্ধেক মহর আবশ্যক হবে না। আর যদি তালাক হয় তবে অর্ধমহর ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো, বিচ্ছেদের পর যদি উভয়ে বিবাহ করে নেয় তাহলে স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে। আর যদি বিচ্ছেদ তালাক হয় তবে এখন স্বামী দ্বিতীয় বিবাহের পর দুই তালাকের মালিক হবে। এমনিভাবে স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকারের কারণে বিচ্ছেদ হলে তাকে তালাক বলা হবে না, পূর্বোক্ত দলিলের ভিত্তিতে। ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্ত মহিলার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, ইচ্ছাধিকারের কারণে বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। দলিল হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের কারণে তালাকের মালিক বানিয়েছে, স্বামী তালাকের মালিক ছিল। তাহলে যেন স্বামীই তালাক দিল, স্ত্রী তালাক দেয়নি।

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَرِثَهُ الْآخَرُ وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ قَبْلَ التَّفْرِيْقِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيْحٌ وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ بِهِ انْتَهٰى بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُوْلِيِّ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّهُ مَوْقُوْفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهٰهُنَا نَافِذٌ فَتَقَرَّرَ بِهِ ـ

অনুবাদ : বালেগ হওয়ার পূর্বে দুজনের একজন যদি মারা যায় তাহলে অপরজন তার ওয়ারিশ হবে। তদ্রূপ যদি বালেগ হওয়ার পর বিচ্ছেদের পূর্বে মারা যায়। কেননা, মূল আকদ তো বিশুদ্ধ আছে। আর সেই বিশুদ্ধ আকদ দ্বারা [সম্ভোগ অঙ্গের] যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে, তা মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। ফুযূল [ওলী বা উকিল নয় এমন তৃতীয় ব্যক্তি] কর্তৃক বিবাহ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনের একজন বিবাহ অনুমোদন করার পূর্বে মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বিবাহ স্থগিত থাকে। সুতরাং মৃত্যুর মাধ্যমে তা বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেখানে [অর্থাৎ অভিভাবকের বিবাহ প্রদানের ক্ষেত্রে] বিবাহ কার্যকর হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর মাধ্যমে তা স্থিতি লাভ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, প্রাপ্তবয়স্কতার স্বাধীনতা লাভের সূরতে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে বা পরে কাজির বিচ্ছেদ ঘটাবার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন মারা যায় তাহলে অপরজন তার ওয়ারিশ হবে। দলিল হলো, মূল আকদ তো সহীহ আছে। এ কারণে কাজির বিচ্ছেদ করার পূর্বে সহবাস করা হালাল। আর মূল আকদ দ্বারা যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তা মৃত্যুর কারণে সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। আর যে বস্তু তার প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায় তা দূরীভূত হয় না; বরং দৃঢ়তার সাথে সাবিত থাকে। এ কারণেই মৃত্যু হওয়ার সুরতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জান্নাতেও বহাল থাকবে। কিন্তু তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী জান্নাতে তালাকদাতা স্বামীর ভাগে জুটবে না। সুতরাং যখন মৃত্যু দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অটুট হলো তখন পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে কোনো ফুযূলী ব্যক্তি যদি পুরুষ-নারীর অনুমতি ছাড়াই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে কিংবা অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কোনো একজন মারা যায় তাহলে অপরজন উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবে না। কেননা, নিকাহে ফুযূলী স্বামী-স্ত্রীর অনুমতির উপর স্থগিত থাকে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যু দ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে, তাই উত্তরাধিকারিত্বও জারি হবে না। আর মতনের মাসআলায় বিবাহ কার্যকর হয়ে থাকে, তাই মৃত্যুর মাধ্যমে তা স্থিতি লাভ করবে।

قَالَ وَلَا وِلَايَةَ لِعَبْدٍ وَلَا صَغِيْرٍ وَلَا مَجْنُوْنٍ لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَاَوْلٰى اَنْ لَّا يَثْبُتَ عَلٰى غَيْرِهِمْ لِاَنَّ هٰذِهٖ وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَلَا نَظَرَ فِى التَّفْوِيْضِ اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلٰى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا وَلِهٰذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهٗ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَارَثَانِ اَمَّا الْكَافِرُ فَيَثْبُتُ لَهٗ وِلَايَةُ الْاِنْكَاحِ عَلٰى وَلَدِهِ الْكَافِرِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَلِهٰذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهٗ عَلَيْهِ وَيَجْرِىْ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাস কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি অভিভাবক হতে পারে না। কেননা, তাদের নিজেদের উপরই নিজেদের কোনো অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং অন্যের উপর অভিভাবকত্ব না থাকা আরো স্বাভাবিক। তাছাড়া এ অভিভাবকত্ব হলো কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য। আর অভিভাবকত্বের পর তাদের হাতে অর্পণ করায় কল্যাণ সংরক্ষিত হয় না। কোনো মুসলমানের উপর কোনো কাফেরের অভিভাবকত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন− وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا 'আল্লাহ কখনই মু'মিনের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো প্রাধান্যের পথ রাখেননি।' এ কারণেই মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না এবং একে অপরের ওয়ারিশ হয় না। তবে কাফের পিতার জন্য কাফের সন্তানকে বিবাহ দানের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন− وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ 'যারা কুফরি করেছে, তারা একে অপরের অভিভাবক।' এ কারণেই কাফেরের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং উভয়ের মাঝে মিরাসও কার্যকর হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا وِلَايَةَ لِعَبْدٍ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, দাস, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির কোনো অভিভাবকত্ব নেই। দলিল হলো, সংক্রমিত অভিভাবকত্ব (اَلْوِلَايَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ) অসম্পূর্ণ অভিভাবকত্বের শাখা (فَرْعٌ)। সুতরাং যার নিজের উপরই অভিভাবকত্ব নেই, সে অবশ্যই অন্যের অভিভাবকত্ব লাভ করবে না। তাই উপরিউক্ত তিনজনের যেহেতু নিজেদের উপরই অভিভাবকত্ব নেই তাই অন্যের উপরও অভিভাবকত্ব লাভ করবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো স্নেহ-সোহাগের উপর, তাই যদি তাদের উপর বিবাহের বিষয়াদি সোপর্দ করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে কোনো স্নেহ-আদর পাওয়া যাবে না। কারণ, শিশু এবং মাতাল ব্যক্তি তো কুফু অর্জন করা থেকে অপারগ, আর গোলাম মনিবের খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে কুফু লাভ করতে পারে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফেরদেরও মুসলমানদের উপর অভিভাবকত্ব নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো প্রাধান্যের পথ রাখেননি। এখানে سَبِيْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরয়ী অধিকার। আর যেহেতু কাফেরদের মুসলমানদের উপর অভিভাবকত্ব নেই, তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না এবং কাফির মুসলমানদের ওয়ারিশও হবে না এবং মুসলমানও কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। তবে কাফের তার নিজের কাফের সন্তানের অভিভাবকত্ব লাভ করবে। আর এ কথাটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত অর্থাৎ, কাফের পরস্পর-পরস্পরের অভিভাবক। এজন্যই কাফেরের সাক্ষী অপর কাফেরের বিরুদ্ধে কবুল করা হবে এবং তাদের পরস্পর মিরাসও কার্যকর হয়।

وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْاَقَارِبِ وِلَايَةُ التَّزْوِيْجِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا تَثْبُتُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِيْ ذٰلِكَ مُضْطَرِبٌ وَالْاَشْهَرُ اَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَهُمَا مَا رَوَيْنَا وَلِاَنَّ الْوِلَايَةَ اِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفْوِ اِلَيْهَا وَاِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ وَالنَّظْرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفْوِيْضِ اِلٰى مَنْ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِالْقَرَابَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الشَّفْقَةِ وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا يَعْنِيْ الْعَصَبَةَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ اِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِيْ اَعْتَقَهَا جَازَ لِاَنَّهُ اٰخِرُ الْعَصَبَاتِ ـ وَاِذَا عُدِمَ الْاَوْلِيَاءُ فَالْوِلَايَةُ اِلَى الْاِمَامِ وَالْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ـ

অনুবাদ : আসাবা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরও বিবাহ দানের অভিভাবকত্ব রয়েছে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। অর্থাৎ আসাবা না থাকা অবস্থায় এ হুকুম হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের জন্য অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। আর এটা হলো কিয়াসের দাবি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত দ্বিধান্বিত। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সঙ্গে রয়েছেন। সাহেবাইনের দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো আত্মীয়তাকে অসমপাত্র বা পাত্রীর সম্পৃক্ততা থেকে রক্ষা করা। আর এ সংরক্ষণ দায়িত্ব আসাবাদের উপর অর্পিত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, এ অভিভাবকত্ব হলো কল্যাণ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। আর এ লক্ষ্য ঐ ব্যক্তির উপর অর্পণের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে, যে এমন আত্মীয়তা সম্পর্কে সম্পৃক্ত, যা স্নেহ-মমতা উদ্রেককারী। যে নারীর অভিভাবক নেই, অর্থাৎ আত্মীয়তার দিক থেকে কোনো আসাবা নেই, তাকে যদি তার আজাদকারী মনিব বিবাহ দান করে তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা, আজাদকারী মনিবই হচ্ছে শেষ আসাবা। যদি কোনো অভিভাবকই না থাকে তাহলে তার অভিভাবকত্ব অর্পিত হবে ইমাম ও প্রশাসকের উপর। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কোনো অভিভাবক নেই তার অভিভাবক হলেন শাসক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْاَقَارِبِ الخ : মাসআলা : আসাবার অবর্তমানে অভিভাবকত্ব কার জন্য সাবিত হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, আসাবা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অভিভাবকত্ব সাবিত হবে। যেমন— মামা, চাচা, খালা, ফুফু ইত্যাদি। ইমাম সাহেবের এ মাযহাব সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, আসাবা ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অভিভাবকত্ব সাবিত হবে না। এ হলো কিয়াসের দাবি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত দ্বিধান্বিত। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সঙ্গে রয়েছেন। সাহেবাইনের দলিল হলো, উপরে বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ- اَلنِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ এখানে اَلِفْ لَامْ হলো جِنْس -এর জন্য। এখন হাদীসের এ অর্থ দাঁড়াবে যে, جِنْس نِكَاحْ সোপর্দ হবে جِنْس عَصَبَاتْ -এর উপর। এছাড়া অন্যদের এতে কোনো দখল নেই।

দ্বিতীয় দলিল হলো, [আকলী দলিল] অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো আত্মীয়তাকে রক্ষা করা, যাতে আত্মীয়তার দিকে অসমপাত্র যুক্ত না হতে পারে। আর এটি সংরক্ষণ হবে আসাবার উপর সোপর্দ করার দ্বারা। এজন্য অভিভাবকত্বের অধিকার শুধু আসাবার জন্য হবে; অন্য কারো জন্য হবে না।

ইমাম সাহেবের দলিল হলো, অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো স্নেহ-মমতার উপর। আর এ স্নেহ-মমতা ঐ ব্যক্তির উপর অর্পণের দ্বারাই সাব্যস্ত হবে, যে এমন আত্মীয়তা সম্পর্কে সম্পৃক্ত যা স্নেহ-মমতা উদ্রেককারী। সুতরাং যার মধ্যে এমন আত্মীয়তা পাওয়া যাবে সে-ই অভিভাবকত্বের অধিকার লাভ করবে। সে আসাবা হোক বা অন্য কেউ হোক। তাদের পেশকৃত হাদীস অর্থাৎ- اَلنِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ -এর জবাব হলো, আসাবাগণ উপস্থিত থাকলে বিবাহের দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পিত হবে। তাই তাদের অবর্তমানে অন্যান্য আসাবাকে বিলুপ্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কার ওলী না থাকে অর্থাৎ, আত্মীয়তার দিক থেকে কোনো আসাবা না থাকে এবং তার বিবাহ আজাদকারী মনিব দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা, সে হলো সর্বশেষে আসাবা। আর যদি কোনো ওলীই না থাকে- আসাবাও না, আছাবা ছাড়া অন্য কেউও নয়, বংশীয় বা অবংশীয়ও নয়, তাহলে তার অভিভাবকত্ব অর্পিত হবে ইমাম ও প্রশাসকের উপর। ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খলীফাতুল মুসলিমীন, আর হাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার স্থলবর্তী, কিংবা হাকিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাজি। কিন্তু কাজির বিবাহের অভিভাবকত্ব তখন অর্জন হবে, যখন খলীফাতুল মুসলিমীন তাকে এর অধিকার দিয়ে থাকবেন। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণী- যার কোনো অভিভাবকত্ব নেই তার অভিভাবক হলেন শাসক।

فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوزُ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِغَيْبَتِهِ وَلِهٰذَا لَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ جَازَ وَلَا وَلَايَةَ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وَلَايَتِهِ وَلَنَا أَنَّ هٰذِهِ وَلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ التَّفْوِيضُ إِلٰى مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ فَفَوَّضْنَاهُ إِلَى الْأَبْعَدِ.

অনুবাদ : নিকটতম অভিভাবক যদি যোগাযোগহীন অবস্থায় গায়েব থাকে তাহলে [তার চেয়ে] দূরবর্তী অভিভাবক তাকে বিবাহ দান করতে পারে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কেননা, নিকটতম অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কারণ আত্মীয়তাকে [অসম পাত্র বা পাত্রীর সম্পৃক্ততা থেকে] রক্ষার উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তার অনুপস্থিতির কারণে তা বাতিল হতে পারে না। এ কারণেই নিকটতম অভিভাবক যেখানে রয়েছে, সেখানে যদি সে তাকে বিবাহ দেয় তাহলে তা জায়েজ। আর তার অভিভাবকত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তো দূরতম ব্যক্তির অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো, অভিভাবকত্বের উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ সংরক্ষণ, আর যার সুচিন্তিত মতামত থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়, তার উপর অভিভাবকত্ব অর্পণের দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। তাই আমরা দূরতম অভিভাবকের উপর তা অর্পণ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ الخ : পূর্বে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছিলেন যে, নিকটতম অভিভাবক থাকলে দূরতম অভিভাবক বঞ্চিত হয়ে যায়। তার থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাটি বের হয়েছে। মাসআলা হলো, নিকটতম ওলী যেমন পিতা স্থায়ীভাবে গায়েব হয়ে গেল, তখন দূরতম ওলী যেমন দাদা তার জন্য বিবাহের অভিভাবক সাব্যস্ত হবে কিনা অর্থাৎ, নিকটতর ওলীর অবর্তমানে দূরতম ওলী বিবাহ দেওয়ার অধিকার লাভ করবে কিনা ? তার বিবাহ দেওয়া জায়েজ হবে কিনা? আমাদের মতে তো জায়েজ, কিন্তু ইমাম যুফার (র.) নাজায়েজ বলেন। তাঁর দলিল হলো, নিকটতম ওলীর অভিভাবকত্ব তো বিদ্যমান আছে। কেননা, আত্মীয়তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়েছে, তাই নিকটতর ওলীর গায়েব হওয়ার দ্বারা তার অভিভাবকত্ব বাতিল হয় না। এ কথাটির সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, নিকটতম ওলী যদি সফরে থাকা অবস্থায় নাবালিকার বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে এ বিবাহ শরয়ীভাবে জায়েজ হবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, নিকটতম ওলীর অভিভাবকত্ব বহাল থাকে। অন্যথায় তার দেওয়া বিবাহ জায়েজ হতো না। আর যখন নিকটতম ওলীর অভিভাবকত্ব বহাল আছে, দূরতম ওলীর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। কারণ নিকটতম ওলীর অভিভাবকত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দূরতম ওলী বঞ্চিত হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো, অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো কল্যাণ সংরক্ষণের উপর। আর যার মতামত দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয় তার উপর বিবাহের বিষয় অর্পণ করা দ্বারা কোনো কল্যাণ সংরক্ষণ হবে না। এজন্য আমরা বিবাহকে দূরতম ওলীর উপর অর্পণ করেছি। আর আমাদের মতে দূরতম ওলী ইমাম ও হাকিমের উপর অগ্রগণ্য। যেমন– যদি নিকটতম ওলী মারা যায়।

وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلْطَانِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْأَقْرَبُ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مَنْعٌ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ نَقُولُ لِلْأَبْعَدِ بُعْدُ الْقَرَابَةِ وَقُرْبُ التَّدْبِيرِ وَلِلْأَقْرَبِ عَكْسُهُ فَنَزَلَا مَنْزِلَةَ وَلِيَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ وَلَا يُرَدُّ وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ وَقِيلَ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِأَقْصَاهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقِيلَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَفُوتُ الْكُفُوُ بِاسْتِطْلَاعِ رَأْيِهِ وَهٰذَا أَقْرَبُ إِلَى الْفِقْهِ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا ابْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَبُوهَا ، لِأَنَّهُ أَوْفَرُ شَفَقَةً مِنَ الْإِبْنِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ، وَهٰذِهِ الْوِلَايَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ، كَأَبِ الْأُمِّ مَعَ بَعْضِ الْعَصَبَاتِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : আর দূরতম অভিভাবক শাসকের চেয়ে অগ্রগণ্য; যেমন– নিকট অভিভাবকের মৃত্যুর বেলায় হয়ে থাকে। যদি নিকটতম অভিভাবক তার অবস্থান থেকে তাকে বিবাহ দেয় তাহলে [তা কায়েম হওয়ার] ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। আর তা মেনে নিলেও আমরা বলব, দূরতম অভিভাবকের ব্যাপারে আত্মীয়তার দূরত্ব থাকলেও ব্যবস্থা গ্রহণের নৈকট্য রয়েছে। আর নিকটতম অভিভাবকের অবস্থা এর বিপরীত। এ কারণে উভয় সমপর্যায়ের ওলীর স্তরে উপনীত হয়। সুতরাং উভয়ের যে কেউ আকদ সম্পন্ন করলে তা কার্যকর হবে; রদ করা হবে না। যোগাযোগহীন অবস্থায় গায়েব থাকার অর্থ এমন কোনো শহরে থাকা, [যেখানে বাণিজ্য ইত্যাদির] কাফেলা বছরে একবারের বেশি যায় না। এ মত ইমাম কুদূরী (র.) গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে, সফরের নিম্ন সময়ের দূরত্ব হলো মাপকাঠি। কেননা, সফরের সর্বোচ্চ সময়ের কোনো সীমা নেই। পরবর্তীকালের কোনো কোনো মাশায়েখ এ মত গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো মতে মাপকাঠি হলো এমন দূরত্বে থাকা যে, তার মতামত জানার অপেক্ষায় [বিলম্বের কারণে] সমপাত্র হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এটা হলো [চিন্তাধারার] অধিকতর নিকটবর্তী। কেননা এমতাবস্থায় তার অভিভাবকত্ব অব্যাহত রাখার দ্বারা তার কল্যাণ সংরক্ষিত হয় না। বিকৃত-মস্তিষ্ক নারীর পিতা ও পুত্র উভয়ে যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে বিবাহ দানের ক্ষেত্রে তার পুত্র হলো তার অভিভাবক। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার পিতাই হলো অভিভাবক। কেননা পুত্রের চেয়ে পিতার স্নেহ অধিকতর। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, আসাবা হিসেবে পুত্র পিতার চেয়ে অগ্রগণ্য। আর এ অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো আসাবা হওয়ার উপর। স্নেহের আধিক্যের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। যেমন– কোনো কোনো আসাবার তুলনায় নানা [এর স্নেহ অধিক থাকা সত্ত্বেও]। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّلْطَانِ الخ : এ ইবারতটি দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কেননা, তিনি বলেন, নিকটতম ওলী যদি মারা যায় তাহলে অভিভাবকত্ব দূরতম ওলীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না; বরং তখনকার শাসকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এমনিভাবে যদি নিকটতম ওলী গায়েব হয়ে যায় তখনও তাঁর মতে তখনকার শাসকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কিন্তু আমাদের মতে দূরতম ওলী তখনকার শাসকের উপর অগ্রগণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর মত وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ الخ -এর জবাব হলো, আমরা এ কথা মানি না যে, "নিকটতম ওলী যেখানে থাকবে সেখান থেকে বিবাহ দিলে বিবাহ হয়ে যাবে" বরং আমাদের মতামত হলো, বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তাই এ মাসআলাটিকে দলিল হিসেবে পেশ করা সমীচীন হবে না। আর যদি আমরা মেনেও নেই যে, নিকটতম ওলীর গায়েব থাকা অবস্থায়ও বিবাহ দেওয়া জায়েজ হয়ে গেল তবে তার কারণ হলো, নিকটতম ওলী ও দূরতম ওলী উভয়ের মাঝে একটি একটি করে ভালাই ও খারাবি রয়েছে। কেননা, দূরতম ওলীর মধ্যে আত্মীয়তার দূরত্ব এবং ব্যবস্থা গ্রহণের নৈকট্য রয়েছে। আর নিকটতর ওলীর মধ্যে আত্মীয়তার নৈকট্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দূরত্ব রয়েছে। সুতরাং তারা উভয়ে এমন হলো– যেমন একই পর্যায়ের দুজন ওলী। আর নীতিমালা রয়েছে যে, একই সম্মানের যদি দুজন ওলী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে-ই বিবাহ প্রদান করবে তা কার্যকর হয়ে যাবে; রদ করা যাবে না। এমনিভাবে এখানেও যে আকদ করবে তা কার্যকর হয়ে যাবে। তাই নিকটতম ওলীর দেওয়া বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُونَ الخ : গ্রন্থকার উপরিউক্ত ইবারতে যোগাযোগহীন অবস্থায় গায়েব থাকা (اَلْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ) -এর ব্যাখ্যা করছেন। এ ব্যাপারে ইমাম কুদূরী (র.) -এর পছন্দনীয় মাযহাব হলো, মানুষ এমন কোনো শহরে চলে যায় যেখানে বাণিজ্য কাফেলা বছরে একবারের বেশি যায় না।

কোনো কোনো মাশায়েখের মত এই যে, সফরের নিম্ন সময়ের দূরত্ব তথা তিনদিনের দূরত্বে চলে যাওয়ার দ্বারা اَلْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা সফরের সর্বোচ্চ সময়ের কোনো সীমা নেই। তাই সফরের সর্বনিম্ন সময় মাপকাঠি হবে। কারো কারো যেমন শামসুল আইম্মা আস্ সারাখ্সীর মত হলো, অভিভাবক এমন স্থানে চলে যাওয়া যেখানে তার মতামত আনতে গেলে সমপাত্র [কুফূ] হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তবে এ ধরনের সুরতে اَلْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ সাব্যস্ত হবে। এ মতটি ফিকহী দলিল-প্রমাণাদির অধিক নিকটবর্তী। কেননা কুফূ ফউত হওয়া সত্ত্বেও তার অভিভাবকত্ব বহাল থাকার মধ্যে কোনো কল্যাণ সংরক্ষিত নেই। অথচ অভিভাবকত্বের ভিত্তিই হলো কল্যাণ সংরক্ষণের উপর। এ কারণে জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো অভিভাবক যদি কোনো শহরে লুকিয়ে থাকে আর তার ব্যাপারে কারো কোনো কিছু জানা না থাকে তবে এটিই اَلْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا الخ : মাসআলা : এক বিকৃত-মস্তিষ্ক নারীর পিতা আছে এবং পূর্বের স্বামীর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেও আছে তবে তার বিবাহের অভিভাবকত্ব কার অর্জন হবে– এ পর্যায়ে শায়খাইনের মাযহাব হলো, অভিভাবকত্ব পুত্রের হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাব হলো, অভিভাবকত্ব পিতার হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, পিতার মধ্যে পুত্রের তুলনায় স্নেহ অধিকতর। আর তার অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো স্নেহের উপর। তাই অধিক স্নেহের কারণে পিতার অভিভাবকত্ব হবে; পুত্রের নয়। শায়খাইনের দলিল হলো, আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে পুত্র হলো অগ্রগণ্য। তাইতো পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পিতা এক ভাগের ছয়ভাগ পায়, আর পুত্র আসাবা হয়ে যায়। আর এ অভিভাবকত্বের ভিত্তি হলো আসাবা হওয়ার উপর। তাই পুত্রই অভিভাবক হবে; পিতা হবে না। আর স্নেহ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর পেশকৃত দলিলের জবাব হলো, অভিভাবকত্বের মধ্যে নিছক স্নেহই হলো বিবেচ্য; অধিক স্নেহ বিবেচ্য নয়। যেমন– কারো নানা আছে এবং চাচাত ভাই ও ভাতিজা আছে, তবে অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে চাচাত ভাই ভাতিজার উপর অগ্রগণ্য হবে। অথচ নানার মধ্যে স্নেহ ও মমতা অধিক। সুতরাং বুঝা গেল, অধিক স্নেহ বিবেচ্য নয়। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ

اَلْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ اِلَّا الْاَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوَّجْنَ اِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ وَلِاَنَّ اِنْتِظَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِيَيْنِ عَادَةً لِاَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَاْبَى اَنْ تَكُوْنَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسِيْسِ فَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ جَانِبِهَا لِاَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشٌ فَلَا تُغِيْظُهُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ وَاِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْوٍ فَلِلْاَوْلِيَاءِ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ اَنْفُسِهِمْ.

অনুচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর কুফূ

অনুবাদ : বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর কুফূ বিবেচ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ اِلَّا الْاَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوَّجْنَ اِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ. "সাবধান! ওলী ছাড়া কেউ যেন নারীদের বিবাহ না দেয়। আর এজন্য যে, সাধারণত! দুই সমকক্ষ পাত্র-পাত্রীর মাঝেই [বিবাহের উদ্দিষ্ট] সুষ্ঠুরূপে কল্যাণ সম্পন্ন হয়। কেননা, ভদ্র মহিলা নিম্নশ্রেণীর লোকের "শয্যাসঙ্গিনী হওয়া পছন্দ করে না। সুতরাং [স্বামীর দিক থেকে] বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। স্ত্রীর দিক থেকে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বামী হলো শয্যা ব্যবহারকারী, ফলে শয্যার নিকৃষ্টতা তাকে বিরক্ত করে না। নারী যদি নিজেই অসম পাত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অধিকার ওলীর রয়েছে। যেন তারা নিজেদের থেকে অপমানের ক্ষতি দূর করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ الخ : কুফূ হওয়া (كَفَاءَتْ) -এর অর্থ হলো সমান-সমান, সমসাময়িক, বরাবর, অনুরূপ, উপযুক্ত। সমান বিবাহের ক্ষেত্রে কুফূ হওয়া (اَلْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ)-এর অর্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর বরাবর হওয়া। তবে বংশকুল, জাতিকুল, জাতিধর্ম, বয়স এবং রূপ ইত্যাদির মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে কুফূর বিবেচনা এজন্য করা হয় যে, যাতে অভিভাবকদের বিবাহ বিলুপ্তির অধিকার খর্ব হয়ে বিবাহ অবধারিত হয়ে যায়। বিবাহের মধ্যে কুফূ বিবেচ্য হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– খবরদার! ওলী ছাড়া কেউ যেন নারীদের বিবাহ না দেয় এবং কুফূ ছাড়া তাদেরকে বিবাহ না দেওয়া হয়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, উক্ত হাদীস, দলিলযোগ্য নয়। কেননা, এর কোনো কোনো বর্ণনাকারী মিথ্যা দ্বারা অভিযুক্ত। অধিকতর সহীহ হাদীস হলো হযরত আলী (র.)-এর হাদীস, যা ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মমার্থ হলো, তিনটি জিনিসে বিলম্ব করা যায় না– ১. যখন নামাজের ওয়াক্ত হয়, ২.যখন জানাজা উপস্থিত হয়, ৩.স্বামীহীন নারীর যখন কুফূ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত আকলী দলিল হলো, বিবাহ-শাদির কিছু কল্যাণকর বিষয় রয়েছে। আর এগুলি তখনই পূর্ণরূপে অর্জিত হবে যখন বিবাহ দুই সমকক্ষের মধ্যে সাধিত হবে। এজন্য আমরা বলেছি যে, বিবাহের কল্যাণগুলো অর্জন করার জন্য কুফূ হওয়া একান্ত জরুরি। কারণ, অভিজাত পরিবারের কোনো নারী নিম্নশ্রেণীর পরিবারের পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া পছন্দ করবে না, তাই কুফূর বিবেচনা করা জরুরি, তবে নারীর দিক থেকে কুফূর বিবেচনা করা জরুরি নয়।

অর্থাৎ পুরুষ যদি অভিজাত পরিবারের হয় আর স্ত্রী নিম্ন খান্দানের হয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, স্বামী হলো শয্যা ব্যবহারকারী, ফলে শয্যার নিকৃষ্টতা তাকে বিরক্ত করে না।

নারী যদি নিজেই অসম পাত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তার ওলীদের বিবাহ বিলুপ্ত করার অধিকার রয়েছে। যেন নিজেদের উপর থেকে অপমানের ক্ষতি দূর হয়ে যায়। তবে এই বিচ্ছিন্ন করার অধিকার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ওলীদের বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার থাকবে না।

ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِى النَّسَبِ لِاَنَّهُ يَقَعُ بِهِ التَّفَاخُرُ فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ وَالْمَوَالِى بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيْمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا رَوَيْنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَسَبًا مَشْهُوْرًا كَاَهْلِ بَيْتِ الْخِلَافَةِ كَاَنَّهُ قَالَ تَعْظِيْمًا لِلْخِلَافَةِ وَتَسْكِيْنًا لِلْفِتْنَةِ وَبَنُوْ بَاهِلَةَ لَيْسُوْا بِاَكْفَاءٍ لِعَامَّةِ الْعَرَبِ لِاَنَّهُمْ مَعْرُوْفُوْنَ بِالْخَسَاسَةِ ـ

অনুবাদ : কুফূ বিবেচনা করা হবে বংশের মধ্যে। কেননা, বংশ দ্বারা পরস্পর গর্ব হয়ে থাকে। সুতরাং কুরায়শ গোত্র পরস্পর কুফূ এবং আরবরা পরস্পর কুফূ। এ বিষয়ে মূল সূত্র হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী–

قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ وَالْمَوَالِى بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ ـ

'কুরায়শ গোত্র পরস্পর কুফূ। যে-কোনো শাখা অপর শাখার কুফূ। আর আরবরা পরস্পর কুফূ, যে-কোনো গোত্র অপর গোত্রের কুফূ। আর অনারব পরস্পর কুফূ। যে-কোনো লোক অপর লোকের কুফূ।' কুরায়শের মাঝে বংশের দিক থেকে পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য নয়। দলিল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি বিখ্যাত কোনো বংশ হয় তাহলে তা বিবেচ্য হবে। যেমন– খলিফা পরিবার। সম্ভবত: এটা তিনি বলেছেন খিলাফতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এবং ফিতনা নিরসনের জন্য। বাহেলীরা সাধারণ আরবের সমকক্ষ নয়। কেননা, হীনতার দিক দিয়ে তারা কুখ্যাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِى النَّسَبِ الخ : মাবসূত নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষের ক্ষেত্রে কুফূ বিবেচনা করা হবে বংশ, স্বাধীনতা, অর্থ, পেশা এবং জাতিকুলের মধ্যে। কেউ কেউ তাকওয়া, পিতার ইসলাম এবং জ্ঞানবান হওয়ারও শর্ত আরোপ করেছেন। মিনহাজুল আবেদীন –এ বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) কুফূ হওয়ার বিবেচনা করেন দোষত্রুটিমুক্তি, বংশ, স্বাধীনতা, পবিত্রতা এবং পেশার মধ্যে। ইমাম আহমদ (র.) [উপরিউক্ত শর্তাবলির সাথে] দীন ও মাযহাব -এর শর্তও আরোপ করেন। –[আইনী শরহে হিদায়া]

গ্রন্থকার (র.) বলেন, বংশের মধ্যে কুফূ বিবেচনা করা হবে। কেননা, বংশ দ্বারাও পরস্পর গর্ব করে থাকে। আর যে সকল জিনিস দ্বারা লোকেরা গর্ব করে থাকে তার মধ্যে কুফূর বিবেচনা করা হয়। তাই এক কুরায়শী অপর কুরায়শীর কুফূ হবে কুরায়শ ছাড়া এক আরব অপর আরবের কুফূ হবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'কুরায়শ একজন অপরজনের কুফূ, এক শাখা অপর শাখার। আরবরা পরস্পর কুফূ –এক গোত্র অপর গোত্রের। অনারব একে অপরের কুফূ –এক পুরুষ অপর পুরুষের।' কুরায়শের মাঝে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য নয়। দলিল হলো উপরে বর্ণিত হাদীসটি। তাই

প্রত্যেক কুরায়শী একে অপরের কুফূ হবে। কেননা, হাদীসের বাণী– اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ -এর কারণে প্রত্যেক কুরায়শীর মাঝে খেলাফতের যোগ্যতা অতিভাবকত্ব রয়েছে। তবে কুরায়শ ব্যতীত অন্য আরবরা কুরায়শের কুফূ হতে পারে না। কেননা, কুরায়শ ব্যতীত অন্য আরবদের মাঝে খেলাফতের যোগ্যতা নেই। সুতরাং কুরায়শ ছাড়া অন্যান্যরা কুরায়শের সমকক্ষ নয়, তাই কুফূও হতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কুরায়শের মধ্যে পরস্পর একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হ্যাঁ, তবে যদি কোনো বংশ বিখ্যাত হয়; যেমন– খেলাফতের খান্দান। সুতরাং ঐ প্রসিদ্ধ খান্দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য হবে। তাই কুরায়শের মধ্য থেকে খেলাফতের খান্দানের কন্যা অন্য কুরায়শ যারা খেলাফতের খান্দান নয় তাদের কুফূ নয়। এ কারণেই কুরায়শী বালেগা কন্যা যারা খেলাফতের খান্দানের সে যদি এমন কুরায়শে বিবাহ করে যে খেলাফতের খান্দানের নয় তাহলে অভিভাবকদের বিবাহ বিলুপ্তি করার অবকাশ থাকবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর প্রসিদ্ধ বংশের কথা বিশেষভাবে বলা সম্ভবত এ কারণে যে, তাঁর দৃষ্টিতে খেলাফতের খান্দানের মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং ফিতনা দূর করা। পরিশেষে বলেন, আরবের একটি খান্দান আছে বনু বাহেলা, তারা সাধারণ আরবদের কুফূ হবে না। কেননা, তাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, তারা মৃতের হাড় নিয়ে তা জোশ দেয় এবং সেগুলোর চর্বি গ্রহণ করে। সুতরাং তারা সাংঘাতিক ধরনের হীন। তাই তাদেরকে সাধারণ আরবদের কুফূ করা যাবে না।

ফায়দা : কুরায়শ তাদেরকে বলা হয় যারা নযর ইবনে কিনানার বংশধর। আর যারা নযর ইবনে কিনানার বংশধর নয় তারা কুরায়শ নয়।

হযরত যোবায়ের ইবনে বাক্কার (র.) বলেন, আরবের ছয়টি স্তর রয়েছে। শু'আব, কবীলা, উমারাহ, বাত্বন, ফাখিয, ফাসীলা। শু'আব হলো সবচেয়ে উপরের স্তর, যা অনেকগুলো কবীলার সমষ্টি, আর কবীলা সমষ্টি হলো উমারার, আর উমারাহ বতনের, আর বতন ফাখিযের, আর ফাখিয ফাসায়িলের। সুতরাং মুযার ও রবী'আ হলো শুআব, আর কিনানা হলো কবীলা, কুরায়শ হলো উমারাহ, কুসাই হলো বতন, হাশিম হল ফাখিয, আর আব্বাস হলো ফাসীলা। –[আইনী শরহে হিদায়া]

وَاَمَّا الْمَوَالِيْ فَمَنْ كَانَ لَهُ اَبَوَانِ فِي الْاِسْلَامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْاَكْفَاءِ يَعْنِيْ لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ فِيْهِ وَمَنْ اَسْلَمَ بِنَفْسِهِ اَوْ لَهُ اَبٌ وَاحِدٌ فِي الْاِسْلَامِ لَا يَكُوْنُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ اَبَوَانِ فِي الْاِسْلَامِ لِاَنَّ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْاَبِ وَالْجَدِّ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اَلْحَقَ الْوَاحِدَ بِالْمُثَنّٰى كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي التَّعْرِيْفِ وَمَنْ اَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَا يَكُوْنُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ اَبٌ وَاحِدٌ فِي الْاِسْلَامِ لِاَنَّ لِلتَّفَاخُرِ فِيْمَا بَيْنَ الْمَوَالِيْ بِالْاِسْلَامِ وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ نَظِيْرُهَا فِي الْاِسْلَامِ فِيْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَا لِاَنَّ الرِّقَّ اَثَرُ الْكُفْرِ وَفِيْهِ مَعْنَى الذُّلِّ فَيُعْتَبَرُ فِيْ حُكْمِ الْكَفَاءَةِ .

অনুবাদ : অনারবদের ক্ষেত্রে যারা দুই বা অধিক পুরুষ ধরে মুসলমান তারা পরস্পর কুফূ। অর্থাৎ, যারা কয়েক পুরুষ ধরে মুসলমান তাদের। আর যে ব্যক্তি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা তার এক পুরুষ [অর্থাৎ, শুধু পিতা] মুসলমান, সে ঐ ব্যক্তির কুফূ নয়, যার দুই পুরুষ মুসলমান। কেননা বংশ পরিচয়ের পূর্ণতা লাভ হয় বাবা ও দাদা দ্বারা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এক পুরুষকে দুই পুরুষের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেমন– [সাক্ষ্য] পরিচিতির ক্ষেত্রে এটা তাঁর মাযহাব। যে ব্যক্তি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে ঐ ব্যক্তির কুফূ হবে না, যার এক পুরুষ ধরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অনারবদের মাঝে ইসলামই হলো গর্বের বিষয়। স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে কুফূর বিবেচনা ইসলামের ক্ষেত্রে কুফূর সাথে তুলনীয়, ঐ সকল প্রকারে যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। কেননা দাসত্ব হলো কুফরির ফল। আর তাতে জিল্লতীর মর্ম বিদ্যমান। সুতরাং কুফূ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمَوَالِيْ فَمَنْ كَانَ لَهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে অনারবদের কুফূ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই গ্রন্থকার (র.) বলেন, যার পিতা ও দাদা-উভয়ে মুসলমান, তার কুফূ হবে যার পিতা, দাদা এবং পরদাদা এবং তার উপরের লোকেরাও মুসলমান ছিল। আর যে ব্যক্তি নিজেতো মুসলমান, কিন্তু পিতা মুসলমান নয়। কিংবা নিজেও মুসলমান এবং পিতাও মুসলমান, কিন্তু দাদা মুসলমান নয় তাহলে এ ব্যক্তি তার কুফূ হবে না যার পিতা এবং দাদা উভয়ে মুসলমান। কেননা বংশের পরিপূর্ণতা পিতা এবং দাদা উভয়ের দ্বারা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এককে দুইয়ের উপর কিয়াস করেন। মূল মতবিরোধ তো হলো [সাক্ষ্য] পরিচিতির মধ্যে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সাক্ষ্য ইত্যাদির মধ্যে সাক্ষীর পরিচিতি তার এবং তার পিতার নাম উল্লেখ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। দাদার নাম উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। তরফাইনের মতে পরিচিতির ক্ষেত্রে পিতা এবং দাদা উভয়ের নাম উল্লেখের প্রয়োজন আছে।

আর যে ব্যক্তি নিজে মুসলমান, কিন্তু পিতা মুসলমান নয় সে তার কুফূ হবে না যার পিতাও মুসলমান। কেননা অনারব লোকেরা ইসলামের দ্বারাও পরস্পর গর্ব করেন।

قَوْلُهُ وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ نَظِيْرُهَا الخ : স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে কুফূ হওয়ার হুকুম এমন যেমন ইসলামের মধ্যে। সারাংশ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি নিজেও আজাদ হয় আর তার পিতা ও দাদাও আজাদ হয়, তবে এ ব্যক্তি তার কুফূ হবে যার অনেক পূর্বপুরুষ আজাদ। যেমন– পিতাও আজাদ, দাদাও আজাদ এবং পরদাদাও আজাদ। অন্যান্য সুরতগুলোকে এরই উপর কিয়াস করা হবে কুফূ হওয়ার মধ্যে স্বাধীন হওয়ার বিবেচনা করার ক্ষেত্রে। দলিল হলো, দাসত্ব হলো কুফরির ফল তথা কুফরিই সুতরাং যেমনিভাবে কুফর ও ইসলামের মধ্যে কুফূ হয় না তেমনিভাবে স্বাধীন হওয়া ও দাসত্বের মাঝেও কুফূ হবে না। দ্বিতীয় দলিল হলো, দাসত্বের মাঝে লাঞ্ছনার মর্ম আছে। আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে মর্যাদার মর্ম আছে এ কারণেই কুফূ হওয়ার হুকুমের মধ্যে তারই বিবেচনা করা হবে।

قَالَ وَتُعْتَبَرُ اَيْضًا فِى الدِّيْنِ اَىْ الدِّيَانَةِ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهٗ مِنْ اَعْلَى الْمَفَاخِرِ وَ الْمَرْأَةُ تُعَيَّرُ بِفِسْقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعَيَّرُ بِضَعَةِ نَسَبِهٖ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا يُعْتَبَرُ لِاَنَّهٗ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ فَلَا تَبْتَنِىْ اَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ اِلَّا اِذَا كَانَ يُصَفَّعُ وَيُسْخَرُ مِنْهُ اَوْ يُخْرَجُ اِلَى الْاَسْوَاقِ سَكْرَانَ وَيَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ لِاَنَّهٗ مُسْتَخَفٌّ بِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ধার্মিকতায় অর্থাৎ দীনদারির ব্যাপারেও কুফূ বিবেচনা করা হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। এটাই বিশুদ্ধ। কেননা, দীনদারি হলো সর্বোত্তম গর্বের বিষয়। আর স্ত্রীকে স্বামীর বংশ-নীচতার চেয়ে বেশি লজ্জা দেওয়া হয় স্বামীর ফাসেকীর কারণে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দীনদারি কুফূ হিসেবে বিবেচ্য নয়। কেননা, তা হলো আখিরাতের বিষয়। সুতরাং এর উপর দুনিয়ার হুকুমের ভিত্তি হতে পারে না। তবে যদি বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, মানুষ তাকে চড়-থাপ্পড় লাগায়, উপহাস করে কিংবা সে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় বের হয় আর ছেলে-পেলেরা তাকে নিয়ে কৌতুক করে, তাহলে তা বিবেচ্য হবে। কেননা, এর ফলে তাকে একেবারে হীন গণ্য করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَتُعْتَبَرُ اَيْضًا فِى الدِّيْنِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দীনের মধ্যেও কুফূ বিবেচনা করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনদারি। অর্থাৎ তাকওয়া, পরহেজগারি, বিবেক, বিবেচনা, মতামত ও উত্তম চরিত্র। কারণ, দীন তথা ইসলাম তো সর্বজন স্বীকৃত বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত।

আমাদের আলোচনা হলো এ পর্যায়ে যে, বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর অভিভাবকদের অভিযোগ করার অধিকার আছে। মোদ্দা কথা, দীনদারির মধ্যে কুফূ বিবেচিত হওয়া শায়খাইনের মাযহাব। এর দলিল হলো, দীনদারি সর্বোত্তম গর্বের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ। দ্বিতীয় দলিল হলো, লোকেরা স্ত্রীকে তার স্বামীর বংশ-নীচতার কারণে যে পরিমাণ লজ্জা দেয় এর চেয়ে অধিক লজ্জা দেওয়া হয় স্বামীর ফাসেকীর কারণে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) দীনদারির মধ্যে কুফূর বিবেচনা করেন না। কেননা, দীনদারি হলো আখিরাতের বিষয়। তাই এর উপর দুনিয়ার হুকুমের ভিত্তি হতে পারে না। তবে কারো স্বামী যদি এ পরিমাণ ফাসেকীতে লিপ্ত হয়ে যায় যারা চায় তারাই তাকে চড়-থাপ্পড় লাগায়, লোকেরা উপহাস করে। মাতাল অবস্থায় লোকেরা তাকে বাজারে নিয়ে যায় যাতে ছেলে-পেলেরা তার সাথে কৌতুক করে। তাহলে এ ধরনের লোক সতী-সাধ্বী নারীর কুফূ হতে পারে না। কারণ এ লোক সাংঘাতিক ধরনের নিচু।

قَالَ وَتُعْتَبَرُ فِى الْمَالِ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَهٰذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَتّٰى اَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا اَوْ لَا يَمْلِكُ اَحَدَهُمَا لَا يَكُوْنُ كُفُوًا لِاَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَلَابُدَّ مِنْ اِيْفَائِهِ وَبِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الْاَزْدِوَاجِ وَدَوَامُهٗ وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوْا تَعْجِيْلَهٗ لِاَنَّ مَا وَرَاءَهٗ مُؤَجَّلٌ عُرْفًا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهٗ اِعْتَبَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ دُوْنَ الْمَهْرِ لِاَنَّهٗ تَجْرِىْ الْمُسَاهَلَةُ فِى الْمُهُوْرِ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ اَبِيْهِ فَاَمَّا الْكِفَاءَةُ فِى الْغِنٰى فَمُعْتَبَرَةٌ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) حَتّٰى اَنَّ الْفَائِقَةَ فِى الْيَسَارِ لَا يُكَافِيْهَا الْقَادِرُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِاَنَّ النَّاسَ يَتَفَاخَرُوْنَ بِالْغِنٰى وَيَتَعَيَّرُوْنَ بِالْفَقْرِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) لَا يُعْتَبَرُ لِاَنَّهٗ لَا ثَبَاتَ لَهٗ اِذِ الْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ .

অনুবাদ : আরো বলেন, আর্থিক ব্যাপারেও কুফূ বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ, স্বামীকে মহর আদায় ও ভরণ-পোষণের পরিমাণ অর্থের মালিক হতে হবে। জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটাই বিবেচ্য। সুতরাং যে এ দুটি কিংবা কোনো একটি পরিশোধের ক্ষমতা রাখে না, তাকে কুফূ গণ্য করা হবে না। কেননা মহর হলো সম্ভোগ অঙ্গের বিনিময়। সুতরাং তা পরিশোধ করা জরুরি। আর ভরণ-পোষণ দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের স্থিতি ও স্থায়িত্ব অর্পিত হয়। আর মহর দ্বারা ঐ পরিমাণ উদ্দেশ্য, যা নগদ আদায় করার রেওয়াজ রয়েছে। কেননা প্রচলিত রীতিতে বাকি অংশ দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শুধু ভরণ-পোষণের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন; মহরের বিষয়টি বিবেচনা করেননি। কেননা মহরের বিষয়ে শিথিলতা প্রচলিত রয়েছে। আর পিতার সচ্ছলতার কারণে পুত্রকে মহর আদায়ে সক্ষম গণ্য করা হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, সম্পদের ক্ষেত্রেও কুফূ বিবেচ্য। সুতরাং শুধু মহর আদায়ে ও ভরণ-পোষণে সক্ষম ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর সম্পদশালী নারীর কুফূ হতে পারে না। কেননা মানুষ সম্পদের প্রাচুর্যতা নিয়ে গর্ব করে এবং দারিদ্র্যের কারণে লজ্জাবোধ করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ধনাঢ্যতা বিবেচ্য নয়। কেননা, এর কোনো স্থিতি নেই। কারণ সম্পদ এমন বস্তু, যা সকালে আসে আর বিকেলে চলে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَتُعْتَبَرُ فِى الْمَالِ الخ : অর্থের মধ্যে কুফূ বিবেচ্য। অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামী ভরণ-পোষণ ও মহর আদায়ে সামর্থ্যবান হওয়া। এ কারণেই স্বামী যদি উভয়টির মালিক না হয় কিংবা দুটির একটির মালিক না হয় তাহলে সে কুফূ হতে পারবে না। যদিও নারী দরিদ্রই হোক। মহরের মালিক হওয়া এজন্য জরুরি যে, মহর হলো সম্ভোগ-অঙ্গের বিনিময়। তাই তা

আদায় করার উপর সামর্থ্যবান হওয়া জরুরি। আর ভরণ-পোষণ এ কারণে জরুরি যে, ভরণ-পোষণ দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও স্থায়ী থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, পুরুষ যদি মর্যাদাশীল হয় যেমন– হাকিম, আলেম, তাহলে সে কুফূ হবে যদিও ভরণ-পোষণের মালিক না হয়। ইবারতের মধ্যে মহর দ্বারা নগদ মহর উদ্দেশ্য, বাকি মহর উদ্দেশ্য নয়। কেননা নগদ মহর পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া জরুরি। বাকি মহরের মালিক হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ কথা বলেননি যে, ভরণ-পোষণ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এক মাসের ভরণ-পোষণের মালিক হওয়া জরুরি। কেউ কেউ বলেন, ছয় মাসের মালিক হওয়া জরুরি। কেউ কেউ বলেন, এক বছরের মালিক হওয়া জরুরি। তবে বিশুদ্ধতর মত হলো, সঞ্চয় করে যদি নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে সে ব্যক্তিই কুফূ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, স্বামীর ভরণ-পোষণের উপর তখন সামর্থ্যবান হওয়া জরুরি যখন স্ত্রী সঙ্গমের যোগ্য হয়। অন্যথায় ভরণ-পোষণের উপর সামর্থ্যবান হওয়া জরুরি নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভরণ-পোষণের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করেন। মহরের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করেন না। কেননা, মহরের ক্ষেত্রে লোকেরা শিথিলতা প্রদর্শন করে। আর মানুষ স্বীয় পিতার মালদার হওয়ার দ্বারা মহরের উপর সামর্থ্যবান বলে গণ্য করেন। কারণ পিতা সাধারণত সন্তানদের পক্ষ থেকে মহর বহন করেন, কিন্তু ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করেন না।

গনী অর্থাৎ, নেসাবের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে কুফূ বিবেচ্য হবে কিনা ? এ ব্যাপারে তরফাইনের মাযহাব হলো, বিবেচ্য হবে। সুতরাং স্ত্রী যদি নেসাবের মালিক হয় তাহলে সে ঐ স্বামী যে শুধু ভরণ-পোষণ এবং মহরের মালিক তার কুফূ হবে না। কেননা লোকেরা ধনাঢ্যতা নিয়ে গর্ব করে, আর দারিদ্র্যের উপর লজ্জাবোধ করে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যে কুফূ বিবেচনা করেন না। কারণ সম্পদ এমন বস্তু যার কোনো স্থিতি নেই– আসে আর যায়। অর্থাৎ সকালে আসে আবার বিকেলে চলে যায়। তাই এ ধরনের অস্থিতিশীল বস্তুর বিবেচনা করা হবে না।

وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) فِيْ ذٰلِكَ رِوَايَتَانِ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا أَنْ يَفْحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَّاغِ وَجْهُ الْاِعْتِبَارِ أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاخَرُوْنَ بِشَرَفِ الْحِرَفِ وَيَتَعَيَّرُوْنَ بِدَنَاءَتِهَا وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ الْحِرْفَةَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَيُمْكِنُ التَّحَوُّلُ عَنِ الْخَسِيْسَةِ إِلَى النَّفِيْسَةِ مِنْهَا قَالَ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) حَتّٰى يَتِمَّ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذٰلِكَ وَهٰذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رح) عَلٰى اِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوْعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ وَقَدْ صَحَّ ذٰلِكَ وَهٰذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ لَهُمَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقُّهَا وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يَفْتَخِرُوْنَ بِغَلَاءِ الْمُهُوْرِ وَيَتَعَيَّرُوْنَ بِنُقْصَانِهَا فَأَشْبَهَ الْكَفَاءَةَ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِهِ ۔

অনুবাদ : পেশাসমূহেও কুফূ বিবেচনা করা হবে। এটা হলো সাহেবাইনের মত। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে আরো এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা বিবেচ্য হবে না, যদি না বড় ধরনের পার্থক্য হয়। যেমন– নাপিত, চামড়া পাকাকারী প্রভৃতি [নিম্নশ্রেণীর পেশাসমূহ] এক্ষেত্রে কুফূ বিবেচনা করার কারণ হলো, মানুষ পেশার আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করে এবং পেশার নিকৃষ্টতার কারণে লজ্জাবোধ করে। আর অন্য মতের কারণ হলো, পেশা অবধারিত কোনো বিষয় নয়; বরং [যে-কোনো সময়] নিকৃষ্ট পেশা থেকে উৎকৃষ্ট পেশায় পরিবর্তিত হওয়া সম্ভবপর। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো স্ত্রীলোক যদি নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর তার মহরে মিছিল থেকেও কম মহর ধার্য করে তাহলে ওলীদের তাতে আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সুতরাং হয় তার মহরে মিছিল পূর্ণ আদায় করবে কিংবা তাকে পরিত্যাগ করবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তাদের সে অধিকার নেই। এ মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তখনই শুদ্ধ হবে, যখন ওলী ছাড়া বিবাহ হবে বলে মেনে নেওয়া হয়। জায়েজ আছে মতের প্রতি তিনি রুজূ করেছেন বলে মেনে নেওয়া হয়। আর তা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত। আর তাঁর মত পরিবর্তনের ব্যাপারে এ মাসআলাটি অভ্রান্ত প্রমাণ। সাহেবাইনের দলিল হলো, দশ দিরহামের উপর যা হয় তা তার নিজের হক। আর যে নিজের হক ছেড়ে দেয় তার উপর কোনো আপত্তি করা যায় না। যেমন– মহর নির্ধারণের পরে। [মহর নির্ধারণ করার পর তা

থেকে কমালে বা মাফ করে দিলে অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার থাকে না]। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, ওলীগণ উচ্চ মহর নিয়ে গর্ব করে থাকে এবং মহরের স্বল্পতার কারণে লজ্জাবোধ করে থাকে। সুতরাং তা কুফূর সদৃশ হলো। [অর্থাৎ সমকক্ষতার বিষয়টি ক্ষুণ্ন হলে যেমন অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে, তেমনি এখানেও অধিকার থাকবে] মহর নির্ধারণের পর তা মাফ করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ কারণে কেউ লজ্জাবোধ করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ الخ : পেশাসমূহের মধ্যে কুফূ বিবেচনা করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে শায়খাইনের মাযহাব হলো, বিবেচনা করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে বিবেচনা করা হবে না, অপর বর্ণনা মতে বিবেচনা করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে যে, বিবেচনা করা হবে না, তবে যদি পেশা একেবারে নিম্নমানের হয়। যেমন– নাপিত, তাঁতি এবং চামড়া পাকাকারীর পেশা, তাহলে এই ধরনের সুরতে কুফূ বিবেচ্য হবে। পেশাসমূহের মধ্যে কুফূ বিবেচ্য হওয়ার কারণ হলো, লোকেরা পেশার আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করে, আর নিকৃষ্ট পেশা নিয়ে লজ্জাবোধ করে। দ্বিতীয় মতের কারণ হলো, পেশা অবধারিত কোনো বিষয় নয়। নিম্ন থেকে উপরের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যে সকল জিনিস অবধারিত নয় তার বিবেচনা করা হয় না। [তবে তার উপর এ প্রশ্ন আসে যে, ফাসেকী আর দরিদ্রতাও তো অবধারিত বিষয় নয়, তাহলে তো দীনদারী ও ধনাঢ্যতার মধ্যেও কুফূ বিবেচ্য না হওয়া উচিত]।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الخ : মাসআলা : এক বালেগা নারী যদি নিজের বিবাহ মহরে মিছিলের কমে ধার্য করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। স্বামী পূর্ণ মহরে মিছিল আদায় করবে কিংবা তাকে পরিত্যাগ করবে। অন্যথায় কাজি মকদ্দমার পর বিচ্ছিন্ন করবে। সাহেবাইনের মতে অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ মাসআলাটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) অভিভাবক ছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের মত থেকে রুজূ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাব এই ছিল যে, বিবাহ অভিভাবক ছাড়া সংঘটিত হয় না। তারপর তিনি এ মত থেকে রুজূ করলেন এবং বলতে লাগলেন যে, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। রুজূ এভাবে হলো যে, সাহেবাইন [যার সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও রয়েছেন] বলতে লাগলেন যে, অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার নেই। এর অর্থ হলো, বিবাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। আর মতনের (مَتْن) মধ্যে যে সূরত বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, অভিভাবক ছাড়াই নারী বিবাহ করেছে। সুতরাং মাসআলাটির এই ধরন ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর রুজূর উপর সত্য সাক্ষ্য। মোদ্দাকথা, উপরিউক্ত মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল হলো, দশ দিরহাম পর্যন্ত তো শরিয়তের হক, এর চেয়ে অধিক হলো স্ত্রীর হক। সুতরাং স্ত্রী মহরে মিছিল থেকে কম করে নিজের হক ছেড়ে দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি নিজের হক ছেড়ে দেয় তার উপর কোনো আপত্তি চলে না। যেমন– মহর নির্ধারণ করার পর স্ত্রী যদি নিজের সম্পূর্ণ কিংবা কিয়দংশকে ছেড়ে দেয়; তখন তার উপর কোনো আপত্তি নেই। এমনিভাবে এখানেও আপত্তি না করা উচিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, অভিভাবকগণ নিজের বংশের নারীদের উচ্চ মহর নিয়ে গর্ব করে এবং স্বল্প মহরের কারণে লজ্জাবোধ করে। সুতরাং মহরের মধ্যে কম হওয়া কুফূ না হওয়ার সদৃশ হলো। আর কুফূ না হওয়ার সুরতে অভিভাবকদের আপত্তি করার অবকাশ আছে। তাই মহরের স্বল্পতার সুরতেও আপত্তি করার অবকাশ থাকবে। মহর নির্ধারণ করার পর তা মাফ করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। এর দ্বারা অভিভাবকরা লজ্জাবোধ করে না। কেননা, এটিতো হেবা। এর দ্বারা অভিভাবকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে; কমবে না।

وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ إِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ إِبْنَهُ الصَّغِيْرَ وَ زَادَ فِيْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَجُوْزُ الْحَطُّ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ وَمَعْنَى هٰذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْحَطَّ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظَرِ فِيْ شَيْءٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلِهٰذَا لَمْ يَمْلِكْ ذٰلِكَ غَيْرُهُمَا وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ النَّظَرِ وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَةِ وَفِي النِّكَاحِ مَقَاصِدُ تَرْبُوْا عَلَى الْمَهْرِ أَمَّا الْمَالِيَّةُ هِيَ الْمَقْصُوْدَةُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَالدَّلِيْلُ عَدِمْنَاهُ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِمَا وَمَنْ زَوَّجَ إِبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ عَبْدًا وَ زَوَّجَ إِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَيْضًا لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْكَفَاءَةِ لِمَصْلَحَةٍ تَفُوْقُهَا وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَلَا يَجُوْزُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : পিতা যদি তার নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয় এবং তার মহরে মিছিল থেকে পরিমাণ কম করে, কিংবা নাবালেগ পুত্রকে বিবাহ করায় আর তার স্ত্রীর মহরের মান বাড়িয়ে দেয় তাহলে উভয়ের উপর তা বৈধরূপে কার্যকর হবে। বাবা ও দাদা ছাড়া অন্য কারো জন্য তা বৈধ হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, সাধারণত যে পরিমাণ কমবেশি লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে কমবেশি করা জায়েজ হবে না। এর অর্থ হলো, তাদের মতে বিবাহ আকদ বৈধ হবে না। কেননা অভিভাবকত্বের উপকারিতা কল্যাণ সংরক্ষণের শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ শর্ত অনুপস্থিত হলে আকদ বাতিল হয়ে যাবে। এখানে কল্যাণ সংরক্ষণ অনুপস্থিত হওয়ার কারণ হলো, [কন্যার ক্ষেত্রে] মহরে মিছিল হতে কম করা এবং [পুত্রের ক্ষেত্রে] বেশি করা কোনোক্রমেই তার কল্যাণ সংরক্ষণের অনুকূল নয়; যেমন– ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো বাবা ও দাদা ছাড়া অন্যেরা তা করতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, [শরিয়তের] হুকুম [বিবাহের বৈধতা] কল্যাণ সংরক্ষণের দলিলের উপর আবর্তিত হবে এবং তা নিকটাত্মীয়তা। আর বিবাহে এমন কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, যা মহরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে [ক্রয়-বিক্রয় তথা] আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। আর [কল্যাণ সংরক্ষণের] প্রমাণ [নিকটাত্মীয়তা] বাবা ও দাদা ছাড়া অন্যদের মাঝে আমরা পাইনি। যে ব্যক্তি তার নাবালেগ কন্যাকে কোনো দাসের সঙ্গে বিবাহ দিল। কিংবা আপন নাবালেগ পুত্রকে কোনো দাসী বিবাহ করাল, তবে এ বিবাহ দেওয়া ও করানো জায়েজ হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। কেননা এমন কোনো কল্যাণের জন্যই কুফূর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা তার চেয়ে বড়। সাহেবাইনের মতে এটি প্রকাশ্য ক্ষতি। যেহেতু কুফু নেই, সুতরাং তা জায়েজ হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, পিতা তার নাবালেগা কন্যাকে বিবাহ দিল এবং তার মহর মহরে মিছিল থেকে কম ধার্য করল। কিংবা পিতা তার নাবালেগ পুত্রকে বিবাহ করাল এবং তার স্ত্রীর মহর মহরে মিছিল থেকে বাড়িয়ে দিল। এ কমবেশি তার স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নাবালেগ ও নাবালেগা উভয়ের বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু বাপ-দাদা ছাড়া অন্য কেউ যদি এমনটি করে তবে বিবাহ জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের মতে কমবেশি যদি চরম ঠক (غَبْنٌ فَاحِشٌ) হিসেবে হয় তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে না। এর চেয়ে কম হলে বিবাহ জায়েজ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) وَمَعْنَى هٰذَا الْكَلَامِ দ্বারা সাহেবাইনের মত "জায়েজ নেই" -এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন। কারণ সাহেবাইনের মত لَا يَجُوْزُ -এর একটি অর্থ এটা হতে পারে যে, মূল বিবাহ তো জায়েজ, কিন্তু কমবেশি জায়েজ নেই। তাকে মহরে মিছিল -এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাহেবাইনের মতের উদ্দেশ্য হলো, তাদের মতে বিবাহই জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, অভিভাবকত্ব সম্পৃক্ত হলো কল্যাণ সংরক্ষণের শর্তের সাথে। সুতরাং কল্যাণ সংরক্ষণ না হলে অভিভাবকত্বই বহাল থাকবে না। এখন এ অর্থ দাঁড়াবে যে, পিতা অভিভাবকত্ব ছাড়াই বিবাহ দিল, আর অভিভাবকত্ব ছাড়া বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তাই এ বিবাহও বাতিল হয়ে যাবে। কল্যাণ সংরক্ষণ কিভাবে ফউত হবে ? এ ব্যাপারে বক্তব্য হলো, নাবালেগার মহরে মিছিলের মধ্যে অসাধারণ কম করা কিংবা নাবালেগ পুত্রের স্ত্রীর মহরে মিছিলের মধ্যে অসাধারণ বৃদ্ধি করা কোনো কল্যাণ সংরক্ষণই নয়। এ মাসআলাটি এমন হলো; যেমন– পিতা নাবালেগ পুত্র ও কন্যার মাল অসাধারণ কম মূল্যে বিক্রয় করল কিংবা তাদের জন্য কোনো কিছু অধিক মূল্যে ক্রয় করল। তাহলে এ বিকিকিনি সকলের মতে জায়েজ হবে না। তাই বিবাহও জায়েজ না হওয়া উচিত। এ কারণে পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ যদি এমনটি করে তবে সকলের মতে জায়েজ হবে না, তাই পিতা-দাদা করলেও জায়েজ না হওয়া উচিত।

ইমাম সাহেবের দলিল হলো, কল্যাণ সংরক্ষণের বিষয়টি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। তার উপর হুকুম আবর্তিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল এবং লক্ষণের উপর হুকুম আবর্তন করা হবে। আর কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল হলো নিকটাত্মীয়তা। তাই আমরা বলি যে, বাপ ও দাদার মধ্যে কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল বিদ্যমান আছে, তাই তার উপর বিবাহ জায়েজ হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। আর বাপ-দাদা ছাড়া অন্যদের মাঝে যেহেতু নিকটাত্মীয়তা নেই, তাই তাদের দেওয়া বিবাহের উপর জায়েজ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। এ কথা বলা যে, মোহরে মিছিল থেকে কম -এর মধ্যে কোনো কল্যাণ সংরক্ষণ নেই– এর জবাব হলো, বিবাহের মধ্যে শুধু মহরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে না; বরং এছাড়াও বিবাহের আরো অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, যেগুলো মহর থেকেও বড়। অনেক সময় জামাতার অনেক যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাই ঐ যোগ্যতাগুলোর কারণে মহরের মধ্যে কম করা যায়। আর এটি তো কল্যাণ সংরক্ষণ এমনটি নয়; বরং হুবহু কল্যাণ সংরক্ষণ। আর সাহেবাইনের বিবাহকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কিয়াস করা একটি অযৌক্তিক কিয়াস (قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ)। কেননা, বিকিকিনির মধ্যে অর্থই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এর মধ্যে যদি চরম ঠক হয় তাহলে তাতে কোনো কল্যাণই থাকবে না। এর বিপরীত হলো বিবাহ-শাদি। কেননা এর মধ্যে অর্থ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অন্যান্য উদ্দেশ্যও রয়েছে যা অর্থ -এর চেয়ে আরো বড়।

قَوْلُهُ وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, পিতা তার নাবালেগা কন্যাকে কোনো দাসের সাথে বিবাহ দিল কিংবা নাবালেগ পুত্রকে কোনো দাসী বিবাহ করাল, তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে [এমন বিবাহ] জায়েজ, আর সাহেবাইনের মতে নাজায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিলের সারাংশ হলো, পিতার অসম-পাত্রের মধ্যে বিবাহ দেওয়া এমন কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, যা কুফুর চেয়ে অধিক উপকারী। তাই অসম-পাত্রে বিবাহ দেওয়ার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই।

সাহেবাইনের দলিল হলো, অসম-পাত্রের বিবাহে প্রকাশ্য ক্ষতি রয়েছে, তাই এ ধরনের বিবাহ জায়েজ হবে না।

فَصْلٌ فِى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

وَيَجُوْزُ لِابْنِ الْعَمِّ اَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهٖ مِنْ نَفْسِهٖ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوْزُ وَاِذَا اَذِنَتِ الْمَرْاَةُ لِلرَّجُلِ اَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهٖ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوْزُ لَهُمَا اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَصَوَّرُ اَنْ يَكُوْنَ مُمَلِّكًا اَوْ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِى الْبَيْعِ اِلَّا اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُوْلُ فِى الْوَلِيِّ ضَرُوْرَةٌ لِاَنَّهٗ لَا يَتَوَلَّاهُ سِوَاهُ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِى الْوَكِيْلِ وَلَنَا اَنَّ الْوَكِيْلَ فِى النِّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَسَفِيْرٌ وَالتَّمَانُعُ فِى الْحُقُوْقِ دُوْنَ التَّعْبِيْرِ وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوْقُ اِلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّهٗ مُبَاشِرٌ حَتّٰى رَجَعَتِ الْحُقُوْقُ اِلَيْهِ وَاِذَا تَوَلّٰى طَرَفَيْهِ فَقَوْلُهٗ زَوَّجْتُ يَتَضَمَّنُ الشَّطْرَيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى الْقَبُوْلِ .

অনুচ্ছেদ : উকিল বা অন্য কারো মাধ্যমে বিবাহ

অনুবাদ : চাচাত ভাই তার [নাবালেগ] চাচাত বোনকে নিজের কাছে বিবাহ দিতে [অর্থাৎ, নিজে বিবাহ করতে] পারে। ইমাম যুফার (রা.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কোনো মহিলা যদি কোনো পুরুষকে নিজের সঙ্গে তার বিবাহ করে নেওয়ার অনুমতি দেয়, আর সে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। উভয়ের দলিল হলো, এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, একই ব্যক্তি মালিক বানাবে এবং নিজেই মালিকানা অর্জন করবে। যেমন– বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, সে ছাড়া কেউ তার ওলী হতে পারে না। আর উকিলের মধ্যে এ প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল নিছক বার্তাবাহক ও বক্তব্য উচ্চারক। আর পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয় হুকুকের ক্ষেত্রে; বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে নয়। আর [স্ত্রী পক্ষের] হকসমূহ তো তার উপর অর্পিত হচ্ছে না। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেখানে উকিল সরাসরি চুক্তি সম্পন্নকারী। তাই [উভয় পক্ষের] হকসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। যখন বিবাহের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দায়িত্ব সে পালন করল তখন তার "বিবাহ দিলাম" কথাই [ইজাব ও কবুল] উভয় অংশকেই অন্তর্ভুক্ত করবে, ফলে [আলাদা শব্দ দ্বারা গ্রহণের প্রয়োজন হবে না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِى الْوَكَالَةِ الخ : উক্ত অনুচ্ছেদটি উকালতি ও গায়রে উকালতি সংক্রান্ত। গায়রে উকালতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মওকুফ বিবাহ (اَلنِّكَاحُ الْفُضُوْلِىْ) এবং বিবাহের ওলী। কেননা উক্ত অনুচ্ছেদে উকিলের আহকাম ছাড়া ফুযূলী এবং ওলীর আহকামও বর্ণিত হবে। বস্তুতপক্ষে উকালতি তো অভিভাবকত্বেরই শাখা; যেমন ওলীর ক্ষমতাধিকার কার্যকর হয় যার অভিভাবক (مَوْلٰى عَصَبَةٌ) তার উপর। এমনিভাবে উকিলের ক্ষমতাধিকার কার্যকর করে যার উকিল তার উপর।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ لِابْنِ الْعَمِّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, চাচার ছেলে ওলী সেজে নিজের বিবাহ নিজের চাচাত বোনের সাথে দিল [নিজে বিবাহ করল] অথচ ঐ মেয়ে নাবালেগা এবং সে ছাড়া অন্য কোনো ওলীও নেই। যেমন– সে বলল, সাক্ষী থাক আমি নিজের বিবাহ অন্য মেয়ের সাথে দিলাম, যে فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ -এর মেয়ে। আমাদের মতে জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও জায়েজ বলেন, কিন্তু ইমাম যুফার (র.) নাজায়েজ বলেন।

দ্বিতীয় সুরত হলো, এক মহিলা কোনো ব্যক্তিকে তাকে বিবাহ করার উকিল বানাল। উকিল দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাকে বিবাহ করে নিল। এ সুরতটি আমাদের মতে জায়েজ। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে নাজায়েজ। তাঁদের দলিল হলো, এক ব্যক্তি এক বস্তুর একই সময়ে মালিক বানানো ও মালিকানা অর্জন করতে পারে না। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হতে পারে না। আর এখানেও একই খারাবি রয়েছে। কেননা চাচার পুত্র নিজের পক্ষ থেকে [মালিক হওয়ার যোগ্য] এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ওলী হয়ে মালিক বানানোর অধিকারী। তাই একই ব্যক্তি মালিক ও মালিকানা গ্রহণকারী হলো। আর এটি নাজায়েজ। তাই বিবাহ-আকদও নাজায়েজ হবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় মাসআলায় পুরুষ যেহেতু বিবাহকারী, তাই সে মালিক হওয়ার অধিকারী এবং যেহেতু মহিলার পক্ষ থেকে উকিল এজন্য মালিক বানানোর অধিকারীও বটে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ওলীর যেহেতু জরুরত রয়েছে। কারণ সে ছাড়া অন্য কোনো ওলী নেই। এজন্য প্রথম সুরতকে জায়েজ বলা হয়েছে। আর উকিলের কোনো জরুরত নেই। কেননা সে ছাড়া অন্যকেও উকিল বানানো যায়, তাই এ সুরতটি নাজায়েজ। আমাদের দলিল হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল শুধু বার্তাবাহক ও বক্তব্য উচ্চারক; জিম্মাদার নয়। আর পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয় হুকূকের ক্ষেত্রে, তা'বীর বা বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে নয়। হুকূকের ক্ষেত্রে বিরোধ এই যে, একই ব্যক্তি মুতালিব ও মুতালাব, মুমাল্লিক ও মুতামাল্লিক, মুখাসিম ও মুখাসাম। কিন্তু বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই। মালিক বানানোর শব্দ উচ্চারণ করে মহিলার পক্ষ থেকে আর মালিক হওয়ার শব্দ উচ্চারণ করে নিজের পক্ষ থেকে। এর বিপরীত হলো ক্রয়-বিক্রয়। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উকিল সাধারণত আকিদ তথা চুক্তি সম্পাদনকারী হয়। তাইতো বিক্রয়ের হুকুম উকিলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়; যে উকিল বানালো তার দিকে নয়। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তি উভয় পক্ষেক মুতাওয়াল্লী হয় তখন পুরুষের যথা 'বিবাহ দিলাম' ইজাব ও কবুল উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। ভিন্ন কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং যখন এক ব্যক্তি দুজনের স্থলবর্তী হতে পারে তখন একজনেরই ব্যাখ্যা দুজনের ব্যাখার স্থলবর্তী হবে।

قَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَكَذٰلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهٰذَا عِنْدَنَا فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ اِنْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ وَالْفُضُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فَتَلْغُو وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ التَّصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي اِنْعِقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا حَتّٰى إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ يُنَفِّذُهُ وَقَدْ يَتَرَاخٰى حُكْمُ الْعَقْدِ عَنِ الْعَقْدِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস ও দাসীর সম্পাদিত বিবাহ স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমোদন করে তাহলে জায়েজ হবে, আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বাতিল হয়ে যাবে। এ রকমই হুকুম কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে সম্মতি ছাড়া বিবাহ দান করে কিংবা কোনো পুরুষকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করায়। এটা হলো আমাদের মাযহাব। কেননা, যে-কোনো চুক্তি কোনো 'ফালতু' লোকের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয় আর তা অনুমোদন করার মতো কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে তা অনুমোদনস্বাপেক্ষে স্থগিতরূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফালতু ব্যক্তির যাবতীয় কার্যক্রম [চুক্তি সম্পাদন] বাতিল। কেননা, আকদ [চুক্তি] প্রবর্তিতই হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফলাফলের জন্য। আর ফালতু ব্যক্তি ফলাফল সাব্যস্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তা অর্থহীন। আর আমাদের দলিল হলো, আকদে নিকাহের ভিত্তি [ইজাব ও কবুল] যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ হতে ব্যবহৃত ও উপযুক্ত স্থানের প্রতি সম্পৃক্ত। আর তা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং তা স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এতে কল্যাণ মনে করলে তা কার্যকর করবে। আর কখনো কখনো কার্যকারিতা বিলম্বিত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الخ : **মাসআলা :** দাস-দাসীর বিবাহ তার মনিবের অনুমতি ছাড়া স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমোদন করে তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, আর যদি অনুমোদন না করে তবে বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া দিয়ে দিল। কিংবা কোনো নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিয়ে দিল। আমাদের মতে জায়েজ হবে এবং বিবাহের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। নীতিমালা রয়েছে যে, যে-কোনো চুক্তি কোনো ফালতু লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং মজলিসে কোনো ইজাব-কবুলকারীও বিদ্যমান থাকে, ইজাব-কবুলকারী অপর ফালতু লোক হোক -উকিল বা আসীল হোক – তবে এই বিবাহ অনুমোদনস্বাপেক্ষে স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব এই যে, ফালতু ব্যক্তির যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল। ইমাম শাফিয় (র.) -এর দলিল হলো, আকদ [চুক্তি] প্রবর্তিত হয়েছে চুক্তির হুকুমকে [ফলাফলকে] সাবিত করার জন্য, আর ফালতু ব্যক্তি হুকুম সাবিত করতে সামর্থ্যবান নয়। তাই তার কথা অর্থহীন হবে।

আমাদের দলিল হলো, رُكْنُ تَصَرُّفٍ অর্থাৎ, ইজাব ও কবুল তার যোগ্য ব্যক্তি থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক থেকে এবং সম্পৃক্ত হলো চুক্তির মহলের সাথে। অর্থাৎ, এমন নারীর সাথে যে মুহাররামাত নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ঐ বিবাহ চুক্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাও নেই। কেননা, এ চুক্তি স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হবে। সমীচীন মনে হলে সাব্যস্ত হবে, না হয় প্রত্যাখ্যান করে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল যে, ফালতু ব্যক্তি হুকুম সাবিত করার যোগ্য নয়– এর জবাব এই যে, এখানে হুকুম অস্তিত্বহীন নয়; বরং অনুমতি পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়েছে। আর আমাদের হুকুম আকদ থেকে বিলম্বিত হতে পারে। যেমন– [খেয়ারের] শর্তসাপেক্ষে বেচাকেনার মধ্যে। কারণ উক্ত বেচাকেনার অপরিহার্যতা কিংবা কার্যকারিতা খেয়ার সাবিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হলো।

وَمَنْ قَالَ اشْهَدُوْا اَنِّىْ قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَاَجَازَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ قَالَ اٰخَرُ اِشْهَدُوْا اَنِّىْ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَاَجَازَتْ جَازَ وَكَذٰلِكَ اِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ هِىَ الَّتِىْ قَالَتْ جَمِيْعَ ذٰلِكَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا غَائِبًا فَبَلَغَهُ فَاَجَازَ جَازَ وَحَاصِلُ هٰذَا اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُضُوْلِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ اَوْ فُضُوْلِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَاَصِيْلًا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهٗ .

অনুবাদ : কেউ যদি বলে যে, তোমরা সাক্ষী থেক, আমি অমুককে বিবাহ করলাম, অতঃপর তার নিকট এ সংবাদ পৌছাল, আর সে তা অনুমোদন করল তবে তা বাতিল। আর যদি [লোকটির উক্ত কথার পর] অন্য একজন বলে উঠে যে, তোমরা সাক্ষী থেক, আমি তাকে তার কাছে বিবাহ দিলাম। অতঃপর সে মহিলার নিকট এ খবর পৌছল এবং সে তা অনুমোদন করল, তাহলে তা জায়েজ হবে। এরূপই [হুকুম] যদি স্ত্রীলোকটি উপরিউক্ত কথাসমূহ বলে। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কোনো নারী যদি কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট নিজেকে বিবাহ দেয় আর তার নিকট এ খবর পৌছার পর সে তা অনুমোদন করে তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে। এ মাসআলার সারাংশ হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত– একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ হতে ফালতুরূপে কিংবা এক পক্ষে আসল এবং অন্য পক্ষে ফালতুরূপে কার্য সম্পাদন করতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তা করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ قَالَ اشْهَدُوْا اَنِّىْ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি দুজনকে সাক্ষী করে বলল, আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করেছি, কিন্তু ঐ মজলিসে মহিলার পক্ষ থেকে কেউ কবুল করেনি, তারপর মহিলার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌছল এবং মহিলা তা অনুমোদন করল, তরফাইনের মতে এ বিবাহ বাতিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে জায়েজ। আর যদি ঐ ইজাবের মজলিসে অপর একজন বলে যে, তোমরা সাক্ষী থেক, আমি ঐ মহিলাকে এ ব্যক্তির বিবাহে দিলাম। কিংবা এভাবে বলল যে, আমি ঐ মহিলার পক্ষ থেকে কবুল করলাম। অতঃপর ঐ মহিলার নিকট বিবাহের সংবাদ পৌছার পর সে তার সম্মতি প্রকাশ করল, তাহলে বিবাহ জায়েজ হয়ে যাবে। উপরিউক্ত উভয় মাসআলায় পার্থক্য এই যে, প্রথম মাসআলায় জায়েজকারী নেই, তাই বিবাহ বাতিল হবে; স্থগিত হবে না। আর দ্বিতীয় মাসআলায় জায়েজকারী বিদ্যমান আছে, তাই বিবাহ স্থগিত থাকবে। কারণ ফালতু বিবাহ স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, আকদের মজলিসে জায়েজকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে। আর এ হুকুম তখন যখন এ সমস্ত কাজ মহিলা করে। অর্থাৎ মহিলা বলল, তোমরা সাক্ষী থেক, আমি নিজেকে অমুকের ছেলে অমুকের কাছে বিবাহ দিলাম। এখন মজলিসের মধ্যে যদি পুরুষের পক্ষ থেকে কেউ কবুল না করে, আর পুরুষের নিকট সংবাদ পৌছার পর তার সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে তরফাইনের মতে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে জায়েজ হবে। আর যদি প্রস্তাবের মজলিসে কেউ অনুপস্থিত লোকের পক্ষ থেকে কবুল করে নেয়, তারপর সংবাদ পৌছার পর পুরুষ অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে বিবাহ জায়েজ হয়ে যাবে।

মোদ্দাকথা হলো, এক ব্যক্তি এক দিক থেকে আসীল, অপর দিক থেকে ফালতু কিংবা উভয় দিক থেকে ফালতু অথবা এক দিক থেকে ফালতু অপর দিক থেকে ওলী, কিংবা এক দিক থেকে ফালতু অপর দিক থেকে উকিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা ? ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে যোগ্যতা রাখে, তাই তাঁর মতে বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে তবে অনুমতি লাভের উপর স্থগিত থাকবে। তরফাইনের মতে যোগ্যতা রাখে না, তাই বিবাহ সংঘটিত হবে না। আমাদের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এক ব্যক্তি একদিক থেকে উকিল অপরদিক থেকে আসীল, কিংবা একদিক থেকে ওলী অপর দিক থেকে উকিল কিংবা উভয় দিক থেকে উকিল হতে পারে। তবে একই ব্যক্তির উভয় দিক থেকে আসীল হওয়া কঠিন ব্যাপার।

قَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَكَذٰلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهٰذَا عِنْدَنَا فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ اِنْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ وَالْفُضُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فَتَلْغُو وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ التَّصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ وَلَا ضَرَرَ فِي اِنْعِقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا حَتّٰى إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ يُنَفِّذُهُ وَقَدْ يَتَرَاخٰى حُكْمُ الْعَقْدِ عَنِ الْعَقْدِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস ও দাসীর সম্পাদিত বিবাহ স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমোদন করে তাহলে জায়েজ হবে, আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বাতিল হয়ে যাবে। এ রকমই হুকুম কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে সম্মতি ছাড়া বিবাহ দান করে কিংবা কোনো পুরুষকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করায়। এটা হলো আমাদের মাযহাব। কেননা, যে-কোনো চুক্তি কোনো 'ফালতু' লোকের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয় আর তা অনুমোদন করার মতো কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে তা অনুমোদনস্বাপেক্ষে স্থগিতরূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফালতু ব্যক্তির যাবতীয় কার্যক্রম [চুক্তি সম্পাদন] বাতিল। কেননা, আকদ [চুক্তি] প্রবর্তিতই হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফলাফলের জন্য। আর ফালতু ব্যক্তি ফলাফল সাব্যস্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তা অর্থহীন। আর আমাদের দলিল হলো, আকদে নিকাহের ভিত্তি [ইজাব ও কবুল] যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ হতে ব্যবহৃত ও উপযুক্ত স্থানের প্রতি সম্পৃক্ত। আর তা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং তা স্থগিত অবস্থায় সংঘটিত হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এতে কল্যাণ মনে করলে তা কার্যকর করবে। আর কখনো কখনো কার্যকারিতা বিলম্বিত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الخ : **মাসআলা :** দাস-দাসীর বিবাহ তার মনিবের অনুমতি ছাড়া স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমোদন করে তাহলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, আর যদি অনুমোদন না করে তবে বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া দিয়ে দিল। কিংবা কোনো নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিয়ে দিল। আমাদের মতে জায়েজ হবে এবং বিবাহের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। নীতিমালা রয়েছে যে, যে-কোনো চুক্তি কোনো ফালতু লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং মজলিসে কোনো ইজাব-কবুলকারীও বিদ্যমান থাকে, ইজাব-কবুলকারী অপর ফালতু লোক হোক -উকিল বা আসীল হোক – তবে এই বিবাহ অনুমোদনস্বাপেক্ষে স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব এই যে, ফালতু ব্যক্তির যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল। ইমাম শাফিয় (র.) -এর দলিল হলো, আকদ [চুক্তি] প্রবর্তিত হয়েছে চুক্তির হুকুমকে [ফলাফলকে] সাবিত করার জন্য, আর ফালতু ব্যক্তি হুকুম সাবিত করতে সামর্থ্যবান নয়। তাই তার কথা অর্থহীন হবে।

আমাদের দলিল হলো, رُكْنُ تَصَرُّفٍ অর্থাৎ, ইজাব ও কবুল তার যোগ্য ব্যক্তি থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক থেকে এবং সম্পৃক্ত হলো চুক্তির মহলের সাথে। অর্থাৎ, এমন নারীর সাথে যে মুহাররামাত নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ঐ বিবাহ চুক্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাও নেই। কেননা, এ চুক্তি স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হবে। সমীচীন মনে হলে সাব্যস্ত হবে, না হয় প্রত্যাখ্যান করে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল যে, ফালতু ব্যক্তি হুকুম সাবিত করার যোগ্য নয়– এর জবাব এই যে, এখানে হুকুম অস্তিত্বহীন নয়; বরং অনুমতি পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়েছে। আর আমাদের হুকুম আকদ থেকে বিলম্বিত হতে পারে। যেমন– [খেয়ারের] শর্তসাপেক্ষে বেচাকেনার মধ্যে। কারণ উক্ত বেচাকেনার অপরিহার্যতা কিংবা কার্যকারিতা খেয়ার সাবিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হলো।

দিয়েছি। কিংবা মনিব বলল, আমি এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে আজাদ করে দিয়েছি, তারপর স্ত্রী ও গোলামের নিকট সংবাদ পৌছার পর যে মজলিসে সংবাদ আসল, সেখানেই কবুল করে নিয়েছে, তাহলে সকলের মতে জায়েজ। সুতরাং আকদে নিকাহেও এমনটি হওয়া উচিত যে, অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। মোদ্দাকথা এই যে, উভয় পক্ষের ফালতু ব্যক্তিকে খোলা, তালাক এবং আজাদীর উপর কিয়াস করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি ইজাব ও কবুলের মুখাপেক্ষী।

তরফাইনের দলিল হলো, আকদে নিকাহ ইজাব ও কবুল দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়। আর মতনের মাসআলায় ঐ ব্যক্তির কথা, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করেছি।' এ কথাটি হলো আকদের একাংশ। অর্থাৎ, ইজাব বা প্রস্তাব কারণ হলো, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মজলিসে উপস্থিত থাকত তবুও উক্ত কথাটি আকদে নিকাহের একাংশ বলে বিবেচিত হতো। অর্থাৎ, ইজাব হতো। তাই অনুপস্থিতিতেও এটি আকদের একাংশ হবে। আর আকদের একাংশ মজলিস পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত থাকে না। যেমন– বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেউ বলল, আমি আমার দাস অমুকের নিকট বিক্রয় করেছি, কিন্তু ক্রেতার পক্ষ থেকে কেউ কবুল করেনি, তাহলে এ আকদে-বায় বাতিল হবে। কেননা মজলিসের মধ্যে শুধু আকদের একাংশ অর্থাৎ, ইজাব পাওয়া গেছে। আর আকদের একাংশ মজলিস পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত হয় না। এমনিভাবে আকদে নিকাহের মধ্যেও আকদের একাংশ মজলিস পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত হবে না। উভয় পক্ষ হতে আদিষ্ট হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ উকিল যে উভয় পক্ষ থেকে আদিষ্ট তার কথা স্থানান্তরিত হয়ে যায়, আকদকারী উভয়ের দিকে। সুতরাং যেন এক পক্ষ থেকে ইজাব হলো, আর অপর পক্ষ থেকে কবুল হলো। সুতরাং উকিলের কথাটি এমন হলো, যেমন দুজনের কথা। আর যখন উভয় আকদকারীর কথা তথা ইজাব ও কবুল পাওয়া গেল, তখন আকদ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এর বিপরীত হলো বিক্রয়ের বিষয়টি। কেননা তার মধ্যে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকিল হতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর যে আকদ দুই ফালতুর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, তা পরিপূর্ণ আকদ। কারণ ইজাব ও কবুল উভয়টি পাওয়া গেছে। এমনিভাবে খোলা, অর্থের বিনিময়ে তালাক এবং অর্থের বিনিময়ে আজাদীও পরিপূর্ণ আকদ। মোটকথা হলো, যখন স্বামী বলল, আমি এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমার স্ত্রীর সাথে খোলা করেছি। স্ত্রী বিদ্যমান নেই। তবে এ খোলা সহীহ হবে। কিন্তু এ কারণে নয় যে, এ স্বামী তার পক্ষ থেকে আসীল আর মহিলার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত; বরং এজন্য যে, খোলা স্বামীর পক্ষ থেকে ইয়ামীন, সুতরাং এখন যদি স্ত্রী কবুল করার পূর্বে ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর ইয়ামীন শপথকারীর সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাই স্বামীকে ফুযূলী বা অতিরিক্ত বানানোর কোনো দরকার নেই। মোটকথা হলো, খোলা, তালাক এবং আজাদীর মধ্যে ইজাব ও কবুল আকদ নয়; বরং শর্ত। তা স্বামী ও মনিবের কথায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাই আকদে নিকাহকে উপরিউক্ত তিনটির উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না; বরং قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ হবে, আর এটা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, খোলা মহিলার পক্ষ থেকে বিনিময়। সুতরাং যদি মহিলা বলে যে, আমি এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমার স্বামীর সাথে খোলা করেছি, আর স্বামী হলো অনুপস্থিত। তারপর তার কাছে সংবাদ পৌছার পর সে সম্মতি জ্ঞাপন করল, তাহলে এ খোলা সহীহ হবে না। কেননা খোলা হলো মহিলার পক্ষ থেকে বিনিময়, তাই মজলিস পরবর্তী সময় পর্যন্ত স্থগিত থাকবে না। একই ব্যাখ্যা অর্থের বিনিময়ে তালাক ও অর্থের বিনিময়ে আজাদীর ক্ষেত্রেও।

وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُوْلِيَّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُوْلِيِّ وَالْأَصِيْلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ هُوَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ مَأْمُوْرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ يُنَفَّذُ فَإِذَا كَانَ فُضُوْلِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُوْدَ شَطْرُ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ شَطْرُ حَالَةِ الْحَضْرَةِ فَكَذَا عِنْدَ الْغَيْبَةِ وَشَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْمَأْمُوْرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ وَمَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُوْلِيَّيْنِ عَقْدٌ تَامٌّ وَكَذَا الْخُلْعُ أَخْتَاهُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِيْنٍ مِنْ جَانِبِهِ حَتّٰى يَلْزَمَ فَيَتِمُّ بِهِ -

অনুবাদ : যদি দুই ফালতু লোকের মধ্যে কিংবা একজন আসল ও অপরজন ফালতু লোকের মধ্যে আকদ পরিচালিত হয়, তাহলে সকলের মতেই তা জায়েজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে আদিষ্ট [উকিল] হতো তাহলে আকদ কার্যকর হতো। সুতরাং যদি ফালতু হয় তবে আকদ স্থগিত থাকবে। আর বিষয়টি খোলা কিংবা অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদান বা আজাদ করার মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, আকদের একটি অংশ মাত্র বিদ্যমান হয়েছে। অপর পক্ষের উপস্থিতির সময়ও এটা আকদের একাংশ বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং তার উপস্থিতিতেও এটা আকদের একাংশ বলে বিবেচিত হবে। আর আকদের একাংশ মজলিশ পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত থাকে না। যেমন– বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর উভয় পক্ষ হতে আদিষ্ট হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তখন তার কথা আকদকারী উভয় পক্ষের দিকে স্থানান্তরিত হবে। আর দুই ফালতু লোকের সাথে অনুষ্ঠিত বিষয়টি [ইজাব ও কবুল বিদ্যমান থাকার কারণে] পূর্ণ চুক্তিরূপে গণ্য হবে। তদ্রূপ খোলা ও তার সমগোত্রীয় বিষয় দুটিও [মালের বিনিময়ে তালাক ও আজাদী] পূর্ণ চুক্তিরূপে গণ্য হবে। কেননা তার পক্ষ থেকে এটা শপথস্বরূপ। এজন্যই তা বাধ্যতামূলক। সুতরাং তা তার একার পক্ষ থেকেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُوْلِيَّيْنِ الخ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তরফাইনের মতে এক ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে ফযূলী [ফালতু] হতে পারে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে এক ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে ফালতু হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আকদ নিকাহ দুই ফালতু কিংবা একজন ফালতু এবং একজন আসল ব্যক্তির মাঝে পরিচালিত হয়, তবে সকলের মতে জায়েজ হবে। পূর্বোক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, যদি এ ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে উকিল হতো তাহলে বিবাহ কার্যকর হয়ে যেত। সুতরাং যদি ফালতু হয় তবে বিবাহ স্থগিত থাকবে। তাই একই ব্যক্তি উভয় পক্ষ থেকে ফালতু হতে পারে। আর এটি খোলা তালাক এবং আজাদ করার অনুরূপ হয়ে গেল। যেমন– স্বামী বলল, আমি আমার বিবির সাথে এক হাজার টাকার বিনিময়ে খোলা করলাম। বিবি বিদ্যমান নেই। তারপর তার নিকট সংবাদ পৌঁছার পর সে তা কবুল করে নিল, তাহলে এ বিবাহ সকলের মতে জায়েজ। সুতরাং এখানে যেমনিভাবে একই সীগাহ (الصِّيْغَةُ الْوَاحِدَةُ) দ্বারা আকদে খোলা সহীহ হয়ে গেল তেমনিভাবে একজন ফালতু লোকের কথা দ্বারাও আকদে নিকাহ সহীহ হয়ে যাওয়া উচিত। এমনিভাবে স্বামী বলল, আমি এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে তালাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি অপর একজনকে উকিল বানাল যে, আমাকে একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দাও। উকিল একই আকদে তাকে দুজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দিল। এতে তাদের মধ্য থেকে কারো বিবাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। কারণ, মাসআলাটির তিনটি সুরত রয়েছে- ১. উভয়ের বিবাহকে কার্যকর করা হবে। ২. অনির্ধারিত একজনের বিবাহ কার্যকর করা হবে। ৩. নির্ধারিত একজনের বিবাহ কার্যকর হবে। কিন্তু এই তিন সুরত অসম্ভব। প্রথম সুরত এজন্য অসম্ভব যে, উভয়ের বিবাহ কার্যকর করতে গেলে মুয়াক্কিল -এর বিরোধিতা করতে হবে। দ্বিতীয় সুরত এজন্য অসম্ভব যে, অনির্ধারিত বিবাহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর অজ্ঞতার (مَجْهُوْل) মধ্যে বিবাহ শর্ত বর্ণনা করার সাথে ঝুলন্ত থাকে। বিবাহকে ঝুলন্ত রাখা জায়েজই নেই। তৃতীয় সুরত এজন্য অসম্ভব যে, একটাকে নির্ধারিত করতে গেলে تَرْجِيْحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং যখন তিন সুরত অসম্ভব হলো তখন বিচ্ছিন্ন করা অনিবার্য হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيْرٌ الخ : হাকিম কাউকে উকিল বানাল যে, 'কোনো মহিলার সাথে আমার বিবাহ দিয়ে দাও।' আর উকিল তাঁকে অন্য একজনের দাসীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ বিবাহ জায়েজ। তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। দলিল হলো, বিবাহের উকিল বানানোর ক্ষেত্রে 'স্ত্রীলোক' শব্দটির নিঃশর্ত (مُطْلَقٌ) যা স্বাধীন ও দাসী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কোনো অপবাদও নেই। কারণ, দাসীটি উকিলের নয়। তাই উকিল অপবাদ দ্বারা জর্জরিতও হবে না। সাহেবাইনের মতে জায়েজ নেই। তবে যদি কুফূর মধ্যে বিবাহ করে। দলিল হলো, উকিল বানানো (تَوْكِيْل) হলো নিঃশর্ত। আর নিঃশর্ত শব্দ প্রচলিত অর্থেই প্রয়োগ হয়। আর তা হলো কুফূর সাথে বিবাহ করা; গায়রে কুফূতে বিবাহ না করা।

قَوْلُهُ قُلْنَا الْعُرْفُ الخ : আমাদের পক্ষ থেকে জবাব হলো, রেওয়াজ শব্দটি ব্যাপক। যেমনিভাবে স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করা যায় তেমনিভাবে দাসীদেরকেও করা যায়। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করা প্রচলন বা রেওয়াজ, তবে এটি কার্য-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষের অভ্যাস হলো যে, স্বাধীনা নারীদেরকে বিবাহ করা। আর সাধারণত ব্যবহার হয় শব্দ-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ। সুতরাং শব্দ-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজের জন্য কার্য-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ মুকায়্যাদ (مُقَيِّدٌ) বা মুখাসাস হতে পারে না। কারণ তাকয়ীদ বা শর্তযুক্ত বস্তু শর্তহীন বস্তুর বিপরীত হয়। আর বিপরীত বস্তুর জন্য মহল অভিন্ন হওয়া শর্ত। আর অভিন্ন মহল পাওয়া যায়নি, তাই শব্দ-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ এবং কার্য-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজের মধ্যে কোনো অভিন্নতা নেই।

قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْوَكَالَةِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থের উকালত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাহেবাইনের মতে এ সুরতে কুফূর বিষয়টি বিবেচনা করা হয় সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কারণ সাধারণ মহিলা বিবাহ করতে প্রত্যেকে সক্ষম, হাকিম হোক বা অন্য কেউ হোক। তাই বুঝা গেল, হাকিম সমপাত্রে বিবাহ করতে সাহায্য কামনা করেছে। ব্যাপারটি যখন এমন তখন অসমপাত্রে বিবাহ করা উকিল বানানোর বিপরীত হবে, তাই জায়েজ হবে না।

وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ إِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ إِثْنَتَيْنِ فِيْ عَقْدَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى تَنْفِيْذِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَا إِلَى التَّنْفِيْذِ فِيْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إِلَى التَّعْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيْقُ وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيْرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ إِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) رُجُوْعًا عَلَى إِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَعَدَمِ التُّهْمَةِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح) لَا يَجُوْزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفْوًا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ بِالْأَكْفَاءِ قُلْنَا الْعُرْفُ مُشْتَرَكٌ أَوْ هُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ مُقَيِّدًا وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ إِعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ فِيْ هٰذَا إِسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَعْجِزُ عَنِ التَّزَوُّجِ بِمُطْلَقِ الزَّوْجِ فَكَانَتِ الْإِسْتِعَانَةُ فِي التَّزَوُّجِ بِالْكُفْوِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো লোককে আদেশ করে যে, তার সঙ্গে যেন একজন মহিলাকে বিবাহ দেয়। আর সে একই আকদে দুজন স্ত্রীলোককে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে একজনেরও বিবাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা উভয়ের বিবাহ কার্যকর করার কোনো যুক্তি নেই। তার আদেশের বিরোধিতা করার কারণে। আর অজ্ঞতার কারণে অনির্ধারিতভাবে একজনের বিবাহ কার্যকর করার যুক্তি নেই, নির্ধারণ করারও কোনো যুক্তি নেই। অগ্রাধিকারের কারণ না থাকার কারণে। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে গেল। কোনো অভিজাত ব্যক্তি যদি একজন স্ত্রীলোককে তার সঙ্গে বিবাহ দানের জন্য কাউকে আদেশ করল, আর সে অন্য একজনের একটি দাসীকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিল, তাহলে জায়েজ হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। [এটা বলা হলো] 'স্ত্রীলোক' শব্দটি নিঃশর্ত ও সাধারণ হওয়ার এবং অপবাদের অবকাশ না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কুফূতে বিবাহ না দিলে তা জায়েজ হবে না। কেননা নিঃশর্ত শব্দ প্রচলিত অর্থেই প্রয়োগ হয়। আর তা হলো কুফূর সাথে বিবাহ দান। এর জবাবে আমরা বলি, এ ব্যাপারের প্রচলনে [স্বাধীনা নারী ও দাসী] উভয়ে অন্তর্ভুক্ত। কিংবা এটা হলো কার্য-সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ। সুতরাং এটা শব্দের অর্থের শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত না। [ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাবসূত কিতাবের] উকালত অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, যে, সাহেবাইনের মতে এক্ষেত্রে কুফূ বিষয়টি বিবেচনা করা সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিলভিত্তিক। কেননা, যে কেউ সাধারণ স্ত্রী বিবাহ করতে অক্ষম হয়ে থাকে না। সুতরাং সাহায্য গ্রহণ সমপাত্রী বিবাহ করার জন্যই বলে বুঝা যাবে।

১. সিদাক ২. নিহ্লাহ্ । এ দু'টি নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

৩. আজর। এ নামটিও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

৪. ফারীযা। কুরআনে কারীমে এর বর্ণনাও রয়েছে। যেমন- وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً

৫. মহর। এ নামটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- فَاِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ

৬. আলীকা । যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ مَا تَرَاضٰى بِهِ الْاَهْلُوْنَ - হাদীসটির মধ্যে আলায়িক দ্বারা মহর উদ্দেশ্য।

৭. উকরু। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, عُقْرُ نِسَائِهَا - এখানে উকর দ্বারা মহর উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সাত নামের মধ্যে চার নাম কুরআনে আর তিন নাম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মহরের সংজ্ঞা : اَلْمَهْرُ শব্দটি মাসদার, অর্থ- বিবাহের আর্থিক বিনিময়। বহুবচনে مُهُوْرٌ পরিভাষায় মহর হলো-

هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فِيْ عَقْدِ النِّكَاحِ فِيْ مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ، اِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ اَوْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ .

"সম্ভোগের বিনিময় স্বরূপ যে অর্থ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী বিবাহের সময় লাভ করে কিংবা তা আদায়ের প্রতিশ্রুতি পায়, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় মহর বলে।" -[আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ]

মহর দু'ধরনের হয়- مُعَجَّلٌ [নগদ] ও مُؤَجَّلٌ [মেয়াদী]। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে যে মহর আদায় করে দেওয়া হয় তাকে مُعَجَّلٌ আর যা পরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট তারিখে কিংবা সময়সাপেক্ষে প্রদানের ওয়াদা করা হয় তাকে مُؤَجَّلٌ বলে। সামর্থ্যের অধিক মহর ধার্য করা উচিত নয়। মানুষ গর্ব ও সুখ্যাতির অন্ধ মোহে মোটা অংকের মহর ধার্য করে থাকে। কখনো বা স্বামী যাতে স্ত্রীকে সহসা তালাক দিতে না পারে সে লক্ষ্যে তা করে থাকে। শরিয়ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো বিবেচনায়ই এর গ্রহণযোগ্যতা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً "স্বল্প ব্যয়বিশিষ্ট বিবাহ অধিক বরকতময়।"

মহরে ফাতেমীর পরিমাণ : রাসূল দুহিতা হযরত ফাতেমা (রা.) -এর জন্য যে মহর ধার্য করা হয়েছিল অনেক লোক সুন্নত স্বরূপ তা অনুকরণ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এতে সুন্নতের অনুকরণ হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একে সুন্নত ভাবা ভুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের বিবাহের মহর হাজার দু হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন এবং কমও করেছেন। তিনি হযরত ফাতেমার মহর পাঁচশত দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক তিনি এ হিসাব বের করেছেন। যারা মহরে ফাতেমী ধার্য করতে চান তাদের উচিত হবে, উক্ত পরিমাণ রূপার যখন যা বাজার মূল্য তা ধার্য করা। ১৩১ তোলা তিন মাশা [=১৫৩১ গ্রাম] রূপার মহরে ফাতেমীর উপর যদি বিবাহ করা হয় আর স্বামী তা নগদ আদায় করতে চায় তাহলে তখনকার বাজার অনুযায়ী তা দিবে। আর পরে আদায় করলে সে সময়ের মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী আদায় করবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, যদিও মহর উল্লেখ না করা হয়। দলিল হলো, নিকাহ বা বিবাহ মিলন ও দাম্পত্য বন্ধনের চুক্তিকে বলা হয়, আর স্বামী-স্ত্রী দ্বারা এই অর্থ পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহরের কোনো প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ الخ - এখন যদি আমরা মহরের উল্লেখকে শর্ত করে দেই, তাহলে কুরআনের উপর আধিক্য দেওয়া (زِيَادَتِيْ) আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা জায়েজ নেই। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন শরয়ীভাবে মহর ওয়াজিব, তখন মহর ছাড়া বিবাহ কিভাবে সহীহ হবে? জবাব হলো, মহর ওয়াজিব হওয়া বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং মহর ওয়াজিব হয়েছে স্থানের মর্যাদা প্রকাশের জন্য। তাই বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহর উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কেউ

بَابُ الْمَهْرِ

قَالَ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيْهِ مَهْرًا لِاَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ اِنْضِمَامٍ وَازْدِوَاجٍ لُغَةً فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ ثُمَّ الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا اِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى ذِكْرِهٖ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَكَذَا اِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ اَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ (رح) وَاَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) مَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ ثَمَنًا فِى الْبَيْعِ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مَهْرًا لَهَا لِاَنَّهٗ حَقُّهَا فَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ اِلَيْهَا وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِاَنَّهٗ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوْبًا اِظْهَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهٗ خَطَرٌ وَهُوَ الْعَشَرَةُ اِسْتِدْلَالًا بِنِصَابِ السَّرِقَةِ ـ

পরিচ্ছেদ : মহর

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মহর নির্ধারণ করা না হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা আভিধানিক অর্থে নিকাহ বা বিবাহ হলো মিলন ও দাম্পত্য বন্ধন। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর বিদ্যমানেই তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর মহর শরিয়তের বিধানে ওয়াজিব সম্পর্কিত স্থানের মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং নিকাহ শুদ্ধ করার জন্য তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ "স্ত্রী মহর পাবে না" এ শর্তে বিবাহ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কারণেই যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। [অর্থাৎ বিবাহের হাকীকত ও মূল অর্থে মহরের বিষয়টি নেই। মহর শর্ত করা হয়েছে শুধু সম্ভোগ-অঙ্গের মর্যাদা প্রকাশের জন্য]। এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিক্রয় ক্ষেত্রে যা কিছু মূল্যরূপে সাব্যস্ত হতে পারে তা স্ত্রীর মহররূপে সাব্যস্ত হতে পারবে। কেননা মহর হলো স্ত্রীর হক। সুতরাং তার পরিমাণ নির্ধারণের অধিকারও তার হাতেই থাকবে। আমাদের দলিল হলো– নবী করীম ﷺ -এর বাণী– لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ 'দশ [দিরহাম] -এর কমে কোনো মহর নেই।' তাছাড়া স্ত্রীর বিশেষ স্থানের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে এটা শরিয়তের হক। সুতরাং তা সম্মানজনক পরিমাণে নির্ধারিত হতে হবে। আর তা হলো দশ [দিরহাম] চুরির নেসাবের উপর কিয়াস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) নিকাহের রুকন এবং শর্তাবলি থেকে অবসর হওয়ার পর নিকাহের হুকুম বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। নিকাহের হুকুম হলো মহর ওয়াজিব হওয়া। কেউ কেউ বলেন, মহর হলো মাল। কেউ কেউ বলেন, মহর হলো নিহলা। নিহলা বলা হয় ঐ মালকে, যা বিবাহের সময় উল্লেখ করা হয়। হযরত কাকী (র.) বলেন, মহরের সাতটি নাম রয়েছে। যথা–

وَلَوْ سُمِّيَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) مَهْرُ الْمِثْلِ لِاَنَّ تَسْمِيَةَ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَعَدَمِهَا وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ هٰذِهِ التَّسْمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَقَدْ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشَرَةِ فَاَمَّا مَا يَرْجِعُ اِلٰى حَقِّهَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُوْنَهَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ لِاَنَّهَا قَدْ تَرْضٰى بِالتَّمْلِيْكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُّمًا وَلَا تَرْضٰى فِيْهِ بِالْعِوَضِ الْيَسِيْرِ ۔

অনুবাদ : যদি মহর দশ দিরহামের কম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে সে দশ দিরহামই পাবে। এটি আমাদের মাযহাব। ইমাম যুফার (র.) বলেন, সে মহরে মিছিল পাবে। কেননা, যা মহর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় তার নাম নেওয়া না নেওয়ারই মতো। আমাদের দলিল হলো, উক্ত পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ফাসাদ' এসেছে শরিয়তের দাবিতে আর মহর দশ দিরহামে উন্নীত করার মাধ্যমে শরিয়তের হক রক্ষিত হয়ে গেছে। আর স্ত্রীর হক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দশ দিরহামের কমেও তার সম্মতি প্রমাণ করে যে, দশ দিরহামে সে রাজি আছে। মহর নির্ধারণ না করার বিষয়টির উপর কিয়াস করার অবকাশ নেই। কেননা, বদান্যতা হিসেবে বিনিময় ছাড়া মালিকানা প্রদানে সে সম্মত হতে পারে, কিন্তু সামান্য পরিমাণ বিনিময় গ্রহণে সম্মত নাও হতে পারে। [দশ বা তার কম নির্ধারণের ক্ষেত্রে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ سُمِّيَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ الخ : মাসআলা : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সময় যদি দশ দিরহামের কম উল্লেখ করা হয়, তাহলে আমাদের মতে, স্ত্রী দশ দিরহামই পাবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কারণ এমন জিনিসকে মহর নির্ধারণ করা যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না [তার নাম নেওয়া] নাম না নেওয়ার মতোই। আর নাম না নেওয়ার সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়, তাই এখানেও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হলো– দশ দিরহামের কমের নামকরণের ফাসাদ এসেছে শরিয়তের দাবির কারণে, আর শরিয়তের দাবি পূর্ণ হয়ে যায় দশ দিরহাম দ্বারা। তাই দশ দিরহাম পূর্ণ করে দেওয়া হবে। অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। এখন দশ দিরহামের উপর স্ত্রীও রাজি আছে কি নেই ? এ পর্যায়ে আমরা বলব, যখন সে দশ দিরহামের কমে রাজি হয়ে গেল, তখন তো দশ দিরহামের উপর অবশ্যই রাজি হবে। মোদ্দাকথা হলো, মহরের মধ্যে শরিয়ত ও স্ত্রী উভয়ের হক রয়েছে, তাই উভয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর দশ দিরহামের মধ্যে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কেননা, শরিয়তের হকই হলো দশ দিরহাম পর্যন্ত। অতিরিক্তের মধ্যে যদিও স্ত্রীর দাবি রয়েছে, কিন্তু সে দশ দিরহামের কমে রাজি হওয়ার কারণে দশ থেকে অতিরিক্তের মধ্যে তার নিজের হক বিলুপ্ত করে দিয়েছে, যার পূর্ণ এখতিয়ার তার রয়েছে। ইমাম যুফার (র.) -এর কিয়াসের জবাব হলো, দশের কমে নাম নেওয়াকে নাম না নেওয়ার উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কারণ মানুষ কখনো কখনো তার পূর্ণ দাবি ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। বদান্যতা এবং প্রাধান্যের উত্তম বংশ পরম্পরাকে সম্মান করার জন্য, স্বল্প বস্তুর [বিনিময়] উপর রাজি হয় না। এমনিভাবে স্ত্রী এখানে বিনিময় ব্যতিরেকে মালিকানা লাভের উপর রাজি হতে পারে নিজের বদান্যতা ও মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু দর্প বশত সামান্য বিনিময়ের উপর রাজি হবে না। সুতরাং এর দ্বারা এ কথা আবশ্যক না যে, স্ত্রী যদি একেবারেই মহর না নিতে সম্মত হয়ে যায় তবে সে দশের কমেও সম্মত হতে পারে। তাই এই কিয়াস সঠিক নয়।

যদি প্রশ্ন করে যে, বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহরের উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই, এর দলিল কি ? জবাব হলো, এর উপর কুরআন সাক্ষী আছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

'তোমাদের কোনো পাপ নেই যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে কিংবা তাদের জন্য কিছু মহর নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক দাও তাদেরকে খরচ দাও সামর্থ্যবান সামর্থ্য অনুযায়ী আর সামর্থ্যহীন তার সামর্থ্য অনুযায়ী।' উক্ত আয়াতের মধ্যে মহরের নাম উল্লেখ ছাড়া তালাক সহীহ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর তালাক সহীহ হয় বিবাহ সহীহ হলে। সুতরাং বুঝা গেল, মহরের উল্লেখ না করা বিবাহ সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, এমনিভাবে বিবাহ তখনও সহীহ হবে, যখন মহর না দেওয়ার শর্তারোপ করা হয়। দলিল হলো পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) -এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন, মহর না দেওয়ার শর্তারোপ দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে না। দলিল হলো, বিবাহ হচ্ছে বিনিময়ের আকদ। সুতরাং যেমনিভাবে বেচাকেনার মধ্যে মূল্য না দেওয়ার শর্তারোপ দ্বারা বেচাকেনা বাতিল হয়ে যায় তেমনিভাবে মহর না দেওয়ার শর্তারোপ দ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এর জবাবে আমরা বলব, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যদি মহরের উল্লেখ না করা হয় এবং সুস্পষ্টভাবে বাদ (نَفِيْ) না দেওয়া হয় তবে বিবাহ জায়েজ। তাই এমনিভাবে যদি মহরকে বাদ দেওয়া হয় তবুও বিবাহ সহীহ হবে। কেননা উল্লেখ না করা আর বাদ দেওয়ার হুকুমের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। যেমন– বেচাকেনার মধ্যে যদি মূল্যকে বাদ দেওয়া হয় কিংবা মূল্যের উল্লেখ না করা হয় উভয় সুরতে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَاَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ الخ : মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই। তবে সর্বনিম্ন পরিমাণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক (র.) বলেন, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ একদিনারের চার ভাগের এক ভাগ [$\frac{১}{৪}$] কিংবা তিন দিরহাম। ইবনে শুবরুমা (র.) বলেন, কমপক্ষে পাঁচ দিরহাম। হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেন, চল্লিশ দিরহাম। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মতে, সর্বনিম্ন পঞ্চাশ দিরহাম হওয়া উচিত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যা কিছু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যরূপে সাব্যস্ত হতে পারে তা বিবাহ-শাদির ক্ষেত্রে মহরও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, মহর স্ত্রীর হক, সুতরাং তা গ্রহণ করা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারই অধিকার থাকবে। বুঝা গেল, মহর স্ত্রীরই হক তাই তার পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তারই অধিকার থাকবে।

আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'দশ দিরহামের কমে কোনো মহরই নেই।' দ্বিতীয় আকলী দলিল হলো, যৌনাঙ্গের [সম্পর্কিত স্থানের] মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য মহর শরিয়তের হক। তাই এতটুকুন পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত যার দ্বারা স্থানের মর্যাদা ও সম্পর্কিত স্থানের মর্যাদা প্রকাশিত হয়। আমরা দেখেছি, চুরির নেসাব হলো দশ দিরহাম। তাই মনে হয় যেন দশ দিরহাম চুরি করার দ্বারা হাত কেটে দেওয়া হয়। সুতরাং বুঝা গেল, মানুষের একটি অঙ্গ তথা হাত -এর মূল্য সর্বনিম্ন দশ দিরহাম। সুতরাং এর উপর কিয়াস করে বিবাহের ক্ষেত্রেও যৌনাঙ্গের মূল্য সর্বনিম্ন দশ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ سَمّٰى مَهْرًا عَشَرَةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামীস্ত্রীর মহর নির্ধারণ করেছে দশ দিরহাম কিংবা ততোধিক। তারপর সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। কিংবা স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়ে গেছে, তাহলে উভয় সূরতে স্বামীর উপর নির্ধারিত পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। দলিল, সহবাসের কারণে বিনিময় তথা যৌনাঙ্গ সমর্পণ করা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর বিনিময়কৃত বস্তু সোপর্দ করার দ্বারা বদল বা বিনিময়ও ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই স্বামীর উপর বদল তথা মহর ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর কারণে কোনো বস্তু তার শেষ সীমায় পৌঁছে যায় এরপর আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না, আর কোনো বস্তু তার শেষ সীমায় পৌঁছে স্থিত ও দৃঢ় হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহ তার সকল আহকাম ও দায়-দায়িত্ব সহই ওয়াজিব হবে। আর বিবাহের হুকুম মহরও বটে, তাই মৃত্যুর কারণে এটিও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সূরত হলো, ঐ মহিলাকে সহবাস এবং প্রকাশ্য সাক্ষাতের পূর্বে তালাক দিয়েছে তাহলে স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার এর দলিল হিসেবে আয়াতে কারীমা পেশ করেছেন। অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে যদি তোমরা তালাক দাও এবং মহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিয়ে দাও। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ الخ : সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি কিয়াস পরস্পর বিরোধী। এক কিয়াসের দাবি হলো, স্বামীর উপর পুরো নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে। কেননা স্বামী স্বেচ্ছায় নিজের দাবির ক্ষেত্রে সম্ভোগ অধিকার হাতছাড়া করেছে। আর এটি এমন হলো যেমন ক্রেতা পণ্য ধ্বংস করে দিয়েছে বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করার পূর্বেই, তাহলে ক্রেতার উপর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। সুতরাং এখানেও এমনটিই হবে। দ্বিতীয় কিয়াসের দাবি হলো, স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব না হওয়া। নির্ধারিত পূর্ণ মহরও না, অর্ধেক মহরও না। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার সূরতে مَعْقُودٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ চুক্তিকৃত বস্তুটি [যৌনাঙ্গ] স্ত্রীর নিকট অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। সুতরাং বিনিময়কৃত বস্তুটি যখন স্ত্রীলোকটির নিকট পরিপূর্ণভাবে ফিরে এসেছে তাই স্বামীর উপর বদল তথা মহরও ওয়াজিব হবে না। যেমন– বিক্রয়-চুক্তি বিলুপ্ত করে দেওয়ার সূরতে যদি পণ্য ক্রেতার নিকট ফিরে আসে তখন ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে এখানেও স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যখন উভয় কিয়াস পরস্পর বিরোধী তাই আমরা "নস" -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আর "নস" -এর মধ্যে অর্ধেক মহর ওয়াজিব করা হয়েছে। তাই "নস" অনুযায়ী স্বামীর উপর ঐ সূরতে নির্ধারিত অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন– قَبْلَ الْخَلْوَةِ তথা একান্ত সাক্ষাতের পূর্বের শর্ত আরোপ করেছেন। এজন্য আমাদের মতে একান্ত সাক্ষাতও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। তাই যে হুকুম সহবাসের হবে সে হুকুম একান্ত সাক্ষাতেরও হবে।

قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا اَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى اَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ عَلٰى اَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُوْلِ لَهُ اَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ اِبْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ فِيْ اِسْقَاطِهِ اِنْتِهَاءً وَلَنَا اَنَّ الْمَهْرَ وُجُوْبًا حَقُّ الشَّرْعِ عَلٰى مَا مَرَّ وَاِنَّمَا يَصِيْرُ حَقًّا لَهَا فِيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ فَتَمْلِكُ الْاِبْرَاءَ دُوْنَ النَّفْيِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ (الْاٰيَةَ) ثُمَّ هٰذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوْعًا اِلَى الْاَمْرِ وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ (رح) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি কেউ কোনো মহর নির্ধারণ না করে কিংবা মহর না দেওয়ার শর্ত নির্ধারণ করে থাকে তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে। যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয়ে থাকে কিংবা স্ত্রী রেখে মারা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [সহবাসের পূর্বে] মৃত্যুর বেলায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর মিলনের বেলায় শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে মহর ওয়াজিব হবে। তাঁর দলিল হলো, মহর সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর হক। সুতরাং সূচনাতেই সে না নেওয়ার মত ব্যক্ত করতে পারে, যেমন পরবর্তীতে রহিত করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের দলিল হলো, [সূচনাতে] মহর ওয়াজিব হওয়া শরিয়তের হক। যেমন- পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর পরবর্তীতে অব্যাহত থাকা অবস্থায় তা স্ত্রীর হক -এ পরিণত হয়। তাই সে অব্যাহতি দেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু সূচনাতে তা অগ্রাহ্যের অধিকার থাকবে না। যদি মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দেয় তাহলে সে মুত'আ পাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ 'আর তোমরা তাদেরকে মুত'আ দান কর সচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সচ্ছলতার পরিমাণে।' আর [আয়াতে বর্ণিত] আদেশবাচক শব্দের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত মুত'আ ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا الخ : গ্রন্থকার (র.) এখানে দুই সুরত বর্ণনা করেছেন- ১. প্রথম সুরত হলো, বিবাহ করেছে, কিন্তু মহরের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেছে; উল্লেখ বা অনুল্লেখ কিছুই করেনি। ২. দ্বিতীয় সুরত হলো, বিবাহ করেছে এবং মহর না দেওয়ার শর্তারোপ করেছে, উভয় সুরতে আমাদের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো স্ত্রীর সাথে সহবাস করা কিংবা স্বামী মৃত্যুবরণ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, "সহবাসের পূর্বে"মৃত্যুর সুরতে স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। অধিকাংশ শাফেয়ীগণ বলেন, সহবাসের সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যেমনটি আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, মহর সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর হক। সুতরাং সে যেমনিভাবে পরবর্তীতে রহিত করার ক্ষমতা রাখে তেমনিভাবে সূচনাতেও না নেওয়ার মত ব্যক্ত করতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) একটি হাদীস দ্বারাও দলিল

পেশ করেন, যা হযরত আলী, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো- قَالُوْا لَهَا الْمِيْرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

"ঐ মহিলার জন্য মিরাস আছে, মহর নেই এবং তার উপর ইদ্দত রয়েছে।" আমাদের দলিল হলো, মহর ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে শরিয়তের হক। যেমন নিম্নের আয়াতদ্বয় তথা- قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا - اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -এর কারণে। উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা উসূলে ফিকহের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মহরের মধ্যে তিনটি হক রয়েছে- ১. শরিয়তের হক। তা হলো এই যে, দশ দিরহামের কম না হওয়া। ২. অভিভাবকদের হক। তাদের হক হলো মহরে মিছিল থেকে কম না হওয়া। ৩. স্ত্রীর হক। তার হক হলো, মহর তার মালিকানা। কিন্তু শরিয়তের হক আর অভিভাবকদের হক শুধু বিবাহের সূচনাতে বিবেচ্য। আর স্ত্রীর হক ধর্তব্য অবশিষ্ট অবস্থার মধ্যে। তাই স্ত্রী পরবর্তীতে তো রহিত করতে পারে, কিন্তু সূচনাতে রহিত করতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ কথা বলা যে, সূচনাতে রহিত করতে পারে - এর জবাব এই যে, এটি হলো স্বীয় হক থেকে অতিক্রম করে যাওয়া যার অনুমতি শরিয়ত প্রদান করে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا الخ : আর যদি ঐ স্ত্রীকে মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তাহলে তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব হবে। দলিল হলো কুরআনে বর্ণিত নিম্নের আয়াত-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ .

উক্ত আয়াতে কারীমায় اَوْ শব্দটি وَاوْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও কিংবা তাদের জন্য মহর নির্ধারণ না কর এবং তাদেরকে মহর দিয়ে দাও।

মুত'আ ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) মোস্তাহাব বলেন, হানাফীগণ ওয়াজিব বলেন। ইমাম মালেক (রা.) -এর দলিল হলো, কুরআনে কারীমে মুত'আ দানকারীকে মুহসিন বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর মুহসিন নফল আদায়কারীকে বলা হয়। আমাদের দলিল ও ইমাম মালেক (র.) -এর জবাব এই যে, مَتِّعُوْا শব্দটি اَمْر -এর সীগাহ, যা ওয়াজিব হওয়াকে দাবি করে। দ্বিতীয় শব্দ হলো, حَقًّا তাও ওয়াজিব হওয়াকে চায়। তৃতীয় শব্দ عَلٰى যা অবধারিতকরণকে চায়। বাকি রইল শুধু মুহসিন (مُحْسِنْ) শব্দটি, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ঐ সকল লোক যারা ওয়াজিবকে আদায় করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে ইহসান হিসেবে আরো বৃদ্ধি করে, এখন আর মুহসিন শব্দটি ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল থাকে না।

وَالْمُتْعَةُ ثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ وَهٰذَا التَّقْدِيْرُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَقَوْلُهُ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ (رحـ) فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ عَمَلًا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ثُمَّ هِيَ لَا تُزَادُ عَلٰى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَيُعْرَفُ ذٰلِكَ فِي الْاَصْلِ ـ

অনুবাদ : আর মুত'আ হলো তার পোশাকের সমপর্যায়ের তিনটি বস্ত্র– কামিজ, ওড়না ও চাদর। এ নির্ধারণ হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) -এর বক্তব্য "তার পোশাকের সমপর্যায়ের" দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচ্য। ওয়াজিব মুত'আর ক্ষেত্রে এটাই ইমাম কারখী (র.) -এর মত। কেননা, তা মহরে মিছিলের স্থলবর্তী। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ -এর উপর আমল হিসেবে স্বামীর অবস্থাই বিবেচ্য হবে। তবে তা মহরে মিছিলের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না, আবার পাঁচ দিরহামের কমও হবে না। এ বিস্তারিত বিবরণ মাবসূত কিতাব থেকে জানা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْمُتْعَةُ ثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ الخ : মুত'আ হলো তিনটি কাপড়-কামিজ, ওড়না, চাদর। এ তিন কাপড়ের নির্ধারণ হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুদূরী مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুত'আর ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে, ওয়াজিব মুত'আর ক্ষেত্রে ইমাম কারখী (র.) -এর এটাই মত। দলিল এই যে, মুত'আ হলো মহরে মিছিলের স্থলবর্তী আর মহরে মিছিলের মধ্যে স্ত্রীদের অবস্থা বিবেচনা করা হয়, তাই যা তার স্থলবর্তী হবে তার মধ্যেও স্ত্রীদের অবস্থারই বিবেচনা করা হবে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, স্বামীর অবস্থায়ই বিবেচ্য হবে। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ - আল্লাহ স্বামীর অবস্থান বিবেচনা করেছেন, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করেননি। মুত'আ তিন ধরনের– নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ। নিম্নমানের মুত'আ হলো তিন কাপড় সূতির হওয়া। মধ্যম মানের হলো, তিন কাপড় তিস্‌রের হওয়া। তিস্‌র হলো অপক্ব রেশমী কাপড় যা সূতীর চেয়ে উন্নত। উচ্চমানের হলো তিন কাপড়ই রেশমের হওয়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ لَا تُزَادُ عَلٰى نِصْفِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুত'আর মধ্যে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করা হোক বা স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা হোক অর্ধেক মহর মহরে মিছিল থেকে বেশি এবং পাঁচ দিরহাম থেকে কম হতে পারবে না। অর্ধেক মহর- মহরে মিছিল -এর অধিক এ কারণে হতে পারবে না যে, নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে অধিক শক্তিশালী। কারণ, নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হয় আকদ এবং নাম নেওয়া দ্বারা আর মহরে মিছিল ওয়াজিব হয় নিরেট আকদ দ্বারা। এখন যদি এমন বিবাহে যার মধ্যে মহরের নাম নেওয়া হয়েছে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তাহলে নির্ধারিত অর্ধেক মহরের অতিরিক্ত মহর দেওয়া হবে না। সুতরাং এমন বিবাহে যার মধ্যে মহরের নাম নেওয়া হয়নি, তার মধ্যে মহরে মিছিলের অধিক অবশ্যই দেওয়া হবে না। আর পাঁচ দিরহামের কম এজন্য দেওয়া যাবে না যে, মুত'আ ওয়াজিব হয়েছে যৌনাঙ্গের বিনিময়ে। কোনো বিনিময় দশ দিরহামের কমে হয় না, তাই অর্ধেক বিনিময়ও পাঁচ দিরহামের কমে হবে না।

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِيَ لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (رح) الْأَوَّلِ نِصْفُ هٰذَا الْمَفْرُوضِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فَيَتَنَصَّفُ بِالنَّصِّ وَلَنَا أَنَّ هٰذَا الْفَرْضَ تَعْيِينٌ لِلْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَ ذٰلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا الْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ.

অনুবাদ : যদি মহর নির্ধারিত না করেই কোনো মহিলাকে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কোনো মহর নির্ধারণে সম্মত হয় তাহলে স্ত্রী উক্ত নির্ধারিত মহরই পাবে, যদি স্বামী তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে কিংবা তাকে রেখে মারা যায়। আর যদি মিলিত হওয়ার পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দেয় তবে সে মুত'আ পাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত অনুযায়ী উক্ত নির্ধারিত মহরের অর্ধেক পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ মত। কেননা এটা নির্ধারিত মহর হয়ে গেছে। কুরআনের ভাষ্য– (نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) অনুযায়ী তার অর্ধেক হবে। আমাদের দলিল হলো, এ নির্ধারণের অর্থ হলো আকদের মাধ্যমে যা ওয়াজিব হয়েছে, তা নির্ধারণ করা। আর তা হলো মহরে মিছিল। আর মহরে মিছিল কখনো অর্ধেক হয় না। সুতরাং যাকে মহরে মিছিলের স্থলবর্তী করা হয়েছে, তাও অর্ধেক হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেখানে আকদের মধ্যে নির্ধারণ উদ্দেশ্য। কেননা নির্ধারণের এ অর্থই প্রচলিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, বিবাহের সময় মহর উল্লেখ করেনি, তারপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। এখন যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে উভয় সূরতে এ নির্ধারিত পরিমাণ মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তরফাইনের মতে স্ত্রীর জন্য মুত'আ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম অভিমত হলো, নির্ধারিত মহরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দ্বিতীয় মত হলো তরফাইনের অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম অভিমতের দলিল হলো, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঐকমত্যে যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছে তা একটি নির্ধারিত পরিমাণ। আর আয়াতে কারীমা– فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক প্রমাণিত হয়– আকদের মধ্যে পরিমাণ নির্ধারিত হোক বা আকদের পরে হোক। তাই ঐ সূরতেও যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তাহলে নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব হবে; মুত'আ ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো, আকদে নিকাহের সময় যদি মহরের উল্লেখ না করা হয় তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। সুতরাং ঐ সূরতেও বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না হওয়ার কারণে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে গেছে। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী একটি পরিমাণের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে আর এই পরবর্তীতে নির্ধারণকৃত পরিমাণ মূলত আকদের মাধ্যমে যা ওয়াজিব হয়েছে তা-ই নির্ধারণকরণ। আকদের মাধ্যমে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়েছিল। আর মহরে মিছিল অর্ধেক হয় না, তাই যার স্থলবর্তী হবে তাও অর্ধেক হবে না। দলিলের সারাংশ হলো, এই নির্ধারিত পরিমাণ মূলত আকদের পর মহরে মিছিলের নির্ধারণ। আর মহরে মিছিল অর্ধেক হয় না, তাই যা তার স্থলবর্তী অর্থাৎ আকদের পর নির্ধারিত পরিমাণ তারও অর্ধেক হবে না। আর যখন অর্ধেক হতে পারে না তখন মুত'আ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে আয়াত তেলাওয়াত করেছেন অর্থাৎ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ তার জবাব হলো, আয়াতের মধ্যে আকদের অবস্থায় নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য; আকদের পর নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য নয়। এর কারণ হলো, আয়াতটি নিঃশর্ত। আর যখন নিঃশর্ত বলা হয় তখন এর দ্বারা প্রচলিত অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আকদের মধ্যে নির্ধারণই হলো প্রচলিত অর্থ; আকদের পর নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আকদের মধ্যে নির্ধারণ – এ অর্ধেক করা হবে; আকদের পরের নির্ধারণের মধ্যে অর্ধেক করা হবে না।

قَالَ فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ إِنْشَاءَ اللّٰهُ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعَلٰى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) أَوَّلًا تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عِنْدَهُمَا يَخْتَصُّ بِالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ وَعِنْدَهُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ فِيهِ عَلٰى مَا مَرَّ وَإِنْ حَطَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا وَالْحَطُّ يُلَاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আকদের পরে যদি স্বামী তার স্ত্রীর মহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয় তাহলে ঐ বর্ধিত পরিমাণ স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি আমরা বিক্রীত-দ্রব্য এবং তার মূল্য বর্ধিত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। আর এ বর্ধিতকরণ যখন গ্রহণযোগ্য হলো তখন মিলনের আগে তালাক দিলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী মূল মহরের সঙ্গে বর্ধিত পরিমাণও অর্ধেক হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো তাদের মতে অর্ধেক হওয়ার বিষয়টি আকদের সময় নির্ধারিত মহরের সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, আকদের পরে নির্ধারণ আকদের সময় নির্ধারণের অনুরূপ। যেমন– ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি স্ত্রী তার নির্ধারিত মহরের পরিমাণ হ্রাস করে, তাহলে এ হ্রাস শুদ্ধ হবে। কেননা মহর হলো তার হক। আর [সূচনাতে মহর নাকচ করার অধিকার না থাকলেও] পরবর্তী অবস্থায় হ্রাসকরণের বিষয়টি মহরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ الخ : আকদে নিকাহের পর স্বামী যদি নির্ধারিত মহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং স্ত্রী ঐ মজলিসেই তা কবুল করে নেয় তাহলে আমাদের মতে, স্বামীর উপর ঐ বর্ধিত পরিমাণ বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, বর্ধিতকরণ সহীহ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, বর্ধিতকরণ হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ দান বিশেষ। তাই মূল আকদের সাথে যুক্ত হবে না। যদি স্ত্রী গ্রহণ করে নেয় তবে মালিক হবে অন্যথায় নয়। আমাদের দলিল হলো কুরআনে কারীমের আয়াত– وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ "তোমাদের কোনো পাপ নেই যখন তোমরা পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাও নির্ধারণ করার পর।" উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) লিখেছেন যে, যদি স্বামী-স্ত্রী মহর নির্ধারণ করার পর কোনো কিছুতে রাজি হয়ে যায়। যেমন– স্ত্রী খুশি হয়ে মহর কম করে দিল কিংবা স্বামী সন্তুষ্টচিত্তে নির্ধারিত মহরে কিছু বর্ধিত করল, তবে এতে তাদের স্বাধীনতা রয়েছে এর মধ্যে কোনো পাপ নেই। মোদ্দাকথা, কম করুক বা বর্ধিত করুক পরস্পরের সন্তুষ্টি দরকার। আইম্মায়ে ছালাছা ও ইমাম যুফার (রা.) -এর মধ্যকার মূল মতবিরোধটি হলো বিক্রীত দ্রব্য এবং তার মূল্য বর্ধিত করা প্রসঙ্গে, যা بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ -এর পর একটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। মতবিরোধটি হলো, হানাফীগণের মতে ক্রেতা মূল্যের মধ্যে আর বিক্রেতা পণ্যের মধ্যে বর্ধিত করতে পারে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে পারে না। মোটকথা, আমাদের মতে যখন মহরের মধ্যে বর্ধিতকরণ জায়েজ তখন সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতে মূলের সাথে বর্ধিত পরিমাণও অর্ধেক হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম অভিমত হলো, মূল মহরের সঙ্গে বর্ধিত পরিমাণও অর্ধেক হবে। তরফাইনের মতে, মূল মহর তো অর্ধেক হবে, কিন্তু বর্ধিত পরিমাণ অর্ধেক হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আকদের পর নির্ধারিত পরিমাণ এমন যেমন আকদের সময় নির্ধারিত পরিমাণ। আমাদের দলিল হলো, অর্ধেক হওয়ার বিষয়টি খাস হলো আকদের সময় নির্ধারিত পরিমাণের সাথে। তাই মূল মহর যা আকদের সময় নির্ধারিত হয়েছিল তার অর্ধেকতো হবে, কিন্তু পরে যা বর্ধিত করা হয়েছে তা অর্ধেক হবে না। আর যদি স্ত্রী তার মহরের মধ্য থেকে কিছু হ্রাস করে দেয় তবে এ হ্রাসকরণ শুদ্ধ হবে। কেননা, মহর হলো স্ত্রীর হক। আর কম করা যুক্ত হলো পরবর্তী অবস্থার সাথে, যা স্ত্রীর সীমা ও অধিকারের মধ্যে রয়েছে। সারাংশ হলো এই যে, স্ত্রী আকদের সূচনাতে শরিয়তের হক হওয়ার কারণে দশ দিরহামের কম করতে পারে না। আর অভিভাবকগণের হকের কারণে মহরে মিছিলে কম করতে পারে না। কিন্তু আকদে নিকাহের পর যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ অবশিষ্ট থাকবে কম করা কার্যকর হবে, নিজের হক হওয়ার কারণে। তবে শর্ত হলো, মজলিসের মধ্যে স্বামী ঐ কম করাকে কবুলও করতে হবে।

وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْيِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَصِيْرُ مُسْتَوْفًى بِالْوَطْيِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ دُوْنَهُ وَلَنَا أَنَّهَا سَلَّمَتِ الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمَوَانِعَ وَ ذٰلِكَ وَسْعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ إِعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ .

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়, আর সেখানে যৌন-সম্ভোগে কোনো বাধা না থাকে অতঃপর সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পূর্ণ মহর পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সে অর্ধেক মহর পাবে। কেননা, যে বিষয়ে আকদ হয়েছে অর্থাৎ সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা, তার পূর্ণভাবে প্রাপ্তি ঘটে সম্ভোগের মাধ্যমে। সুতরাং তা ছাড়া মহর পাকা হবে না। আমাদের দলিল হলো, স্ত্রী যাবতীয় বাধা দূর করার মাধ্যমে বিনিময়কৃত সম্ভোগ-অঙ্গ অর্পণ করে দিয়েছে, আর এতটুকুই তার সাধ্য ছিল। সুতরাং বিক্রয় -এর উপর কিয়াস হিসেবে 'বিনিময়' -এর ক্ষেত্রে তার হক পাকা হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় মিলিত হওয়ার সময় সহবাসের কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। তাহলে আমাদের মতে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে অর্ধেক মহর পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা পূর্ণভাবে অর্জন হয় সহবাস দ্বারা, আর এখানে সহবাস পাওয়া যায়নি। তাই যেন স্বামী বিনিময়কৃত বস্তু গ্রহণ করেনি, তাই স্বামীর উপর বদল তথা মহরও ওয়াজিব হবে না। সুতরাং ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সহবাস ছাড়া মহর দৃঢ় হয় না। আমাদের দলিল হলো, স্ত্রী সম্ভোগ-অঙ্গ তথা বিনিময়কৃত বস্তু স্বামীকে অর্পণ করে দিয়েছে। কেননা স্ত্রী যাবতীয় বাধা দূর করে দিয়েছে, আর স্ত্রীর শক্তি এতটুকুই ছিল; এর অতিরিক্ত ছিল না। সুতরাং স্ত্রী যখন বিনিময়কৃত বস্তু অর্পণ করে দিয়েছে, তাই তার জন্য বদলের হক তথা মহর সাব্যস্ত হবে। তাই স্ত্রীর জন্য ঐ সুরতে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আমরা বিক্রয়ের উপরও কিয়াস করি। যেমন– বিক্রেতা যদি পণ্য এবং ক্রেতার মধ্যকার সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, পণ্য গ্রহণ করাতে কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না তখন বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যের উক্ত অর্পণ সহীহ হবে এবং ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আমাদের মাযহাবের সমর্থন খোলাফায়ে রাশেদীনের ফয়সালায়ও পাওয়া যায়। ফয়সালা হলো– إِنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخٰى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ "যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করল এবং পর্দা দিল তার উপর মহর ওয়াজিব হয়ে গেল এবং ইদ্দত ওয়াজিব হবে।"

وَإِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مَرِيْضًا اَوْ صَائِمًا فِىْ رَمَضَانَ اَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ فَرْضٍ اَوْ نَفْلٍ اَوْ بِعُمْرَةٍ اَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَيْسَتِ الْخَلْوَةُ صَحِيْحَةً حَتّٰى لَوْ طَلَّقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ مَوَانِعُ اَمَّا الْمَرَضُ فَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ اَوْ يَلْحَقُهُ بِهٖ ضَرَرٌ وَقِيْلَ مَرَضُهٗ لَا يَعْرِىْ عَنْ تَكَسُّرٍ وَفُتُوْرٍ وَهٰذَا التَّفْصِيْلُ فِىْ مَرَضِهَا وَاَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ لِمَا يَلْزَمُهٗ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْاِحْرَامُ لِمَا يَلْزَمُهٗ مِنَ الدَّمِ وَفَسَادُ النُّسُكِ وَالْقَضَاءُ وَالْحَيْضُ مَانِعٌ طَبْعًا وَشَرْعًا وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهٗ لِاَنَّهٗ يُبَاحُ لَهُ الْاِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِىْ رِوَايَةِ الْمُنْتَقٰى وَهٰذَا الْقَوْلُ فِى الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَصَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْذُوْرِ كَالتَّطَوُّعِ فِىْ رِوَايَةٍ لِاَنَّهٗ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ. وَالصَّلٰوةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهٖ وَنَفْلُهَا كَنَفْلِهٖ.

অনুবাদ : যদি দুজনের কোনো একজন অসুস্থ থাকে, কিংবা রমজানের রোজা পালন অবস্থায় থাকে, কিংবা ফরজ বা নফল হজের ইহরাম অবস্থায় থাকে, কিংবা ওমরার ইহরাম অবস্থায় থাকে, কিংবা স্ত্রী হায়েজগ্রস্ত থাকে। তাহলে এমতাবস্থায় 'একান্ত মিলন' শুদ্ধ গণ্য হবে না। এমন কি সে যদি তালাক দেয় তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। কেননা, এ বিষয়গুলো সহবাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য। অসুস্থতা অর্থ ঐ অসুস্থতা, যা সহবাসের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে কিংবা সহবাসের দরুন [কোনো একজন] ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো মতে, স্বামীর যে-কোনো অসুস্থতাই যৌন নিস্তেজতা থেকে মুক্ত নয়, [সুতরাং তা প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য হবে] উক্ত ব্যাখ্যা শুধু স্ত্রীর অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রমজানের রোজা প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ এই যে, সহবাসের কারণে কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়। ইহরামের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সহবাসের কারণে দম ওয়াজিব হয়, ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় এবং কাজা ওয়াজিব হয়। আর হায়েজ তো রুচিবোধ ও শরিয়ত উভয় দিক থেকেই প্রতিবন্ধক। যদি উভয়ের কোনো একজন নফল রোজা পালনকারী হয়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। কেননা 'মুনতাকা' কিতাবের বর্ণনা মতে, বিনা ওজরে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা মুবাহ। আর মহরের ক্ষেত্রে এ অভিমতই বিশুদ্ধ। এক বর্ণনা মতে, কাজা ও নজরের রোজা নফল রোজার অনুরূপ। কেননা এতে কাফফারা নেই। আর [এক্ষেত্রে] নামাজ রোজার সমতুল্য অর্থাৎ ফরজ নামাজ ফরজ রোজার এবং নফল নামাজ নফল রোজার সমতুল্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مَرِيْضًا الخ : পূর্বে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, একান্ত মিলন দুই প্রকার– ১. শুদ্ধ একান্ত মিলন (اَلْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ) ও ২. অশুদ্ধ একান্ত মিলন (اَلْخَلْوَةُ الْفَاسِدَةُ)। যদি কোনো ধরনের সহবাসের প্রতিবন্ধক বস্তু বিদ্যমান থাকে তখন যে একান্ত মিলন হবে সেটি হলো অশুদ্ধ একান্ত মিলন। আর যদি সহবাসের প্রতিবন্ধক কোনো বস্তু বিদ্যমান না থাকে তখন যে একান্ত মিলন হবে তাকে শুদ্ধ একান্ত মিলন বলা হয়।

প্রতিবন্ধক অনেক প্রকার। যথা– হাকীকী প্রতিবন্ধক, প্রাকৃতিক (طَبْعِيٌّ) প্রতিবন্ধক, শরয়ী প্রতিবন্ধক এবং হিস্‌সী প্রতিবন্ধক হাকীকী প্রতিবন্ধক যেমন– অসুস্থতা। তবয়ী ও শরয়ী প্রতিবন্ধক যেমন– হায়েয, হায়েয তবয়ী প্রতিবন্ধক এ কারণে যে, তার সাথে হায়েযের রক্ত মিশে থাকবে যা সুস্থ মস্তিষ্ক পছন্দ করে না। আর শরয়ী প্রতিবন্ধক এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ – শুধু তবয়ী প্রতিবন্ধক যেমন– বন্ধ হওয়া অর্থাৎ মহিলাদের লজ্জাস্থানের মুখ বন্ধ হওয়া কিংবা এত ছোট হওয়া যে, সহবাসের অযোগ্য। শুধু শরয়ী প্রতিবন্ধক যেমন– ফরজ হজের ইহরাম, হিস্‌সী প্রতিবন্ধক যেমন– স্বামী-স্ত্রীর ঘরে অন্য কেউ অবস্থান করা বা পাওয়া যাওয়া। জাগ্রত হোক বা ঘুমন্ত হোক। বালেগ হোক বা বোধগম্য সম্পন্ন বাচ্চা হোক।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রতিবন্ধকগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে বলেন, অসুস্থতা হলো প্রতিবন্ধক। কিন্তু অসুস্থতা দ্বারা ঐ অসুস্থতা উদ্দেশ্য যা সহবাসের প্রতিবন্ধক হয় কিংবা সহবাস দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয়, শর্তহীন (مُطْلَقًا) অসুস্থতা উদ্দেশ্য নয়। কারো কারো অভিমত হলো পুরুষের অসুস্থতা শর্তহীনভাবে প্রতিবন্ধক। কেননা শর্তহীন অসুস্থতা দ্বারা অঙ্গ বিদীর্ণ এবং অলসতা থাকে তাই পুরুষের সহবাসের জন্য আনন্দবোধ হবে না, এজন্য পুরুষের শর্তহীন অসুস্থতাকে প্রতিবন্ধকরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা শুধু স্ত্রীর অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মোদ্দাকথা হলো, স্ত্রীর অসুস্থতা মতবিরোধিতা ছাড়াই বিভাজ্য, আর স্বামীর অসুস্থতা কারো কারো মতে বিভাজ্য আবার কারো কারো মতে বিভাজ্য নয়। তবে স্বামীর অসুস্থতা সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক। রমজানের রোজাও বিশুদ্ধ একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক। কারণ রমজানের রোজা রাখা অবস্থায় যদি সহবাস করা হয় তখন কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে গুনাহগারও হবে। উল্লেখ্য যে, এগুলোর মধ্যে কষ্ট রয়েছে। তাই রমজানের রোজাও একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক হবে। আর ইহরাম এ কারণে প্রতিবন্ধক যে, যদি ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হয় তখন মুহরিমের উপর দম ওয়াজিব হবে, অর্থাৎ বকরি বা উট ইত্যাদি জবাই করা ওয়াজিব হবে। আর হজের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, এগুলোর মধ্যেও কষ্ট রয়েছে। তাই ইহরাম ও একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক হবে। হায়েয এজন্য প্রতিবন্ধক যে, হায়েযের অবস্থায় সহবাস করা তবয়ীভাবেও নিষিদ্ধ এবং শরয়ীভাবেও নিষিদ্ধ, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا صَائِمًا الخ : আর যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন নফল রোজা পালনকারী হয় আর এ অবস্থায় একান্ত মিলন ঘটে তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.) নফল রোজাকে একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করেননি। দলিল হলো, মুনতাকা নামক গ্রন্থ লেখক হাকিম আশ্‌শাহীদ আবুল ফজল -এর বর্ণনা অনুযায়ী নফল রোজা আদায়কারী বিনা ওজরে রোজা ভঙ্গ করা মুবাহ। সুতরাং যখন নফল রোজা ভঙ্গের মধ্যে কোনো আপত্তি নেই, তাই তাকে একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুনতাকার উক্ত বর্ণনাকে নিরেট পরিপূর্ণ মহর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অন্যথায় কারো কারো মতে নফল রোজাও একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক। তাইতো নফল রোজাকে বিনা ওজরে বাতিল করা জায়েজ নেই। কাজা ও নফলের রোজার ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে–

১. নফল রোজার ন্যায় কাযা ও নযরের রোজাও একান্ত মিলন বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। দুই. রমজানের রোজার ন্যায় একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক। মুদ্দাকথা এই যে, রমজানের রোজার হালাতে সহবাস করা দ্বারা কাফফারাও ওয়াজিব হয় এবং গুনাহও হয়। আর কাযা ও নযরের রোজার হালাতে যদি সহবাস করা হয় তখন গুনাহগার হবে কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যারা বলেছেন যে, গুনাহগার হবে তারা কাজা ও নযরের রোজাকে রমজানের রোজার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন– নফল রোজার হুকুমে মনে করেননি। আর যারা বলেছেন যে, কাজা ও নযরের রোজা দ্বারা কাফফারা নেই তারা কাজা ও নযরের রোজাকে নফল রোজার অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, নামাজ হলো রোজার অনুরূপ অর্থাৎ ফরজ রোজার যে হুকুম ছিল ফরজ নামাজেরও একই হুকুম হবে। আর নফল রোজার যে হুকুম ছিল নফল নামাজেরও একই হুকুম থাকবে। মোটকথা হলো, ফরজ রোজা ও ফরজ নামাজ উভয়টি একান্ত মিলনের প্রতিবন্ধক। কিন্তু উভয়টির নফল একান্ত মিলন সহীহ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوْبُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِاَنَّهُ اَعْجَزُ مِنَ الْمَرِيْضِ بِخِلَافِ الْعِنِّيْنِ لِاَنَّ الْحُكْمَ اُدِيْرَ عَلٰى سَلَامَةِ الْاٰلَةِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْمُسْتَحِقَّ عَلَيْهَا التَّسْلِيْمُ فِىْ حَقِّ السُّحْقِ وَقَدْ اَتَتْ بِهٖ ـ

অনুবাদ : কর্তিত পুরুষাঙ্গ ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। কেননা সেতো অসুস্থ ব্যক্তির চেয়েও অক্ষম। নপুংসক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মহরের হুকুমটি পুরুষাঙ্গ অক্ষত থাকার উপর আবর্তিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, [কর্তিত পুরুষাঙ্গ স্বামীর] স্ত্রীর কর্তব্য হলো, দলন ও সোহাগের জন্য নিজেকে সমর্পণ করা, আর সে তা করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوْبُ بِامْرَأَتِهِ الخ : মাসআলা : কর্তিত পুরুষাঙ্গ ব্যক্তির একান্ত মিলন ঠিক না বেঠিক ? ইমাম সাহেব (র.) বলেন, কর্তিত পুরুষাঙ্গ ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় তারপর তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর এটাকে বিশুদ্ধ একান্ত মিলন বলা হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, এটি হলো অ-বিশুদ্ধ একান্ত মিলন, তাই যদি তালাক প্রকাশ করে তাহলে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির চেয়ে আরো অধিক অক্ষম। কেননা অসুস্থ ব্যক্তিতো কখনো কখনো সহবাস করতে সক্ষম হয়, কিন্তু পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তিতো কখনোই সহবাস করতে সক্ষমতা লাভ করে না– পুরুষাঙ্গ না থাকার কারণে। তবে নপুংসক ব্যক্তির বিষয়টি হলো ভিন্ন। তার একান্তে মিলন ঠিক আছে। কারণ হুকুম পুরুষাঙ্গ অক্ষত থাকার উপর আবর্তিত হয়, আর পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির তো পুরুষাঙ্গই নেই। সুতরাং নপুংসক ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই উভয়ের হুকুমের মধ্যেও পার্থক্য হবে। নপুংসকের একান্ত মিলন ঠিক; আর পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির একান্ত মিলন বেঠিক। নপুংসক বলা হয়, যে একেবারেই সহবাসে অক্ষম, পুরুষাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও। কেউ কেউ বলেন, যে বিবাহিতা (ثَيِّبَه)-কে সহবাস করতে সক্ষম, কিন্তু কুমারীকে সঙ্গম করতে অক্ষম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, স্ত্রীর কর্তব্য হলো সমপর্ণ করা। অর্থাৎ, সম্ভোগ-অঙ্গকে সমর্পণ করা ওয়াজিব আর এটাই তার সামর্থ্যের ভিতরে রয়েছে। আর স্ত্রী তা করেছে, তাই পুরুষের উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে এবং এটি বিশুদ্ধ একান্ত মিলন হবে।

قَالَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِى جَمِيْعِ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ اِحْتِيَاطًا اِسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّغْلِ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقُ فِى اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ لِاَنَّهُ مَالٌ لَايُحْتَاطُ فِى اِيْجَابِهِ وَ ذَكَرَ الْقُدُوْرِىُّ (رح) فِى شَرْحِهِ اَنَّ الْمَانِعَ اِنْ كَانَ شَرْعِيًّا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِثُبُوْتِ التَّمَكُّنِ حَقِيْقَةً وَاِنْ كَانَ حَقِيْقِيًّا كَالْمَرَضِ وَالصِّغَرِ لَا تَجِبُ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ حَقِيْقَةً ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। সূক্ষ্ম দলিলের ভিত্তিতে–সতর্কতার খাতিরে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। কেননা, গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। আর ইদ্দত হলো শরিয়তের এবং [গর্ভস্থ] সন্তানের হক। সুতরাং অন্যের হক বাতিলের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। মহরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মহর হলো মাল, যা ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি নয়। ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, প্রতিবন্ধকতা যদি শরিয়ত বিষয়ক হয় তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সহবাসের সক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি বাস্তব প্রতিবন্ধকতা থাকে; যেমন– অসুস্থতা কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কতা, তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষেই সক্ষমতা অনুপস্থিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ الخ : পূর্বে বিশুদ্ধ একান্ত মিলন ও অ-বিশুদ্ধ একান্ত মিলনের হুকুম জানা গেছে। বিশুদ্ধ একান্ত মিলন হলো সহবাসের স্থলবর্তী, তাই اَلْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ -এর প্রাক্কালে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব করা হয়েছে। আর اَلْخَلْوَةُ الْفَاسِدَةُ যেহেতু সহবাসের স্থলবর্তী নয়, তাই তার সময়ে স্বামীর উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত সকল মাসআলায় বিশুদ্ধ একান্ত মিলন হোক বা অ-বিশুদ্ধ হোক, কিংবা কর্তিত পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে একান্ত মিলন হোক–সকল সুরতে তালাকের পর স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। সকল সুরতে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া খেলাফে কিয়াস বা কিয়াস বিরোধী। সর্তকতার ভিত্তিতে। দলিলের সার হলো, উক্ত সকল সুরতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ হতে পারে সহবাসের কারণে কিংবা দলন-সোহাগের দ্বারা বীর্য বের হয়ে যৌনাঙ্গে প্রবেশ করেছে। তাই এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে যে, ইদ্দত ওয়াজিব করে দেওয়া হবে। আর স্বামীর কথা যে, 'আমি সহবাস করিনি, কিংবা স্ত্রীর কথা যে, আমার সাথে সহবাস করেনি' গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ইদ্দত হলো শরিয়ত এবং গর্ভস্থ সন্তানের হক। শরিয়তের হক তো এ কারণে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি ইদ্দত বিলুপ্ত করতে চায় বিলুপ্ত করতে পারবে না। আর সন্তানের হক ঐ হাদীসের কারণে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজের পানি দ্বারা অন্যের জমি চাষাবাদ না করে। উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, সন্তানের নসবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। উল্লেখ্য যে, এটি সন্তানের হক। কায়দা আছে যে, অন্যের হক বাতিল করার জন্য কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই স্বামী-স্ত্রী যদি একমত হয় যে, সহবাস করা হয়নি তাহলে তাদের কথা সত্য মানা হবে না। তবে অ-শুদ্ধ একান্ত মিলন দ্বারা পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয় না। কেননা মহর হলো মাল। আর মাল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে "প্রতিবন্ধক" -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধকতা যদি শরিয়ত বিষয়ক হয় যেমন– হায়েজ, নিফাস তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কেননা শরয়ী প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যদি একান্ত মিলন পাওয়া যায় তাহলে শরয়ীভাবে অসমর্থ হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সহবাসে সক্ষম প্রমাণিত হয়। সুতরাং সহবাসের সংশয়ের কারণে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা হয়ে গেছে। এ কারণে সতর্কতাবশত ইদ্দত ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। আর যদি বাস্তব প্রতিবন্ধকতা হয় যেমন– অসুস্থতা কিংবা এত ছোট যে, সহবাসের অযোগ্য তাহলে এ সুরতে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। কেননা বাস্তব প্রতিবন্ধকতা থাকা অবস্থায় বাস্তব সহবাসের উপর সক্ষম হয় না, তাই গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনাও নেই।

قَالَ وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِهٰذِهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ صِلَةً مِنَ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْفِرَاقِ إِلَّا أَنَّ فِي هٰذِهِ الصُّورَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ طَرِيْقَةُ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسْخٌ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتْعَةُ لَا تَتَكَرَّرُ وَلَنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ خَلْفٌ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوِّضَةِ لِأَنَّهُ سَقَطَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتْعَةُ وَالْعَقْدُ يُوْجِبُ الْعِوَضَ فَكَانَ خَلْفًا وَالْخَلْفُ لَا يُجَامِعُ الْأَصْلَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَلَا تَجِبُ مَعَ وُجُوْبِ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيْحَاشِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْغَرَامَةُ بِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে-কোনো তালাকপ্রাপ্তাকে মুত'আ প্রদান করা মোস্তাহাব শুধু একজন তালাকপ্রাপ্তা ব্যতীত। আর সে হলো স্বামী মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দিয়েছে, আর [আকদের] পরে তার জন্য মহর নির্ধারণ করেছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ তালাকপ্রাপ্তা ছাড়া আর সকল তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব হবে। কেননা তা স্বামীর পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলক দানরূপে ওয়াজিব হয়েছে। কারণ সে তাকে বিচ্ছেদের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত করেছে। তবে এ মুহূর্তে অর্ধেক মহর মুত'আরূপেই সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় তালাক অর্থ বিবাহ রহিত করা, আর মুত'আ একাধিকবার ওয়াজিব হয় না। আমাদের দলিল হলো– বিনা মহরে বিবাহে সম্মত নারীর ক্ষেত্রে মুত'আ হলো মহরে মিছিলের স্থলবর্তী। কেননা তার জন্য মহরে মিছিল বাদ পড়েছে এবং মুত'আ ওয়াজিব হয়েছে। আর আকদ একটি বিনিময় দাবি করে। সুতরাং মুত'আ মহরের স্থলবর্তী সাব্যস্ত হবে। আর স্থলবর্তী কখনো আসলের সঙ্গে কিংবা তার অংশবিশেষের সঙ্গে একত্রিত হয় না। সুতরাং কোনো পর্যায়ের মহর ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় মুত'আ ওয়াজিব হতে পারে না। আর স্ত্রীকে হতাশাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে সে অপরাধী নয়। [কেননা, শরিয়তের অনুমোদিত কাজ সে করেছে] সুতরাং তার উপর দণ্ড আরোপিত হতে পারে না। তাই এটা সৌজন্যমূলক দানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ الخ : কুদূরীর ইবারতে একটি অস্পষ্টতা আছে। প্রথমে তা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। অস্পষ্টতা হলো এই যে, ইমাম কুদূরী (র.)-এর "কথার সূচনা" প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপকভাবে মুত'আ মোস্তাহাব হওয়া বুঝায়। কেননা كُلّ শব্দটিকে যখন نَكِرَه -এর দিকে إِضَافَتْ করা হয় তখন তা ব্যাপক أَفْرَاد -এর দাবি করে। তারপর তার থেকে অ-সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তাকে إِسْتِثْنَا করা হয়েছে। তাই এখানে কথার সূচনা ও ইসতিছনা -এর ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে। إِسْتِثْنَا -এর ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর নির্ধারিত তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব। [আর কুদূরীর ইবারত] تُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ -এর মধ্যে উপরিউক্ত সুরতটিও শামিল। সুতরাং

مُسْتَثْنٰى আর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এক হয়ে গেল। অর্থাৎ, প্রথমত বলা হয়েছে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব। তারপর ঐ তালাকপ্রাপ্তাকে اِسْتِثْنَا. করে বলা হয়েছে 'তবে ঐ তালাকপ্রাপ্তার জন্য মোস্তাহাব।' তাহলে তো এ اِسْتِثْنَاءُ عَنْ نَفْسِهِ টি اِسْتِثْنَا. হলো, যা অসম্ভব। বিষয়টি এমন হলো– যেমন কেউ বলল– جَاءَنِيْ خَالِدٌ اِلَّا خَالِدٌ 'আমার নিকট খালেদ এসেছে, কিন্তু খালেদ।' আর "কথা সূচনা"-এর ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব। আর প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার মধ্যে অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর নির্ধারিত নয়, সেও শামিল। তাহলে তার জন্যও তো মুত'আ মোস্তাহাব হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব।

اِسْتِثْنَا.-এর ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন ছিল তার জবাব হলো, ইমাম কুদূরীর মতে বাদ দেওয়া সুরতের মধ্যে মুত'আ মোস্তাহাব নয়। কেননা ইমাম কুদূরী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো সুরতে মুত'আ ওয়াজিব আর কোনো কোনো সুরতে মুত'আ মোস্তাহাব। তবে অ-সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর নির্ধারিত নয় – সে ছাড়া। কারণ তার জন্য মোস্তাহাব নয় বরং ওয়াজিব। সুতরাং এখন مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর مُسْتَثْنٰى ভিন্ন হয়ে গেল, তাই اِسْتِثْنَاءُ عَنْ نَفْسِهِ আবশ্যক হবে না। আর এ ধরনের اِسْتِثْنَا. সহীহ আছে।

'কথার সূচনা' ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন ছিল তার জবাব হলো, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব, তবে অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর নির্ধারিত নয়– সে ব্যতীত। কেননা তার হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজিব। সুতরাং যখন তিনি প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপকতা থেকে ঐ তালাকপ্রাপ্তাকে বের করে দিয়েছে– এখনতো صَدْرِ كَلَامْ -এর ক্ষেত্রে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

কেউ কেউ ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ سِوَى الَّتِيْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَهِيَ الَّتِيْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَقَبْلَ التَّسْمِيَةِ، فَاِنَّ مُتْعَتَهَا وَاجِبَةٌ اِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِيْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ فَاِنَّ مُتْعَتَهُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَا مُسْتَحَبَّةٍ .

অর্থাৎ, মুত'আ মোস্তাহাব প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য। শুধু একজন [তালাকপ্রাপ্তা] ব্যতীত, যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। সে হলো যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সহবাসের পূর্বে এবং মহরের নামকরণ করার পূর্বে। কারণ তার মুত'আ ওয়াজিব। তবে সে তালাকপ্রাপ্তার জন্য যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সহবাসের পূর্বে এবং মহরের নামকরণ করার পূর্বে। কেননা তার মুত'আ ওয়াজিবও নয়; মোস্তাহাবও নয়।

আবার কেউ কেউ জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ইবারতের মধ্যে قَدْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ -এর স্থলে وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ছিল। ছাপায় ভুল হয়ে গেছে। এখন ইবারতের এই অর্থ হবে যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব। তবে একজন তালাকপ্রাপ্তা যাকে তার স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়েছে এবং তার কোনো মহরের কথা উল্লেখ ছিল না। কেননা তার জন্য মুত'আ মোস্তাহাব নয়; বরং ওয়াজিব। সুতরাং এ সুরতেও আর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকল না। –[আইনী শরহে হিদায়া]

হিদায়ার টিকাকার একটি জবাব দিয়েছেন যে, তাও অধ্যয়ন করা যেতে পারে [দ্র: হাশিয়া]। মোটকথা হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারী সর্বমোট চার প্রকার–

১. অ-সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারণ করা হয়নি (مُطَلَّقَةٌ غَيْرُ مَدْخُوْلٍ بِهَا غَيْرُ مُسَمًّى لَهَا) তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব। কুরআনে কারীমের আয়াত এর প্রমাণ বহন করে। যেমন– কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ .

২. সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারণ করা হয়নি। ৩. সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দুই প্রকারের জন্য মুত'আ মোস্তাহাব। কুরআনে কারীম হলো তার দলিল। যেমন বর্ণিত হয়েছে– وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ – 'তালাকপ্রাপ্তা নারীদের মুত'আ রয়েছে নিয়মমাফিক।'

৪. অ-সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারণ করা হয়েছে। তার জন্য মুত'আ ওয়াজিবও না, মোস্তাহাবও না। এ সুরতটিই মতন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দলিল হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর বাণী- لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِيْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ 'প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ রয়েছে, তবে [সে ব্যক্তি] যার জন্য মহর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তার সাথে সহবাস করা হয়নি। তাহলে তার জন্য অর্ধেক মহর যথেষ্ট।' ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব, তবে অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারিত তার জন্য ওয়াজিব নয়- তাঁর নতুন অভিমত অনুযায়ী। তবে তাঁর পুরাতন অভিমত অনুযায়ী তার জন্যও মুত'আ ওয়াজিব। মোটকথা হলো, অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারণ করা হয়নি, তার ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ী সকলে একমত যে, তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব। আর অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারিত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে উভয়ে একমত যে, তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব নয়। অবশিষ্ট দুই সুরতে হানাফীগণ মোস্তাহাব বলেন, আর শাফেয়ীগণ ওয়াজিব বলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী স্ত্রীকে তার থেকে পৃথক করে হতাশাগ্রস্ত করেছে। তাই আমরা বিচ্ছেদের হতাশাকে দূরীভূত করার জন্য দয়া ও দান হিসেবে মুত'আ ওয়াজিব করে দিয়েছি, যাতে বিচ্ছেদের ব্যথা দূর হয়ে যায়। কিন্তু বাদ দেওয়া সুরতে এজন্য ওয়াজিব করা হয়নি যে, অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারিত তার অর্ধেক মহর মুত'আ হিসেবে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার অর্থ হলো বিবাহ রহিত করা। কেননা ঐ অবস্থায় সম্ভোগ-অঙ্গ তার দিকে সঠিকভাবেই ফিরে আসে। আর এর দাবি হলো পূর্ণ মহর বিলুপ্ত হওয়া। যেমন- বিক্রয় রহিত করার সুরতে ক্রেতার জিম্মা থেকে সম্পূর্ণ মূল্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু শরিয়ত অর্ধেক মহর মুত'আ হিসেবে ওয়াজিব করেছে। আর মুত'আ একাধিকবার ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যদি ঐ তালাকপ্রাপ্তার জন্য অর্ধেক মহরের সাথে মুত'আও ওয়াজিব করে দেওয়া হয় তাহলে মুত'আ একাধিকবার ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা শরয়ীভাবে জায়েজ নেই। এজন্য ঐ তালাকপ্রাপ্তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব করা হয়নি।

আমাদের দলিলের পূর্বে একথা মনে রাখতে হবে যে, আকদে নিকাহ বিনিময় থেকে খালি হয় না। এর প্রমাণ হলো আয়াতে কারীমা- أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ। এখন বিনিময়কৃত বস্তু নির্ধারিত মহর হোক বা মহরে মিছিল হোক। দ্বিতীয় কথা হলো, খলিফা [বিকল্প] আসলের সাথে একত্রিত হতে পারে না, আর আসলও অংশের সাথে একত্রিত হতে পারে না। যেমন- তায়াম্মুম অজুর সাথে একত্রিত হতে পারে না। এখন দলিলের সারসংক্ষেপ এই হবে যে, অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারিত নয়- তার ক্ষেত্রে মুত'আ হলো মহরে মিছিলের খলিফা বা স্থলবর্তী। কারণ সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে মহরে মিছিল বিলুপ্ত তো হয়ে গেছে, আর আকদে নিকাহের জন্য বিনিময় জরুরি, তাই মহরে মিছিলের খলিফা তথা মুত'আ ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট তিন সুরতের মধ্যে মুত'আ এজন্য ওয়াজিব হবে না যে, আমরা পূর্বে নীতিমালা বর্ণনা করেছি যে, আসল খলিফার সাথে একত্রিত হতে পারে না এবং আসল তার কোনো অংশের সঙ্গেও একত্রিত হতে পারে না। সুতরাং সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর নির্ধারিত এবং সহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা যার মহর অনির্ধারিত নয় এ দু প্রকারের জন্য যদি মুত'আ ওয়াজিব করা হয় তখন খলিফা তার আসল অর্থাৎ, পূর্ব নির্ধারিত মহর কিংবা মহরে মিছিলের সাথে একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি অসহবাসকৃত তালাকপ্রাপ্তা, যার মহর নির্ধারিত তার জন্য মুত'আ ওয়াজিব করা হয় তখন খলিফা আসলের অংশ তথা অর্ধেক মহরের সাথে একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে। আর এ সুরতগুলো নীতি বিবর্জিত। এজন্য এগুলোর মধ্যে মুত'আ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ جَانٍ الخ দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারাংশ হলো, এ কথাতো মানা যায় যে, বিচ্ছেদের কারণে স্ত্রীকে হতাশাগ্রস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এ হতাশাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে সে অপরাধী নয়। কেননা শরিয়ত তাকে তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে; বরং কোনো কোনো সুরতে তালাক দেওয়া মোস্তাহাবও বটে। যেমন- স্ত্রী যদি বেনামাজি হয় এবং বুঝানো দ্বারা স্বামীকে মান্য করে না। সুতরাং যে সকল কাজ শরিয়তের অনুমতিসাপেক্ষে করা হয় তা করার দ্বারা অপরাধী গণ্য করা হয় না। সুতরাং যখন স্বামী তালাক দিয়ে কোনো অপরাধ করেনি তাই তাকে [স্ত্রীকে] তালাক দ্বারা হতাশাগ্রস্তের মধ্যে পতিত করার দ্বারা কোনো দণ্ডও ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এ মুত'আ সৌজন্যমূলক দানের অন্তর্ভুক্ত হবে; দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই তাকে মোস্তাহাব তো বলা যাবে, কিন্তু ওয়াজিব বলা যাবে না। তাই উপরিউক্ত সুরতগুলোতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মুত'আকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করাটা ঠিক হয়নি।

وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُوْنَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْأٰخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ الشَّافِعِي (رح) بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوْحَةً وَلَا إِشْتِرَا فِيْ هٰذَا الْبَابِ فَبَطَلَ الْإِيْجَابُ وَلَنَا أَنَّهُ سَمّٰى مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُّ الْعَقْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا سَمَّى الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيْرَ وَلَا شِرْكَةَ بِدُوْنِ الْإِسْتِحْقَاقِ.

নুবাদ : কেউ যদি আপন কন্যাকে এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহকারী আপন কন্যা কিংবা ভগ্নিকে তার কাছে বিবাহ বে, যাতে উভয় আকদের মধ্যে একটি অপরটির বিনিময় হবে। তাহলে উভয় আকদ বৈধ হবে এবং এদের মধ্যে ত্যেক স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় আকদ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে ম্ভোগ-অঙ্গের অর্ধেককে মহর এবং বাকি অর্ধেককে বিবাহের আওতাভুক্ত করেছে। অথচ এক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কানো অবকাশ নেই। সুতরাং ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো– সে এমন জিনিসের উল্লেখ রেছে, যা মহর হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং আকদ সহীহ হয়ে যাবে এবং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যেমন– কউ যদি মদ ও শূকরকে [মহররূপে] উল্লেখ করে। আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া শরিকানা সাব্যস্ত হয় না। [অর্থাৎ ম্ভোগ-অঙ্গ যখন মহর হতে পারল না তখন তাতে অর্ধ বছর শরিকানা হতে পারল। সুতরাং এটি শর্তে ফাসেদ হবে, ার শর্তে ফাসেদ দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, হামেদ তার নিজ কন্যাকে মাজেদের সাথে এ শর্তে বিবাহ দিয়েছে , মাজেদ তার কন্যাকে হামেদের সাথে বিবাহ দেবে। যাতে উভয়ের সম্ভোগ-অঙ্গ একটি অপরটির মহর হয়ে যায়। অর্থাৎ, ামেদের কন্যার মহর মাজেদের কন্যার সম্ভোগ-অঙ্গ আর মাজেদের কন্যার মহর হামেদের কন্যার সম্ভোগ-অঙ্গ। এ ধরনের বাহকে নিকাহে শিগার বলা হয়। শিগার শব্দটি শাগ্রুন (شُغُوْر) থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো উঠানো এবং খালি করা। ঠানো এর অর্থের ক্ষেত্রে নামকরণের কারণ এই হবে যে, স্বামী-স্ত্রী যেহেতু মহরকে আকদ থেকে উঠিয়ে দিয়েছে এজন্য এ রনের নিকাহের নাম নিকাহে শিগার করা হয়েছে। আর যদি খালি করা -এর অর্থ নেওয়া হয় তাহলে وَجْهُ التَّسْمِيَةِ এই বে যে, এ নিকাহটি যেহেতু মহর থেকে খালি, তাই এ ধরনের নিকাহকে নিকাহে শিগার বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, শগার অর্থ হলো– দূর হওয়া। এ অর্থে وَجْهُ التَّسْمِيَةِ এই হবে যে, যেন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মহরকে বাদ দিয়ে হক থেকে দূরে লে গেছে। তাই এ নিকাহকে নিকাহে শিগার বলা হবে। নিকাহে শিগার হানাফীদের মতে সহীহ। কিন্তু উভয় মহিলার ত্যেকের জন্য মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় আকদ বাতিল। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর আকলী দলিল তো বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার সমর্থনে যে হাদীসগুলো রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করেননি। অথচ দুটি হাদীস তাঁর মাযহাবের দলিল হতে পারে। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস– لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ইসলামে নিকাহে শিগারের কোনো অবকাশ নেই।' ইমাম তিরমিযী (র.)-ও উক্ত হাদীসটি হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)

থেকে নকল করেছেন। দ্বিতীয় হাদীস হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যা ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো- نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকাহে শিগার থেকে নিষেধ করেছেন।' উপরিউক্ত হাদীস দুটি নিকাহে শিগার জায়েজ না হওয়ার উপর সাক্ষ্য বহন করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর আকলী দলিল হলো, ঐ ব্যক্তি যে তার কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে এ শর্তে বিবাহ দিয়েছে যে, সে তার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দেবে, তাহলে যেন উভয় কন্যার মধ্য থেকে প্রত্যেকের অর্ধেক সম্ভোগ মহর ও অপর অর্ধেক অঙ্গ বিবাহের আওতাভুক্ত করেছে। মোদ্দাকথা, প্রত্যেকের সম্ভোগ-অঙ্গ স্বামী এবং তার কন্যার মধ্যে মুশতারাক হয়ে গেল। অর্ধেক সম্ভোগ-অঙ্গ স্বামীর জন্য হবে নিকাহের হুকুম হিসেবে, আর অর্ধেক তার কন্যার জন্য হবে মহরের হুকুম হিসেবে। সুতরাং এতে অংশীদারিত্ব আবশ্যক হয়ে পড়ল। অথচ সম্ভোগ-অঙ্গের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কোনো অবকাশ নেই। যেমন- একজন মহিলার দুজন পুরুষের সাথে বিবাহ হওয়া- এ ধরনের বিবাহ জায়েজ নেই। সুতরাং যখন অংশীদারিত্ব সহীহ নেই তখন ইজাব বাতিল হয়ে গেল। আর যখন ইজাব বাতিল হয়ে গেল তখন আকদ-ই বাতিল হয়ে গেল। এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে উভয় আকদ বাতিল।

আমাদের দলিল হলো, উভয় আকদে এমন জিনিসকে মহর নির্ধারণ করা হয়েছে, যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর কায়দা রয়েছে যে জিনিস মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যদি তাকে মহর নির্ধারণ করা হয় তবে আকদে নিকাহ সহীহ হয়ে যায়, আর মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। যেমন- শরাব ও শূকরকে মহর নির্ধারণ করলে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে এবং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ঠিক এখানেও তদ্রূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর আকলী দলিলের জবাব হলো, যখন সম্ভোগ-অঙ্গ মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তখন মুশতারাকও হবে না। কেননা, এক মহিলার সম্ভোগ-অঙ্গ অপর মহিলার মালিকানা হতে পারে না। সুতরাং যখন মুশতারাক সাব্যস্ত হলো না তখন সম্ভোগ-অঙ্গের মহরের শর্ত দ্বারা শর্তে ফাসেদ হবে। আর বিবাহ শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয় না; বরং খোদ শর্ত ফাসেদই বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং উপরিউক্ত নিকাহে শিগারের মধ্যে সম্ভোগ-অঙ্গকে মহর বানানোর শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, আর বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। তবে স্বামীর উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীসগুলোর জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে নিষেধটি বিবাহের জন্য নয়; বরং হাদীসের মধ্যে নিষেধ এসেছে বিবাহকে মহরের নাম থেকে খালি করার কারণে। হাদীসের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্দেশ্য বিবাহ থেকে বারণ করা নয়; বরং বিবাহকে মহরের নাম থেকে খালি করাকে বারণ করা হয়েছে। মহরের নাম থেকে যদি বিবাহকে খালি রাখা হয় তবে এর দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। যেমন- জুমার আজানের পর বিকিকিনি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং বিকিকিনি নিষেধ নয়; বরং জুমার আজানের সময় নিষিদ্ধ।

وَاِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ اِمْرَأَةً عَلٰى خِدْمَتِهٖ اِيَّاهَا سَنَةً اَوْ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَهَا قِيْمَةُ خِدْمَتِهٖ وَاِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ اِمْرَأَةً بِاِذْنِ مَوْلَاهُ عَلٰى خِدْمَتِهٖ سَنَةً جَازَ لَهَا خِدْمَتُهٗ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَهَا تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ وَالْخِدْمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِاَنَّ مَا يَصْلُحُ اَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالشَّرْطِ يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهٗ لِاَنَّهٗ بِذٰلِكَ تَتَحَقَّقُ الْمُعَارَضَةُ وَصَارَ كَمَا اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى خِدْمَةِ حُرٍّ اٰخَرَ بِرِضَاهُ وَعَلٰى رَعْيِ الزَّوْجِ غَنَمَهَا وَلَنَا اَنَّ الْمَشْرُوْعَ اِنَّمَا هُوَ الْاِبْتِغَاءُ بِالْمَالِ وَالتَّعْلِيْمُ لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذٰلِكَ الْمَنَافِعُ عَلٰى اَصْلِنَا وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ اِبْتِغَاءٌ بِالْمَالِ لِتَضَمُّنِهٖ تَسْلِيْمَ رَقَبَتِهٖ وَلَا كَذٰلِكَ الْحُرُّ وَلِاَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوْزُ اِسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوْعِ بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرٍّ اٰخَرَ بِرِضَاهُ لِاَنَّهٗ لَا مُنَاقَضَةَ وَبِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ لِاَنَّهٗ يَخْدِمُ مَوْلَاهُ مَعْنًى حَيْثُ يَخْدِمُهَا بِاِذْنِهٖ وَاَمْرِهٖ وَبِخِلَافِ رَعْيِ الْاَغْنَامِ لِاَنَّهٗ مِنْ بَابِ الْقِيَامِ بِاُمُوْرِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا مُنَاقَضَةَ عَلٰى اَنَّهٗ مَمْنُوْعٌ فِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ) تَجِبُ قِيْمَةُ الْخِدْمَةِ.

অনুবাদ : যদি কোনো স্বাধীন লোক কোনো মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, সে তার এক বছর খেদমত করবে কিংবা তাকে কুরআন শিক্ষা দিবে, তবে সে স্ত্রী মোহরে মিছিলের অধিকারী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে স্বামীর [এক বছরের] খেদমতের বিনিময়-মূল্য পাবে। আর কোনো দাস যদি মনিবের সম্মতিক্রমে এক বছর খেদমত করার শর্তে কোনো মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে এবং স্ত্রী তার এক বছরের সেবা লাভ করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে কুরআন শিক্ষা ও খেদমত তার প্রাপ্য হবে। কেননা শর্ত করে যে জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করা যায় তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা এভাবেই বিনিময় আদান-প্রদান হতে পারে। বিষয়টি এরূপ হলো যেন সে অন্য একজন স্বাধীন ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তার খেদমতের বিনিময়ে বিবাহ করল। কিংবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মেষপাল চরানোর শর্তে বিবাহ করল। আমাদের দলিল হলো, শরিয়ত যা অনুমোদন করেছে তা হলো মালের বিনিময়ে [সম্ভোগ অধিকার] লাভ করা। আর শিক্ষাদান কোনো মাল নয়। তদ্রূপ আমাদের নীতি অনুযায়ী [কোনো সত্তার] উপকারিতা মাল নয়। পক্ষান্তরে দাসের খেদমত মালের বিনিময় লাভ হিসেবে গণ্য। কেননা, এখানে গোলামের আপন সত্তা সমর্পন করা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি [এর ক্ষেত্রে] এরূপ নয়। তা ছাড়া বিবাহের আকদের মাধ্যমে স্বাধীন স্বামীর খেদমতের হকদার স্ত্রী হতে পারে না। কেননা, এতে বিবাহের প্রকৃত অবস্থা পাল্টে যায়। অন্য স্বাধীন ব্যক্তির সম্মতিতে তার খেদমতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা,

এখানে কোনো বিরোধ নেই। পক্ষান্তরে গোলামের খেদমতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মর্মগতভাবে সে তো তার মনিবের খেদমত করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে স্ত্রীর খেদমত করবে আপন মনিবের সম্মতি ও আদেশক্রমে। স্ত্রীর মেষপাল চরানোর বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, এটা হলো দাম্পত্য বিষয়াবলি আঞ্জাম দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এতে কোনো বিরোধ নেই। তা ছাড়া এক বর্ণনা মতে এটাও নিষিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, স্বামীর খেদমতের বিনিময়-মূল্য ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ اِمْرَأَةً اِلخ : মাসআলা : কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করল আর মহর বানাল যে, আমি এক বছর স্ত্রীর খেদমত করব। কিংবা কুরআন শিক্ষা দেওয়াকে মহর নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ, এ কথা বলেছে যে, আমি আমার স্ত্রীকে কুরআনে কারীম শিক্ষা দেব। আমার পক্ষ থেকে এটিই মহর। উপরিউক্ত উভয় সুরতে শায়খাইনের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বাধীন স্বামীর খেদমতের বিনিময়-মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি দাস তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে এবং মহর হিসেবে নির্ধারণ করে এক বছরের খেদমত করাকে, তাহলে দাসের খেদমতকে মহর নির্ধারণ করা জায়েজ আছে এবং স্ত্রী তার এক বছরের সেবা লাভ করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব হলো, তা'লীমে কুরআন এবং স্বাধীন ও দাস উভয়ের খেদমতকে মহর হিসেবে নির্ধারণ করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, আকদে নিকাহ হলো বিনিময়ের আকদ। সুতরাং যে জিনিস مُعَوَّضٌ হতে পারে অর্থাৎ যার বিনিময় গ্রহণ করা যায়, সে জিনিস আকদে নিকাহের মধ্যে বিনিময় অর্থাৎ মহর হতে পারে, যাতে বিনিময়ের সঠিক মর্ম সাব্যস্ত হয়। আর যেহেতু তা'লীমে কুরআন ও খেদমত উভয়টির বিনিময় গ্রহণ করা যায় তাই এ দুটি নিজেই বিনিময় তথা মহর হতে পারে। বিষয়টি এরূপ হলো, যেমন অন্য একজন স্বাধীন মানুষের খেদমতকে মহর নির্ধারণ করল, স্বামীর স্ত্রীর মেষ চরানোকে মহর বানাল। আর যেহেতু এ দুটি সকলের মতে জায়েজ, তাই তা'লীমে কুরআন আর স্বাধীন স্বামীর খেদমতকেও মহর বানানো জায়েজ হবে।

আমাদের দলিল হলো, আকদে নিকাহের মধ্যে শরিয়ত মালের বিনিময়ে [সম্ভোগ-অধিকার] লাভ করার অনুমোদন করেছে। দলিল হলো কুরআনে কারীমের বাণী- أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ। আর তা'লীমে কুরআন মাল নয়। তাই তা'লীমে কুরআন শরিয়ত অনুমোদিত মালের সন্ধান নয়। এমনিভাবে আমাদের নীতি অনুযায়ী [কোনো সত্তার] উপকারিতাও মাল নয়। কেননা সম্পদশালী (تَمَوُّلْ) -এর জন্য জরুরি হলো, দুই জমানায় অবশিষ্ট থাকা। অথচ উপকারিতা ও খেদমত দুই কাল পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে আমরা বলেছি, খেদমতও মাল নয়, তাই খেদমতের সাথেও শরিয়ত অনুমোদিত বিনিময় মাল হবে না। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত দলিলের ভিত্তিতে অন্য স্বাধীন ব্যক্তি খেদমত এবং মেষ চরানোকে মহর বানানো জায়েজ হবে না। কেননা এগুলোও উপকারী বস্তু। আর আমাদের মতে, দাসের খেদমতকে মহর বানানো এজন্য জায়েজ যে, দাসের খেদমত মালের বিনিময় লাভ করতে পারে। দাসের খেদমত এজন্য মাল যে, যখন গোলাম খেদমত করবে তখন যেন সে আপন সত্তাকে অর্পণ করে দিয়েছে, আর গোলামের গ্রীবা মাল। তাই এ সুরতে মহর মাল হবে, মাল নয় এমন জিনিস মহর হবে না। আর স্বাধীন ব্যক্তি এমন নয় যে, যখন খেদমত করবে, তখন যেন নিজের সত্তাকে অর্পণ করে দিল। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত মাল হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি স্বাধীন স্বামীর খেদমতকে মহর বানানো হয় তখন স্ত্রী আকদে নিকাহের কারণে খেদমতের হকদার থাকে না। কেননা এর দ্বারা প্রকৃত অবস্থা পাল্টে যায়। অবস্থা পাল্টে যায় এভাবে যে, স্ত্রী হলো খেদমতকারিণী আর স্বামী হলো খেদমতকৃত। কিন্তু এখন যদি স্বামীর খেদমতকে মহর নির্ধারণ করা হয় তখন স্ত্রী খেদমতকৃতা আর স্বামী খেদমতকারী হয়ে যায়। আর এটি সকলের মতে বিবাহের উদ্দেশ্যের বিপরীত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) অন্য স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতের উপর কিয়াস করেছিলেন যে, যেমনিভাবে অন্য স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতকে তার সন্তুষ্টিচিত্তে মহর বানানো যায় এমনিভাবে স্বাধীন স্বামীর খেদমতকে মহর বানানো যাবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, অন্য স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতকে এজন্য মহর বানানো জায়েজ যে, সে নিজের সত্তাকে অর্পণ করে দেবে। যেমন– কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে ইজারা নেওয়া হয়েছে। তখন সে ইজারাকৃত স্বাধীন ব্যক্তি নিজের সত্তাকে অর্পণ করে দেবে। মূলকথা হলো এই যে, এর দ্বারা বিষয়টি পাল্টে যায় না যে, মাখদূম খাদেম হয়ে গেল আর খাদেম মাখদূম হয়ে গেল। তাছাড়া আমাদের মতে এক বর্ণনা মোতাবেক অন্য স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত মহর বানানো জায়েজ নেই। তাই তার উপর কিয়াস করাও জায়েজ হবে না। –[ফাতহুল কাদীর]

দাসের খেদমতকে মহর বানানো দ্বারাও তো বিষয়টি পাল্টে যায়? এর জবাবে আমরা বলি যে, ঐ সুরতে বিষয়টি পাল্টে যায় না। কেননা গোলাম কার্যত তার মনিবের অনুমতি ও আদেশক্রমেই হয়ে থাকে। আর যখন গোলাম তার মনিবের খেদমত করে, স্ত্রীর খেদমত নয়, তবে বিষয়টি আর পাল্টে যায় না। কেননা বিষয়টি তখনই পাল্টে যাবে– যখন সে তার স্ত্রীর খেদমত করবে এবং মেষ চরানোর উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। প্রথমত এজন্য যে, স্বামীর স্ত্রীর মেষ চরানো খেদমতের অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং এটি দাম্পত্য বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনকি মেষ চরানোকে মাবসূতের এক বর্ণনা মোতাবেক মহর হিসেবে গণ্য করা জায়েজই হবে না। সুতরাং এ বর্ণনা অনুযায়ী তার উপর কিয়াস করাও জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الخ : গ্রন্থকারের ইবারতের মধ্যে কিছুটা ভ্রম রয়েছে। কারণ তিনি দলিল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন– وَلَنَا اَنَّ الْمَشْرُوْعَ الخ এখন প্রশ্ন হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.) গ্রন্থকারের বক্তব্য وَلَنَا الخ -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাহলে গ্রন্থকারের বক্তব্য– ثُمَّ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَجِبُ فِيْهِ الْخِدْمَةُ لِاَنَّ الْمُسَمّٰى مَالٌ -এর বিপরীত হয়ে যায়। কারণ প্রথমে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে খেদমতকে গায়রে মাল আখ্যা দেওয়া হয়েছিল আর এখানে মাল বলা হচ্ছে। আর যদি ইমাম মুহাম্মদ (র.) গ্রন্থকারের বক্তব্য وَلَنَا الخ -এর অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে উচিত ছিল গ্রন্থকার وَلَنَا الخ না বলে وَلَهُمَا বলতেন। এর জবাব হলো, তা'লীমে কুরআনের দিকে নিসবত করার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) وَلَنَا الخ -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা'লীমে কুরআনকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও মাল বলেন না। আর খেদমতের দিকে নিসবত করার দিক থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) وَلَنَا -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে খেদমত হলো মাল। সুতরাং এখন আর কোনো ভ্রম থাকল না। –[ফাতহুল কাদীর] মোদ্দাকথা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের ভিত্তিতে খেদমতকে মহর বানানো সহীহ আছে। তবে স্বামীর উপর খেদমত করা ওয়াজিব হবে না; বরং তার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, নির্ধারিত বস্তু অর্থাৎ খেদমত তো হলো মাল। কিন্তু তা অর্পণ করতে স্বামী অপারগ। কেননা খেদমত করতে গেলে বিষয়টি পাল্টে যায়। আর কায়দা আছে, কোনো ব্যক্তি যদি নির্ধারিত মহরকে অর্পণ করতে অপারগ হয় তখন তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হয়। যেমন– কেউ অন্যের গোলামকে মহর বানাল। এ সুরতে অন্যের গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা সে অন্যের গোলামকে অর্পণ করতে অপারগ। শায়খাইনের মতের ভিত্তিতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত মাল নয়। আর মাল না হওয়ার কারণ হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই খেদমত লাভের হকদার হয় না। যদি খেদমত মাল হতো তাহলে অবশ্যই তার হকদার হতো। কোনো কোনো শারেহ বলেছেন। এখানে একটি اَوْ শব্দ উহ্য আছে। মূল ইবারত ছিল– لِاَنَّ الْخِدْمَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ اَوْ لَا يَسْتَحِقُّ فِيْهِ بِحَالٍ - এ সুরতে অর্থ এই দাঁড়াবে যে, গ্রন্থকারের বক্তব্য– لِاَنَّ الْخِدْمَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ এবং لَا يَسْتَحِقُّ فِيْهِ بِحَالٍ উভয়টি মহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়ার উপর দলিল। প্রথম قَوْل দ্বারা ইশারা হবে গ্রন্থকারের বক্তব্য وَلَنَا اَنَّ الْمَشْرُوْعَ هُوَ الْاِبْتِغَاءُ بِالْمَالِ -এর দিকে, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হবে গ্রন্থকারে বক্তব্য وَلِاَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوْزُ اِسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ -এর দিকে। সুতরাং যেমনিভাবে শূকর ও শরাবের নাম নেওয়ার সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে খেদমতকে মহর বানানোর সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

لِاَنَّ الْمُسَمّٰى مَالٌ اِلَّا اَنَّهٗ عَجِزَ عَنِ التَّسْلِيْمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلٰى عَبْدِ الْغَيْرِ وَعَلٰى قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِاَنَّ الْخِدْمَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ اِذْ لَا يَسْتَحِقُّ فِيْهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَهٰذَا لِاَنَّ تَقَوُّمَهَا بِالْعَقْدِ لِلضَّرُوْرَةِ فَاِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيْمُهٗ فِى الْعَقْدِ لَا يَظْهَرُ تَقَوُّمُهٗ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْاَصْلِ وَهُوَ الْمَهْرُ الْمِثْلُ ـ

অনুবাদ : কেননা [মহর রূপে] নির্ধারিত বিষয়টি মূলত মাল। কিন্তু বিরোধের কারণে স্বামী তা সমর্পণ করতে অক্ষম। সুতরাং বিষয়টি অন্যের গোলামকে মহর নির্ধারিত করে বিবাহ করার মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা খেদমত মাল নয়। কারণ বিবাহের আকদের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই স্ত্রী স্বামীর সেবা লাভের হকদার হয় না। সুতরাং এটি মদ বা শূকর উল্লেখ করার মতোই হলো। মহরে মিছিল ওয়াজিব করার কারণ এই যে, চুক্তির মাধ্যমে সেবাকে মালরূপে সাব্যস্ত করা হয় মানুষের প্রয়োজনের কারণে। সুতরাং যখন বিবাহ-চুক্তিতে তা সমর্পণ করা ওয়াজিব হলো না তখন তার বিনিময়-মূল্য প্রকাশ পাবে না। ফলে হুকুম তার মূলনীতির উপর রয়ে যাবে। আর তা হলো মহরে মিছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهٰذَا لِاَنَّ تَقَوُّمَهَا بِالْعَقْدِ الخ : এ ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, হানাফীগণের মধ্য থেকে শায়খাইন খেদমতকে মহর নির্ধারণ করার সুরতে মহরে মিছিল এজন্য ওয়াজিব বলেছেন যে, স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত মালে مُتَقَوَّمْ নয়; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত যদি مَال مُتَقَوَّمْ না হয় তাহলে আজাদ ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া কিভাবে সহীহ হয় অথচ স্বাধীন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতকে আকদে ইজারার মধ্যে মালরূপে দেওয়া হয় শুধু মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। না হয় স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত مَال مُتَقَوَّمْ নয়। এখন আর প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। এখন আমরা বলি যে, যখন বিষয়টি পাল্টে যাওয়ার ভয়ে আকদে নিকাহের মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতকে অর্পণ করা জায়েজ নয়। এতে তো স্বাধীন ব্যক্তির খেদমত مَال مُتَقَوَّمْ হওয়াও জাহির নয় তাই হুকুম তার মূলনীতির উপর রয়ে যাবে। আর মূলনীতি হলো মহরে মিছিল, তাই এ সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا وَ وَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُوْدِ وَالْفُسُوْخِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُوْنًا أَخَرَ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) لِأَنَّهُ سَلِمَ الْمَهْرُ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا تَبْرَأُ عَمَّا لِيَسْتَحِقَّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَلَا يُبَالِيْ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ.

অনুবাদ : যদি স্ত্রীকে এক হাজার দিরহামের মহরে বিবাহ করে আর স্ত্রী তা কব্জা করে নেয় এবং স্বামীকে তা হেবা করে দেয় অতঃপর স্বামী মিলনের পূর্বেই তাকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে পাঁচশ দিরহাম ফেরত নেবে। কারণ হেবা বা দানের মাধ্যমে স্বামীর নিকট হুবহু প্রাপ্য জিনিস পৌঁছেনি। কেননা চুক্তিসমূহ ও তা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দিরহাম ও দিনার [নির্ধারিত করলেও] নির্ধারিত হয় না [যেমন নির্দিষ্ট একটি দিরহাম দেখিয়ে কোনো জিনিস খরিদ করলে পরে খরিদকারী অন্য দিরহামও দিতে পারে] তদ্রূপ হুকুম হবে যদি মহর দিরহাম-দিনার ছাড়া পাত্র দ্বারা কিংবা দাড়িপাল্লা দ্বারা পরিমাপকৃত জিনিস জিম্মায় ওয়াজিব হয়। কেননা এ ক্ষেত্রেও প্রাপ্য বস্তুটি নির্ধারিত নয়। পক্ষান্তরে যদি হাজার দিরহাম কব্জা না করে তা স্বামীকে হেবা করে দেয়, এরপর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে উভয়ের কেউ অপরজনের নিকট থেকে কিছুই ফিরে পাবে না। কিয়াসের দাবি মতে, স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামী অর্ধেক মহর ফেরত পাবে। এটা ইমাম যুফার (র.) -এর মত। কেননা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণে মহর তার অনুকূলে অক্ষুণ্ন রয়েছে। সুতরাং মিলন-পূর্ব তালাকের মাধ্যমে স্বামী যে অর্ধেক মহরের অধিকারী হয়েছে, তা থেকে স্ত্রী অব্যাহতি পেতে পারে না। সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি এই যে, মিলনের পূর্বে তালাকের মাধ্যমে যে জিনিস পাওয়ার অধিকারী সে হয়েছে, হুবহু তা তার নিকটে পৌঁছেছে। আর তা হলো অর্ধেক মহর থেকে তার অব্যাহতি লাভ। আর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার পর "কারণের" ভিন্নতা গ্রাহ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ الخ : এ ইবারতের মাসআলাটির প্রথমত প্রকরণ এই যে, মহিলাকে বিবাহ হয় এমন জিনিসের মাধ্যমে হয়েছে যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না; যেমন– টাকা, পয়সা, কিংবা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন– গম, যব ইত্যাদি। তারপর প্রত্যেকটির আবার দুই সুরত করে রয়েছে স্ত্রী মহর কব্জা করে নিয়েছে কিংবা কব্জা করেনি। এগুলোর আবার দুই সুরত রয়েছে স্ত্রী সম্পূর্ণ মহর হেবা করে দিয়েছে কিংবা আংশিক মহর হেবা করেছে।

[গ্রন্থকার] প্রথমে মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীকে বিবাহ করেছে এমন জিনিসের মাধ্যমে যা নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আর তা হলো এক হাজার দিরহাম। তারপর স্ত্রী সেগুলো কব্জা করেছে এবং পুনরায় স্বামীকে পূর্ণ এক হাজার দিরহাম হেবা করে দিয়েছে, তারপর সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে গিয়েছে– তাহলে এর হুকুম এই যে, স্বামী-স্ত্রী থেকে পাঁচশ দিরহাম ফিরিয়ে নেবে। দলিলের পূর্বে এ কথা বুঝতে হবে যে, দিরহাম ও দিনারসমূহ উকূদ ও ফুসূখের মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যেমন– কেউ দিরহাম হাতে নিয়ে বলল, এ দিরহামগুলোর বিনিময়ে আমি এই সামান ক্রয় করেছি; বিক্রেতা তা কবুল করল। এখন ক্রেতার স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে যে দিরহাম নির্দিষ্ট করেছিল তা দেবে কিংবা অন্যগুলো দেবে। অথবা বিকিকিনি পূর্ণ হওয়ার পর ইকালা করল তথা বিকিকিনি রহিত করে দিল তখন বিক্রেতা ঐ টাকা ফেরত দেবে যা ক্রেতা দিয়েছে কিংবা অন্য টাকা ফেরত দিবে। উভয়টি জায়েজ। এখন দলিলের সারাংশ এই হবে যে, স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে কব্জাকৃত অর্ধেকের হকদার হবে এবং স্ত্রীর হেবা করার কারণে স্বামীর দিকে হুবহু ঐ জিনিস পৌঁছে না যার হকদার স্বামী হয়েছিল। কেননা দিরহাম-দিনার নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সুতরাং স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা হেবা করা এমন, যেমন কব্জাকৃত [হাজার] ছাড়া অন্য এক হাজার হেবা করা হলো। আর যখন স্বামী পর্যন্ত ঐ অর্ধেক মহর না পৌঁছে যার হকদার স্বামী ছিল, তখন স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে অর্ধেক মহর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে। এই হুকুম তখন যখন মহর নির্ধারণ করা হয় কোনো পরিমাপকৃত জিনিসকে কিংবা দিরহাম-দিনার ছাড়া অন্য কোনো ওজনবিশিষ্ট জিনিসকে। কিন্তু এই পরিমাপকৃত কিংবা ওজনবিশিষ্ট জিনিস স্বামীর জিম্মায় [থাকবে যেগুলো] নির্দিষ্ট করা হয়নি। কেননা পরিমাপকৃত কিংবা ওজনবিশিষ্ট জিনিসগুলো যদি এমন হয় যার দিকে ইশারা করা হয়েছে তাহলে সেগুলো নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেগুলোর হুকুম উপরিউক্ত হুকুম নয়।

দ্বিতীয় সুরত হলো, যদি স্ত্রী কব্জা করা ব্যতিরেকে এক হাজার হেবা করে দেয় এবং তারপর সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে যায় তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কেউ কারো থেকে কিছু ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর কিয়াসের দাবি এই যে, স্বামী অর্ধেক মহর ফিরিয়ে নেবে। এটিই ইমাম যুফার (র.) -এর মত। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল এই যে, স্ত্রী কব্জা ছাড়া হেবা করে স্বামীকে মহর থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে এবং স্ত্রীর অব্যাহতি দেওয়ার দ্বারা যে এক হাজার স্বামীর জন্য অক্ষুণ্ণ থাকল তা হলো তার ভিন্ন স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে যার হকদার হয়েছিল। অর্থাৎ, অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি পাওয়া। সুতরাং যখন স্বামীর জন্য তাছাড়া অন্যটি অক্ষুণ্ণ থাকল যার হকদার স্বামী হয়েছিল, তখন স্ত্রী ঐ অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি পাবে না, যার হকদার স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে ছিল। এ কারণে আমাদের মাযহাব হলো, স্বামীর ঐ সুরতেও অর্ধেক মহর ফিরিয়ে নেওয়ার হক থাকবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, যখন স্ত্রী পূর্ণ মহর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল তখন স্বামীর নিকট হুবহু ঐ জিনিস পৌঁছে গেল, যার হকদার সে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে হয়েছিল। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে স্বামীর হক ছিল অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি লাভ করা। আর যখন পূর্ণ মহর থেকেই অব্যাহতি লাভ করল তাহলে অর্ধেক মহর থেকেই অবশ্যই অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু কেউ যদি এভাবে বলে যে, সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে স্বামীর হক ছিল অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি লাভ করা আর এ অর্ধেক স্বামীর নিকট পৌঁছেছে অন্য কারণে অর্থাৎ স্ত্রীর অব্যাহতির কারণে, তাহলে সবব পরিবর্তন হয়ে গেল? হিদায়া গ্রন্থকার (র.) وَلَا يُبَالِيْ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الخ দ্বারা মূলত উপরিউক্ত প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারাংশ হলো, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার সময় কারণের ভিন্নতা গ্রাহ্য করা হয় না। আর উদ্দেশ্য অর্থাৎ অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেছে, সবব যাই হোক। এটি এরূপ হলো, যেমন কোনো ব্যক্তি অন্য একজনকে বলল, আমার নিকট তোমার এক হাজার টাকা আছে ঐ দাসীর মূল্য হিসেবে যা আমি তোমার থেকে ক্রয় করেছিলাম। অন্যজন (مُقِرٌّ لَهٗ) বলল, দাসীতো তোমারই, তবে আমার এক হাজার টাকা তোমার নিকট রয়েছে। এ সুরতে স্বীকৃতি দানকারীর উপর এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। যদিও সববের মধ্যে দ্বিতীয়জন উপর প্রথমজনের মিথ্যারোপ করেছিল। অর্থাৎ বিক্রির মধ্যে দ্বিতীয় জন মিথ্যারোপ করেছে। সুতরাং বুঝা গেল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার সময় কারণের ভিন্নতার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।

وَلَوْ قَبَضَتْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوْضَ وَغَيْرَهُ أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِاَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطٌّ فَيَلْتَحِقُ بِاَصْلِ الْعَقْدِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ مَقْصُوْدَ الزَّوْجِ حَصَلَ وَهُوَ سَلَامَةُ نِصْفِ الصَّدَاقِ بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الرُّجُوْعَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالْحَطُّ لَا يَلْتَحِقُ بِاَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ اَلَا تَرٰى اَنَّ الزِّيَادَةَ فِيْهِ لَا تَلْتَحِقُ حَتّٰى لَا تَنْتَصِفُ. وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ اَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَقَبَضَتِ الْبَاقِيَ فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا اِلٰى تَمَامِ النِّصْفِ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوْضِ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلٰى عَرْضٍ فَقَبَضَتْ اَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيْمَتِهِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ رَدُّ نِصْفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلٰى مَا مَرَّ تَقْرِيْرُهُ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَقْبُوْضِ مِنْ جِهَتِهَا وَقَدْ وَصَلَ اِلَيْهِ وَلِهٰذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا دَفْعُ شَيْءٍ اٰخَرَ مَكَانَهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا وَبِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لِاَنَّهُ وَصَلَ اِلَيْهِ بِبَدَلٍ .

অনুবাদ : যদি [এক হাজার থেকে] পাঁচশ দিরহাম কব্জা করে থাকে অতঃপর উসুলকৃত এবং অ-অসুলকৃত সমগ্র এক হাজার দিরহাম হেবা করে কিংবা [অ-উসুলকৃত] অবশিষ্ট হেবা করে থাকে অতঃপর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক দেয়, তাহলে উভয়ের কেউ অপরজনের নিকট থেকে কোনো কিছু ফেরত পাবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, স্ত্রী যা কব্জা করেছে তার অর্ধেক স্বামী তার নিকট থেকে ফেরত নেবে অংশকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আংশিক হেবা করার অর্থ হলো পরিমাণ হ্রাস করা। সুতরাং এ হ্রাসকরণ আকদের সঙ্গে যুক্ত হবে। [ফলে উসুলকৃত অংশটুকুই হবে কার্যত সমগ্র মহর। সুতরাং তারই অর্ধেক করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, স্বামীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। আর তা হলো কোনো বিনিময় ছাড়া অর্ধেক মহর নিরাপদ থাকা। সুতরাং, সে তালাকের সময় স্ত্রীর নিকট ফেরত দাবি করতে পারবে না। আর বিবাহের ব্যাপারে হ্রাসকৃত অংশকে আকদের সময় ধার্যকৃত মূল মহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় না। তুমি কি জান না যে, পরিবর্ধিত অংশকে মূল মহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় না এমন কি তা অর্ধেক করা হয় না। আর যদি অর্ধেকের কম হেবা করে থাকে আর অবশিষ্টটুকু কব্জা করে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পূর্ণ অর্ধেক পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে পাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, উসুলকৃত অংশের অর্ধেক ফেরত নেবে। আর যদি কোনো সামানের বিনিময়ে বিবাহ করে, আর স্ত্রী তা কব্জা করে কিংবা কব্জা না করে স্বামীকে তা হেবা করে

দেয়, অতঃপর মিলনের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রী তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কিয়াসের দাবি মতে উক্ত সামানের অর্ধেক মূল্য স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নেবে। আর তা হলো ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত। কেননা সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে মহরের অর্ধেক ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। এর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল এই যে, তালাকের প্রেক্ষিতে স্বামীর প্রাপ্য হক হলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে উসূলকৃত জিনিসের অর্ধেক পুরোপুরি পেয়ে যাওয়া। আর তা তার কাছে পৌঁছে গেছে। এ কারণেই তো সকলের মতেই উক্ত দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যকিছু প্রদান করা স্ত্রীর জন্য জায়েজ না। পক্ষান্তরে মহর দায়েন (دَيْن) হলে বিষয়টি বিপরীত। তদ্রূপ স্বামীর নিকট উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সেটা তো বিনিময়ের মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَتْ خَمْسَمِائَةٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্ত্রী পাঁচশ দিরহাম কব্জা করল তারপর স্বামীর জন্য এক হাজার উসূলকৃত ও অ-উসূলকৃত উভয়টি হেবা করে দিল। কিংবা শুধু অ-উসূলকৃত হেবা করল এবং সহবাসের পূর্বে তালাক হয়ে গেল, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কেউ কারো নিকট ফেরত পাবার হকদার হবে না। এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর সাহেবাইনের মাযহাব হলো, স্বামী উসূলকৃত অর্ধেক অর্থাৎ, দুশো পঞ্চাশ দিরহাম ফেরত পাবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, তারা আংশিককে পূর্ণের উপর কিয়াস করে বলেন, যদি স্ত্রীপূর্ণ কব্জা করত এবং স্বামীকে হেবা করে দিত তারপর স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল তাহলে আমাদের [সাহেবাইনের] মতে, স্বামী-স্ত্রীর নিকট থেকে উসূলকৃত অর্ধেক ফেরত নিবে। সুতরাং এমনিভাবে স্ত্রী যখন আংশিক কব্জা করল তাই এ আংশিকের অর্ধেক ফেরত নেওয়ার হকদার হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, আংশিক হেবা করা অর্থাৎ অ-উসূলকৃত অর্ধেক হেবা করার অর্থ হলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে হ্রাস করা। আর হ্রাসকরণ যুক্ত হয় আসল আকদের সাথে। তাই যেন স্বামী প্রথমেই উসূলকৃত পাচঁশ'র উপর বিবাহ করেছে। সুতরাং এ পাঁচশ সমগ্র মহর হবে, আর পূর্বে সমগ্র মহরের হুকুম বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সম্পূর্ণ মহর কব্জা করে স্ত্রী সম্পূর্ণটাই স্বামীকে হেবা করে দেয় তাহলে অর্ধেক ফেরত নেওয়ার হকদার হবে। তাই এখানেও উসূলকৃত অর্ধেক ফেরত নেওয়ার হকদার হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, স্বামীর উদ্দেশ্য হলো বিনিময় ছাড়া অর্ধেক মহর পুরোপুরি পাওয়া। আর এ উদ্দেশ্য তালাক দ্বারা পূর্বেই হাসিল হয়েছে। তাই তালাকের পর ফেরত নেওয়ার হকদার হবে না। সাহেবাইনের দলিলের জবাব হলো, বিবাহের ব্যাপারে হ্রাসকৃত অংশকে মূল আকদের সাথে যুক্ত করা হয় না। কারণ হলো, যেমন– এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করল মহিলাটি পনেরো দিরহাম স্বামীকে হেবা করে দিল। এখন আর স্বামীর উপর দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে না; বরং পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। যদি হ্রাসকৃত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত হতো, তাহলে এমন হতো যেমন স্বামী পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। যদি পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করা হয় তখন দশ দিরহাম ওয়াজিব হয়। তাহলে তো ঐ সুরতেও দশ দিরহাম ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং স্বামীর উপর পাঁচ দিরহামই ওয়াজিব হয়। বুঝা গেল, হ্রাসকৃত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) হ্রাসকৃত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত না হওয়ার একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, বিবাহের মধ্যে পরিবর্ধিত অংশ সকলের মতে মূল আকদের সাথে যুক্ত হয় না। যেমন– স্বামী নির্ধারিত মহরের উপর পঞ্চাশ দিরহাম বৃদ্ধি করে দিল, তারপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল, তাহলে এ পঞ্চাশ দিরহাম বিভাজ্য হবে না, অর্ধেক হবে না। তাই যেমনিভাবে পরিবর্ধিত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত হয় না তেমনিভাবে হ্রাসকৃত অংশও মূল আকদের সাথে যুক্ত না হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ اَقَلَّ الخ : মাসআলাটির সুরত হলো এই যে, বিবাহ হলো যেমন এক হাজার টাকার বিনিময়ে। স্ত্রী দুশ টাকা স্বামীকে হেবা করে দিল, অবশিষ্ট আটশ টাকা কব্জা করল। এ পর্যায়ে ইমাম সাহেবের মাযহাব হলো, এ পরিমাণ আরো ফিরিয়ে নেবে যাতে অর্ধেক মহর পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ স্বামী তিনশ টাকা স্ত্রী থেকে আরো নিয়ে নিবে। আর সাহেবাইনের মতে উসুলকৃত অর্ধেক অর্থাৎ চারশ টাকা ফেরত নেবে। সাহেবাইনের দলিল এই যে, যখন অর্ধেকের কম হেবা করল, আর হেবা হলো হ্রাস করা, সুতরাং এ হ্রাসকৃত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত হবে; যেন উসুলকৃত পরিমাণ-ই হলো মহর। সুতরাং যখন মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল, তখন স্ত্রী থেকে উসূলকৃত পরিমাণের অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে। ইমাম সাহেবের দলিল হলো, মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অর্ধেক মহর বহাল থাকবে; সবব যাই হোক না কেন, তাই তিনশ টাকা স্ত্রী থেকে আরো উসুল করে নেবে যাতে স্বামীর নিকট অর্ধেক মহর পৌঁছে যায়।

وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلٰى عَرَضٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, বিবাহের সময় এমন জিনিস মহর বানাল যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়; যেমন– সামান ইত্যাদি। স্ত্রী ঐ মহর কব্জা করুক বা না করুক হুকুমের ক্ষেত্রে উভয় সুরত বরাবর। তারপর স্ত্রী স্বামীকে হেবা করে দিয়েছে– আর স্বামী তাকে মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছে। উক্ত সূরতের হুকুম এই যে, স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে অন্যকোনো কিছু ফেরত নিবে না। এই হুকুম হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে; এটিই আইম্মায়ে ছালাছালার মাযহাব। ইমাম যুফার (র.) -এর মত হলো, তার অর্ধেক মূল্য ফেরত নেবে। আর এটাই হলো কিয়াস। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতে হুবহু অর্ধেক মহর ফিরানো ওয়াজিব। এখানে এমনটি পাওয়া যায় না। কেননা স্বামীর জন্য মহর থেকে অব্যাহতি লাভ স্ত্রীর অব্যাহতি দেওয়ার দ্বারা হয়, স্বামী অর্ধেক মহরের হকদার ছিল মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে। তাই স্ত্রী তার থেকে অব্যাহতি পাবে না, যার হকদার স্বামী হয়েছে। অর্থাৎ মিলনের পূর্বে তালাকের কারণে অর্ধেক হুবহু মহর। সুতরাং যখন স্ত্রী অব্যাহতি পেল না তাই স্বামী ঐ অর্ধেক মহর ফেরত পাওয়ার হকদার হবে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, সহবাসের পূর্বে তালাকের সময় স্বামীর এই হক ছিল যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় ছাড়া উসুলকৃত অর্ধেক পেয়ে যাওয়া। আর স্বামীর কাছে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় ছাড়া হুবহু মহরই পৌঁছে গেছে, তাই স্বামীর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। আর যখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল তখন আর কিছু ফেরত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الخ : আর মিলন-পূর্ব তালাকের ক্ষেত্রে যেহেতু স্বামীর হক তালাকের সময় অর্ধেক উসুলকৃত পেয়ে যাওয়া, সেহেতু স্ত্রীর জন্য জায়েজ নেই যে, স্বয়ং উসুল সামান থাকাকালে তার স্থলে অন্য কোনো কিছু স্বামীর দেওয়া। কেননা উসূলকৃত সামান উভয়টির মধ্যে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে যদি মহর যদি এমন বস্তু থেকে হয় যা নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তাহলে এর হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা এ সুরতে স্বামীর অর্ধেক মহর ফেরত নেওয়ার হক থাকবে। কারণ স্বামীর হক উসুলকৃত অর্ধেকের মধ্যে ছিল না– তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে। এ কারণেই স্ত্রী যদি অর্ধেক মহরের স্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেয় তাহলে জায়েজ হবে। এর বিপরীত হলো স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট মহরের সামানকে বিক্রি করে দেয় তাহলে এ সুরতেও স্বামীর অর্ধেক মহর ফেরত নেওয়ার হক থাকবে। কেননা স্বামীর নিকট উসুলকৃত অর্ধেক মহর বিনিময়সহ পৌঁছে গেছে। কারণ স্বামী স্ত্রী থেকে ক্রয় করেছে। আর বিনিময়সহ পাওয়া এমন যেমন পায়নি। সুতরাং এ বিনিময়সহ এ উসুলকৃত অর্ধেক তার স্থলবর্তী হবে না, যার হকদার স্বামী মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার কারণে ছিল। আর যখন বিনিময়সহ এ উসুলকৃত অর্ধেক তার স্থলবর্তী হলো না, তখন পুনরায় স্বামী অর্ধেক মহর ফেরত পাওয়ার হকদার হবে। কিংবা এটাকে সংক্ষিপ্ত করে এভাবেও বলা যায় যে, স্বামীর হক ছিল বিনিময় ছাড়া অর্ধেক মহরের মধ্যে। অথচ স্বামীর বিনিময়সহ পৌঁছেছে। সুতরাং যেন স্বামীর নিকট তার হক পৌঁছেনি। তাই তার ফেরত নেওয়ার হক থাকবে।

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى حَيَوَانٍ اَوْ عُرُوْضٍ فِى الذِّمَّةِ فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ لِاَنَّ الْمَقْبُوْضَ مُتَعَيِّنٌ فِى الرَّدِّ وَهٰذَا لِاَنَّ الْجَهَالَةَ تَحَمَّلَتْ فِى النِّكَاحِ فَاِذَا عُيِّنَ يَصِيْرُ كَاَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : যদি অনির্ধারিত কোনো প্রাণী কিংবা দ্রব্যের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করে তাহলে একই হুকুম। কেননা উসুলকৃত জিনিসটি ফেরত দানের সময় নির্ধারিত হয়ে যাবে। এটা এজন্য যে, বিবাহের মহরের ক্ষেত্রে 'অজ্ঞতা'ও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং পরে যখন নির্ধারণ করা হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, আকদের সময় এটাই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى حَيَوَانٍ الخ : মাসআলা : বিবাহ করল, মহর নির্ধারণ করল প্রাণীকে যেমন– ঘোড়া, গাধা ইত্যাদিকে মহর নির্ধারণ করল কিংবা সামানকে, তাহলে স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব হবে। যেমন– বলল, হারবী কাপড় হলো মহর। এবং তার ধরন ও প্রকার বলে দিল। তারপর স্ত্রী কব্জা করেছে বা কব্জা করেনি, কিন্তু স্বামীকে হেবা করে দিয়েছে, তারপর স্বামী মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দিয়েছে, তাহলে স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে কিছু ফেরত পাবার অধিকার থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মহরের এ নাম নেওয়া ঠিক হয়নি তাই এ সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর এক রেওয়ায়েত হলো এই যে, মহরের নামের অজ্ঞতার কারণে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মতে আকদে নিকাহ সহীহ হবে এবং মধ্যম ধরনের কাপড় এবং মধ্যম ধরনের প্রাণী ওয়াজিব হবে। মূল মাসআলায় আমরা বলেছি যে, স্বামীর স্ত্রী থেকে ফেরত নেওয়ার হক থাকবে না। দলিল হলো, উসুলকৃত জিনিসটি ফেরত দানের সময় নির্ধারিত। অর্থাৎ স্ত্রী যদি কব্জা করে নেয় তখন তার হুবহু ফেরত দেওয়া নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর যখন উসুলকৃত মহর ফেরত দানের সময় নির্ধারিত তখন তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারণ হয়ে যায় তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যখন স্ত্রী এমন জিনিস হেবা করে যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায় তখন এ হেবা যদি কাজা করার পরে হয় তবে তো স্বামীর নিকট হুবহু হক পৌঁছে গেছে। কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সববের ভিন্নতা গ্রাহ্য নয়। আর যদি হেবা কব্জা করার পূর্বে হয় তবুও স্বামীর নিকট তার হক পৌঁছে গেছে। আর তা হলো অর্ধেক মহর থেকে অব্যাহতি লাভ করা। আর এ কথা তো জানা আছে যে, সববের ভিন্নতা বিবেচ্য নয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّ الْجَهَالَةَ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার দুটি বস্তুর দিকে ইশারা করেছেন। প্রথম এই যে, অনির্দিষ্ট প্রাণী ও অনির্দিষ্ট সামানের বিনিময়ে বিবাহ করা জায়েজ। দ্বিতীয় জিনিস হলো, উসুলকৃত জিনিসটি ফেরত দানের সময় নির্দিষ্ট। প্রথম জিনিসের দিকে ইশারা করেছেন– لِاَنَّ الْجَهَالَةَ দ্বারা, মোদ্দাকথা হলো, অনির্দিষ্ট ঘোড়ার বিনিময়ে বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যায়। সুতরাং কোনো জিনিস যদি অনির্ধারিত ঘোড়ার বিনিময়ে ক্রয় করা হয় তাহলে এ বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে এতটুকুন অজ্ঞতাকে বরদাশত করা হবে। যেমন– বিবাহের মধ্যে যদি অনির্ধারিত ঘোড়াকে মহর নির্ধারণ করা হয় তখন বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে এবং মাঝারি ধরনের ঘোড়া ওয়াজিব হবে।

বেচাকেনা ও বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হলো, বিবাহ-শাদির ভিত্তি হলো নম্রতার উপর। তাই অল্প অজ্ঞতাকেও বরদাশত করা যায়। আর বেচাকেনার ভিত্তি হলো সঙ্কোচের উপর তাই বেচাকেনার মধ্যে শর্তহীনভাবে স্বল্প অজ্ঞতারও অবকাশ হবে না। দ্বিতীয় জিনিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে– فَاِذَا عُيِّنَ الخ দ্বারা। অর্থাৎ যখন কব্জার সময় নির্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন যেন নামকরণ ঐ উসুলকৃত বস্তুর উপরই হয়েছে। প্রথম জিনিসটির ফায়দা হলো আকদে নিকাহ সহীহ হয়ে যাওয়া, যদিও নাম নেওয়া বস্তুটি অস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় জিনিসের ফায়দা হলো, স্বামী স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন না করা। যদিও স্ত্রী ঐ প্রাণী স্বামীকে হেবা করে থাকে

وَاِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى اَلْفٍ عَلَى اَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَةِ اَوْ عَلَى اَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرٰى فَاِنْ وَفٰى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمّٰى لِاَنَّهٗ صَلُحَ مَهْرًا وَ قَدْ تَمَّ رِضَاهَا بِهٖ وَاِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اُخْرٰى اَوْ اَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِاَنَّهٗ سَمّٰى مَا لَهَا فِيْهِ نَفْعٌ فَعِنْدَ فَوَاتِهٖ يَنْعَدِمُ رِضَاهَا بِالْاَلْفِ فَيُكَمَّلُ مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا فِيْ تَسْمِيَةِ الْكَرَامَةِ وَ الْهَدِيَّةِ مَعَ الْاَلْفِ ـ

অনুবাদ : যদি এ শর্তে এক হাজার দিরহামের মহরে তাকে বিবাহ করে যে, তাকে এ শহর থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবে না, কিংবা তার বর্তমানে অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। এখন যদি সে শর্ত পুরা করে তাহলে তো স্ত্রী নির্ধারিত মহর পাবে। কেননা এটা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে, আর এ পরিমাণের প্রতি তার পূর্ণ সম্মতিও পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে যদি সে তার বর্তমানে অন্য কাউকে বিবাহ করে কিংবা তাকে এ শহর হতে অন্যত্র নিয়ে যায় তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে। কেননা, সে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করেছে, যাতে স্ত্রীর উপকার রয়েছে। সুতরাং তার বিপরীত হলে এক হাজার দিরহামের মহরের প্রতি তার সম্মতিও বিদ্যমান থাকবে না। সুতরাং তার জন্য পূর্ণ মহরে মিছিল প্রাপ্য হবে। যেমন– এক হাজার দিরহামের সঙ্গে তাকে বখশিশ এবং উপহার দানের কথা উল্লেখ করলে [মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى اَلْفٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি কোনো একজন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং এক হাজার টাকা মহর ধার্য করেছে এ শর্তে যে, তাকে শহর থেকে বের করবে না কিংবা তার বর্তমানে অন্য কাউকে বিবাহ করবে না, তাহলে এ বিবাহ সহীহ আছে। যদিও সফর না করার শর্ত কিংবা বিবাহ না করার শর্ত শর্তে ফাসেদ। আর শর্তে ফাসেদ এ কারণে যে, তার মধ্যে শরিয়ত বিদিত বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হয়। তাই স্বামী যদি শর্ত পূরণ করে তবে স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহর অর্থাৎ এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। কারণ নির্ধারিত বস্তু অর্থাৎ এক হাজার টাকা মহর হওয়ার যোগ্যতাও রাখে। আর স্ত্রীর এক হাজার টাকার উপরে সম্মতিও পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এ শর্তের উপর স্ত্রীর উপকার রয়েছে। আর যদি স্বামী শর্ত পূরণ না করে তাহলে দেখতে হবে যে, নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে বেশি না কম, না বরাবর। যদি মহরে মিছিল বেশি হয় নির্ধারিত মহর অর্থাৎ এক হাজার থেকে তবে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। দলিল হলো, স্বামী এমন জিনিস উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে স্ত্রীর উপকারিতা রয়েছে। তাইতো ঐ উপকারের কারণে স্ত্রী নির্ধারিত মহরকে মহরে মিছিল থেকে কম করার উপর রাজি হয়ে গেছে। তাই মহরের লোকসান যেন ঐ উপকারের মোকাবিলায় হলো। সুতরাং ঐ উপকার বিলুপ্ত হওয়ার সুরতে এক হাজারের উপর স্ত্রীর সম্মতি রহিত হয়ে গেছে। তাই তার মহরে মিছিলকে পূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর এই মাসআলাটি এমন হলো, যেমন– এমনটি বলল, আমি এক হাজারের সাথে তোমার সম্মানও করব কিংবা এক হাজারের সাথে কিছু বখশিশও দেব। সুতরাং যদি এ শর্তগুলো পূরণ না করে তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে এখানেও। আর যদি মহরে মিছিল নির্ধারিত মহর তথা এক হাজার থেকে কম হয় কিংবা সমান হয় তবে শর্তপূরণ না করার সুরতেও নির্ধারিত মহর অর্থাৎ এক হাজার ওয়াজিব হবে। আর এ শর্তগুলো স্বামীর পক্ষ থেকে দান হিসেবে গণ্য হবে।

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَلَا يُنْقَصُ عَنِ الْأَلْفِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا الشَّرْطَانِ جَمِيْعًا جَائِزَانِ حَتّٰى كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَالْأَلْفَانِ إِنْ أَخْرَجَهَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) اَلشَّرْطَانِ جَمِيْعًا فَاسِدَانِ وَيَكُوْنُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَلْفٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فِيْ قَوْلِهِ إِنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَسَنُبَيِّنُهَا فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

অনুবাদ : যদি এ শর্তে বিবাহ করে থাকে যে, স্বামী এ নগরীতে তার সঙ্গে বাস করলে মহর হবে এক হাজার, আর এখান থেকে তাকে বাইরে নিয়ে গেলে দু-হাজার। এখন যদি স্বামী তার সঙ্গে এ নগরীতে বাস করে তাহলে স্ত্রী এক হাজার দিরহামই পাবে। আর যদি বের করে নিয়ে যায় তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে, তবে তা দুহাজারের বেশি হবে না এবং এক হাজারের কম হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয় শর্তই বৈধ। সুতরাং স্বামী তার সঙ্গে বাস করলে সে এক হাজার পাবে, আর সেখান থেকে তাকে অন্যত্র নিয়ে গেলে সে দু-হাজার দিরহাম পাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় শর্তই ফাসেদ এবং সে মহরে মিছিল পাবে, যা এক হাজারের কম হবে না আবার দু-হাজারের বেশিও হবে না। মাসআলার মূল দলিল ইজারা অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে– যদি কেউ বলে যে, এটা আজ সেলাই করে দিলে তুমি এক দিরহাম পাবে আর আগামীকাল সেলাই করে দিলে অর্ধ দিরহাম পাবে। এ বিষয়টি ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি কোনো একজন নারীকে বিবাহ করেছে এবং বিনিময় হিসেবে দুটি শর্ত উল্লেখ করেছে। যেমন বলেছে– যদি স্ত্রীকে তার শহরে রাখে তাহলে মহর এক হাজার হবে, আর যদি তাকে এ শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে মহর দু-হাজার হবে। এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব এই যে, প্রথম শর্ত জায়েজ, আর দ্বিতীয় শর্ত ফাসেদ। সুতরাং যদি শহরে অবস্থান করে তাহলে মহর এক হাজার হবে, আর যদি তাকে তার শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইনের মাযহাব হলো, উভয় শর্ত জায়েজ। তাই প্রথম শর্তের সুরতে মহর এক হাজার হবে, আর দ্বিতীয় শর্তের সুরতে মহর দু'হাজার হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মাযহাব হলো, উভয় শর্ত ফাসেদ। সুতরাং উভয় সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে; যার পরিমাণ এক হাজারের কম হবে না এবং দু'হাজারের বেশি হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার মাসআলাটি দলিলসহ বর্ণনা করেননি, বরং ইজারা অধ্যায়ের নিম্নোক্ত মাসআলার উপর প্রযুক্ত করেছেন, মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি দরজিকে বলল,

যদি তুমি আজকে এই কাপড় সেলাই করে দাও তাহলে পারিশ্রমিক এক দিরহাম পাবে, আর যদি আগামীকাল সেলাই করে দাও তাহলে অর্ধ দিরহাম পাবে, তাহলে ইমাম সাহেবের মতে প্রথম শর্ত জায়েজ, আর দ্বিতীয় শর্ত ফাসেদ, সাহেবাইনের মতে উভয় শর্ত জায়েজ এবং ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, উভয় শর্ত ফাসেদ। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে দলিল বর্ণনা করা হলো–

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, একই বস্তু অর্থাৎ সম্ভোগ-অঙ্গের মোকাবিলায় বিনিময় হিসেবে দুটি ভিন্ন জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে দুটি জিনিস হলো এক হাজার ও দু'হাজার। সুতরাং অজ্ঞতার কারণে নাম নির্ধারণ ফাসেদ হয়ে গেছে। আর যখন নাম নির্ধারণ ফাসেদ হয়ে গেল তখন মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, প্রথম শর্তের সময় তার সাংঘর্ষিক কোনো কিছু বিদ্যমান ছিল না, তাই অজ্ঞতা না থাকার কারণে প্রথম শর্ত সহীহ হয়ে যাবে এবং আকদ তার সাথে সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যেহেতু দ্বিতীয় শর্তের সময় তার সাংঘর্ষিক তথা প্রথম শর্ত বিদ্যমান আছে, কারণ অজ্ঞতা দ্বিতীয় শর্তের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন দ্বিতীয় শর্তের কারণে অজ্ঞতা এসে গেল তাই শর্ত ফাসেদ হয়ে যাবে, তবে বিবাহ ফাসেদ হবে না। কেননা শর্ত ফাসেদ হওয়ার দরুন বিবাহ ফাসেদ হয় না।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কেউ যদি বলে, যদি স্ত্রী সুন্দরী হয় তাহলে মহর দু'হাজার আর যদি কুশ্রী হয় তাহলে মহর এক হাজার হবে। এখানে সকলের মতে শর্ত দু'টি জায়েজ। তাহলে এ দুই মাসআলার মধ্যে কি ব্যবধান রয়েছে? মতনের মাসআলায় ইমাম সাহেব দ্বিতীয় শর্তকে ফাসেদ বলেন, আর এখানে উভয় শর্তকে জায়েজ বলেন?

উত্তর : এর উত্তর হলো, মতনের মাসআলায় দ্বিতীয় নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জুয়ার মর্ম পাওয়া যায়। কেননা, স্ত্রীর জানা নেই যে, তাকে বের করা হবে কিনা? আর দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যে এ ধরনের কোনো কিছু নেই। কারণ বাস্তবিকপক্ষে স্ত্রী সুশ্রী হবে কিংবা কুশ্রী হবে। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায় যে, স্বামীর জানা নেই। স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর অজ্ঞতা জুয়ার কারণ নয়, তাই এখানে উভয় শর্ত জায়েজ হবে।

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ فَاِذَا اَحَدُهُمَا اَوْكَسُ وَالْاٰخَرُ اَرْفَعُ فَاِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا اَقَلَّ مِنْ اَوْكَسِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكَسُ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَرْفَعُ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَ قَالَا لَهَا الْاَوْكَسُ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ فَاِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْاَوْكَسِ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ بِالْاِجْمَاعِ لَهُمَا اَنَّ الْمَصِيْرَ اِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذُّرِ اِيْجَابِ الْمُسَمّٰى وَقَدْ اَمْكَنَ اِيْجَابُ الْاَوْكَسِ اِذِ الْاَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالْاِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْمُوْجَبَ الْاَصْلِىَّ مَهْرُ الْمِثْلِ اِذْ هُوَ الْاَعْدَلُ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَالْاِعْتَاقِ لِاَنَّهٗ لَا مُوْجَبَ لَهٗ فِى الْبَدَلِ اِلَّا اَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ اِذَا كَانَ اَكْثَرَ مِنَ الْاَرْفَعِ فَالْمَرْاَةُ رَضِيَتْ بِالْحَطِّ وَاِنْ كَانَ اَنْقَصَ مِنَ الْاَوْكَسِ فَالزَّوْجُ رَضِىَ بِالزِّيَادَةِ وَالْوَاجِبُ فِى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِىْ مِثْلِهٖ الْمُتْعَةُ وَنِصْفُ الْاَوْكَسِ يَزِيْدُ عَلَيْهَا فِى الْعَادَةِ فَوَجَبَ لِاعْتِرَافِهٖ بِالزِّيَادَةِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো মহিলাকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, এই গোলামটি কিংবা ঐ গোলামটি মহর হবে। পরে দেখা গেল যে, একটি গোলাম কম দামি আর অন্যটি বেশি দামি। এখন যদি তার মহরে মিছিল কম দামি গোলামটির চেয়েও পরিমাপে কম হয়, তাহলে কম দামি গোলামটিই পাবে। আর যদি তার মহরে মিছিল উৎকৃষ্টতর গোলামটির চেয়েও অধিক হয়, তাহলে সে উৎকৃষ্টতর গোলামটি পাবে। আর যদি মহরে মিছিল উভয়ের মধ্যবর্তী হয়, তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন বলেন, সর্বাবস্থায় সে কম দামী গোলামটি পাবে। যদি মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দেয়, তাহলে সর্বাবস্থায় সে নিম্নতর গোলামটির অর্ধেক পাবে। এটা হলো সর্বসম্মত মত। সাহেবাইনের দলিল হলো, নির্ধারিত মহর সাব্যস্ত করা অসম্ভব হলে তখনই মহরে মিছিলের দিকে যেতে হয়। অথচ এখানে নিম্নতর গোলামটি ওয়াজিব করা সম্ভব। কেননা, নিম্নমানেরটি তো সুনিশ্চিত। আর তা মালের বিনিময়ে খোলা করা কিংবা আজাদ করার অনুরূপ হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিবাহের মূল ওয়াজিব হলো মহরে মিছিল। কেননা, তা-ই হলো অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। মহর নির্ধারণ সঠিক হলেই শুধু তা থেকে সরে আসা যায়। আর এখানে অজ্ঞতার কারণে মহর নির্ধারণে ফাসেদ হয়ে গেছে। খোলা ও আজাদ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তার বদলে বিনিময়রূপে কোনো কিছু ওয়াজিব নেই। তবে মহরে মিছিল যদি

উৎকৃষ্টতর গোলামের চেয়ে অধিক হয় তাহলে [বলা হবে যে,] স্ত্রী তো [মহরে মিছিল থেকে] হ্রাস করতে রাজি হয়েছে। আর যদি মহরে মিছিল নিম্নতর গোলামটির চেয়ে কম হয় তাহলে [বলা হবে যে,] স্বামী তো মহরে মিছিলের উপর বর্ধিত করতে রাজি হয়েছে, আর এ ধরনের ক্ষেত্রে মিলন-পূর্ব তালাক হলে মুত'আ সাব্যস্ত হয়। আর নিম্নতর গোলামটির অর্ধেক মূল্য সাধারণত মুত'আর চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং তা-ই ওয়াজিব হবে। কেননা, স্বামী বর্ধিত পরিমাণ প্রদানে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الخ : মাসআলা : সামনে দু'টি গোলাম রয়েছে– একটির মূল্য কম আরেকটির মূল্য বেশি। যেমন– একটি এক হাজার মূল্যের অপরটি দু'হাজার মূল্যের। স্বামী অনির্ধারিতভাবে দু'টির একটিকে মহররূপে ধার্য করল। এ মাসআলায় ইমাম সাহেবের মাযহাব হলো, মহরে মিছিল দেখতে হবে যে, সেটি কম অর্থাৎ যে গোলামটি দামে কম তার থেকেও কম, কিংবা মহরে মিছিল তার বরাবর, কিংবা বেশি মূল্যের গোলামের চেয়ে বেশি, কিংবা কম বেশি এর মাঝামাঝি। যদি মহরে মিছিল কম মূল্যের গোলামের চেয়েও কম বা বরাবর হয়, তাহলে এ সুরতে স্ত্রী কম দামি গোলামটিই পাবে। আর যদি মহরে মিছিল বেশি দামি গোলামের চেয়েও অধিক হয়, তবে এ সুরতে স্ত্রী বেশি দামি গোলামটি পাবে। আর যদি মহরে মিছিল উভয়টির বরাবর হয়, তবে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে।

সাহেবাইনের মাযহাব হলো, সকল সুরতে স্ত্রী কম দামি গোলাম পাবে। মহরে মিছল কম দামি গোলাম থেকে কম হোক কিংবা বেশি দামি গোলাম থেকে অধিক হোক কিংবা উভয়টির মধ্যবর্তী হোক। তবে স্বামী যদি মিলনের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সকল সুরতে স্ত্রী কম দামি গোলামের অর্ধেক পাবে।

দলিলের পূর্বে প্রথমে বুঝতে হবে যে, সম্ভোগ-অঙ্গের বদলে মূল ওয়াজিব কি ? সাহেবাইন বলেন, মূল ওয়াজিব হলো নির্ধারিত মহর। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত মহর ওয়াজিব করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে সরে মহরে মিছিলের দিকে যাওয়া যাবে না। ইমাম সাহেব (র.) বলেন, মূল ওয়াজিব হলো মহরে মিছিল। কেননা, মহরে মিছিল হলো যৌনাঙ্গের বরাবর; কমবেশি কবুল করে না। কারণ হলো, মহরে মিছিল হলো সম্ভোগ-অঙ্গ লাভের মূল্য। আর কোনো বস্তুর মূল্য কম -বেশিকে চায় না। মহর নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত– কমবেশিকে চায়। তাই ইমাম সাহেবের মতে, মহরে মিছিল থেকে নির্ধারিত মহরের দিকে তখন সরে আসা যাবে যখন মহর নির্ধারণ সহীহ হয়। নতুবা সরে আসা যাবে না। এখন সাহেবাইনের দলিলের উদ্দেশ্য হবে এই যে, মহরে মিছিলের দিকে তখন সরে আসা যাবে যখন নির্ধারিত মহর ওয়াজিব করা দুরূহ হয়। আর এখানে কম দামি গোলাম ওয়াজিব করা সম্ভব। কারণ, কম দামি গোলাম দামে কম। আর কম জিনিস নির্ধারিত হয়ে যায়, তাই ঐ নির্ধারিত বস্তুকে ওয়াজিব করা হবে। মাসআলাটি এমন হলো– যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার সাথে খোলা করলাম ঐ গোলামের বিনিময়ে বা এই গোলামের বিনিময়ে কিংবা মনিব গোলামকে বলল, আমি তোমাকে আজাদ করলাম ঐ গোলামের বিনিময়ে কিংবা এই গোলামের বিনিময়ে– উভয় মাসআলায় কম দামিটি নির্ধারিত। তাই মহরের মাসআলায়ও কম দামি গোলাম নির্দিষ্ট হবে। ইমাম সাহেব (র.)-এর দলিল এই যে, মূল ওয়াজিব হলো মহরে মিছিল। আর মহরে মিছিল থেকে সরে আসা মহর নির্ধারণ সহীহ হওয়ার সময় হবে। আর এখানে দুই গোলামের মধ্যকার সংশয়ের কারণে অজ্ঞতা এসে গেছে। সুতরাং এই অজ্ঞতার কারণে মহর নির্ধারণ ফাসেদ হয়ে গেছে। তাই নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে না। তবে খোলা ও আজাদ করার উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, বদলের ক্ষেত্রে এ দুটির কোনো মূল ওয়াজিব নেই। তাই এ কিয়াসটি সঠিক কিয়াস হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো হলো, যখন মহরে মিছিল আসল, তখন তিন অবস্থায়ই মহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়া উচিত। মহরে মিছিল কম দামি গোলাম থেকে কম হোক কিংবা বেশি দামি গোলাম থেকে বেশি হোক কিংবা উভয়টির মধ্যবর্তী হোক। অথচ ইমাম সাহেব উক্ত অভিমত পোষণ করেন না?

উত্তর : এর উত্তর হলো, হুকুম তো এটাই। কিন্তু যখন মহরে মিছিল দামির চেয়েও অধিক হয় তখন স্ত্রী নিজের মহরে মিছিল থেকে কম দিতে রাজি হয়ে গেছে। আর যদি মহরে মিছিল কম দামির চেয়ে কম হয় তখন স্বামী মহরে মিছিল থেকে অধিক দিতে রাজি হয়ে গেছে। তাই আমরা তাদের উভয়ের সন্তুষ্টির উপর আমল করেছি।

قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ فِي الطَّلَاقِ الخ : এ বাক্য দ্বারাও একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, ইমাম সাহেবের মতে যখন মহর নির্ধারণ ফাসেদ হয়ে গেল তখন তো মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতে মুত'আ ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। তাহলে কম দামির অর্ধেক কেন ওয়াজিব করা হলো?

উত্তর: এর উত্তর হলো, কম দামির অর্ধেক হওয়াও মুত'আ হিসেবেই। তাই আর কোনো প্রশ্ন থাকল না। কিন্তু এখনো সংশয় রয়ে গেছে। কারণ, আমরা বলেছি যে, যেমনিভাবে মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতে মহর নির্ধারণ ফাসেদ হওয়ার সময় মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতেও মুত'আ ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। কেননা, যেমনিভাবে মিলনের পর তালাক দ্বারা মহরে মিছিল হলো মূল ওয়াজিব, এমনিভাবে মিলনের পূর্বে তালাকের মধ্যেও মুত'আ মূল ওয়াজিব। এর জবাব হলো, ওয়াজিব তো মুত'আ-ই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু সাধারণত কম দামির অর্ধেক মুত'আ থেকে অধিক মূল্যের হয় এবং স্বামী সেই আধিক্যের স্বীকারোক্তিও দান করেছে এজন্য মুত'আ ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। এটাই কারণ যে, যদি মুত'আ অর্ধেক কম দামির থেকে অধিক মূল্যের হয় তবে অর্ধেক কম দামি ওয়াজিব হবে না; বরং মুত'আ-ই ওয়াজিব হবে।

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ اَعْطَاهَا ذٰلِكَ وَإِنْ شَاءَ اَعْطَاهَا قِيْمَتَهُ قَالَ (رضـ) مَعْنٰى هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اَنْ يُسَمِّيَ جِنْسَ الْحَيَوَانِ دُوْنَ الْوَصْفِ بِاَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ اِذَا لَمْ يُسَمِّ الْجِنْسَ بِاَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوْزُ التَّسْمِيَةُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا لِاَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ لَا يَصْلُحُ مُسَمًّى اِذْ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ وَلَنَا اَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ اِلْتِزَامَ الْمَالِ حَتّٰى لَا يَفْسُدُ بِاَصْلِ الْجَهَالَةِ كَالدِّيَةِ وَالْاَقَارِيْرِ وَشَرَطْنَا اَنْ يَكُوْنَ الْمُسَمّٰى مَالًا وَسَطُهُ مَعْلُوْمٌ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ وَ ذٰلِكَ عِنْدَ اِعْلَامِ الْجِنْسِ لِاَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيِّ وَالْوَسَطِ وَالْوَسَطُ ذُوْ حَظٍّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ لِاَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ لِاخْتِلَافِ الْمَعَانِي الْاَجْنَاسِ وَبِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ اَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَاِنَّمَا يَتَخَيَّرُ لِاَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ اِلَّا بِقِيْمَةٍ فَصَارَتْ اَصْلًا فِيْ حَقِّ الْاِيْفَاءِ وَالْعَبْدُ اَصْلٌ تَسْمِيَةً فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا .

অনুবাদ : গুণ বর্ণনা ছাড়া কোনো প্রাণীকে মহর সাব্যস্ত করে যদি বিবাহ করে, তাহলে এ মহর নির্ধারণ সহীহ হবে। আর স্ত্রী ঐ প্রাণীর মধ্যম স্তরের একটি প্রাণী পাবে। আর স্বামীর এখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে ঐ প্রাণীটি দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তার মূল্যও প্রদান করতে পারে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মাসআলার অর্থ হলো, প্রাণীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কোনো গুণ বর্ণনা করা হয়নি। যেমন– ঘোড়া কিংবা গাধা উল্লেখ করে বিবাহ করল। পক্ষান্তরে যদি প্রাণীর প্রকার উল্লেখ না করে; যেমন– একটি চতুষ্পদ জন্তুর বিনিময়ে বিবাহ করল, তাহলে মহর নির্ধারণ বৈধ হবে না এবং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় সুরতেই মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা, তাঁর মতে যা বিক্রয়চুক্তিতে মূল্য হওয়ার যোগ্য নয়, তা [বিবাহের মহররূপে] নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, [বিক্রয় ও বিবাহ] উভয়টি [মূলত] বিনিময়ের আদান-প্রদান। আমাদের দলিল হলো, বিবাহের মধ্যে মালের বিনিময় হলো এমন জিনিস, যা মাল নয়। সুতরাং বিবাহকে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থদায় গ্রহণ বলে ধরে নিলাম। তাই মূলত [মালের ধরন সম্পর্কে] অজ্ঞতার কারণে বিবাহ ফাসেদ হবে না। দিয়ত ও দায় স্বীকারের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। আর আমরা শর্ত আরোপ করেছি যে, নির্ধারিত মহরটি এমন মাল হতে হবে যার মধ্যস্তর জানা আছে, যাতে উভয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন প্রাণীটির প্রকার জানা

থাকবে। কেননা, একটি প্রকারের ভিতরে উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন এ তিনটি স্তর অন্তর্ভুক্ত। আর মধ্যমটি উত্তম ও নিম্ন উভয়টির অংশপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে প্রকার অজ্ঞাত থাকলে মধ্যম স্তর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা, প্রাণীর প্রকারের মাঝে জাতিগত ভিন্নতা বিদ্যমান। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিক্রয়ের ভিত্তি হলো সংকোচ ও দর কষাকষির উপর। পক্ষান্তরে বিবাহের ভিত্তি হলো উদারতার উপর। আর এখতিয়ার প্রদানের কারণ হলো, মূল্য ধার্য ছাড়া মধ্যম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আদায় করার ক্ষেত্রে মূল্যই হলো আসল। আর গোলাম হলো মহররূপে উল্লেখের দিক থেকে আসল। সুতরাং উভয়ের মাঝে এখতিয়ার থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلٰى حَيَوَانٍ الخ : মাসআলা : এক ব্যক্তি কোনো একজন নারীকে বিবাহ করল, মহর নির্ধারণ করল এমন প্রাণীকে যার গুণ বর্ণনা করা হয়নি, তাহলে আমাদের মতে এই মহর নির্ধারণ শুদ্ধ হবে। আর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে যে, স্ত্রীকে মধ্যম স্তরের একটি প্রাণী দেওয়া। আর স্বামীরও এখতিয়ার থাকবে, সে মধ্যম স্তরের প্রাণীর মূল্য প্রদান করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরীর এ মাসআলার অর্থ হলো, প্রাণীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, গুণ বর্ণনা করা হয়নি। যেমন– ঘোড়া কিংবা গাধা উল্লেখ করে বিবাহ করল। এখানে প্রাণীর প্রকার তো বর্ণনা করা হলো; কিন্তু এ কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, ঘোড়া নিম্নস্তরের কিংবা উচ্চস্তরের কিংবা মধ্যম স্তরের হবে। তবে যদি প্রাণীর প্রকারই বর্ণনা না করা হয়; যেমন– শুধু প্রাণীর উপর বিবাহ করা হলো, তাহলে এ মহর নির্ধারণ শুদ্ধ হবে না; বরং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের ইবারতের মধ্যে جِنْسِ حَيَوَانٍ দ্বারা نَوْعِ حَيَوَانٍ তথা প্রাণীর প্রকার উদ্দেশ্য। কারণ, ঘোড়া ও গাধার যে مِثَالٌ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো جِنْس ও نَوْع নয়। হিদায়া গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে এই জবাব হবে যে, গ্রন্থকার جِنْس দ্বারা ঐ جِنْس উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা ফকীহগণের পরিভাষায় جِنْس। যেমন– اِنْسَان তথা মানুষ। এটি ফকীহ ছাড়া অন্যদের পরিভাষায় نَوْع মোদ্দাকথা, نَوْعِ حَيَوَانٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একই অর্থের হওয়া যার মধ্যে অনেক اَفْرَادٌ অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ সবগুলোর মূল উদ্দেশ্য এক হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় সুরতের মধ্যে প্রকার বর্ণনা করা হোক বা না হোক। মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, যে জিনিস বিক্রয়-চুক্তিতে মূল্য হতে পারে না সে জিনিস বিবাহ-চুক্তিতেও নির্ধারিত মহর হতে পারে না। আর গুণ বর্ণনা করা হয়নি– এমন প্রাণী যেহেতু বিক্রয়-চুক্তিতে মূল্য হতে পারে না, তাই বিবাহ-চুক্তিতেও নির্ধারিত মহর হতে পারবে না। আকদে নিকাহকে বিক্রয়-চুক্তির উপর কিয়াস করার কারণ হলো, উভয়টি মূলত বিনিময়ের আদান-প্রদান।

হানাফীগণের দলিল হলো, বিবাহ-চুক্তি হলো মাল ছাড়া মালের বিনিময়। এজন্য আমরা বিবাহকে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থদায়রূপে গ্রহণ করে নিলাম। অর্থাৎ স্বামী নিজের উপর কোনো বিনিময় ছাড়া অর্থ আবশ্যক করে নেয়। আর অর্থ আবশ্যক করে নেওয়া মূল অজ্ঞতা দ্বারাও ফাসেদ হয় না। যেমন– দিয়তের মধ্যে শরিয়ত গুণাবলি বর্ণনা ছাড়া একশ উট নির্ধারণ করেছে, তদ্রূপ কেউ কারো জন্য কোনো জিনিসের স্বীকৃতিও দান করেছে তাহলে এ স্বীকৃতি দান সহীহ আছে। আর আমরা এ শর্ত আরোপ করেছি যে, নির্ধারিত মহরটি এমন মাল হতে হবে যার মধ্যস্তর জানা আছে। যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করা সম্ভব হয়। আর এটি তখন সম্ভব হবে যখন জিনস তথা প্রকার বর্ণনা করা হবে। কেননা, একটি প্রকারের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, নিম্ন সবগুলো স্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে। মধ্যম স্তরটির সম্পর্ক উভয়টির সাথে থাকে। কেননা, মধ্যম স্তর উত্তম স্তরের তুলনায় নিম্ন, আর নিম্ন স্তরের তুলনায় উত্তম। মোটকথা হলো, বিবাহ-শাদি প্রাথমিক পর্যায়ে হলো অর্থের দায় তথা আবশ্যক করা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো বিনিময়। অর্থ আবশ্যক করার দাবি হলো, মূল অজ্ঞতা দ্বারাও বিবাহ ফাসেদ না হওয়া। যেমন– স্বীকৃতি প্রদান মূল

অজ্ঞতাকেও বরদাশত করে। আর বিনিময়ের দাবি হলো, বিবাহ শর্তহীনভাবে অজ্ঞতাকে বরদাশত না করা। চরম অজ্ঞতাকেও নয় এবং সাধারণ অজ্ঞতাকেও নয়। যেমন– বিক্রয়-চুক্তি অজ্ঞতাকে একেবারেই বরদাশত করে না। এজন্য আমরা উভয় দিক লক্ষ্য করে বলেছি যে, বিবাহ চরম অজ্ঞতা অর্থাৎ মূল অজ্ঞতাকে তো বরদাশত করে না তবে লঘু অজ্ঞতাকে বরদাশত করে। এজন্য হানাফীগণ বলেছেন, প্রকার বর্ণনা করা জরুরি; কিন্তু গুণ বর্ণনা করা জরুরি নয়। প্রকার বর্ণনা করা এজন্যও জরুরি যে, প্রকার যদি অস্পষ্ট থাকে তাহলে মধ্যম স্তর জানাও যায় না। কেননা, প্রকারের কোনো মধ্যম স্তর নেই– প্রকারের মর্যাবলি বিভিন্ন হওয়ার কারণে। এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, আকল বড় না মহিষ বড়, সে জবাবে বলল, প্রশ্নই ভুল। কেননা, ছোট-বড় তো প্রকার একসাথে হলে হয়; প্রকার ভিন্ন হলে হয় না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, বিবাহ-চুক্তিকে বিক্রয়-চুক্তির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, বিক্রয়ের ভিত্তি হলো সংকোচ ও দর কষাকষির উপর। আর বিবাহের ভিত্তি হলো উদারতার উপর।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يَتَخَيَّرُ لِاَنَّ الْوَسَطَ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, মধ্যম স্তরের ঘোড়া কিংবা মধ্যম স্তরের গাধা নির্ধারিত মহর হলো, কায়দা আছে, নির্ধারিত মহর আদায় করা যদি সম্ভবপর হয় তখন অন্য জিনিস আদায় করা যাবে না। তারপর স্বামীকে এ এখতিয়ার কেন দেওয়া হলো যে, সে মধ্যম স্তরের প্রাণী দেবে কিংবা তার মূল প্রদান করবে।

উত্তর : এর উত্তর হলো, মধ্যম স্তর জানা যায় তার মূল্য দ্বারা। কারণ, যার মূল্য অনেক বেশি সেটি হলো উত্তম স্তরের, আর যার মূল্য একেবারেই কম সেটি হলো নিম্ন স্তরের। যার মূল্য বেশিও না কমও না সেটি হলো মধ্যম স্তরের। সুতরাং আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্য হবে আসল। নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গোলাম হলো আসল। কেননা, তার দ্বারাই নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, একদিক থেকে মূল্য আসল, অপরদিক থেকে নির্দিষ্টকরণ আসল। তাই স্বামীর এখতিয়ার থাকবে যা ইচ্ছা দেবে। হিদায়ার উক্ত নুসখায় وَالْعَبْدُ اَصْلٌ تَسْمِيَةً রয়েছে এ হিসেবে বলা হবে যে, মতনের মধ্যে حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ -কে মহর নির্ধারণ করা হয়েছে– এখানে তার এক উদাহরণ عَبْد -কে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো নুসখায় রয়েছে وَالْعَيْنُ اَصْلٌ। এ নুসখাটি অধিক পরিষ্কার। কেননা, এ সময় উদ্দেশ্য হবে হুবহু জিনিস অর্থাৎ নির্ধারিত মহর হলো আসল।

وَاِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَعْنَاهُ اَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَ وَجْهُهُ اَنَّ هٰذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ لِاَنَّ الثِّيَابَ اَجْنَاسٌ وَلَوْ سَمّٰى جِنْسًا بِاَنْ قَالَ هَرَوِيٌّ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذَا اِذَا بَالَغَ فِيْ وَصْفِ الثَّوْبِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ وَكَذَا اِذَا سَمّٰى مَكِيْلًا اَوْ مَوْزُوْنًا وَسَمّٰى جِنْسَهُ دُوْنَ صِفَتِهِ وَاِنْ سَمّٰى جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ لَا يُخَيَّرُ لِاَنَّ الْمَوْصُوْفَ مِنْهَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُبُوْتًا صَحِيْحًا .

অনুবাদ : যদি গুণ বর্ণনা না করে কোনো কাপড় মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে তবে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে অর্থাৎ শুধু কাপড় কথাটা উল্লেখ করেছে; এর অতিরিক্ত কোনো কিছু বলেনি। এর কারণ হলো, এখানে প্রকারের বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েছে। কেননা, কাপড় তো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যদি প্রকার উল্লেখ করে থাকে; যেমন বলল– "হারাবী কাপড়" তাহলে এ নির্ধারণ শুদ্ধ হবে এবং [স্বামী মাঝারী ধরনের হারাবী কাপড় কিংবা তার মূল্য প্রদানের] এখতিয়ারপ্রাপ্ত হবে। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ [এখতিয়ারপ্রাপ্ত হবে] যদি কাপড়ের আরো অতিরিক্ত গুণ বর্ণনা করে থাকে। এ হুকুম জাহিরে রিওয়ায়েত অনুযায়ী। কেননা, এটা সদৃশ শ্রেণীভুক্ত নয়। তদ্রূপ হুকুম যদি পাত্র পরিমাপিত কিংবা পাল্লা পরিমাপিত কোনো জিনিস উল্লেখ করে এবং তার প্রকার উল্লেখ করে, কিন্তু কোনো গুণ উল্লেখ না করে। পক্ষান্তরে যদি প্রকার ও গুণ উল্লেখ করে, তাহলে স্বামীকে এখতিয়ার দেওয়া হবে না। কেননা, এ জাতীয় গুণ বর্ণিত জিনিস বিশুদ্ধরূপেই জিম্মায় সাব্যস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ الخ : **মাসআলা :** বিবাহের মধ্যে কাপড়কে মহর হিসেবে নির্ধারণ করেছে, কিন্তু কাপড়ের গুণ উল্লেখ করেনি। যেমন– এভাবে বলেছে যে, মহর হিসেবে কাপড় দেব, কিন্তু তার ধরন ও প্রকার বলেনি। তবে এ সুরতে ইমাম চতুষ্টয়ের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এর কারণ হলো, এ সুরতে প্রকারের অজ্ঞতা রয়েছে। কারণ, কাপড়ের অনেক প্রকার রয়েছে– পশমি কাপড়, কাতান শাড়ি, রেশমি কাপড় প্রভৃতি। সুতরাং মহর নির্ধারণের অজ্ঞতার কারণে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি কাপড়ের প্রকার বর্ণনা করে থাকে। যেমন বলল, এটি হারাবী সুতি থানের হবে। তাহলে এ নির্ধারণ শুদ্ধ হবে এবং স্বামীর মূল্য এবং মাঝারি ধরনের হারাবী কাপড় প্রদানের ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে। দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি কাপড়ের আরো অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করে থাকে অর্থাৎ, প্রকারও বর্ণনা করল এবং তার সাথে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও মোটাও উল্লেখ করা হলো, তবে এ সুরতেও স্বামীর মাঝারি ধরনের কাপড় আর মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে। কেননা, কাপড় সদৃশ শ্রেণীভুক্ত নয়; বরং মূল্য শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই যদি কাপড় নষ্ট হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণে মূল্য দিতে হয়, সদৃশ কিছু দিতে হয় না।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا سَمّٰى مَكِيْلًا الخ : আর যদি মহর কোনো পাত্র পরিমাপিত কিংবা পাল্লা পরিমাপিত জিনিসকে নির্ধারণ করে এবং তার প্রকার বলে দেয়, যেমন– এক কুর [পরিমাপ যন্ত্র] গম কিংবা একমণ জাফরানকে মহর হিসেবে নির্ধারণ করল, কিন্তু তার গুণ বলে দেয়নি, তাহলে তখনো স্বামীর মাঝারি ধরনের নির্ধারিত বস্তু বা তার মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে। আর যদি প্রকার ও গুণ উভয়টি বলে দেওয়া হয়, তাহলে স্বামীর উপর নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে। মূল্য আর নির্ধারিত বস্তুর মধ্যকার এখতিয়ার দেওয়া হবে না। কেননা, مَكِيْلِىْ ও مَوْزُوْنِىْ -এর মধ্য থেকে যার গুণ বর্ণনা করা হয় তা শর্তহীনভাবেই জিম্মায় অবধারিত হয়ে যায়। যেমন– বায়-ই সলমের মধ্যে এবং অন্যান্য বায়ের মধ্যে। কিন্তু গুণ বর্ণিত কাপড় এর বিপরীত। কেননা, এটি শুধু বায়-ই সলমের মধ্যে জিম্মায় খেলাফে কিয়াস সাব্যস্ত হয়ে যায়।

فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّ شَرْطَ قَبُوْلِ الْخَمْرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ لٰكِنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ لِمَا أَنَّ الْمُسَمّٰى لَيْسَ بِمَالٍ فِيْ حَقِّ الْمُسْلِمِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.

অনুবাদ : যদি কোনো মুসলমান মদ বা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে, আর স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। কেননা, মহররূপে মদ গ্রহণের শর্তটি হলো শর্তে ফাসিদ। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে, আর শর্ত নাকচ হয়ে যাবে। বিক্রয়-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা শর্তে ফাসিদ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তবে মহররূপে এর উল্লেখ বৈধ হয়নি। কেননা, মুসলমানের জন্য এটা ভালো নয়। সুতরাং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ الخ : মুসলমান পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করল, মহর নির্ধারণ করল মদ বা শূকরকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, বিবাহ সহীহ হবে এবং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে বিবাহ ফাসেদ হবে। ইমাম মালিক (র.) বিবাহকে বিক্রয়-এর উপর কিয়াস করেন। যেমনিভাবে বিক্রয়ের মধ্যে শরাব ও শূকরকে মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যায় এমনিভাবে যদি বিবাহের মধ্যে শরাব ও শূকরকে মহর নির্ধারণ করা হয় তাহলে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। আইম্মায়ে ছালাছার দলিল এই যে, যখন স্বামী বলল, আমি তোমাকে মদের বিনিময়ে বিবাহ করলাম, তখন যেন স্বামী মদ কবুল করার শর্ত আরোপ করেছে। আর মদ কবুল করার শর্ত হলো শর্তে ফাসিদ। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিবাহ শর্তে ফাসিদ দ্বারা বাতিল হয় না; বরং খোদ শর্তে ফাসিদই বাতিল হয়ে যায়। কেননা, শর্তে ফাসিদ মহর নির্ধারণ বর্জন করা থেকে বড় নয়। আর যখন মহর নির্ধারণ তরক করার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না তখনতো শর্তে ফাসিদ দ্বারা অবশ্যই বিবাহ বাতিল হবে না। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায় যে, মদ ও শূকরের দ্বারা মহর নির্ধারণ করা সহীহ নয়। কেননা, মদ ও শূকর মুসলমানদের ক্ষেত্রে উপকারযোগ্য মাল নয়। মহর নির্ধারণ সহীহ না হওয়ার সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তাই ঐ সুরতেও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক (র.)-এর কিয়াসের জবাব এই যে, মহর নির্ধারণ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, নির্ধারিত জিনিস মাল হওয়া। আর যখন নির্ধারিত জিনিস মাল না হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে গেল তখন যেন বিনিময় উল্লেখই করা হয়নি। বিনিময় উল্লেখ না করার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। একই ব্যাখ্যা বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মদ ও শূকর উপকারযোগ্য মাল না হওয়ার কারণে বিক্রয়ের মধ্যে দাম নির্ধারণ সহীহ হয়নি। আর যখন সহীহ হয়নি তখন যেন বিক্রয়ের মধ্যে মূল্যের উল্লেখই করা হয়নি। আর বিক্রয় দাম নির্ধারণ না করার দ্বারা ফাসেদ হয়ে যায় এ কারণে বিক্রয়ও ফাসেদ হয়ে যাবে।

বিক্রয় শর্তে ফাসিদ দ্বারা ফাসেদ হয়ে যায় আর বিবাহ শর্তে ফাসিদ দ্বারা ফাসেদ হয় না। পার্থক্যের কারণ এই যে, শর্তে ফাসিদ বিক্রির মধ্যে হলো রিবা বা সুদ। আর সুদ কুরআন দ্বারা হারাম হয়ে গেছে। আর বিবাহের মধ্যে কোনো সুদই নেই। তাই শর্ত দ্বারা আকদের রুকনের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই আকদের রুকন সহীহ থাকবে, আর শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

فَإِنْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً عَلٰى هٰذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَهَا مِثْلُ وَزْنِهٖ خَلًّا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) تَجِبُ الْقِيْمَةُ لِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهٗ أَطْمَعَهَا مَالًا وَعَجِزَ عَنْ تَسْلِيْمِهٖ فَتَجِبُ قِيْمَتُهٗ أَوْ مِثْلُهٗ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمّٰى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ إِجْتَمَعَتِ الْإِشَارَةُ وَالتَّسْمِيَةُ فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ لِكَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ التَّعْرِيْفُ فَكَأَنَّهٗ تَزَوَّجَ عَلٰى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَقُوْلُ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسَمّٰى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُسَمّٰى مَوْجُوْدٌ فِي الْمُشَارِ ذَاتًا وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهٗ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهٖ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمّٰى لِأَنَّ الْمُسَمّٰى مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعٍ لَهٗ وَالتَّسْمِيَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمَاهِيَّةَ وَالْإِشَارَةُ تُعَرِّفُ الذَّاتَ أَلَا تَرٰى أَنَّ مَنِ اشْتَرٰى فَصًّا عَلٰى أَنَّهٗ يَاقُوْتٌ فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِإِخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَوْ إِشْتَرٰى عَلٰى أَنَّهٗ يَاقُوْتٌ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِإِتِّحَادِ الْجِنْسِ وَفِيْ مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْخَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ .

অনুবাদ : যদি কোনো স্ত্রীলোককে "এই মটকা ভর্তি সিরকা"র বিনিময়ে বিবাহ করে। কিন্তু দেখা গেল যে, তা মদ, তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, সে এ মটকার সমপরিমাণ সিরকা পাবে। আর যদি এই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু দেখা গেল যে, সে স্বাধীন মানুষ, তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, সে তাকে একটি মালের আশা দিয়েছে, কিন্তু তা অর্পণ করতে অপারগ হচ্ছে। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে কিংবা সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে, যদি পরিমাপ জাতীয় দ্রব্য হয়। মাসআলাটি এমন হলো, যেমন মহররূপে নির্ধারিত গোলাম স্ত্রীর হাতে অর্পণ করার পূর্বে মারা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এখানে [এ শব্দ দ্বারা] ইঙ্গিত এবং [গোলাম শব্দের] উল্লেখ একত্র হয়েছে। সুতরাং ইঙ্গিতটিই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তথা পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতই অধিক কার্যকর। সুতরাং যেন সে মদ কিংবা স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে বিবাহ করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মূলনীতি হলো, উল্লেখকৃত জিনিসটি যদি ইঙ্গিতকৃত জিনিসের স্বগোত্রীয় হয় [যেমন– গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তি] তাহলে

আকদ বা চুক্তির সম্পর্ক হবে ইঙ্গিতকৃত জিনিসটির সাথে। কেননা, উল্লেখকৃত জিনিসটি সত্তাগতভাবে ইঙ্গিতকৃত জিনিসটির সাথে বিদ্যমান রয়েছে, আর গুণতো সত্তার অনুবর্তী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উল্লেখকৃত জিনিসটি ইঙ্গিতকৃত জিনিসের জিনস [গোত্র] বহির্ভূত হলে আকদের সম্পর্ক হবে উল্লেখকৃত জিনিসটির সঙ্গে। কেননা, [উদ্দিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে] উল্লেখকৃত জিনিসটি ইঙ্গিতকৃত জিনিসটির সমকক্ষ; তার অনুবর্তী নয়। আর [জিনস বা গোত্র ভিন্ন হওয়ার অবস্থায়] পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে নামোল্লেখ অধিক কার্যকর। কেননা, নামোল্লেখ বস্তুর হাকীকতের পরিচয় দেয়। আর ইঙ্গিত বস্তুর সত্তার পরিচয় তুলে ধরে। দেখুন না, কেউ যদি আংটি খরিদ করে এ শর্তে যে, তা ইয়াকৃত পাথরের : কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তা কাঁচ। তাহলে বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হবে না। কেননা, জিনস ভিন্ন। আর যদি এ শর্তে খরিদ করে থাকে যে, তা লাল ইয়াকৃত হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, তা সবুজ ইয়াকৃত। তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হবে। কেননা, জিনস এক। এখন আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি হলো এক জিনস। কেননা, উপকার লাভের ক্ষেত্রে পার্থক্য কম। আর সিরকার মোকাবিলায় মদ ভিন্ন জিনস। কারণ, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هٰذَا الدَّنِّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, বিবাহে মহর নির্ধারণ করা হলো এক মটকা সিরকাকে যা ইঙ্গিতকৃত (مُشَارٌ إِلَيْهِ) কিন্তু, পরে দেখা গেল যে, তা মদের মটকা। তাহলে এ মাসআলায় ইমাম সাহেবের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের মতে ঐ মটকা সমপরিমাণ সিরকা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো, মহর নির্ধারণ করা হলো গোলামকে যা ইঙ্গিতকৃত (مُشَارٌ إِلَيْهِ) পরে দেখা গেল, তা স্বাধীন মানুষ। এ মাসআলায় তরফাইনের মাযহাব হলো, মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম সাব্যস্ত করে গোলামের যে মূল্য হবে তা ওয়াজিব হবে। মতবিরোধের সারনির্যাস হলো, সাদৃশ্যকৃত বস্তুর (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে, আর মূল্যকৃত বস্তুর (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে। তারপর উসূল হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সকল সুরতে ইঙ্গিত বিবেচ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সকল সুরতে মহর নির্ধারণ বিবেচ্য, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইঙ্গিত ও মহর নির্ধারণের মধ্যে জিনস অভিন্ন হওয়ার সুরতে ইঙ্গিত বিবেচ্য। আর জিনস ভিন্ন হওয়ার সুরতে মহর নির্ধারণ বিবেচ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্বামী স্ত্রীকে একটি মালের আশা দিয়েছে, কিন্তু সে মাল অর্পণ করতে যে অপারগ হচ্ছে। এখন যদি সে মাল পরিমাপ জাতীয় দ্রব্য হয় তাহলে তার সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে, আর যদি মূল্য জাতীয় দ্রব্য হয় তাহলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে। এ মাসআলাটি এমন হলো যেমন অর্পণ করার পূর্বেই যদি নির্ধারিত গোলাম ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তার মূল্য ওয়াজিব হবে। এখানে এমনটিই হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, هٰذَا الدَّنِّ এবং هٰذَا الْعَبْدِ -এর মধ্যে ইঙ্গিত এবং [গোলামের] নামোল্লেখ একত্র হয়েছে, আর যখন এ দু'টি জিনিস একত্র হয় তখন ইঙ্গিতটিই গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা, উদ্দেশ্য তথা পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতই অধিক কার্যকর হয়। ইঙ্গিতটি এজন্য অধিক কার্যকর যে, ইঙ্গিত হলো وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ -এর স্থলবর্তী। অর্থাৎ, কোনো কিছুর উপর হাত রেখে দেওয়া। হাত রাখার পর কোনো জিনিস পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কেননা, কোনো জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে যদি অন্যটি উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তখন এটি নিষিদ্ধ [হয়ে যায়]। কিন্তু কোনো শব্দ বলে তার অন্যটি উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। সুতরাং বুঝা গেল, ইঙ্গিতের মধ্যে অন্যের সম্ভাবনাই নেই। আর নামোল্লেখের মধ্যে অন্যের সম্ভাবনা আছে। এজন্য পরিচয় দানের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত হলো অধিক কার্যকর নামোল্লেখের মোকাবিলায়, সুতরাং যখন ইঙ্গিত বিবেচ্য হয় তখন যেন বিবাহ মদ ও স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে হলো, আর যখন এ দু'টির কোনো একটিকে মহররূপে নির্ধারণ করা হয় তখন মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। তাই উপরিউক্ত উভয় সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বুঝার পূর্বে দু'টি ভূমিকা বুঝে নিতে হবে। প্রথম ভূমিকা হলো, مَاهِيَّتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে حَقِيْقَةٌ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ আর ذَاتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা বাইরে বিদ্যমান থাকে এবং তার দিকে إِشَارَةٌ حِسِّيَّةٌ করা হয়। দ্বিতীয় ভূমিকা হলো, جِنْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার أَفْرَادْ -এর মধ্যে একটি ব্যবধানকারী বিষয় হবে এবং পার্থক্য একেবারে স্বল্প হবে। যেমন– গোলাম ও স্বাধীন মানুষ এবং মৃত ও জবাইকৃত। আর মানুষ ছাড়া অন্যের মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। جِنْسَيْن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার أَفْرَادْ -এর মধ্যে এক বিষয় থেকে অধিক ব্যবধানকারী হয় এবং أَفْرَادْ -এর মধ্যকার অনেক ব্যবধান হওয়া। যেমন– সিরকা ও মদ। এ দু'টি নামের মধ্যে ব্যবধানকারী বস্তু আছে– একটির নাম সিরকা অন্যটির নাম মদ। আর গুণ হিসেবেও ব্যবধানকারী বস্তু আছে– সিরকার মধ্যে টক আছে আর মদের মধ্যে তেজি আছে। মর্মের দিক থেকেও ব্যবধান আছে। যেমন– মদের মধ্যে নেশা আছে, কিন্তু সিরকার মধ্যে নেশা নেই। দাসী ও দাসের মধ্যে নাম ও গুণের দিক থেকে ব্যবধান আছে। এখন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের সারাংশ হলো, যে সময় আকদের মধ্যে ইঙ্গিত ও নামোল্লেখ উভয়টি একত্র হয়, তখন দেখতে হবে যে, উল্লেখকৃত জিনিসটি ও ইঙ্গিতকৃত জিনিসটি একই জিনসের না ভিন্ন জিনসের। যদি একই জিনসের হয় তাহলে ইঙ্গিতকৃতটিই (مُشَارٌ إِلَيْهِ) গ্রহণযোগ্য হবে। আর আকদের সম্পর্ক ইঙ্গিতকৃত জিনিসের সাথে হবে। কেননা, এখানে নামোল্লেখ অন্যকোনো مَاهِيَّتْ -কে বুঝাবে না; বরং গুণকেই বুঝাবে। আর গুণ সব সময় সত্তার (مَوْصُوْف) অনুবর্তী হয়। সত্তা ইঙ্গিতকৃত জিনিসটির মধ্যে বিদ্যমান আছে। সুতরাং যখন সত্তা ইঙ্গিতকৃত-এর মাঝে বিদ্যমান আছে, তাই আকদের সম্পর্ক ইঙ্গিতকৃত-এর সাথেই হবে। এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, জিনস এক হওয়ার সুরতে ইঙ্গিতকৃত জিনিসটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং তারই সাথে আকদের সম্পর্ক হবে। আর যদি নামোল্লেখ ও ইঙ্গিতকৃত জিনিসটি ভিন্ন হয় তাহলে উল্লেখকৃত জিনিসটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ সময় উল্লেখকৃত জিনিসটি ইঙ্গিতকৃত জিনিসের বহির্ভূত হাকীকতের উপর বুঝাবে। সুতরাং উল্লেখকৃত জিনিসটি ইঙ্গিতকৃত জিনিসটির সমকক্ষ হবে। দুই সমকক্ষের একটি অপরটির অনুবর্তী হয় না। সুতরাং হকের দাবিদার হিসেবে একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক। আর যেহেতু জিনস ভিন্ন হওয়ার সুরতে নামোল্লেখ হলো পরিচয় দানের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। কেননা, নামোল্লেখ দ্বারা বস্তুর হাকীকত বুঝা যায় আর ইঙ্গিত দ্বারা বস্তুর সত্তার পরিচয় লাভ করা যায়। আর হাকীকতের পরিচয় উত্তম সত্তার পরিচয়ের তুলনায়। এজন্য আমরা বলেছি যে, পরিচয় দানের ক্ষেত্রে নামোল্লেখ অধিক কার্যকর। আর নামোল্লেখ যেহেতু অধিক কার্যকর তাই নামোল্লেখের গ্রহণযোগ্যতা হবে। আর এ সুরতে আকদের সম্পর্কও নামোল্লেখের সাথে হবে; ইঙ্গিতের সাথে নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নীতিমালার ভিত্তিতে অধিক মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কেউ যদি ইয়াকৃত পাথরের শর্তে আংটি খরিদ করে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তা কাঁচ, তাহলে বিক্রয়-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, নামোল্লেখ হলো ইয়াকৃতের আর ইঙ্গিতকৃত বস্তু হলো কাঁচের। উভয়টির জিনস ভিন্ন। আর জিনস ভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আকদের সম্পর্ক হয় নামোল্লেখের সাথে, আর নামোল্লেখ তথা ইয়াকৃত এখানে নেই। তাই পণ্য না থাকার কারণে বিক্রয়-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি লাল ইয়াকৃতের শর্তে খরিদ করে থাকে, পরে দেখা গেল যে, তা সবুজ ইয়াকৃত। তাহলে বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, এখানে নামোল্লেখ তথা লাল ইয়াকৃত আর ইঙ্গিতকৃত বস্তু তথা সবুজ ইয়াকৃত উভয়টির জিনস এক ও অভিন্ন। আর জিনস এক হওয়ার সুরতে আকদের সম্পর্ক ইঙ্গিতকৃত বস্তুর সাথে হয়। তাই ইঙ্গিতকৃত বস্তু পণ্য হবে। আর যেহেতু এ সুরতে পণ্য উপস্থিত তাই বিক্রয়-চুক্তি সহীহ হয়ে যাবে। তবে গুণাবলি না থাকার কারণে ক্রেতার কবুল করার এখতিয়ার থাকবে। এখন মতনের মাসআলায় লক্ষণীয় যে, স্বাধীন ব্যক্তি আর গোলামের মধ্যে স্বল্প ব্যবধান থাকার কারণে জিনস এক। আর জিনস এক হলে আকদের সম্পর্ক ইঙ্গিতকৃত বস্তুর সাথে হয়। এখানে ইঙ্গিতকৃত বস্তু হলো স্বাধীন ব্যক্তি, যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই এ সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর সিরকা ও মদের মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাংঘাতিক ধরনের ব্যবধান রয়েছে, তাই উভয়টির মধ্যে জিনস ভিন্ন হবে। আর জিনস ভিন্ন হলে আকদের সম্পর্ক নামোল্লেখের সাথে হয়। আর নামোল্লিখিত বস্তুটি হলো সিরকা, যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে বিদ্যমান না থাকার কারণে সোপর্দ করতে অপারগ। যেহেতু সিরকার মটকা মূল্য জাতীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তার সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا اَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا اِلَّا الْبَاقِىْ اِذَا سَاوٰى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّهُ مُسَمًّى وَ وُجُوْبُ الْمُسَمّٰى وَاِنْ قَلَّ يَمْنَعُ وُجُوْبَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) لَهَا الْعَبْدُ وَقِيْمَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا لِاَنَّهُ اَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنِ وَعَجِزَ عَنْ تَسْلِيْمِ اَحَدِهِمَا فَتَجِبُ قِيْمَتُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لَهَا الْعَبْدُ الْبَاقِىْ اِلٰى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا اِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا اَكْثَرَ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ لِاَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا عِنْدَهُ فَاِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ اِلٰى تَمَامِ مَهْرِ الْمِثْلِ .

অনুবাদ : যদি ইশারাকৃত দুই গোলামের বিনিময়ে বিবাহ করে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, একজন হলো স্বাধীন লোক তাহলে অপর গোলামটিই শুধু পাবে- যদি তা দশ দিরহামের সমপরিমাণ হয়। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, এটা নির্ধারিত মহর। আর নির্ধারিত মহর সাব্যস্ত হওয়ার পর পরিমাণে তা যত কমই হোক, মহরে মিছিল সাব্যস্ত করতে বাধা দেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, স্ত্রী গোলামটি পাবে এবং স্বাধীন লোকটি গোলাম গণ্য হলে যে মূল্য হতো সেই মূল্য পাবে। কেননা, সে তার স্ত্রীকে উভয় গোলাম পুরোপুরি অর্পণের আশা দিয়েছে। অথচ এখন দু'টির একটিকে অর্পণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর তা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত একটি মত- তার মহরে মিছিল যদি গোলামের থেকে বেশি হয় তাহলে সে মহরে মিছিল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপর গোলামটির মূল্য পাবে। কেননা, লোক দু'টি উভয়ে যদি স্বাধীন হতো তাহলে তাঁর মতে পূর্ণ মহরে মিছিল ওয়াজিব হতো। সুতরাং একজন যদি গোলাম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মহরে মিছিল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত গোলামটির মূল্য ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, দুই গোলামের দিকে ইশারা করে মহর নির্ধারণ করেছে। ঘটনাচক্রে দুজনের একজন স্বাধীন ছিল, অপরজন গোলাম ছিল। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, দুজনের মধ্যে যে গোলাম- তার মূল্য যদি দশ দিরহামের সমপরিমাণ হয় তাহলে শুধু সে গোলাম ওয়াজিব হবে, আর যদি দশ দিরহাম থেকে কম মূল্যের হয় তবে দশ দিরহাম পূর্ণ করে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব হলো, গোলাম ওয়াজিব হবে, আর স্বাধীন লোকটিকে গোলাম গণ্য করে তার যে মূল্য হয় তাও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোলাম ওয়াজিব হবে সমস্ত মহরে মিছিল পর্যন্ত। অর্থাৎ মহরে মিছিল যদি গোলামের মূল্য থেকে অধিক হয় তাহলে মহরে মিছিল পূর্ণ করে দেওয়া হবে যেমন- গোলামের মূল্য একহাজার দিরহাম। আর স্ত্রীর মহরে মিছিল দু'হাজার দিরহাম তাহলে স্ত্রীকে গোলামের সাথে আরো একহাজার দিরহাম অতিরিক্ত দেওয়া হবে, তাহলে মহরে মিছিলের পরিমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নামোল্লেখ আর ইঙ্গিত যদি একত্র হয় তাহলে ইঙ্গিত গ্রহণযোগ্য হয়। আর স্বাধীন ব্যক্তির দিকে ইশারা করার দ্বারা তাকে আকদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তাহলে যেন একটি গোলামের বিনিময়ে বিবাহ সংঘটিত হলো। আর এ একটা গোলামই হলো নির্ধারিত মহর। নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হওয়া মহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। যদিও নির্ধারিত মহর কমই হোক না কেন। আবার এটিও হতে পারবে না যে, গোলাম বাকি থাকবে, আর মহরে মিছিল উভয়টিকে ওয়াজিব করবে। কারণ, এ দুটি একত্র হতে পারে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্বামী দুই গোলাম উল্লেখ করে স্ত্রীকে লোভ দেখিয়েছে দুই গোলামই অর্পণ করবে। কিন্তু একটি অর্পণ করতে অপারগতা দেখা দিয়েছে, তাই তার মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যদি এ দুটি গোলাম স্বাধীন হতো তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হতো। সুতরাং যখন একটি গোলাম, তাই সমস্ত মহরে মিছিল পর্যন্ত এক গোলাম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, যদি গোলামের মূল্য মহরে মিছিল থেকে কম হয় তাহলে সেই কমকে পূর্ণ করে দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের ভিত্তি হলো, তিনি জিনস এক হওয়ার সুরতে ইঙ্গিতকে ধর্তব্য বলে মনে করেন।

وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِىْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيْهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهٖ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيْفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَكَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ فِيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمَكُّنُ فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْيِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمّٰى عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) هُوَ يَعْتَبِرُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَنَا اَنَّ الْمُسْتَوْفٰى لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَجِبِ الزِّيَادَةُ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمّٰى لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهٗ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ فِىْ نَفْسِهٖ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهٗ بِقِيْمَتِهٖ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ اِلْحَاقًا لِلشُّبْهَةِ بِالْحَقِيْقَةِ فِىْ مَوْضِعِ الْاِحْتِيَاطِ وَتَحَرُّزًا عَنْ اِشْتِبَاهِ النَّسَبِ .

অনুবাদ : নিকাহে ফাসিদ -এর ক্ষেত্রে মিলনের পূর্বে যদি কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন, তাহলে সে কোনো মহর পাবে না। কেননা, ফাসেদ হওয়ার কারণে শুধু আকদ দ্বারা মহর ওয়াজিব হয় না; বরং সম্ভোগ-অঙ্গের ফায়দা অর্জন করার কারণে মহর ওয়াজিব হয়। অদ্রূপ নির্জনে সাক্ষাতের পরও [সে মহর পাবে না]। কেননা, নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে নির্জন সাক্ষাৎ দ্বারা [সহবাসের উপর] সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং নির্জন সাক্ষাৎকে মিলনের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হবে না। আর যদি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে তাহলে মহরে মিছিল পাবে, কিন্তু তা নির্ধারণকৃত মহরের অধিক হতে পারে না। এটা হলো আমাদের মত। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি একে ফাসেদ বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হলো, [সম্ভোগ-অঙ্গের লাভ] অর্জিত বিষয় কোনো মাল নয়। মহর উল্লেখের মাধ্যমেই তা মূল্যবিশিষ্ট হয়। সুতরাং যখন নির্ধারিত মহর মহরে মিছিলের চেয়ে বেশি হয় তখন মহর উল্লেখকরণ অশুদ্ধ হওয়ার কারণে অতিরিক্ত পরিমাণটুকু ওয়াজিব হবে না। আর তা মহরে মিছিলের চেয়ে কম হলে নির্ধারিত মহরের অতিরিক্তটুকু ওয়াজিব হবে না। কেননা, অতিরিক্ত পরিমাণটুকু উল্লেখ করা হয়নি। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিক্রীত বস্তু তো নিজস্ব সত্তা হিসেবে মূল্যমান মাল। সুতরাং তার [বাজার] মূল্য দ্বারাই তার স্থলবর্তী নির্ধারিত হবে। আর ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। যেহেতু সতর্কতার ক্ষেত্রে এবং নসবকে সন্দেহমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সন্দেহযুক্ত বিবাহকে প্রকৃত বিবাহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِىْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কাজি নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল অথচ এখনো স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সংগম করেনি, তাহলে এ সূরতে মহর পাবে না– পূর্ণ মহরও না এবং আংশিক মহরও না। পক্ষান্তরে বিবাহ যদি সহীহ হয়, তখন মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে

নিকাহে ফাসিদ যেমন– দুই সাক্ষী ছাড়া বিবাহ, তালাকে বায়েনের ক্ষেত্রে এক বোনের ইদ্দতে অপর বোনের সাথে বিবাহ, চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে পঞ্চম বিবাহ, স্বাধীন স্ত্রী থাকাকালে দাসীকে বিবাহ। নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে মিলনের পূর্বে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে মহর ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হলো, নিকাহে ফাসিদের মধ্যে নিরেট আকদের কারণে মহর ওয়াজিব হয় না, কারণ, আকদটি হলো ফাসেদ; বরং সম্ভোগ-অঙ্গের ফায়দা অর্জন করার কারণে মহর ওয়াজিব হয়। আর নিকাহে ফাসিদের মধ্যে শুধু আকদের কারণে মহর ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . "অর্থাৎ যে মহিলা ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল, তার বিবাহ বাতিল। [তবে] যদি তার সাথে মিলন হয় তাহলে সে মহর পাবে– তার যৌনাঙ্গ হালাল করার কারণে।" উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, নিকাহে বাতিলের মধ্যে মহর সংযোগের কারণে ওয়াজিব হয়। শুধু আকদ ও মিলন দ্বারা হয় না। এমনিভাবে যদি নিকাহে ফাসিদ -এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা হয়, তাহলেও স্ত্রী মহর পাবে না। কারণ, নিকাহে সহীহ -এর মধ্যে নির্জন সাক্ষাতের পর মহর এ কারণে ওয়াজিব হতো যে, নির্জন সাক্ষাৎ হলো সঙ্গমের স্থলবর্তী আর নিকাহে ফাসিদের মধ্যে যেহেতু শরয়ী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, তাই এটি অহেতুক [ফাসেদ] নির্জন হবে, আর ফাসেদ নির্জন সংগমের স্থলবর্তী হয় না। তাই নিকাহে ফাসিদের মধ্যে নির্জন সাক্ষাতের পরও মহর ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ যদি স্ত্রীর সাথে সংগম করে তবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর এ মহরে মিছিল আমাদের মতে নির্ধারিত মহর থেকে অতিরিক্ত না হওয়া চাই। ইমাম যুফার (র.)-এর মত হলো, নিঃশর্তভাবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। নির্ধারিত মহর থেকে কম হোক বা বেশি হোক। ইমাম যুফার (র.) নিকাহে ফাসিদকে বায়-ই ফাসিদের উপর কিয়াস করেন। যেমনিভাবে বায়-ই ফাসিদের মধ্যে মূল্য ওয়াজিব হয়– তা মূল্য থেকে কম হোক বা বেশি হোক। এমনিভাবে নিকাহে ফাসিদের মধ্যেও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে নির্ধারিত মহর থেকে বেশি হোক বা কম হোক। আমাদের দলিল হলো, সম্ভোগ-অঙ্গের লাভ যা অর্জিত হয়েছে তা মাল নয়। তবে নিকাহের সময় যখন মহর উল্লেখ করা হয়েছে তখন সম্ভোগ-অঙ্গের লাভ মূল্যবিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং যখন মহরে মিছিলের উপর নির্ধারিত মহর বেশি হবে, তখন অতিরিক্তটি ওয়াজিব হবে না। কেননা, মহরে মিছিল থেকে অতিরিক্তের নির্ধারণ সহীহ হয়নি। আর যদি নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে কম হয়ে যায়, তখন নির্ধারিতের অতিরিক্ত ওয়াজিব হবে না। কেননা, নির্ধারিতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে কম। তাহলে যেন স্ত্রী নিজের হক কম করার উপর রাজি হয়ে গেছে। এর উপর স্ত্রীর কোনো অভিযোগ নেই। এর বিপরীত হলো বিক্রয়-চুক্তি। কেননা, বিক্রীত বস্তু তার নিজস্ব সত্তা হিসেবেই মূল্য বিশিষ্ট হয় তাই তার মূল্য দ্বারাই তার স্থলবর্তী নির্ধারিত হবে। এজন্য নিকাহে ফাসিদকে বাই-ই ফাসিদ-এর উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না। আর নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা, নিকাহে ফাসিদের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিবাহ রয়েছে। তাই সন্দেহযুক্ত বিবাহকে প্রকৃত বিবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সতর্কতার খাতিরে। কারণ, নসব এমন একটি বিষয় যাকে সাব্যস্ত করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং নসবকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং নসবকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে।

وَيُعْتَبَرُ إِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيْقِ لَا مِنْ اٰخِرِ الْوَطِيَّاتِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهَا تَجِبُ بِاِعْتِبَارِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَ رَفْعُهَا بِالتَّفْرِيْقِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا لِاَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِيْ اِثْبَاتِهِ اِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُوْلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى لِاَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ اِلَيْهِ وَالْاِقَامَةُ بِاِعْتِبَارِهٖ ـ

অনুবাদ : আর ইদ্দতের আরম্ভ বিচ্ছেদের সময় থেকে গণ্য করা হবে; শেষ মিলন থেকে নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, এ ইদ্দত বিবাহের সন্দেহের কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার নিরসন হচ্ছে বিচ্ছেদ ঘটানোর মাধ্যমে। আর তার সন্তানের নসব স্বীকৃত হবে। কেননা, সন্তানের জীবন ধারণ নিশ্চিত করার জন্য নসব সাব্যস্ত করার অনুকূলে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং যে বিবাহ কোনো অবস্থায় সাব্যস্ত হয়, সে বিবাহের উপরই নসব সাব্যস্ত হবে। আর নসবের মেয়াদ গণ্য করা হবে মিলনের সময় থেকে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত এবং এর উপরই ফতোয়া। কেননা, ফাসেদ বিবাহ মিলনের প্রতি প্রেরণাদায়ক নয়। আর এ হিসেবেই বিবাহকে মিলনের স্থলবর্তী গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الخ : নিকাহে ফাসিদের মধ্যে ইদ্দতের আরম্ভ কখন থেকে হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আইম্মায়ে আরবা'আর মাযহাব হলো, ইদ্দতের আরম্ভ বিচ্ছেদের সময় থেকে গণ্য করা হবে, শেষ মিলন থেকে নয়। ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব হলো, ইদ্দতের আরম্ভ শেষ মিলন থেকে গণ্য হবে। সুতরাং যদি শেষ মিলনের পর বিচ্ছেদের পূর্বে তিন হায়েজ অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, ঐ মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। আইম্মায়ে আরবা'আর মতে, বিচ্ছেদের পর থেকে ইদ্দতের আরম্ভ গণ্য করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাবকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে তার দলিল বর্ণনা করেননি। আইম্মায়ে আরবা'আর দলিল হলো যে, নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দত এজন্য ওয়াজিব যে, তার মধ্যে বিবাহের সন্দেহ রয়েছে। কারণ, আকদের রুকন তথা ইজাব ও কবুল পাওয়া গেছে। আর বিবাহের সন্দেহ নিরসন হয় বিচ্ছেদ দ্বারা। তাই বিচ্ছেদের সময় থেকেই ইদ্দতের আরম্ভ হবে।

قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا الخ : নিকাহে ফাসিদের ফলাফলে যদি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তার নসব স্বীকৃত হবে। দলিল হলো, নসব সাব্যস্ত করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা, বাচ্চার নসব যদি সাব্যস্ত না হয় এবং তার কোনো প্রসিদ্ধ পিতা এবং মুরব্বি না থাকে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেকাংশে মৃত্যু পর্যন্ত এসে যায়। সুতরাং নিকাহে ফাসিদ একদিক থেকে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চাকে জীবিত রাখার জন্য তার উপর নসব সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। নসবের মেয়াদ কখন থেকে গণ্য করা হবে এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব হলো, নসবের মেয়াদ মিলনের সময় থেকে গণ্য করা হবে; আকদে নিকাহ থেকে গণ্য করা হবে না। এরই উপর ফতোয়া।

শায়খাইন (র.) বলেন, নসবের মেয়াদ বিবাহের সময় থেকে গণ্য করা হবে। শায়খাইনের দলিল হলো, তারা নিকাহে ফাসিদকে নিকাহে সহীহ -এর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, যেমনিভাবে নিকাহে সহীহের মধ্যে নসবের মেয়াদ নিকাহের ওয়াক্ত থেকে শুরু হয়, এমনিভাবে নিকাহে ফাসিদের মধ্যেও নসবের মেয়াদ বিবাহের ওয়াক্ত থেকে হবে; সহবাসের ওয়াক্ত থেকে নয়। মতবিরোধের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, নিকাহে ফাসিদের ছয় মাস পর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলো, কিন্তু মিলনের সময় থেকে ছয় মাসের মেয়াদ পূর্ণ হয়নি; বরং কিছু সময় বাকি, তাহলে শায়খাইনের মতে নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল ও শায়খাইনের কিয়াসের জবাব হলো, নিকাহে সহীহের মধ্যে নসবের মেয়াদ বিবাহের ওয়াক্ত থেকে এ কারণে গণ্য হবে যে, তা সহবাসের দিকে প্রেরণাদায়ক হিসেবে সহবাসের স্থলবর্তী হবে। আর যেহেতু নিকাহে ফাসিদের মধ্যে সহবাস হারাম, আর নিকাহ ভাঙ্গন একান্ত আবশ্যক। এজন্য তা সহবাসের দিকে প্রেরণাদায়কও হবে না, আর যখন নিকাহে ফাসিদ সহবাসের দিকে প্রেরণাদায়ক নয়, তা সহবাসের স্থলবর্তীও হবে না। সুতরাং নসবের মেয়াদ মিলনকাল থেকে গণ্য হবে; বিবাহের ওয়াক্ত থেকে নয়।

قَالَ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِاَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ اَعْمَامِهَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) لَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ فِيْهِ وَلَا شَطَطَ وَهُنَّ اَقَارِبُ الْاَبِ وَلِاَنَّ الْاِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ اَبِيْهِ وَقِيْمَةُ الشَّيْءِ اِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِيْ قِيْمَةِ جِنْسِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاُمِّهَا وَخَالَتِهَا اِذَا لَمْ تَكُوْنَا مِنْ قَبِيْلَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا فَاِنْ كَانَتِ الْاُمُّ مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا بِاَنْ كَانَتْ بِنْتُ عَمِّهِ فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا لِمَا اَنَّهَا مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا وَيُعْتَبَرُ فِيْ مَهْرِ الْمِثْلِ اَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ لِاَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هٰذِهِ الْاَوْصَافِ وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ قَالُوْا وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِيْ اَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ لِاَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوْبَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্ত্রীর মহরে মিছিল সাব্যস্ত হবে তার বোন, ফুফু ও চাচাত বোনদের মহরের সঙ্গে তুলনা করে। কেননা, ইবনে মাসঊদ (র.) বলেছেন, সে তার সমগোত্রীয় নারীদের অনুরূপ মহর পাবে– কমও নয়, বেশিও নয়। আর তারা হলো পিতৃকুলের আত্মীয়া। তাছাড়া মানুষ তার পিতার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য হয়। আর কোনো জিনিসের মূল্য তার সমগোত্রীয়ের মূল্যের দিকে লক্ষ্য করলেই জানা যায়। মা ও খালা যদি তার স্বগোত্রীয় না হয়, তাহলে তাদের মহরের সাথে তুলনা করা যাবে না। এর কারণ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। মা যদি তার পিতার গোত্রীয় হয়; যেমন– পিতার চাচাতো বোন তখন তার মায়ের মহরের সাথে তুলনা করা যাবে। কেননা, মা তো তার পিতার গোত্রীয়া। মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে উভয় নারীর বয়সে, সৌন্দর্যে, অর্থ-সম্পদে, জ্ঞানে, ধার্মিকতায় এবং দেশ ও কালের ব্যাপারে সমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেননা, এ সকল গুণের বিভিন্নতার কারণে মহরে মিছিল বিভিন্ন হয়ে থাকে। তদ্রূপ দেশ ও কালের ব্যবধানের কারণেও বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফকীহগণ বলেছেন, কুমারিত্বের ক্ষেত্রেও মিল হতে হবে। কেননা, কুমারিত্ব ও অকুমারিত্বের কারণে মহরে পার্থক্য হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ الخ : মাসআলা : স্ত্রীর মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে তার বংশের নারীদের বিবেচনা করা হবে, যারা তার পিতৃকুলের আত্মীয়া। যেমন– বোন, ফুফু ও চাচাতো বোন প্রমুখ। ইবনে আবী লায়লা মহরে মিছিলের মধ্যে স্ত্রীর মা এবং যে সকল নারী তার মাতৃকুলের আত্মীয়া তাদের বিবেচনা করেন। যেমন– খালা। ইবনে আবী লায়লার দলিল হলো, মহর নারীদের সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য। তাই নারীদের পক্ষ থেকে যারা আত্মীয়া, মহরে মিছিলের মধ্যে তাদেরই বিবেচনা করা হবে। আমাদের দলিল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বাণী– لَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا وَهُنَّ اَقَارِبُ الْاَبِ "নারীর জন্য তার সমগোত্রীয় নারীদের অনুরূপ মহরে মিছিল হবে এবং তারা পিতৃকুলের নিকটাত্মীয়া।" উক্ত বাণীর মধ্যে نِسَا -এর

إِضَافَتُ ঐ নারীদের দিকে করা হয়েছে, অর্থাৎ ঐ নারীর নারীদের দিকে। সারাংশ হলো, নারীদেরকে যুক্ত করা হয়েছে ঐ নারীর দিকে। আর নসবের মধ্যে পিতা বিবেচ্য হয়; মা বিবেচ্য হয় না। দ্বিতীয় দলিল এই যে, মানুষ তার পিতার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর কোনো বস্তুর মূল্য তার গোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য করলেই জানা যায়। তাই সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য অর্থাৎ– মহরে মিছিলকে জানার ক্ষেত্রে সে নারীর পিতার নিকটাত্মীয়া নারীদের বিবেচনা করা হবে নসবের মধ্যে। যেহেতু পিতার বিবেচনা করা হয়, এ কারণে দাসীর ছেলেকে খলিফা নির্ধারণ করা জায়েজ, তবে শর্ত হলো তার পিতা কুরায়শী হতে হবে। وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ এটি হযরত ইবনে মাসউদ (র.)-এর বক্তব্য নয়; বরং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি نِسَائِهَا -এর ব্যাখ্যা। কেউ কেউ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ থেকে وَاوْ-কে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন এবং এটাকে স্ত্রীগণের নিকটাত্মীয়া হওয়ার উপর দলিল পেশ করেছেন। অর্থাৎ, তার স্ত্রীরা এবং তারা পিতার নিকটাত্মীয়া। এর দলিল হলো, মানুষ তার পিতার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মহরে মিছিলের মধ্যে স্ত্রীর মা ও খালা বিবেচ্য হবে না যখন তারা স্ত্রীর আত্মীয়াদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে মা যদি স্ত্রীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে তার বিবেচনা করা হবে। যেমন– স্ত্রীর পিতা বিবাহ করেছে তার চাচার মেয়েকে; সুতরাং এ সুরতে ঐ স্ত্রীর মা ও খালা পিতার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই মহরে মিছিলের মধ্যে তাদেরও বিবেচনা করা হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মহরের মধ্যে এরও বিবেচনা করা হবে যে, দুজন নারী বয়সে, সৌন্দর্যে, অর্থ-সম্পদে, জ্ঞান-গরিমায়, ধার্মিকতায়, দেশ এবং কালের মধ্যে বরাবর হবে। কেননা, মহরে মিছিল গুণের বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে যায়। এমনিভাবে শহর ও কালের ভিন্নতার কারণেও ভিন্ন হয়ে যায়।

কোনো কোনো ফকীহ কুমারিত্বের মধ্যেও মিল থাকাকে বিবেচনা করেছেন। কারণ, কুমারিত্ব আর অকুমারিত্বের কারণেও মহরে মিছিল ভিন্ন হয়ে যায়। তাই কুমারীর সঙ্গম-অঙ্গের মূল্য বেশি হবে; আর অকুমারীর কম হবে। মোদ্দাকথা, মহরে মিছিল হলো সংগম-অঙ্গের মূল্য। আর কোনো বস্তুর মূল্য তার সমসাময়িক মূল্য দ্বারা বুঝা যায়। তাই যে সকল নারী মহরে মিছিলের মধ্যে ধর্তব্য তারা উপরে বর্ণিত জিনিসগুলোর মধ্যে ঐ স্ত্রীর বরাবর হওয়া চাই। আর মতনের মধ্যে বয়স দ্বারা বিবাহের বয়স উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ أَهْلُ الْإِلْتِزَامِ وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَصِحُّ ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا إِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي الْكَفَالَةِ وَكَذٰلِكَ يَصِحُّ هٰذَا الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْأَبُ مَالَ الصَّغِيرِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْوَلِيَّ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فِي النِّكَاحِ وَفِي الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَالْحُقُوقُ إِلَيْهِ وَيَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَوْ صَحَّ الضَّمَانُ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ وَ وِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ لِلْأَبِ بِحُكْمِ الْأُبُوَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَاقِدٌ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ بَعْدَ بُلُوغِهَا فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ .

অনুবাদ : ওলী যদি মহরের জামিন হয় তাহলে তার জামানত সহীহ হবে। কেননা, সে দায়-দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য এবং দায়িত্ব এমন একটি জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে যা দায়িত্বভুক্ত হতে পারে। কাজেই জামানত সহীহ হবে। অতঃপর স্ত্রীর মহর দাবি করার এখতিয়ার থাকবে স্বামীর কাছে কিংবা ওলীর কাছে । এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে অন্যান্য জামিনদারির উপর কিয়াস করে। তবে ওলী নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে থাকলে স্বামীর নিকট হতে ফেরত নেবে, যদি স্বামীর আদেশে জামিন হয়ে থাকে। জামিনদারির ক্ষেত্রে এই হলো নিয়ম। স্ত্রী নাবালেগা হলেও এ জামিনদারি সহীহ হবে। তবে যদি পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মাল বিক্রি করে এবং মূল্যের জামিন হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা, বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী নিছক বার্তাবাহক ও বক্তব্য আদায়কারী। পক্ষান্তরে বিক্রির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী, তাই দায়দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয় এবং হকসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তাকে দায়মুক্ত করা সহীহ হবে, আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে মূল্য কব্জা করারও অধিকারী হবে। সুতরাং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওলীকে যদি মূল্যের বৈধ জামিন গণ্য করা হয় তাহলে সে নিজে নিজের জন্য জামিন সাব্যস্ত হবে। আর পিতার জন্য মহর কব্জা করার অধিকার হাসিল হয় পিতৃত্বের দাবিতে; আকদ সম্পাদনকারী হিসেবে নয়। এজন্যই নাবালেগা বালেগা হওয়ার পর মহর কব্জা করার অধিকার পিতার থাকে না। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের জন্য নিজে জামিন হচ্ছে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, ওলী তথা পিতা তার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দিল এবং মেয়ের জন্য তার স্বামীর পক্ষ থেকে মহরের জামিন হলো, তাহলে তার এ জামিন হওয়া শরয়ীভাবে জায়েজ আছে। কেননা, ওলী মালের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য, আর যে জিনিসের দিকে দায়িত্বকে যুক্ত করেছে অর্থাৎ মহর তাও দায়িত্বযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

কেননা, মহর হলো ঋণ (دَيْن) আর ঋণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও জামিনদারি উভয়টি জায়েজ। তাই ওলী কর্তৃক বালেগার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে মহরের জামিন হওয়া সহীহ। সুতরাং যখন জামিনদারী সহীহ হলো তখন স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে, সে মহর স্বামীর কাছেও দাবি করতে পারে এবং ওলীর কাছেও দাবি করতে পারে। অন্যান্য জামিনদারির মধ্যেও এটাই নিয়ম যে, মালের মালিক ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার উভয়ের কাছে মাল দাবি করতে পারে। এখন ওলী যদি মহরের মাল স্ত্রীকে দিয়ে দেয় তাহলে লক্ষণীয় যে, এটি স্বামীর নির্দেশে দেওয়া হয়েছে কিনা? যদি স্বামীর নির্দেশে দিয়ে থাকে তাহলে ওলী এ মহরের মালকে স্বামীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে। আর যদি স্বামীর নির্দেশে না দিয়ে থাকে তাহলে ওলী স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না; বরং এ আদায়কৃত মহর ওলীর পক্ষ থেকে দান হবে। জামিনদারিরও এটাই নিয়ম। আর এ জিম্মাদারি সহীহ হওয়ার হুকুম তখন দেওয়া হবে যখন ওলী জামিনদার হয় ছোট কন্যার, তবে যদি পিতা তার ছোট ছেলের মাল ক্রয় করে এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যেরও জামিনদার হয়ে যায় তাহলে এ জিম্মাদারিত্ব সহীহ হবে না। মোদ্দাকথা, পিতা তার ছোট কন্যার পক্ষ থেকে তার মহরের জামিন তো হতে পারে, কিন্তু তার ছোট ছেলের মাল ক্রয় করার সুরতে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জিম্মাদার হতে পারবে না। পার্থক্যের কারণ এই যে, ওলী বিবাহের মধ্যে শুধু বার্তাবাহক এবং বক্তব্য দানকারী হয়। এর চেয়ে অধিক আর কোনো কিছু নয়। আর বিক্রয়ের মধ্যে ওলী বার্তাবাহক নয়; বরং চুক্তি সম্পাদনকারী। এ কারণে বিবাহের মধ্যে নিকাহের হুকুম ও নিকাহের জিম্মাদারি স্বামী-স্ত্রীর দিকে আরোপিত হয়; ওলীর দিকে নয়। যেমন– স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের দাবি স্বামীর কাছে করবে; ওলীর কাছে নয়। এমনিভাবে স্বামী সহবাসের যোগ্য হওয়ার দাবি স্ত্রীর নিকট করবে– ওলীর নিকট নয়। অর বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রয়ের হুকুম চুক্তি সম্পাদনকারীর দিকে আরোপিত হয়; আসীলের দিকে নয়। যেমন– ক্রেতা পণ্যের উপর কব্জা করার দাবি চুক্তি সম্পাদনকারীর নিকট করবে, আসীল (صَغِيْر) -এর নিকট করবে না। এমনিভাবে মূল্য উসুল করার হক চুক্তি সম্পাদনকারী ওলীর হবে; আসীল তথা সগীরের হবে না। এ কারণে ওলী যদি ক্রেতাকে মূল্য থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে ক্রেতা মুক্ত হয়ে যাবে তরফাইনের মতে। আর যার ওলী ছিল তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে। এজন্য সগীরের বালেগ হওয়ার পরও বিবাহের মধ্যে ওলীর অবস্থান হলো একজন বার্তাবাহক ও বক্তব্য আদায়কারীর মতো। তাই এখন যদি সে তার বালেগা কিংবা সগীরা কন্যার জন্য মহরের জামিন হয় তাহলে এ জিম্মাদারী নিজের জন্য হবে না; বরং অন্যের জন্য হবে। আর অন্যের জন্য জামিন হওয়া জায়েজ। তাই পিতার জন্য নিজের কন্যার জামিন হওয়াও জায়েজ হবে। আর যেহেতু বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে ওলীর অবস্থান বার্তাবাহকের অনুরূপ নয়; বরং চুক্তি সম্পাদনকারী। তাই এখন যদি ওলী তথা পিতা তার সগীর সন্তানের জন্য ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জামিন হয়ে যায় তাহলে এটি নিজের জন্য জামিন হতে হবে, যা নাজায়েজ। এজন্য বিক্রয়-চুক্তির মধ্যে পিতা তার সন্তানের জন্য ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্যের জামিন হতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَوِلَايَةُ قَبْضِ الْمَهْرِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো, পিতা তার ছোট কন্যার পক্ষ থেকে মহর কব্জা করার মালিক, যেমনিভাবে উকিল মূল্য কব্জা করার মালিক। তাই যদি পিতার জামিন হওয়া সহীহ হয় তাহলে এটি নিজের জন্য জামিন হওয়া আবশ্যক হবে, যা নাজায়েজ।

উত্তর : এর উত্তর হলো, পিতার জন্য মহর কব্জা করার অধিকার তার চুক্তিকারী হওয়ার কারণে নয়; বরং পিতা হওয়ার কারণে। এ কারণে কন্যার বালেগ হওয়ার পর পিতা মহর কব্জা করার মালিক থাকে না। সুতরাং পিতা যদি তার কন্যার মহরের জামিন হয়ে যায় তাহলে এটি নিজের জন্য জামিন হওয়া নয়। এজন্য একে জায়েজ বলা হয়েছে।

قَالَ وَلِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتّٰى تَاْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعَهُ اَنْ يُخْرِجَهَا اَىْ يُسَافِرُ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِى الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِى الْمُبْدَلِ وَصَارَ كَالْبَيْعِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوْجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ زِيَارَةِ اَهْلِهَا حَتّٰى يُوْفِيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ اَيِ الْمُعَجَّلَ لِاَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاِسْتِيْفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْاِسْتِيْفَاءِ قَبْلَ الْاِيْفَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِاِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّاجِيْلِ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَفِيْهِ خِلَافُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَيْسَ لَهَا اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا كَانَ الدُّخُوْلُ بِرِضَاهَا حَتّٰى لَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً اَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً اَوْ مَجْنُوْنَةً لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِى الْحَبْسِ بِالْاِتِّفَاقِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اَلْخَلْوَةُ بِهَا بِرِضَاهَا وَيَبْتَنِىْ عَلٰى هٰذَا اِسْتِحْقَاقُ النَّفَقَةِ لَهُمَا اَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ كُلَّهُ قَدْ صَارَ مُسَلَّمًا اِلَيْهِ بِالْوَطْيَةِ الْوَاحِدَةِ اَوْ بِالْخَلْوَةِ وَلِهٰذَا يَتَاَكَّدُ بِهَا جَمِيْعُ الْمَهْرِ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ كَالْبَائِعِ اِذَا سَلَّمَ الْمَبِيْعَ وَلَهُ اَنَّهَا مَنَعَتْ مِنْهُ مَا قَابَلَ بِالْبَدَلِ لِاَنَّ كُلَّ وَطْيَةٍ تَصَرُّفٌ فِى الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلٰى عَنِ الْعِوَضِ اِبَانَةً لِخَطَرِهِ وَالتَّاَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ الْجَهَالَةِ مَا وَرَائَهَا فَلَا يَصِحُّ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُوْمِ ثُمَّ اِذَا وُجِدَ وَطْىٌ اٰخَرُ وَصَارَ مَعْلُوْمًا تَحَقَّقَتِ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهْرُ مُقَابِلًا بِالْكُلِّ كَالْعَبْدِ اِذَا جَنٰى جِنَايَةً يُدْفَعُ كُلُّهُ بِهَا ثُمَّ اِذَا جَنٰى اُخْرٰى وَاُخْرٰى يُدْفَعُ بِجَمِيْعِهَا وَاِذَا اَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا اِلٰى حَيْثُ شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَقِيْلَ لَا يُخْرِجُهَا اِلٰى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا لِاَنَّ الْغَرِيْبَةَ تُؤْذِىْ وَفِىْ قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيْبَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرْبَةُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাকে বাইরে অর্থাৎ সফরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও বাধা প্রদান করতে পারে। যাতে বদলের ক্ষেত্রে তার হক নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন– বদলকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর হক নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর ব্যাপারটি 'বিক্রয়'-এর মতো হলো। [অর্থাৎ, বিক্রেতা মূল্য বুঝে পাওয়া পর্যন্ত বিক্রীত দ্রব্য আটক রাখবে]। স্বামীর এ অধিকার নেই যে, স্ত্রীকে সফর থেকে বাধা দেবে, ঘর থেকে বের হতে বাধা দেবে এবং তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বাধা দেবে, যতক্ষণ না সে পূর্ণ মহর আদায় করবে। অর্থাৎ মু'আজ্জাল মহর [নগদ দেয় মহর]। কেননা, আবদ্ধ রাখার হক [স্বামীর

জন্য] হাসিল হয় নিজ প্রাপ্য উসুল করার জন্য। অথচ [মহর] আদায় করার পূর্বে স্ত্রী-সম্ভোগ করার অধিকার স্বামীর নেই। যদি সবটুকু মহরই বিলম্বে দেওয়া হয়, তাহলে স্ত্রীর নিজকে বিরত রাখার অধিকার নেই। কেননা, বিলম্বে আদায়ের মাধ্যমে নিজের হক সে নিজেই রহিত করেছে। যেমন– বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তবে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [অর্থাৎ, বিলম্বে দেয় মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্য আটকে রাখতে পারে না]। যদি স্বামী তার সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে তাহলেও অনুরূপ হুকুম। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, নিজেকে বিরত রাখার অধিকার স্ত্রীর নেই। তবে এ মতপার্থক্য হলো ঐ সুরতে, যখন মিলন তার সম্মতিক্রমে হবে। পক্ষান্তরে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হলে কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে সকলের মতেই তার নিজেকে বিরত রাখার হক রহিত হবে না। আর সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে তার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে। খোরপোশের হকদার হওয়ার বিষয়টিও এর উপর নির্ভর করে। সাহেবাইনের দলিল হলো, একটি সহবাস কিংবা একবারে নির্জনে সাক্ষাতের মাধ্যমে চুক্তিকৃত সম্ভোগ-অঙ্গ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হয়ে গেছে। এর দ্বারাই পূর্ণ মহরের অধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং পরবর্তীতে তার নিজেকে বাধা প্রদানের অধিকার থাকবে না। যেমন– বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করে দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিনিময়ের বিপরীতে যা রয়েছে, সে স্বামীর নিকট অর্পণে বিরত রাখছে। কেননা, প্রতিটি সহবাসের অর্থ হলো সম্মানযোগ্য সম্ভোগ-অঙ্গের ব্যবহার। সুতরাং ঐ সম্ভোগ-অঙ্গের মর্যাদা প্রকাশের জন্য কোনো মিলনই বিনিময়মুক্ত হবে না। তবে একটি মিলন দ্বারাই সমগ্র মহর নিশ্চিত হওয়ার কারণ এই যে, পরবর্তী মিলনগুলো অজ্ঞাত। সুতরাং সেগুলো জ্ঞাত মিলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। অতঃপর যখন দ্বিতীয় মিলন অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তা জ্ঞাত হয়ে যাবে তখন তার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে এবং মহর সমগ্র মিলনের মোকাবিলায় গণ্য হবে। যেমন– কোনো দাস একটি অপরাধ করলে সম্পূর্ণ গোলামটিকে তার বিনিময়ে অর্পণ করতে হয়। অতঃপর আরো অপরাধ করলেও মহরগুলোর বিনিময়েই তাকে অর্পণ করতে হয়। যখন সে তার প্রাপ্য মহর পূর্ণ আদায় করে দেবে তখন তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ "তোমরা যেখানে বসবাস কর সেখানেই তাদেরকে বসবাস করাও।" তবে কেউ কেউ বলেছেন, তার নিজের শহর থেকে তাকে অন্য শহরে বের করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা, প্রবাস জীবন তার জন্য কষ্টদায়ক হবে। তবে কাছাকাছি জনপদগুলোতে প্রবাস সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا الخ : মাসআলাটির কয়েকটি সুরত রয়েছে। কেননা কেউ যদি কোনো নারীকে মহরের বিনিময়ে বিবাহ করে, তাহলে পূর্ণ মহর মু'আজ্জাল [নগদ দেয় মহর] হবে, কিংবা পূর্ণ মহরে মুয়াজ্জাল [বিলম্বে দেয় মহর] হবে। কিংবা কিছু মু'আজ্জাল ও কিছু মুয়াজ্জাল হবে। সুতরাং পুরো মহর যদি মু'আজ্জাল হয়, তখন স্বামী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে কিনা ? যদি পুরো মহরে মু'আজ্জাল হয় আর স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসও করেনি তাহলে এ সুরতে স্ত্রীর এখতিয়ার রয়েছে, সে তার স্বামীকে পুরো মহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত সহবাসে বাধা প্রদান করতে পারে। এমনিভাবে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সফরে যাওয়ার ব্যাপারেও বাধা প্রদান করতে পারে। দলিল এই যে, বিবাহ হলো অদল-বদলের আকদ, যা উভয়দিকের সমতাকে দাবি করে। আর বদলকৃত বস্তু তথা সম্ভোগ-অঙ্গের মধ্যে স্বামীর হক নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাই স্ত্রীকেও মহর কব্‌জ করার অধিকার দিতে হবে, তাহলে তার বদলের হক তথা মহর নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং নির্ধারিতকরণের মধ্যে উভয় বদলের সাথে সমতা এসে যায়। আর ব্যাপারটি বিক্রয়ের মতো হয়ে গেল। অর্থাৎ, যেমনিভাবে বিক্রেতা মূল্য বুঝে পাওয়া পর্যন্ত বিক্রীত দ্রব্য আটক

করে রাখতে পারে তেমনিভাবে স্ত্রী মহর বুঝে পাওয়া পর্যন্ত সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহারে বাধা প্রদান করতে পারে। আর ঐ সুরতে স্বামীর জন্য জায়েজ নেই যে, সে তার স্ত্রীকে সফর করা থেকে বাধা প্রদান করবে এবং নিজের ঘর হতে বের হওয়া থেকে এবং স্ত্রীর পরিবারকে সাক্ষাৎ করা থেকে বাঁধা দেবে– যতক্ষণ না স্বামী তার মহরে মু'আজ্জাল পূর্ণ করবে। দলিল এই যে, স্বামীর আবদ্ধ করার অধিকার এজন্য ছিল, যাতে সে নিজের প্রাপ্য তথা সম্ভোগ-অঙ্গের উপকার উসুল করে নেয় এবং স্বামী মহর আদায় করার পূর্বে তার হক উসুল করার অধিকার রাখে না। এ কারণে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে সফর ইত্যাদি থেকে বাধা প্রদান করারও এখতিয়ার থাকবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا الخ : দ্বিতীয় সুরত হলো, সম্পূর্ণ মহর মহরে মুয়াজ্জাল হওয়া। এরও আবার দুই সুরত রয়েছে। কেননা, স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে না কি করেনি? যদি সহবাস না করে থাকে তাহলে স্ত্রীর বাধা দানের অধিকার থাকবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তরফাইনের মতে স্ত্রীর বাধা প্রদানের অধিকার নেই। অর্থাৎ, স্ত্রীর এ অধিকার নেই যে, সে স্বামীকে সহবাস করতে সুযোগ দেবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, স্ত্রীর বাধা প্রদানের অধিকার আছে। অর্থাৎ স্ত্রীর এ অধিকার আছে যে, সে স্বামীকে সহবাস করতে বাধা প্রদান করবে এবং তাকে সহবাস করতে সুযোগ দেবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মুতলাক রাখার সময় বিবাহের দাবি হলো মহর অর্পণ করা। হবহু মহর হোক বা ঋণী মহর হোক। সুতরাং যে সময় স্বামী নিকাহের দাবি জানা সত্ত্বেও "আজাল"কে কবুল করে নিয়েছে। অর্থাৎ, এ কথা মেনে নিয়েছে যে, মহর বিলম্বে আদায় করে দেওয়া হবে, তাহলে যেন স্বামী এ কথার উপর রাজি হয়ে গেল যে, তার হক মহর আদায় করা পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে। আর যখন স্বামী তার হক বিলম্ব করার উপর রাজি হয়ে গেল, তখন স্ত্রীরও ঐ সময় পর্যন্ত বাধা দানের অধিকার থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী পূর্ণ মহর আদায় না করবে।

তরফাইনের দলিল হলো, স্ত্রী মহর বিলম্বিত করে দেওয়ার কারণে নিজের হকের দাবিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আর যখন স্ত্রী নিজেই নিজের হককে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এখন আর তার স্বামীর প্রাপ্য হক তথা সম্ভোগ-অঙ্গের বাধা দানের অধিকার থাকবে না। যেমন– বিক্রয়-এর মধ্যে। অর্থাৎ, বিক্রেতা যদি মূল্য বিলম্ব করে দেয় তাহলে বিক্রেতার বিক্রীত দ্রব্যকে বারণ করার অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে মহর যদি বিলম্ব করা হয় তাহলে স্ত্রীর বাধা দানের অধিকার থাকবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَكَذٰلِكَ الخ : গ্রন্থকার তৃতীয় সুরত বর্ণনা করেছেন যে, যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং মহরটি মহরে মু'আজ্জাল হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, একই হুকুম অর্থাৎ স্ত্রীর বাধা দানের অধিকার থাকবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, সহবাসের পর স্ত্রীর বাধা দানের অধিকার থাকবে না। উল্লেখ্য যে, ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের মতবিরোধ ঐ সুরতে যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস তার সন্তুষ্টিতে করা হয়। কিন্তু যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সহবাস করা হয়, কিংবা স্ত্রী অপ্রাপ্তবয়স্কা হয় কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহলে সকলের মতে তার নিজেকে বিরত রাখার হক রহিত হবে না। এ মতবিরোধটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন স্ত্রীর সন্তুষ্টচিত্তে তার সাথে একান্ত নির্জনে সাক্ষাৎ করা হয়। একই মতবিরোধ খোরপোশের হকদার হওয়ার ক্ষেত্রেও। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বারণ করার মেয়াদকালে স্ত্রী খোরপোশের হকদার হবে। কারণ, এটি হকের কারণে বারণ। আর হকের দরুন বারণের কারণে এ স্ত্রী অবাধ্য ও নাফরমান হবে না। সাহেবাইনের মতে স্ত্রী খোরপোশের হকদার হবে না। এ কারণে তাঁদের মতে এ স্ত্রী অবাধ্য। আর অবাধ্যের জন্য খোরপোশ ইত্যাদি ওয়াজিব হয় না। মোদ্দাকথা, মিলন কিংবা নির্জনে সাক্ষাতের পর সাহেবাইনের মতে স্ত্রীর বারণ করার অধিকার নেই। ইমাম সাহেবের মতে স্ত্রীর জন্য বারণ করার অধিকার আছে। সাহেবাইনের দলিল হলো, যখন স্বামী একবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল কিংবা নির্জনে মিলিত হলো তখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর দিকে পূর্ণভাবে চুক্তিকৃত সম্ভোগ-অঙ্গ অর্পণ করে দেওয়া হলো। এ কারণে একবার সহবাস কিংবা একবার নির্জনে সাক্ষাৎ দ্বারা পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং দ্বিতীয় সহবাসের পর যদি মহর থাকত তাহলে একবার সহবাস দ্বারা পূর্ণ মহর ওয়াজিব হতো না। তাই যখন স্ত্রী চুক্তিকৃত সম্ভোগ-অঙ্গ অর্পণ করে দিল, এখন আর তার নিজেকে বারণ রাখার অধিকার নেই। এ মাসআলাটি একেবারে এমন যেমন– বিক্রেতা মূল্য কবজা

করার পূর্বে ক্রেতার নিকট বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করে দিল। এখন বিক্রেতার জন্য মূল্যের কারণে বিক্রীত দ্রব্য বারণ করার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল বিরোধের সুরত এই হবে যে, আমরা এ কথা মানি না যে, একবার সহবাসের কারণে পূর্ণ চুক্তিকৃত সম্ভোগ-অঙ্গ স্বামীকে অর্পণ করে দেওয়া হয়। কেননা, স্ত্রী স্বামীর থেকে এমন জিনিস রহিত রেখেছে যার বিপরীতে বিনিময় রয়েছে। কেননা, প্রত্যেক সহবাস দ্বারা সম্মানযোগ্য সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, একবার সহবাস দ্বারা পূর্ণ সম্ভোগ-অঙ্গ অর্থাৎ পূর্ণ চুক্তিকৃত অঙ্গ অর্পণ করা হয় না। এ দলিলটি যদি বিতর্ক হিসেবে বলা হয় তাহলে এভাবে বলা হবে যে, স্ত্রী স্বামী থেকে ঐ জিনিস বারণ করেছে যার বিপরীতে বিনিময় আছে। কারণ, প্রত্যেকবার সহবাস দ্বারা সম্মানযোগ্য সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আর সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহার করাটা বিনিময় থেকে খালি হয় না। আর ঐ জিনিস থেকে বারণ করা যার বিপরীতে বিনিময় রয়েছে তা সহীহ আছে। তাই স্ত্রীর জন্য একবার সহবাসের পরও বারণ করার অধিকার থাকবে।

قَوْلُهُ وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَحْدَةِ الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, একবার সহবাস দ্বারা পূর্ণ মহর এ কারণে ওয়াজিব হয় যে, এ সহবাসটি ছাড়া অন্য সহবাসগুলো হলো অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত মিলন জ্ঞাত মিলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না। কেননা, পূর্বে মহর একবার সহবাস দ্বারা দৃঢ় হয়ে যায়। সুতরাং একবার সহবাসের পর যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সহবাস করা হয়, তবে এ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহবাসও জ্ঞাত হবে। এক জ্ঞাত সহবাস অপর জ্ঞাত সহবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তাই এ সুরতে মহর শুধু একবার সহবাসের বিপরীতে হবে না; বরং যতবার সহবাস পাওয়া যায় প্রত্যেকবারের বিপরীতে হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত এমন যেমন– কোনো গোলাম একবার অপরাধ করল, তখন মনিবের উপর ওয়াজিব হলো, সে অপরাধের বিনিময় দেবে কিংবা গোলামকে অর্পণ করবে। সুতরাং পূর্ণ গোলাম যদি একই অপরাধের বিনিময়ে দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার অপরাধ করলে সকল অপরাধের বিনিময় এই এক গোলামই হবে, এর চেয়ে অধিক মনিবের উপর আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি কিছু মহরে মু'আজ্জাল আর কিছু মহরে মোয়াজ্জাল হয়, তখন মহরে মু'আজ্জাল আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর বারণ করার অধিকার থাকবে। আর যদি মহরে মু'আজ্জাল স্ত্রীকে অর্পণ করে দেওয়া হয় তবে স্ত্রীর বারণ করার অধিকার থাকবে না। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যদি মহরে মু'আজ্জাল ও মহরে মুয়াজ্জালের উল্লেখ না থাকে, তাহলে কি হুকুম হবে? এর জবাবে আমরা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, নিঃশর্ত অবস্থায় নিকাহের দাবি হলো, মহর অর্পণ করা। তাই কোনো মহরের কথা উল্লেখ না থাকলেও পূর্ণ মহরে মু'আজ্জালই ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا أَوْفَاهَا الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার বলছেন যে, স্বামী যদি পূর্ণ মহর দিয়ে দেয় তখন স্বামীর এখতিয়ার থাকবে যে, তাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। দলিল হিসেবে আয়াত পেশ করা হয়েছিল। আয়াতের অর্থ এই ছিল যে, "তোমরা যেখানে বসবাস কর সেখানেই তাদেরকেও বসবাস করাও।" ফকীহ আবুল লাইছ (র.) বলেন, স্ত্রীকে তার শহর ছাড়া অন্য শহরে না নিয়ে যাওয়া উচিত। কেননা, অন্য শহর স্ত্রীর জন্য হলো পরদেশ। আর পরদেশ দ্বারা স্ত্রীর কষ্ট হবে। ফকীহ আবুল লাইছের অভিমতের বিপরীতে জহীরুদ্দীন মুরগিনানী বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণীর উপর আমল করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– 'যেখানে চাও, সেখানে রাখ।' তাই ফকীহ আবুল লাইছের একথা বলা যে, তার শহর ব্যতীত অন্যত্র বের করা ঠিক হবে না– কথাটি ঠিক নয়। কিন্তু ফকীহ আবুল লাইছের পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয় যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার বাণী গ্রহণ করেছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন– وَلَا تُضَارُّوهُنَّ 'এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না।' উল্লেখ্য যে, তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করলে কষ্ট হবে। তাই তাদেরকে অন্যত্র বের না করা উচিত। তবে শহরের নিকটস্থ জনপদ বের করার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। নিকটস্থ জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সফরের মেয়াদ থেকে কম হওয়া। কারণ, এতটুকুন পরিমাণ সফর করার দ্বারা পরদেশী বলা হয় না।

قَالَ وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فِى الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ اِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيْمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَاِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِىْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اَلْقَوْلُ قَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَهُ اِلَّا اَنْ يَاتِىَ بِشَئٍ قَلِيْلٍ وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِى الزِّيَادَةَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِيْنِهِ اِلَّا اَنْ يَاتِىَ بِشَئٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيْهِ وَهٰذَا لِاَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُوْرِىٌّ فَمَتٰى اَمْكَنَ اِيْجَابُ شَئٍ مِنَ الْمُسَمّٰى لَا يُصَارُ اِلَيْهِ وَلَهُمَا اَنَّ الْقَوْلَ فِى الدَّعَاوِىْ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِاَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْاَصْلِىُّ فِىْ بَابِ النِّكَاحِ وَصَارَ كَالصَّبَّاغِ مَعَ رَبِّ الثَّوْبِ اِذَا اخْتَلَفَا فِىْ مِقْدَارِ الْاَجْرِ يُحَكَّمُ فِيْهِ قِيْمَةُ الصَّبْغِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করল, অতঃপর মহরের পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিল। তখন মহরে মিছিল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর মহরে মিছিলের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর যদি তার সাথে মিলনের পূর্বে তাকে তালাক দেয় তাহলে অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তালাকের পূর্বে এবং পরে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু সে যদি অল্প পরিমাণের কথা বলে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অল্প পরিমাণের অর্থ হলো এমন পরিমাণ, যা মহররূপে সমাজে প্রচলিত নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্ত্রীলোকটি অতিরিক্তের দাবি করছে। স্বামী তা অস্বীকার করছে, আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি সে এমন অল্প পরিমাণের কথা বলে, যাকে বাহ্যিক অবস্থা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে [তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না]। এর কারণ হলো, সম্ভোগ-অঙ্গের উপকার লাভের মূল্য নির্ধারণ অনিবার্য কারণবশত। সুতরাং যখন নির্ধারিত কোনো জিনিসকে মহর সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে তখন মহরে মিছিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা যার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। আর বাহ্যিক অবস্থা তারই অনুকূলে প্রমাণিত, যার অনুকূলে মহরে মিছিল সাক্ষ্য দেয়। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের ক্ষেত্রে মহরে মিছিলই হলো স্ত্রীর মূল প্রাপ্য। এটা কাপড়ের মালিকের সঙ্গে রঞ্জকের অবস্থার মতো হলো। যখন উভয়ে মজুরির পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ করে তখন রংয়ের মূল্যকেই মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا الخ : উপরে বর্ণিত মাসআলাটির কয়েকটি সুরত রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ তাদের জীবদ্দশায় হবে কিংবা তাদের উভয়ের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরিরা মতবিরোধ করবে। কিংবা স্বামী-স্ত্রী একজনের মৃত্যুর পর মতবিরোধ হয়। যদি তাদের জীবদ্দশায় তারা মতবিরোধ করে, এর আবার দু'টি সুরত রয়েছে। কারণ, এ

মতবিরোধ তালাকের পর কিংবা তালাকের পূর্বে হবে। অতঃপর প্রত্যেকটির আবার দুই সূরত রয়েছে। কেননা, এ মতবিরোধ মূল [অর্থাৎ মহর নির্ধারিত হওয়া না হওয়া] নিয়ে হবে কিংবা নির্ধারিত মহর নিয়ে হবে। গ্রন্থকার সর্বপ্রথম এ সূরত বর্ণনা করেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী মহরের নির্ধারিত পরিমাণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছে, নিকাহ সংঘটিত হওয়ার সময়, কিংবা মিলনের পর বিচ্ছেদ ঘটার পর কিংবা স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর পর। যেমন– স্বামীর দাবি হলো, মহর এক হাজার আর স্ত্রী বলছে দুই হাজার। তাহলে এ ব্যাপারে তরফাইনের মাযহাব হলো, মহরে মিছিলের পরিমাণ পর্যন্ত স্ত্রীর কথা [গ্রহণযোগ্য] কবুল করা হবে। আর মহরে মিছিলের অতিরিক্তের মধ্যে স্বামীর কথা [গ্রহণযোগ্য] কবুল করা হবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে তালাক হয় তাহলে অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে শুধু স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে; স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব হলো, মতবিরোধ তালাকের পূর্বাপর যখনই হোক, উভয় সুরতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি অল্প পরিমাণের কথা বলে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। "অল্প পরিমাণ" -এর ব্যাখ্যায় ফকীহগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, অল্প পরিমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দশ দিরহামের কম হওয়া। অর্থাৎ, স্বামী যদি দশ দিরহামের কম দাবি করে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি দশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশি দাবি করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধ কথা হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অল্প পরিমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন পরিমাণ যা মহররূপে সমাজে প্রচলিত নয়। অর্থাৎ, স্বামী মহরের এ পরিমাণ দাবি করে এ ধরনের নারীদেরকে সাধারণত যে পরিমাণে বিবাহ করা যায় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, স্ত্রীলোকটি অতিরিক্ত মহরের দাবিদার, আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। আর কায়দা আছে যে, দাবিদারের নিকট দলিল না থাকলে অস্বীকারকারীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। তাই স্বামী যে অতিরিক্তের অস্বীকারকারী তার কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি এত অল্প পরিমাণ উল্লেখ করে বাহ্যিক অবস্থা যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, সম্ভোগ-অঙ্গের উপকার লাভ হলো মূল্যহীন। কেননা, সম্ভোগ-অঙ্গ মাল নয়। তবে সম্ভোগ-অঙ্গের মর্যাদা প্রকাশার্থে কিংবা বংশধারাকে সামনে রেখে সম্ভোগ-অঙ্গকে অনিবার্য কারণবশত মূল্যবিশিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত মহর [যা আসল] -কে ওয়াজিব করা সম্ভব, মহরে মিছিল [যা অনিবার্য কারণবশত: সাব্যস্ত] -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। এজন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, নির্ধারিত মহরের মধ্যে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। মহরে মিছিলকে হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে না।

তরফাইনের দলিলের সারাংশ হলো, দাবিদারের নিকট যদি দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে তখন যার উপর দাবি উত্থাপন করা হয় (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) তার কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। مُدَّعٰى عَلَيْهِ তাকে বলা হয়, যার কথা বাহ্যিক অবস্থার অনুকূলে হয়। আর যেহেতু বিবাহের মধ্যে মূল ওয়াজিব হলো মহরে মিছিল, তাই যার কথা মহরে মিছিল অনুযায়ী হবে তার কথাই বাহ্যিক অবস্থার অনুকূলে বলা হবে। সারকথা এই যে, তরফাইনের মতে মহরে মিছিল হলো হুকুম। সুতরাং মহরে মিছিল যদি এক হাজার কিংবা এর চেয়ে কম হয় তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহরে মিছিল দুই হাজার কিংবা এর চেয়ে বেশি হয় তখন স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহরে মিছিল এক হাজার এবং দুই হাজারের মাঝামাঝি হয় তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। মাসআলাটি এমন হলো– যেমন, রঞ্জক ও কাপড়ের মালিকের মধ্যে মজুরির পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হলো; যেমন– কাপড়ের মালিক বলে, রংয়ের মজুরি এক দিরহাম, আর রঞ্জক বলে দুই দিরহাম। তাহলে এ সুরতে রংয়ের মূল্যকে মাণদণ্ড বানানো হবে। অর্থাৎ, প্রথমে রংহীন কাপড়ের মূল্য জানতে হবে, তারপর রঙ্গিন কাপড়ের মূল্য জানবে। যেমন– রঙহীন কাপড়ের মূল্য হলো দশ দিরহাম, আর রঙ্গিন কাপড়ের মূল্য হলো বারো দিরহাম। সুতরাং রংয়ের কারণে দুই দিরহাম বেড়ে গেল। এখন এ দুই দিরহাম রংয়ের মূল্য হবে। তাই এ মূল্যকে মানদণ্ড বানানো হবে। আর যেহেতু রঞ্জকের কথা রংয়ের মূল্যের অনুকূলে, তাই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কাপড়ের মালিকের কথা তার মূল্যের অনুকূলে হয় তাহলে কাপড়ের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

ثُمَّ ذَكَرَ هٰهُنَا اَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ اَلْقَوْلُ قَوْلُهٗ فِيْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَهٰذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْاَصْلِ وَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ اَنَّهٗ يُحَكَّمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا لِاَنَّ الْمُتْعَةَ مُوْجِبَةٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَهٗ فَتَحَكَّمُ كَهُوَ وَ وَجْهُ التَّوْفِيْقِ اَنَّهٗ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْاَصْلِ فِي الْاَلْفِ وَالْاَلْفَيْنِ وَالْمُتْعَةُ لَا تَبْلُغُ هٰذَا الْمَبْلَغَ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيْدُ تَحْكِيْمُهَا وَ وَضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي الْمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ وَمُتْعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُوْنَ فَيُفِيْدُ تَحْكِيْمُهَا وَالْمَذْكُوْرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ سَاكِتٌ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلٰى مَا هُوَ الْمَذْكُوْرُ فِي الْاَصْلِ وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيْمَا اِذَا اخْتَلَفَا فِيْ حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ اَنَّ الزَّوْجَ اِذَا ادَّعَى الْاَلْفَ وَالْمَرْاَةُ الْاَلْفَيْنِ فَاِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا اَلْفًا اَوْ اَقَلَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ اَلْفَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَاَيُّهُمَا اَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهَيْنِ تُقْبَلُ وَاِنْ اَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا لِاَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ بَيِّنَتُهٗ لِاَنَّهَا تُثْبِتُ الْحَطَّ وَاِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ تَحَالَفَا وَاِذَا حَلَفَا تَجِبُ اَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ هٰذَا تَخْرِيْجُ الرَّازِيْ (رحـ) وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (رحـ) يَتَحَالَفَانِ فِي الْفُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার ইমাম কুদূরী (র.) এখানে উল্লেখ করেছেন যে, মিলনের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা জামিউস সাগীর ও মাবসূতের বর্ণনা। জামিউলকাবীরে বর্ণিত আছে যে, তার সমস্তরের মুত'আকে এক্ষেত্রে মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের কিয়াসের দাবি। কেননা, তালাকের পূর্বে মহরে মিছিলের মতো তালাকের পরে মুত'আ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং মহরে মিছিলের ন্যায় এক্ষেত্রে মুত'আকে মানদণ্ড ধরা হবে। তবে এ [মতান্তরের মাঝে] সমন্বয় এরূপ হতে পারে যে, মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাসআলাটি উপস্থাপন করেছেন এক হাজার এবং দুই হাজার সূরতের উপর। আর মুত'আ সাধারণত এ পরিমাণে পৌঁছে না। সুতরাং মুত'আকে মানদণ্ড ধরলে কোনো ফলাফল হবে না। পক্ষান্তরে জামিউল কাবীরে মাসআলা উপস্থাপন করেছেন একশ ও দশ দিরহামের সুরতের উপর, আর তার সমস্তরের মুত'আ বিশ দিরহাম হয়ে থাকে। সুতরাং মুত'আকে মানদণ্ড করার ফলাফল পাওয়া যাবে। আর জামিউস সাগীরে পরিমাণ উল্লেখ করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সেটাকে মাবসূতে উল্লিখিত পরিমাণের উপর প্রযুক্ত ধরা হবে। বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় উভয়ের মতপার্থক্য সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যা এই যে, স্বামী যদি এক হাজার দিরহামের দাবি করে, আর স্ত্রী দুই

হাজার দিরহামের দাবি করে তবে তার মহরে মিছিল এক হাজার বা তার কম হলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। আর দুই হাজার কিংবা তার বেশি হলে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে। উভয় সুরতে দুজনের মাঝে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য পেশ করবে তার কথাই গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে প্রথমে স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তার সাক্ষ্য অধিক পরিমাণ সাব্যস্ত করছে। আর দ্বিতীয় সুরতে স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তা [মহরে মিছিল থেকে] হ্রাসকৃত পরিমাণ সাব্যস্ত করছে। যদি তার মহরে মিছিল পনেরশ দিরহাম হয় তাহলে উভয়কে শপথ করতে হবে। যদি উভয়ে শপথ করে নেয় তাহলে পনেরশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। এটা হলো ইমাম রাযী (র.)-এর উদ্ভাবনকৃত মাসআলা। আর ইমাম কারখী (র.) বলেন, তিন অবস্থায়ই উভয়ে শপথ করবে। অতঃপর মহরে মিছিলকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ ذَكَرَ هٰهُنَا الخ : ইবারতটুকু দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের মধ্যকার পরস্পর বিরোধ দেখাচ্ছেন। বিরোধ হলো এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর ও মাবসূতে উল্লেখ করেছেন যে, সহবাসের পূর্বে তালাকের পর মহরের পরিমাণ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী যদি মতবিরোধ করে তখন অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর সমপর্যায়ের মুত'আকে মানদণ্ড বানানো যাবে না। আর জামিউল কাবীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, সমপর্যায়ের মুত'আকে মানদণ্ড বানানো যাবে। সমপর্যায়ের মুত'আ স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে যার কথার অনুকূলে হবে অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে তারই কথা গ্রহণযোগ্য হবে। জামিউল কাবীরের রেওয়ায়েতটি তরফাইনের মতের অনুকূলে। কারণ, যেমনিভাবে তালাকের পূর্বে মহরে মিছিল নিকাহের কারণ, তেমনিভাবে সহবাসের পূর্বে তালাকের পর মুত'আও নিকাহের কারণ। সুতরাং যেমনিভাবে মহরে মিছিল মানদণ্ড ছিল, তেমনিভাবে সমপর্যায়ের মুত'আও মানদণ্ড হবে। তরফাইনের উল্লেখ বিশেষভাবে এ কারণে করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, সকল সুরতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَجْهُ التَّوْفِيْقِ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার উপরিউক্ত বিরোধের সমাধা করছেন। গ্রন্থকার বলেন, [ইমাম মুহাম্মদ (র.)] মাবসূতের মধ্যে মাসআলাটি উপস্থাপন করেছেন এক হাজার এবং দুই হাজারের সুরতের উপর। অর্থাৎ, স্বামীর দাবি ছিল এক হাজারের আর স্ত্রীর দাবি ছিল দুই হাজারের। আর মুত'আ সাধারণত পাঁচশ পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে না। এজন্য মুত'আকে মানদণ্ড নিরূপণ করার দ্বারা কোনো লাভ নেই। কেননা, স্বামী নির্ধারিত অর্ধেক মহরের অর্থাৎ পাঁচশ -এর প্রথম থেকেই স্বীকৃতি দানকারী। তাই স্ত্রীকে পাঁচশ দিরহাম দিয়ে দেওয়া হবে। মুত'আকে মানদণ্ড বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

জামিউল কাবীরের মধ্যে মাসআলাটি উপস্থাপন করেছেন একশ ও দশ দিরহামের সুরতের উপর। অর্থাৎ স্বামীর দাবি হলো, মহর দশ দিরহাম, আর স্ত্রীর দাবি হলো মহর একশ দিরহাম। আর সমপর্যায়ের মুত'আ সাধারণত বিশ দিরহাম হয়। তাই এখন মুত'আকে মানদণ্ড বানানোর দ্বারা ফলাফল পাওয়া যাবে। তাইতো এ সুরতে মুত'আ স্ত্রীর জন্য সহায়ক।

জামিউস সাগীরের মধ্যে মহরের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে জামিউস সাগীর নীরবতা অবলম্বন করেছে। তাই জামিউস সাগীরের রেওয়ায়েতটিকে মাবসূতে উল্লিখিত পরিমাণের উপর প্রযুক্ত করা হবে। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সকল কিতাবের মধ্যে মাবসূত হলো আসল বা মূল কিতাব। আবার কেউ কেউ এও বলেছেন যে, মাবসূত প্রথমে রচিত হয়েছে, তারপর জামিউস সাগীর রচনা করা হয়েছে। তাই মাবসূতের মধ্যে যা উল্লেখ থাকবে তা সমাজে প্রচলিত-এর অনুরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার তরফাইনের মতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা হলো, যখন স্বামী-স্ত্রী তালাকের পূর্বে মহরের পরিমাণের মধ্যে মতবিরোধ করেছে। যেমন- স্বামীর দাবি হলো মহর এক হাজার দিরহাম। আর স্ত্রীর দাবি হলো দুই হাজার দিরহাম। এখন যদি মহরে মিছিল এক হাজার বা এর চেয়ে কম হয় তাহলে শপথসহ স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, বাহ্যিক অবস্থা স্বামীর মতের অনুকূলে। আর বাহ্যিক অবস্থা যার মতের অনুকূলে হবে সে-ই مُدَّعٰى عَلَيْهِ তথা বিবাদী। দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে বাদীর নিকট যদি দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে, তখন বিবাদীর মত শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি মহরে মিছিল দুই হাজার বা এর চেয়ে অধিক হয় তখন স্ত্রীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি সাক্ষী পেশ করে ফেলে তাহলে উভয় সুরতে [মহরে মিছিল স্বামীর মতের অনুকূলে হোক বা স্ত্রীর মতের অনুকূলে হোক] তার কথাই গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য পেশ করে দেয়। তবে প্রথম সুরতে [যখন মহরে মিছিল স্বামীর মতের অনুকূলে হয়] স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে [যে সময় মহর স্ত্রীর মতের অনুকূলে হয়] স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল হলো, সাক্ষ্য এমন জিনিসকে সাবিত করে যা বাহ্যিকভাবে সাবেত নয়। যেহেতু প্রথম সুরতে স্ত্রীর কথা জাহির পরিপন্থি। তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে স্বামীর কথা জাহির পরিপন্থি। এজন্য দ্বিতীয় সুরতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহরে মিছিল পনেরশ দিরহাম হয়, তবে উভয় থেকে শপথ নিতে হবে। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রত্যেকেই বাদীও আবার অস্বীকারকারী এবং বিবাদীও। কেননা, স্বামীর দাবি হলো নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে কম, আর স্ত্রী তা অস্বীকারকারী। [এমনিভাবে] স্ত্রীর দাবি হলো মহরে মিছিল থেকে অধিক। আর স্বামী তার অস্বীকারকারী। সুতরাং যেহেতু উভয়ে অস্বীকারকারী তাই উভয়ের কাছ থেকে শপথ নিতে হবে। কেননা, সাক্ষ্য না থাকার সুরতে অস্বীকারকারীর উপর শপথ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

শপথ প্রথমে কে করবে? এ ব্যাপারে 'কাযী খান'-এ বর্ণিত আছে যে, প্রথম শপথ -এর ক্ষেত্রে কাজি সাহেব লটারি দেবেন। আর এ লটারি মোস্তাহাব। অন্যথায় কাজির ইচ্ছা, যাকে চায় তার থেকেই প্রথম শপথ নেবেন। এখন স্বামী যদি শপথ করা থেকে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং দুই হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী শপথ করা থেকে অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এক হাজার নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ে শপথ করে তাহলে পনেরশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। এক হাজার নির্ধারিত মহর হিসেবে। কেননা, এক হাজারের উপর উভয়ে একমত। আর পাঁচশ মহরে মিছিল হিসেবে। আর যদি তাদের উভয়ের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী পেশ করে ফেলে, তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষী পেশ করে তাহলে মহরে মিছিল পনেরশ দিরহাম ওয়াজিব হবে এবং সংঘাতের কারণে উভয় সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। এটা হলো আবূ বকর জাস্সাস রাযী (র.) কর্তৃক উদ্ভাবনকৃত মাসআলা। ইমাম কারখী (র.) বলেন, তিন সুরতেই তাদের থেকে শপথ নেওয়া হবে- মহরে মিছিল স্বামীর মতের অনুকূলে হোক কিংবা স্ত্রীর অনুকূলে হোক কিংবা কারো অনুকূলে না হোক। শপথের পর মহরে মিছিলকে মানদণ্ড বানানো হবে। কেননা, মূল নির্ধারিত মহরের উপর উভয়ে একমত। আর বিশুদ্ধ মহর নির্ধারণ মহরে মিছিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা থেকে বারণ করে। কিন্তু যখন উভয়ে শপথ করল তখন নির্ধারিত মহর দুঃসাধ্য হয়ে গেল। তাই মহরে মিছিলকে মানদণ্ড বানানো যাবে। -[আইনী শরহে হিদায়া]

وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ فِيْ اَصْلِ الْمُسَمّٰى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهُ هُوَ الْاَصْلُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمُسَمّٰى فَيُصَارُ اِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ اَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِيْ حَيَاتِهِمَا لِاَنَّ اِعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : আর যদি মূল মহর নির্ধারণ সম্পর্কেই মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সকলের মতেই মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মহরে মিছিলই হলো আসল। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, নির্ধারিত মহর সম্পর্কে ফয়সালা প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং মহরে মিছিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর যদি দু'জনের কোনো একজনের মৃত্যুর পর মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে এর হুকুম তাদের জীবদ্দশার মতোই হবে। কেননা, দু'জনের কোনো একজনের মৃত্যুর কারণে মহরে মিছিলের গ্রাহ্যতা রহিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ فِيْ اَصْلِ الخ : উপরে বর্ণিত মাসআলাটির দ্বিতীয় সূরত এই যে, স্বামী-স্ত্রী জীবদ্দশায় মূল মহর নির্ধারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য করে। যেমন– একজন বলল, আকদে নিকাহের সময় মহরের উল্লেখ করা হয়েছিল, অপরজন তা অস্বীকার করছে। তাহলে এ সূরতে অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সকলের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে তরফাইনের দলিল হলো, মহরে মিছিল-ই হলো আসল, তাই তাকেই ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আসল মহর তো নির্ধারিত মহরই। কিন্তু যেহেতু মতপার্থক্যের কারণে নির্ধারিত মহর সম্পর্কে ফয়সালা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাই মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর এ সূরতে যদি মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তাহলে সকলের মতে মুত'আ ওয়াজিব হবে।

এ জায়গায়ও হিদায়া গ্রন্থকারের ভ্রম হয়েছে। কেননা, এখানে তিনি বলেছেন যে, মহরে মিছিল আসল হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে রয়েছেন। অথচ পূর্বে ১৩২ নং পৃষ্ঠায় اِذَا تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ وَاَحَدُهُمَا اَوْكَسُ -এর আলোচনায় বলেছিলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নির্ধারিত মহর হলো আসল; মহরে মিছিল আসল নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ اَحَدِهِمَا الخ : এ মাসআলাটি উপরিউক্ত মাসআলার তৃতীয় সূরত। সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে জীবিত সে মৃতের ওয়ারিশদের সাথে মতপার্থক্য করেছে। মহরের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য করুক কিংবা নির্ধারিত মূল মহর নিয়ে করুক। উভয় সূরতে ঐ হুকুম হবে যে হুকুম তাদের উভয়ের জীবদ্দশায় মতপার্থক্যের সূরতে ছিল। অর্থাৎ, যদি মহরের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য হয় তাহলে তরফাইনের মতে মহরে মিছিল মানদণ্ড হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি নির্ধারিত মহরের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়, তাহলে সহবাসের পর সকলের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর সহবাসের পূর্বে মুত'আ ওয়াজিব হবে। বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দলিল হলো, স্বামী-স্ত্রীর যে-কোনো একজনের মৃত্যুর কারণে মহরের গ্রাহ্যতা রহিত হয় না। যেমন, কোনো নারী বিনা মহরে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, পরে স্বামী-স্ত্রী যে-কোনো একজন মারা গেল। তাহলে এ সূরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে এখানেও স্বামী-স্ত্রী যে-কোনো একজনের মৃত্যুর কারণে মহরে মিছিল রহিত হবে না।

وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِى الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَا يَسْتَثْنِى الْقَلِيْلَ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَلْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ اِلَّا اَنْ يَّاْتُوْا بِشَيْءٍ قَلِيْلٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَلْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِىْ حَالَةِ الْحَيٰوةِ وَاِنْ كَانَ فِىْ اَصْلِ الْمُسَمّٰى فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ اَنْكَرَهُ فَالْحَاصِلُ اَنَّهُ لَا حُكْمَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

অনুবাদ : আর যদি উভয়ের মৃত্যুর পর মহরের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে স্বামীর ওয়ারিশদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। এমন কি পরিমাণ স্বল্পতার বিষয়টিকেও তিনি ব্যতিক্রম ধরেননি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্বামীর ওয়ারিশদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে– যদি না তারা খুব অল্প পরিমাণ বলে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জীবদ্দশায় যে হুকুম ছিল এ অবস্থায়ও সেই হুকুম হবে। আর যদি মূল মহর নির্ধারণ সম্পর্কেই মতবিরোধ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যে মহর অস্বীকার করবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। মোটকথা, ইমাম সাহেবের মতে উভয়ের মৃত্যুর পর মহরে মিছিলকে মানদণ্ড ধরা হবে না। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা এর কারণ আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا الخ : এটি উপরে বর্ণিত মাসআলার চতুর্থ সুরত। সুরতে মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরিরা নির্ধারিত মহরের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য করল, তবে এর হুকুমের ব্যাপারে হানাফীগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, স্বামীর ওয়ারিশদের কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্বল্পতার বিষয়টিকেও ব্যতিক্রম ধরেননি। এমন কি ইমাম সাহেবের মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর ওয়ারিশদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তারা স্বল্প পরিমাণের দাবি করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতেও স্বামীর ওয়ারিশদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) স্বল্প পরিমাণকে বাদ দেন। অর্থাৎ, স্বামীর ওয়ারিশরা যদি স্বল্প পরিমাণ দাবি করে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ অবস্থায়ও সেই হুকুম হবে, জীবদ্দশায় মতপার্থক্যের সুরতে যে হুকুম হয়েছিল। অর্থাৎ, যেমনিভাবে জীবদ্দশায় মহরে মিছিলকে মানদণ্ড বানিয়ে ছিল তেমনিভাবে উভয়ের মৃত্যুর পরও মহরে মিছিল মানদণ্ড হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মৃত্যুর পরের অবস্থাকে কিয়াস করেছেন জীবদ্দশার উপর। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের সারাংশ হলো, স্বামীর ওয়ারিশগণ অধিক মহরের অস্বীকারকারী, আর সাক্ষ্য না থাকার সুরতে অস্বীকারকারীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়, তাই স্বামীর ওয়ারিশদের কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী মূল মহর নির্ধারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য করে, তখন ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে যে মহর অস্বীকার করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু স্বামীর ওয়ারিশদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে ঐ সুরতে মহরে মিছিলের ফয়সালা করা হবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) এ মত পোষণ করেন এবং এরই উপর ফতোয়া। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) শপথ গ্রহণের পর মহরে মিছিলকে ওয়াজিব বলেন। সাহেবাইন, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শপথ গ্রহণ ওয়াজিব নয়। প্রত্যেকের দলিল-প্রমাণ পরবর্তী মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرًا فَلِوَرَثَتِهَا أَنْ يَأْخُذُوا ذٰلِكَ مِنْ مِيْرَاثِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّي لَهَا مَهْرًا فَلَا شَيْئَ لِوَرَثَتِهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لِوَرَثَتِهَا الْمَهْرُ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعْنَاهُ الْمُسَمّٰى فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُسَمّٰى دَيْنٌ فِيْ ذِمَّتِهِ وَقَدْ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ فَيُقْضٰى مِنْ تَرِكَتِهِ إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ أَوَّلًا فَيَسْقُطُ نَصِيْبُهُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَوَجْهُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِ كَالْمُسَمّٰى فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ مَوْتَهُمَا يَدُلُّ عَلٰى إِنْقِرَاضِ أَقْرَانِهِمَا فَبِمَهْرِ مَنْ يُقَدِّرُ الْقَاضِيْ مَهْرَ الْمِثْلِ ـ

অনুবাদ : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মারা যায় এমন অবস্থায় যে, স্বামী স্ত্রীর জন্য মহর নির্ধারণ করেছিল, তাহলে স্ত্রীর ওয়ারিশদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঐ নির্ধারিত মহর উসুল করবে। আর যদি মহর নির্ধারণ না করে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওয়ারিশরা কিছুই পাবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর ওয়ারিশগণ মহর পাবে। অর্থাৎ, প্রথম সুরতে নির্ধারিত মহর আর দ্বিতীয় সুরতে মহরে মিছিল পাবে। প্রথমোক্ত সুরতের কারণ হলো, নির্ধারিত মহর স্বামীর জিম্মায় ঋণরূপে বিদ্যমান রয়েছে, যা মৃত্যুর মাধ্যমে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত ঋণ তার সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে। তবে যদি জানা যায় যে, স্ত্রী আগে মারা গিয়েছে, তখন উক্ত মহর থেকে স্বামীর হিসাব বাদ যাবে। দ্বিতীয় সুরতে সাহেবাইনের মতামতের কারণ হলো, নির্ধারিত মহরের মতো মহরে মিছিলও স্বামীর জিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে সুতরাং মৃত্যুর দ্বারা এ ঋণ রহিত হবে না। যেমন– কোনো একজনের মৃত্যুতে মহরে মিছিল রহিত হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উভয়ের মৃত্যু প্রমাণ করে যে, তাদের সমসাময়িক লোকেরা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। সুতরাং তাদের মহরের সাথে তুলনা করে কাজি মহরে মিছিল নির্ধারণ করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقَدْ سُمِّيَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন লক্ষণীয় যে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত মহর ছিল কিনা? যদি স্ত্রীর জন্য মহর নির্ধারণ থেকে থাকে তাহলে সকলের মতে স্ত্রীর ওয়ারিশরা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মহর উসুল করে নেবে।

আর যদি স্ত্রীর জন্য মহর নির্ধারিত না থাকে, তাহলে এই সূরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রীর উত্তরসূরিরা কিছুই পাবে না। আর সাহেবাইনের মতে মহরে মিছিল পাবে। মোদ্দাকথা, সাহেবাইনের মতে উভয় সুরতে মহর পাবে। মহর নির্ধারণের সুরতে নির্ধারিত মহর পাবে, আর মহর নির্ধারণ না করার সুরতে মহরে মিছিল পাবে।

ঐকমত্যের মাসআলার উপর দলিল হলো, নির্ধারিত মহর স্বামীর জিম্মায় ঋণ। এ ঋণ প্রমাণিত হবে সাক্ষ্য দ্বারা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর ঐকমত্য দ্বারা। মোটকথা, নির্ধারিত মহর হলো স্বামীর জিম্মায় ঋণ। আর মৃত্যুর মাধ্যমে নির্ধারিত জিনিস

পাকাপোক্ত হয়ে যায়। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে এ সম্ভাবনা ছিল যে, স্বামী তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে। এ কারণে অর্ধেক মহর থাকবে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ সম্ভাবনা দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং যখন মৃত্যুর কারণে নির্ধারিত মহর সুদৃঢ় হয়ে গেল, তখন স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে। তবে যদি জানা যায় যে, স্বামীর পূর্বে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে তখন এ সুরতে নির্ধারিত মহর থেকে স্বামীর অংশ বাদ যাবে। আর স্বামীর অংশ হলো, স্ত্রী যদি সন্তানসম্পন্না হয় তখন স্বামী পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে $\frac{১}{৪}$ ভাগ পাবে। আর যদি সন্তান সম্পন্না না হয় তখন স্বামী অর্ধেক পাবে। মূলত এর চারটি সুরত হবে- ১. স্বামী-স্ত্রী একসাথে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তা জানাও আছে। ২. একথা জানা নেই যে, প্রথমে কে মৃত্যুবরণ করেছে। ৩. এ কথা জানা আছে যে, স্বামী প্রথমে মৃত্যুবরণ করেছে। এ তিন সুরতে স্ত্রীর উত্তরসূরিদেরকে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত পূর্ণ [মহর] দেওয়া হবে। ৪. এ কথা জানা আছে যে, স্ত্রী প্রথমে মৃত্যুবরণ করেছে এ সুরতে নির্ধারিত মহর থেকে স্বামীর মিরাসের অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ স্ত্রীর ওয়ারিশদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে।

বিরোধপূর্ণ সুরতের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো, যেমনিভাবে নির্ধারিত মহর স্বামীর জিম্মায় ঋণ, তেমনিভাবে মহরে মিছিলও স্বামীর জিম্মায় ঋণ। যেমনিভাবে নির্ধারিত মহর মৃত্যুর কারণে রহিত হয় না, তেমনিভাবে মহরে মিছিলও মৃত্যুর কারণে রহিত হবে না। সাহেবাইন (র.) দ্বিতীয় কিয়াস করেছেন স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর উপর। অর্থাৎ, যেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একজনের মৃত্যুর কারণে মহরে মিছিল অগ্রাহ্য হয় না তেমনিভাবে উভয়ের মৃত্যু দ্বারাও মহরে মিছিল অগ্রাহ্য হবে না। ইমাম সাহেবের দলিল হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মৃত্যুবরণ দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সমসাময়িক লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। কাজি ঐ স্ত্রীর মহরে মিছিল নির্ধারণ করেন তার সমসাময়িক এবং তার কালের স্ত্রীদের মহরের সাথে তুলনা করে। সুতরাং যখন কাজি তার সমসাময়িক কাউকে না পান তখন তার মহরের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করবেন ? যখন মহরে মিছিল নির্ধারণ করা যাবে না তখন তা ওয়াজিবও করা যাবে না। আর যদি কাল অতি পুরাতন না হয় এবং সময়ও বেশি অতিবাহিত না হয় তখন ঐ স্ত্রীর মহরে মিছিলের হুকুম দেওয়া হবে। কোনো কোনো মাশায়িখ ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে একটি উত্তম তথ্য বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, মহরে মিছিল যেহেতু সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য, সেহেতু এটা নির্ধারিত মহরের সদৃশ। কেননা, নির্ধারিত মহরও সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য। আর যেহেতু মহরে মিছিল গায়রে মাল তথা সম্ভোগ-অঙ্গ লাভের প্রতিকূলে এজন্য তা দানের সদৃশ। যেমন- খোরপোশ স্বামীর পক্ষ থেকে দান। আর নির্ধারিত মহর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মৃত্যু দ্বারাও রহিত হয় না এবং একজনের মৃত্যু দ্বারাও রহিত হয় না। আর দান স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারাও রহিত হয়ে যায় এবং একজনের মৃত্যু দ্বারাও রহিত হয়। এখন যদি মহরে মিছিলের মধ্যে শুধু নির্ধারণকরণের সাদৃশ্য লক্ষ্য রাখা হয়, তাহলে মহরে মিছিল উভয় সুরতে রহিত না হওয়া চাই- দুইজনের মৃত্যুর কারণেও এবং একজনের মৃত্যুর কারণেও [রহিত না হওয়া উচিত] আর যদি শুধু খোরপোশের সাদৃশ্যকে লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে মহরে মিছিল উভয় সুরতে রহিত হওয়া উচিত- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মৃত্যু দ্বারাও এবং একজনের মৃত্যু দ্বারাও। কিন্তু আমরা উভয় সাদৃশ্যকে সামনে রেখে বলেছি যে, যেহেতু মহরে মিছিল নির্ধারিত মহরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এজন্য স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর কারণে তা রহিত হবে না। আর তা যেহেতু দান তথা খোরপোশের সাথে সম্পর্ক রাখে এজন্য স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারা মহরে মিছিল রহিত হয়ে যাবে।

وَمَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيْكِ كَيْفَ وَأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسْعٰى فِيْ إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ قَالَ إِلَّا فِي الطَّعَامِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُمَا يَكُوْنُ مُهَيَّأً لِلْأَكْلِ لِأَنَّهُ يَتَعَارَفُ هَدِيَّةً فَأَمَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا وَقِيْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمَهْرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কিছু পাঠাল আর স্ত্রী বলল যে, এটা হাদিয়া বা উপহার ছিল। পক্ষান্তরে স্বামী বলল যে, এটা মহরের অংশবিশেষ ছিল। তখন স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে-ই হচ্ছে মালিকানা দানকারী। সুতরাং মালিকানার দিক সম্পর্কে সে-ই অধিক অবগত রয়েছে। কেন তা হবে না? এটাই তো স্বাভাবিক যে, সে তার ওয়াজিব পরিশোধে সচেষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তবে আহারযোগ্য খাদ্যদ্রব্য হলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ঐ সকল খাদ্য উদ্দেশ্য, যা আহারের জন্য প্রস্তুতকৃত। কেননা, তা হাদিয়ারূপেই প্রচলিত। পক্ষান্তরে গম ও যবের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওড়না ও কামিজ জাতীয় যে সকল পোশাক দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব, সেগুলোকে সে মহর হিসেবে গণ্য করতে পারবে না। কেননা, বাহ্যিক অবস্থা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী স্ত্রীর নিকট কিছু বস্তু-সামগ্রী পাঠাল আর বলল, এটি মহর। পক্ষান্তরে স্ত্রী বলল, এটি হাদিয়া। এ সুরতে স্বামীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল এই যে, স্বামী হলো মালিকানা দানকারী এবং মালিকানার দিক সম্পর্কে সে-ই অধিক অবগত যে, মালিকানা হাদিয়াস্বরূপ না মহর আদায়স্বরূপ। স্বামীর কথা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না? কারণ, বাহ্যিক অবস্থাও তার পক্ষে সাক্ষী। কারণ, প্রত্যেক মানুষ প্রথমে চায় যে, ওয়াজিব তার থেকে দূর হয়ে যায়। ওয়াজিব জিম্মায় বাকি থাকুক এমনটি কেউ কামনা করে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট খাদ্যদ্রব্য জাতীয় কিছু পাঠায়; যেমন– ভুনা করা গোশত, পাকানো খানা এবং এমন ফল-ফলাদি যা অধিকক্ষণ অবশিষ্ট থাকে না। এ সকল বিষয়াশয়ের ব্যাপারে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ সকল জিনিস হাদিয়াস্বরূপ হওয়াই অধিক প্রচলিত। সাধারণত এ সকল জিনিস দ্বারা হাদিয়া প্রেরণ করা হয়; মহর আদায়রূপে পাঠানো হয় না। তবে যদি স্ত্রীর নিকট গম, যব, মধু, ঘি, আখরোট, বাদাম, আটা, চিনি, জীবিত বকরি, কিংবা এমন জিনিস পাঠায়, যেগুলো অধিক সময় পর্যন্ত বাকি থাকে; দ্রুত নষ্ট হয় না তাহলে এ সকল সুরতেও স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, স্বামী প্রথমত ওয়াজিবকে দূর করতে চায়। কেউ কেউ বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট এমন জিনিস পাঠায় যা স্বামীর উপর অবধারিত ছিল, যেমন– ওড়না, কামিজ, পায়জামা এবং ঘরে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, তবে এগুলো স্বামী মহর হিসেবে গণ্য করতে পারবে না। কেননা, বাহ্যিক অবস্থা স্বামীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু স্বামী যদি মোজা, চাদর ইত্যাদি ওয়াজিব থেকে অতিরিক্ত পাঠায় তবে সেগুলো মহর হিসেবে গণ্য হতে পারে।

فَصْلٌ وَاِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلٰى مَيْتَةٍ اَوْ عَلٰى غَيْرِ مَهْرٍ وَ ذٰلِكَ فِىْ دِيْنِهِمْ جَائِزٌ وَ دَخَلَ بِهَا اَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَكَذٰلِكَ الْحَرْبِيَّانِ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِى الْحَرْبِيَّيْنِ وَاَمَّا فِى الذِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اِنْ مَاتَ عَنْهَا اَوْ دَخَلَ بِهَا وَالْمُتْعَةُ اِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَقَالَ زُفَرُ (رضـ) لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِى الْحَرْبِيَّيْنِ اَيْضًا لَهُ اَنَّ الشَّرْعَ مَا شَرَعَ ابْتِغَاءَ النِّكَاحِ اِلَّا بِالْمَالِ وَهٰذَا الشَّرْعُ وَقَعَ عَامًّا فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى الْعُمُوْمِ وَلَهُمَا اَنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِيْنَ اَحْكَامَ الْاِسْلَامِ وَ وِلَايَةُ الْاِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتَبَايُنِ الدَّارِ بِخِلَافِ اَهْلِ الذِّمَّةِ لِاَنَّهُمْ اِلْتَزَمُوْا اَحْكَامَنَا فِيْمَا يَرْجِعُ اِلَى الْمُعَامَلَاتِ كَالرِّبٰوا وَالزِّنَاءِ وَ وِلَايَةُ الْاِلْزَامِ مُتَحَقِّقَةٌ لِاِتِّحَادِ الدَّارِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ اَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَلْتَزِمُوْنَ اَحْكَامَنَا فِى الدِّيَانَاتِ وَفِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ خِلَافَهُ فِى الْمُعَامَلَاتِ وَ وِلَايَةُ الْاِلْزَامِ بِالسَّيْفِ اَوْ بِالْمُحَاجَّةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِاِعْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ فَاِنَّا اُمِرْنَا بِاَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِيْنُوْنَ فَصَارُوْا كَاَهْلِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ الزِّنَا لِاَنَّهُ حَرَامٌ فِى الْاَدْيَانِ كُلِّهَا وَالرِّبٰوا مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَنْ عُقُوْدِهِمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا مَنْ اَرْبٰى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ اَوْ عَلٰى غَيْرِ مَهْرٍ يَحْتَمِلُ نَفْىَ الْمَهْرِ وَيَحْتَمِلُ السُّكُوْتَ وَقَدْ قِيْلَ فِى الْمَيْتَةِ وَالسُّكُوْتِ رِوَايَتَانِ وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ ـ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : কোনো খ্রিস্টান পুরুষ যদি কোনো খ্রিস্টান নারীকে মৃত প্রাণীর বিনিময়ে কিংবা মহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ করে, আর তাদের ধর্মে তা জায়েজ থাকে এবং সে ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে কিংবা সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মহর পাবে না। এরূপ হুকুম যদি দুই হারবী দারুল হরবে এভাবে বিবাহ করে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। উভয়েই হারবী হলে তাদের সম্পর্কে সাহেবাইনেরও একই মত। আর যদি জিম্মি হয়, তাহলে সে মহরে মিছিল পাবে। যদি তাকে রেখে স্ত্রী মারা গিয়ে থাকে, কিংবা তার সাথে সহবাস করে থাকে। আর যদি সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে মুত'আ পাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ে হারবী হলেও স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। তাঁর দলিল হলো, শরিয়ত মাল ছাড়া বিবাহ সংঘটন বৈধ করেনি। আর এ শরিয়ত সর্বজনীনরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ব্যাপকভাবেই বিধান সাব্যস্ত হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, হারবীগণ তো ইসলামের বিধানসমূহ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। আর দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে বিধান প্রয়োগ করার ক্ষমতাও অনুপস্থিত। জিম্মি নারীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সুদ, জেনা ইত্যাদি মু'আমালা সংক্রান্ত বিষয়ে তারা আমাদের বিধান পালনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং দেশ এক হওয়ার কারণে

বিধান প্রয়োগের অধিকারও বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জিম্মিগণ ধর্মীয় বিষয়ে এবং যে সকল মু'আমালায় তারা ভিন্ন আকিদা পোষণ করে, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের বিধান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। আর বিধান প্রয়োগের অধিকার অর্জিত হয় তলোয়ারের শক্তি কিংবা যুক্তি-প্রমাণে বাধ্য করার মাধ্যমে। অথচ এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণই তাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত– জিম্মি-চুক্তি বহাল থাকার কারণে। কেননা, আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দিতে। সুতরাং তারা হারবীদের মতোই হয়ে গেল। জেনার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটা সকল ধর্মেই হারাম। আর সুদের বিষয়টি তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি থেকে বহির্ভূত– নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে– إِلَّا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ – 'কিন্তু যে সুদ গ্রহণ করবে তার ও আমাদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই।' জামিউস সাগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি– أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ [কিংবা মহর ছাড়া] -এর অর্থ মহর না দেওয়ার শর্তও হতে পারে। কিংবা মহর প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করাও হতে পারে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, মুরদার ও নীরবতা অবলম্বন সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, প্রত্যেকটি সুরতেই মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً الخ : শরিয়তের বিধানাবলির মধ্যে মুসলমান যেহেতু নীতিমালার পর্যায়ে। আর মু'আমালাতের মধ্যে কাফেররা মুসলমানদের অনুবর্তী এবং বিবাহও কাফেরদের ক্ষেত্রে মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু হিদায়া প্রণেতা মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত বিবাহের আহকাম উল্লেখ করছেন, এরপর এখান থেকে কাফেরদের সাথে সম্পর্কিত বিবাহের আহকাম বর্ণনা করছেন।

মতনের মধ্যে নাসরানী ও নাসরানিয়া দ্বারা জিম্মি ও জিম্মিয়া উদ্দেশ্য। সুরতে মাসআলা হলো, দারুল ইসলামে এক খ্রিস্টান পুরুষ খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করল। মহর নির্ধারণ করল কোনো মৃতপ্রাণীকে, কিংবা মহর ছাড়াই বিবাহ করল। বিনা মহরে বিবাহ করা তাদের ধর্মে জায়েজও বটে। এ সুরতে স্ত্রী মহর পাবে কিনা? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আযমের মতে স্ত্রী মহর পাবে না। সাহেবাইন ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। দারুল হারবে কোনো হারবী যদি কোনো হারবিয়াকে বিনা মহরে বিবাহ করে, কিংবা মৃতপ্রাণীকে মহর করে বিবাহ করে, তাহলে এ সুরতে ইমাম আযম ও সাহেবাইনের মতে স্ত্রী কোনো মহরই পাবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে হারবী কাফেরা মহরে মিছিল পাবে। মোটকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জিম্মিয়া ও হারবিয়া কারো জন্য মহর ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে উভয়ের জন্য মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন হারবিয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আযমের সাথে, আর জিম্মিয়ার ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর সাথে। সুতরাং কোনো জিম্মি যদি জিম্মিয়াকে মিলনের পর তালাক দেয় কিংবা জিম্মি মৃত্যুবরণ করে তাহলে উভয় সুরতে জিম্মিয়া মহরে মিছিল পাবে। আর যদি মিলনের পূর্বে তালাক দেয় তাহলে জিম্মিয়া মুত'আ পাবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, শরিয়ত মালসহ বিবাহ সংঘটন বৈধ করেছে। ইরশাদ হয়েছে– أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ- আর এ শরিয়ত সর্বজনীনরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন সকলের জন্য। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ يَعْنِي الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ অধিকন্তু এ শরিয়ত এ কারণেও ব্যাপক যে, এ ধ পূর্বের সকল ধর্মকে রহিতকারী। সুতরাং যখন এ শরিয়ত ব্যাপক, তখন তার হুকুমও ব্যাপক হবে। মু'মিন-গায়রে মু'মিন সকলকে শামিল করবে। দলিলের সারাংশ হলো, মাল দ্বারা বিবাহ ব্যাপকভাবেই শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। আর যে জিনিস ব্যাপকরূপে প্রবর্তিত তার হুকুমও ব্যাপকরূপে সাবেত হবে। তাই যেমনিভাবে মৃতপ্রাণীকে মহর নির্ধারণ আর বিনা মহরে বিবাহ করার সুরতে মুসলমান স্ত্রী মহরে মিছিলের হকদার ছিল, এমনিভাবে জিম্মিয়া আর হারবিয়াও মহরে মিছিল পাবে। অধিকন্তু বিবাহ মু'আমালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর কাফেররা মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শরিয়ত সম্বোধিত ব্যক্তি। সুতরাং মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে হুকুম হবে, কাফের ও জিম্মিদেরও সেই হুকুম হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, হারবীরা ইসলামের বিধানসমূহ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি এবং আমাদেরও দায়িত্ব পালনের কর্তৃত্ব নেই। কেননা, দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর ভিন্ন ভিন্ন। যখন উভয়টি ভিন্ন, তখন হারবীদের উপর ইসলামের বিধানসমূহ কিভাবে কার্যকর করা হবে? জিম্মিদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, জিম্মিরা প্রথমত জিম্মি-চুক্তির কারণে মু'আমালা সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের বিধানসমূহ পালনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাই তো জেনা এবং সুদ থেকে তাদেরকেও এমনিভাবে নিষেধ করা হয়েছে যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, জেনায় লিপ্ত হলে হদ জারি করা হবে। যদি অল্প সময়ের জন্য মেনে নেওয়া হয় যে, জিম্মিরা নিজেদের উপর ইসলামের বিধানসমূহ আবশ্যক করেনি [তবুও বলা হবে যে,] দেশ এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে আমাদের জন্য বিধান প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। এ হিসেবে জিম্মিদের উপর ইসলামের বিধানসমূহ প্রয়োগ করা যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আমরা এ কথা মানি না যে, জিম্মিরা মু'আমালাত সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের বিধানাবলিকে আবশ্যক করে নিয়েছে। কেননা, জিম্মি-চুক্তির কারণে তারা দিয়ানত তথা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের বিধিবিধান আবশ্যক করেনি এবং ঐ সকল মু'আমালাতের ক্ষেত্রেও আবশ্যক করেনি যেগুলোর মধ্যে তারা আমাদের বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন- বিনা সাক্ষীতে বিবাহ-শাদি, মদের ক্রয়-বিক্রয়, শূকরের ক্রয়-বিক্রয়। আমরা এগুলোকে হারাম বিশ্বাস করি, জিম্মিরা এগুলোকে হালাল বিশ্বাস করে।

قَوْلُهُ وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّيْفِ الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো, বিধান প্রয়োগের কর্তৃত্ব অর্জিত হয় তলোয়ারের শক্তি দ্বারা এবং যুক্তি-প্রমাণে বাধ্য করার দ্বারা। কিন্তু জিম্মি-চুক্তির কারণে এগুলো অনুপস্থিত। তাই তো আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দিতে। সুতরাং জিম্মিরা হারবীদের মতোই হয়ে গেল। তাই হারবীদের যে হুকুম হবে জিম্মিদেরও সেই হুকুম হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الزِّنَا الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের মতের জবাব দেওয়া হয়েছে। সারাংশ হলো, জেনার উপর কিয়াস করা ঠিক হয়নি। কেননা, জেনা সকল ধর্মেই হারাম। আর সুদের বিষয়টি তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি থেকে বহির্ভূত। অর্থাৎ, জিম্মিদেরকে সুদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। যেমন- হিদায়া গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী বর্ণনা করেছেন যে- إِلَّا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ "খবরদার! যে সুদের কাজ-কারবার করল আমাদের আর তার মাঝে কোনো চুক্তি নেই।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেছেন। তাদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যার মধ্যে লেখা ছিল যে, وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ مِنْهُمُ الرِّبَا فَذِمَّتِي مِنْهُمْ بَرِيئَةٌ "সুদ খেয়ো না। তাদের মধ্য থেকে যে সুদ খেয়েছে- আমার জিম্মা তার থেকে মুক্ত।" মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় বর্ণিত হয়েছে- كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ "রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তারা ছিল খ্রিস্টান। [চিঠিতে লেখা এই ছিল যে,] তোমাদের মধ্য থেকে যে সুদি লেনদেন করবে তার জন্য কোনো দায়দায়িত্ব নেই।"

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, জামিউস সাগীরের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ [কিংবা মহর ছাড়া] -এর দুটি অর্থ হতে পারে- ১. আকদে নিকাহের সময় মহরের উল্লেখই করা হয়নি। ২. আকদের সময় স্বামী-স্ত্রী মহর প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেছে। যাহিরে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, যদি মহরের উল্লেখ একেবারেই না করা হয়, তবে জিম্মি স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। আর নীরবতা পালনের সুরতে জিম্মি স্ত্রী কিছুই পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, মৃতপ্রাণীকে মহর নির্ধারণ করা আর মহর থেকে নীরবতা পালন করার সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যেমন- সাহেবাইনের মাযহাব। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী জিম্মি স্ত্রী কিছুই পাবে না। যেমন- মতনের মাসআলা। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো, সকল সুরতে [মৃতপ্রাণীকে মহর নির্ধারণ করা হোক কিংবা মহর একেবারেই উল্লেখ না করা হোক কিংবা মহর থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হোক] মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জিম্মি স্ত্রী কিছুই পাবে না, আর সাহেবাইনের মতে মহরে মিছিল পাবে। -[ফাতহুল কাদীর]

فَإِنْ تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً عَلٰى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيْرُ وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِأَعْيَانِهِمَا وَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيْمَةُ وَفِي الْخِنْزِيْرِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَهَا الْقِيْمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُؤَكِّدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوْضِ فَيَكُوْنُ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ كَالْعَقْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا وَإِذَا الْتَحَقَتْ حَالَةُ الْقَبْضِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ فَأَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَقُوْلُ لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَذَا هٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَقُوْلُ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ لِكَوْنِ الْمُسَمّٰى مَالًا عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ التَّسْلِيْمُ لِلْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيْمَةُ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمّٰى قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ يَتِمُّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهٰذَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيْهِ وَبِالْقَبْضِ يَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إِلٰى ضَمَانِهَا وَذٰلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ كَاسْتِرْدَادِ الْخَمْرِ الْمَغْصُوْبِ وَفِيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْضُ مُوْجِبٌ مِلْكَ الْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ بِالْإِسْلَامِ .

অনুবাদ : কোনো জিম্মি পুরুষ যদি কোনো জিম্মি মহিলাকে মদ বা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কিংবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্ত্রী মদ ও শূকর পাবে। অর্থাৎ, যদি উভয়টি নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং কবজ করার আগেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আর যদি নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে মদের ক্ষেত্রে তার মূল্য এবং শূকরের ক্ষেত্রে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই সে মহরে মিছিল পাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই সে মূল্য পাবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, কবজ নির্দিষ্ট কবজকৃত বস্তুর মাঝে মালিকানা সংহত করে। সুতরাং তা মূল আকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। কাজেই ইসলামের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন– আকদ করা। তাই [মদ ও শূকর] উভয়টি অনির্ধারিত হলে যে হুকুম হয় তেমনি হবে। মোটকথা, কবজ-এর অবস্থা যখন আকদের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলো তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আকদের সময় উভয়ে মুসলমান হলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। সুতরাং এখানেও তা-ই হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাম উল্লেখ শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, তাদের আকিদায় উল্লিখিত বস্তু মাল। কিন্তু ইসলামের কারণে এগুলোর অর্পণ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন– কবজ-এর পূর্বে নির্ধারিত গোলাম মারা গেলে হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নির্ধারিত মহরের ক্ষেত্রে শুধু আকদের দ্বারাই মালিকানা হয়ে যায় এজন্যই স্ত্রী কবজ করার পূর্বে

ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। কব্জ দ্বারা স্বামীর জিম্মা থেকে স্ত্রীর জিম্মায় স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আর এ স্থানান্তর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। যেমন– ছিনিয়ে নেওয়া মদ ফিরিয়ে আনা। পক্ষান্তরে অনির্ধারিতের ক্ষেত্রে কব্জ নির্দিষ্ট বস্তুর উপর মালিকানা সাব্যস্ত করে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ দ্বারা তা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক জিম্মি-পুরুষ জিম্মি-নারীকে বিবাহ করল এবং মহর নির্ধারণ করল নির্দিষ্ট মদ বা নির্দিষ্ট শূকরকে। তারপর মহর কব্জ করার পূর্বে উভয়ে মুসলমান হয়ে গেল কিংবা একজন মুসলমান হলো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জিম্মি-নারী নির্দিষ্ট মদ এবং নির্দিষ্ট শূকর পাবে। আর যদি মদ ও শূকর অনির্ধারিত হয়, তাহলে ইমাম আযমের মতে অনির্ধারিত মদের ক্ষেত্রে জিম্মি-নারীর জন্য মূল্য ওয়াজিব হবে, আর অনির্ধারিত শূকরের ক্ষেত্রে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, নির্ধারিত-অনির্ধারিত উভয় সূরতে মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ে যেহেতু হুবহু মদ ও হুবহু শূকর ওয়াজিব না করার ক্ষেত্রে একমত, যখন উভয়টি নির্দিষ্ট হবে। এ কারণে হিদায়া গ্রন্থকার উভয়ের দলিল একত্রে বর্ণনা করেছেন। তাই গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাহেবাইনের দলিল হলো, কব্জ নির্দিষ্ট কব্জকৃত বস্তুর মধ্যে মালিকানাকে দৃঢ় করে। এ কারণে নির্দিষ্ট মহর যদি স্ত্রীর কব্জ করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা স্বামীর মাল থেকে ধ্বংস হবে এবং স্বামীর উপর তার অনুরূপ ওয়াজিব হবে, যদি তা সদৃশ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর মূল্য ওয়াজিব হবে, যদি নির্দিষ্ট মহর মূল্যবান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি কব্জ করার পর ধ্বংস হয়, তাহলে স্ত্রীর মাল থেকে ধ্বংস হবে। এমনিভাবে ইমাম সাহেবের মতে, কব্জ-এর পূর্বে মহরের মধ্যে স্ত্রীর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না, তবে কব্জ-এর পর স্ত্রীর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং যখন কব্জ মালিকানার সংহতকারী, তাই কব্জ আকদের সদৃশ হয়ে গেল। কেননা, কব্জ এবং আকদ উভয়টি প্রত্যেকের মালিকানায় ফলপ্রসূ। সুতরাং যেমনিভাবে ইসলামের পর শুরুতে আকদ হওয়ার কারণে মদের মালিকানা ও শূকরের মালিকানা নিষিদ্ধ, এমনিভাবে ইসলামের পর মদ ও শূকরের উপর কব্জ করাও নিষিদ্ধ। মাসআলাটি এমন হলো যেমন অনির্ধারিত মদ ও অনির্ধারিত শূকর। অর্থাৎ, যেমনিভাবে অনির্ধারিতের মধ্যে হুবহু মদ ও হুবহু শূকর ওয়াজিব হয় না, তেমনিভাবে নির্ধারিতের মধ্যেও হুবহু মদ ও হুবহু শূকর ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যখন কব্জ-এর অবস্থা আকদের অবস্থার অনুরূপ হয়ে গেল এবং হুবহু মদ ও হুবহু শূকর অর্পণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মদ আর শূকরকে মহর ধার্য করে আকদে নিকাহ করার সময় এরা যদি মুসলমান হতো, তাহলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হতো, তাই যখন কব্জ-এর সময় মুসলমান, এখনও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মদ আর শূকরের নাম উল্লেখকরণ শুদ্ধ আছে। কেননা, জিম্মিদের মতে, উল্লিখিত বস্তু হালাল। কিন্তু যেহেতু ইসলামের কারণে শরাব আর শূকর অর্পণ করা নিষিদ্ধ, এজন্য সেগুলোর মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমনিভাবে কব্জ-এর পূর্বে যদি নির্দিষ্ট গোলাম হালাক হয়ে যায়, তখন তার মূল্য ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে এখানেও মদ আর শূকরের মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নির্ধারিত মহরের ক্ষেত্রে শুধু আকদের দ্বারাই মালিকানা হয়ে যায়। কেননা, মালিকানা দু প্রকার। জাতের মালিকানা, আর ব্যবহারের মালিকানা। স্ত্রীর জন্য কব্জ-এর পূর্বে উভয় মালিকানা সাবেত হয়। এজন্যই স্ত্রী কব্জ করার পূর্বে তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করতে পারবে। যদি কব্জ করার পূর্বে ঐ মহর ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর মালিকানায় হালাক হবে স্বামীর মালিকানায় নয়। মোটকথা হলো, নির্দিষ্ট মহরের মধ্যে শুধু কব্জ মালিকানার কারণ নয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে কব্জ দ্বারা কি লাভ হবে? হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জবাব দিচ্ছেন যে, কব্জ দ্বারা মালিকানা স্বামীর জিম্মা থেকে স্ত্রীর জিম্মায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর এ মালিকানার স্থানান্তর ইসলামের কারণে নিষিদ্ধ নয়। যেমন– এক জিম্মি থেকে কেউ তার মদ ছিনিয়ে নিল, এরপর জিম্মি মুসলমান হয়ে গেল। এখন এ মুসলমান জিম্মির জন্য ছিনতাইকারী থেকে ঐ ছিনতাইকৃত মদ ফেরত আনা জায়েজ। আর অনির্ধারিত মহরের মধ্যে কব্জ হলো মালিকানার কারণ। কিন্তু ইসলামের কারণে মদ ও শূকরের মালিকানা উভয়টি নিষিদ্ধ, তাই কব্জও নিষিদ্ধ হবে।

بِخِلَافِ الْمُشْتَرِىْ لِاَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ اِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالْقَبْضِ وَاِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِىْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَا تَجِبُ الْقِيْمَةُ فِى الْخِنْزِيْرِ لِاَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَيَكُوْنُ اَخْذُ قِيْمَتِهٖ كَاَخْذِ عَيْنِهٖ وَلَا كَذٰلِكَ الْخَمْرُ لِاَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِالْقِيْمَةِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ فِى الْخِنْزِيْرِ دُوْنَ الْخَمْرِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَمَنْ اَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ اَوْجَبَ الْمُتْعَةَ وَمَنْ اَوْجَبَ الْقِيْمَةَ اَوْجَبَ نِصْفَهَا ـ

অনুবাদ : ক্রেতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ক্রয়কৃত দ্রব্যে ইচ্ছামতো ব্যবহারের মালিকানা কব্‌জ-এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। তো অনির্ধারিতের ক্ষেত্রে যখন কব্‌জ করা অসম্ভব তখন শূকরে মূল্য ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা মূল্যবান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার মূল্য গ্রহণ করা শূকর গ্রহণ করারই সমতুল্য। মদের বিষয়টি অনুরূপ নয়। কেননা, তা সদৃশ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। দেখুন না, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্বামী যদি মূল্য প্রদান করত, তাহলে তা গ্রহণে স্ত্রীকে বাধ্য করা হতো শূকরের ক্ষেত্রে, কিন্তু মদের ক্ষেত্রে নয়। আর সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দেয়, তাহলে যারা মহরে মিছিল ওয়াজিব করেছেন তারা মুত'আ ওয়াজিব বলেন । আর যারা মূল্য ওয়াজিব করেছেন তারা অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব বলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِىْ الخ : اَلْمُشْتَرِىْ শব্দটি بِفَتْحِ الرَّاءِ ও بِكَسْرِ الرَّاءِ উভয়তাবে পড়া যায়। প্রথম সুরতে পণ্য উদ্দেশ্য হবে। তখন মর্মার্থ এই হবে যে, নির্দিষ্ট মহরের মধ্যে মালিকানা নিছক আকদ দ্বারা পূর্ণতা ধারণ করে। বিক্রয়ের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, বিক্রয়ের মধ্যে কব্‌জ-এর কারণে মালিকানার অধিকার অর্জন হয়; নিছক আকদের কারণে নয়। যেমন– এক ব্যক্তি মদ কিংবা শূকর বেচাকেনা করল, অতঃপর কব্‌জ করার পূর্বে ক্রেতা মুসলমান হয়ে গেল, তাহলে তার জন্য কব্‌জ করা জায়েজ নেই। আর যদি بِكَسْرِ الرَّاءِ হয়, তখন মর্ম এই হবে যে, নির্দিষ্ট মহরের মধ্যে স্ত্রীর জন্য নিছক আকদ দ্বারা মালিকানা পূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ক্রেতার জন্য নিছক আকদের কারণে মালিকানা পূর্ণ হয় না। কেননা, কব্‌জ দ্বারা তার জন্য মালিকানার অধিকার লাভ হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যখন অনির্ধারিত মহরের মধ্যে ইসলামের কারণে কব্‌জ বাধাপ্রাপ্ত হলো, তখন শূকরের সুরতে স্বামীর উপর তার মূল্য ওয়াজিব হবে না; বরং মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা, শূকর হলো মূল্যবান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। তার মূল্য গ্রহণ দ্বারা হুবহু শূকর গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। আর এটা জায়েজ নেই। তাই ঐ সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর মদ যেহেতু সদৃশ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, এজন্য তার মূল্য গ্রহণ দ্বারা হুবহু মদ গ্রহণ হবে না। এজন্য মদের সুরতে স্ত্রীর জন্য মদের মূল্য ওয়াজিব করা হয়েছে। আর মদ যেহেতু মূল্যবান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, এজন্য মুসলমান হওয়ার পূর্বে যদি স্বামী শূকরের মূল্য দিতে চায়, তাহলে স্ত্রীকে তা গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। তবে মদের সুরতে বাধ্য করা হবে না। কেননা, মদ মূল্যবান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হিদায়া প্রণেতা (র.) বলেন, উপরিউক্ত সুরতে স্বামী যদি মিলনের পূর্বে তালাক দেয়, তাহলে ইমামগণের মধ্যে যাঁরা মহরে মিছিল ওয়াজিব করেছেন, তাঁদের মতে মুত'আ ওয়াজিব হবে। আর যাঁরা মদ ও শূকরের মূল্য ওয়াজিব করেছেন, তাঁদের মতে অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيْقِ

لَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ اِلَّا بِاِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ (رح) يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ لِاَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمْلِكُ النِّكَاحَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلِاَنَّ فِىْ تَنْفِيْذِ نِكَاحِهِمَا تَعْيِيْبُهُمَا اِذِ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيْهِمَا فَلَا يَمْلِكَانِهِ بِدُوْنِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا ـ وَكَذٰلِكَ الْمُكَاتَبُ لِاَنَّ الْكِتَابَةَ اَوْجَبَتْ فَكَّ الْحَجْرِ فِىْ حَقِّ الْكَسْبِ فَبَقِىَ فِىْ حَقِّ النِّكَاحِ عَلٰى حُكْمِ الرِّقِّ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ تَزْوِيْجَ عَبْدِهٖ وَيَمْلِكُ تَزْوِيْجَ اَمَتِهٖ لِاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْاِكْتِسَابِ وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ لَاتَمْلِكُ تَزْوِيْجَ نَفْسِهَا بِدُوْنِ اِذْنِ الْمَوْلٰى وَتَمْلِكُ تَزْوِيْجَ اَمَتِهٖ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَاُمُّ الْوَلَدِ لِاَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِمَا قَائِمٌ ـ

পরিচ্ছেদ : দাসের বিবাহ

অনুবাদ : মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস ও দাসীর বিবাহ জায়েজ নয়। ইমাম মালেক (র.) বলেন, দাসের জন্য বিবাহ করা জায়েজ হবে। কেননা, সে তালাকের অধিকারী, সুতরাং বিবাহেরও অধিকারী হবে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ "কোনো গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।" তা ছাড়া তাদের বিবাহ কার্যকর করলে তাদের খুঁতযুক্ত করা হয়। কেননা, দাস ও দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহ হলো খুঁত। সুতরাং দাস ও দাসী তাদের মনিবের অনুমতি ছাড়া তা করার অধিকারী হবে না। মুকাতাব [আজাদীর জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম] সম্পর্কেও তেমনই হুকুম। কেননা, মুকাতাবের সাথে কৃতচুক্তি উপার্জনের ক্ষেত্রে তার বন্ধন-মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং সে বিবাহের ক্ষেত্রে দাসত্বের হুকুমের উপর বহাল থাকবে। এজন্যই তো মুকাতাব তার গোলামকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু তার দাসীকে বিবাহ করতে পারে। কেননা, [দাসীকে বিবাহ দান মহর ও সন্তান লাভের কারণে] উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ মুকাতাব দাসী মনিবের অনুমতি ছাড়া নিজেকে বিবাহ দিতে পারে না। কিন্তু নিজের দাসীকে বিবাহ দিতে পারে। তার কারণ এইমাত্র আমরা বর্ণনা করেছি। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ সম্পর্কে একই হুকুম। কেননা, তাদের মাঝে মনিবের মালিকানা বহাল রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : দাসের বিবাহকে খ্রিস্টান পুরুষ ও নারীদের অনুচ্ছেদের পরে এ কারণে আনা হয়েছে যে, দাসত্ব হলো কুফরের লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রথমত কাফেরকে দাস বানানো হয়; মুসলমানকে নয়। আর যেহেতু اَثَرْ টা مُؤَثِّرْ-এর পরে হয়, তাই দাসের বিবাহ-পর্বকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। رَقِيْق অধীনস্থকে বলা হয়। رَقِيْق শব্দটি একবচন, বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الخ : لَا يَجُوزُ -এর এক অর্থ হলো, মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস-দাসীর বিবাহ সাব্যস্তই হবে না। হাফীযুদ্দীন (র.) এই মত পোষণ করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস-দাসীর বিবাহ জায়েজ এবং বিশুদ্ধ, তবে অকার্যকর। তার কার্যকারিতা মনিবের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমতি প্রদান করে তাহলে বিবাহ কার্যকর হবে, আর যদি অনুমতি না দেয়, তবে বিবাহ অকার্যকর থাকবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান এবং ইবরাহীম নাখ'ঈ (র.) এ মত পোষণ করেন। মোদ্দাকথা, দাসীর বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া সকলের মতে কার্যকর হবে না। কেননা, দাসীর সম্ভোগ-অঙ্গের উপকার হলো মনিবের মালিকানা। আর মনিবের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া অন্যের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। তাই মনিবের অনুমতি ছাড়া দাসীর বিবাহ কার্যকর হবে না। গোলামের ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) বলেন, মনিবের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিবাহ জায়েজ [কার্যকর] হবে। হানাফীগণের মতে, গোলামের বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া জায়েজ [কার্যকর] হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, গোলাম তালাকের অধিকারী আর যে ব্যক্তি তালাকের অধিকারী সে বিবাহেরও অধিকারী হবে। কেননা, তালাকের অস্তিত্ব হলো নিকাহের কারণে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের মালিক হবে সে তার দিকে প্রত্যানীত সববেরও মালিক হবে। তাই গোলাম যখন তালাকের মালিক, তখন সে তালাকের সবব নিকাহেরও মালিক হবে। এ দলিলটি এভাবেও বলা যায় যে, গোলাম তালাকের মালিক, আর তালাক বলা হয় নিকাহ দূর করাকে। যে ব্যক্তি কোনো জিনিস দূর করার মালিক সে ঐ জিনিস স্থাপন করারও মালিক হবে। তাই গোলাম বিবাহেরও মালিক হবে।

হানাফীগণের দলিল হলো, হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– 'যে গোলাম মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল সে ব্যভিচারী।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ কার্যকর হয় না। আকলী দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, দাস-দাসীর বিবাহকে কার্যকর করতে গেলে তাদেরকে খুঁতযুক্ত করা হবে। কেননা, দাস-দাসীর বিবাহের মধ্যে খুঁত রয়েছে। [এ কারণে কেউ যদি গোলাম কিংবা দাসীকে ক্রয় করে, পরে জানা যায় যে, তারা বিবাহিত, তাহলে ক্রেতার জন্য দোষের খেয়ারের কারণে সেগুলোকে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে]। আর দাস-দাসীর এ এখতিয়ার নেই যে, তার নিজেদের মধ্যে খুঁত সৃষ্টি করবে– মনিবের হকের দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে। সুতরাং তার মনিবের অনুমতি ছাড়া সে বিবাহের মালিক হবে না।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, তালাক দ্বারা খুঁত দূর হয়, আর বিবাহ দ্বারা খুঁত সৃষ্টি হয়। সুতরাং খুঁত দূর করার মালিক হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, সে ব্যক্তি খুঁত তৈরিরও মালিক হবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْمُكَاتَبُ الخ : মাসআলা : মুকাতাবের বিবাহও মনিবের অনুমতি ছাড়া সহীহ [কার্যকর] হবে না। দলিলের সারাংশ হলো, গোলাম সব ধরনের অধিকার প্রয়োগ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিতাবতের চুক্তি তার নিষিদ্ধতাকে উপার্জন তথা উপকার লাভ করার ক্ষেত্রে বাতিল করে দিল, যাতে উপার্জনের দ্বারা স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ হয়। আর বিবাহ-শাদি এ ধরনের ব্যাপার নয় যার দ্বারা উপকার অর্জন হবে; বরং তার দ্বারা অনেক ধরনের ক্ষতি সাধিত হবে। যেমন– মহর দিতে হবে, খোরপোশ ওয়াজিব হবে। তাই মুকাতাব বিবাহের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে পূর্বে গোলাম ছিল, তেমনিভাবে মুকাতাব হওয়ার পরও গোলাম থাকবে। আর যেহেতু মুকাতাব বিবাহের ক্ষেত্রে গোলাম, এ কারণে সে তার গোলামের বিবাহ দানের অধিকার রাখে না। কেননা, গোলামের বিবাহ উপার্জনের অধ্যায়ভুক্ত নয়। তবে মুকাতাব তার দাসীকে বিবাহ দিতে পারে। কেননা, দাসীর বিবাহ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাই তো তার কারণে মহর এবং খোরপোশ লাভ হয়। কারণ, যে মহর আকদ কিংবা সহবাসের কারণে দাসীর জন্য ওয়াজিব হলো, তা মনিবের জন্য হবে। একই হুকুম মুকাতাবা দাসীরও। সে তার দাসীর বিবাহ দিতে পারে, কিন্তু নিজের বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া দিতে পারে না। এর দলিল হলো পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবে না। কারণ, মালিকানা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ কারণে মনিব যদি বলে– كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ حُرٌّ 'আমার সকল গোলাম আজাদ', তাহলে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ তারাও আজাদ হয়ে যাবে।

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ لِأَنَّ هٰذَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِوُجُوْدِ سَبَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلٰى لِصُدُوْرِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلْمَضَرَّةِ عَنْ أَصْحَابِ الدُّيُوْنِ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَلَا يُبَاعَانِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ لِنَقْلٍ مِنْ مِلْكٍ إِلٰى مِلْكٍ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيْرِ مِنْ كَسْبِهَا لَا مِنْ نَفْسِهَا .

অনুবাদ : দাস যখন তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে, তখন মহর তার ঘাড়ে ঋণরূপে থাকবে এবং তা আদায় করার জন্য তাকে বিক্রয় করা যাবে। কেননা, এটা এমন ঋণ, যা গোলামের ঘাড়ে ওয়াজিব হয়েছে। এজন্য যে, যোগ্য পাত্রের পক্ষ থেকে ঋণের কারণ অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর তা মনিবের উপর কার্যকরী হবে। এ কারণে যে, মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতি জারি হয়েছে। সুতরাং ঋণ পাওনাদারদের ক্ষতিগ্রস্ততা দূর করার জন্য তার ঘাড়ের সাথে ঋণ যুক্ত করে দেওয়া হবে। যেমন– ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণের বেলায় [ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ঋণগ্রস্ত হলে তাকে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা হবে]। মুদাববার ও মুকাতাব মহর পরিশোধ করার জন্য মজুরি করবে। কিন্তু এ কারণে তাদের বিক্রি করা যাবে না। কেননা, মুকাতাব ও মুদাববার থাকা অবস্থায় তাদের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং তাদের উপার্জন দ্বারা মহর পরিশোধ করা হবে; তাদের নিজের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, গোলাম যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে, তাহলে মহর গোলামের উপর ওয়াজিব হবে এবং ঐ মহর আদায় করার জন্য গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। তবে যদি ঐ গোলামের বিক্রীত মূল্য দ্বারা পূর্ণ মহর আদায় না করা যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার বিক্রি করা যাবে না; বরং অবশিষ্ট মহর আযাদ হওয়ার পর চাওয়া হবে। দলিলের সারাংশ হলো, এটা এমন ঋণী মহর যা গোলামের ঘাড়ে ওয়াজিব হয়েছে। আর প্রত্যেক ঐ ঋণ যা গোলামের ঘাড়ে ওয়াজিব হয়, সে ঋণ আদায়ের জন্য গোলামকে বিক্রি করা যায়। তাই এ গোলামকেও ঋণী মহর আদায় করার জন্য বিক্রি করা যাবে। ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, ওয়াজিব হওয়ার সবব অর্থাৎ বিবাহ তার যোগ্য পাত্র তথা আকিল বালিগ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর বিবাহের প্রতিবন্ধক তথা মনিবের অধিকার দূর হয়ে গেছে তার অনুমতি দান করার কারণে। আর গোলামের ঘাড়ে ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, মনিবের অনুমতি প্রদান করা ও ঋণীদের তথা স্ত্রীদের থেকে ক্ষতিকে দূর করা। যেমনি ব্যবসায়ী ঋণের বেলায় অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে বিক্রয় করা যায়, তেমনিভাবে স্ত্রীর মহর আদায়ের জন্যও গোলামকে বিক্রয় করা যাবে। তবে মুদাববার আর মুকাতাব যদি মনিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করে, তাহলে তারা সঞ্চয় করে মহর আদায় করবে; তাদেরকে বিক্রি করা হবে না। দলিল হলো, মুদাববার ও মুকাতাব থাকা অবস্থায় এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় স্থানান্তর করা সহীহ নয়। সুতরাং যখন উভয়টি এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় হস্তান্তরযোগ্য নয়, তাই এগুলোকে বিক্রিও করা যাবে না। মোটকথা হলো, মুদাববার ও মুকাতাবের গর্দান থেকে মহর উসুল করা কঠিন। তাই তারা সঞ্চয় করে মহর আদায় করবে।

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا فَلَيْسَ هٰذَا بِإِجَازَةٍ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ لِأَنَّ رَدَّ هٰذَا الْعَقْدِ وَمُتَارَكَتَهُ يُسَمّٰى طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَهُوَ الْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ أَوْ هُوَ أَدْنٰى فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلٰى وَإِنْ قَالَ طَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَهٰذَا إِجَازَةٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَةُ ـ

অনুবাদ : দাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে আর মনিব তাকে বলে যে, তাকে তালাক দাও কিংবা তাকে পরিত্যাগ কর, তবে এটা বিবাহের অনুমতিরূপে বিবেচ্য হবে না। কেননা, তা প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কারণ, এ আকদ রদ ও বর্জন করাকে তালাক ও পরিত্যাগ বলা হয়ে থাকে। আর অবাধ্য গোলামের ক্ষেত্রে এটাই অধিক উপযুক্ত কিংবা এজন্য যে, এ অর্থ নিকটবর্তী। সুতরাং এ অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। আর যদি তাকে বলে যে, তাকে তুমি এক তালাক দাও, যাতে তোমার রুজু করার অধিকার থাকে, তাহলে এটাকে বিবাহের অনুমতি ধরা হবে। কেননা, তালাকে রিজয়ী বিশুদ্ধ বিবাহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং অনুমতি দানের দিকটি নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ مَوْلَاهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, গোলাম মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল, জানার পর মনিব গোলামকে বলল, তাকে তালাক দাও কিংবা পরিত্যাগ কর, তবে এটি মনিবের পক্ষ থেকে বিবাহের অনুমতি হবে না দলিল হলো, মনিবের উপরিউক্ত কথার মধ্যে যেমনিভাবে বিবাহের অনুমতির সম্ভাবনা আছে– তেমনিভাবে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করারও সম্ভাবনা আছে। কেননা, নিকাহে ফাসিদকে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করার নাম হলো তালাক ও পরিত্যাগ। সুতরাং যখন উভয় দিকের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আমরা প্রত্যাখ্যানের দিকটিকে অনুমতির দিকের উপর দুটি কারণে প্রাধান্য দিয়েছি।

১. গোলাম অবাধ্য ও নাফরমান। আর অবাধ্য ও নাফরমানের জন্য সমীচীন হলো, তার কৃত আমলকে প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে দেওয়া; কার্যকর করা নয়।

২. প্রত্যাখ্যান অধিক নিকটবর্তী। কেননা, প্রত্যাখ্যান হলো দূর করা, আর তালাক হলো নিকাহ সাব্যস্ত হওয়ার পর দূর করা; আর দূর করার তুলনায় প্রত্যাখ্যান সহজ তাই প্রত্যাখ্যানের উপর প্রযুক্ত করাই অধিক উত্তম ও সমীচীন হবে।

প্রশ্ন: এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, طَلِّقْهَا শব্দটি তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে হাকীকত, আর বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করার অর্থে রূপক, এখানে হাকীকতের উপর আমল করা সম্ভব, তাহলে রূপকের দিকে কেন প্রত্যাবর্তন করা হবে?

উত্তর : এর উত্তর হলো, হাকীকতকে অবস্থার প্রেক্ষিতে ছেড়ে দেওয়া যায়, আর এখানেও এমনটি হয়েছে। আর যদি মনিব বলে, طَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ তবে মনিবের এ কথাটি তার পক্ষ থেকে অনুমতিরূপে গণ্য হবে। এর দলিল হলো, মনিব গোলামটিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তালাকে রিজয়ী দিয়ে দাও। আর তালাকে রিজয়ী নিকাহে সহীহ-এর পর পতিত হয় সুতরাং মনিবের তালাকে রিজয়ীর হুকুম দেওয়া মানে নিকাহে সহীহ-এর হুকুম দেওয়া।

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ هٰذِهِ الْاَمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا عُتِقَ وَاَصْلُهُ اَنَّ الْاِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ فَيَكُوْنُ هٰذَا الْمَهْرُ ظَاهِرًا فِيْ حَقِّ الْمَوْلٰى وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ فَلَا يَكُوْنُ ظَاهِرًا فِيْ حَقِّ الْمَوْلٰى فَيُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتَاقِ لَهُمَا اَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ الْاِعْفَافُ وَالتَّحْصِيْنُ وَ ذٰلِكَ بِالْجَائِزِ وَلِهٰذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّ بَعْضَ الْمَقَاصِدِ حَاصِلٌ وَهُوَ مِلْكُ التَّصَرُّفَاتِ وَلَهُ اَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِيْ عَلٰى إِطْلَاقِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَبَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَاصِلٌ كَالنَّسَبِ وَ وُجُوْبِ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ عَلٰى إِعْتِبَارِ وُجُوْدِ الْوَطْيِ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِيْنِ مَمْنُوْعَةٌ عَلٰى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি তার দাসকে বলে যে, এ দাসীকে বিবাহ কর, আর তাকে অশুদ্ধরূপে বিবাহ করল এবং তার সাথে সহবাস করল, তাহলে তাকে মহর পরিশোধের জন্য বিক্রি করা যাবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, সে যখন আজাদ হবে তখন তার নিকট থেকে মহর আদায় করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নীতি হলো, তাঁর মতে বিবাহের অনুমতি শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এ মহর মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে। সাহেবাইনের মতে, এ অনুমতি বৈধ বিবাহের জন্য কার্যকরী হবে; অবৈধ বিবাহের জন্য নয়। সুতরাং এ মহর মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে না। অতএব আযাদী লাভের পর তার নিকট থেকে মহর উসুল করা হবে। সাহেবাইনের যুক্তি হলো, বিবাহের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য হলো সতীত্ব ও সুচিতা রক্ষা করা। আর তা বৈধ বিবাহ দ্বারাই অর্জিত হয়। এ কারণেই কেউ যদি শপথ করে যে, সে বিবাহ করবে না, তাহলে তা বৈধ বিবাহের উপরই কার্যকর হবে। বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ফাসেদ বিক্রয় দ্বারাও কোনো কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়, আর তা হলো ব্যবহারের মালিকানা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, 'বিবাহ কর' শব্দটি নিঃশর্ত। সুতরাং তা নিঃশর্ততার উপরই প্রযোজ্য হবে; যেমন– বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর ফাসেদ বিবাহ দ্বারাও কিছু কিছু উদ্দেশ্য হাসিল হয়; যেমন– নসব সাব্যস্ত হওয়া, মহর ওয়াজিব হওয়া এবং ইদ্দত পালন সহবাসের অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে, আর আলোচ্য নীতি অনুযায়ী শপথের মাসআলাটি [সুনানে আবূ হানীফার মতে] গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ الخ : মতনের মধ্যে إِشَارَة ও أَمَة -এর قَيْد টি قَيْد تَنَافِيْ। কারণ, দাসীর যেই হুকুম স্বাধীন নারীরও সেই হুকুম। এমনিভাবে নির্ধারিতের যেই হুকুম অনির্ধারিতেরও একই হুকুম।

সুরতে মাসআলা হলো, মনিব তার গোলামকে تَزَوَّجْ هٰذِهِ الْأَمَةَ বাক্য দ্বারা বিবাহের অনুমতি দিল। গোলাম ঐ দাসীকে অশুদ্ধ বিবাহ করল এবং তার সাথে সহবাসও করল। ইমাম আযমের মতে, মহর আদায় করার জন্য ঐ গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে, মহরের জন্য গোলামকে বিক্রি করা যাবে না; বরং আজাদ হওয়ার পর গোলাম থেকে মহর উসুল করা হবে। মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইমাম সাহেবের মতে বিবাহের অনুমতি বৈধ ও অবৈধ উভয় বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাহেবাইনের মতে শুধু বৈধ বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে, অবৈধ বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ইমাম সাহেবের মতে, অশুদ্ধ বিবাহ যেহেতু মনিবের অনুমতিতে হয়েছে, তাই মহর মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে এবং গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। আর সাহেবাইনের মতে অশুদ্ধ বিবাহ যেহেতু মনিবের অনুমতিতে হয়নি, তাই মহরও মনিবের দায়িত্বে প্রকাশ পাবে না; বরং গোলাম আজাদ হওয়ার পর তার থেকে মহর উসুল করা হবে।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো সতীত্ব ও সুচিতা অর্জন করা এবং মনকে হারাম কাজ থেকে রক্ষা করা। আর এ উদ্দেশ্য বৈধ বিবাহ দ্বারা অর্জন হয়। কেননা, অবৈধ বিবাহের সময় সহবাস করা হারাম। তাই মনিবের পক্ষ থেকে বিবাহের অনুমতি বৈধ বিবাহকে শামিল করবে; অবৈধ বিবাহকে নয়। এ কারণে কেউ যদি শপথ করে যে, বিবাহ করব না, তাহলে এ শপথ বৈধ বিবাহকে শামিল করবে; অবৈধ বিবাহের কারণে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তবে মনিব যদি তার গোলামকে বিক্রি করার অনুমতি দেয়, তাহলে এ অনুমতি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বেচাকেনা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, কোনো কোনো উদ্দেশ্য অশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাও অর্জন হয়। যেমন– ব্যবহারের মালিক হওয়া, আজাদ করা, হেবা করা ইত্যাদি।

ইমাম আযমের দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, 'বিবাহ কর' শব্দটি নিঃশর্ত; কায়দা আছে, যখন কোনো জিনিস নিঃশর্তভাবে বলা হয়, তখন তা নিঃশর্ততার উপরই প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এ নিঃশর্ত শব্দটিকেও তার নিঃশর্ততার উপর প্রযোজ্য করা হবে এবং তার হুকুম বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেমনিভাবে বিক্রির নির্দেশ বৈধ ও অবৈধ সকল বিক্রিকে শামিল করে। সাহেবাইনের এ কথা বলা যে, 'অশুদ্ধ বিক্রয় দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য অর্জন হয়' এর জবাবে আমরা বলব যে, অশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাও কিছু কিছু উদ্দেশ্য অর্জন হয়। যেমন– বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে পিতার নসব সাবেত হয়, সহবাসের প্রেক্ষিতে মহর ওয়াজিব হয়। আর যদি সহবাস করা হয়, তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِيْنِ مَمْنُوْعَةٌ الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, আমরা এ কথা মানি না যে, কেউ যদি বিবাহ না করার শপথ করে, তাহলে তার এ শপথ বৈধ বিবাহকে শামিল করে, অবৈধ বিবাহকে শামিল করে না; বরং বিশুদ্ধ মত হলো, এ শপথ উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমনিভাবে বৈধ বিবাহ দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হয় তেমনিভাবে অবৈধ বিবাহ দ্বারাও শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি কিছু সময়ের জন্য আমরা মেনেও নেই যে, এ শপথ বৈধ বিবাহকে শামিল করে, অবৈধ বিবাহকে শামিল করে না, তাহলে ইমাম আযমের পক্ষ থেকে জবাব এই হবে যে, বিবাহকে শপথের উপর কিয়াস করা সঠিক নয়। কেননা, শপথের ভিত্তি হলো প্রচলনের উপর, পক্ষান্তরে বিবাহ-এর ভিত্তি প্রচলনের উপর নয়, তাই এ কিয়াসও সঠিক নয়।

উভয় দলের দলিলগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে এভাবেও বলা যায় যে, বিক্রয়ের অনুমতি দ্বারা সকলের মতে বৈধ বিক্রয় ও অবৈধ বিক্রয় উভয়টি শামিল। আর বিবাহের উকিল দ্বারা সকলের মতে বৈধ বিবাহ শামিল হবে; অবৈধ বিবাহ শামিল হবে না। সুতরাং সাহেবাইন (র.) বিবাহের অনুমতিকে বিবাহের উকিল বানানোর উপর কিয়াস করেছেন, আর ইমাম সাহেব (র.) বিবাহের হুকুমকে বিক্রয়ের হুকুমের উপর কিয়াস করেছেন।

وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُوْنًا مَاذُوْنًا لَهُ اِمْرَأَةً جَازَ وَالْمَرْأَةُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِىْ مَهْرِهَا وَمَعْنَاهُ اِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَ وَجْهُهُ اَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوْلٰى مِلْكُهُ الرَّقَبَةَ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِىْ حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْاِبْطَالِ مَقْصُوْدًا اِلَّا اَنَّهُ اِذَا صَحَّ النِّكَاحُ وَجَبَ الدَّيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ فَشَابَهُ دَيْنَ الْاِسْتِهْلَاكِ وَصَارَ كَالْمَرِيْضِ الْمَدْيُوْنِ اِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَبِمَهْرِ مِثْلِهَا اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আপন গোলামকে কোনো মহিলার সাথে বিবাহ দিল, যে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত, ঋণগ্রস্ত তার বিবাহ দান জায়েজ হবে। আর স্ত্রী মহর আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের সম অধিকারী হবে। অর্থাৎ, যদি মহরে মিছিলের উপর বিবাহ হয়ে থাকে। আর এটা এজন্য যে, মনিবের অভিভাবকত্বের কারণ হলো তার সত্তার মালিকানার অধিকারী হওয়া। বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আর বিবাহ উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাওনাদারদের হক নষ্ট করার সাথে যুক্ত নয়। তবে বিবাহ যখন শুদ্ধ হলো, তখন এমন একটি কারণে ঋণ সাব্যস্ত হলো, যা রদ করার উপায় নেই। সুতরাং নষ্ট করার কারণে যে ঋণ সাব্যস্ত হয় আলোচ্য মহর তার সমতুল্য হলো এবং ঋণগ্রস্ত অসুস্থ ব্যক্তির কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করার মতো হলো। সুতরাং সে তার মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে পাওনাদারদের সমান অংশীদার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَدْيُوْنًا مَاذُوْنًا الخ : সুরতে মাসআলা হলো, মনিব তার ঋণগ্রস্ত, ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে কোনো মহিলার সাথে মহরে মিছিলের বিনিময়ে বিবাহ দিল, তাহলে এ বিবাহ জায়েজ এবং স্ত্রী স্বীয় মহর আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের সম অধিকারী হবে। যেমন– গোলাম দু হাজার টাকায় বিক্রি হলো। পাওনাদার তিনজন, যার মধ্যে প্রত্যেকের পাওনা হলো এক হাজার টাকা এবং চতুর্থ নম্বরে স্ত্রী, তার মহরও এক হাজার টাকা। এখন এ চারজনের মধ্য থেকে প্রত্যেকে এক-চতুর্থাংশ মূল্য অর্থাৎ পাঁচশ টাকার হকদার হবে। বাকি অংশ গোলাম আজাদ হওয়ার পর চেয়ে নেবে।

স্ত্রী অন্যান্য পাওনাদারদের সম অধিকারী হবে– এর দলিল হলো, মহরের দাবি অর্থাৎ মনিবের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। আর মনিবের কর্তৃত্ব এজন্য বিদ্যমান যে, তার সবব সাব্যস্ত আছে, আর তা হলো গোলামের গ্রীবার মালিক হওয়া। সুতরাং যখন মনিব তার বিবাহ দিল তখন যেন ঐ গোলামের উপর মহর আবশ্যক করে দিল। তাই মহর মনিবের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে।

قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ لَا يُلَاقِىْ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, মনিব ঋণগ্রস্ত গোলামের বিবাহ দিয়ে পাওনাদারদের হককে বাতিল করে দিল। অথচ অন্যের হক বাতিল করা জায়েজ নেই। তাই স্ত্রী অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে সমান সমান শরিক না হওয়া উচিত?

উত্তর: এর উত্তর হলো, বিবাহ পাওনাদারদের হুকুমের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত নয় যে, তাদের হুককে বাতিল করে দেবে। কারণ, বিবাহের অবস্থান হলো মানবিকতার উপর। আর পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হলো মালিকানার সাথে। বেশির থেকে বেশি এ কথা বলা যায় যে, পাওনাদারদের হক বিনা ইচ্ছায় বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এটি অগ্রহণযোগ্য।

দলিলের সারাংশ হলো, যখন দাবি সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন প্রতিবন্ধক তথা স্বেচ্ছায় অন্যের হক বাতিল করাও দূর হয়ে গেছে, তাই হুকুম সাবেত হয়ে যাবে। মোদ্দাকথা, যখন বিবাহ সহীহ হয়ে গেল, তখন মহরের ঋণ এমন কারণে ওয়াজিব হলো যে, তাকে রদ করা যায় না, সুতরাং এ মহরের ঋণ اِسْتِهْلَاكْ -এর ঋণের অনুরূপ হয়ে গেল। অর্থাৎ, ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত গোলাম কোনো ব্যক্তির মাল হালাক করে দিল, তখন মালের মালিক পাওনাদারদের সাথে বরাবর শরিক হবে। এমনিভাবে স্ত্রীও তার মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে পাওনাদারদের বরাবর হকদার হবে। আর এ ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত গোলাম ঐ ঋণগ্রস্ত অসুস্থ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল, যে অসুস্থ অবস্থায় কোনো মহিলাকে বিবাহ করল। সুতরাং যেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির স্ত্রী নিজের মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে পাওনাদারদের সঙ্গে বরাবর শরিক হবে, তেমনিভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত গোলামের স্ত্রীও পাওনাদারদের সঙ্গে তার মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে শরিক হবে।

وَمَنْ زَوَّجَ اَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلٰكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلٰى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتٰى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئْتَهَا لِاَنَّ حَقَّ الْمَوْلٰى فِى الْاِسْتِخْدَامِ بَاقٍ وَالتَّبْوِئَةُ اِبْطَالٌ لَهُ فَاِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى وَاِلَّا فَلَا لِاَنَّ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الْاِحْتِبَاسَ وَلَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّبْوِئَةِ كَمَا لَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ ـ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَ تَزْوِيْجَ الْمَوْلٰى عَبْدَهُ وَاَمَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ رِضَاهُمَا وَهٰذَا يَرْجِعُ اِلٰى مَذْهَبِنَا اَنَّ لِلْمَوْلٰى اِجْبَارَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَا اِجْبَارَ فِى الْعَبْدِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ النِّكَاحَ مِنْ خَصَائِصِ الْاٰدَمِيَّةِ وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ تَحْتَ مِلْكِ الْمَوْلٰى مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَالٌ فَلَا يَمْلِكُ اِنْكَاحَهُ بِخِلَافِ الْاَمَةِ لِاَنَّهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُضْعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيْكَهَا وَلَنَا اَنَّ الْاِنْكَاحَ اِصْلَاحُ مِلْكِهِ لِاَنَّ فِيْهِ تَحْصِيْنَهُ عَنِ الزِّنَاءِ الَّذِىْ هُوَ سَبَبُ الْهَلَاكِ وَالنُّقْصَانِ فَيَمْلِكُهُ اِعْتِبَارًا بِالْاَمَةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ لِاَنَّهُمَا اِلْتَحَقَا بِالْاَحْرَارِ تَصَرُّفًا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি তার দাসীকে বিবাহ দিল, তার জন্য তাকে স্বামীর ঘরে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া জরুরি নয়; বরং সে মনিবেরই খেদমত করবে। আর স্বামীকে বলা হবে যে, যখন তুমি সুযোগ পাবে তখন তার সাথে মিলিত হবে। কেননা, খেদমত গ্রহণের ব্যাপারে মনিবের হক বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বামীর ঘরে অবস্থানে সে হক নষ্ট করা হয়। যদি মনিব তাকে স্বামীর ঘরে তার সঙ্গে অবস্থান করতে দেয়, তাহলে সে খোরপোশ ও অবস্থান পাওয়ার অধিকারী হবে; অন্যথায় নয়। কেননা, খোরপোশ তো হলো [স্বামীর ঘরে] আবদ্ধ থাকার বিনিময়ে। আর যদি মনিব বাঁদিকে [স্বামীর সঙ্গে] কোনো গৃহে থাকতে দেয় এবং তাকে পুনরায় নিজের খেদমতে ফিরিয়ে আনা সমীচীন মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারে। কেননা, মালিকানা বিদ্যমান থাকার কারণে তার খেদমত গ্রহণের হক বহাল রয়েছে। সুতরাং স্বামীর ঘরে পাঠানোর কারণে তা রহিত হবে না। যেমন– বিবাহের কারণে রহিত হয় না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, [জামিউস সাগীর কিতাবে] দাস ও দাসীকে মনিবের বিবাহ দানের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের সম্মতির কথা বলেননি। এটা আমাদের মাযহাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, মনিব দাস ও দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দাসকে বাধ্য করার অধিকার নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে। কেননা, বিবাহ মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর গোলাম মনিবের মালিকানার অধিকারভুক্ত হয়েছেন মাল হিসেবে [মানুষ হিসেবে নয়], সুতরাং সে তাকে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ দানের অধিকারী হবে না। দাসীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে দাসীর সম্ভোগ-অঙ্গের অধিকারী। সুতরাং সে অন্যকে এটির মালিক বানাতে পারবে। আমাদের দলিল হলো, বিবাহ দানের উদ্দেশ্য হলো তার মালিকানাধীন জিনিসের হেফাজত ও সংশোধন। কেননা, এতে দাসকে জেনা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়, যা ধ্বংস ও ক্ষতি হওয়ার কারণ। সুতরাং দাসীর উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, মনিব তাকে বিবাহ দানের অধিকারী হবে। মুকাতাব দাস ও দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ব্যবহারের অধিকারের দিক থেকে তারা স্বাধীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সম্মতির শর্ত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ زَوَّجَ اَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الخ : اَلتَّبْوِيَةُ -এর অর্থ হলো– দাসীকে স্বামীর নিকট অর্পণ করা এবং মনিবের দাসী থেকে খেদমত গ্রহণ ছেড়ে দেওয়া। যদি দাসী স্বামীর নিকট আসা-যাওয়া করে এবং মনিবেরও খেদমত করতে থাকে, তাহলে এটাকে اَلتَّبْوِيَةُ বলা হবে না।

সূরতে মাসআলা হলো, মনিব তার দাসীকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিল, তখন মনিবের উপর স্বামীর ঘরে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া এবং নিজের হক ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং দাসী মনিবের খেদমত করতে থাকবে এবং স্বামীকে বলা হবে, যখনই তোমার সুযোগ হবে দাসীর সাথে মিলিত হবে। দলিল হলো, খেদমত গ্রহণের ব্যাপারে মনিবের হক বিদ্যমান রয়েছে। বিবাহের অনুমতি প্রদান দ্বারা মনিবের হক খতম হয় না। আর স্বামীর ঘরে দাসীর বসবাস দ্বারা মনিবের হক বাতিল করতে হয়। সুতরাং এ অর্পণের সূরতে উপরের হককে নীচের হকের কারণে বাতিল করা আবশ্যক হয়। আর এমনটি সহীহ নয়। তাই মনিবের উপর অর্পণ (تَبْوِيَة) করাও জরুরি নয়। তবে মনিব যদি দাসীকে স্বামীর সাথে কোনো স্থানে আবাদ করে দেয় অর্থাৎ, রাতে পৃথক স্থানে অবস্থান করার অনুমতি দেয়, তাহলে এ সূরতে স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর খোরপোশ ও অবস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মনিব স্বামীর সাথে একাকী থাকার অনুমতি প্রদান না করে, তাহলে স্বামীর উপর খোরপোশ ও অবস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব নয়। দলিল হচ্ছে, খোরপোশ হলো [স্বামীর ঘরে] আবদ্ধ থাকার বিনিময়। তাই মনিব যদি নিজের খেদমতের জন্য রেখে দেয়, তখন খোরপোশ দেওয়া মনিবের উপর ওয়াজিব হবে; স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্বামী নিজের খেদমতের জন্য রেখে দেয়, তাহলে খোরপোশ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে; মনিবের উপর ওয়াজিব হবে না। আর যদি মনিব দাসীকে স্বামীর সাথে অন্য স্থানে রাত কাটাবার অনুমতি দেয়, কিন্তু পরে মনিবের মত হলো যে, সে নিজেও দাসীর খেদমত গ্রহণ করবে, তখন তার অধিকার আছে, পৃথক স্থানে অবস্থানের অনুমতিকে রহিত করা। তখন স্বামী থেকে খোরপোশও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দলিল হলো, মনিবের খেদমত গ্রহণের হক মালিকানা বিদ্যমান থাকার কারণে বহাল রয়েছে। তাই যেমনিভাবে বিবাহ দেওয়ার কারণে এ হক রহিত হয় না তেমনিভাবে অর্পণ করা (تَبْوِيَة) দ্বারাও রহিত হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে এ কথা বলেছেন যে, মনিব তার গোলাম বা দাসীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু তাদের সম্মতির কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটি হলো আমাদের মাযহাব যে, মনিব তার গোলাম বা দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে। বাধ্য করার অর্থ হলো, মনিব যদি তাদের সম্মতি ছাড়াও বিবাহ দেয়, তাহলেও বিবাহ কার্যকর হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দাসকে বাধ্য করার অধিকার নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও একটি বর্ণনা, যাকে ইমাম তাহাবী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন, যদিও এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল (شاذ)। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের সারসংক্ষেপ হলো, যদি মনিব গোলামের সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেয়, তাহলে তা কার্যকর হবে না। তবে দাসীর বিবাহ তার সম্মতি ছাড়া সকলের মতে জায়েজ এবং কার্যকর।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, বিবাহ-শাদি হলো মানবীয় বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষত্ব। গোলাম মনিবের অধীন হয়েছেন মাল হিসেবে; মানুষ হিসেবে নয়। তাই সে তার বিবাহের মালিক হবে না। অর্থাৎ, বিবাহ যে জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে মনিব তার মালিক নয়, তাই মনিবের বিবাহ দেওয়া দ্বারা এমন জিনিসের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা হবে যার সে মালিক নয়। সুতরাং মনিবের দেওয়া বিবাহ এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেমনটি অপরিচিতের বিবাহ [বিলুপ্ত হয়ে যায়]। দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মনিব দাসীর সম্ভোগ-অঙ্গের মালিক, তাই তার সম্মতি ছাড়া অন্যকেও মালিক বানাতে পারবে। কেননা, এতে নিজের মালিকানায়ই হস্তক্ষেপ করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, গোলামের বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া অনুপকারী। কেননা, গোলামের তাৎক্ষণিকভাবে তালাক প্রয়োগের অধিকার আছে। তাই তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেওয়া দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। আমাদের দলিল হলো, বিবাহ করা মানে নিজের মালিকানাধীন জিনিসের সংশোধন করা। কেননা, বিবাহ দ্বারা গোলামকে জেনা থেকে রক্ষা করা হয়, যা ধ্বংস ও ক্ষতি হওয়ার কারণ। অর্থাৎ, যখন হদ জারি করা হবে, তখন কখনো হদ দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায় আবার কখনো ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। সুতরাং প্রথম সূরতে মাল ধ্বংস করা হয়, আর দ্বিতীয় সূরতে মালকে হ্রাস করা হয়। তাই মনিব গোলামের অনুমতি ছাড়াও বিবাহ দানের অধিকার রাখে, দাসীর উপর কিয়াস করে এবং উভয়টির মাঝে কর্তৃত্বের সবব বা কারণ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, গ্রীবার মালিকানা হাসিল হওয়া এবং নিজের মালিকানাকে জেনা থেকে সংরক্ষণ করা যা ধ্বংস এবং ক্ষতির কারণ। মুকাতাব দাস-দাসীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, মনিব তাদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারে না। দলিল হলো, তারা উভয়ে কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের মালিকানা হিসেবে স্বাধীনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি মনিবকে তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দানের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তখন তাদের উভয়ের ব্যবহারের অধিকারকে খর্ব করা আবশ্যক হবে, যা জায়েজ নেই। এজন্য মুকাতাব দাস-দাসীর সম্মতিকে শর্ত করা হয়েছে।

قَالَ وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَوْلَاهَا اِعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا وَهٰذَا لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَهُ أَنَّهُ مَنَعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيُجَازَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ وَالْقَتْلُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ إِتْلَافًا حَتّٰى وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ فَكَذَا فِي حَقِّ الْمَهْرِ .

অনুবাদ : মূল গ্রন্থকার বলেন, যে মনিব তার দাসীকে বিবাহ দেওয়ার পর স্বামীর সহবাসের পূর্বেই তাকে হত্যা করে, তাহলে এ দাসীর জন্য কোনো মহর নেই। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন দাসীর স্বাভাবিক মৃত্যুর উপর কিয়াস করে বলেন, মনিবের অনুকূলে স্বামীর উপর মহর সাব্যস্ত হবে। আর তা এজন্য যে, নিহত ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময়েই মারা গিয়েছে। সুতরাং অন্য ব্যক্তি তাকে হত্যা করার মতোই হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অর্পণ করার পূর্বেই বিনিময়কৃত জিনিসটিকে [সম্ভোগ-অঙ্গকে] মনিব আটকে দিয়েছে। সুতরাং বিনিময় [মহর]-কে আটকে দেওয়ার মাধ্যমে তার শোধ গ্রহণ করা হবে। যেমন হুকুম স্বাধীন নারী যখন মুরতাদ হয়ে যায়। আর দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে হত্যাকে বিনষ্ট করা ধরা হয়েছে। এজন্যই তো কিসাস এবং দিয়ত ওয়াজিব হয়। সুতরাং মহরের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا الخ : সুরতে মাসআলা হলো, মনিব স্বীয় দাসীকে কারো সাথে বিবাহ দিল, অতঃপর স্বামীর সহবাসের পূর্বেই মনিব দাসীকে হত্যা করে ফেলল। এ সুরতে ইমাম আযমের মতে দাসীর জন্য স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, স্বামীর উপর তার মনিবের অনুকূলে মহর ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) এ সুরতকে স্বাভাবিক মৃত্যুর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, যদি এ দাসী সহবাসের পূর্বে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করত, তাহলে সকলের মতে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। তাই উপরে বর্ণিত সুরতেও স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর ঐ কিয়াসের কারণ হলো, যাকে হত্যা করা হয়েছে সে আল্লাহর নিকট নির্ধারিত সময়েই মারা গিয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এটিই আকিদা-বিশ্বাস। সুতরাং মনিব তার দাসীকে হত্যা করা এমন যেমন দাসী স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছে।

সাহেবাইন (র.) দ্বিতীয় কিয়াস এটি বর্ণনা করেছেন যে, যেমনিভাবে দাসীকে যদি অন্য কেউ হত্যা করত, তাহলে সকলের মতে মহর বিলুপ্ত হতো না; বরং স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হতো। এমনিভাবে উপরিউক্ত মাসআলায়ও স্বামীর দাসীর মনিবের জন্য মহর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আযমের দলিল হলো, অর্পণ করার পূর্বে মনিব বিনিময়কৃত জিনিসটিকে তথা সম্ভোগ-অঙ্গকে আটকে রেখেছে, তাই বিনিময় তথা মহরকে আটকে রেখে মনিবকে বিনিময় প্রদান করা হবে। আর এ মাসআলাটি এমন হলো যেমন কোনো স্বাধীন নারী মুরতাদ হয়ে বিনিময়কৃত জিনিস অর্থাৎ, সম্ভোগ-অঙ্গকে আটকে রাখল। তাই এ মুরতাদ্দার [মুরতাদ নারী] বিনিময় তথা মহরকে আটক রাখা হবে। এমনিভাবে উপরিউক্ত মাসআলায়ও।

قَوْلُهُ وَالْقَتْلُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো, হত্যা দ্বারা মূলত নির্ধারিত সময়েই আল্লাহর নিকট মৃত্যুবরণ করা হয়, কিন্তু দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে হত্যাকে 'বিনষ্ট করা' গণ্য করা হয়েছে। তাইতো স্বেচ্ছায় হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ও অনিচ্ছায় হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হয়। তবে মনিবের উপর কিসাস ও দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কেননা, যদি মনিবের উপর কিসাস কিংবা দিয়তকে ওয়াজিব করা হয়, তখন এ কিসাস বা দিয়ত তারই জন্য ওয়াজিব হবে। আর এটি অসম্ভব। তবে মনিবের গুনাহ হবে। আর যদি অনিচ্ছায় হত্যা (القتل الخطأ) হয় তবে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। সুতরাং যেমনিভাবে হত্যাকে কিসাস এবং দিয়তের ক্ষেত্রে 'নষ্ট করা' গণ্য করা হয়েছে তেমনিভাবে মহরের ক্ষেত্রেও নষ্ট করা গণ্য করা হয়েছে। যেন মনিব অর্পণ করার পূর্বেই বিনিময়কৃত জিনিসটিকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাই তার বিনিময় অর্থাৎ মহরও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَهَا الْمَهْرُ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالرِّدَّةِ وَبِقَتْلِ الْمَوْلٰى اَمَتَهُ وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَنَا اَنَّ جِنَايَةَ الْمَرْءِ عَلٰى نَفْسِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَابَهَ مَوْتَهَا حَتْفَ اَنْفِهَا بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَوْلٰى اَمَتَهُ لِاَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا حَتّٰى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ ۔

অনুবাদ : স্বাধীন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর সহবাসের পূর্বে আত্মহত্যা করে, তবে তার মহর আদায় করতে হবে। ইমাম যুফার (র.) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মুরতাদ হওয়ার উপর এবং মনিব তার দাসীকে হত্যা করার উপর কিয়াস করেন। আর [উভয়ের মাঝে] সে ব্যাপারে মিল রয়েছে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আমাদের দলিল হলো, দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে আত্মঅপরাধ ধর্তব্য নয়। সুতরাং এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর সমপর্যায়ের হবে। আর মনিব তার দাসীকে হত্যা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, দুনিয়ার বিধানে তা ধর্তব্য। এ কারণেই মনিবের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا الخ : সুরতে মাসআলা হলো, স্বাধীন স্ত্রী সহবাসের পূর্বে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে আইম্মায়ে ছালাছার মতে ঐ স্ত্রীর জন্য মহর ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও ইমাম যুফারের সাথে রয়েছেন। ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলার হুকুমকে মুরতাদ হওয়ার হুকুমের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, যেমনিভাবে স্বাধীন স্ত্রী যদি সহবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে মহর বিলুপ্ত হয়ে যায় তেমনিভাবে এ মাসআলায়ও মহর বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলার হুকুমকে মনিব তার দাসীকে হত্যা করার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, মনিব যদি তার দাসীকে স্বামীর সহবাসের পূর্বে হত্যা করে, তাহলে মহর বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে উপরিউক্ত মাসআলায়ও মহর বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর উভয়ের মাঝে মিল রয়েছে। অর্থাৎ, مَقِيْس [স্বাধীন স্ত্রী আত্মহত্যা করা] আর مَقِيْس عَلَيْه [স্বাধীন স্ত্রীর সহবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যাওয়া] এবং মনিব তার দাসীকে সহবাসের পূর্বে হত্যা করার মাঝে অর্পণ করার পূর্বে বিনিময়কৃত বস্তু তথা সম্ভোগ-অঙ্গকে আটক রাখা। উল্লেখ্য যে, ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মনিব তার দাসীকে হত্যা করার উপর কিয়াস করা ইমাম আযমের মতানুযায়ী সহীহ হবে। কেননা, সাহেবাইন ঐ সুরতে মহর বিলুপ্ত হওয়ার প্রবক্তা নন।

আমাদের দলিল হলো, মানুষ নিজের উপর অপরাধ করা দুনিয়ার বিধানের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। যদিও আখিরাতে পাকড়াও হবে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর সদৃশ হয়ে গেল। আর স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মহর বিলুপ্ত হয় না; বরং স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে উপরিউক্ত সুরতেও স্ত্রীর জন্য মহর ওয়াজিব হবে। স্বাধীন স্ত্রীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, দুনিয়ার বিধানে মুরতাদ হওয়া ধর্তব্য। তাই তো স্বাধীন স্ত্রীকে মুরতাদ হওয়ার কারণে আটক করা হয়, শাস্তি দেওয়া হয়, তার বিবাহ স্থগিত হয়ে যায়, তাই মুরতাদ হওয়ার কারণে মহরও বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনিব তার দাসীকে হত্যা করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, দুনিয়ার বিধানে এটাও ধর্তব্য। তাই তো ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে মনিবের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি দাসীর উপর ঋণ থাকে, তবে মনিবের উপর তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। সুতরাং এ দুই সুরতের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ أَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْوَطْئَ حَقُّهَا حَتَّى ثَبَتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ وَفِي الْعَزْلِ تَنْقِيصُ حَقِّهَا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَجْه ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَبِهٰذَا فَارَقَ الْحُرَّةَ . وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَرِيْرَةَ حِيْنَ أُعْتِقَتْ مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ فَالتَّعْلِيْلُ بِمِلْكِ الْبُضْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهُوَ مَحْجُوْجٌ بِهِ وَلِأَنَّهُ يَزْدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِتْقِ فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ .

অনুবাদ : কেউ যদি দাসীকে বিবাহ করে, তাহলে আযল করার ক্ষেত্রে অনুমতির বিষয়টি মনিবের সাথে সম্পৃক্ত এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, অনুমতির বিষয়টি দাসীর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, সহবাস হলো দাসীর হক। তাইতো সহবাস দাবি করার অধিকার তার জন্য সাব্যস্ত। আর আযলের মাধ্যমে তার হক নষ্ট করা হয়। সুতরাং তার সম্মতির শর্ত আরোপিত হবে; যেমন– স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে। তবে নিজের মালিকানাধীন দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, [মনিবের নিকট] সহবাস দাবি করার অধিকার দাসীর নেই। সুতরাং তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না। জাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল হলো, 'আযল' সন্তান লাভের উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে। আর তা হলো মনিবের হক। সুতরাং তার সম্মতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। আর এর দ্বারাই দাসীর বিষয়টি স্বাধীন স্ত্রীলোক থেকে ভিন্ন হয়ে গেল। যদি দাসী তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে, অতঃপর সে স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে তার জন্য এখতিয়ার হাসিল হবে– তার স্বামী স্বাধীন হোক কিংবা দাস হোক। কেননা, স্বাধীনতা লাভ করার পর হযরত বারীরা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন– مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ [তুমি তোমার সম্ভোগ-অঙ্গের অধিকারিণী হয়েছ, সুতরাং তুমি এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পার]। এখানে সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানাকে নিঃশর্তরূপে ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং [স্বামী স্বাধীন বা দাস হওয়া] উভয় অবস্থাকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) আমাদের সাথে প্রথম স্বামী স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন নিঃশর্ত হাদীস দ্বারা তিনি দলিল পেশ করেন। কেননা, স্বাধীনতা লাভের পর তার উপর স্বামীর মালিকানা বৃদ্ধি পায় ফলে স্বাধীনতার পর স্বামী তিন তালাকের অধিকারী হয়। সুতরাং অতিরিক্ত মালিকানা রোধ করার জন্য মূল আকদকে রহিত করার অধিকার সে লাভ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذْنُ إِلَخْ : আযল বলা হয় সহবাস করার সময় বীর্য বাইরে বের করা, যাতে গর্ভসঞ্চার না হয়। সাধারণ আলেমগণের মতে আযল জায়েজ, তবে সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতের মতে তা মাকরূহ। জায়েজ হওয়ার দলিল হলো–

১. سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 'হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই।'

২. বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে– كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ 'কুরআন নাজিলকালেও আমরা আযল করতাম।'

৩. মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে–

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا .

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আযল করতাম– এর সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌঁছার পর তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।' এগুলো ছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো দ্বারা আযল জায়েজ বুঝা যায়। যারা আযল করাকে নাজায়েজ [মাকরূহ] বলেন তাদের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.) -এর ঐ হাদীস যা জুযামা বিনতে ওহাব থেকে বর্ণিত আছে। মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নে প্রদত্ত হলো– فَسَأَلُوْا عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ 'তারা আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, এটি হলো গুপ্তহত্যা।' অন্য হাদীসে এসেছে–

عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنِ الْعَزْلِ .

'হযরত ওমর ও ওসমান উভয়ে আযল থেকে বারণ করতেন।'

অন্য এক হাদীসে আযলকে ছোট হত্যাযজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূলত আযল তিনভাগে বিভক্ত–

১. স্বীয় দাসীর সাথে আযল। তার সাথে আযল করার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।

২. স্বাধীন স্ত্রীর সাথে আযল। তার সাথে আযল করার জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন আছে। এ দুই সুরতে সকলে একমত।

৩. বিবাহিত দাসীর সাথে আযল। এ সুরতের মধ্যে মতবিরোধ আছে, যা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তাইতো গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আযল করার জন্য অনুমতি প্রদানের অধিকার মনিবের। সাহেবাইনের মতে, আযলের অনুমতি প্রদানের অধিকার বিবাহিতা দাসীর।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে, সহবাস হলো বিবাহিত দাসীর হক এবং তার সহবাস দাবি করার অধিকার রয়েছে, তাই তার অনুমতি ছাড়া আযল কিভাবে জায়েজ হবে? আযল করার ক্ষেত্রে বিবাহিতা দাসীর হককে হ্রাস করা হয়। এজন্য তার অনুমতি দরকার হবে। যেমন– স্বাধীন নারীর অনুমতি সকলের মতে জরুরি। কেননা, স্বাধীন স্ত্রীরও স্বামী থেকে সহবাস দাবি করার অধিকার আছে। মালিকানাধীন দাসীর বিষয়টি এর বিপরীত। তাই তার মনিবের জন্য আযল করার অধিকার আছে– মালিকানাধীন দাসী রাজি হোক বা না হোক। কেননা, তার সহবাস দাবি করার অধিকার নেই, তাই তার সন্তুষ্টিও অগ্রহণযোগ্য হবে।

জাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ হলো, আযল দ্বারা সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হয়ে যায় আর সন্তান হলো মনিবের হক, তাই মনিবের সন্তুষ্টিই গ্রহণযোগ্য হবে। এ দলিল দ্বারা বিবাহিতা দাসী ও বিবাহিতা স্বাধীন নারীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল যে, বিবাহিতা দাসীর সন্তান হলো মনিবের হক। আর বিবাহিতা স্বাধীন নারীর সন্তান মনিবের হক নয়। সুতরাং যখন পার্থক্য বিদ্যমান, তাই কিয়াসও বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الخ : সুরতে মাসআলা হলো, দাসী তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করল। অতঃপর সে স্বাধীনতা লাভ করল। এখন ঐ দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ারের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মাযহাব হলো, স্বাধীনতা লাভের সময় তার স্বামী স্বাধীন থাকুক বা দাস থাকুক; উভয় সুরতে তার জন্য স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে। সে বিবাহ বহাল রাখুক বা রহিত করে দিক। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বাধীনতা লাভের সময় স্বামী যদি স্বাধীন থাকে, তবে দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে না। আর যদি [স্বামী] দাস থাকে, তবে এখতিয়ার হাসিল হবে। মোদ্দাকথা, স্বামী যদি দাস হয়, তবে সকলের মতে আজাদপ্রাপ্ত দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর স্বাধীনতা লাভের সময় স্বাধীন থাকে, তবে এতে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, এ সুরতেও দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ সুরতে দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে না।

হানাফীগণের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) যখন স্বীয় দাসী হযরত বারীরাকে আজাদ করে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বারীরাকে বললেন– مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখতিয়ার সাব্যস্ত হওয়ার ইল্লত বা কারণ সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানাকে নিরূপণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই যে, বারীরার স্বামী স্বাধীন না গোলাম। তাই তার এ নিঃশর্ততার কারণে উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থাৎ, স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক উভয় সুরতে আজাদ মহিলার স্বাধীনতার এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে, এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে। তবে এ ব্যাপারে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা রয়েছে যে, যে সময় হযরত বারীরাকে সময় দেওয়া হয়েছিল, তখন তার স্বামী গোলাম ছিল নাকি স্বাধীন ছিল? মোটকথা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর থেকে হযরত বারীরার আজাদ হওয়ার ঘটনা তিনজন তাবেয়ী রেওয়ায়েত করেছেন। একজন হলেন হযরত আসওয়াদ, যার সকল রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি [বারীরার স্বামী] স্বাধীন ছিলেন। দ্বিতীয়জন হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের, যার এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোলাম ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি স্বাধীন ছিলেন। অথচ উভয় রেওয়ায়েত সহীহ। তৃতীয়জন হযরত কাসিম, যার সম্বন্ধে এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি স্বাধীন ছিলেন, আর অন্য রেওয়ায়েতে সংশয় রয়েছে। অথচ হাদীস দুটির সনদই সহীহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, হযরত বারীরার স্বামী একজন হাবশী গোলাম ছিলেন, যার সম্বন্ধে নাম ছিল মুগীস। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বারীরাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। মোদ্দাকথা, যখন সবগুলো রেওয়ায়েত পরস্পর বিরোধী, তাই রেওয়ায়েত ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ -এর উপর আমল করা হবে।

দ্বিতীয়ত আকলী দলিল হলো, দাসীর স্বাধীনতা লাভের সময় তার উপর মালিকানা বৃদ্ধি পায়। কেননা, দাসীর স্বাধীন হওয়ার পূর্বে স্বামী দুই তালাকের মালিক ছিল, আর স্বাধীন হওয়ার পর তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। তাই আজাদপ্রাপ্ত নারীকে অতিরিক্ত মালিকানা রোধ করার জন্য মূল আকদকে রহিত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: তবে এর উপর প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তালাকের সংখ্যার ক্ষেত্রে পুরুষকে বিবেচনা করা হয়, স্ত্রীকে বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং যখন দাসীর আজাদ হওয়ার সময় স্বামী আজাদ ছিল, তখন দাসীর আজাদ হওয়ার দ্বারা আজাদকৃত দাসীর উপর মালিকানা বৃদ্ধি পায়নি। কারণ, স্বামী পূর্ব থেকেই তিন তালাকের মালিক ছিল?

উত্তর : তালাকের সংখ্যার ক্ষেত্রে স্ত্রীদের বিবেচনা করা সুদৃঢ় দলিল দ্বারা সাবেত আছে। যেমনটি তালাক অধ্যায়ে আসবে। তাই তা নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ নেই।

وَكَذٰلِكَ الْمُكَاتَبَةُ يَعْنِي اِذَا تَزَوَّجَتْ بِاِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عُتِقَتْ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا خِيَارَ لَهَا لِاَنَّ الْعَقْدَ نَفَذَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَكَانَ الْمَهْرُ لَهَا فَلَا مَعْنٰى لِاِثْبَاتِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْاَمَةِ لِاَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَلَنَا اَنَّ الْعِلَّةَ اِزْدِيَادُ الْمِلْكِ وَقَدْ وَجَدْنَاهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِاَنَّ عِدَّتَهَا قُرْآنِ وَ طَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ـ

অনুবাদ : মুকাতাবা নারীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ, যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে অতঃপর স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা, বিবাহের আকদ তার সম্মতিক্রমেই তার উপর কার্যকরী হয়েছে এবং সে-ই মহর পাবে। সুতরাং তার জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত করার কোনো মানে নেই। দাসীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, [বিবাহের ক্ষেত্রে] তার সম্মতি ধর্তব্য নয়। আমাদের দলিল হলো, স্বাধীনতার পর মালিকানা বৃদ্ধিই হলো এখতিয়ারের কারণ। আর তা মুকাতাবা নারীর ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি। কেননা, মুকাতাবা নারীর ইদ্দত ছিল দুটি হায়েজ এবং তার তালাকের সংখ্যা ছিল দুটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْمُكَاتَبَةُ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, যদি মুকাতাবা নারী তার মনিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করে তারপর বদলে কিতাবাত আদায় করে স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে আইম্মায়ে ছালাছার মতে ঐ আজাদকৃত মুকাতাবা নারীর স্বাধীনতার এখতিয়ার অর্জন হবে। তার স্বামী আজাদ হোক বা গোলাম হোক। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার ইচ্ছাধিকার সাবেত হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, আজাদকৃত দাসীর ইচ্ছাধিকার দুই কারণে ছিল– ১. দাসীর আকদে নিকাহ তার অনুমতি ছাড়া কার্যকরী ছিল। ২. তার মহর তার মনিবের জন্য ছিল। মুকাতাবা নারীর এ উভয়টির কোনোটিই বিদ্যমান নেই। কেননা, মুকাতাবা নারীর আকদে নিকাহ তার অনুমতি ছাড়া কার্যকরী ছিল না এবং মহরও তার জন্যই হবে; তার মনিবের জন্য হবে না। তাই মুকাতাবা নারীর স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, যদি মালিকানা দাসীর সন্তুষ্টিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যও স্বাধীনতার ইচ্ছাধিকার না হওয়া উচিত ? এর জবাব হলো, মালিকানা দাসীর সন্তুষ্টির বিবেচনা করা হয়নি। আমাদের দলিল হলো, স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার এখতিয়ারের দ্বারা আজাদকৃত দাসীর উপর তালাকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। আর এ ইল্লত মুকাতাবা নারীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কেননা, মুকাতাবা নারীর ইদ্দত স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দুই হায়েজ ছিল আর আজাদ হওয়ার পর তিন হায়েজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তার স্বামী দুই তালাকের মালিক ছিল, আজাদ হওয়ার পর তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। সুতরাং যখন স্বাধীনতার এখতিয়ারের ইল্লত মুকাতাবার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাই মুকাতাবার আজাদ হওয়ার পর তার জন্যও স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে।

وَاِنْ تَزَوَّجَتْ اَمَةٌ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عَتَقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ لِاَنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْعِبَارَةِ وَامْتِنَاعُ النُّفُوْذِ لِحَقِّ الْمَوْلٰى وَقَدْ زَالَ وَلَا خِيَارَ لَهَا لِاَنَّ النُّفُوْذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمِلْكِ كَمَا اِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ . فَاِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ عَلٰى اَلْفٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهْرُ لِلْمَوْلٰى لِاَنَّهٗ اِسْتَوْفٰى مَنَافِعَ مَمْلُوْكَةٍ لِّلْمَوْلٰى وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى اَعْتَقَهَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِاَنَّهٗ اِسْتَوْفٰى مَنَافِعَ مَمْلُوْكَةٍ لَهَا وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ الْاَلْفُ الْمُسَمّٰى لِاَنَّ نَفَاذَ الْعَقْدِ بِالْعِتْقِ اِسْتَنَدَ اِلٰى وَقْتِ وُجُوْدِ الْعَقْدِ فَصَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَ وَجَبَ الْمُسَمّٰى وَلِهٰذَا لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ اٰخَرُ بِالْوَطْءِ فِىْ نِكَاحٍ مَوْقُوْفٍ لِاَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اِتَّحَدَ بِاسْتِنَادِ النَّفَاذِ فَلَا يُوْجِبُ اِلَّا مَهْرًا وَاحِدًا .

অনুবাদ : দাসী যদি তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে অতঃপর স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, দাসী বক্তব্য প্রদানের অধিকারিণী। তবে তার বক্তব্যের কার্যকারিতা রহিত ছিল মনিবের হকের কারণে, আর তা এখন দূর হয়ে গেছে। তবে তার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কেননা, বিবাহ কার্যকর হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের পর। সুতরাং [স্বামীর] মালিকানা বৃদ্ধি সাব্যস্ত হচ্ছে না। স্বাধীনতা লাভের পর নিজেকে বিবাহ দিলে যেমন হতো। যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া এক হাজার দিরহামের উপর বিবাহ বসে অথচ তার মহরে মিছিল হলো একশ দিরহাম। অতঃপর স্বামী তার সাথে সহবাস করল এবং মনিব তাকে আজাদ করে দিল। তাহলে পূর্ণ মহর মনিবের জন্য হবে। কেননা, স্বামী যে ফায়দা হাসিল করেছে তা মনিবের মালিকানাধীন ছিল। আর যদি সহবাসের পূর্বে তাকে আজাদ করে দেয়, তাহলে মহর স্ত্রীর জন্যই সাব্যস্ত হবে। কেননা, স্বামী স্ত্রীর মালিকানাধীন ফায়দা হাসিল করেছে। এখানে মহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত এক হাজার দিরহাম। কেননা, স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে যে বিবাহ কার্যকর হচ্ছে, তা আকদের অস্তিত্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং মহরের নির্ধারণ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত মহর সাব্যস্ত হবে। এজন্যই তো স্থগিত বিবাহের ক্ষেত্রে [যেমন- কোনো ফুযূলী ব্যক্তি বিবাহ দান করল] সহবাস দ্বারা মহর সাব্যস্ত হয় না। কেননা, বিবাহের কার্যকারিতাকে পূর্ববর্তী আকদের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে আকদ অভিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং সে আকদ একটি মহরই ওয়াজিব করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ تَزَوَّجَتْ اَمَةٌ بِغَيْرِ اِذْنِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি জিনিস বর্ণিত হয়েছে– ১. দাসী মনিবের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করেছে তারপর স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাহলে এ বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। ২. ঐ আজাদকৃত দাসীর স্বাধীনতার এখতিয়ার হাসিল হবে না। বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার দলিল হলো, বিবাহের দাবি বিদ্যমান আছে। কেননা, বিবাহের রোকন তথা ইজাব ও কবুল

তার যোগ্য পাত্র থেকে বের হয়েছে। কারণ, দাসী প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়ার কারণে বক্তব্য প্রদানের অধিকারিণী হয়েছে এবং বিবাহের প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেছে। কেননা, বিবাহের কার্যকারিতা মনিবের হকের কারণে রহিত ছিল। আর মনিবের হক আজাদ করে দেওয়ার কারণে দূর হয়ে গেছে। সুতরাং যখন দাবি বিদ্যমান আর প্রতিবন্ধক রহিত, তাই বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে।

এখতিয়ার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, বিবাহ কার্যকরর হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর। তাই আজাদ করে দেওয়ার কারণে মালিকানা বৃদ্ধি সাব্যস্ত হচ্ছে না। সুতরাং যখন এখতিয়ারের ইল্লত পাওয়া যায়নি, তখন ঐ আজাদকৃত দাসীর এখতিয়ারও সাব্যস্ত হবে না। যেমন– আজাদ হওয়ার পর সে যদি নিজে নিজের বিবাহ করে নিত, তাহলে তার এখতিয়ার হাসিল হতো না, ঠিক এখানেও তা-ই হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, দাসী তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল এবং মহর এক হাজার নির্ধারণ করল, অথচ মহরে মিছিল হলো নিছক একশ দিরহাম। অতঃপর স্বামী সহবাস করেছে। এরপর মনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছে, তাহলে পূর্ণ মহর মনিবের জন্য হবে। সূরতে মাসআলায় নির্ধারিত মহর এক হাজার এবং মহরে মিছিল একশ এ কারণে বলা হয়েছে যে, যাতে বুঝা যায়, নির্ধারিত মহর যদি মহরে মিছিল থেকে অধিক হয়ে যায়, তবুও নির্ধারিত মহর মনিবের জন্য হবে। তবে শর্ত হলো সহবাস স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অর্জন করেছে যা মনিবের মালিকানাধীন, তাই বদল তথা মহরও মনিবের জন্যই ওয়াজিব হবে। আর যদি মনিবের আজাদ করার পর স্বামী সহবাস করে। অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পর সহবাস হয়, তাহলে মহর আজাদকৃত দাসীর জন্য সাব্যস্ত হবে। কারণ, এ সুরতে মনিব এমন উপকার লাভ করেছে যা দাসীর মালিকানাধীন। তাই বদল তথা মহরও দাসীর জন্য ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ الْأَلْفُ الْمُسَمّٰى الخ : ইবারতটি দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সহবাসের সুরতে মনিবের জন্য মহরে মিছিলের পরিমাণ ওয়াজিব হওয়া উচিত। আর যা মহরে মিছিল থেকে বেশি হবে তা স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়া হবে। কেননা, পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য হলো মহরে মিছিল। আর সম্ভোগ-অঙ্গ মনিবের মালিকানাধীন। তাই সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্যও মনিবের জন্য হওয়া উচিত। মূল্য থেকে অতিরিক্ত [ওয়াজিব] নয়।

উত্তর : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এর উত্তরে বলেন, মহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এক হাজার নির্ধারিত মহর, মহরে মিছিল নয়। কেননা, দাসীর স্বাধীনতা লাভের কারণে আকদের কার্যকারিতা আকদের সময়ের সাথে যুক্ত হবে। অর্থাৎ, যে সময় বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল সে সময় থেকে কার্যকর হবে। যদিও কার্যকারিতার প্রকাশ স্বাধীনতা লাভের পর হয়েছিল। আর বিবাহ সাব্যস্ত হয়েছিল এক হাজার নির্ধারিত মহরের বিনিময়ে। সুতরাং মহর নির্ধারণ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে। তবে যদি সহবাসের পর স্বাধীনতা লাভ করে থাকে, তাহলে এ মহর মনিবের বলে গণ্য হবে। আর যদি মিলনের পূর্বে স্বাধীন হয়, তাহলে এ মহর দাসীর হবে। এ কারণেই আকদের কার্যকারিতা আকদের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত হবে। স্থগিত বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাসের কারণে দ্বিতীয় মহর ওয়াজিব হবে না। যেমন– দাসী মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল, অতঃপর মনিব অনুমতি প্রদান করল। এখন এটা হবে না যে, অনুমতি লাভের পূর্বে যে সহবাস করেছিল তার মহর ওয়াজিব হবে। তারপর অনুমতি লাভের পর নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, অনুমতি লাভ দ্বারা যে আকদ স্থগিত ছিল তা জায়েজ হয়ে গেছে। তাহলে যেন আকদের সময়েই অনুমতি পেয়েছে। তাই প্রত্যেক সহবাস জায়েজ বিবাহের মধ্যেই হয়েছে। এজন্য একটাই মহর আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, কার্যকারিতা এ আকদের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে একই আকদ থাকল; দুই আকদ নয়। আর এক আকদ দ্বারা একটি মাত্র মহর ওয়াজিব হয়, তাই এখানেও এক মহর ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ وَطِئَ اَمَةَ اِبْنِهٖ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ اُمُّ الْوَلَدِ لَهٗ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ اَنْ يَدَّعِيْهِ الْاَبُ وَ وَجْهُهٗ اَنَّ لَهٗ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ اِبْنِهٖ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْبَقَاءِ فَلَهٗ تَمَلُّكُ جَارِيَتِهٖ لِلْحَاجَةِ اِلٰى صِيَانَةِ الْمَاءِ غَيْرَ اَنَّ الْحَاجَةَ اِلٰى اِبْقَاءِ نَسْلِهٖ دُوْنَهَا اِلٰى اِبْقَاءِ نَفْسِهٖ فَلِهٰذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَةَ بِالْقِيْمَةِ وَالطَّعَامَ بِغَيْرِ الْقِيْمَةِ ثُمَّ هٰذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْاِسْتِيْلَادِ شَرْطًا لَهٗ اِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ اَوْ حَقُّهٗ وَكُلُّ ذٰلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْاَبِ فِيْهَا حَتّٰى يَجُوْزَ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِهٖ فَتَبَيَّنَ اَنَّ الْوَطْئَ يُلَاقِيْ مِلْكَهٗ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَجِبُ الْمَهْرُ لِاَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكْمًا لِلْاِسْتِيْلَادِ كَمَا فِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَحُكْمُ الشَّيْئِ يُعَقِّبُهٗ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوْفَةٌ .

অনুবাদ : কেউ যদি আপন পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করে, আর দাসী তার দ্বারা সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে দাসীটি তারই উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর পুত্রের অনুকূলে পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে তার উপর কোনো মহর ওয়াজিব হবে না। মাসআলাটির অর্থ হলো, যদি পিতা উক্ত সন্তানের দাবি করে। এর কারণ হলো, জীবন ধারণের প্রয়োজনে পুত্রের মালের মালিকানা ব্যবহারের অধিকার পিতার রয়েছে। সুতরাং বীর্যের হেফাজতের প্রয়োজনে পুত্রের দাসীর মালিকানা হাসিলের অধিকারও তার থাকবে। তবে বংশ রক্ষার প্রয়োজন জীবন রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে নিম্নস্তরের। এ কারণেই দাসীর মালিকানা লাভ করবে মূল্য দ্বারা, আর খাদ্যের মালিকানা সাব্যস্ত হবে মূল্য ছাড়া। অবশ্য এ মালিকানা সাব্যস্ত হবে সন্তান উৎপাদনের পূর্ব মুহূর্তে। কেননা, সন্তান লাভ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি শর্ত। কেননা, প্রকৃত মালিকানা কিংবা মালিকানার হক হলো সন্তান লাভকে বিশুদ্ধতা দানকারী। অথচ এর কোনোটাই পিতার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত নয়। এজন্যই তো উক্ত দাসীকে পিতা বিবাহ করতে পারে। সুতরাং মালিকানা অগ্রবর্তী হওয়া জরুরি। এতে স্পষ্ট হলো যে, সহবাস তার মালিকানাতে সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং তার উপর উকর ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (র.) বলেন, মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, তাঁরা সন্তান লাভের [শর্তরূপে নয়; বরং] হুকুম [বা ফল] রূপে মালিকানা সাব্যস্ত করেন, যৌথ মালিকানার দাসীর ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। আর কোনো কিছুর হুকুম বা ফল তার পশ্চাদ্বর্তী হয়ে যাবে। মাসআলাটি সুপ্রসিদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ وَطِئَ اَمَةَ اِبْنِهٖ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, পিতা পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করল। সহবাসের ফলে দাসী সন্তান জন্ম দিল। এখন এ দাসীকে পিতার উম্মে ওয়ালাদ বলা হবে এবং পিতার উপর ঐ দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে, যদিও পিতা গরিব হয় এবং সন্তানের মূল্য ওয়াজিব হবে না। তবে পিতার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ দাসী পিতার উম্মে ওয়ালাদ তখন হবে যখন পিতা সেই সন্তানের নসবের দাবি করবে যে, এ সন্তান আমার বীর্য দ্বারা হয়েছে এবং পিতা মুসলমান ও জ্ঞানবান হতে হবে। এর দলিল হলো, পিতার এ কর্তৃত্ব রয়েছে যে, সে তার সন্তানের মালের মালিক হবে, নিজের প্রাণকে অবশিষ্ট রাখার জন্য। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে– اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার জন্য।" হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهٖ فَكُلُوْا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ "মানুষের সন্তানাদি তার সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের অর্থসম্পদ থেকে আহার কর।" হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের উত্তম সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঞ্চয় থেকে আহার কর।" প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে তার সন্তানের মালের মালিক হতে পারে– সন্তাকে বাকি রাখার জন্য, সে তার সন্তানের দাসীর মালিকও হতে পারবে– নিজের পানিকে সংরক্ষণ করার জন্য।

قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْحَاجَةَ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, যদি পানির সংরক্ষণ সত্তা অবশিষ্ট রাখার অনুরূপ হয়, তাহলে পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব না হওয়া উচিত। যেমন– আহার-বিহারের বস্তুর মধ্যে পিতার উপর মূল্য ওয়াজিব হয় না? প্রত্যুত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বংশ রক্ষার প্রয়োজন জীবন রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে নিম্ন স্তরের। এ কারণেই সন্তানকে এর উপর জবরদস্তি করা যাবে না যে, সে পিতাকে দাসীর মালিকানার জন্য স্বীয় দাসীকে দিয়ে দেবে। কারণ, এমনটি জরুরি নয়। সুতরাং উক্ত পার্থক্যের কারণে পিতা দাসীর মালিকানা লাভ করবে মূল্য দ্বারা, আর খাদ্যের মালিকানা সাব্যস্ত হবে মূল্য ছাড়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ هٰذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْاِسْتِيْلَادِ الخ : এর দ্বারা আরেকটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নের সারাংশ হলো, মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য জরুরি হলো, সহবাস মালিকানায় সংঘটিত হওয়া। যেমন– অধীনস্থ দাসীর সাথে সহবাস করা হয়, মুকাতাব নারীর সাথে সহবাস করা হয়। আর এখানে পিতার জন্য প্রকৃত মালিকানাও নেই এবং মালিকানার হকও নেই। এ কারণে সন্তানের দাসীর সাথে পিতার বিবাহ জায়েজ। যদি সন্তানের দাসীর মধ্যে পিতার প্রকৃত মালিকানা বা মালিকানার হক থাকত, তাহলে তার সাথে বিবাহ বৈধ হতো না। মোদ্দাকথা, যখন পিতার জন্য সন্তানের দাসীর মধ্যে প্রকৃত মালিকানা বা মালিকানার হক সাব্যস্ত নেই, তখন এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ কিভাবে সাব্যস্ত হবে? আর যেহেতু অন্যের মালিকানায় সহবাস করা হয়েছে, তাই পিতার উপর উক্ত সহবাসের কারণে উকরও ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল?

উত্তর: এর উত্তর হলো, প্রয়োজনের কারণে পিতার মালিকানাকে সহবাসের উপর অগ্রবর্তী ধরা হয়েছে, যাতে পিতার কাজ হারামে পতিত না হয়। কিংবা এজন্য যে, মালিকানা সন্তান লাভ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। আর কোনো কিছুর শর্ত তার উপর অগ্রবর্তী হয়। সুতরাং যখন শর্ত হওয়ার মালিকানা সহবাসের উপর অগ্রগণ্য, তখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পিতার সহবাস মালিকানাতেই সংঘটিত হয়েছে। আর যখন সহবাস মালিকানাতে পাওয়া গেল, তখন পিতার উপর উকরও ওয়াজিব হবে না। কেননা, মালিকানায় সহবাস দ্বারা উকর আবশ্যক হয় না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ সুরতে পিতার উপর উকর ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, তাঁরা মালিকানাকে সন্তান লাভের হুকুমরূপে সাব্যস্ত করেন। আর কোনো কিছুর হুকুম তার পরে হয়ে থাকে, তাই পিতার মালিকানা সহবাসের পর সাব্যস্ত হবে। যখন পিতার মালিকানা সহবাসের পর পাওয়া গেল, তখন যেন পিতা অন্য মালিকানার দাসীর সাথে সহবাস করেছে। আর অন্যের মালিকানায় সহবাস করার দ্বারা মহর ও উকর ওয়াজিব হয়। তাই পিতার উপর উক্ত সহবাস দ্বারা মহর ওয়াজিব হবে। যেমন– যৌথ মালিকানার দাসীর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, একজন দাসী পিতা-পুত্রের যৌথ মালিকানার। তারপর উক্ত দাসী সন্তান প্রসব করল। পিতা এ সন্তানের নসবের দাবি করল। এতে সন্তানের সাথে পিতার নসব সাব্যস্ত হবে এবং সকলের মতে পিতার উপর অর্ধেক উকর ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যৌথ দাসীর মধ্যে পিতার এক ধরনের মালিকানা সাব্যস্ত আছে। এতদসত্ত্বেও পিতার উপর উকর ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং যে সুরতে পিতার মালিকানা সাব্যস্ত নয়, ঐ সুরতে পিতার উপর অবশ্যই উকর ওয়াজিব হওয়া উচিত।

তাদের কিয়াসের জবাব হলো, প্রয়োজনের কারণে উপরিউক্ত মাসআলায় মালিকানাকে সহবাসের উপর অগ্রগণ্য করা হয়েছে। যাতে অন্য মালিকানায় সহবাস পতিত না হয়। আর এ মাসআলায় যেহেতু একপ্রকার মালিকানা বিদ্যমান আছে যা বিশুদ্ধ সন্তান লাভের জন্য যথেষ্ট, তাই মালিকানার অগ্রগণ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। এ মাসআলাটি জামিউস সাগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মতে মালিকানা শর্ত হয়ে সন্তান লাভের পূর্বে সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মালিকানা সন্তান লাভের পর হুকুম হয়ে সাব্যস্ত হবে।

ফায়দা : উকর স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে মহরে মিছিল হয়। আর দাসীর ক্ষেত্রে সে যদি কুমারী হয়, তবে তার মূল্যের এক-দশমাংশকে উকর বলা হয়। আর যদি ছায়্যিবা বা বিবাহিতা হয়, তবে তার মূল্যের অর্ধেক ওশরকে উকর বলা হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَالَ وَلَوْ كَانَ الْاِبْنُ زَوَّجَهَا اَبَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرْ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا قِيْمَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ وَلَدُهَا حُرٌّ لِاَنَّهُ صَحَّ التَّزَوُّجُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) لِخُلُوِّهَا عَنْ مِلْكِ الْاَبِ اَلَا يَرٰى اَنَّ الْاِبْنَ مَلَكَهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَمِنَ الْمُحَالِ اَنْ يَمْلِكَهَا الْاَبُ مِنْ وَجْهٍ وَكَذَا يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقٰى مَعَهَا مِلْكُ الْاَبِ لَوْ كَانَ فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اِنْتِفَاءِ مِلْكِهِ اِلَّا اَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَاِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاؤُهُ مَصُوْنًا بِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَلَا تَصِيْرُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا قِيْمَةَ عَلَيْهِ فِيْهَا وَلَا فِيْ وَلَدِهَا لِاَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُمَا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِاِلْتِزَامِهِ بِالنِّكَاحِ وَ وَلَدُهَا حُرٌّ لِاَنَّهُ مَلَكَهُ اَخُوْهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ.

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, পুত্র যদি তার দাসীকে পিতার নিকট বিবাহ দান করে আর সে সন্তান প্রসব করে, তাহলে দাসীটি পিতার উম্মে ওয়ালাদ হবে না এবং পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে না; বরং তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর দাসীর পুত্র স্বাধীন হবে। কেননা, আমাদের মতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [আমাদের যুক্তি হলো–] এ দাসী পিতার মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। লক্ষ্য করেছেন নাকি যে, সকল দিক থেকে পুত্র এ দাসীর মালিক ; সুতরাং কোনো দিক থেকেই পিতার পক্ষে দাসীর মালিক হওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ পুত্র ঐ সকল ব্যবহারের অধিকারী যার পর আর পিতার মালিকানা থেকে থাকলেও তা বিদ্যমান থাকতে পারে না ; সুতরাং এটা পিতার মালিকানা না থাকা প্রমাণ করে। তবে মালিকানায় সন্দেহ থাকার কারণে জেনার হদ রহিত হয়। মোটকথা, বিবাহ যখন শুদ্ধ হয়ে গেল, তখন বিবাহের কারণে তার বীর্য সংরক্ষিত হয়ে গেল। ফলে দাসত্ব সূত্রে আর মালিকানা সাব্যস্ত হলো না। সুতরাং দাসীটি আর পিতার উম্মে ওয়ালাদও হলো না। আর পিতার উপর ঐ দাসীটির মূল্য এবং সন্তানটির মূল্য ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে তো তাদের মালিক হয়নি, তবে বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে পিতার উপর মহর আবশ্যক হবে। আর দাসীর পুত্র স্বাধীন হবে। কেননা, তার ভাই তার মালিকানা লাভ করেছে ; ফলে আত্মীয়তার কারণে সে তার কাছ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْاِبْنُ زَوَّجَهَا اَبَاهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক পুত্র সন্তান স্বীয় দাসীকে নিজ পিতার সাথে বিবাহ দিল। অতঃপর দাসী পিতার বীর্যের কারণে সন্তান প্রসব করল। এখন এ দাসী পিতার উম্মে ওয়ালাদ হবে না এবং পিতার উপর পুত্রের জন্য ঐ দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে না। তবে পিতার উপর মহর ওয়াজিব হবে এবং ঐ দাসীর সন্তানাদি যা পিতার বীর্য থেকে পয়দা হলো সব আজাদ হবে।

উল্লেখ্য, সন্তানের দাসীর সাথে পিতার বিবাহ জায়েজ কিনা ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে জায়েজ আছে, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, সন্তানের মালের মধ্যে পিতার মালিকানার হক রয়েছে। [أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার জন্যে"– এ হাদীসের কারণে]। এ কারণে পিতা যদি স্বীয় পুত্রের দাসীর সাথে হারামভাবে সহবাস করে তাহলেও পিতার উপর জেনার হদ সাব্যস্ত হবে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যার জন্য কোনো দাসীর মধ্যে মালিকানার হক থাকবে সে দাসীর সাথে তার বিবাহ জায়েজ হবে না। তাই পুত্রের দাসীর সাথে পিতার বিবাহ জায়েজ হবে না। হানাফীগণের দলিল হলো, পুত্রের দাসী পিতার মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন– আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পুত্র সকল দিক থেকে ঐ দাসীর মালিক। এর দলিল হলো, পুত্রের জন্য তার সাথে সহবাস করা হালাল এবং সে আজাদ করলে আজাদ হয়ে যায়। সুতরাং পুত্র যখন সর্বদিক থেকে মালিক, তখন পিতা সর্বদিক থেকে তার মালিক হওয়া দুরূহ ব্যাপার। কেননা, দুই ব্যক্তির এক স্থানে একই সময়ে কোনো কিছুর মালিক হওয়া নিষেধ। দ্বিতীয় কারণ হলো, পুত্র ঐ দাসীর মধ্যে এমন কিছু ব্যবহারের মালিক যেগুলোর সাথে যদি পিতার মালিকানা হয়, তবুও বাকি থাকবে না। যেমন– পুত্র ঐ দাসীকে বিক্রয় করা, হেবা করা, আজাদ করা এবং ইজারা ইত্যাদি দেওয়ার মালিক। সুতরাং এগুলোও পিতার মালিকানা না হওয়াকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো, জাহিরে হাদীস أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ -এর উপর আমল করত মালিকানার সন্দেহের কারণে পিতা থেকে জেনার হদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। মোদ্দাকথা, যখন পুত্রের দাসী পিতার মালিকানা থেকে মুক্ত তখন পিতার বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যখন পিতার বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেল, তখন তার বীর্য বিবাহের কারণে সংরক্ষিত হয়ে গেল। তাই পিতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যখন পিতার জন্য পুত্রের দাসীর মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না, তখন এ দাসী পিতার উম্মে ওয়ালাদও হবে না এবং পিতার উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে না এবং তার সন্তাদিরও না। কেননা, পিতা উভয়ের মালিক নয়। তবে পিতার উপর মহর জরুরি হবে। কেননা, সে বিবাহ দ্বারা মহরকে অবধারিত করেছে। আর ঐ দাসী কর্তৃক পিতার বীর্য থেকে যে সন্তান জন্ম লাভ করল সে আজাদ হবে। কেননা, দাসীর সন্তান মনিবের মালিকানা হয়। এখানে মনিব ঐ সন্তানের ভ্রাতা, তাই আত্মীয়তার কারণে এ সন্তান তার ভাই তথা মনিবের উপর আজাদ হয়ে যাবে– مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ [যে ব্যক্তি তার কোনো মাহরামের মালিক হবে, উক্ত মাহরাম তার পক্ষ থেকে এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে] এ হাদীসের ভিত্তিতে।

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا يَفْسُدُ وَأَصْلُهُ أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا حَتّٰى يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ وَلَوْ نَوٰى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ طَلَبَ أَنْ يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهٰذَا مُحَالٌ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ اٰدَمَ فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ وَلَنَا أَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقْدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ إِذِ الْمِلْكُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ عَنْهُ فَيَصِيْرُ قَوْلُهُ أَعْتِقْ طَلَبَ التَّمْلِيْكِ مِنْهُ بِالْأَلْفِ ثُمَّ أَمْرَهُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِ الْآمِرِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ أَعْتَقْتُ تَمْلِيْكًا مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَّنَافِيْ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, কোনো স্বাধীন স্ত্রীর স্বামী যদি দাস থাকে এবং সে স্ত্রী স্বামীর মনিবকে বলে যে, তাকে আমার পক্ষ হতে এক হাজারের বিনিময়ে আজাদ করে দিন। মনিব তা-ই করল, তখন বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফাসেদ হবে না। আসল বিষয় হলো, আমাদের মতে আদেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদী সংঘটিত হয়। এ কারণেই দাসের উত্তরাধিকার আদেশদাতার হক। আর এ আদেশদাতা যদি এ আজাদকরণ দ্বারা কাফফারার নিয়ত করে, তাহলে কাফফারার দায় থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) -এর মতে [যাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে] তার পক্ষ হতেই আজাদ সংঘটিত হবে। কেননা, আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করেছে যেন সে নিজের গোলামকে আদেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদ করে, আর তা তো অসম্ভব। কেননা, মানুষ যে গোলামের মালিক নয়, তাকে সে আজাদ করতে পারে না। তাই তার আদেশ প্রদান শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আদিষ্টের পক্ষ থেকেই আজাদকরণ সাব্যস্ত হবে। আমাদের দলিল হলো, এটি শুদ্ধ করা সম্ভব, অবস্থার চাহিদার মালিকানা অগ্রবর্তী করার মাধ্যমে। কেননা, তার পক্ষ থেকে আজাদকরণ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিকানা হলো পূর্বশর্ত। সুতরাং আদেশদাতার 'আজাদ কর' কথাটির অর্থ হবে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে তাকে মালিক বানানোর দাবি। অতঃপর আদেশদাতার পক্ষ হতে গোলামকে আজাদ করার আদেশ প্রদান। আর আদেশকৃত ব্যক্তির 'আজাদ করলাম' কথাটির অর্থ হবে, প্রথমে তার পক্ষ থেকে আদেশদাতাকে মালিক বানানো। অতঃপর তার পক্ষ হতে তাকে আজাদ করা। যখন আদেশদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হলো, তখন বিবাহ ফাসেদ হয়ে গেল। এ দুই মালিকানার মাঝে বৈপরীত্য থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, একজন আজাদ নারী কোনো গোলামের স্ত্রীত্বে রয়েছে। সে তার দাস স্বামীর মনিবকে বলল, তাকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে দিন। মনিব বলল, আজাদ করে দিলাম। তাহলে এ সুরতে আইম্মায়ে ছালাছার মতে বিবাহ ফাসেদ হয়ে গেছে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিবাহ ফাসেদ হবে না। মতবিরোধের ভিত্তি হলো, আমাদের মতে আজাদী আদেশদাতা তথা স্বাধীন নারীর পক্ষ থেকে এসেছে

কারণেই দাসের উত্তরাধিকার আদেশদাতাই পাবে। আর যদি আদেশদাতা এ আজাদকরণ দ্বারা কাফফারার নিয়ত করে, তাহলে আদেশদাতার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে এবং আদেশদাতা কাফ্ফারার জিম্মাদারি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে আজাদকরণ মনিবের পক্ষ থেকে এসেছে। তাঁর দলিল হলো, আদেশদাতা অর্থাৎ, স্বাধীন নারী তার স্বামীর মনিবের নিকট এ দরখাস্ত করেছে যে, যেন তার গোলাম তার পক্ষ থেকে আজাদ করে দেয়। আর এ ব্যাপারটি দুষ্কর। কেননা, মানুষ যার মালিক নয় তার পক্ষ থেকে আজাদকরণ সাব্যস্ত হয় না। তাই আদেশদাতা অর্থাৎ স্বাধীন নারীর আজাদকরণের দরখাস্ত করাও সহীহ নয়। সুতরাং দাসের এ আজাদকরণ মামুর তথা মনিবের পক্ষ থেকে আদায় হবে; আদেশদাতার পক্ষ থেকে হবে না।

আমাদের দলিল হলো, আদেশদাতার নির্দেশকে অহেতুক হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য তাকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। অথচ আদেশদাতার নির্দেশকে বিশুদ্ধ করাও সম্ভব। তা এভাবে যে, চাহিদার দিক থেকে আদেশদাতার জন্য মালিকানাকে অগ্রগণ্য করা হবে। কেননা, আজাদী বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিকানা শর্ত। এখন আদেশদাতা অর্থাৎ স্বাধীন নারীর বক্তব্য أَعْتِقْهُ عَنِّيْ بِأَلْفٍ-এর মূল ইবারত হবে- بِعْهُ عَنِّيْ بِأَلْفٍ ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِيْ بِالْإِعْتَاقِ "আমার নিকট এ দাসটিকে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করুন তারপর আমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তাকে আজাদ করে দিন।" জবাবে মনিবের বক্তব্য أَعْتَقْتُ -এর মূল ইবারত হবে بِعْتُكَ وَأَعْتَقْتُهُ عَنْكَ "আমি তোমাকে বিক্রি করলাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তাকে আজাদ করে দিলাম।" সুতরাং যখন চাহিদার দিক থেকে বিক্রি পাওয়া গেল তখন নির্দেশদাতা অর্থাৎ স্বাধীন নারীর জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং বিবাহের মালিকানা ও ইয়ামীনের মালিকানার মাঝে বৈপরীত্যের কারণে বিবাহ ফাসেদ হয়ে গেল।

আমাদের দলিলের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়–

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, যদি মামুর তথা মনিব সুস্পষ্টভাবে বিক্রি করত আর বলত بِعْتُ وَأَعْتَقْتُ . আমি বিক্রি করলাম এবং আজাদ করলাম, তাহলে সকলের মতে আজাদকরণ মামূর বা মনিবের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হতো। কেননা, নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে বিক্রির গ্রহণীয়তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং যখন সুস্পষ্ট বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদকরণ সংঘটিত হয়নি, তখন বিক্রির চাহিদার ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদকরণ না হওয়া উচিত?

উত্তর: এর উত্তর হলো, কোনো বস্তু অনেক সময় মোটামুটিভাবে (ضِمْنًا) সাব্যস্ত হয়ে যায়, যদিও সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত না হয়। যেমন– মায়ের পেটের সন্তানের বিক্রি মায়ের অনুগত হয়ে মোটামুটি সাব্যস্ত হয়ে যায়, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে সাব্যস্ত না হয়।

প্রশ্ন: দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যদিও আদেশদাতার জন্য কর্তৃত্বের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল, এতদসত্ত্বেও দুই কারণে বিবাহ ফাসেদ না হওয়া উচিত–

১. এখানে আদেশদাতার জন্য চাহিদাগতভাবে মালিকানা সাব্যস্ত আছে। আর যে জিনিস চাহিদার দিক থেকে সাবেত হয় তা আবশ্যক হিসেবে সাবেত হয়। আর যে জিনিস আবশ্যক হিসেবে সাবেত হয় তা আবশ্যকতার পরিমাণই সাবেত হয়। আর আবশ্যকতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদকরণ হয়ে যাওয়া। সুতরাং এ কর্তৃত্বের মালিকানা বিবাহ ফাসেদ হওয়ার দিকে ধাবিত হবে না।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, এখানে নির্দেশদাতার জন্য যে মালিকানাই সাব্যস্ত হবে তা আজাদকরণের হুকুম দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত হয়ে যাবে। আর এ ধরনের মালিকানা দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না। কারণ, উকিলের জন্য যে ধরনের মালিকানাই সাবেত হোক তা সাথে সাথে বাতিল হয়ে যাবে।

উত্তর: প্রথম কারণের উত্তর হলো, কোনো কিছু যখন সাবেত হয়, তখন তার সব কিছু নিয়েই সাবেত হয়, আর বিবাহ ফাসেদ হওয়াও মালিকানার বিষয়সমূহের একটি। তাই বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণের উত্তর হলো, মালিকানা শুরুতেই মুয়াক্কিলের জন্য সাবেত হয়; উকিলের জন্য সাবেত হয় না। যেমন– শামসুল আইম্মার পছন্দনীয় মাযহাবও এটাই। তাই উকিলের বিবাহ ফাসেদ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

–[ফাতহুল কাদীর, আল-কিফায়া]

وَلَوْ قَالَتْ اَعْتِقْهُ عَنِّيْ وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ لِاَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهِ وَيَسْقُطُ اِعْتِبَارُ الْقَبْضِ كَمَا اِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَاَمَرَ غَيْرَهُ اَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ وَلَهُمَا اَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِّ فَلَا يُمْكِنُ اِسْقَاطُهُ وَلَا اِثْبَاتُهُ اِقْتِضَاءً لِاَنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّهُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ وَفِيْ تِلْكَ الْمَسْاَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوْبُ عَنِ الْاٰمِرِ فِي الْقَبْضِ اَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِيْ يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوْبَ عَنْهُ .

অনুবাদ : যদি স্ত্রী বলে যে, আমার পক্ষ হতে তাকে আজাদ করুন আর কোনো মালের কথা উল্লেখ না করে, তাহলে বিবাহ ফাসেদ হবে না। আর আজাদকারীর জন্য وَلَاء সাব্যস্ত হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ সুরত এবং প্রথমটি অভিন্ন। কেননা, তিনি আদেশদাতার কার্যকে শুদ্ধ করার জন্য বিনিময় ব্যতীত মালিকানাকে অগ্রবর্তী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। কব্জ-এর বিষয়টি এখানে রহিত হয়ে যাবে। যেমন– কারো উপর যিহারের কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো, আর সে অন্যকে তার পক্ষ থেকে [ফকিরকে] খাওয়ানোর আদেশ দিল। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, শরিয়তের নস দ্বারা হেবার ক্ষেত্রে কব্জ শর্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটাকে রহিত করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি চাহিদার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়। কেননা, এটা হলো প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজ। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটা হলো শরিয়তসম্মত কাজ। আর যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে [আহার গ্রহণকারী] ফকির, কব্জ করার ক্ষেত্রে আদেশদাতার স্থলবর্তী হচ্ছে। অথচ গোলামের হাতে কিছু আসছে না, যাতে [তা গ্রহণের ক্ষেত্র] সে আদেশদাতার স্থলবর্তী হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَتْ اَعْتِقْهُ عَنِّيْ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বাধীন স্ত্রী তার গোলাম স্বামীর মনিবকে বলল, তাকে আমার পক্ষ থেকে আজাদ করে দিন। কিন্তু কোনো মালের কথা উল্লেখ করেনি, তাহলে তরফাইন (র.)-এর মতে বিবাহ ফাসেদ হবে না এবং আজাদকারী তথা মনিবের জন্য وَلَاء সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ মাসআলা ও উপরের মাসআলা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যেমনিভাবে প্রথম মাসআলায় আজাদকরণ আদেশদাতার পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হয়েছিল এবং বিবাহ ফাসেদ হয়ে গিয়েছিল, তদ্রূপ উক্ত মাসআলায়ও আজাদকরণ আদেশদাতা তথা স্বাধীন স্ত্রীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হবে এবং বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, যেমনিভাবে প্রথম মাসআলায় জ্ঞানবানের কথাকে অহেতুক হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য বিনিময়সহ মালিকানা অর্থাৎ বিক্রয়কে চাহিদা হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিল তেমনিভাবে এ মাসআলার মধ্যেও আদেশদাতা যে জ্ঞানবান তার কার্যকে বিশুদ্ধ করার জন্য বিনিময় ছাড়া মালিকানা অর্থাৎ, হেবাকে চাহিদা হিসেবে নির্ধারণ করা হবে। আর মূল ইবারত এমনটি হবে যে, স্বাধীন স্ত্রী গোলাম স্বামীর মনিবকে বলল, প্রথমত এ গোলামকে আমার

পক্ষ থেকে হেবা করে দিন, তারপর আমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তাকে আজাদ করে দিন। মনিব বলল, আমি এমনটি করলাম অর্থাৎ, প্রথমত এ গোলাম তোমাকে হেবা করে দিলাম তারপর তোমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তাকে আজাদ করে দিলাম। উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, গোলামের আজাদকরণ আদেশদাতা তথা স্বাধীন স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়েছে এবং বিবাহও ফাসেদ হয়ে গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উপরিউক্ত দলিলের উপর এ প্রশ্ন জাগে যে, হেবার জন্য কব্জ করা শর্ত, আর উপরিউক্ত সুরতে مَوْهُوْبٌ لَهُ অর্থাৎ, আদেশদাতার পক্ষ থেকে কব্জ পাওয়া যায়নি, তাই হেবা কিভাবে পরিপূর্ণ হবে? এর জবাব হলো, প্রথম মাসআলায় নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে 'কবুল' যা বিক্রির রোকন ছিল তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, তাই কব্জ যা হেবার জন্য শর্ত ছিল তাকে বিলুপ্ত করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে। সুতরাং যেমনিভাবে প্রথম মাসআলায় কবুল ছাড়া বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে এ মাসআলায়ও কব্জ ছাড়া হেবা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি এমন হলো যেমন এক ব্যক্তির উপর যিহারের কাফফারা ওয়াজিব ছিল সে অপরকে নির্দেশ দিল যে, 'আমার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকিনকে খাইয়ে দিবে।' উক্ত কথার অর্থ এটাই যে, প্রথমে আমাকে খানা হেবা কর তারপর আমার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকিনকে খাইয়ে দাও।

সুতরাং নির্দেশিত ব্যক্তি যদি নির্দেশ মোতাবেক কার্য সমাধা করে, তাহলে সকলের মতে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। অথচ এর মধ্যে হেবার ক্ষেত্রে কব্জ বিদ্যমান নেই। তাই যেমনিভাবে এখানে কব্জ-এর শর্ত বিলুপ্ত হয়ে হেবা বিশুদ্ধ হলো, এমনিভাবে এখানেও কব্জ-এর শর্ত বিলুপ্ত হয়ে গোলাম হেবা হয়ে গেল। তারপর মনিব স্ত্রীর পক্ষ থেকে আজাদ করে দিল, তাই বিবাহ ফাসেদ হয়ে গেল।

তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, হেবার জন্য কব্জ শর্ত। প্রমাণ হলো হাদীসে রাসূল ﷺ -এর বাণী– لَا تَصِحُّ الْهِبَةُ إِلَّا مَقْبُوْضَةً 'কব্জ ব্যতিরেকে হেবা গ্রহণযোগ্য নয়' এবং কব্জকে বিলুপ্ত করাও সম্ভব নয়। কেননা, সাধারণত ঐ বস্তুই বিলুপ্ত হয় যা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর কব্জ হেবার মধ্যে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। বিক্রয়ের রোকনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন– بَيْعُ التَّعَاطِيْ -এর মধ্যে ইজাব-কবুল উভয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাই قَبْضَةٌ فِي الْهِبَةِ -কে বিক্রয়ের রোকনের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না এবং কব্জকে চাহিদার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়। কেননা, কব্জ হলো প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজ। আর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাজ কবুল জাতীয় নয়। তাই أَعْتِقْ দ্বারা কব্জকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। বিক্রয়ের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, বিক্রয় হলো শরিয়তসম্মত কাজ, তাই তাকে أَعْتِقْ দ্বারা সাব্যস্ত করা সহীহ হবে।

قَوْلُهُ وَفِيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الخ : এর দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, যখন ঐ ব্যক্তি যার উপর কাফফারায়ে যিহার ওয়াজিব সে অন্যকে বলল যে, আমার পক্ষ থেকে সে যেন ফকিরকে খানা খাইয়ে দেয়, আর নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফকিরকে খাইয়ে দেয় এতে ফকির আদেশদাতার স্থলবর্তী হয়ে কব্জ করে নেবে, তারপর নিজের জন্য কব্জ করবে। যেমন– ফকিরকে যখন জাকাত দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থলবর্তী হয়ে কব্জ করে তারপর নিজের জন্য কব্জ করে। সুতরাং এ সুরতে হেবা কব্জ ছাড়া থাকল না। আর নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন গোলাম আজাদ করল তখন তার কব্জ-এর কোনো কিছু থাকে না, যাতে সে গোলাম নির্দেশদাতার স্থলবর্তী হতে পারে। সুতরাং এ সুরতে কব্জ ছাড়াই হেবা থেকে গেল। সুতরাং যখন ফকির কব্জ-এর স্থলবর্তী, আর গোলাম স্থলবর্তী হতে পারে না, তাই একটাকে অপরটির উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না।

بَابُ نِكَاحِ اَهْلِ الشِّرْكِ

وَاِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ اَوْ فِىْ عِدَّةِ كَافِرٍ وَ ذٰلِكَ فِىْ دِيْنِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ اَسْلَمَا اُقِرَّا عَلَيْهِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) اَلنِّكَاحُ فَاسِدٌ فِى الْوَجْهَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْاِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ اِلَى الْحُكَّامِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ كَمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ كَمَا قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَهُ اَنَّ الْخِطَابَاتِ عَامَّةٌ عَلٰى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَتَلْزَمُهُمْ وَاِنَّمَا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ لِذِمَّتِهِمْ اِعْرَاضًا لَا تَقْرِيْرًا وَاِذَا تَرَافَعُوْا اَوْ اَسْلَمُوْا وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَ التَّفْرِيْقُ وَلَهُمَا اَنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوْا مُلْتَزِمِيْنَ لَهَا وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ وَلَمْ يَلْتَزِمُوْا اَحْكَامَنَا بِجَمِيْعِ الْاِخْتِلَافَاتِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْحُرْمَةَ لَا يُمْكِنُ اِثْبَاتُهَا حَقًّا لِلشَّرْعِ لِاَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِحُقُوْقِهِ وَلَا وَجْهَ اِلٰى اِيْجَابِ الْعِدَّةِ حَقًّا لِلزَّوْجِ لِاَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ لِاَنَّهُ يَعْتَقِدُهُ وَاِذَا صَحَّ النِّكَاحُ فَحَالَةُ الْمُرَافَعَةِ وَالْاِسْلَامِ حَالَةُ الْبَقَاءِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيْهَا وَكَذَا الْعِدَّةُ لَا تُنَافِيْهَا كَالْمَنْكُوْحَةِ اِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ .

পরিচ্ছেদ : মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ

অনুবাদ : কাফের যদি সাক্ষী ছাড়া কিংবা অন্য কাফেরের ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করে আর তা তাদের ধর্মে বৈধ হয়ে থাকে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বহাল রাখা হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় সুরতেই বিবাহ ফাসেদ। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কিংবা সিদ্ধান্ত চেয়ে আদালতে মামলা উত্থাপনের পূর্বে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। প্রথম সুরতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন, আর দ্বিতীয় সুরতে ইমাম যুফার (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শরিয়তের সম্বোধন সর্বজনীন। সুতরাং এ সম্বোধন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা হবে না তাদের সাথে জিম্মি-চুক্তির কারণে – উপেক্ষা করার ভিত্তিতে; স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে নয়। তবে যদি শাসকবর্গের নিকট তারা বিচার দায়ের করে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করে অথচ নিষিদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে, তখন বিচ্ছেদ ঘটানো ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, ইদ্দত পালনকারী নারীর বিবাহের নিষিদ্ধতা সর্বসম্মত বিষয়। সুতরাং তারাও তা

পালনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। পক্ষান্তরে সাক্ষী ছাড়া বিবাহের নিষিদ্ধতার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আর তারা আমাদের শরিয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধান মতপার্থক্যসহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, হুরমত ও নিষিদ্ধতা শরিয়তের হকরূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, শরিয়তের হকসমূহ আদায় করার ব্যাপারে তারা সম্বোধিত নয়। তদ্রূপ স্বামীর হক হিসেবে ইদ্দত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, স্বামী এটি তার হক বলে বিশ্বাস রাখে না। পক্ষান্তরে সে কোনো মুসলমানের বিবাহধীন থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা, স্বামী এটাকে নিজের হক বলে বিশ্বাস করে। যা হোক যখন বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেল, তখন আদালতে বিচার দায়ের এবং ইসলাম গ্রহণ হলো বিবাহের পরবর্তী অবস্থা। আর বিবাহের পরবর্তী অবস্থায় সাক্ষ্য শর্ত নয়। তদ্রূপ ইদ্দতও বিবাহের পরবর্তী অবস্থার পরিপন্থি নয়। যেমন– কোনো বিবাহিতার সঙ্গে সন্দেহবশত সহবাস হয়ে গেল [তখন পূর্ব বিবাহ বাকি থাকা সত্ত্বেও এ সহবাসের কারণে ইদ্দত পালন করতে হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : মুশরিক বলা হয় যে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে। যেমন– নাসরানী, মূর্তিপূজক। তবে তারা আল্লাহকেও স্বীকার করে। কিন্তু এখানে আহলে শিরক দ্বারা শর্তহীনভাবে কাফের উদ্দেশ্য, যা মুশরিক এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। মুশরিকদের বিবাহকে গোলামের বিবাহের পর উল্লেখ করার কারণ হলো, মর্যাদার দিক থেকে মুশরিক গোলাম থেকে নিম্নমানের। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ 'মু'মিন দাস মুশরিক থেকে উত্তম।' তাই গোলামের বিবাহের পর মুশরিকদের বিবাহের আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্বকথা : এ অনুচ্ছেদের মাসআলাগুলোর ভিত্তি তিনটি উসূলের উপর রয়েছে।

১. যে বিবাহ দুই মুসলমানের মধ্যে যে সহীহ তা দুই কাফেরের মধ্যেও সহীহ হবে। এ মর্মেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ – 'আমি বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছি; ব্যভিচার দ্বারা নয়।'

২. দ্বিতীয় উসূল হলো, যে বিবাহ দুই মুসলমানের মাঝে শর্ত ইত্যাদি না পাওয়া যাওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যায়, কাফেরের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে দুটি সুরত রয়েছে– এক. কাফেররাও যদি এ ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ মনে করে, তাহলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। দুই. আর যদি কাফেররা তাকে জায়েজ মনে করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কাফেরদের ক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে যাবে। এ কারণেই তারা উভয়ে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ঐ বিবাহের উপরই তারা থেকে যাবে।

৩. তৃতীয় উসূল হলো, যে বিবাহ স্থান হারাম হওয়ার কারণে হারাম হয়; যেমন– বোন ইত্যাদিকে বিবাহ করল, তাহলে তা বিশ্বাস অনুযায়ী বৈধ হবে। কিন্তু মাশায়েখে ইরাকের মতে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, এক কাফের কোনো কাফের নারীকে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করল, কিংবা এমন নারীকে বিবাহ করল, যে কোনো কাফেরের ইদ্দতের মধ্যে আছে এবং এ ধরনের বিবাহ তাদের মাযহাব অনুযায়ী জায়েজও বটে। অতঃপর উভয়ে মুসলমান হয়ে গেল, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, উভয়কে তাদের মাযহাবের উপর বাকি রাখা হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় সুরতে বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কিংবা মুসলমান ন্যায়পরায়ণ বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করার পূর্বে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রথম সুরত অর্থাৎ, সাক্ষী ছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে ঐ হুকুম যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আর দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ, কাফেরের মু'তাদ্দাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে ঐ হুকুম যা ইমাম যুফার (র.) বলেছেন। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, শরিয়তের সম্বোধন সর্বজনীন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ অর্থাৎ 'তোমরা বিবাহের সম্পর্কের ইচ্ছাও করো না, যতক্ষণ না নির্ধারিত ইদ্দত তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়।' আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না' তাই হুকুমও ব্যাপক আকারে সাবেত হবে। আর যেহেতু সম্বোধন ব্যাপক, তাই তা কাফেরের জন্যও অবধারিত হবে। তবে কাফেরদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা হবে না। কেননা, তাদের উপর হস্তক্ষেপ না করার জিম্মি-চুক্তি রয়েছে। তবে এ হস্তক্ষেপ না করা এ কারণে নয় যে, আমরা তাদের কার্যকলাপকে সঠিক মনে করি; বরং সেগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে হস্তক্ষেপ করা হয় না। যেমন- তারা মূর্তিপূজা করে। আমরা বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করব না, তবে যখন তারা তাদের মামলা কোনো মুসলমান বিচারকের নিকট নিয়ে যায় কিংবা মুসলমান হয়ে যায় অথচ এখনো বিবাহের হুরমত বিদ্যমান রয়েছে, তবে তখন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া জরুরি হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ উক্ত আয়াতে بَيْنَهُمْ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ কাফেরদের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ, আপনি কাফেরদের মাঝে ঐ ভাবেই ফয়সালা করুন যা আল্লাহ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মুসলমান বিচারক শরিয়ত অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, অন্যের মু'তাদ্দাকে বিবাহ করা হারাম- এ ব্যাপারে সকলে একমত। তবে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। কারণ, ইমাম মালেক ও ইবনে আবী লায়লা (র.) সাক্ষী ছাড়া বিবাহকে জায়েজ বলেন, আর জিম্মি কাফেররা আমাদের ঐকমত্যপূর্ণ বিধিবিধানগুলো তো পালন করেছে, কিন্তু বিরোধপূর্ণ বিধিবিধানগুলো পালন করেনি। সুতরাং অন্যের মু'তাদ্দাকে বিবাহ করা হারাম- এ বিষয়টি যেহেতু সর্বসম্মত, এজন্য জিম্মি কাফেররা এ হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুগত। আর যেহেতু অন্যের মু'তাদ্দার সাথে মুসলমানদের বিবাহ ফাসেদ, তাই জিম্মি কাফেরদের বিবাহও ফাসেদ হবে। মুসলমান হওয়া কিংবা মামলা দায়েরের পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর সাক্ষী ছাড়া বিবাহের বিষয়টি যেহেতু বিরোধপূর্ণ, তাই জিম্মি কাফেররা এ হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুগত হবে না; বরং তাদের মাযহাব অনুযায়ী অন্যের মু'তাদ্দার সাথে বিবাহ জায়েজ হবে। আর ইসলাম কবুল করার পর পূর্বের বিবাহের উপরই বাকি রাখা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ইদ্দতের কারণে বিবাহের হুরমত বা নিষিদ্ধতা শরিয়তের হকরূপে সাব্যস্ত হবে কিংবা স্ত্রীর হক রূপে। আর উক্ত সুরতগুলো সম্ভবপর নয়। শরিয়তের হকরূপে সাব্যস্ত করা এ কারণে সম্ভবপর নয় যে, কাফেররা শরিয়তের বিধিবিধান আদায় করার ক্ষেত্রে সম্বোধিত নয়। আর স্বামীর হকরূপে ইদ্দত ওয়াজিব করা এ কারণে সম্ভব নয় যে, স্বামী তো ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাসই করে না। এর বিপরীত কোনো জিম্মি কিতাবী নারী যদি কোনো মুসলমানের বিবাহে থাকে, তারপর মুসলমান তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে ঐ কিতাবী নারীর উপর স্বামীর হকরূপে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা, মুসলমান ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাসী। তাই ইদ্দতের ক্ষেত্রে ঐ কিতাবী নারীর বিবাহ সহীহ হবে না। সুতরাং যখন ইদ্দতের কারণে বিবাহের হুরমতকে সাব্যস্ত করার দুটি সুরত ছিল, আর এ দুই সুরতই অসম্ভব, তখন এক কাফেরের বিবাহ অন্য কাফেরে মু'তাদ্দার সাথে সহীহ হবে। আর যখন বিবাহ সহীহ হয়ে গেল, তখন আদালতের বিচার দায়ের আর ইসলাম কবুল করার অবস্থা হলো বিবাহের পরবর্তী অবস্থা। আর বিবাহের পরবর্তী অবস্থার সাক্ষ্য শর্ত নয়। এ কারণেই যদি বিবাহের পর সাক্ষী মরে যায়, তাহলে বিবাহ বাতিল হবে না। এমনিভাবে ইদ্দত পালন বিবাহের পরবর্তী অবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি বিবাহিতা নারীকে এই মনে করে বিবাহ করল যে, তার স্বামী মরে গেছে এবং তার সাথে সহবাসও করে ফেলেছে। এরপর জানা গেল যে, সে জীবিত আছে, তখন প্রথম বিবাহ বাকি থাকা সত্ত্বেও ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং বুঝা গেল, ইদ্দত বিবাহের পরবর্তী অবস্থার বিরোধী নয়।

فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّهُ أَوْ إِبْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكْمُ الْبُطْلَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ وَ وَجَبَ التَّعَرُّضُ بِالْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ وَعِنْدَهُ لَهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُنَافِيْ بَقَاءَ النِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَا تُنَافِيْهِ .

অনুবাদ : কোনো মাজূসী যদি তার মা কিংবা কন্যাকে বিবাহ করে, অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কেননা, সাহেবাইনের মতে মাহরাম বিবাহের বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রেও বাতিল বলে গণ্য; যেমনটি ইদ্দত পালনরত [কাফের নারীকে বিবাহ করার] প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। আর এখন ইসলাম গ্রহণের কারণে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুতরাং বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এ বিবাহের বৈধতা রয়েছে। তবে মাহরাম হওয়া বিবাহের স্থায়িত্বের অবস্থার পরিপন্থি, সুতরাং ইসলামের কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইদ্দতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিবাহ স্থায়িত্বের পরিপন্থি নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো অগ্নিপূজক তার মা কিংবা কন্যা কিংবা যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাদের মধ্য থেকে কাউকে বিবাহ করে, তারপর উভয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তবে এ ব্যাপারে ইমাম আযমের বিশুদ্ধ মত এই ছিল যে, এ বিবাহ সহীহ এবং মাশায়েখে ইরাকের মতে এ বিবাহ বাতিল ছিল। আর এটাই সাহেবাইনের অভিমত। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের মুসলমান হওয়ার পর উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, স্থায়ী মাহরামদের বিবাহ খোদ কাফেরদের মধ্যেও বাতিল বলে গণ্য। যেমন– আমরা অন্যের মু'তাদ্দার ক্ষেত্রে আলোচনা করে এসেছি। অর্থাৎ, প্রথম মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, অন্যের মু'তাদ্দার বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সকলে একমত। তাই জিম্মি-কাফেরদেরও তাতে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এমনিভাবে মুসলমানরাও একমত যে, স্থায়ী মাহরামদের বিবাহ হারাম। তাই জিম্মিরাও তাদের অনুগত হবে। তবে জিম্মি-চুক্তির কারণে তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কিন্তু যখন তারা উভয়ে মুসলমান হয়ে গেল এখন তারা ইসলামি বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর ইসলাম যেহেতু স্থায়ী মাহরামদের বিবাহের পরিপন্থি, এজন্য ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই বিচারক উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।

ইমাম আযমের দলিল হলো, অগ্নিপূজকদের বিবাহ তো স্থায়ী মাহরামের সাথে মূলত সহীহ ছিল, আর সহীহ হওয়ার কারণও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হারাম হওয়া শরিয়তের হকের কারণে হবে কিংবা স্ত্রীর হকের কারণে হবে। শরিয়তের হক এ কারণে হতে পারে না যে, কাফেররা শরিয়তের হকের সম্বোধিত নয়। তাহলে যেন সম্বোধন তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণই হয়নি। কেননা,

তারা তো মুবাল্লিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকার করে। তবে কাফেরদের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করার কর্তৃত্ব এ কারণে নেই যে, এটি তলোয়ার দ্বারা হয়, অথবা তর্ক-বিতর্ক দ্বারা হয়, আর এ উভয়টি জিম্মি-চুক্তির কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই তাদের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার হাসিল হবে না। মোদ্দাকথা, শরিয়তের হকের কারণে হুরমত সাব্যস্ত হবে না। আর স্ত্রীর হকের কারণে এজন্য সম্ভব নয় যে, স্বামী অগ্নিপূজক; সে তো হ হারাম হওয়ার বিশ্বাসই রাখে না। সুতরাং হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার দুটি সুরত ছিল আর উভয়টিই অসম্ভব। তাই আমরা বলি প্রথমত স্থায়ী মাহরামের সাথে মাজূসীদের বিবাহ সহীহ আছে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, যখন ইমাম সাহেবের মতে মাহরামের বিবাহ সূচনাতে সহীহ, তাহলে তো ইসলাম গ্রহণের পরও বাকি থাকা উচিত। বিচ্ছিন্ন করাকে কেন ওয়াজিব করা হয়েছে?

উত্তর: এর উত্তর হলো, কাফের ইসলাম গ্রহণের পর শরিয়তের হকের সম্বোধিত ব্যক্তি হয়ে গেছে। আর ইসলামি শরিয়তে মাহরাম হওয়া যেমনিভাবে শুরুতে বিবাহের পরিপন্থি, তেমনিভাবে বিবাহ অবশিষ্ট থাকারও পরিপন্থি। যেমন– এক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছোট বালকের সাথে তার দুধপান করার মুদ্দতে বিবাহ করল। তারপর ঐ নারী ঐ বালককে দুধপান করিয়ে দিল, তখন ঃ বালক তার রেজয়ী সন্তান হয়ে গেল। তাই এ নারীর বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন ইসলাম গ্রহণের কারণে ? শরিয়তের পাবন্দ হয়ে গেল, তাই এখন তার উপর হস্তক্ষেপ করা জরুরি হবে এবং বিচারক উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। ইদ্দতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, ইদ্দত বিবাহ স্থায়িত্বের পরিপন্থি নয়। তাই অন্যের মু'তাদ্দার বিবাহের ইসলাম গ্রহণের পরও অবশিষ্ট রাখা হবে।

ثُمَّ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ اِسْتِحْقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يَبْطُلُ بِمُرَافَعَةِ صَاحِبِهِ إِذْ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ اِعْتِقَادُهُ أَمَّا اِعْتِقَادُ الْمُصِرِّ بِالْكُفْرِ لَا يُعَارِضُ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى وَلَوْ تَرَافَعَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا ـ

অনুবাদ : আর দুজনের একজনের ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কিন্তু [ইসলামের বিধান জানতে চেয়ে] আদালতে একজনের মামলা দায়েরের কারণে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। সাহেবাইন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এ পার্থক্যের কারণ হলো, বিবাহের স্থায়িত্বের ব্যাপারে একজনের অধিকার অন্যজনের মামলা দায়েরের কারণে বাতিল হয় না। কেননা, এতে তো তার আকিদা ও বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় না। পক্ষান্তরে কুফরির ব্যাপারে অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস মুসলিমের ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কারণ, ইসলামের স্থান সর্বোচ্চ, নিম্নস্তরে নয়। আর যদি উভয়ে মামলা দায়ের করে, তাহলে সকলের মতেই বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কেননা, উভয়ের মামলা দায়েরের অর্থ হলো উভয় পক্ষ থেকে [কাজিকে] বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, মাজূসী মাহরামদের মধ্য থেকে যে-কোনো একজনকে বিবাহ করল, তারপর উভয়জনের মধ্য থেকে কোনো একজন মুসলমান হয়ে গেল, তাহলে সকলের মতে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে।

আর যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন কাজির নিকট মামলা দায়ের করে, [ইসলামের বিধান জানতে চায়] তাহলে ইমাম আযমের মতে, বিচ্ছেদ করা হবে না। সাহেবাইনের মতে বিচ্ছেদ করিয়ে দেওয়া হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, মূল বিবাহ তো বাতিল ছিল, কিন্তু জিম্মি-চুক্তির কারণে হস্তক্ষেপ করা হয় না। সুতরাং যখন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন মামলা দায়ের করবে অর্থাৎ, ইসলামি বিধান জানতে চাইবে এবং ইসলামের বিধানের অনুগত হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। যেমন– যদি তাদের মধ্য থেকে একজন মুসলমান হয়ে যেত, তাহলে সকলের মতে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হতো। সুতরাং তাদের দুজনের মধ্য থেকে একজন মুসলমান হয়ে যাওয়া এমন, যেমন উভয়ে মুসলমান হয়ে গেল। এমনিভাবে তাদের মধ্য থেকে একজন মামলা দায়ের করা এমন যেমন উভয়ে মামলা দায়ের করল। উভয়ের মামলা দায়ের করার সুরতে সকলের মতে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাই একজনের মামলা দায়ের করার সুরতেও বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এবং উভয় সুরতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, মূল বিবাহ তো সহীহ ছিল, তাদের মধ্য থেকে একজন কাজির নিকট মামলা দায়ের করা এবং ইসলামি বিধান সন্ধান করা অপরজনের বিরুদ্ধে তার হক বাতিল করার জন্য দলিল হবে না; বরং তার বিশ্বাস অপরজনের বিশ্বাসের পরিপন্থি এবং প্রাধান্য দানকারী না থাকার কারণে একটাকে অপরটির উপর প্রাধান্যও দেওয়া হবে না। তাই বিশুদ্ধতার হুকুম পূর্বের অবস্থার উপরই বলবৎ থাকবে। এর বিপরীত তাদের মধ্য থেকে যদি কোনো একজন মুসলমান হয়ে যায়– তখন বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। কেননা, ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে; পরাজিত হয় না। তাই কুফরির ব্যাপারে অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস মুসলমানের ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না; বরং মুসলমানের ইসলামকে প্রাধান্য দিয়ে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবে।

আর যদি উভয়ে কাজির নিকট মামলা দায়ের করে এবং ইসলামের বিধান সন্ধান করে, তবে সকলের মতে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। কেননা, তাদের উভয়ের মামলা করা এমন, যেমন উভয়ে অপর কোনো একজনকে বিচারক নির্ধারণ করল। তারা যদি কাউকে বিচারক নির্ধারণ করত এবং তার থেকে ইসলামি সমাধান চাইত, তাহলে বিচারকের জন্য জায়েজ ছিল, তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া। সুতরাং বিচারকের ব্যাপক কর্তৃত্বের কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার অধিক হক রাখে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَإِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ الخ – 'সুতরাং যদি তারা আপনার নিকট আসে তবে তাদের মাঝে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করুন।'

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَمُرْتَدَّةً لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ وَالْإِمْهَالُ ضَرُورَةُ التَّأَمُّلِ وَالنِّكَاحُ يُشْغِلُهُ عَنْهُ فَلَا يُشْرَعُ فِيْ حَقِّهِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِلتَّأَمُّلِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغُلُهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمَصَالِحُ وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِمَصَالِحِهِ .

অনুবাদ : মুরতাদের জন্য কোনো মুসলিম নারী কিংবা কাফের নারী কিংবা মুরতাদ নারীকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, সে তো হত্যাযোগ্য। তাকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে শুধু চিন্তা করার প্রয়োজনে। আর বিবাহ তাকে চিন্তা থেকে অন্যমনস্ক করবে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে বিবাহ শরিয়ত অনুমোদিত হবে না। তদ্রূপ মুরতাদ নারীকেও কোনো মুসলিম কিংবা কোনো কাফের বিবাহ করতে পারে না। কেননা, সে চিন্তা-ভাবনার জন্য আবদ্ধ থাকবে। অথচ স্বামীর সেবা তাকে চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্যমনস্ক করে দেবে। তা ছাড়া উভয়ের মাঝে বিবাহ সম্পর্কিত কল্যাণসমূহ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম পাবে না। অথচ বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে নিজস্ব সত্তাগত কারণে বৈধতা লাভ করেনি; বরং সংশ্লিষ্ট কল্যাণসমূহের কারণে [বৈধতা লাভ করেছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, মুরতাদের জন্য কোনো মুসলমান নারী কিংবা কাফের ও মুরতাদ নারীকে বিবাহ করার অনুমতি নেই। এর দলিল হলো, মুরতাদ ব্যক্তি শুধু ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার কারণে হত্যাযোগ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ – 'যে নিজের দীন পরিবর্তন করল তাকে হত্যা কর।'

قَوْلُهُ وَالْإِمْهَالُ ضَرُورَةُ التَّأَمُّلِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, মুরতাদ যেহেতু হত্যাযোগ্য, তাই তাকে সুযোগ না দেওয়া উচিত ?

উত্তর: এর উত্তর হলো, মুরতাদকে তিনদিনের অবকাশ এ কারণে দেওয়া হয়েছে, যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে তার সন্দেহকে দূর করতে পারে, যা ইসলাম সম্পর্কে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। আর বিবাহ যেহেতু তাকে চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়, তাই মুরতাদের ক্ষেত্রে বিবাহকে শরিয়ত অনুমোদন করেনি। উক্ত দলিলের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, স্বেচ্ছায় হত্যাকারী ব্যক্তিও কিসাস হিসেবে হত্যাযোগ্য, তাই তার বিবাহও সহীহ না হওয়া উচিত ? অথচ স্বেচ্ছায় হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য বিবাহ জায়েজ। এর উত্তর হলো, কিসাসের মধ্যে ক্ষমা হলো মোস্তাহাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ – সুতরাং যখন কিসাসের মধ্যে ক্ষমা হলো মোস্তাহাব, তাই হত্যাকারী আর হত্যাযোগ্য থাকল না। মুরতাদের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে সাধারণত তার ইরতিদাদ থেকে ফিরে আসে না। কেননা, সে তো ইসলামের সৌন্দর্য দেখার পরও মুরতাদ হয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার ইরতিদাদ তার ধারণা মতে কোনো সুদৃঢ় সন্দেহের কারণে; কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, কেননা ঐ ব্যভিচারী ব্যক্তি যার ব্যভিচার দলিল কিংবা স্বীকৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেও হত্যাযোগ্য। অর্থাৎ, প্রস্তরাঘাত করে হালাক করে দেবে। এতদসত্ত্বেও তার বিবাহ জায়েজ। অথচ আপনার বর্ণনা মতে সহীহ না হওয়া উচিত ? এর উত্তর হলো, সম্ভবত সাক্ষী তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে যাবে এবং প্রস্তরাঘাতের হুকুম সরে যাবে। দ্বিতীয় সূরত হলো, মুরতাদ নারীকে কোনো মুসলমান বা কাফের বিবাহ করতে পারবে না। এর দলিল হলো, মুরতাদ নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে চিন্তা-ভাবনা করে তার সংশয়কে দূর করতে পারে এবং স্বামীর খেদমত তাকে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে অন্যমনস্ক করে দেবে। এজন্য তার ব্যাপারেও বিবাহের অনুমোদন করা হয়নি। দ্বিতীয় দলিল হলো, বিবাহের কল্যাণসমূহ তাদের উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং বিবাহ সত্তাগত কারণে অনুমোদন করা হয়নি; বরং বিবাহের কল্যাণসমূহের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। বিবাহের কল্যাণসমূহ যেমন– বাসস্থান, বিবাহ, প্রজনন, বংশধারা প্রভৃতি

فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ وَكَذٰلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ تَبَعًا لَهُ نَظَرًا لَهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ نَظَرٍ لَهُ إِذِ الْمَجُوسِيَّةُ شَرٌّ مِنْهُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُخَالِفُنَا فِيهِ لِلتَّعَارُضِ وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرْجِيحَ .

অনুবাদ : স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলমান হয়, তাহলে সন্তান তারই ধর্মের উপর গণ্য হবে। তদ্রূপ যদি উভয়ের কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ছোট সন্তান থাকে, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার এ সন্তান মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তাকে মুসলিমের অনুগামী করার মধ্যেই তার প্রতি কল্যাণ রয়েছে। যদি উভয়ের একজন কিতাবী হয় আর অপরজন মাজূসী হয়, তাহেল সন্তানকে কিতাবী গণ্য করা হবে। কেননা, এতে তার প্রতি একপ্রকার কল্যাণ রয়েছে। কারণ, মাজূসী ধর্ম কিতাবী ধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট। যেহেতু উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বিষয়ে আমাদের মতের বিরোধিতা করেন, কিন্তু আমরা অগ্রাধিকার প্রমাণ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সন্তান ইসলাম ধর্মের উপর হবে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে আরবা'আ একমত। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী কাফের ছিল, স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেল কিংবা স্বামী মুসলমান হলো, তারপর অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করার পূর্বেই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলো। এখন এ শিশু ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলমানের অনুগত হবে। তবে শর্ত হলো, শিশু এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে একজন যে মুসলমান হলো তারা একই রাষ্ট্রের হতে হবে। যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের হয় যেমন– মুসলমান পিতা ইসলামি রাষ্ট্রে আর শিশু দারুল হারবে কিংবা এর উল্টো হয়, তাহলে শিশু তার পিতার ইসলামের কারণে মুসলমান বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয় সুরত হলো, স্বামী-স্ত্রীর একজন মুসলমান হয়ে গেল, তাদের একজন ছোট শিশু রয়েছে, তবে এ শিশু স্বামী-স্ত্রীর একজনের মুসলমান হওয়ার দরুন মুসলমান হয়ে যাবে। দলিল হলো, এ শিশুকে মুসলমানের অনুগত করার ক্ষেত্রে তার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়– দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। দুনিয়াতে এভাবে যে, তার সাথে কাফেরদের ন্যায় আচরণ করা হবে না এবং মৃত্যুর পর মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে এবং আখিরাতে সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর একজন কিতাবী হয় আর অপরজন মাজূসী কিংবা মূর্তিপূজক হয়, তাহলে এ শিশু কিতাবীর অনুগত হবে। এ কারণেই তার জবাইকৃত পশু হালাল এবং মুসলমানের সাথে তার বিবাহ সহীহ হবে। দলিল হলো, শিশুটিকে কিতাবীর অনুগত বানানোর ক্ষেত্রেও শিশুটির উপর একপ্রকার অনুগ্রহ করা হয়। কেননা, মাজূসী হওয়া কিতাবী হওয়া থেকে নিকৃষ্ট। তাইতো দুনিয়ায় কিতাবীর জবাইকৃত পশু হালাল, কিতাবী নারীর সাথে মুসলমানের বিবাহ বৈধ এবং পরকালে কিতাবীদের আজাব মাজূসীদের চেয়ে কম হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) শিশুকে কিতাবীর অনুগত নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধী। সুতরাং পিতা যদি কিতাবী হয় আর মা মাজূসী হয়, এ পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম মত হলো, শিশুটি মাজূসী বলে গণ্য হবে। ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। আর দ্বিতীয় মত হলো, শিশুটি পিতার অনুগত হয়ে কিতাবী হয়ে যাবে। ইমাম মালেক (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। আর যদি মা কিতাবী আর পিতা মাজূসী হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত হলো, শিশুটি পিতার অনুগত হয়ে মাজূসী হবে। তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না এবং তার সাথে কোনো মুসলমানের বিবাহ জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لِلتَّعَارُضِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল পেশ করা হয়েছে। দলিলের সারমর্ম হলো, اَلْعِلَّتَيْنِ-এর মধ্যে তা'আরুয [বৈপরীত্য] রয়েছে। অর্থাৎ, যদি শিশুকে মাজূসীর সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে তার সাথে মুসলমানের বিবাহ এবং তার জবাইকৃত পশু হারাম হবে। আর যদি কিতাবীর সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে জবাইকৃত পশুও হালাল হবে এবং তার সাথে মুসলমানের বিবাহও জায়েজ হবে। মোদ্দাকথা, মাজূসীর সাথে যুক্ত করা হারাম হওয়ার কারণ হয়ে যায় আর কিতাবীর সাথে যুক্ত করা হালাল হওয়ার কারণ হয়ে যায়। আর কায়দা আছে যে, হুরমত আর হিল্লতের কারণ যদি একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে হুরমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর হুরমত তো মাজূসীর অনুগত করার মাধ্যমে হয়। এজন্য শিশুকে মাজূসীর অনুগত করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমরা প্রাধান্যের কারণ বর্ণনা করেছি যে, শিশুকে কিতাবীর অনুগত করার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, এজন্য শিশুকে কিতাবীর অনুগত করা হয়েছে।

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذٰلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) لَا يَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لَهُمْ وَقَدْ ضَمِنَّا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ فَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ مُتَأَكِّدٌ فَيَتَأَجَّلُ إِلَى انْقِضَاءِ ثَلٰثِ حِيَضٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ ـ

অনুবাদ : স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্বামী কাফের থাকে, তাহলে কাজি তার নিকট ইসলাম পেশ করবেন। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার স্ত্রীরূপে বহাল থাকবে। আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। আর এটি তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে– ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে। আর যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার অধীনে অগ্নি উপাসক স্ত্রী থাকে, তাহলে তার নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে তার স্ত্রী থাকবে। আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। কিন্তু উভয়ের মাঝের এ বিচ্ছেদটি তালাক বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় কোনোটিতেই বিচ্ছেদ তালাক হবে না। ইসলাম পেশ করার বিষয়টি আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইসলাম পেশ করা হবে না। কেননা, এতে কাফেরদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ জিম্মি-চুক্তির মাধ্যমে আমরা তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা দিয়েছি। তবে যেহেতু সহবাসের পূর্বে বিবাহের মালিকানা দৃঢ় নয়, তাই শুধু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সহবাসের পরে তা দৃঢ় হয়, তাই বিচ্ছেদের বিষয়টি তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। যেমন তালাকের ক্ষেত্রে স্থগিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্ত্রী মুসলমান হলো এবং তার স্বামী কাফের– কিতাবী হোক বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী হোক, এখন কাজি স্বামীর নিকট ইসলাম পেশ করবে। কাজির ইসলাম পেশ করার পর স্বামী যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ঐ নারী তার স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। আর যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। আর এ বিচ্ছেদ তরফাইনের মতে তালাক বলে বিবেচিত হবে; বিবাহ রহিতকরণ হিসেবে নয়।

দ্বিতীয় সুরত হলো, স্বামী মুসলমান হয়ে গেল, তার অধীনে একজন মাজূসী স্ত্রী আছে। এখন কাজি মাজূসী স্ত্রীর নিকট ইসলাম পেশ করবে। যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তার স্ত্রী হিসেবে বহাল থাকবে এবং তাদের বিবাহও বলবৎ থাকবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবে। আর এ বিচ্ছেদ তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং বিবাহ রহিতকরণ হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উভয় সুরতে বিচ্ছেদ তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে না। স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক কিংবা স্ত্রী অস্বীকার করুক উভয় অবস্থা বরাবর; বরং বিবাহ রহিত হয়ে যাবে। উক্ত বিচ্ছেদকে রহিত বলে মান্য করার ফায়দা এই যে, বিচ্ছেদের পরেও তালাকের সংখ্যার মধ্যে হ্রাস হবে না। এ কারণেই যদি দ্বিতীয়জন মুসলমান হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তবে স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে। আর যাদের মতে বিচ্ছেদটি তালাক হিসেবে গণ্য, তাদের মতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পর স্বামী দুই তালাকের মালিক হবে। বিচ্ছেদের কারণে এক তালাক হ্রাস পাবে। মোদ্দাকথা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, স্বামী অস্বীকার করুক বা স্ত্রী অস্বীকার করুক উভয় সুরতে বিচ্ছেদ ফসখ তথা বিবাহ রহিত বলে গণ্য হবে। আর তরফাইনের মতে, স্বামী অস্বীকার করার কারণে যে বিচ্ছেদ হবে তা তালাক হবে; ফসখ হবে না। আর স্ত্রী অস্বীকার করার কারণে যে বিচ্ছেদ হবে তা ফসখ হবে; তালাক হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয়জনের নিকট ইসলাম পেশ করা আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দ্বিতীয়জনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, ইসলাম পেশ করার দ্বারা জিম্মিদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। অথচ জিম্মি-চুক্তির কারণে আমরা এ কথার নিশ্চয়তা দিয়েছিলাম যে, আমরা তাদের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। কিন্তু যেহেতু সহবাসের পূর্বে বিবাহের মালিকানা দৃঢ় নয়, তাই ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সহবাসের পর বিবাহ দৃঢ় হয়, তাই বিচ্ছেদের বিষয়টি তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকে। যেমন– তালাকের ক্ষেত্রে স্থগিত থাকে। অর্থাৎ, সহবাসের পূর্বে শুধু তালাকই বিবাহকে ভঙ্গ করে দেয়, আর সহবাসের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর ভঙ্গ হয়।

হিদায়া গ্রন্থকারের ইবারত– فَيَتَأَجَّلُ اِلَى اِنْقِضَاءِ ثَلٰثِ حِيَضٍ -এর মধ্যে ثَلٰثِ حِيَضٍ কথাটি ভুল। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইদ্দতের মধ্যে 'তুহর' গ্রহণযোগ্য; হায়েজ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ ইবারত মনে করে একথা বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হে হানাফীরা! তোমাদের নিকট সমীচীন হলো, বিচ্ছেদের বিষয়টি তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এ হিসেবে ইবারত সঠিক হয়ে যাবে।

وَلَنَا اَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَاتَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ يَبْتَنِىْ عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ وَالْاِسْلَامُ طَاعَةٌ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لَهَا فَيُعْرَضُ الْاِسْلَامُ لِيَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْاِسْلَامِ اَوْ يَثْبُتَ الْفُرْقَةُ بِالْاِبَاءِ وَجْهُ قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ يَشْتَرِكُ فِيْهِ الزَّوْجَانِ فَلَا يَكُوْنُ طَلَاقًا كَالْفُرْقَةِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَلَهُمَا اَنَّ بِالْاِبَاءِ اِمْتَنَعَ عَنِ الْاِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوْفِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْاِسْلَامِ فَيَنُوْبُ الْقَاضِىْ مَنَابَهُ فِى التَّسْرِيْحِ كَمَا فِى الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ اَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتْ بِاَهْلٍ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوْبُ مَنَابَهَا عِنْدَ اِبَائِهَا ثُمَّ اِذَا فَرَّقَ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا بِاِبَائِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ اِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لِتَاَكُّدِهٖ بِالدُّخُوْلِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا لِاَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِهَا وَالْمَهْرُ لَمْ يَتَاَكَّدْ فَاَشْبَهَ الرِّدَّةَ وَالْمُطَاوَعَةَ.

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, [একজনের ইসলাম গ্রহণের কারণে] বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হয়ে গেছে। সুতরাং এমন একটি কারণ থাকতে হবে, যার উপর বিচ্ছেদের ভিত্তি রাখা যায়। ইসলাম হলো আল্লাহর আনুগত্য। সুতরাং তা বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। তাই ইসলাম পেশ করা হবে, যাতে ইসলাম গ্রহণের কারণে বিবাহের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে, কিংবা অস্বীকার করার কারণে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, বিচ্ছেদ এমন কারণে হয়েছে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক, সুতরাং এটা তালাক হতে পারে না। যেমন– মালিকানা লাভের কারণে সাব্যস্ত বিচ্ছেদটি তালাক নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে স্ত্রীকে রাখা থেকে বিরত রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাজি তার স্থলবর্তী হবে। যেমন– কর্তিত পুরুষাঙ্গ বা পুরুষত্ব রহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যেহেতু তালাকের অধিকারী নয়, তাই সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হলে কাজি উভয় পক্ষ থেকে তালাকের স্থলবর্তী হতে পারে না। অতঃপর কাজি যখন স্ত্রীর অধিকারের কারণে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন, তখন স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করে থাকলে সে পূর্ণ মহর পাবে। কেননা, সহবাসের কারণে মহর অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে সে মহর পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ তার পক্ষ থেকে ঘটেছে আর মহর অবশ্যম্ভাবী হয়নি। সুতরাং বিষয়টি মুরতাদ হওয়ার কিংবা স্বামী পুত্রকে সুযোগ প্রদানের অনুরূপ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَاتَتْ الخ : গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতে আহনাফের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের দলিল হলো, স্ত্রীর মুসলমান হওয়া কিংবা মজূসী স্ত্রীর স্বামী মুসলমান হওয়ার দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হয়ে গেছে। আর ব্যাহত হওয়া একটি নব বিষয়। সুতরাং এর জন্য এমন একটি কারণ থাকা দরকার যার উপর তার [বিচ্ছেদের] ভিত্তি রাখা যায়। এখন দুটি সুরত রয়েছে ১. ইসলামকে বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হওয়ার কারণ বা সবব ধরা হবে কিংবা ২. ঐ ব্যক্তির অস্বীকারকে ধরা হবে যে এখনো কুফরি অবস্থায় আছে। প্রথম সুরত সম্ভব নয়। কেননা, ইসলাম হলো [আল্লাহর] আনুগত্য। বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহের ন্যায় নিয়ামতরাজির ব্যাহত হওয়ার কারণ এটি হতে পারে না। আর দ্বিতীয় সুরতও সম্ভবপর নয়। কেননা, যার কুফরি এখনো বাকি আছে তার কুফরি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে এবং তার কুফরি সূচনাতেও বিবাহকে বারণ করেনি এবং পরেও বিবাহের উদ্দেশ্যগুলোকে ব্যাহত করেনি। সুতরাং উপরে বর্ণিত কারণগুলো ব্যতীত অন্য একটি কারণ থাকা দরকার [যার উপর বিচ্ছেদের ভিত্তি করা যাবে]। এ কারণে কাজি সাহেব যার কুফরি এখনো বাকি তার নিকট ইসলাম পেশ করবেন। এখন যদি কেউ মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ বিবাহের উদ্দেশ্যগুলোই অর্জন হয়ে যাবে; বিচ্ছেদের আর প্রয়োজন থাকবে না। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ইসলাম থেকে এ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। কেননা, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকারকরণ নিয়ামত দূরীভূত হওয়ার কারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যেহেতু বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হওয়ার জন্য বিচ্ছে

জরুরি, তাই যে জিনিস ব্যাহত হওয়ার সবব হবে তা তার লাযিম তথা বিচ্ছেদেরও সবব হবে। তাই হানাফীগণ বলেন, مَنْ يَبْقَى عَلَى كُفْرِ -এর নিকট ইসলাম পেশ করা হবে, যাতে তার ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিচ্ছেদের কারণ বানানো যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কথা বলা যে, জিম্মিদের প্রতি হস্তক্ষেপ করা নিষেধ– এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্মতিক্রমে তার সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ নয়। আমাদের মাযহাবের সমর্থন ইবনে শিহাব যুহরী কর্তৃক মুয়াত্তায় বর্ণিত হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপ–

اَنَّ اِبْنَةَ الْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ ابْنِ اُمَيَّةَ فَاَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ ابْنُ اُمَيَّةَ مِنَ الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِهِ حَتّٰى اَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَتُهُ بِذٰلِكَ النِّكَاحِ .

'ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কন্যা সাফওয়ান ইবনে উমায়্যার বিবাহে ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সে মুসলমান হয়ে গেল এবং তার স্বামী সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইসলাম ধর্ম থেকে পলায়ন করল। [কিন্তু] রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাননি। এদিকে সাফওয়ান মুসলমান হয়ে গেল এবং তার নিকট তার স্ত্রী ঐ বিবাহেই বহাল ছিল।'

ইমাম তাহাবী ও ইবনুল আরাবী (র.) উল্লেখ করেছেন যে– اَنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ نَصْرَانِيٍّ وَبَيْنَ نَصْرَانِيَّةٍ بِاِبَائِهِ عَنِ الْاِسْلَامِ 'হযরত ওমর (রা.) নাসরানীর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে নাসরানী ও নাসরানিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন।

وَذَكَرَ اَصْحَابُنَا اَنَّ رَجُلًا مِنْ تَغْلِبَ اَسْلَمَتْ اِمْرَأَتُهُ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ فَرُفِعَتْ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ وَاِلَّا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

অর্থাৎ, আমাদের বুজুর্গগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাগলিব গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেল। অথচ সে নাসরানিয়া ছিল। সে [স্ত্রী] হযরত ওমরের আদালতে মকদ্দমা দায়ের করল। তিনি তাকে [স্বামী]-কে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও, অন্যথায় তোমাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। [কিন্তু] সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। ফলে তিনি তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিলেন। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা ইসলাম পেশ করা সাবেত হলো। –[আল-কিফায়া, ফাতহুল কাদীর]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে ফারিগ হওয়ার পর وَجْهُ قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হচ্ছে। কেননা, তিনি বলেছিলেন, বিচ্ছেদ উভয় সুরতে তালাক নয়; বরং ফসখ। তার মতের কারণ এই যে, বিচ্ছেদ এমন কারণে হয়েছে যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক। অর্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে উভয়ের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মুসলমান হলো আর অপরজন ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল, অস্বীকার করল। এতেই বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। আর প্রত্যেক ঐ বিচ্ছেদ যা এমন কারণে সংঘটিত হয় যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক থাকে, তা তালাকরূপে গণ্য হয় না। যেমন– স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনের মালিক হলো, এর দরুন যে বিচ্ছেদ হলো তা তালাকরূপে গণ্য হবে না; বরং বিবাহ রহিত (فَسْخ) বলে গণ্য হবেঃ

তরফাইনের দলিল এবং উভয় সুরতের মধ্যকার পার্থক্যের কারণ হলো, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির দ্বারা স্বামী নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে রাখা থেকে বিরত থাকল, অথচ সে ইসলাম কবুল করার দ্বারা নিয়মানুযায়ী রাখার উপর সামর্থ্যবান ছিল। আর শরিয়তের নীতিমালা রয়েছে যে, স্বামী যদি নিয়মানুযায়ী রাখা থেকে বিরত থাকে, তাহলে স্ত্রীকে মুক্ত করার ব্যাপারে কাজি স্বামীর স্থলবর্তী হবে। আর মুক্ত করার নামই তো তালাক। সুতরাং কাজির এ বিচ্ছেদ করাকে তালাক বলা হবে। যেমন– কর্তিত পুরুষাঙ্গ বা পুরুষত্ব রহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্ত্রীর চাওয়া দ্বারা বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। আর এ বিচ্ছেদ তালাক বলে বিবেচিত হয়। এমনিভাবে এখানেও স্বামীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে। মোদ্দাকথা, স্ত্রী যেহেতু তালাকের অধিকারীই নয় তাই তার ইসলাম থেকে বিরত থাকার সময় কাজি [স্ত্রীকে] মুক্ত করার ব্যাপারে তার স্থলবর্তী হতে পারে না। কেননা, تَشْرِيْع তথা তালাকের চিন্তা স্ত্রী থেকে করাই যায় না।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِذَا فَرَّقَ الْقَاضِيْ بَيْنَهُمَا الخ : অতঃপর তার ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে যখন কাজি বিচ্ছেদ করে দিল, এখন দেখতে হবে যে, তার স্বামী ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল কিনা? যদি সহবাস করে থাকে, তবে স্ত্রীর জন্য পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, সহবাসের কারণে মহর অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। আর যদি সহবাস না করে, তবে স্ত্রী মহর পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে, আর সহবাস না করার কারণে মহরও অবশ্যম্ভাবী হয়নি। সুতরাং এটি মুরতাদ কিংবা স্বামী-পুত্রকে সুযোগ প্রদানের অনুরূপ হয়ে গেল। অর্থাৎ স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেল কিংবা নিজের স্বামীর পুত্রকে নিজের উপর সুযোগ প্রদান করল। সুতরাং এটি যদি সহবাসের পরে হয়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। কেননা, সহবাস দ্বারা মহর দৃঢ় হয়ে গেছে। আর যদি সহবাসের পূর্বে হয়, তবে সে মহর পাবে না।

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتّٰى تَحِيضَ ثَلٰثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا وَهٰذَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَةِ رَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ السَّبَبِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُوْلِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا وَالشَّافِعِيُّ (رح) يَفْصِلُ كَمَا مَرَّ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةَ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا وَسَيَأْتِيْكَ إِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلٰى نِكَاحِهِمَا لِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا اِبْتِدَاءً فَلِأَنْ يَبْقٰى أَوْلٰى .

অনুবাদ : স্ত্রী যদি দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্বামী কাফের থেকে যায়, কিংবা হারবী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তার স্ত্রী কোনো মাজূসী নারী থাকে, তাহলে তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর উপর বিচ্ছেদ পতিত হবে না। এরপর সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, ইসলাম বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। আর [ইসলামি শাসকের] কর্তৃত্ব না থাকার কারণে ইসলাম পেশ করা সম্ভবপর নয়, অথচ ফাসাদ নিরসনের জন্য বিচ্ছেদ অপরিহার্য। তাই বিচ্ছেদের শর্ত তথা তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়াকে আমরা সববের স্থলবর্তী করেছি। যেমন কূপ খননের ক্ষেত্রে সহবাসকৃতা হওয়া-না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দারুল ইসলামের একই ধরনের ঘটনায় তিনি পার্থক্য করেছেন। যদি বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, আর স্ত্রী হারবিয়া হয়, তাহলে [সকলের মতেই] তার উপর ইদ্দত আবশ্যক নয়। যদিও স্ত্রী মুসলমান হয়, তাহলেও একই হুকুম। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। ইনশাআল্লাহ এ আলোচনা সামনে আসবে। কিতাবী নারীর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। কেননা, উভয়ের মাঝে বিবাহের সূচনা বৈধ। সুতরাং বিবাহ বহাল থাকাটা আরো স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, দারুল হারবে এক স্ত্রী মুসলমান হলো, তার স্বামী কাফের কিংবা হারবী স্বামী মুসলমান হলো আর তার কোনো মাজূসী স্ত্রী আছে, তবে উভয় সুরতে স্ত্রীর তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হবে না। আর যদি স্ত্রী ঋতুমতী না হয়, তবে তিন মাস অতিক্রান্ত করবে। অতঃপর তিন হায়েজ কিংবা তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিচ্ছেদ পতিত হবে এবং এ স্ত্রী তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এ কথা লক্ষণীয় যে, বিচ্ছেদ হওয়ার পর ইদ্দতের জন্য দ্বিতীয়বার তিন হায়েজ কিংবা তিন মাস অতিবাহিত করবে।
—[আইনী শরহে হিদায়া]

দলিলের পূর্বে এ কথা বুঝতে হবে যে- اَلْعَرْضُ عَلَى الْاِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ -এর মধ্যে ইবারতটি উল্টো হয়ে গেছে। মূলত ইবারত হবে- عَرْضُ الْاِسْلَامِ عَلَى الْكَافِرِ مُتَعَذِّرٌ কেননা, ইসলামের উপর কাফেরকে পেশ করা যায় না; বরং কাফেরের উপর ইসলামকে পেশ করা হয়। যেমন বলা হয়- عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْعَوْضِ এবং اَدْخَلْتُ الْخَاتَمَ فِي الْاِصْبَعِ অথচ মূলত হবে- عَرَضْتُ الْعَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ এবং اَدْخَلْتُ الْاِصْبَعَ فِي الْخَاتَمِ

এখন দলিলের সারসংক্ষেপ হলো, ইসলাম বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। যেমন পূর্বের মাসআলা দ্বারা জানা গেছে এবং যেহেতু দারুল হারবে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্বও নেই। তাই দারুল হারবে কাফেরদের নিকট ইসলাম পেশ করাও অসম্ভব। এদিকে ফাসাদ নিরসনের জন্য বিচ্ছেদ করাও অপরিহার্য। [ফাসাদ হলো মুসলমানের কাফেরের অধীনে থাকা]। তাই যখন বিচ্ছেদের সবব তথা ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে ধরে নেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল, তাই আমরা বিচ্ছেদের শর্ত [তিন হায়েজ অতিক্রম করা যদি ঋতুমতী হয় কিংবা তিন মাস অতিক্রম করা যদি ঋতুমতী না হয়] -কে বিচ্ছেদের সববের স্থলবর্তী করে দিয়েছি। যেমন, কূপ খননের ক্ষেত্রে। যেমন- এক ব্যক্তি পাবলিক রাস্তায় কিংবা অন্যের জায়গায় কূপ খনন করল। তারপর এর মধ্যে কোনো মানুষ কিংবা পশু পড়ে মারা গেল। এতে খননকারী জামিন হবে। কেননা, কূপে পতিত হওয়া ইল্লত বা সবব হলো পড়া ব্যক্তির ওজন বা বোঝা। কিন্তু বোঝা পতিত হওয়ার কারণ হতে পারে না। কেননা, এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়, যার মধ্যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি নেই। আর পতিত হওয়ার কারণ হলো চলা। কিন্তু 'চলা'-কেও সবব নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা, রাস্তায় চলাচল করা উন্মুক্তভাবে সকলের জন্য জায়েজ। তাই পতিত হওয়ার শর্ত কূপ খননকে সববের স্থলবর্তী করে শর্তের মালিক অর্থাৎ, কূপ খননকারীকে জিম্মাদার নিরূপণ করা হয়েছে। এমনিভাবে এখানেও বিচ্ছেদের শর্ত বিচ্ছেদের সববের স্থলবর্তী।

আমাদের নিকট সহবাসকৃতা হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টি বিচ্ছেদের জন্য তিন হায়েজ অতিক্রম করা শর্ত। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ঐ ব্যাখ্যাই করেন যেমনটি পার্থক্য করেছেন দারুল ইসলামে। অর্থাৎ, দারুল হারবের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ সহবাসের পূর্বে হয়, তাহলে তখনই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি সহবাসের পরে হয়, তাহলে তিন হায়েজ অতিক্রম করার পর বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে করজোড়ে বলি যে, হযরত! এ তিন হায়েজ ইদ্দতের জন্য নয়; বরং বিচ্ছেদের জন্য। তাই এর মধ্যে সহবাসকৃতা হওয়া-না হওয়া বরাবর। -[আইনী শরহে হিদায়া]

قَوْلُهُ وَاِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যখন তিন হায়েজ অতিক্রম করার পর বিচ্ছেদ হয়ে গেল এবং স্ত্রীও হারবী; মুসলমান হয়নি শুধু তার স্বামী মুসলমান হয়েছে। তাহলে সকলের মতে হারবী স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা, শরিয়তের বিধান তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় না। আর যদি হারবী স্ত্রী মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী হারবী কাফেরই থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। সাহেবাইনের মতে তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। শামসুল আইম্মা এমনটিই উল্লেখ করেছেন। ইনশাআল্লাহ এ আলোচনা সামনে করা হবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ الخ : আর যদি কিতাবী স্ত্রীর স্বামী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তারা উভয়ে পূর্বের বিবাহের উপর বহাল থাকবে। কেননা, মুসলমান স্বামী ও কিতাবী নারীর মধ্যকার বিবাহ সূচনাতেই সহীহ আছে, তাই পরেও অবশ্যই সহীহ থাকবে। কেননা, পরের অবস্থা সূচনার অবস্থার চেয়ে সহজ।

قَالَ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رضـ) لَا تَقَعُ وَلَوْ سُبِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ يَقَعِ الْبَيْنُوْنَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) وَقَعَتْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَبَ هُوَ التَّبَايُنُ دُوْنَ السَّبْيِ عِنْدَنَا وَهُوَ يَقُوْلُ بِعَكْسِهِ لَهُ أَنَّ التَّبَايُنَ أَثَرُهُ فِيْ إِنْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ وَ ذٰلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمِنِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ أَمَّا السَّبْيُ فَيَقْتَضِي الصَّفَاءَ لِلسَّابِيْ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَلِهٰذَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمَسْبِيِّ وَلَنَا أَنَّ مَعَ التَّبَايُنِ حَقِيْقَةً وَحُكْمًا لَا يَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ فَشَابَهَ الْمَحْرَمِيَّةَ وَالسَّبْيُ يُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يُنَافِي النِّكَاحَ إِبْتِدَاءً فَكَذٰلِكَ بَقَاءً فَصَارَ كَالشِّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَقْتَضِي الصَّفَاءَ فِيْ مَحَلِّ عَمَلِهِ وَهُوَ الْمَالُ لَا فِيْ مَحَلِّ النِّكَاحِ وَفِي الْمُسْتَأْمَنِ لَمْ يَتَبَايَنِ الدَّارُ حُكْمًا لِقَصْدِهِ الرُّجُوْعَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল হারব থেকে আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিচ্ছেদ ঘটবে না। স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি বন্দি হয়ে যায়, তাহলে তালাক ছাড়াই উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে উভয়ে একসঙ্গে বন্দি হলে বিচ্ছেদ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। মোটকথা, আমাদের মতে [বিচ্ছেদের] কারণ হলো দুই দেশের ভিন্নতা; বন্দিত্ব নয়, কিন্তু তিনি এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর যুক্তি হলো, দুই দেশের ভিন্নতার প্রভাব হলো, [উভয়ের মাঝে] কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর বিচ্ছেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই। যেমন– নিরাপত্তা গ্রহণ করে আগমনকারী হারবী এবং নিরাপত্তা গ্রহণ করে গমনকারী মুসলমান [নিজ নিজ বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব কর্তিত হয়ে যায়, অথচ বিচ্ছেদ হয় না]। পক্ষান্তরে বন্দিত্বের দাবি হলো বন্দিকারীর জন্য বন্দি পূর্ণরূপে অধিকারে এসে যাওয়া। আর তা বিবাহ বন্ধন কর্তিত হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই বন্দির জিম্মার যাবতীয় ঋণ রহিত হয়ে যায়। আমাদের দলিল হলো, প্রকৃত এবং দৃশ্যত দেশ-ভিন্নতা অবস্থায় বিবাহের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকতে পারে না। সুতরাং মাহরাম হওয়ার মতো হয়ে গেল। আর বন্দিত্ব দেহ-সত্তার উপর মালিকানা সাব্যস্ত করে, আর তা বিবাহের সূচনার পরিপন্থি নয়। সুতরাং বিবাহের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং তা ক্রয়ের ন্যায় হলো। তা ছাড়া বন্দিত্ব তার কর্মক্ষেত্রে বন্ধনহীনতা দাবি করে আর তা হলো তার দেহ-সত্তার অর্থগত দিক। কিন্তু বিবাহ স্থলের মধ্যে বন্ধনহীনতা দাবি করে না। আর নিরাপত্তা নিয়ে আগমনকারীর ক্ষেত্রে আইনত দেশ-ভিন্নতা হয়নি। কেননা, তার প্রত্যাবর্তনের নিয়ত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মধ্যে তিনটি সুরত রয়েছে– একটি হলো مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর দুটি হলো مُخْتَلَفٌ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ সুরত তো হলো, স্বামী-স্ত্রীর যে-কোনো একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সুরতে সকলের মতে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। مُخْتَلَفٌ فِيْهِ -এর প্রথম সুরত হলো, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মুসলমান হয়ে যদি দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে হানাফীগণের মতে তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিচ্ছেদ হবে না।'

مُخْتَلَفٌ فِيْهِ -এর দ্বিতীয় সুরত হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গ্রেফতার হয়েছে। এ সুরতে হানাফীগণের মতে বিচ্ছেদ হবে না, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। মোটকথা হলো, আমাদের মতে বিচ্ছেদের সবব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রকৃত বা দৃশ্যত দুই দেশের ভিন্নতা; বন্দিত্ব নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিচ্ছেদের সবব হলো বন্দিত্ব; দেশের ভিন্নতা নয়। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, দুই দেশের ভিন্নতার প্রভাব এই যে, দুই দেশের ভিন্নতার কারণে [উভয়ের মাঝের] কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায়, আর কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার কোনো ভূমিকা বিচ্ছেদের মধ্যে নেই। যেমন– একজন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল। তাই দুই দেশের ভিন্নতার কারণে ঐ নিরাপত্তা গ্রহণকারী আগমনকারী হারবীর কর্তৃত্ব তো রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার আর তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি। এমনিভাবে কোনো মুসলমান নিরাপত্তা গ্রহণ করে দারুল হারবে চলে গেল, এতে তার কর্তৃত্ব তো রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার আর তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি। সুতরাং বুঝা গেল যে, দুই দেশের ভিন্নতার কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব তো আছে, কিন্তু বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব নেই। পক্ষান্তরে বন্দিত্বের দাবি হলো বন্দিকারীর জন্য বন্দি পূর্ণরূপে এসে যাওয়া। আর এটি তখনই সম্ভব যখন বিবাহ-বন্ধন কর্তিত হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল, বন্দি হওয়াটা কর্তৃত্ব রহিত হওয়া এবং বিচ্ছেদ উভয়টির সবব– চাই উভয়ে একসাথে বন্দি হোক কিংবা আলাদা বন্দি হোক। আর যেহেতু বন্দি ব্যক্তি পূর্ণরূপে বন্দিকারীর জন্য হয়ে যায়, তাই বন্দির উপর থেকে যাবতীয় ঋণ রহিত হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো, দেশ-ভিন্নতা প্রকৃত এবং দৃশ্যত বিবাহের স্বার্থের বিপরীত। আর যে সকল বস্তু স্বার্থের বিপরীত হয় সেগুলো বিবাহ-বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়। যেমন– মাহরাম হওয়ার বিষয়টি। তাই দুই দেশের ভিন্নতা বিবাহকে ছিন্ন করে দেবে। প্রকৃত দেশ-ভিন্নতা এই যে, তাদের উভয়ের মাঝে ব্যক্তিত্বের দূরত্ব পাওয়া যাবে। যেমন– একজন দারুল হারবে, অপরজন দারুল ইসলামে। আর দৃশ্যত দেশ-ভিন্নতা এই যে, যে দেশে গিয়েছে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত নেই; বরং ফিরে যাওয়ার নিয়ত রয়েছে। [যেমন– নিরাপত্তা নিয়ে আগমনকারী হারবী কিংবা গমনকারী মুসলমান। যেহেতু তাদের প্রত্যাবর্তনের নিয়ত রয়েছে, তাই তাদের উপর প্রকৃত দেশ-ভিন্নতার হুকুম আরোপিত হয় না]। এ পর্যন্ত মাযহাব সাবেত করার বর্ণনা ছিল।

قَوْلُهُ وَالسَّبْىُ يُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, বন্দিত্ব দ্বারা দেহ-সত্তার উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর দেহ-সত্তার মালিকানা বিবাহের সূচনার পরিপন্থি নয়। যেমন– এক ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে অন্যের কাছে বিবাহ দিল। এ ধরনের বিবাহ বৈধ। অথচ মনিবের দেহ-সত্তার মালিকানা রয়েছে। তাই দেহ-সত্তার মালিকানার স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও তা বিবাহের পরিপন্থি হবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্যের বিবাহ স্থায়ী আছে। তাই বন্দিত্ব ক্রয়ের ন্যায় হয়ে গেল। অর্থাৎ, যেমনিভাবে ক্রয় দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না, তেমনিভাবে বন্দিত্ব দ্বারাও বিবাহ ফাসেদ হবে না – বৈপরীত্য না থাকার কারণে। তারপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কথা বলা যে, বন্দিত্বের দাবি হলো বন্দিকারীর জন্য বন্দি পূর্ণরূপে এসে যাওয়া। তাঁর এ কথা আমরা মানি, কিন্তু বন্দিত্ব তো সে সকল স্থানেই পূর্ণ অধিকারে আসার দাবি করে যেখানে তার আমল আছে। অর্থাৎ, অর্থের মধ্যে; বিবাহের স্থানের মধ্যে নয়। তাইতো বন্দিকারীর জন্য বন্দিত্বের সত্তার মধ্যে বিশেষভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হয়– বিবাহের মহলের মধ্যে হয় না অর্থাৎ যৌনাঙ্গের কার্যের মধ্যে হয় না। কেননা, এটি তার আমলের মহল নয়। কারণ, বিবাহ-শাদি মানুষের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত; অর্থগত দিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বন্দিত্ব বিচ্ছেদের সবব নয়।

قَوْلُهُ وَفِى الْمُسْتَأْمَنِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, আমাদের মতে, দেশ-ভিন্নতা শর্তহীনভাবে বিচ্ছেদ হওয়ার সবব নয়; বরং ঐ ধরনের ভিন্নতাই সবব, যা কার্যত কিংবা দৃশ্যত উভয়ভাবে [ভিন্ন] হয়। আর নিরাপত্তা গ্রহণ করে আগমনকারী হারবী এবং নিরাপত্তা গ্রহণ করে গমনকারী মুসলমান যদিও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন, কিন্তু দৃশ্যত ভিন্ন নয়। কেননা, নিরাপত্তা গ্রহণ করে আগমনকারী হারবী দারুল ইসলাম থেকে আর নিরাপত্তা গ্রহণ করে গমনকারী মুসলমানের দারুল হারব থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছা রয়েছে। তাই তাদের উভয়ের উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না।

قَالَ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فِىْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهَا أَثَرُ النِّكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ وَجَبَتْ إِظْهَارًا لِخَطَرِهِ وَلَا خَطَرَ لِمِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَلِهٰذَا لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَسْبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا وَعَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا كَمَا فِى الْحُبْلٰى مِنَ الزِّنَا وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ فَإِذَا ظَهَرَ الْفِرَاشُ فِىْ حَقِّ النَّسَبِ يَظْهَرُ فِىْ حَقِّ الْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ إِحْتِيَاطًا ـ

অনুবাদ : স্ত্রী যদি হিজরত করে আমাদের নিকট দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে সে বিবাহ করতে পারে। তার উপর ইদ্দত আবশ্যক নয়। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, তার উপর ইদ্দত আবশ্যক। কেননা, দারুল ইসলামে প্রবেশের পর বিচ্ছেদ ঘটেছে। সুতরাং তার উপর ইসলামের বিধান কার্যকর হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ইদ্দত হচ্ছে পূর্ববর্তী বিবাহের ফল, যা বিবাহের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হয়েছে। আর হারবীর মালিকানার কোনো মর্যাদা নেই। এ কারণেই বন্দি মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব নয়। যদি স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়, তাহলে প্রসবের পূর্বে বিবাহ করতে পারবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক বর্ণনা আছে যে, বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে। তবে প্রসব পর্যন্ত স্বামী তার নিকটবর্তী হতে পারবে না। যেমন, জেনার কারণে গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে। প্রথমোক্ত মতের কারণ হলো, [অন্যের পক্ষ থেকে] এ গর্ভের নসব প্রমাণিত। সুতরাং নসবের ক্ষেত্রে যখন শয্যাধিকার প্রকাশ পেল, তখন সতর্কতার খাতিরে বিবাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও তা প্রকাশ পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, একজন স্ত্রী দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসল। সে মুসলিম নারী হোক জিম্মি নারী হোক, তার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছাও নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মুহাজির স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ এবং তার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে, তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো, দারুল ইসলামে প্রবেশের পর বিচ্ছেদ ঘটেছে। আর প্রত্যেক বিচ্ছেদ যা দারুল ইসলামে ঘটে তার উপর ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর হয়। আর ইদ্দতও ইসলামি আহকামের অন্তর্ভুক্ত। তাই উক্ত মুহাজির স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ হারবী যদি দারুল হারবে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর ঐ স্ত্রী দারুল ইসলামে হিজরত করে আসে, তাহলে সকলের মতে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আযমের দলিল হচ্ছে, ইদ্দত হলো পূর্ববর্তী বিবাহের ফল, যা বিবাহের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হয়েছে। অথচ হারবী পুরুষের বিবাহের মালিকানার কোনো মর্যাদা নেই। এজন্য সকলের মতে ঐ বন্দি মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ حَامِلًا الخ : উল্লিখিত মাসআলাটির দ্বিতীয় সুরত হলো, ঐ মুহাজির মহিলাটি যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে প্রসবের পূর্বে বিবাহ করতে পারবে না। এ মতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় মত যা ইমাম আবূ ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আযম থেকে বর্ণনা করেছেন, তা হলো, ঐ মুহাজির গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করা তো সহীহ আছে, তবে প্রসবের পূর্বে তার সাথে সহবাস করবে না।

প্রথম মতের কারণ হলো, অন্যের পক্ষ থেকে এ গর্ভের নসব প্রমাণিত। সুতরাং নসবের ক্ষেত্রে যখন শয্যাধিকার প্রকাশ পেল তখন সতর্কতার খাতিরে বিবাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, এ গর্ভধারিণী তার কাফের স্বামীর বিশুদ্ধ শয্যাসঙ্গিনী। তাই তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর যেহেতু সতর্কতার খাতিরে বিবাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রেও শয্যাধিকার প্রকাশ পেল তাই তার সাথে বিবাহও সহীহ হবে না। ইনায়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হারবী পুরুষের কোনো মর্যাদা নেই। তাই তার অংশ অর্থাৎ, গর্ভের মর্যাদা অবশ্যই হবে না। তাই মুহাজির গর্ভধারিণীর সাথে বিবাহকে বৈধ বলা হয়েছে। যেমনটি ব্যভিচারের গর্ভধারিণীর ক্ষেত্রে করা হয়। কেননা, ব্যভিচারের বীর্যের কোনো মর্যাদা নেই। আর সহবাসের অনুমতি এ কারণে দেওয়া হয়নি যে, এর মাধ্যমে নিজের পানি দ্বারা অন্যের জমিন সিঞ্চন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে [তবে প্রথম মতটি বিশুদ্ধ]।

মোটকথা হলো, অন্যের মাধ্যমে গর্ভসঞ্চার শর্তহীনভাবে সহবাস করাকে বারণ করে। আর যেহেতু হামল বা গর্ভ দ্বারা নসব সাব্যস্ত হয়, তাই তা বিবাহকেও বারণ করবে।

قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْاِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنَ الزَّوْجِ فَهِيَ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ هُوَ يَعْتَبِرُ بِالْاِبَاءِ وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَّاهُ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رح) مَرَّ عَلٰى مَا اَصَّلْنَا لَهٗ فِي الْاِبَاءِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ وَجْهُهٗ اَنَّ الرِّدَّةَ مُنَافِيَةٌ لِلنِّكَاحِ لِكَوْنِهَا مُنَافِيَةً لِلْعِصْمَةِ وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَذَّرَ اَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا بِخِلَافِ الْاِبَاءِ لِاَنَّهٗ يُفَوِّتُ الْاِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوْفِ فَيَجِبُ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ عَلٰى مَا مَرَّ وَلِهٰذَا يَتَوَقَّفُ الْفُرْقَةُ بِالْاِبَاءِ عَلَى الْقَضَاءِ وَلَا تَتَوَقَّفُ بِالرِّدَّةِ ثُمَّ اِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ اِنْ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَاِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ اِنْ دَخَلَ بِهَا وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ لِاَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِهَا .

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ধর্মত্যাগ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। তিনি [স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর] স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অস্বীকৃতির উপর এটিকে কিয়াস করেন। উভয় সুরতের মাঝে সমন্বয় তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে বর্ণিত তাঁর নীতিই এ বিষয়ে অনুসরণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাঁর দলিল হলো, ধর্মত্যাগ বিবাহের পরিপন্থি। কেননা, তা নিরাপত্তা রহিতকারী। পক্ষান্তরে তালাক বিবাহ স্থগিতকারী। সুতরাং উক্ত বিচ্ছেদকে তালাক গণ্য করা সম্ভব নয়। ইসলাম গ্রহণের অস্বীকৃতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা সদাচারের সাথে স্ত্রীকে রাখার সুযোগকে নষ্ট করে। সুতরাং উত্তমভাবে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই অস্বীকৃতিজনিত বিচ্ছেদ আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল। অথচ ধর্মত্যাগজনিত বিচ্ছেদ তার উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মত্যাগ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে সহবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাসের পূর্বে হয়ে থাকলে সে অর্ধেক মহর পাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সহবাস হয়ে থাকলে সে পূর্ণ মহর পাবে। আর সহবাস না হয়ে থাকলে সে কোনো মহর পাবে না এবং খোরপোশও পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ তার দিক থেকে এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তখনই তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক, উভয় অবস্থায় সম[ান] বিধান। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ধর্মত্যাগ সহবাসের পূর্বে হয়, তাহলে তখনই বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর যদি সহবাসের পরে হয়, তাহলে তিন হায়েজ অতিক্রম করার পর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বামী-স্ত্রীর কো[নো]

একজনের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। ইবনে আবী লায়লা বলেন, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের মুরতাদ হওয়ার দ্বারা বিচ্ছেদ হবে না। সহবাসের পূর্বেও না এবং পরেও না; বরং মুরতাদকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, তার এ স্ত্রী পূর্বের বিবাহেই বহাল থাকবে। আর যদি ধর্মত্যাগ অবস্থায় মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তাহলে তার স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে। মোদ্দাকথা, ধর্মত্যাগের দরুন যে বিচ্ছেদ হয়, তা শায়খাইনের মতে তালাক নয়; বরং বিবাহ রহিতকরণ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধর্মত্যাগ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে এ বিচ্ছেদ তালাক বলে বিবেচিত হবে; অন্যাথায় তালাক বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ধর্মান্তরিত হওয়ার অবস্থাকে স্বামীর ইসলাম থেকে অস্বীকার করার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, স্ত্রী যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে এটি স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে স্বামীর মুরতাদ হওয়াও স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক বলে গণ্য হবে। আর مَقِيْسٌ ও مَقِيْسٌ عَلَيْهِ-এর মধ্যকার মূল মিল সেখানেই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ যেমনিভাবে স্বামীর ইসলাম গ্রহণ অস্বীকার করার কারণে সদাচারের সাথে [স্ত্রীকে] রাখার সুযোগকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং সে তার উপর সামর্থ্যবানও ছিল, তাই কাজি উত্তমভাবে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তী হয়ে বিচ্ছেদ করে দেবে। আর এ বিচ্ছেদ তালাক-বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে ধর্মত্যাগের কারণে স্বামী সদাচারের সাথে রাখার সুযোগকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাই কাজি উত্তমভাবে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তী হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল তা যা ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, বিচ্ছেদ এমন কারণে ঘটেছে যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক। আর তালাক শুধু স্বামীর পক্ষ থেকে পতিত হয়, স্ত্রীর এর মধ্যে কোনো অধিকার নেই। তাই ধর্মত্যাগের কারণে যে বিচ্ছেদ হবে তা তালাক হবে না; বরং বিবাহ রহিত বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইসলাম অস্বীকার করা আর ধর্মত্যাগের মাঝে পার্থক্য করেন। তাইতো স্বামীর ইসলামকে অস্বীকার করার কারণে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর ধর্মত্যাগের কারণে যে বিচ্ছেদ হয়, তাকে তালাকরূপে গণ্য করা হয়নি। উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো, ধর্মত্যাগ হচ্ছে বিবাহের পরিপন্থি। কেননা, ধর্মত্যাগ সত্তা ও অর্থের নিরাপত্তা রহিতকারী। তাইতো ধর্মত্যাগীর জান ও মাল বৈধ অর্থাৎ, যদি কেউ তাকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কিংবা দিয়ত ওয়াজিব হবে না এবং মুরতাদের মালিকানা ও বিবাহ রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তালাক বিবাহের পরিপন্থি নয়। কেননা, তালাক বিবাহ সাব্যস্ত হওয়ার পর বিবাহকে স্থগিতকারী; এ কারণে স্বামী যদি তালাকের পর বিবাহ করতে চায়, তাহলে বিবাহ করতে পারে। মোটকথা হলো, তালাক বিবাহের পরিপন্থি নয়। আর মুরতাদ বিবাহের পরিপন্থি, তাই ধর্মত্যাগকে তালাক হিসেবে নিরূপণ করা কঠিন। ইসলাম গ্রহণের অস্বীকৃতির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে তো তার মূল কুফরের উপর থাকতে চায়। এজন্য জিম্মি হিসেবেই থাকল। তাই তার রক্ত বৈধ হয়নি। এ কারণে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বিবাহের পরিপন্থি নয়, আর ধর্মত্যাগ বিবাহের পরিপন্থি। তাই ধর্মত্যাগকে ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে স্বামী সদাচারের সাথে স্ত্রীকে রাখার সুযোগকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই উত্তমরূপে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর উত্তমরূপে পরিত্যাগ করার নামই হলো তালাক। তাই ইসলামকে অস্বীকৃতির কারণে বিচ্ছেদকে তালাক গণ্য করা হয়েছে। আর ধর্মত্যাগ যেহেতু বিবাহের পরিপন্থি, আর ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি বিবাহের পরিপন্থি নয়। এ কারণে ইসলামকে অস্বীকৃতির দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয় তা কাজির রায়ের উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা, ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি বিবাহের পরিপন্থি নয়। আর ধর্মত্যাগের দরুন যে বিচ্ছেদ হয়, তা কাজির রায়ের উপর নির্ভরশীল হবে না। কেননা, বৈপরীত্যের হুকুম আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন- মাহরাম হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল হয় না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায়, আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে এবং ইদ্দতের খোরপোশও পাবে। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। আর যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার সাথে সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে, তবে ইদ্দতের খোরপোশ পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে তাই স্ত্রীকে নাফরমান বলা হবে। আর নাফরমানের জন্য খোরপোশ হয় না। পক্ষান্তরে যদি তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে সে মহরও পাবে না এবং খোরপোশও না।

قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اِسْتِحْسَانًا وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَبْطُلُ لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا مُنَافِيَةٌ وَفِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ اِرْتَدُّوا ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ بِتَجْدِيدِ الْأَنْكِحَةِ وَالْإِرْتِدَادُ مِنْهُمْ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيخِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْاِرْتِدَادِ فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِإِصْرَارِ الْآخَرِ عَلَى الرِّدَّةِ لِأَنَّهُ مُنَافٍ كَابْتِدَائِهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি উভয়ে একত্রে ধর্মত্যাগ করে আর একত্রে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা উভয়ে নিকাহের উপর বহাল থাকবে। এ হুকুম হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, দুজনের একজনের ধর্মত্যাগ বিবাহের পরিপন্থি। আর উভয়ের ধর্মত্যাগের মাঝে একজনের ধর্মত্যাগ বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, বর্ণিত আছে যে, বনূ হানীফা গোত্রের লোকেরা একসাথে ধর্মত্যাগ করেছিল অতঃপর একসাথে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিবাহ নবায়নের আদেশ প্রদান করেননি। তাদের ধর্মত্যাগ একসঙ্গে হয়েছিল বলেই ধরা হবে– তারিখ না জানার কারণে। [উভয়ের একই সঙ্গে] ধর্মত্যাগের পর যদি একজন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে উভয়ের মাঝে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, অন্যজন ধর্মত্যাগের উপর অনড় রয়েছে। আর ধর্মত্যাগের সূচনা যেমন বিবাহের পরিপন্থি, তদ্রূপ ধর্মত্যাগের উপর অনড় থাকাও বিবাহের পরিপন্থি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ الخ : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসাথে ধর্মত্যাগ করল, পুনরায় উভয়ে একসাথে মুসলমান হয়ে গেল, এতে তারা উভয়ে তাদের বিবাহের উপর বহাল থাকবে। বিবাহ নবায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। এ মতটি হলো সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সুরতে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর এটাই হলো কিয়াস। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, একজনের ধর্মত্যাগ যখন বিবাহের পরিপন্থি, দুজনের ধর্মত্যাগ অবশ্যই বিবাহের পরিপন্থি হবে। কেননা, দুজনের ধর্মত্যাগের মাঝে একজনের ধর্মত্যাগও বিদ্যমান আছে। আমাদের দলিল [আর এটাই সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ] হাদীসে রাসূল ﷺ। হাদীসটির সারমর্ম হলো, বনূ হানীফা [যারা মুসায়লামা কায্যাবের গোত্রের একটি ছোট গোত্র, যারা] জাকাত অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামের একটি দল প্রেরণ করেন, ফলে তারা সকলে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে বিবাহ নবায়নের নির্দেশ দেননি। এর উপর সকল সাহাবী একমত ছিলেন। তাই সাহাবীগণের ইজমা হয়ে গেল। আর ইজমার কারণে কিয়াসকে তরক করা হয়।

প্রশ্ন: কিন্তু এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তাদের ধর্মত্যাগতো এক সময়ে ছিল না, তাই উক্ত ঘটনা দ্বারা কিভাবে দলিল পেশ করা যায়?

উত্তর: এর উত্তর হলো, যখন অগ্রপশ্চাৎ জানা না যায়, তখন বলা হয়, তারা একই সময়ে ধর্মত্যাগ করেছে। আর যদি ধর্মত্যাগের পর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে উভয়ের বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে– অপরজনের ধর্মত্যাগের উপর বাড়াবাড়ি করার কারণে। কেননা, ধর্মত্যাগের উপর বাড়াবাড়ি যেমন বিবাহের পরিপন্থি তদ্রূপ ধর্মত্যাগের সূচনাও বিবাহের পরিপন্থি।

জ্ঞাতব্য : স্বামী-স্ত্রী একযোগে ধর্মত্যাগের পর যে ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে সে যদি স্বামী হয় আর স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে স্ত্রী কোনো মহরই পাবে না। আর যদি সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। আর যদি স্ত্রী ইসলামের দিকে ফিরে আসে এবং তার সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে সে অর্ধেক মহর পাবে। আর যদি সহবাস হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণ মহর পাবে। কেননা, সহবাসের কারণে মহর স্বামীর জিম্মায় ঋণ হয়ে যায়। আর ঋণ ধর্মত্যাগের কারণে রহিত হয় না। –[ফাতহুল কাদীর]

بَابُ الْقَسْمِ

পরিচ্ছেদ : পালা-বণ্টন

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে অধিক স্ত্রী বিবাহের বৈধতাকে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রয়োজন হলো ঐ পালা-বণ্টন বর্ণনা করা যা শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই তিনি بَابُ الْقَسْمِ স্থাপন করলেন। اَلْقَسْمُ - قَافٌ -এ فَتْحَةٌ -এর সাথে مَصْدَرٌ বা উৎসস্থল। قَسْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান করা। عَدْلٌ بَيْنَ النِّسَاءِ -এর নামও قَسْمٌ; قِسْمٌ - قَافٌ -এ كَسْرَةٌ -এর সাথে অর্থ– অংশ। قَسَمٌ - قَافٌ ও سِيْن -এর فَتْحَةٌ -এর সাথে অর্থ– শপথ। আর قِسْمَتٌ হলো বণ্টনের নাম।

প্রকৃতপক্ষে শর্তহীনভাবে সমতা বিধান করা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

অর্থাৎ, আপনার থেকে এটি কখনো সম্ভব নয় যে, আপনি সকল স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধান করবেন। আপনার মন যতই কামনা করুক, আপনি একদিকে একেবারেই ঝুঁকে পড়বেন না। যার দ্বারা তাকে ঝুলন্তের ন্যায় ছেড়ে দেবেন। –[বয়ানুল কুরআন]

অধিক স্ত্রী থাকলে সমতা বিধান করা কুরআন ও হাদীস উভয়টি দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে– فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ [চার স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ– এ বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন] 'তোমাদের যদি সমতা বিধান না করার ভয় হয়, তাতে এক স্ত্রীর উপরই যথেষ্ট কর। অথবা যে দাসী তোমাদের নিকট রয়েছে তার উপর ক্ষান্ত কর।' অর্থাৎ, সমতা বিধান না করার যদি প্রবল ধারণা হয়, তখন কয়েকজনকে বিবাহ করা এ কারণে নিষেধ যে, এতে এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কিন্তু বিবাহ সহীহই হবে না– বিষয়টি এমন নয়। বিবাহ অবশ্যই সহীহ হয়ে যাবে। –[বয়ানুল কুরআন]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে সমতা বিধান করা একান্ত আবশ্যক। হাদীসের বিশুদ্ধ চার কিতাব প্রণেতা হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে–

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ يَعْنِى الْقَلْبَ اَىْ زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবিদের পালাবদলের খুব খেয়াল রাখতেন এবং সমতা বিধান করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ! এটি আমার বণ্টন– এর মধ্যে যার মালিক আমি নিজে; তাই আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না তার মধ্যে, যার মালিক আপনি; আমি নই অর্থাৎ অন্তর তথা মহব্বতের আধিক্যের ব্যাপারে।' এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মহব্বতের আধিক্য ছাড়া সব জিনিসের মধ্যে মানুষের মালিকানা ও সামর্থ্য আছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اَحَدِهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ اَىْ مَفْلُوْجٌ .

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যার দুজন স্ত্রী আছে এবং তাদের দুজনের মধ্যে একজনের প্রতি ধাবিত হয়, কিয়ামতের দিবসে সে এভাবে উঠবে যে, তার একটি অঙ্গ কুঁজো হয়ে রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, আল-কিফায়া]

وَاِذَا كَانَ لِرَجُلٍ اِمْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ اَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِى الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتَا اَوْ ثَيِّبَتَيْنِ اَوْ اَحَدُهُمَا بِكْرًا وَالْاُخْرٰى ثَيِّبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَمَالَ اِلٰى اَحَدِهِمَا فِى الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْدِلُ فِى الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهٖ وَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تُوَاخِذْنِىْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ يَعْنِىْ زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ وَلَا فَصْلَ فِيْمَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : কোনো লোকের যদি দুজন স্বাধীন স্ত্রী থাকে, তাহলে উভয়ের মাঝে পালা-বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা ওয়াজিব– তারা উভয়ে কুমারী হোক কিংবা অকুমারী কিংবা একজন কুমারী এবং অন্যজন অকুমারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَمَالَ اِلٰى اَحَدِهِمَا فِى الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ 'যার দুজন স্ত্রী রয়েছে, আর সে তার হক বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পার্শ্ব ঝুঁকে থাকবে।' হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে পালা-বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতেন এবং বলতেন– اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تُوَاخِذْنِىْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ 'হে আল্লাহ! এটা আমার বণ্টন, যে ক্ষেত্রে আমার সাধ্য রয়েছে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে আমার সাধ্য নেই [অর্থাৎ, মহব্বতের আধিক্যের ক্ষেত্রে,] সে ক্ষেত্রে আমাকে পাকড়াও করবেন না।' আর আমাদের বর্ণিত হাদীসে [কুমারী-অকুমারীর মাঝে] কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَانِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কোনো একজন পুরুষের যদি দুই কিংবা দু'য়ের অধিক স্ত্রী থাকে। উভয়ে কুমারী হোক বা অকুমারী, কিংবা উভয়ে অকুমারী হোক, কিংবা একজন কুমারী ও অপরজন অকুমারী হোক। এ সকল সূরতে ইনসাফের সাথে পালা-বণ্টন করা ওয়াজিব। দলিলের বর্ণনায় হিদায়া গ্রন্থকার দুটি হাদীস পেশ করেছেন। উভয় হাদীসের মর্ম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। زِيَادَةُ الْمَحَبَّةِ এ বাক্যটি হাদীসের নয়; বরং বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। আর যেহেতু হাদীসের মধ্যে কুমারী ও অকুমারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তাই তার হুকুমের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

وَالْقَدِيْمَةُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوْقِ النِّكَاحِ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِيْ ذٰلِكَ وَالْاِخْتِيَارُ فِيْ مِقْدَارِ الدَّوْرِ إِلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّسْوِيَةُ دُوْنَ طَرِيْقِهَا وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْبَيْتُوْتَةِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ لِأَنَّهَا تَبْتَنِيْ عَلَى النَّشَاطِ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدٰهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرٰى أَمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ بِذٰلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ النُّقْصَانِ فِي الْحُقُوْقِ وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيْهِنَّ قَائِمٌ .

অনুবাদ : পুরাতন ও নতুন স্ত্রী এ ক্ষেত্রে সমান। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীস শর্তহীন। তা ছাড়া পালা-বণ্টন হলো বিবাহের অন্যতম হক। আর এ ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পালার পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার ন্যস্ত হলো স্বামীর প্রতি। কেননা, স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সমতা; সমতার পন্থা নয়। তদ্রূপ সমতা হবে একত্রে রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে সহবাসের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, তা নির্ভর করে প্রফুল্লতার উপর। যদি একজন স্বাধীন আর অপরজন দাসী হয়, তাহলে বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বাধীন দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং দাসী স্ত্রী পাবে এক-তৃতীয়াংশ। হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এ কারণে যে, দাসী স্ত্রীর নিকাহ হালাল হওয়ার ক্ষেত্র স্বাধীন স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র থেকে নিম্নস্তরের। সুতরাং হকসমূহের ক্ষেত্রে এ নিম্নতা প্রকাশ করা জরুরি। মুকাতাবা, মুদাব্বারা ও উম্মে ওয়ালাদ দাসীগণও সাধারণ দাসীর সমতুল্য। কেননা, দাসত্ব তাদের ব্যাপারেই বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقَدِيْمَةُ وَالْجَدِيْدَةُ سَوَاءٌ الخ : যেমনিভাবে কুমারী ও অকুমারীর পালা-বণ্টন ওয়াজিব, তদ্রূপ আমাদের মতে নতুন ও পুরাতন স্ত্রীর মাঝেও সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয়, তাহলে বিবাহের পর সাত দিন থাকবে আর যদি অকুমারী (ثَيِّبَةٌ) হয়, তাহলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস–

عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا .

'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুমারীর জন্য সাত দিন ও অকুমারীর জন্য তিন দিন নির্ধারিত করেছেন।' অন্যত্র বর্ণিত আছে–

وَعَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ .

'হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, সুন্নত হলো, যখন অকুমারীর উপর কুমারীকে বিবাহ করা হয়, তখন তার নিকট সাত দিন থাকবে তারপর পালা-বণ্টন করবে। আর যখন অকুমারীকে বিবাহ করা হয়, তখন তার নিকট তিন দিন থাকবে, তারপর পালা-বণ্টন করবে।' –[বুখারী, মুসলিম]

আমাদের দলিল হলো ঐ সকল হাদীস, যা হিদায়া গ্রন্থকার উপরে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, হাদীসদ্বয় মুতলাক বা শর্তহীন, তাই নতুন ও পুরাতনের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হবে না। আর আকলী দলিল হলো, পালা-বন্টন করা হলো বিবাহের হকসমূহের অন্যতম হক। যেমন– খোরপোশ বিবাহের হক। আর এ হকের মধ্যে কুমারী-অকুমারী এবং নতুন ও পুরাতনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন– মুসলিম নারী ও কিতাবী নারী, প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী, মাতাল ও বুদ্ধিমতি নারী এবং সুস্থ ও অসুস্থ নারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, এ নারীর মাঝে হুকূকের সবব হলো সমানে সমান। আর সবব হলো ঐ হালাল হওয়া যা বিবাহ দ্বারা সাবেত হয়। পালা-বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করার এখতিয়ার হলো স্বামীর। মনে চাইলে এক এক দিনের পালা-বন্টন করবে, কিংবা দুই দুই দিনের বা তিন তিন ও চার চার দিনের পালা-বন্টন করবে। আর যেহেতু এ বন্টন করা ওয়াজিব হলো অন্তরঙ্গ তা স্থাপনের জন্য এবং ভয়ভীতি দূরীভূত করার জন্য, তাই প্রয়োজন হলো নিকটতম পরিমাণের ধর্তব্য করা। আমার [গ্রন্থকার] মতে সাত দিনের বেশি পালা-বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করা কষ্টকর। তাই এক সপ্তাহের অধিক পরিমাণ নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। হ্যাঁ স্ত্রীরা যদি এক সপ্তাহের বেশির উপরও রাজি হয়ে যায়, তাহলে আধিক্যের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সঙ্গত হলো এ পরিমাণ যেন ঈলা [চার মাস] পর্যন্ত না পৌঁছে। স্বামীকে এখতিয়ার দেওয়ার হেতু হলো, স্বামীর উপর তো পালা-বন্টন ওয়াজিব, কিন্তু সমতার পন্থা ওয়াজিব নয়। আর সমতা হলো রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে; সহবাসের ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ, সকল স্ত্রীর নিকট সমান সমান রাত্রিযাপন করবে। ঐ রাতগুলোতে সহবাস শর্ত নয়। কেননা, সহবাস নির্ভর করে মনের প্রফুল্লতার উপর, আর এটি তার এখতিয়ারভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ اَحَدُهُمَا حُرَّةً الخ : যদি কারো বিবাহে একজন স্বাধীন স্ত্রী ও একজন দাসী স্ত্রী থাকে, তবে পালা-বন্টনের ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রী দুই-তৃতীয়াংশ আর দাসী স্ত্রী এক-তৃতীয়াংশ পাবে। দলিল হিসেবে হাদীস (اَثَر) পেশ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) আল-কিফায়া গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.) এ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আকলী দলিল হলো, যেহেতু দাসী স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র স্বাধীন স্ত্রীর হালাল হওয়ার ক্ষেত্র থেকে নিম্নস্তরের, তাই হকসমূহের ক্ষেত্রেও এ নিম্নতা প্রকাশ করা জরুরি। আর যদি দাসী কোনো ব্যক্তির মুকাতাবা, মুদাব্বারা কিংবা উম্মে ওয়ালাদ হয় তাহলে সেও দাসীর সমতুল্য। কেননা, দাসত্ব তাদের মধ্যেও বিদ্যমান।

قَالَ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِى الْقَسْمِ حَالَةَ السَّفَرِ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْاَوْلٰى اَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَلْقُرْعَةُ مُسْتَحِقَّةٌ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ اِلَّا اَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ الْقُرْعَةَ لِتَطْيِيْبِ قُلُوْبِهِنَّ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْاِسْتِحْبَابِ وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْاَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ اَلَا يُرٰى اَنَّ لَهُ اَنْ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَكَذَا لَهُ اَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ رَضِيَتْ اِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ لِاَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ عَنْهَا وَلَهَا اَنْ تَرْجِعَ فِىْ ذٰلِكَ لِاَنَّهَا اَسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সফরের অবস্থায় পালা-বণ্টনের কোনো হক তাদের নেই; বরং স্বামী তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সঙ্গে নিয়ে সফর করতে পারে। তবে উত্তম হলো, তাদের মাঝে লটারি করা এবং লটারিতে যার নাম আসে তাকে নিয়ে সফর করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, লটারি করা ওয়াজিব। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। তবে আমরা বলি যে, এ লটারি ছিল তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং এটা মোস্তাহাব পর্যায়ের হবে। এর কারণ হলো, স্বামীর সফরের সময় তার উপর স্ত্রীর কোনো হক নেই। দেখছেন না যে, তাদের কোনো একজনকে সঙ্গে না নিয়ে সফর করতে পারে। সুতরাং তাদের কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়েও সফর করার অধিকার তার রয়েছে। এ সময়টুকু তার হিসাব করা হবে না। আর কোনো স্ত্রী যদি তার কোনো পালা তার অন্য সঙ্গিনীকে দিয়ে দিতে সম্মত হয় তাহলে তা জায়েজ। কেননা, হযরত সাওদা বিনতে জাম'আ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দরখাস্ত করেছিলেন যেন তিনি তাকে রুজু করে নেন এবং তিনি নিজের পালা হযরত আয়েশা (রা.)-কে দিয়ে দিচ্ছেন। অবশ্য স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এ দান ফিরিয়ে নেওয়ার। কেননা, সে এমন হক রহিত করেছে যা এখনও ওয়াজিব হয়নি। সুতরাং তা রহিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِى الْقَسْمِ الخ : মাসআলা : কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে সফরের অবস্থায় পালা-বণ্টনের কোনো হক তাদের নেই। তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সফর করতে পারবে। তবে উত্তম হলো, তাদের মধ্যে লটারি করবে। লটারিতে যার নাম বের হয় তাকে নিয়ে সফর করবে। এটি হলো হানাফীগণের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, তাদের মাঝে লটারি করা ওয়াজিব। এ কারণেই যদি লটারি করা ছাড়া কাউকে নিয়ে সফর করে তবে সফরের এই পরিমাণ হিসেবে আসবে। অর্থাৎ, এ পরিমাণ দিনই ঐ স্ত্রীর কাছে অবস্থান করবে যাকে সে সফরে নেয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। এতে যার নাম বেরিয়ে আসত তাকে নিয়ে সফরে যেতেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্ত আমল দ্বারা লটারি করাকে ওয়াজিব বলেন। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করা নিরেট তাদের মনতুষ্টির জন্য ছিল। তাই এ লটারি করা মোস্তাহাব হবে; ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর পালা-বণ্টন করা ওয়াজিবই ছিল না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ 'আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দূরে রাখুন আর যাকে চান কাছে রাখুন।' -[বয়ানুল কুরআন] উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর পালা-বণ্টন জরুরি নয়।

হাফেজ আব্দুল আযীম মুনযিরী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাওদা, জুয়াইযিয়া, উম্মে হাবীব, সফিয়া এবং মায়মূনাকে দূরে রেখেছেন এবং হযরত আয়েশা ও অন্যান্য স্ত্রীদেরকে কাছে রাখতেন। সুতরাং যখন তাঁর উপর পালা-বণ্টনই ওয়াজিব নয় তখন লটারি কিভাবে ওয়াজিব হবে?

আর লটারি করা এ কারণেও মোস্তাহাব যে, স্বামীর সফরের সময় স্ত্রীর কোনো হকই নেই। সুতরাং স্বামী যদি তাদের কাউকে না নিয়েও সফরে যায় তাও তার এখতিয়ার আছে। এমনিভাবে যদি তাদের কোনো একজনকে নিয়ে সফর করে তাও তার এখতিয়ার রয়েছে এবং এটি কোনো হিসেবে আসবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الخ : আর যদি স্ত্রীদের মাঝে কোনো একজন নিজের পালা অন্যকোনো সতীনকে দিয়ে দেয়, তাহলে এটি শরয়ীভাবে জায়েজ। এর দলিল হলো, হযরত ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.)-কে তালাক দিয়েছিলেন। যখন তিনি নামাজের জন্য বের হতে উদ্যত হলেন, তখন হযরত সাওদা (রা.) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার অন্য কোনো পুরুষের খাহেশ নেই, তবে আমার আশা হলো এই যে, আমার হাশর যেন আপনার স্ত্রীদের সাথে হয় এবং দরখাস্ত করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে রুজু করে নিন! অবশেষে হযরত সাওদা (রা.) নিজের পালার দিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। আর যে সকল স্ত্রী নিজেদের পালার দিন অন্য কোনো সতীনকে দিয়ে দেবে তাদের জন্য জায়েজ আছে, তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা, সে এমন হক রহিত করেছে যা এখনো ওয়াজিবই হয়নি, তাই তা রহিতই হবে না। সুতরাং এ রুজু করা নিজের পালা থেকে বারণ করা হবে; কোনো বিলুপ্তকৃত জিনিসকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

كِتَابُ الرَّضَاعِ

قَالَ قَلِيْلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ سَوَاءٌ اِذَا حَصَلَ فِيْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيْمُ اِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ (اَلْاٰيَة) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِاَنَّ الْحُرْمَةَ وَاِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشُوْزِ الْعَظْمِ وَاِنْبَاتِ اللَّحْمِ لٰكِنَّهُ اَمْرٌ مُبْطَنٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِفِعْلِ الْاِرْضَاعِ وَمَا رَوَاهُ مَرْدُوْدٌ بِالْكِتَابِ اَوْ مَنْسُوْخٌ بِهِ وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيِّنُ .

অধ্যায় : স্তন্যপান

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অল্প এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধপানের হুকুম সমান। যদি তা স্তন্যপানের মেয়াদকালে হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে হুরমতের হুকুম সম্পৃক্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাঁচ ঢোঁকের কমে হুরমত সাব্যস্ত হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ 'এক বা দুই বার চোষা দ্বারা এবং এক বা দুইবার স্তন মুখে দেওয়ার দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না।' আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ 'আর তোমাদের ঐ মাতাগণ, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন' এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 'দুগ্ধপানের কারণে সে সবই হারাম হবে নসবের কারণে যা কিছু হারাম।' [এ আয়াত ও হাদীসে] অল্প ও বেশির মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া এজন্য যে, যদিও বিবাহের হুরমতের কারণ হলো উভয়ের মাঝে শারীরিক আংশিকতা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ যা দুধের দ্বারা হাড়-মাংস তৈরি হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু এটা দৃষ্টির অগোচর বিষয়। সুতরাং দুগ্ধপানের উপরই হুকুম সম্পৃক্ত হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস পেশ করেছেন, তা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অথবা তা দ্বারা রহিত। তবে তা দুগ্ধপানের মেয়াদকালে হতে হবে যার দলিল আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : رَضَاعٌ শব্দটি بِفَتْحِ الرَّاءِ – আসল, আর بِكَسْرِ الرَّاءِ -ও একটি ব্যবহার রয়েছে। বিশুদ্ধ ভাষা অনুযায়ী بَاب سَمِعَ থেকে, কিন্তু নজদবাসীদের মতে بَاب ضَرَبَ থেকে। আভিধানিক অর্থে رَضَاعَةٌ বলা হয় স্তন থেকে দুধ চোষাকে। আর শরিয়তের পরিভাষায় رَضَاعَةٌ বলা হয় দুগ্ধপোষ্য শিশু নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের স্তন থেকে দুধ চোষণকে। মানুষের স্তনের কথা বলে প্রাণীর স্তন থেকে দুধ পান করাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি ছাগল ইত্যাদির দুধ পান করে তাহলে তার দ্বারা রাদ'আতের হুকুম সাবেত হবে না। আর নির্দিষ্ট সময় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "দুধ পান করার মুদ্দত বা সময়"। এর পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ আছে, যা সামনে আলোচিত হবে।

قَوْلُهُ قَالَ قَلِيْلُ الرِّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ الخ : দুধের পরিমাণ [যার দ্বারা দুধপানের হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যায়।] -এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মাযহাব হলো, শর্তহীনভাবে দুধপান করা বা করানো দ্বারা দুধপানের হুকুম সাবেত হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, দুধপানের সময়ে পান করতে হবে। হযরত হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ওয়াকী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং জমহুর ফুকাহাও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাঁচ ঢোক দুধ পান করার দ্বারা হুরমত সাবেত হবে। অর্থাৎ, শিশুটি এগুলোর প্রত্যেকটির উপর নির্ভর করবে। জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ (র.)-এর অন্য একটি মত হলো যে, তিন ঢোক পান করার দ্বারা হুরমত সাবেত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল প্রসঙ্গে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পেশ করেছেন। হাদীসটির মধ্যে اَلْمَصَّةُ ও اَلْإِمْلَاجَةُ শব্দদ্বয় এসেছে। উভয়টির মাঝে পার্থক্য হলো, مَصَّةٌ হলো رَضِيْعٌ তথা শিশুর কাজ অর্থাৎ শিশু কর্তৃক দুধ চোষা, পান করা, আর إِمْلَاجَةٌ হলো مُرْضِعَةٌ -এর কাজ অর্থাৎ শিশুকে দুধ চোষানো, পান করানো। এখন হাদীসের মর্ম এই দাঁড়াবে যে, একবার বা দুইবার দুধ চোষা বা চোষানো দ্বারা হুরমত সাবেত হয় না। এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এভাবে হবে যে, হাদীসটি অল্প পান করা হারাম না হওয়াকে বুঝায়। এতে হানাফীগণের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর হানাফীগণের মাযহাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব সাবেত হয়ে গেল। কেননা, উভয় মাযহাবের মধ্যে فَصْلٌ -এর প্রবক্তা কেউ নয়। কিন্তু এ দলিলের উপর প্রশ্ন জাগে যে, জাহিরীরা বলেন, তিন ঢোক দ্বারা হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। তাই এ কথা বলা যে, فَصْلٌ -এর প্রবক্তা কেউ নয় , এটি ঠিক নয়। আর যদি ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস- قَالَتْ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ نُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ

"হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কুরআনে নির্ধারিত দশ ঢোক বর্ণিত হয়েছে, তারপর এর মধ্য থেকে পাঁচ ঢোক রহিত হয়ে গেছে" – এর দ্বারা দলিল পেশ করতেন তাহলে তার মাযহাব সাবেত হওয়ার জন্য খুবই সহায়ক হতো।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ الخ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الخ । আয়াতের অর্থ হলো [এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে] তোমাদের ঐ সকল মাতা যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন। আর হাদীসের অর্থ হলো রাদা'আত দ্বারা তা হারাম হয়ে যায়, যা নসব দ্বারা হারাম হয়। উক্ত আয়াত ও হাদীস উভয়টি মুতলাক। এর মধ্যে কমবেশির কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাই مُطْلَقٌ তথা শর্তহীনভাবে দুধপান করা হুরমতের সবব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত আকলী দলিলটি একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, স্বল্প পরিমাণ দুধ দ্বারা হুরমতে রাদা'আত সাবেত না হওয়া উচিত। কেননা, দুধপান করা হারাম হওয়া তো এ কারণে যে, এর দ্বারা শিশুর গোশ্ত এবং হাড় বেড়ে যায়। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে যে– قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلرِّضَاعُ أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, [দুধপান করা] হাড় গজায় আর গোশ্ত বাড়ায়। –[আইনী শরহে হিদায়া] আর স্বল্প পরিমাণ দুধের দ্বারা হাড় গজায় না এবং গোশত বাড়ে না। তাই স্বল্প পরিমাণ দুধ দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না।

উত্তর: এর উত্তর হলো, দুধপান করার দ্বারা হাড় গজানো এবং গোশ্ত বৃদ্ধি পাওয়া একটি বাতেনী বিষয়। আর কোনো হুকুমের সম্পর্ক হলো জাহেরী বিষয়ের সাথে। সুতরাং দুধপান করানো, যা জাহেরী সবব; হুরমতের হুকুম তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এজন্য আমরা বলেছি যে, শর্তহীনভাবে দুধপান করানো হলো হুরমতের সবব।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো, যদি কিতাবুল্লাহ আগে আর হাদীস পরে হয়, তাহলে কিতাবুল্লাহ দ্বারা হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ, হাদীসের উপর আমল করার তুলনায় কিতাবুল্লাহর উপর আমল করা হলো মজবুত। আর যদি হাদীস আগে ও কিতাবুল্লাহর এই আয়াত পরে হয় তবে এ হাদীসটি কিতাবুল্লাহ দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস عَشْرُ رَضَعَاتٍ الخ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে বাত্তাল (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি مُضْطَرِبٌ , তাই তা তরক করা আর কিতাবুল্লাহর দিকে রুজু করা ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, রাদা'আতের হুকুম তখন সাবেত হবে যখন রাদা'আত [দুধপান] দুধপানের মুদ্দতের মধ্যে পাওয়া যাবে, যার ব্যাখ্যা সামনের মাসআলায় করা হবে।

ثُمَّ مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا سَنَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) ثَلٰثَةُ اَحْوَالٍ لِاَنَّ الْحَوْلَ حَسَنٌ لِلتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ اِلٰى حَالٍ وَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لِمَا نُبَيِّنُ فَتَقَدَّرُ بِهٖ وَلَهُمَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا وَمُدَّةُ الْحَمْلِ اَدْنَاهَا سِتَّةُ اَشْهُرٍ فَبَقِىَ لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ وَقَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ وَلَهٗ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَ وَجْهُهٗ اَنَّهٗ تَعَالٰى ذَكَرَ شَيْأَيْنِ وَضَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً فَكَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْاَجَلِ الْمَضْرُوْبِ لِلدَّيْنَيْنِ اِلَّا اَنَّهٗ قَامَ الْمُنْقِصُ فِىْ اِحْدٰهُمَا فَبَقِىَ فِى الثَّانِىْ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَلِاَنَّهٗ لَا بُدَّ مِنْ تَغَيُّرِ الْغِذَاءِ لِيَنْقَطِعَ الْاِنْبَاتُ بِاللَّبَنِ وَ ذٰلِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّبِىُّ فِيْهَا غَيْرَهٗ فَقُدِّرَتْ بِاَدْنٰى مُدَّةِ الْحَمْلِ لِاَنَّهَا مُغَيِّرَةٌ فَاِنَّ غِذَاءَ الْجَنِيْنِ يُغَايِرُ غِذَاءَ الرَّضِيْعِ كَمَا يُغَايِرُ غِذَاءَ الْفَطِيْمِ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مُدَّةِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصُّ الْمُقَيَّدُ بِحَوْلَيْنِ فِى الْكِتَابِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুগ্ধপানের মেয়াদকাল ত্রিশ মাস। সাহেবাইন বলেন, মেয়াদ দুই বছর। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এ মত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিন বছর। কেননা, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য এক বছরই হলো যথাযোগ্য। আর দুই বছরের উপর কিছু অতিরিক্ত সময় জরুরি। এর কারণ পরবর্তীতে আমরা বর্ণনা করব। সুতরাং এ অতিরিক্ত সময়কে এক বছর নির্ধারণ করা হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا [তাকে গর্ভধারণের এবং দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হলো ত্রিশ মাস] আর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হলো ছয় মাস। সুতরাং দুধ ছাড়ানোর জন্য দুই বছর অবশিষ্ট রইল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا رِضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ [দুবছরের পর দুগ্ধপানের কোনো অবকাশ নেই] উপরিউক্ত আয়াত-ই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষয় উল্লেখ করে উভয়টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং মেয়াদ পূর্ণভাবে উভয়টির জন্য স্থিরকৃত হবে। যেমন– দুটি ঋণের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে একটির ক্ষেত্রে [অর্থাৎ গর্ভধারণের ক্ষেত্রে] উক্ত মেয়াদ হ্রাসকারী দলিল রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়টি তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বহাল থাকবে। তা ছাড়া এ কারণে যে, [স্তন্য ত্যাগের সময়] খাদ্য পরিবর্তনের অবকাশ প্রদান জরুরি। যাতে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হতে পারে। আর সেটা সম্ভব এমন অতিরিক্ত মেয়াদ নির্ধারণের মাধ্যমে, যে মেয়াদে শিশু অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সর্বনিম্ন গর্ভকাল দ্বারা উক্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। কেননা, এ সময়কাল খাদ্য-প্রকার পরিবর্তনকারী। কারণ, গর্ভস্থ সন্তানের খাদ্য দুগ্ধপোষ্য খাদ্য থেকে ভিন্ন। যেমন– দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাদ্য স্তন্য পরিত্যাগকারী শিশুর খাদ্য থেকে ভিন্ন। আর [সাহেবাইন বর্ণিত] হাদীসটি প্রযোজ্য হবে দুগ্ধপানের অধিকারের মেয়াদকালের উপর। আর এ অর্থেই প্রয়োগ করা হবে কিতাবুল্লাহর যে আয়াতটিতে দু বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে, সে আয়াতটিকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(رَضَاعَة) : قَوْلُهُ ثُمَّ مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ الخ দুগ্ধপানের মেয়াদকালের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ত্রিশ মাস। সাহেবাইনের মতে দু বছর। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.) -এরও এ মত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, দুগ্ধপানের মেয়াদকাল তিন বছর। ইমাম মালেক (র.) থেকে দুই বছর এক মাস মেয়াদকালের কথাও বর্ণিত আছে এবং দু বছর দু মাসের কথাও বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (র.)-এর আরেকটি বর্ণনা হলো, যতদিন পর্যন্ত শিশু দুধপান করার মুখাপেক্ষী থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাকে এর থেকে ফিরানো যাবে না। কারো কারো মত হলো, দুগ্ধপানের মেয়াদকালের কোনো সীমা নেই। পুরো জীবনে যখনই দুধপান করবে দুগ্ধপানের হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, দুগ্ধপানের মেয়াদকাল পনের বছর। কেউ কেউ চল্লিশ বছর বলেছেন, তবে এ সকল মতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের সারাংশ হলো, দু বছরের পর এমন কিছু সময় জরুরি যার মধ্যে শিশু দুধ ছাড়া অন্যান্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যাতে দুধ দ্বারা যা যা বর্ধিত হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। আর এক বছরের মেয়াদকাল এমন যার মধ্যে শিশুটি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। কেননা, এক বছরের মেয়াদকাল চারটি ঋতু ব্যাপৃত। এ কারণে দুগ্ধপানের মেয়াদকাল তিন বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ الخ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদকাল ত্রিশ মাস বর্ণনা করেছেন।' আর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হলো ছয় মাস। তাই দুধ ছাড়ানোর জন্য দু বছর অবশিষ্ট থাকল। এজন্য আমরা বলেছি যে, দুগ্ধপানের মেয়াদকাল হলো দু বছর। এরপর দুধ ছাড়ানো হবে। দ্বিতীয় দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– 'দু বছরের কমে দুগ্ধপানের কোনো অবকাশ নেই।' অন্য রেওয়ায়েতে আছে– لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ 'দুগ্ধপানের অবকাশ শুধু দু বছরেই আছে।' ইবনে আদীর বর্ণনায় রয়েছে– لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ 'দুগ্ধপান দ্বারা হারাম হবে না, তবে দু বছরের মধ্যে।'

সাহেবাইনের মতের সমর্থন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ দ্বারাও হয়। অর্থাৎ, 'এবং তার দুধ ছাড়ানো হবে দু বছরের মধ্যে।' -[সূরা লুকমান] অপর আয়াত– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ দ্বারাও তাদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ, দুগ্ধপায়ী মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধপান করাবে। যে চায় তার সন্তানদেরকে দুধের মেয়াদকাল পূর্ণ করতে। -[সূরা বাকারা] উক্ত আয়াতে দুধপানের পূর্ণ মেয়াদকাল দু বছর বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুধপানের মেয়াদকাল দু বছর।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলও ঐ আয়াত যা সাহেবাইন পেশ করেছেন। তবে দলিল এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষয় [গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো] উল্লেখ করে উভয়টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এ মেয়াদ পূর্ণভাবে উভয়টির জন্য স্থিরকৃত হবে। উভয়টির মধ্যে বণ্টন হবে না। মাসআলাটির উদাহরণ এমন যেমন– এক ব্যক্তির কিছু ঋণ যায়েদের নিকট আর কিছু ঋণ বকরের নিকট। ঋণদাতা তাদের উভয়কে বলল, আমি তোমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দিলাম। এখন অবকাশের এ এক বছর তাদের দুজনের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পূর্ণ এক বছর হবে। এক বছরকে উভয়ের মাঝে বণ্টন করে ছয় ছয় মাসের মেয়াদকাল গণ্য হবে না। অথবা এক ব্যক্তি যায়েদের নিকট এক হাজার টাকা আর দশমণ গম ঋণ পাবে। ঋণদাতা বলল, আমি যায়েদকে উভয় ঋণের জন্য এক বছর অবকাশ দিলাম। এখন অবকাশের এই এক বছর উভয় ঋণের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পুরোপুরি হবে। এক বছরের মেয়াদকালকে উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হবে না। সুতরাং এমনিভাবে উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোর মাঝেও حَمْل ও فِصَال উভয়টির মধ্য থেকে প্রত্যেকটির জন্য ত্রিশ ত্রিশ মাস

মেয়াদকাল হবে। উভয়টির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে না। তবে উভয়টির মধ্য থেকে একটির মধ্যে [হামলের মেয়াদকাল] কম করার দলিল বিদ্যমান আছে; আর হ্রাসকারী ঐ দলিল হলো আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস–

اَلْوَلَدُ لَا يَبْقٰى فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِقَدْرِ فَلْكَةِ مِغْزَلٍ.

অর্থাৎ 'সন্তান মাতৃগর্ভে দুবছরের বেশি মুহূর্তকাল থাকতে পারে না; যদিও তা চরকার খণ্ড সদৃশ্য হোক।' –[ফাতহুল কাদীর, আল-কিফায়া] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় মত [দুধ ছাড়ানো] -এর মধ্যে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বহাল থাকবে। আর তা হলো ত্রিশ মাস। তাই প্রতীয়মান হলো যে, দুধ ছাড়ানোর মেয়াদকাল হলো ত্রিশ মাস। আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে। দ্বিতীয় আকলী দলিল হলো, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য খাদ্য পরিবর্তন জরুরি, যাতে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্য জিনিস গ্রহণের মাধ্যমে তা আবার চালু হয়। সুতরাং এ খাদ্য পরিবর্তনের জন্য এমন অতিরিক্ত মেয়াদ জরুরি, যার মধ্যে শিশু দুধ ছাড়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে; কারণ, একই সাথে হঠাৎ করে দুধ ছাড়ানো শিশুর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তা সর্বনিম্ন গর্ভের মেয়াদকালের সাথে নির্ধারণ করেছেন। কেননা, এ মেয়াদকাল খাদ্যকে পরিবর্তনকারী; আর গর্ভস্থ সন্তানের খাদ্য দুগ্ধপোষ্য সন্তানের খাদ্যের বিপরীত; কেননা, গর্ভস্থ সন্তানের খাদ্য হলো তা-ই, মায়ের খাদ্য যা। তারপর প্রসবের পর তার খাদ্য হবে খালেস দুধ। এমনিভাবে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের খাদ্য স্তন্য পরিত্যাগকারী সন্তানের খাদ্য থেকে ভিন্ন।

কেননা, দুগ্ধপোষ্য সন্তানের খাদ্য শুধু দুধ হয়; আর স্তন্য পরিত্যাগকারী সন্তানের খাদ্য কখনো দুধ আবার কখনো খাদ্য জাতীয় বস্তু হয়। মোদ্দাকথা, খাদ্যের পরিবর্তন জরুরি; আর খাদ্যের পরিবর্তন ছয় মাসে হয়ে যায়। তাই শিশুকে অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত বানানোর জন্য অতিরিক্ত ছয় মাস জরুরি।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) সাহেবাইনের পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীস لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ -এর জবাবে বলেন, হাদীসের মধ্যে দু বছরের পর দুধ পান করতে নফী (نَفِىْ) করা হয়নি; বরং পারিশ্রমিকের অধিকারের নফী (نَفِىْ) করা হয়েছে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তার শিশুকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধ পান করায় তাহলে সন্তানের পিতার উপর শুধু দু বছরের পারিশ্রমিকের বাধ্যবাধকতা থাকবে; সকলের মতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দু বছরের পরবর্তী সময়ের পারিশ্রমিক পাবে না। আর এ পারিশ্রমিকের অধিকারের উপর ঐ নস প্রযুক্ত হবে যা حَوْلَيْنِ -এর قَيْد -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ الخ আয়াতটি। দলিল হলো, এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا 'যদি তারা উভয়ে দুধ ছাড়াতে চায় পারস্পরিক সন্তুষ্টি দ্বারা।' উক্ত আয়াতে দুধ ছাড়ানোকে সন্তুষ্টির উপর যুক্ত করা হয়েছে। যদি দুই বছরের পর দুধ পান করা হারাম হতো তবে সন্তুষ্টির উপর যুক্ত করা হতো না। সুতরাং বুঝা গেল যে, আয়াতে দুগ্ধপানের মেয়াদকাল বর্ণনা করা হয়নি; বরং পিতার উপর পারিশ্রমিকের অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই সাহেবাইনের উক্ত আয়াত ও হাদীসকে তাদের মাযহাবের সমর্থনে পেশ করা ঠিক হবে না।

قَالَ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتِبَارِ النَّشْوِ وَ ذٰلِكَ فِى الْمُدَّةِ إِذِ الْكَبِيْرُ لَا يَتَرَبّٰى بِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ إِلَّا فِىْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) إِذَا اسْتَغْنٰى عَنْهُ وَ وَجْهُهُ إِنْقِطَاعُ النَّشْوِ بِتَغَيُّرِ الْغِذَاءِ وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَدْ قِيْلَ لَا يُبَاحُ لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ ضَرُوْرِيَّةٌ لِكَوْنِهِ جُزْءَ الْآدَمِيِّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্তন্যপানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুগ্ধপানের সাথে হুরমতের সম্পর্ক থাকবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ [স্তন্য ছাড়ানোর পর স্তন্যপান ধর্তব্য নয়] তাছাড়া এ কারণে যে, হুরমত সাব্যস্ত হয় [দুধ দ্বারা শরীরের] বৃদ্ধি লাভ হওয়ার কারণে। আর সেটা হয়ে থাকে স্তন্যপানের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে। কেননা, বড় বাচ্চা উক্ত দুধ দ্বারা পুষ্টি লাভ করে না। তদ্রূপ সময়ের পূর্বে দুধ ছাড়িয়ে দেওয়াও ধর্তব্য নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে তা ধর্তব্য হবে- যদি শিশু উক্ত দুধের মুখাপেক্ষী না থাকে। এর কারণ হলো, খাদ্য পরিবর্তিত হওয়ার কারণে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, মেয়াদের পরে কি স্তন্যদান জায়েজ হবে? কোনো কোনো মতে, জায়েজ হবে না। কেননা, এ বৈধতা ছিল জরুরিভিত্তিক মানুষের শরীরের অংশবিশেষ হিসেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ الخ : মাসআলা : স্তন্যপানের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর যদি সন্তানকে দুধপান করানো হয় তাহলে এর সাথে হুরমতের সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ, স্তন্যপানের হুরমত সাবেত হবে না। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- "স্তন্য ছাড়ানোর পর স্তন্যপান ধর্তব্য নয়।" কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস হলো এর বিপরীত। হাদীসটি হলো- عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) فَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ أَمَرَتْ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُوْمٍ أَوْ بَعْضَ بَنَاتِ أُخْتِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسًا 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি যখন ইচ্ছা করতেন, কোনো পুরুষকে [যার সাথে পর্দা করা ওয়াজিব] তার সামনে আসার অনুমতি প্রদানের, তখন স্বীয় বোন উম্মে কুলসুম কিংবা তাঁর কোনো বোনের মেয়েকে নির্দেশ দিতেন যাতে সে ঐ পুরুষকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করিয়ে দেয়।' উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, স্তন্যপানের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দুধ পান করা দ্বারা হুরমত সাবেত হয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এর জবাবে বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য হাদীস ও সাহাবীগণের আছার দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেমন- পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَوْلَيْنِ বর্ণিত হয়েছে এবং আবূ দাউদ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ 'স্তন্যপান হারামকারী নয় তবে যা গোশত গজায় এবং হাড় বাড়ায়।' উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা মেয়াদকালের পর দুগ্ধপান দ্বারা হুরমত না হওয়া বুঝা যায়।

আকলী দলিল : হুরমত তো সাব্যস্ত হয় এ কারণে যে, দুধের কারণে শরীরের অঙ্গ বৃদ্ধি পায়। আর এ বৃদ্ধি পাওয়া মেয়াদকালের মধ্যে দুগ্ধপান দ্বারা হয়, মেয়াদকালের পরে নয়। কেননা, বড় বাচ্চা দুগ্ধপান দ্বারা পুষ্টি লাভ করে না; বরং তার পুষ্টি লাভ হয় অন্যান্য খাদ্যের দ্বারা। সুতরাং যখন হুরমতের হুকুম শরীর বৃদ্ধি হিসেবে হবে, আর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর শরীরের বৃদ্ধি পাওয়া যায় না, তাই মেয়াদকালের পর হুরমতের হুকুমও সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্তন্যপানের মেয়াদকালের পূর্বে যদি দুধ ছাড়ানো হয় তবে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাইতো দুধ ছাড়ানোর পর এবং মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কোনো মহিলা ঐ শিশুকে দুধপান করায় তবে এর দ্বারা হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। –[জাহিরে রেওয়ায়েত]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন, যদি শিশুর দুধ এমনভাবে ছাড়ানো হয় যে, এখন শিশু দুধের মুখাপেক্ষী নয়, তাহলে এ সুরতে মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও দুধ ছাড়ানো ধর্তব্য হবে। এ কারণেই কোনো মহিলা যদি ঐ বাচ্চাকে দুধ পান করায় তাহলে হুরমত সাবেত হবে না। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের রেওয়ায়েতটির কারণ হলো, খাদ্য পরিবর্তিত হওয়ার কারণে দুগ্ধ দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আর হুরমত তো ছিল বৃদ্ধির কারণেই। তাই এ সুরতে দুগ্ধপান করানো দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে বলেন– اَلرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ 'স্তন্যপানতো তা-ই যা অন্ত্রকে ফেড়ে দেয়।' আর উম্মে সালামার হাদীস : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ –[তিরমিযী, ফাতহুল কাদীর]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রশ্নের আকারে বলেন যে, স্তন্যপানের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর দুধ পান করানো জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে বলা হয়েছে বৈধ নয়। কেননা, দুধপানের মেয়াদকালে দুধপান করার বৈধতা জরুরিভিত্তিক সাবেত ছিল। আর কায়দা আছে– اَلثَّابِتُ بِالضَّرُوْرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ – আর যেহেতু মেয়াদকালের পর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, তাই বৈধতাও খতম হয়ে গেছে। আর দুধের বৈধতা এ কারণে ছিল যে, দুধ হলো মানুষের শরীরের অংশবিশেষ। আর মানুষের শরীরের অংশ দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম। তাই বিনাপ্রয়োজনে মানুষের দুধ বৈধ হবে না।

قَالَ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لِلْحَدِيْثِ الَّذِىْ رَوَيْنَا اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ لِاَنَّهَا تَكُوْنُ اُمَّهُ اَوْ مَوْطُوْءَةَ اَبِيْهِ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নসবের কারণে যারা হারাম হয়, স্তন্যপানের কারণেও তারা হারাম হবে। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তবে দুধ-বোনের মাকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। কিন্তু নসবী-বোনের মাকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কেননা, হয় সে তার আপন মা হবে কিংবা পিতার সহধর্মিণী [সৎ মা] হবে। দুধ-বোনের বেলায় তা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) উপরিউক্ত ইবারতে একটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, যে সকল মহিলা নসবের কারণে হারাম হয়, তারা স্তন্যপানের কারণেও হারাম হবে। দলিল হিসেবে ঐ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিকাহ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত নীতিমালা থেকে দুটি সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুটি সুরত এমন যেখানে স্তন্যপান দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না, কিন্তু নসবের কারণে হুরমত সাবেত হবে। গ্রন্থকার প্রথম সুরতটি اِلَّا اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ – দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত ইবারতে তিনটি সুরত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, مِنَ الرَّضَاعِ -এর সম্পর্ক বোন ও মা উভয়ের সাথে হবে। কিংবা শুধু বোন বা মা-এর সাথে হবে। প্রথম সুরতের মর্ম হবে- দুধ-বোনের দুধ-মাকে বিবাহ করা জায়েজ। এর সুরত হলো, খালিদ ও যয়নাব উভয়ে হিন্দার দুধ পান করল। শুধু যয়নাব উম্মে সালামার দুধ পান করল। এখন খালেদের বিবাহ উম্মে সালামার সাথে জায়েজ। অথচ উম্মে সালামা খালিদের দুধ-বোন যায়নাবের দুধ-মা। দ্বিতীয় সুরতের মর্ম এই হবে যে, দুধ-বোনের নসবী মাকে বিবাহ করা জায়েজ। এর সুরত এই হবে যেমন- যায়েদ ও সাজেদা অপরিচিতা এক মহিলার দুধ পান করল। কিন্তু যায়েদ সাজেদার নসবী মা-এর দুধ পান করেনি এখন যায়েদের জন্য তার দুধ-বোন সাজেদার নসবী মা বৈধ। তৃতীয় সুরতের মর্ম এই হবে যে, নসবী-বোনের দুধ-মায়ের সাথে বিবাহ জায়েজ। এর সুরত এই হবে যে, যায়েদের নসবী-বোন আছে আর বোনের দুধ-মা আছে, যে যায়েদকে দুধ পান করায়নি। এখন এ নসবী-বোনের দুধ-মাকে বিবাহ করা জায়েজ। তবে নসবী-বোনের নসবী মাকে বিবাহ করা জায়েজ নয় কারণ, নসবী বোনের নসবী মা হয়তো তারও মা হবে। যদি তারা উভয়ে আপন ভাই-বোন হয়ে থাকে। কিংবা তার পিতার সহধর্মিণী হবে- যদি উভয়ের পিতা এক আর মা আলাদা আলাদা হয়। আর এ উভয় সুরতে অর্থাৎ মা ও পিতার সহধর্মিণীর সাথে বিবাহ নাজায়েজ। কারণ, এ নসবী আত্মীয়ের সুরতে বিবাহ নাজায়েজ নিরূপণ করা হয়েছে। কিন্তু রাদা'আতের সুরতে এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, রাদা'আতের সুরতে বিবাহকে জায়েজ বলা হয়েছে।

وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ إِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ هٰذَا الْمَعْنٰى فِى الرَّضَاعِ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ وَامْرَأَةُ إِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ لِمَا رَوَيْنَا وَ ذِكْرُ الْأَصْلَابِ فِى النَّصِّ لِإِسْقَاطِ اِعْتِبَارِ التَّبَنِّىْ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : দুধ-পুত্রের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ আছে, কিন্তু নসবের ক্ষেত্রে তা জায়েজ নয়। কেননা, নসবী-পুত্রের সৎ বোনের মায়ের সঙ্গে সহবাসের কারণে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায়। দুধ-পুত্রের বোনের ক্ষেত্রে এ অবস্থা পাওয়া যায় না। দুধ-পিতার স্ত্রীকে কিংবা দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ নেই; যেমন- নসবের ক্ষেত্রে তা জায়েজ নয়। এর দলিল আমাদের পূর্ববর্ণিত হাদীস। আর আয়াতে পুত্র সম্পর্কে যে ঔরসজাত বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো, পালকপুত্রকে বাদ দেওয়া। বিষয়টি ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ إِبْنِهِ الخ : দ্বিতীয় সুরত যাকে পূর্বের নীতিমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার তা-ই বর্ণনা করেছেন। এ দ্বিতীয় সুরতেরও তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে :

১. দুধ-ছেলের দুধ-বোন, ২. দুধ-ছেলের নসবী-বোন, ৩. নসবী-ছেলের দুধ-বোন। এ তিন সুরতে বিবাহ জায়েজ। উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর উপর কিয়াস করে এগুলোর উদাহরণ বের করা কঠিন হবে না। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে যদি নসবী সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ, নসবী-ছেলের নসবী-বোন, তবে এ নসবী-ছেলের নসবী-বোনকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না। কারণ, হলো, তার নসবী ছেলের বোন যদি তারই বীর্য থেকে হয় তাহলে সে তার কন্যা হবে। আর যদি তার বীর্য থেকে না হয় এবং তার ছেলের শুধু বৈপিত্রেয় তথা মা-শরীকী বোন হয় তাহলে এটি তার সৎমেয়ে হবে। আর সৎমেয়ের মায়ের সাথে যদি সহবাস করা হয় তাহলে সৎমেয়ে হারাম হয়ে যাবে। এ কথাগুলো হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, যখন ছেলের বোনের মায়ের সাথে সহবাস করা হলো, তখন এ বোন ঐ পিতার উপর হারাম হয়ে গেল। যা-ই হোক উভয় সুরতে [কন্যা হোক বা সৎকন্যা হোক] ঐ নসবী-ছেলের নসবী বোনের সাথে বিবাহ জায়েজ হবে না। আর স্তন্যপানের মধ্যে উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান নেই। তাই স্তন্যপানের সুরতে বিবাহকে জায়েজ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ الخ : এর সুরত হলো, মুরযি'আ তথা স্তন্যদানকারিনীর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দাকে করল, তারপর হিন্দাকে তালাক দিয়ে দিল, এখন এ স্তন্যদানকারিণীর দুধ-ছেলে হিন্দাকে বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, হিন্দা তার দুধ-পিতার স্ত্রী। এমনিভাবে দুধ-ছেলের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

قَوْلُهُ وَ ذِكْرُ الْأَصْلَابِ الخ : এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, কুরআনে কারীমে যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ -এর দ্বারা বুঝা যায়, শুধু ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রী হারাম; দুধ-সন্তানের স্ত্রী হারাম নয়। অথচ হুকুম হলো এর বিপরীত।

উত্তর: এর উত্তর হলো, আয়াতের মধ্যে ঔরসজাত বলা হয়েছে পালকপুত্রের স্ত্রীকে এ হুকুম থেকে বাদ দেওয়ার জন্য; দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। মোদ্দাকথা, পালক সন্তানের স্ত্রী হালাল। আর ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম হওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর দুধ-সন্তানের স্ত্রীর হুরমত মশহুর হাদীস- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ দ্বারা প্রমাণিত।

وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَهُوَ اَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً فَتَحْرُمُ هٰذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلٰى زَوْجِهَا وَعَلٰى اٰبَائِهِ وَاَبْنَائِهِ وَيَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِىْ نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ اَبًا لِلْمُرْضِعَةِ وَفِىْ اَحَدِ قَوْلَىِ الشَّافِعِيِّ (رح) لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ لِاَنَّ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ وَاللَّبَنُ بَعْضُهَا لَا بَعْضُهُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَكَذَا بِالرِّضَاعِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلِاَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُوْلِ اللَّبَنِ مِنْهَا فَيُضَافُ اِلَيْهِ فِىْ مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ اِحْتِيَاطًا ـ

অনুবাদ : যে স্বামীর কারণে স্ত্রীর স্তনে দুধ এসেছে, তার সঙ্গেও হুরমতের সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায়, তাহলে এ মেয়ে উক্ত স্ত্রীর স্বামী এবং স্বামীর পিতা এবং ঊর্ধ্বতন সকল পুরুষ এবং স্বামীর সন্তান ও অধঃস্তনসহ সকল পুরুষ সকলের জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যে স্বামীর কারণে তার স্তনে দুধ এসেছে সে ঐ মেয়ের দুধ-পিতা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, উক্ত স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। কেননা, হুরমতের সম্পর্ক হয় [দুধের মাধ্যমে শারীরিক] আংশিকতার সন্দেহের কারণে। আর দুধ তো স্ত্রীর অংশ, স্বামীর অংশ নয়। আমাদের দলিল হলো পূর্বে যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি তা। আর নসবের ক্ষেত্রে হুরমত [মা-বাবা] উভয় দিক থেকে হয়। সুতরাং স্তন্যপানের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। তা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) -কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ 'আফলাহ তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। কেননা, সে তোমার দুধ-চাচা।' তা ছাড়া এ কারণে যে, স্বামী হলো স্ত্রীর স্তনে দুধ প্রবাহিত হওয়ার কারণ। সুতরাং সতর্কতা হিসেবে হুরমতের ক্ষেত্রে তার সঙ্গেও দুধ সম্পৃক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَبَنُ الْفَحْلِ : এর মধ্যে اِضَافَةُ الشَّىْءِ اِلٰى سَبَبِهٖ তথা বস্তুকে তার সববের দিকে যুক্ত করা হয়েছে। কারণ, পুরুষই দুধ প্রবাহিত হওয়ার কারণ। আর لَبَنُ الْفَحْلِ দ্বারা হারাম হওয়ার সুরত হলো, এক মহিলা কোনো মেয়েকে দুধ পান করালে এতে এ মেয়ে স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেল এবং ঐ স্বামীর বাপ-দাদা এবং তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানের জন্যও হারাম হয়ে গেল। আর স্তন্যদানকারিণীর এ স্বামী যার দ্বারা স্তন্যদানকারিণীর দুধ প্রবাহিত হলো, ঐ দুধপানকৃত মেয়ের পিতা হয়ে যাবে। এটাই সাধারণ শাফেয়ীদের মতামত। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অপর এক মত এই যে, لَبَنُ الْفَحْلِ দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দৌহিত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন। আর দলিল হিসেবে বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী– اُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ -এর মধ্যে দুগ্ধপানের হুরমতকে মহিলাদের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষের সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, لَبَنُ الْفَحْلِ -এর সাথে হারাম হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি কোনো পুরুষের স্তন থেকে দুধ বের হয়, আর তা কোনো শিশুকে পান করানো হয়, তবে সকলের মতে এর দ্বারা হুরমত

সাবেত হবে না। সুতরাং তার স্ত্রীর দুধ পান করানোর দ্বারা তার স্বামীর সাথে অবশ্যই হুরমত সাবেত হবে না। তৃতীয় দলিল, যা হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন তা এই যে, রাদা'আত দ্বারা হুরমতের সম্পর্ক হলো [দুধের মাধ্যমে শারীরিক] আংশিকতার সন্দেহের কারণে। কারণ, দুধ পান করানোর দ্বারা বাচ্চার অংশ বৃদ্ধি পায়। আর তার গোশ্ত ও হাড় গজায়। উল্লেখ্য যে, দুধ স্ত্রীর অংশ; পুরুষের অংশ নয়। তাই হুরমতের সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে হবে; স্বামীর সাথে হবে না। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, সম্ভবত ইমাম শাফেয়ী (র.) ঐ দুধের কথা বলেছেন, যা পুরুষের স্তন থেকে বের হয়। আর এটি সকলের মতে হারাম নয়। কারণ, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের কারণে যে দুধ প্রবাহিত হয়েছে, তা হানাফী, মালিকী এবং হানাবেলাসহ সকলের মতে পুরুষের জন্য হুরমতকে সাবেত করে। আর এটাই শাফেয়ীদের বইপত্রে উল্লেখ রয়েছে এবং এটাই সাধারণ শাফেয়ীদের মতামত। দৌহিত্র আব্দুর রহমান ভিন্নমত পোষণ করেন। এ কারণে পুরো দুনিয়ার খেলাফ আমাদের দলিল উপরে বর্ণিত হাদীস- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ আর নসবের কারণে হুরমত পিতামাতা উভয় দিক থেকে সাবেত হয়। তাই রাদা'আতের কারণে হুরমত উভয় দিক থেকে সাবেত হবে। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, এখানে তো হুরমত সাবেত হয় দুধের কারণে। আর দুধ তো মহিলার হয়; পুরুষের হয় না। এর জবাবে আমরা বলব, দুধ পুরুষদের দ্বারাও হয়। কারণ, দুধ প্রবাহিত হওয়ার কারণ হলো সন্তান জন্ম লাভ করা। আর সাধারণত জন্মলাভ পুরুষের সহবাস ব্যতিরেকে হয় না। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ের সাথে হারাম হওয়ার সম্পর্ক হবে। যেমনটি নসবের ক্ষেত্রে হয়। তবে পুরুষ ছাড়া দুধ প্রবাহিত হওয়া এটির অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য, যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা, বলা হয়- اَلنَّادِرُ كَالْمَعْدُوْمِ

দ্বিতীয় হাদীস হলো, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। পূর্ণ হাদীস হিদায়ার প্রান্ত-টীকায়, আইনী শরহে হিদায়ায় এবং ফাতহুল কাদীর ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে। হাদীসের অনুবাদ নিম্নরূপ- হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার নিকট আফলাহ ইবনে আবী কায়েস আসল। আমি তার সাথে পর্দা করলাম। আফলাহ বললেন, তুমি আমার সাথে পর্দা কর ! অথচ আমি তোমার চাচা। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি বললাম, কিভাবে ? আফলাহ বললেন, তোমাকে আমার ভাইয়ের স্ত্রী দুধ পান করিয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছে; পুরুষ দুধ পান করায়নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনলে আমি তাঁর সামনে বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, সে তোমার চাচা। আফলাহ তোমার নিকট পর্দা ছাড়াই আসবে। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আফলাহকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর দুধ-চাচা বলেছেন। আর দুধ-চাচা এছাড়া হতে পারে না যে, দুগ্ধপানকারিণীর স্বামী হযরত আয়েশার দুধ-বাপ। সুতরাং যখন দুধ-চাচার সাথে হারাম হওয়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে দুধ-বাপের সাথে অবশ্যই হারামটি যুক্ত হবে।

আকলী দলিল হলো, স্বামী হলো স্ত্রীর স্তনে দুধ প্রবাহিত করার কারণ। তাই সতর্কতা হিসেবে হুরমতের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গেও দুধ সম্পৃক্ত হবে।

জ্ঞাতব্য : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে اَفْلَحُ -এর هَمْزَه -তে ফাতহা ও حَا . এবং فَا . -তে জযম রয়েছে। আফলাহ আবূ কু'আইসের সন্তান। মুসলিম শরীফেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে এবং অধিকাংশ রেওয়ায়েতেও এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাসায়ী শরীফে মালেকের সূত্রে إِنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, আফলাহ হলো আবূ কু'আইসের ভাই; ছেলে নয়। হিদায়া ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনীও এটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা কুরতুবীও বলেছেন যে, এটি সহীহ। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার আর কিফায়া গ্রন্থকার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতেও আফলাহকে আবূ কু'আইসের ভাই হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

لِيَلِجْ এটা اَمْرِ غَائِبْ -এর সীগাহ। وُلُوْجٌ بِمَعْنَى دُخُوْلٌ থেকে নির্গত। মূলত ছিল لِيَوْلِجْ . وَاوْ বর্ণটি يَا . ও كَسْرَه -এর মাঝে আসার কারণে পড়ে গেছে। اَفْلَحُ . رَفَع -এর সাথে لِيَلِجْ -এর فَاعِلْ

وَيَجُوْزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِاُخْتِ اَخِيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِاُخْتِ اَخِيْهِ مِنَ النَّسَبِ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ الْاَخِ مِنَ الْاَبِ اِذَا كَانَتْ لَهُ اُخْتٌ مِنْ اُمِّهِ جَازَ لِاَخِيْهِ مِنْ اَبِيْهِ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ثَدْيِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْاُخْرٰى هٰذَا هُوَ الْاَصْلُ لِاَنَّ اُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا اَخٌ وَاُخْتٌ .

অনুবাদ : দুধ-ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ। কেননা, নসবী-ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। যেমন– বাপ-শরীক ভাইয়ের যদি তার মায়ের পক্ষের কোনো বোন থাকে তাহলে বাপ-শরীক ভাই সেই বোনকে বিবাহ করতে পারে। দুই ছেলেমেয়ে যদি কোনো স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করে থাকে তাহলে তারা একে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এটাই হলো নীতিগত হুকুম। কেননা, উভয়ের দুধমা এক হওয়ার কারণে তারা একে অন্যের ভাই-বোন হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, খালিদ মাজেদের মায়ের দুধ পান করেছে। এতে মাজেদ খালিদের নসবী-বোনকে বিবাহ করতে পারবে। অথচ এ মেয়েটি মাজেদের দুধ ভাই খালিদের নসবী-বোন। দলিল হলো, নসবী-ভাইয়ের নসবী-বোনের সাথে বিবাহ জায়েজ। এর সুরত হলো, শাহেদের দুই ছেলে। উভয়ের মা আলাদা আলাদা। তাহলে এরা উভয়ে আল্লাতী অর্থাৎ বাপ-শরীকি ভাই হলো। শাহেদ ঐ দুজনের একজনকে তালাক দিল। এ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ করার পর অপর স্বামীকে বিবাহ করল এবং তার থেকে একটি কন্যাও জন্মলাভ করল। এখন এ কন্যা শাহেদের দুই সন্তানের মধ্য থেকে একজনের মা-শরীকি বোন, আর অপরজনের ক্ষেত্রে আজনবীয়া তথা অপরিচিতা। সুতরাং এ দ্বিতীয় সন্তান উক্ত কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। অথচ এ কন্যাটি তার স্বামীর নসবী ভাইয়ের নসবী বোন। কিন্তু যেহেতু এ কন্যাটি তার ক্ষেত্রে অপরিচিতা মহিলা ছিল, যার সাথে তার বিবাহ হয়েছে। এজন্য এ বিবাহ সহীহ আছে।

قَوْلُهُ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اِجْتَمَعَ الخ : উভয় শিশু অর্থাৎ ছেলেমেয়ে দুজন কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করল– একসাথে কিংবা আগে-পরে। তাহলে এরা উভয়ে দুধ ভাই-বোন হয়ে গেল এবং পারস্পরিক তাদের বিবাহ সহীহ হবে না। যেমন– নসবী ভাই-বোনের পরস্পরে বিবাহ সহীহ হয় না। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই হলো নীতিমালা।

وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُرْضَعَةُ اَحَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِيْ اَرْضَعَتْ لِاَنَّهُ اَخُوْهَا وَلَا وَلَدَ وَلَدِهَا لِاَنَّهُ وَلَدُ اَخِيْهَا وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ اُخْتَ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ لِاَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَاِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَاِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) هُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ مَوْجُوْدٌ فِيْهِ حَقِيْقَةً وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَلْمَغْلُوْبُ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ حُكْمًا حَتّٰى لَا يَظْهَرُ بِمُقَابَلَةِ الْغَالِبِ كَمَا فِي الْيَمِيْنِ .

অনুবাদ : স্তন্যপানকারিণী তার দুধ-মাতার কোনো পুত্রকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, সে তার দুধ ভাই হবে। তদ্রূপ দুধ-মাতার পুত্রের সন্তানকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, সে তার ভাইয়ের সন্তান হবে। তদ্রূপ দুধপানকারী বাচ্চা স্তন্যদানকারিণীর স্বামীর বোনকে বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, সে তার দুধ-ফুফু হলো। যদি স্তনের দুধ পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয় আর দুধের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে উক্ত দুধের সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে। পক্ষান্তরে পানির অংশ অধিক হলে তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, উক্ত পানিতে প্রকৃতপক্ষে তো দুধ বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো, বিধান অনুযায়ী কম পরিমাণ অংশ অস্তিত্বহীন গণ্য হয়, তাই অধিক পরিমাণের মোকাবিলায় তা প্রকাশ পাবে না। যেমন– কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। [অর্থাৎ, কেউ কসম করল যে, দুধ খাবে না– অতঃপর পানি মিশ্রিত দুধ পান করল আর পানির পরিমাণ দুধের চেয়ে বেশি, তাহলে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُرْضَعَةُ اَحَدًا الخ : اَلْمُرْضَعَةُ-এর মধ্যে تَرْكِيْب-এর দিক থেকে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. مُرْضَعَة . بِفَتْحِ الضَّادِ ইসমে মাফউল এবং يَتَزَوَّجُ-এর فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع। আর اَحَدًا - مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب এ সুরতে অর্থ হবে, দুধপানকারিণী শিশু দুধদানকারীর সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে বিবাহ করতে পারবে না।

২. مُرْضَعَة - مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب। আর اَحَد - فَاعِل হিসেবে مَرْفُوْع। এ সুরতে অর্থ হবে, স্তন্যদানকারিণীর সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ দুধপানকারিণীর সাথে বিবাহ করতে পারবে না। উভয় সম্ভাবনার মূল একই। মাসআলাটির সুরত এবং তার দলিল পরিষ্কার, তাই দ্বিতীয় বার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَاِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, যদি দুধে পানি মিশানো হয়, আর দুধ বেশি ও পানি কম হয়। অতঃপর কোনো শিশু তা পান করে, তাহলে এর দ্বারা হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। আর যদি পানি বেশি ও দুধ কম হয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, এর দ্বারা হুরমত সাবেত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি পাঁচ ঢোক পরিমাণ দুধ তাতে

বিদ্যমান থাকে, আর শিশু তা পান করে, তাহলে এর দ্বারা হুরমত সাবেত হয়ে যাবে যদিও পানি বেশি হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, উক্ত পানিতে প্রকৃতপক্ষে দুধ বিদ্যমান আছে, তাই দুধ পান করা ধর্তব্য হবে। কারণ, প্রকৃত জিনিসের অস্বীকার করা যায় না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উপর বেশির চেয়ে বেশি এ প্রশ্ন করা যায় যে, দুধের আধিক্যের কারণে পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই তার উপর হুরমতের হুকুম আরোপিত না হওয়া উচিত। তখন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে এই জবাব হবে যে, এ সুরতের মধ্যে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া না হওয়ার মাঝে দোদুল্যমান, তাই সতর্কতাবশত হুরমতকে গাইরে হুরমতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আমাদের দলিল এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হলো, বিধান অনুযায়ী কম পরিমাণ অংশ অস্তিত্বহীন হিসেবে গণ্য হয়, তাই তা অধিক পরিমাণের মোকাবিলায় প্রকাশ পাবে না। যেমন– কেউ শপথ করল, আমি দুধ পান করব না। অতঃপর সে পানি মিশ্রিত দুধ পান করল। অথচ এখানে পানি বেশি ও দুধ কম ছিল। তাতে এ ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হবে না। হানাফীগণ যেন উক্ত মাসআলাটিকে শপথের মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন। কিন্তু হানাফীগণের এ দলিলটি দুর্বল। কেননা, আমরা বলি ঈমানের ভিত্তি হলো উরফের [প্রচলন] উপর। আর উরফের মধ্যে কম পরিমাণকে দুধ বলা হয় না, তাই এ কারণে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর রাদা'আতের হুরমত মওকুফ হলো দুধ বিদ্যমান থাকার উপর। আর এখানে তা আছে। তাই রাদা'আতের হুরমত সাবেত হওয়া উচিত। মোদ্দাকথা, উক্ত কিয়াস সঠিক নয়। তাই শক্তিশালী দলিল হলো, হুরমতের সম্পর্ক দুধপান করানোর সাথে নয়। যেমন– বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে দুধ পান করানোর দ্বারা সকলের মতে হুরমত সাবেত হয় না; বরং হুরমতের সম্পর্ক হলো, দুধ পান করানো দ্বারা যে হাড় ও গোশ্‌ত বৃদ্ধি পায় তার সাথে। আর যেহেতু স্বল্প দুধ দ্বারা খাদ্য হাসিল হয় না, তাই এর দ্বারা হাড় ও গোশ্‌তও বৃদ্ধি পাবে না। অতএব যখন হাড় ও গোশত বৃদ্ধি পাবে না, তাই এর দ্বারা রাদা'আতের হুরমতও সাবেত হবে না। –[আইনী শরহে হিদায়া]

وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا إِذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ قَالَ (رضـ) قَوْلُهُمَا فِيْمَا إِذَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ حَتَّى لَوْ طُبِخَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهُ شَيْءٌ عَنْ حَالِهِ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ الطَّعَامَ أَصْلٌ وَاللَّبَنَ تَابِعٌ لَهُ فِيْ حَقِّ الْمَقْصُوْدِ فَصَارَ كَالْمَغْلُوْبِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّبَنِ مِنَ الطَّعَامِ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ التَّغَذِّيَ بِالطَّعَامِ إِذْ هُوَ الْأَصْلُ .

অনুবাদ : যদি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে স্তনের দুধ মিশ্রিত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দুধের অংশ বেশি হলেও তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। তবে সাহেবাইনের মতে দুধের অংশ বেশি হলে তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাহেবাইনের বক্তব্য হলো ঐ দুধ সম্পর্কে, যা আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যদি আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সকলের মতেই তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। সাহেবাইনের দলিল হলো, আধিক্যই বিবেচ্য। যেমন– পানির সঙ্গে মিশ্রণের ক্ষেত্রে, যদি অন্যকিছু তার অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল, খাদ্যদ্রব্যই হলো মূল, আর দুধ হলো তার অনুবর্তী, উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে। সুতরাং সেটা স্বল্পতার পর্যায় হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, খাবার থেকে দুধ ফোঁটা ফোঁটা পড়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, খাদ্যের মধ্যেই রয়েছে শরীরের পুষ্টিগত গুণ। কেননা, এ পুষ্টিই হলো মূল উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, স্তনের দুধ যদি খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় আর ঐ মিশ্রিত দুধকে আগুন স্পর্শ না করে। অর্থাৎ, আগুনে না পাকানো হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এর দ্বারা রাদা'আতের হুরমত সাবেত হবে না– চাই দুধ খাদ্যদ্রব্যে কম বা বেশি হোক। সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি দুধ বেশি হয় তাহলে তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবে, আর কম হলে হবে না। আর যদি দুধ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করে আগুনে জ্বালানো হয় তবে সকলের মতে এর দ্বারা রাজ'আতের হুরমত সাবেত হবে না– চাই দুধ বেশি হোক বা কম হোক। কেননা, দুধ যদি কম হয় তখন তো হুরমত সাবেত না হওয়া পরিষ্কার, আর যদি দুধ বেশি হয় তখন হুরমত এ কারণে সাবেত হবে না যে, যখন দুধ খাদ্যে মিশ্রিত করে পাকানো হলো তখন দুধ খাদ্যের অনুবর্তী হয়ে গেল। তাই এখন এ দুধকে শর্তহীনভাবে দুধ বলা হবে না।

মূল মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল এই যে, আধিক্যই হলো বিবেচ্য। যেমন– পানির ক্ষেত্রে আধিক্যের বিবেচনা করা হয়। তবে শর্ত হলো, দুধকে অন্যকোনো কিছু তার মূল অবস্থা থেকে পরিবর্তন না ঘটাতে হবে।

ইমাম সাহেবের দলিল হলো, খাদ্যদ্রব্যই হলো মূল। আর দুধ হলো তার অনুবর্তী, তাই (حُصُوْلُ مَقْصُوْدٍ) অর্থাৎ খাদ্যে দুধ কম হয়ে গেল। যদিও মূলত বেশি ছিল তাই তার সাথে হুরমত যুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللَّبَنِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি খাদ্যে দুধ মিশ্রিত থাকে, আর লোকমা উঠাবার সময় খাদ্য থেকে দুধ ফোঁটা ফোঁটা পড়ে তাহলে এ সুরতে রাদা'আতের হুরমত সাব্যস্ত হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আযম (র.)-এর মতে সহীহ এই যে, হুরমত সাব্যস্ত হবে না। আর ফোঁটা ফোঁটা দুধের কোনো বিবেচনা করা হবে না। দলিল হলো, এ সুরতেও খাদ্যের মধ্যে শরীরের পুষ্টিগত গুণ রয়েছে; দুধের মধ্যে নয়। কেননা, পুষ্টির মধ্যে খাদ্যই হলো মূল। ইমাম আযম (র.) থেকে আরেকটি মত হলো, এ সুরতে হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। কেননা, দুধের একটি ফোঁটা শিশুর কণ্ঠনালি প্রবেশ করে এটিই হুরমতকে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, সর্বাবস্থায় হুরমত সাব্যস্ত হবে না।

জ্ঞাতব্য : فَصَارَ كَالْمَغْلُوْبِ -এর মধ্যে كَافْ বর্ণটি অতিরিক্ত।

وَاِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ لِاَنَّ اللَّبَنَ يَبْقٰى مَقْصُوْدًا فِيْهِ اِذِ الدَّوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْوُصُوْلِ وَاِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَاِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ كَمَا فِى الْمَاءِ. وَاِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيْمُ بِاَغْلَبِهِمَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لِاَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْاَقَلُّ تَابِعًا لِلْاَكْثَرِ فِىْ بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) وَ زُفَرُ (رح) يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا لِاَنَّ الْجِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَاِنَّ الشَّئَ لَا يَصِيْرُ مُسْتَهْلَكًا فِىْ جِنْسِهِ لِاِتِّحَادِ الْمَقْصُوْدِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فِىْ هٰذَا رِوَايَتَانِ وَاَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْاَيْمَانِ وَاِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ فَاَرْضَعَتْ صَبِيًّا تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ لِاِطْلَاقِ النَّصِّ وَلِاَنَّهُ سَبَبُ النَّشْوِ فَيَثْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ.

অনুবাদ : দুধ যদি ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত হয় আর দুধের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে কেননা, এক্ষেত্রে দুধও উদ্দেশ্যমূলক থাকে। কারণ, ঔষধ প্রয়োগ করা হয় দুধ যথাস্থানে পৌঁছার শক্তিবৃদ্ধির জন্য দুধ যদি বকরির দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হয় আর তা বকরির দুধের চেয়ে অধিক হয় তাহলে তার সঙ্গে হুরমত সম্পর্কিত হবে. পক্ষান্তরে বকরির দুধ অধিক হলে তার সঙ্গে হুরমত সম্পর্কিত হবে না। এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো আধিক্যের দিক বিবেচনা করে। যেমন– পানির ক্ষেত্রে। যদি দুজন স্ত্রীলোকের দুধ মিশ্রিত হয়, তাহলে যার দুধ পরিমাণে অধিক তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবে। এটা হলো ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। কেননা, সাকুল্য দুধ একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং স্বল্পতরকে অধিকতরের অনুবর্তী ধরে তার উপর হুকুমের ভিত্তি হবে। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, হুরমতের সম্পর্ক হবে উভয় দুধের সাথে। কেননা, কোনো জিনিস সমজাতীয় জিনিসের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ, কোনো জিনিস সমজাতীয় জিনিসের সাথে মিশ্রিত হলে তা বিলীন হয় না কেননা, উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দুটি বর্ণনা রয়েছে। আর মূল মাসআলাটি কসম সম্পর্কিত [বিয়য়ের সাথে সংশ্লিষ্ট]। কুমারী নারীর যদি দুধ নেমে আসে আর তা কোনো বাচ্চাকে পান করায়, তাহলে উক্ত দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে। কেননা, এ সম্পর্কীয় আয়াত নিঃশর্ত। তা ছাড়া দুধ হলো শরীরের বৃদ্ধির কারণ। সুতরাং এর দ্বারা শারীরিক আংশিকতার সন্দেহ সাব্যস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ الخ : যদি দুধ ঔষধের সঙ্গে মিশানো হয় আর দুধ অধিক হয় তাহলে এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হবে. দলিল হলো, খাদ্যের ক্ষেত্রে দুধই হলো মূল উদ্দেশ্য। ঔষধতো প্রয়োগ করা হয় নিছক দুধ যথাস্থানে পৌঁছার শক্তিবৃদ্ধির জন্য। আর যদি দুধ কম ও ঔষধ বেশি হয় তাহলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না।

প্রশ্ন: কিন্তু এর উপর প্রশ্ন জাগে যে, যদি দুধের কাজ শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া অন্যকোনো কিছু না হয়, তাহলে তো দুধ কমবেশি যা-ই হোক হুরমত সাবেত হওয়া উচিত। কেননা, দুধ কম হওয়ার সুরতে ন্যূনতম এক ফোঁটা হলেও তা বাচ্চার কণ্ঠনালিতে অবশ্যই পৌঁছে যাবে। আর হানাফীগণের মতে, এ এক ফোঁটাও হুরমত সাবেত করে?

উত্তর : এর উত্তর হলো, এ স্থানে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাইতো দুধ যদি অধিক হয় তাহলে এর দ্বারা খাদ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য হবে। আর ঔষধ শুধু শক্তি বৃদ্ধির জন্য হবে। আর যদি দুধ কম হয় তাহলে উদ্দেশ্য শক্তি বৃদ্ধি হবে। আর দুধ ঔষধে শক্তি যোগাবে। সুতরাং উক্ত পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যাবার পর আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি দুই স্ত্রীলোকের দুধ মিশ্রিত হয়ে যায় এবং কোনো বাচ্চা ঐ দুধ পান করে, তাহলে এর দ্বারা হুরমতে রাদা'আত সাব্যস্ত হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যার দুধ অধিক তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। এটি শাফেয়ী (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, উভয়ের দুধের সাথে হুরমতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অনুরূপ, আর অপর বর্ণনা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর অনুরূপ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উভয় স্ত্রীলোকের দুধ মিশ্রিত হয়ে একই বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই এর রাদা'আতের হুকুমের ভিত্তি করার ক্ষেত্রে স্বল্পতরকে অধিকতরের অনুবর্তী করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, কোনো জিনিস সমজাতীয় জিনিসের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। কারণ, প্রাধান্য তখন অস্তিত্বে আসে যখন স্বল্পতর জিনিস না থাকে। আর কোনো জিনিস তার সমজাতীয়ের সাথে মিলে অস্তিত্বহীন হয় না; বরং তার মধ্যে বৃদ্ধি হয়। কেননা, উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং যখন কোনো জিনিস তার সমজাতীয়ের সাথে মিলে অনস্তিত্ব লাভ করে না, তখন তাদের মধ্যে থেকে কোনোটি অপরটির অনুবর্তী হবে না। আর যখন একটি অপরটির অনুবর্তী হবে না, তখন হুরমত প্রত্যেকটির সাথে ভিন্ন ভিন্নভাবে যুক্ত হবে; একটির সাথে নয়।

قَوْلُهُ وَاَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْاَيْمَانِ : মূল মাসআলাটির সম্পর্ক কসম অধ্যায়ের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ বকরির দুধ পান করবে না। অতঃপর এ বকরির দুধ অন্য বকরির দুধের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় বকরির দুধ অধিক। আর প্রথমটির দুধ কম। এখন এ ব্যাপারেও উপরিউক্ত মতবিরোধ বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, স্বল্পতর বস্তু হলো অস্তিত্বহীন সদৃশ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, কোনো জিনিস তার সমজাতীয়ের সাথে মিলে আরো বৃদ্ধি পায়; শেষ হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ الخ : যদি কুমারী নারীর স্তন থেকে দুধ নেমে আসে এবং ঐ দুধ কুমারী নারী কোনো বাচ্চাকে পান করিয়ে দেয়, তবে সকলের মতে উক্ত দুধ দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, আয়াতে কারীমা وَأُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ أَرْضَعْنَكُمْ হলো শর্তহীন। এর মধ্যে কুমারী-অকুমারী বলে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় দলিল হলো, কুমারীর দুধও শরীরের বৃদ্ধির কারণ বা সবব হয়। সুতরাং এর দ্বারা শরীরের আংশিকতার সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে যায়। আর এ আংশিকতার সন্দেহের কারণে সতর্কতাগত হুরমত সাব্যস্ত করে দেয়, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা এই যে, কুমারীর দুধ দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কুমারীর দুধ খুব কমই বেরিয়ে আসে, তাই তা পুরুষের দুধের অনুরূপ হয়ে গেল, [তাই এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হবে না]।

وَاِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاُوْجِرَ الصَّبِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) هُوَ يَقُوْلُ اَلْاَصْلُ فِيْ ثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ اِنَّمَا هُوَ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تَتَعَدّٰى اِلٰى غَيْرِهَا بِوَاسِطَتِهَا وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلًّا لَهَا وَلِهٰذَا لَا يُوْجِبُ وَطْيُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَلَنَا اَنَّ السَّبَبَ هُوَ شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذٰلِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَى الْاِنْشَاءِ وَالْاِنْبَاتِ وَهُوَ قَائِمٌ بِاللَّبَنِ وَهٰذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْمَيْتَةِ دَفْنًا وَتَيْمِيْمًا اَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فِي الْوَطْيِ لِكَوْنِهٖ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّ الْحَرْثِ وَقَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ فَافْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : কোনো নারীর মৃত্যুর পর যদি তার দুধ দোহন করা হয় এবং তা কোনো শিশুর মুখে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে তার সঙ্গে হুরমতের সম্পর্ক হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো স্তন্যদানকারিণী নারী। অতঃপর তার মাধ্যমে অন্যদের দিকে হুরমতের বিস্তার ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর কারণে সেতো হুরমতের ক্ষেত্র থাকেনি। এ কারণেই তার সঙ্গে যৌনসম্ভোগ দ্বারা বৈবাহিক হুরমত সাব্যস্ত হয় না। আমাদের দলিল হলো, শারীরিক আংশিকতার সন্দেহই হুরমতের কারণ। আর তা হলো দুধের মধ্যে। যেহেতু তাতে শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির গুণ রয়েছে। আর তা দুধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। আর এ [দুধের সাথে সম্পৃক্ত] হুরমত মৃতের বেলায় প্রকাশ পাবে, দাফন ও তায়াম্মুম করানোর ক্ষেত্রে। আর সহবাসের বেলায় আংশিকতা ধর্তব্য হয় উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে বীর্যের সংযোগের কারণে। আর মৃত্যুর কারণে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং উভয় সুরতে পার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ الخ : اُوْجِرَ - مَاضِيْ مَجْهُوْل - وَجْرٌ থেকে নির্গত। وَجْرٌ ও وُجُوْرٌ ঐ ঔষধকে বলা হয়, যা মুখের [জিহ্বার] মাঝখানে ঢেলে দেওয়া হয়। আর اُوْجِرَ বলা হয় মুখের মধ্যে ঢেলে দেওয়াকে। শব্দটি مُتَعَدِّيْ بِدُوْمَفْعُوْل হলো ضَمِيْر যা رَاجِعْ হয়েছে لَبَنُ الْمَرْأَةِ -এর দিকে, যা فَاعِل -এর স্থলাভিষিক্ত। দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো مَفْعُوْل اَوَّل - اَلصَّبِيُّ। -[আইনী শরহে হেদায়া]।

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো নারীর মৃত্যুর পর তার দুধ দোহন করা হয়েছে, তারপর তা কোনো শিশুর মুখে প্রবেশ করানো হয়েছে। এখন হানাফীগণের নিকট এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এটি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এরও বক্তব্য। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হুরমত সাব্যস্ত হবে না। গ্রন্থকার بَعْدَ الْمَوْتِ -এর সাথে এ কারণে উল্লেখ করেছেন যে, যদি মৃত্যুর পূর্বে (قَبْلَ الْمَوْتِ) দুধ দোহন করা হয়, আর মৃত্যুর পর শিশুর মুখে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে এ সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতেও হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মোদ্দাকথা, বিরোধপূর্ণ সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল তো হলো নারী। অর্থাৎ, প্রথমত ঐ স্তন্যদানকারিণী নারী ও দুধ পানকৃত শিশুর মধ্যকার হুরমত সাবিত হয়ে যাবে। তারপর ঐ নারীর মাধ্যমে তার অন্যদের দিকে বিস্তার ঘটবে। কিন্তু যেহেতু এ নারী মৃত্যুর কারণে হুরমতের ক্ষেত্র থাকেনি, তাই অন্যের দিকেও হুরমতের বিস্তার ঘটবে না। আর যেহেতু এ নারী হুরমতের ক্ষেত্রই থাকেনি, তাই যদি এ মৃত নারীর সাথে সহবাস করা হয় তাহলে এর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক সাবিত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, শারীরিক আংশিকতার কারণই হুরমতের কারণ। আর যেহেতু দুধ পান করার কারণে গোশত ও হাড় বৃদ্ধি পায় –এ কারণে আমরা বলেছি যে, দুধ পান করার সময় এ আংশিকতার সন্দেহ বিদ্যমান আছে। আর যখন হুরমতের সবব অর্থাৎ আংশিকতার সন্দেহ বিদ্যমান, তাই এ মৃত নারীর দুধ পান করার দ্বারাও হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ الْحُرْمَةُ تَظْهَرُ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর জবাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ কথা বলা যে, মৃত্যুর কারণে নারী হুরমতের ক্ষেত্রই থাকল না, এ কথাটি ভুল। কেননা, এই হুরমত মৃত নারীর ক্ষেত্রে দাফন ও তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার বেলায় প্রকাশ পাবে। এর সুরত হলো, এক মেয়ে যে ঐ মৃত নারীর দুধ পান করেছে, যার স্বামী আছে। এখন এ মেয়ের স্বামী ঐ মৃত নারীর মাহরাম হবে। কেননা, এ মৃত নারী ঐ মেয়ের স্বামীর শাশুড়ি হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, জামাতা শাশুড়ির মাহরাম হয়। এখন যদি ঐ মৃত নারীর কোনো মাহরাম না থাকে এবং গোসল ব্যতিরেকে তায়াম্মুম করানোর প্রয়োজন দেখা দেয়, উক্ত মেয়ের জামাই ব্যতীত তার অন্যকোনো মাহরাম না থাকে, তাহলে এ জামাই তাকে তায়াম্মুম করাবে আর দাফন কার্য সম্পাদন করবে। কেননা, এ মৃত নারী তার দুধ-শাশুড়ি।

قَوْلُهُ أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فِي الْوَطْيِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারাংশ হলো, রাদা'আতের হুরমতকে হুরমতে মুসাহারাত তথা বৈবাহিক হুরমতের সাথে কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, উভয়টির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, রাদা'আতের মধ্যে হুরমতের সবব খাদ্যের কারণে গোশ্ত ও হাড় বৃদ্ধি পাওয়া। যার দ্বারা আংশিকতা সাব্যস্ত হয় না। আর বৈবাহিক হুরমতের সবব হলো ঐ আংশিকতা যা সন্তানের দ্বারা অর্জন হয়। আর সন্তানতো তখন হবে যখন সহবাস উৎপাদন ক্ষেত্রের স্থানে করা হবে। আর মৃত্যুর কারণে উৎপাদন ক্ষেত্রের স্থান দূরীভূত হয়ে গেছে। তাই মৃত্যুর পর সন্তানদেরও চিন্তা করা যায় না। আর যখন মৃত্যুর পর সন্তানদের চিন্তাও করা যায় না তখন আংশিকতারও চিন্তা করা যায় না। মোদ্দাকথা এই যে, মৃত্যুর পর নারীর দুধ দোহন করে যদি বাচ্চাকে পান করানো হয়, তবে এর দ্বারা আংশিকতা সাবেত হয়ে যাবে। আর মৃত নারীর সাথে যদি সহবাস করা হয় তবে উৎপাদন ক্ষেত্রের মহল না হওয়ার দরুন সন্তানের চিন্তাই আসবে না। আর সন্তানদের চিন্তা না আসার কারণে আংশিকতা সাবেত হবে না, তাই রাদা'আতকে মৃত্যুর পর সহবাসের উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না। –[আল-কিফায়া]

وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ يَثْبُتُ الْحُرْمَةُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلَاحُ الْبَدَنِ وَيُوْجَدُ ذٰلِكَ فِي الدَّوَاءِ فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ مَعْنَى النَّشْوِ وَلَا يُوْجَدُ ذٰلِكَ فِي الْإِحْتِقَانِ لِأَنَّ الْمُغْذِيَّ وُصُوْلُهُ مِنَ الْأَعْلٰى ـ

অনুবাদ : আর যদি শিশুকে দুধ ডুশ দ্বারা দেওয়া হয় তাহলে এ দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তা হুরমত সাব্যস্ত করবে, যেমন তা দ্বারা সিয়াম ফাসেদ হয়ে যায়। জাহিরী বর্ণনা মতে উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, সিয়ামের ক্ষেত্রে ভঙ্গকারী বিষয় হলো শরীরের সংশোধন [উপকার সাধন] আর ঔষধ প্রয়োগের মধ্যে এ বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে হারামকারী বিষয় হলো পুষ্টি অর্জনের গুণ। আর তা ডুশ ব্যবহারের মাঝে পাওয়া যায় না। কেননা, পুষ্টি লাভ হয় উপরের দিক [নাক-মুখ] থেকে গ্রহণের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ الخ : اِحْتِقَانٌ অর্থ– ডুশ দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির গুহ্যদ্বার দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করানো। 'আল-মাগরিব' নামক অভিধানে বর্ণিত আছে যে, اُحْتُقِنَ সহীহ নয়; বরং حُقِنَ অধিক শুদ্ধ। কেননা, মাগরিব গ্রন্থকার اِحْتِقَانٌ-কে لَازِمٌ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু تَاجُ الْمَصَادِرْ-এ বর্ণিত হয়েছে যে, اِحْتِقَانٌ অর্থ– ডুশ দেওয়া। কিন্তু تَاجُ الْمَصَادِرِ গ্রন্থকার اِحْتِقَانٌ-কে مُتَعَدِّيْ বলেছেন। তাই এর উপর ভিত্তি করে مَجْهُوْل-এর সীগাহ ব্যবহার করা সহীহ আছে। সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো শিশুর পেটে ডুশ দ্বারা কোনো নারীর দুধ পৌঁছানো হয় তাহলে তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। জাহিরী রেওয়ায়েতে এমনটিই বর্ণিত আছে। তবে নাওয়াদির -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারাও হুরমত সাবেত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যেমনিভাবে ডুশ দ্বারা রোজা ফাসেদ হয়ে যায়, তেমনিভাবে ডুশ দ্বারা শিশুর পেটে দুধ পৌঁছানো দ্বারাও রাদা'আতের হুরমত সাবেত হবে।

জাহিরী বর্ণনা মতে ডুশ দেওয়ার ক্ষেত্রে রোজা ফাসেদ হওয়া ও রাদা'আতের হুরমতের মধ্যকার পার্থক্যের কারণ এই যে, রোজার মধ্যে শরীরের সংশোধনকারী রয়েছে আর ডুশ দ্বারা ঔষধ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শরীরের সংশোধন রয়েছে, এজন্য রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। আর দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে হারামকারী বিষয় হলো পুষ্টি অর্জনের গুণ। আর ডুশের মধ্যে এ বস্তুটি পাওয়া যায় না। কেননা, পুষ্টি লাভ হয় ঐ সকল বস্তু দ্বারা যা উপরের দিক থেকে পৌঁছানো হয়; নীচের দিক থেকে নয়। মোদ্দাকথা, যখন ডুশের মাধ্যমে ঔষধ পৌঁছানোর মধ্যে পুষ্টি নেই, যা রাদা'আতের মধ্যে হারামকারী, তাই এর সাথে হুরমত যুক্ত হবে না।

وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى التَّحْقِيقِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّشُوُّ وَالنُّمُوُّ وَهٰذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ لَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَ الْأٰدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ وَالْحُرْمَةُ بِاعْتِبَارِهَا .

অনুবাদ : পুরুষের যদি দুধ নামে আর সে তা কোনো শিশুকে পান করায় তাহলে তাতে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। কেননা, গবেষণার সিদ্ধান্ত মতে তা দুধ নয়। সুতরাং এর সঙ্গে শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্পর্কিত হবে না। কারণ, স্তন্যদুগ্ধ ঐ সত্তার ক্ষেত্রেই শুধু কল্পনা করা যায়, যে ক্ষেত্রে সন্তান প্রসব সম্ভব। কতিপয় শিশু যদি একটি বকরির দুধ পান করে তাহলে উক্ত দুধের কারণে হুরমতের সম্পর্ক হবে না। কেননা, মানুষ ও পশুর মাঝে শারীরিক আংশিকতার সম্পর্ক নেই। অথচ আংশিকতার কারণেই হুরমতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ الخ : যদি কোনো পুরুষের স্তন থেকে দুধ বের হয় এবং সে এ দুধ কোনো শিশুকে পান করায় তবে এর দ্বারা রাদা'আতের হুরমত সাব্যস্ত হবে না [এর উপর সকল ইমাম একমত]। দলিল হলো, পুরুষের দুধ প্রকৃতপক্ষে দুধ নয়। যেমন– মাছের রক্ত প্রকৃতপক্ষে রক্ত নয়। তাছাড়া এর দ্বারা শরীরের বৃদ্ধিও পাওয়া যাবে না। আর পুরুষের দুধ প্রকৃত দুধ নয় এ কারণে যে, দুধ ঐ সত্তার ক্ষেত্রেই শুধু কল্পনা করা যায় যার দ্বারা সন্তান প্রসব সম্ভব। আর যেহেতু পুরুষ থেকে সন্তান প্রসবের কল্পনা করা যায় না, তাই যখন তার থেকে দুধ বের হবে তখন তার সাথে হুরমতও যুক্ত হবে না। এমনিভাবে যদি কুমারীর স্তন থেকে হলদে বর্ণের পানি বের হয় এবং তা কোনো শিশুকে পান করানো হয় তাহলে এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হবে না। মুগনীতে বর্ণিত আছে যে, খুনছা [হিজড়া]-এর দুধ পুরুষের দুধের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ الخ : মূল মাসআলাটির সুরত ও দলিল সুস্পষ্ট। তবে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (র.) শায়খ আবূ হাফ্স আল-কাবীরের জমানায় বুখারায় তাশরীফ নিলেন, আর ফতোয়া দিতে লাগলেন [যে এর দ্বারা হুরমত সাবেত হবে]।

শায়খ আবূ হাফ্স ইমাম বুখারীকে বললেন, এ ধরনের ফতোয়া দিও না। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) শায়খের উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। একবার তাঁর নিকট ফতোয়া চাওয়া হলো যে, যদি দুই শিশু এক বকরির দুধ পান করে তাহলে এর বিধান কি?

ইমাম বুখারী (র.) বললেন, হুরমত সাবেত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা একত্রিত হয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। অবশেষে উক্ত ফতোয়ার কারণে ইমাম বুখারী (র.)-কে বুখারা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حَرُمَتَا عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ رِضَاعًا وَ ذٰلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا ثُمَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيْرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَلِلصَّغِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ لَا مِنْ جِهَتِهَا وَالْاِرْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا لٰكِنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيْ إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتْ مُوْرِثَهَا وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ اِمْرَأَتُهُ .

অনুবাদ : কোনো লোক যদি বড় ও ছোটকে বিবাহ করে আর বড় স্ত্রী ছোটটিকে স্তন্যদান করে বসে, তাহলে উভয়ে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা, লোকটি তখন দুধ-মা ও দুধ-কন্যাকে একত্রকারী হয়ে যাবে। আর তা হারাম। যেমন– নসবী মা ও মেয়েকে একত্র করা। বড়টির সঙ্গে যদি সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে সে কোনো মহর পাবে না। কেননা, সহবাসের পূর্বেই তার দিক থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে ছোটটি অর্ধেক মহর পাবে। কেননা, বিচ্ছেদ তার দিক থেকে ঘটেনি। দুগ্ধপান যদিও তারই কর্ম, কিন্তু তার হক রহিত করার ক্ষেত্রে তার কর্ম ধর্তব্য নয়। যেমন– ছোট শিশু যদি এমন কাউকে হত্যা করে, যার কাছ থেকে তার মিরাস পাওয়ার কথা [তাহলে সে মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না]। তবে স্বামী বড়টির কাছ থেকে মহর বাবত প্রদত্ত অর্থ উসুল করবে, যদি সে দুধ পান করিয়ে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকে। আর যদি সে ইচ্ছা না করে থাকে তাহলে তার উপর কোনো অর্থদণ্ড আসবে না, যদিও তার তা জানা থাকে যে, ছোট শিশুটি তার স্বামীর স্ত্রী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً الخ : একজনের বিবাহে একজন বড় ও একজন ছোট দুধের শিশু আছে। বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীকে নিজের দুধ পান করিয়ে দিল। এখন স্বামীর জন্য এরা উভয়জন হারাম হয়ে যাবে। এটা হলো আহনাফের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। বড় স্ত্রী তো হারাম হবে এ কারণে যে, সে তার আপন স্বামীর দুধ-শাশুড়ি হয়ে গেল। আর ছোট স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যাখ্যা আছে। আর তা হলো, যদি ঐ স্বামী বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে যার ফলে তার থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো এবং দুধ বেরিয়ে আসল, তারপর বড় স্ত্রী এ দুধ তার ছোট স্ত্রীকে পান করাল। এখন এর দ্বারা ছোট স্ত্রীর সাথে হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, এ ছোট স্ত্রী তার দুধ-কন্যা হয়ে গেল এবং এ স্বামী তার দুধ-পিতা হয়ে গেল।

আর যদি বড় স্ত্রীর দুধ তার প্রথম সূত্রে বেরিয়ে আসে এবং এ ব্যক্তি [দ্বিতীয় স্বামী] প্রথম স্বামীর তালাক দেওয়ার পর তাকে বিবাহ করে অথচ এ বড় স্ত্রী দুগ্ধবতী। তারপর এ বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীকে দুধ পান করায়, তাহলে লক্ষণীয় যে, এ দ্বিতীয় স্বামী বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে কিনা। যদি সহবাস করে থাকে, তাহলেও ছোট স্ত্রীর সাথে হুরমত যুক্ত হবে। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে হুরমত যুক্ত হবে না। কেননা, এ ছোট স্ত্রী হলো তার সতীনের মেয়ে। আর সতীনের মেয়েরও একই হুকুম। অর্থাৎ, যদি তার মায়ের সাথে সহবাস করা হয়, তাহলে সতীনের মেয়েকে [রবীবা] বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। আর যদি তার মায়ের সাথে সহবাস না করা হয়, তাহলে বিবাহ হালাল হবে। –[ফাতহুল কাদীর, আল-কিফায়া]

মোদ্দাকথা, ছোট-বড় [স্ত্রী] উভয়কে বিবাহ করা হারাম হওয়ার কারণ হলো, তারা উভয়ে পরস্পরে দুধ-মা ও মেয়ে হয়ে গেল। আর দুধ-মা ও মেয়েকে একত্রে বিবাহ করা হারাম– যেমনটি নসবী মা-মেয়েকে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيْرَةِ الخ : এর দ্বারা মহরের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি স্বামী বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে স্বামীর উপর বড় স্ত্রীর মহর ওয়াজিব হবে না– দুধ পান করানো দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করার ইচ্ছা করুক বা না করুক। দলিল হলো, বড়জনের দুধ পান করানোর কারণে সহবাসের পূর্বের বিচ্ছেদ তার পক্ষ থেকেই ঘটেছে। আর সহবাসের পূর্বের বিচ্ছেদ তার পক্ষ থেকেই ঘটেছে। আর সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটার দ্বারা অর্ধ মহর বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই বড়জনের জন্য মহর ওয়াজিব হবে না। কেননা, মহর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ বা ইল্লত বড়জনের দিকে বিচ্ছেদকে সম্পর্কিত করারই নামান্তর। এজন্য আমরা বলেছি যে, যদি দুধ পান করানোর জন্য বড়জনকে জবরদস্তি করা হয় কিংবা সে শায়িত ছিল, ছোটজন এসে নিজেই দুধ পান করে ফেলেছে, কিংবা কোনো ব্যক্তি বড়জনের দুধ নিয়ে ছোটজনকে ঢেলে দিল, কিংবা বড়জন মাতাল অবস্থায় দুধ পান করিয়ে দিল, তাহলে এ সকল সুরতে বড়জন অর্ধ মহর পাবে। কেননা, এ সুরতগুলোর মধ্যে বড়জনের দিকে বিচ্ছেদকে নিসবত করা হয় না। আর যদি স্বামী বড়জনের সাথে সহবাস করে থাকে, তাহলে তার জন্য পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। তবে স্বামীর উপর ইদ্দতের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, ভুল বড়জনের পক্ষ থেকেই এসেছে। তবে ছোট স্ত্রী মহর পাবে কিনা? এ ব্যাপারে হানাফীগণের মাযহাব হলো, ছোট স্ত্রীর জন্য অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, বিচ্ছেদ তো ছোট স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন– সে বড় স্ত্রীর কন্যা হয়ে গেল। সুতরাং যেমনিভাবে বড়জনের মহর বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবে ছোটজনের মহরও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হানাফীগণের দলিল হলো, ছোটজনের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটেনি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দুধ পান করাতো ছোটজনের কর্ম, তাই এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ছোট স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ পাওয়া গেছে। এর উত্তরে আমরা বলব যে, দুধ পান করা যদিও ছোট স্ত্রীর কর্ম এবং বিবাহ বিনষ্ট তার দ্বারাই হয়েছে; কিন্তু ছোটজনের কর্ম তার হককে রহিত করার ক্ষেত্রে শরয়ীভাবে ধর্তব্য নয়। কেননা, ছোটজন শরয়ী বিধানাবলির মুখাতাব বা সম্বোধিত নয়। তাই তার কর্মের উপর শরিয়তের হুকুম আরোপ হবে না। মাসআলাটি এমন হলো, যেমন– ছোট শিশু তার কোনো উত্তরসূরিকে হত্যা করে ফেলল, তাহলে এ ছোট শিশুটি নিহতের ওয়ারিশ হবে না এবং তার এ হত্যা শরয়ীভাবে মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার সবব বা কারণ হবে না। অথচ হত্যাকারীকে তার নিহত উত্তরসূরির উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, শরিয়ত শিশুর হত্যার কর্মকে গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ছোটজন প্রকৃতিগতভাবে দুধ পান করতে অপারগ। আর বড়জন তার স্তন ছোটজনের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন। আর নীতিমালা আছে যে, কর্মের সম্পর্ক ইচ্ছার দিকে করা হয়, অপারগতার দিকে করা হয় না [ছোটজনের হত্যার সুরত এই হবে যে, সে ছাদের উপর আছে, আর তার মা নীচে শায়িত। সে একটি পাথর নীচে মায়ের উপর ফেলে দিল, যার ফলে মা মৃত্যুবরণ করল]।

قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ الخ : এর দ্বারা গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, স্বামী যে অর্ধ মহর ছোট স্ত্রীকে দিয়েছিল তা বড় স্ত্রী থেকে ফেরত নিতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জাহিরে রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বড় স্ত্রী যদি দুধ পান করানো দ্বারা বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে স্বামীর বড় স্ত্রী থেকে অর্ধেক মহর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি সে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা না করে থাকে; বরং ক্ষুধা ও ধ্বংস থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা করেছিল, তাহলে এ সুরতে বড় স্ত্রী থেকে অর্ধেক মহর ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না। যদিও বড় স্ত্রীর জানা থাকে যে, ছোটজন তার স্ত্রী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে নাওয়াদিরে বর্ণিত আছে যে, স্বামী উভয় সুরতে বড় স্ত্রী থেকে অর্ধেক মহর ফেরত নেবে– বড় স্ত্রী বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও এ মত।

وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَكَّدَتْ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ ذٰلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ لٰكِنَّهَا مُسَبِّبَةٌ فِيهِ إِمَّا لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ لَيْسَ بِإِفْسَادِ النِّكَاحِ وَضْعًا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذٰلِكَ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ أَوْ لِأَنَّ فَسَادَ النِّكَاحِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِإِلْزَامِ الْمَهْرِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِسُقُوطِهِ إِلَّا أَنَّ نِصْفَ الْمَهْرِ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا عُرِفَ لٰكِنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِبْطَالُ النِّكَاحِ وَإِذَا كَانَتْ مُسَبِّبَةً يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي كَحَفْرِ الْبِئْرِ ثُمَّ إِنَّمَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً إِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَقَصَدَتْ بِالْإِرْضَاعِ الْفَسَادَ أَمَّا إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلٰكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوعِ وَالْهَلَاكِ مِنَ الصَّغِيرَةِ دُونَ الْإِفْسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِذٰلِكَ وَلَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً أَيْضًا وَهٰذَا مِنَّا اِعْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উভয় সুরতেই তার নিকট থেকে স্বামী মহরের অর্থ ফেরত পাবে। তবে জাহিরে রেওয়ায়েতের বর্ণনাই সহীহ। কেননা, এটা ঠিক যে, অর্ধমহর রহিত হওয়ার সম্ভাবনা পরিপূর্ণ ছিল, সেটাকে রহিত করে দিয়েছে। আর তা নষ্ট করার সমতুল্য, কিন্তু এ বিষয়ে সে অনুঘটক মাত্র। এটা এজন্য যে, স্তন্যদান প্রকৃতিগতভাবে বিবাহ নষ্টকারী নয়। আর এখানে তা ঘটনাচক্রে সাব্যস্ত হচ্ছে। অথবা বিবাহ নষ্ট হওয়া মহর সাব্যস্ত করার কারণ নয়; বরং মহর রহিত হওয়ার কারণ। তবে অর্ধমোহর ওয়াজিব হচ্ছে মুত'আ হিসেবে। যেমন- ইতঃপূর্বে তা জানা গেছে। কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিবাহ বাতিল হওয়া। যখন সে অনুঘটক বলে সাব্যস্ত হলো তখন দণ্ড সাব্যস্ত করার জন্য তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন পাওয়া শর্ত হবে। যেমন- কূপ খননের বিষয়টি। তবে বড় স্ত্রী সীমালঙ্ঘনকারী তখনই হবে, যখন সে বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে আর স্তন্যদানের মাধ্যমে বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা থাকে। আর যদি বিবাহ সম্পর্কে জানা না থাকে কিংবা জানা তো ছিল, কিন্তু সে ছোট মেয়েটির ক্ষুধা নিবারণ করার এবং জীবন রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিল; বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করেনি, তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারিণী হবে না। কেননা, [এরূপ ক্ষেত্রে] এটা করার জন্য সে [শরিয়তের পক্ষ থেকে] আদিষ্ট। যদি বিবাহের বিষয়টি জানা থেকে থাকে, কিন্তু বিবাহ নষ্ট হওয়ার হুকুম জানা না থাকে, তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে অজ্ঞতা বিবেচনা করার কারণ 'নষ্টকরণের ইচ্ছা' না থাকার ক্ষেত্রে, শরিয়তের হুকুম রোধ করার ক্ষেত্রে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ : তবে জাহিরে রেওয়ায়েতের বর্ণনা হলো সহীহ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বড় স্ত্রী বিবাহ নষ্ট করার ক্ষেত্রে مُسَبِّبَة তথা কারণ সৃষ্টিকারিণী। আর কায়দা আছে যে, ক্ষতিপূরণ (ضَمَانٌ) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে مُسَبِّبْ . مُبَاشِرْ -এর অনুরূপ হয়। এ কারণে যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো পিঞ্জরের দরজা খুলে দেয় আর এতে পাখি উড়ে যায়, কিংবা আস্তাবলের দরজা খুলে দেয় আর ঘোড়া পলায়ন করে, কিংবা কয়েদির পায়ের বেড়ি খুলে দেয় আর সে পলায়ন করে, তাহলে এ দরজা উন্মুক্তকারী এবং বেড়ি উন্মুক্তকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অথচ সে শুধু . مُبَاشِرْ مُسَبِّبْ নয়। কিন্তু مُسَبِّبْ -কে مُبَاشِرْ -এর অনুরূপ করে مُسَبِّبْ -এর উপরই ঐ হুকুম দেওয়া হয়েছে, যা مُبَاشِرْ -এর উপর দেওয়া হয়। আর যেহেতু مُبَاشِرْ -এর মধ্যে সীমালজ্ঞন ও অসীমালজ্ঞন উভয়টি বরাবর, তাই এমনিভাবে مُسَبِّبْ -এর মধ্যেও সীমালজ্ঞন ও অসীমালজ্ঞন উভয়টি বরাবর হবে। এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বড়জন দুধ পান করিয়ে সীমালজ্ঞন করুক [বিবাহ নষ্টের ইচ্ছা করুক] বা সীমালজ্ঞন না করুক [অর্থাৎ, বিবাহ নষ্টের ইচ্ছা না করুক] উভয় সুরতে স্বামী বড়জন থেকে অর্ধ মহর ফেরত নেবে। −[ইনায়া] জাহিরে রেওয়ায়েতের কারণ হলো, ছোট স্ত্রীর অর্ধ মহর রহিত হওয়ার নিকটবর্তী ছিল, যেমন− বালিগ হয়ে সহবাসের পূর্বে সে স্বামী স্ত্রীকে চুমা দিত, কিংবা মুরতাদ হয়ে যেত এবং এর কারণে তার পূর্ণ মহর রহিত হয়ে যেত। মোদ্দাকথা, ছোট স্ত্রীর যে অর্ধ মহর রহিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, বড় স্ত্রী দুধ পান করিয়ে তার অর্ধ মহরকে রহিত করে দিল, আর এ দৃঢ়করণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার স্থলবর্তী। যেন বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীকে দুধ পান করিয়ে স্বামীর অর্ধ মহরকে ধ্বংস করে দিল। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, এ বড় স্ত্রী মহর ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নিছক مُسَبِّبَة . مُبَاشِرَة নয়। অর্থাৎ صَاحِبِ عِلَّتْ ;صَاحِبِ سَبَبْ নয়। আর مُسَبِّبَة হওয়ার কারণ হলো, দুধ পান করানোকে বিবাহ বিনষ্ট করার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং তা বাচ্চার তরবিয়ত ও লালনপালনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এখানে ঘটনাচক্রে বিবাহ এ কারণে নষ্ট হয়েছে যে, তারা উভয়ে ছোট-বড় মা-মেয়ে হয়ে এক ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হয়ে গেছে। নতুবা যদি এ বড় স্ত্রী অন্য কারো দুধ পান কৃত কন্যাকে দুধ পান করাত, তাহলে তাদের মাঝে বিবাহ নষ্ট হতো না। সুতরাং বুঝা গেল, দুধ পান করা দ্বারা বিবাহ বিনষ্ট হওয়া তাৎক্ষণিক ব্যাপার। আর مُسَبِّبَة হওয়ার হয়তো কারণ এই যে, শরয়ীভাবে বিবাহ বিনষ্ট হওয়া মহর অবধারিত হওয়ার সবব নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে মহর রহিত হওয়ার সবব। কেননা, যে জিনিস দ্বারা মুবদাল তথা যৌনাঙ্গের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তার কারণে বদল তথা মহরও ফউত হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আপনি কিভাবে বললেন যে, বিবাহ বিনষ্ট হওয়া শরয়ীভাবে মহর অবধারিত হওয়ার সবব নয়। অথচ স্বামীর উপর ছোট স্ত্রীর জন্য মহর ওয়াজিব হয়? হিদায়া গ্রন্থকার− إِلَّا أَنَّ نِصْفَ الْمَهْرِ الخ দ্বারা জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারাংশ হলো, ছোট স্ত্রীর এ অর্ধ মহর মুত'আ হিসেবে ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে [মহর অধ্যায়ে] কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, মুত'আ হিসেবে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হওয়ার কথা আমরা মানি না। কেননা, মুত'আ সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার সুরতে ওয়াজিব হয়, তবে শর্ত হলো মহর নির্ধারিত না থাকতে হবে। আর এখানে তো মহর নির্ধারিত আছে। এ কারণে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, আর যদি মুত'আ হিসেবে ওয়াজিব হওয়াকে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে প্রশ্নকারী বলতে পারে যে, তিন কাপড় ওয়াজিব হওয়া উচিত− অর্ধ মহর নয়। আমরা এর জবাবে বলব যে, গ্রন্থকারের এ উদ্দেশ নয় যে, এ অর্ধেক মহর হলো মুত'আ। যেমনটি প্রশ্নকারী বুঝেছে; বরং উদ্দেশ্য হলো এই যে, নসের কারণে কিয়াসবিরোধী হওয়ার ক্ষেত্রে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হওয়া মুত'আ ওয়াজিব হওয়ার অনুরূপ হয়ে গেল। মুত'আর ক্ষেত্রে নস হলো− وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ الخ আর অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে নস হলো−

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الخ .

মোটকথা হলো, এ অর্ধেক মহর মুত'আ হিসেবে ওয়াজিব; কিন্তু মুত'আ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো বিবাহ বিনষ্ট হওয়া, যা এখানে বিদ্যমান আছে। এ কারণে বড় স্ত্রীর দুধ পান করাবার কারণে ছোট স্ত্রীর বিবাহও বিনষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য ছোট স্ত্রীর জন্য অর্ধেক মহর ওয়াজিব করা হয়েছে। সারকথা, দলিল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, বড় স্ত্রী দুধ পান করাবার ক্ষেত্রে مُبَاشِرَه . مُسَبِّبَه নয়। আর শায়খাইনের মতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে مُبَاشِر . مُسَبِّب -এর অনুরূপ নয়; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তা এই যে, مُسَبِّب -এর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার জন্য تَعَدِّىْ [সীমালঙ্ঘন] প্রয়োজন। যেমন– কেউ সরকারি রাস্তায় কিংবা অন্যের জমিনে কূপ খনন করল। এক ব্যক্তি তাতে পড়ে মারা গেল, তাহলে এ সুরতে কূপ খননকারীর উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা, কূপ খনন করা হলো তার পড়ে মারা যাওয়ার কারণ এবং খননকারী থেকে সীমাঙ্ঘনও পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, তবে সে ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানাধীন জমিনে কূপ খনন করে এবং এতে কেউ পড়ে মারা যায়, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা, কূপ খননকারীর পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি পাওয়া যায়নি। আর مُبَاشِر -এর উপর [ক্ষতিপূরণ] ওয়াজিব করার জন্য বাড়াবাড়ি শর্ত নয়; বরং বাড়াবাড়ি হোক বা না হোক উভয় সুরতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। মোদ্দাকথা, বড় স্ত্রী হলো مُسَبِّب আর مُسَبِّبَه -এর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার জন্য বাড়াবাড়ি শর্ত। আর বাড়াবাড়ি তখন হবে যখন বড় স্ত্রীর ছোট স্ত্রীর সাথে বিবাহের কথা জানা থাকে এবং এটিও জানা থাকে যে, ছোট স্ত্রীকে দুধ পান করানো বিবাহ বিনষ্টকারী এবং দুধ পান করানো দ্বারা বিবাহ নষ্টের ইচ্ছা থাকে। আর যদি বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীর সাথে বিবাহের কথা জানা না থাকে কিংবা বিবাহের কথা জানা আছে, কিন্তু দুধ পান করানো দ্বারা বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা না করে থাকে; বরং ক্ষুধা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এ বড় স্ত্রীকে দুধপান করানো দ্বারা সীমালঙ্ঘনকারিণী বলা যাবে না। কেননা, ধ্বংসের হাত ও ক্ষুধা দূর করার জন্য দুধপান করানো দ্বারা শরয়ীভাবে ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِشْبَاعُ كَبِدٍ جَائِعٍ 'ক্ষুধার্তকে পেট ভর্তি করে খানা খাওয়ানো উত্তম আমল।' আর যদি বড় স্ত্রীর এ কথাতো জানা থাকে যে, ছোট স্ত্রীও আমার স্বামীর বিবাহিতা; কিন্তু এ মাসআলা জানা নাই যে, আমার এ দুধ পান করার দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে, তাহলে এ সুরতেও বড় স্ত্রী সীমালঙ্ঘনকারিণী হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا مِنَّا إِعْتِبَارُ الْجَهْلِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নের সার-সংক্ষেপ হলো, মুসলমান রাষ্ট্রে শরয়ী বিধান থেকে অজ্ঞ থাকাকে ওজর বলা হবে না। তাহলে বড় স্ত্রীর দুধ পান করার কারণে বিবাহ নষ্ট হওয়ার হুকুম থেকে অজ্ঞ থাকাকে কিভাবে ওজর বলা হবে ? কেননা এখানে তার অজ্ঞতার হিসাব করে তার উপর ক্ষতিপূরণকে ওয়াজিব করা হয়নি।

উত্তর: উত্তরের সারাংশ হলো, শরয়ী হুকুম অর্থাৎ, বড় স্ত্রীর উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হওয়ার যিম্মায় ক্ষতিপূরণ তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের উপর মওকুফ। আর সীমালঙ্ঘন তখন ধর্তব্য হবে যখন বড় স্ত্রী দুধ পান করানোর দ্বারা বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে। আর বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা তখন ধতর্ব্য হবে যখন দুধপান করার দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ইলমও থাকে। সুতরাং যখন বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার ইলম বিলুপ্ত হয়ে গেল তখন বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার উদ্দেশ্যও বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাই অজ্ঞতা ধর্তব্য হবে বিবাহ বিনষ্ট করার ইচ্ছাকে দূর করার জন্য; শরয়ী হুকুমকে দূর করার জন্য নয়।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, বিবাহ বিনষ্টের উদ্দেশ্যকে দূর করার দ্বারা শরয়ী হুকুমকে দূর করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই অজ্ঞতা ধর্তব্য হওয়া দ্বারা শরয়ী বিধানকে দূর করাও ধর্তব্য করা হলো, তাহলে তো প্রশ্ন পূর্বের অবস্থায় রয়ে গেল। উত্তর হলো, এ কথাগুলো প্রসঙ্গত অপরিহার্য হয়ে যায়, তাই তা ধর্তব্য হবে না। –[ইনায়া, ফাতহুল কাদীর]

وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَاِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَاِمْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ اِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ لِاَنَّ الْحُرْمَةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنِ اشْتَرٰى لَحْمًا فَاَخْبَرَهُ وَاحِدٌ اَنَّهُ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوْسِيِّ وَلَنَا اَنَّ ثُبُوْتَ الْحُرْمَةِ لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيْ بَابِ النِّكَاحِ وَاِبْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ اِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ بِخِلَافِ اللَّحْمِ لِاَنَّ حُرْمَةَ التَّنَاوُلِ يَنْفَكُّ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فَاعْتُبِرَ اَمْرًا دِيْنِيًّا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : স্তন্যপানের ক্ষেত্রে নারীদের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়; বরং দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যে তা সাব্যস্ত হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি সে সৎ প্রকৃতির হয় তাহলে সেরূপ এক স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যেও তা সাব্যস্ত হবে। কেননা, এ হুরমত হলো শরিয়তের হক। সুতরাং এক ব্যক্তির খবরে তা সাব্যস্ত হবে। যেমন– কেউ গোশ্‌ত খরিদ করল আর এক ব্যক্তি তাকে খবর দিল যে, এটা অগ্নিপূজকের জবাইকৃত। আমাদের দলিল হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া মালিকানা রহিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আর মালিকানা বাতিল করা দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হতে পারে না। গোশতের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, খাবারের হুরমত মালিকানা রহিত হওয়া থেকে পৃথক হতে পারে। সুতরাং এটি একটি দীনি বিষয়রূপে গণ্য হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, রাদা'আত সাবেত করার জন্য কাদের সাক্ষ্য জরুরি. এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মাযহাব হলো, দু পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা রাদা'আত সাবেত হয়ে যাবে। নিছক নারীদের একক সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চারজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা রাজ'আত সাবিত হয়ে যায়। ইমাম মালেক (র.) বলেন, একজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা রাদা'আত সাব্যস্ত হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, ঐ নারী ন্যায়পরায়ণশীলা হতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, স্তন্যপানের সম্পর্ক হলো নারীর স্তনের সাথে। আর যেহেতু নারীর স্তনের দিকে তাকানো হারাম, তাই স্তন্যপানের ব্যাপারে কোনো পুরুষ পূর্ণ অবগতি লাভ করতে পারবে না। আর যে সকল বস্তুর ব্যাপারে পুরুষ অবগতি লাভ করতে পারে না, সে সকল বস্তুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে চার নারীর সাক্ষ্য শর্ত, যাতে দুই নারী এক পুরুষের স্থলবর্তী হয়ে যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, স্তন্যপান এমন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলোর ব্যাপারে পুরুষ অবগতি লাভ করতে অক্ষম; বরং প্রকৃত সত্য এই যে, পুরুষ স্তন্যপানের উপর অবগতি লাভ করতে পারে। যেমন– ذَوِي الْاَرْحَام -এর তাদের নারীদের স্তনের দিকে তাকানো জায়েজ। তাই উপরিউক্ত দলিল অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল হলো, হুরমত, শরিয়তের হুকুমসমূহের একটি হুকুম। আর শরিয়তের হকগুলো হলো দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই হুরমতও দীনি বিষয় হবে। আর দীনি বিষয় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায় [সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক, তবে শর্ত হলো তারা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে]। যেমন– এক ব্যক্তি গোশত খরিদ করল, অতঃপর কোনো এক ব্যক্তি ক্রেতাকে বলল, এটা অগ্নিপূজকের জবাইকৃত। এখন ক্রেতার উপর এ গোশ্ত হারাম হয়ে গেল। সে নিজেও খেতে পারবে না এবং অন্যকেও খাওয়াতে পারবে না। সুতরাং বুঝা গেল, দীনি বিষয়াদি সাব্যস্ত করার জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট।

আমাদের দলিল হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া মালিকানা রহিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ, এটা হতে পারে না যে, স্তন্যপানের দ্বারা বিবাহ হারাম হয়ে যাবে, আর বিবাহের মালিকানা বাকি থাকবে। কেননা, হারামের স্থায়িত্বের সাথে বিবাহ অবশিষ্ট থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং যখন স্তন্যপানের কারণে হুরমত সাব্যস্ত হবে, তখন বিবাহও বাতিল হয়ে যাবে। আর বাতিল হওয়া বিবাহকে সাব্যস্ত করার জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য তথা দুজনের সাক্ষ্য জরুরি। এজন্য আমরা বলেছি, দুজন পুরুষ সাক্ষ্য দেবে কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষ্য দেবে। গোশ্তের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, খাবারের কোনো জিনিসের হুরমত মালিকানা রহিত হওয়া থেকে পৃথক হতে পারে। অর্থাৎ, এটা হতে পারে যে, একটি জিনিস খাওয়া হারাম, কিন্তু তার মালিকানা পৃথক হয়নি; বরং অবশিষ্ট থাকবে। মোদ্দাকথা, খানার হুরমত আর মালিকানা উভয়ে একত্রিত হতে পারে। যেমন- এক কাফের মদের মালিক, তারপর এ কাফের মুসলমান হয়ে গেল। এখন ঐ মুসলমানের জন্য ঐ মদ পান করা হারাম হবে, অথচ তার মালিকানা বহাল আছে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি মাটির মালিক। এখন এ ব্যক্তির জন্য মাটি খাওয়া হারাম। অথচ তার মালিকানা বহাল আছে। সুতরাং এমনিভাবে এ গোশত ক্রেতার জন্য হারাম, কিন্তু তার মালিকানা পৃথক হয়নি। এ সূরতে সাক্ষ্য শুধু গোশ্ত হারাম হওয়ার উপর হয়েছে; মালিকানা দূর করার উপর হয়নি। হুরমত হলো দীনি বিষয়। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দীনি বিষয়ের জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট। এজন্য এক ব্যক্তির খবর দ্বারা ঐ গোশ্ত হারাম হয়ে গেছে। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় : তালাক

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বিবাহ-সংক্রান্ত বিধানাবলি বর্ণনা সমাপনান্তে তালাক -এর প্রকারভেদ ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়– বাস্তব ক্ষেত্রে বিবাহ আগে হয়ে থাকে, আর তালাক তৎ-সংশ্লিষ্ট। তাই শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রথমত বিবাহ সম্পর্কিত বিধানাবলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন, অতঃপর তালাকের বিষয়টি এনেছেন। আর স্তন্যপান অধ্যায়ের পর তালাক অধ্যায়টির আলোচনার কারণ হিসেবে বলা হয়– স্তন্যপান ও তালাক উভয়ের কারণে ব্যক্তির জন্য কোনো মহিলা হারাম হয়ে যায়। তবে স্তন্যপানের কারণে সর্বদার জন্য সে মহিলা হারাম হয়ে যায়, কিন্তু তালাকের কারণে সর্বদার জন্য হারাম হয় না, পরবর্তীতে আবার তার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অবকাশ থাকে। আর তাই গ্রন্থকার বিধানের ক্ষেত্রে কঠিন বিষয়টির অবতারণা আগে করেছেন, এরপর অপেক্ষাকৃত সহজ ও হালকা বিধানটি বর্ণনা করেছেন।

طَلَاقٌ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : اَلْمَغْرِبُ গ্রন্থে طَلَاقٌ শব্দটিকে ক্রিয়ামূল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ– اَلتَّطْلِيْقُ [মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া], যেমন– اَلسَّلَامُ অর্থ اَلتَّسْلِيْمُ ও اَلْكَلَامُ অর্থ اَلتَّكْلِيْمُ আভিধানিক অর্থে তালাক হলো বন্ধন মুক্ত করা। আর পরিভাষায়– رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ حَالًا اَوْ مَآلًا অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট শব্দাবলি দ্বারা বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করা চাই তা তৎক্ষণাৎ হোক বা পরিণামে।

طَلَاقٌ -এর প্রকারভেদ : তালাক প্রধানত দু-প্রকার– সুন্নত তালাক ও বিদ'আত তালাক। সুন্নত তালাক দু-ধরনের– সংখ্যাগত দিক থেকে সুন্নত তালাক ও সময়গত দিক থেকে সুন্নত তালাক। সংখ্যাগত দিক থেকে সুন্নত তালাক আবার দু-প্রকার– حَسَنٌ [উত্তম] ও اَحْسَنُ [অতি উত্তম]। বিদ'আত তালাকও দু-প্রকার– সংখ্যাগত দিক থেকে বিদ'আত তালাক ও সময়গত দিক থেকে বিদ'আত তালাক। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এসব প্রকারভেদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামি শরিয়তে তালাক বৈধ বলে বিবেচিত হলেও, তা নিকৃষ্টতম একটি কর্ম হিসেবে বিবেচ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'তালাক প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত।' অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে স্ত্রীলোক যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে, তার উপর সমস্ত ফেরেশতা ও মানুষের অভিসম্পাত।

–[বিনায়া : খণ্ড; ৫, পৃ. ৩]

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

قَالَ اَلطَّلَاقُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ حَسَنٌ وَاَحْسَنُ وَبِدْعِيٌّ فَالْاَحْسَنُ اَنْ يُّطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَه تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ وَيَتْرُكُهَا حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لِاَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ لَّا يَزِيْدُوْا فِي الطَّلَاقِ عَلٰى وَاحِدَةٍ حَتّٰى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَاَنَّ هٰذَا اَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ اَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ثَلٰثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً وَلِاَنَّهٗ اَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ وَاَقَلُّ ضَرَرٍ بِالْمَرْأَةِ وَلَا خِلَافَ لِاَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ ـ

পরিচ্ছেদ : সুন্নত পদ্ধতির তালাক

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তালাক তিন প্রকার : حَسَنٌ [উত্তম] اَحْسَنُ [অতি উত্তম] এবং بِدْعَةٌ [বিদআত]। সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো– স্বামী স্ত্রীকে সহবাসবিহীন একটি তুহর -এ একটি তালাক প্রদান করা। আর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা। কেননা সাহাবায়ে কেরাম পছন্দ করতেন যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন এক তালাকের অধিক না দেওয়া হয়। তাঁদের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির প্রত্যেক তুহরে এক তালাক করে তিন তালাক প্রদানের চেয়ে এটা উত্তম। অধিকন্তু এটা অনুশোচনার চেয়ে অধিকতর নিরাপদ এবং স্ত্রীর জন্যও কম ক্ষতিকর। আর এটা মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ اَلطَّلَاقُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ الخ : কুদূরী গ্রন্থকার (র.) তালাকের তিনটি প্রকার বর্ণনা করেছেন। اَحْسَنُ [অতি উত্তম] তালাকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন, স্বামী স্ত্রীকে সহবাসবিহীন তুহর -এ একটি তালাক প্রদান করবে এবং ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। এর দলিল হলো সাহাবায়ে কেরাম ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত একের অধিক তালাক দেওয়া পছন্দ করতেন না। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে উত্তম পন্থা ছিল, তিন তুহর-এ তিন তালাক প্রদান করা। আর যুক্তির কথাও হলো– এক তালাক দেওয়ার অনুতপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কেননা ইদ্দতের ভিতর রুজু করার অবকাশ থাকে। যে কাজের মাঝে সংশোধনের অবকাশ থাকে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا। আর স্ত্রীর জন্যও তা কম ক্ষতিকর। কেননা এক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয় না, কিন্তু একাধিক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়।

قَوْلُهٗ وَلَا خِلَافَ لِاَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ : এ ধরনের তালাক (اَحْسَنُ) মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে حَسَنٌ তালাকের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

وَالْحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَهُوَ اَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُوْلَ بِهَا ثَلْثًا فِىْ ثَلْثَةِ اَطْهَارٍ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) اِنَّهُ بِدْعَةٌ وَلَا يُبَاحُ اِلَّا وَاحِدَةً لِاَنَّ الْاَصْلَ فِى الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ وَالْاِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْخَلَاصِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ حَدِيْثِ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ السُّنَّةَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اِسْتِقْبَالًا فَيُطَلِّقُهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيْقَةً وَلِاَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلٰى دَلِيْلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْاِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِىْ زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَ الطُّهْرُ فَالْحَاجَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ نَظَرًا اِلٰى دَلِيْلِهَا ثُمَّ قِيْلَ الْاَوْلٰى اَنْ يُؤَخِّرَ الْاِيْقَاعَ اِلٰى اٰخِرِ الطُّهْرِ اِحْتِرَازًا عَنْ تَطْوِيْلِ الْعِدَّةِ وَالْاَظْهَرُ اَنْ يُطَلِّقَهَا كَمَا طَهُرَتْ لِاَنَّهُ لَوْ اَخَّرَ رُبَمَا يُجَامِعُهَا وَمِنْ قَصْدِهِ التَّطْلِيْقُ فَيُبْتَلٰى بِالْاِيْقَاعِ عُقَيْبَ الْوِقَاعِ ـ

অনুবাদ : আর উত্তম তালাক হলো সুন্নতসম্মত তালাক। তাহলো সহবাসকৃত স্ত্রীকে তিন তুহর -এ তিন তালাক দেওয়া। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটি বিদআত। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো নিষিদ্ধতা। আর বন্ধন মুক্তির প্রয়োজনে এসেছে বৈধতা। আর তা এক তালাকের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের দলিল হলো– হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "সুন্নত এই যে 'তুহর' -এর অপেক্ষা করবে। অতঃপর প্রত্যেক 'তুহর' -এ একটি তালাক দেবে।" অধিকন্তু তালাক বৈধ হওয়ার বিষয়টি/বিধানটি প্রয়োজনের প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। সেটা হচ্ছে নতুন আগ্রহ হওয়ার সময় অর্থাৎ 'তুহর' -এর সময় তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া। সুতরাং প্রয়োজনের প্রমাণের প্রেক্ষিতে ধরা হবে– যেন প্রয়োজনটি বারংবার হয়েছে। ভিন্নমতে উত্তম হলো– দীর্ঘায়িত ইদ্দত পরিহার করার জন্য 'তুহর' -এর শেষ পর্যন্ত তালাক প্রদান বিলম্বিত করা। তবে জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে পবিত্র হওয়া মাত্র তালাক দেবে। কেননা বিলম্বিত হলে স্ত্রীসহবাসের সম্ভাবনা থাকে, অথচ তার ইচ্ছা হলো তালাক দেওয়া। ফলে সে সহবাসের পর তালাক প্রদানে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমতকে নাকচ করার লক্ষ্যে হাসান-তালাককে সুন্নত-তালাক হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানে সুন্নত বলতে বৈধ উদ্দেশ্য। কেননা তালাক প্রদান এমন কোনো ইবাদত নয়, যা দ্বারা ছওয়াব হয়। সুতরাং সুন্নত তালাক অর্থ হলো এমন তালাক যা সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত। এ পদ্ধতিতে তালাক প্রদানকারী শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

হাসান তালাক হলো– স্বামী তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে তিন 'তুহর' -এ তিন তালাক দেওয়া। ইমাম মালেক (র.) এ ধরনের তালাককে বিদআত বলেছেন। তাঁর মতে শুধু এক তালাক প্রদান করা বৈধ। তাঁর দলিল হলো– তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই হলো মূল বিধান। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا 'তোমরা বিবাহ কর, তালাক দিও না' –[আবূ দাউদ]। তবে তালাকের বৈধতা এসেছে প্রয়োজনের খাতিরে। আর সে প্রয়োজন এক তালাকের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় তালাক দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

আমাদের দলিল হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস। হাদীসের মূলকথা হলো− হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর স্ত্রীকে হায়েজের সময়ে তালাক দিলেন। এরপর তিনি অপর দুটি তালাক দুই 'তুহর' -এ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর জানতে পেরে বললেন, 'হে ইবনে ওমর ! আল্লাহ তোমাকে এমন করতে নির্দেশ দেননি। তুমি তো সুন্নত পরিহার করেছ। সুন্নত হলো 'তুহর' -এর অপেক্ষা করবে। অতঃপর প্রত্যেক 'তুহর' -এ একটি তালাক দেবে।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আমার স্ত্রীকে রাজ'আত করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যখন সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাকে তালাক দেবে কিংবা বিরত থাকবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমি যদি তাকে তিন তালাক দিই, তাহলে তাকে রুজু করা কি আমার জন্য বৈধ হবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না। সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; তোমার জন্য তা গুনাহ হবে। -[দারাকুতনী খণ্ড. ৪. পৃষ্ঠা ৩১]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিচ্ছিন্নভাবে তিন 'তুহর' -এ তিন তালাক দেওয়া সুন্নত।

আমাদের যৌক্তিক দলিল হলো− তালাক প্রদানের প্রয়োজন একটি অপ্রকাশিত বিষয়। সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণকেই প্রয়োজনের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। আর এখানে প্রয়োজনের প্রমাণ হলো− স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার কারণে সহবাসের প্রতি আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া প্রমাণ করে যে, অনিবার্য কোনো কারণ দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে হায়েজের সময় তালাক দিলে বলা যেতে পারে, অনাগ্রহের কারণে তালাক দিয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের প্রমাণের প্রেক্ষিতে ধরা হবে যেন প্রয়োজনটি বারংবার হয়েছে। আর যখন প্রয়োজন বারংবার হয় তখন একাধিকবার তালাক প্রদানও বৈধ হবে। এ কারণেই আমরা বলি, ভিন্ন ভিন্নভাবে তিন 'তুহর' −এ তিন তালাক দেওয়া বৈধ; এটি বিদ'আত নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ إِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ الخ : সুন্নত তালাকের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য আছে। 'তুহর' -এর শেষ সময়ে তালাক দেওয়া উত্তম, নাকি 'তুহর' -এর প্রথম দিকে তালাক দেওয়া উত্তম ? কারো কারো অভিমত হলো− 'তুহর' -এর শেষ সময় পর্যন্ত তালাক প্রদান বিলম্বিত করা উত্তম। কেননা, এ ক্ষেত্রে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয় না। 'তুহর' -এর শুরুতে তালাক দিলে ইদ্দতের সময়সীমা দাঁড়ায়− তিন 'তুহর' ও তিন 'হায়েজ'। পক্ষান্তরে 'তুহর' -এর শেষ দিকে তালাক প্রদান করলে ইদ্দতের সময়সীমা হয় দুই 'তুহর' ও তিন 'হায়েজ'। সুতরাং 'তুহর' -এর শুরুতে তালাক দিলে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয় বলে 'তুহর' -এর শেষ সময় পর্যন্ত তালাক প্রদান বিলম্বিত করা উত্তম।

আর জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে যখনই স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হবে, তখনই তালাক দেওয়া উত্তম। কেননা বিলম্বিত করলে স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অথচ স্বামীর ইচ্ছা হলো তাকে তালাক দেওয়া। এমতাবস্থায় সে সহবাসের পর তালাক প্রদানে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর সহবাসকৃত তুহর -এর মধ্যে তালাক দেওয়া সুন্নত পরিপন্থি কাজ। তাই উত্তম পন্থা হলো, পবিত্র হওয়া মাত্র তালাক দেওয়া।

وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلٰثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ ثَلٰثًا فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) كُلُّ طَلَاقٍ مُبَاحٌ لِاَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوْعٌ حَتّٰى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكْمُ وَالْمَشْرُوْعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ لِاَنَّهُ الْمُحَرَّمُ تَطْوِيْلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقُ وَلَنَا اَنَّ الْاَصْلَ فِى الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِىْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمَصَالِحُ الدِّيْنِيَّةُ وَالدُّنْيَاوِيَّةُ وَالْاِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْخَلَاصِ وَلَا حَاجَةَ اِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلٰثِ وَهِىَ فِى الْمُفَرَّقِ عَلَى الْاَطْهَارِ ثَابِتَةٌ نَظْرًا اِلٰى دَلِيْلِهَا وَالْحَاجَةُ فِىْ نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ فَاَمْكَنَ تَصْوِيْرُ الدَّلِيْلِ عَلَيْهَا وَالْمَشْرُوْعِيَّةُ فِىْ ذَاتِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ اِزَالَةُ الرِّقِّ لَا تُنَافِى الْحَظْرَ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَكَذَا اِيْقَاعُ الثِّنْتَيْنِ فِى الطُّهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ لِمَا قُلْنَا وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِى الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ قَالَ فِى الْاَصْلِ اَنَّهُ اَخْطَأَ السُّنَّةَ لِاَنَّهُ لَا حَاجَةَ اِلٰى اِثْبَاتِ صِفَةٍ زَائِدَةٍ فِى الْخَلَاصِ وَهِىَ الْبَيْنُوْنَةُ وَفِىْ رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ اَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْخَلَاصِ نَاجِزًا ـ

অনুবাদ : বিদ'আত তালাক হলো স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া কিংবা একই তুহরে তিন তালাক দেওয়া। এরূপ করলে তালাক পতিত হবে এবং সে গুনাহগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রত্যেক প্রকার তালাকই বৈধ। কেননা এটা শরিয়ত প্রবর্তিত এবং তা থেকে বিধানও প্রবর্তিত হয়। আর শরিয়ত স্বীকৃত হওয়া ও নিষিদ্ধতা একসাথে একত্র হতে পারে না। পক্ষান্তরে হায়েজের অবস্থায় তালাক দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এ ক্ষেত্রে হারামের কারণ তালাক দেওয়া নয়। হারামের কারণ হলো স্ত্রীর ইদ্দতকে দীর্ঘায়িত করা। আমাদের দলিল হলো– তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই হলো মূল বিধান। কেননা এতে বিবাহকে বিচ্ছিন্ন করা হয় যার সাথে বিভিন্ন দীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ সম্পৃক্ত। আর শুধু সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনে তালাকের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। আর তিন তালাককে একত্র করার কোনো প্রয়োজন নেই। অপর পক্ষে তিন 'তুহরে' পৃথক পৃথক তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রকৃতার্থে প্রয়োজনের বিদ্যমানতা সম্ভব। সুতরাং এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার দলিলকে কল্পনা করা যেতে পারে। আর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিজস্ব সত্তাগতভাবে তালাকের শরয়ী কার্যকারিতা ভিন্ন কারণে নিষিদ্ধতার বিপরীত নয়। আর এ ভিন্ন কারণ তা-ই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে এক 'তুহর'-এ দুই তালাক দেওয়া বিদআত। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। আর এক তালাক বায়েন দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের বর্ণনায় ভিন্নতা রয়েছে। মাবসূত -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সে সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কেননা বন্ধন মুক্তির জন্য অতিরিক্ত বিশেষণ তথা তাৎক্ষণিক বায়ন যোগ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে 'যিয়াদাত' -এর বর্ণনানুসারে মাকরূহ নয়। কেননা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধন মুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا الخ : বিদ'আত তালাক হলো স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া কিংবা এক তুহরে তিন তালাক দেওয়া। আমাদের মাযহাব অনুসারে এ ধরনের তালাক প্রদান হারাম। তবে কেউ প্রয়োগ করলে তা পতিত হবে। তার স্ত্রী একেবারে হারাম হয়ে যাবে এবং সে গুনাহগার হবে। জাহিরিয়্যা ও শিয়াদের মতে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কিংবা হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালে এক তালাকের প্রচলন ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সময়কালেও এমনই ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) -এর সময়কাল থেকে তিন তালাকের প্রচলন শুরু হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম শরীফ; ইনায়া: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-৭]

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব হলো– সকল প্রকার তালাকই বৈধ। তাঁর দলিল এই যে, তালাক শরিয়তসম্মত একটি বিধান, যার কারণে তা থেকে হুকুম প্রবর্তিত হয়। আর যে বিধান শরিয়ত স্বীকৃত তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা শরিয়ত স্বীকৃত হওয়া নিষিদ্ধতার সাথে একত্র হতে পারে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ الخ : এ বাক্য দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য –"শরিয়ত স্বীকৃত হওয়া নিষিদ্ধতার সাথে একত্র হতে পারে না" – যথার্থ নয়। কেননা হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তালাক দেয়, তাহলে তালাক প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে শরিয়ত স্বীকৃত বিধান ও নিষিদ্ধতা একত্রিত হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো– হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম নয়; বরং হারাম হলো স্ত্রীর ইদ্দতকে দীর্ঘায়িত করা। কেননা হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে, সর্বসম্মতিক্রমে ঐ হায়েজ ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যে তুহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে সে তুহরে তালাক দেওয়া হারাম নয়; বরং হারাম হলো ইদ্দতকে সন্দেহপূর্ণ করা। কেননা এ ক্ষেত্রে স্ত্রী গর্ভবতী কিনা তা জানা যায় না। যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত পালিত হবে– সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যদি গর্ভবতী না হয়, তাহলে আমাদের মতে তার ইদ্দত পালিত হবে হায়েজ অনুসারে, আর শাফেয়ীদের মতে তুহর অনুসারে।

আমাদের দলিল হলো, তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই মূল বিধান। কেননা তালাকের কারণে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথচ এ বিবাহের সাথে বিভিন্ন দীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে। যেমন– বিবাহের ফলে ব্যক্তি জেনা-ব্যভিচারের মতো খারাপ কাজ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারে, যা প্রতিটি ধর্মেই নিষিদ্ধ। অপরদিকে বিবাহের ফলে মহিলা যেমন ভরণ–পোষণ পায়, তেমনি পুরুষ সন্তানের বাবা হতে পারে। এসব দীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ যে তালাকের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায় তা শরিয়তে জায়েজ না হওয়ারই কথা। যুক্তি তা-ই বলে। কিন্তু তালাকের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণে। আর তা করতে তিন তালাককে একত্র করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তিনের কমেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। তাই আমাদের মতে তিন তালাক একত্রে প্রদান করা হারাম।

قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ عَلَى الْأَطْهَارِ الخ : এ বাক্যের দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, প্রয়োজন পূরণার্থে যেরূপ তিন তালাককে একত্র করার দরকার হয় না, তদ্রূপ তিন তুহরে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং আহনাফের মতে তিন তালাক একত্রে প্রদান করা যেমন হারাম, তদ্রূপ তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়াও হারাম হওয়ার কথা। অথচ তারা তিন তুহরে তিন আলাক প্রদানকে সুন্নত তালাক বলে থাকেন।

উত্তর: এর উত্তর হলো, তিন তুহরে পৃথক পৃথক তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের বিদ্যমানতা সম্ভব। আর এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রমাণকেই প্রয়োজনের স্থলবর্তী গণ্য করা হয়। এখানে প্রয়োজনের প্রমাণ হলো স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার কারণে সহবাসের প্রতি আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বে

তালাক প্রদানের উদ্যোগী হওয়া প্রমাণ করে যে, অনিবার্য কোনো কারণ দেখা দিয়েছে। সুতরাং এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রমাণকে প্রয়োজনের স্থলবর্তী বিবেচনা করা হয়। কেননা, নিছক প্রমাণ প্রমাণিত বিষয়ের বিদ্যমানতাকে অনিবার্য করে না, যতক্ষণ না প্রমাণিত বিষয়ের বিদ্যমানতা সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ فِىْ نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ الخ : এ বাক্যের দ্বারা আরেকটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্ন হলো প্রয়োজনের প্রমাণকে প্রয়োজনের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে তখনই, যখন প্রয়োজনের বিদ্যমানতা পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নেই। কেননা যখন প্রথম তুহরে এক তালাক পতিত হয়ে যায়, তখন বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তালাকের আর প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং প্রয়োজনের প্রমাণও প্রয়োজনের স্থলবর্তী হবে না।

উত্তর: এর উত্তরে বলা হয়, প্রথম তুহরে তালাক দেওয়ার পর সত্তাগতভাবে তালাকের শরয়ী কার্যকারিতা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। কেননা অনেক সময় স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে রুজূ' তথা পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় না। আর এ কারণেই শরিয়ত ঐ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুহরে ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে, যাতে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্ণিত আলোচনাসাপেক্ষে তো একই সঙ্গে তিন তালাক প্রদান জায়েজ হওয়ার কথা অথচ আপনারা হারাম বলেন। এর উত্তর হলো– এ যৌক্তিক প্রমাণ নসের বিপরীত হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য ও নসকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস এবং আয়াত– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাক প্রদানের প্রমাণ বহন করে।

قَوْلُهُ وَالْمَشْرُوْعِيَّةُ فِىْ ذَاتِهِ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পেশকৃত দলিলের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের মোদ্দাকথা হলো– যা সত্তাগতভাবে শরিয়ত প্রবর্তিত, তা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ কিছুর সাথে কখনোই মিলিত হয় না। তবে তা অন্যকোনো কারণে নিষিদ্ধ কিছুর সাথে একত্র হতে পারে। যেমন– আত্মসাৎকৃত জমিতে নামাজ আদায় ও জুমার আজানের সময় বেচাকেনার ক্ষেত্রে সত্তাগতভাবে নামাজ ও বেচাকেনা শরিয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত, তবে আত্মসাৎকৃত জমি হওয়া ও জুমার নামাজে সা'ঈ পরিত্যাগ করার কারণে তা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় সত্তাগতভাবে তালাকের কার্যকারিতা সত্ত্বেও বৈবাহিক কল্যাণ বিনষ্ট হওয়ার কারণে তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِيْقَاعُ الثِّنْتَيْنِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এক তুহরে দুই তালাক দেওয়াও বিদআত। কেননা একাধিক তালাক একত্র করার প্রয়োজন নেই।

সহবাসবিহীন কোনো তুহরে এক তালাকে বায়েন দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মাযহাবে মতপার্থক্য আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর মাবসূত কিতাবে বর্ণনা করেন– এ ধরনের তালাক প্রদান সুন্নত পরিপন্থি। কেননা, স্ত্রীর সাথে বন্ধন মুক্তির জন্য অতিরিক্ত বিশেষণ – "তাৎক্ষণিক বায়েন" যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে 'যিয়াদাত' -এর বর্ণনানুসারে, এ ধরনের তালাক প্রদান মাকরূহ নয়। কেননা কখনো কখনো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধন মুক্তির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশেষণ প্রয়োজন। তাই এক তালাক বায়েন মাকরূহ নয়।

বর্ণিত মতপার্থক্যটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– اَلزِّيَادَاتُ গ্রন্থে নয়। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার (র.) اَلزِّيَادَاتُ -এর কথা উল্লেখ করেছেন। হতে পারে কাতিব/ পাণ্ডুলিপি লেখকের ভুল হয়েছে। কিংবা হতে পারে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) اَلزِّيَادَاتُ – ই উল্লেখ করেছেন। কেননা زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি اَلزِّيَادَاتُ -এর পরিশিষ্ট। তাই বর্ণিত মাসআলাটিকে زِيَادَاتُ – এ গণ্য করেছেন। –[আল-বিনায়া খণ্ড ৫, পৃ. ১০]

وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَسُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ فَالسُّنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَالسُّنَّةُ فِي الْوَقْتِ يَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ لِأَنَّ الْمُرَاعٰى دَلِيلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَ الطُّهْرُ الْخَالِيْ عَنِ الْجِمَاعِ أَمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفْرَةِ وَبِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهْرِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) وَهُوَ يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَنَا أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ لَا تَقِلُّ بِالْحَيْضِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهُ مِنْهَا وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَتَجَدَّدُ بِالطُّهْرِ ـ

অনুবাদ : তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নত-দুই দিক থেকে। সময়ের দিক থেকে সুন্নত, সংখ্যার দিক থেকে সুন্নত। সংখ্যাগত দিক থেকে সুন্নতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া কিংবা সহবাস না হওয়া উভয় সমান। আর আমরা তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে সময়ের দিক থেকে সুন্নত সহবাসকৃত স্ত্রীর সাথে বিশিষ্ট। অর্থাৎ সহবাসবিহীন তুহরে তালাক দেওয়া। কেননা প্রয়োজনের দলিল বিদ্যমান থাকার বিষয়টি লক্ষণীয়। আর তা হলো সহবাসের প্রতি নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সময় তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া। আর সে সময়টা হচ্ছে সহবাসমুক্ত তুহর। কেননা হায়েজের সময়টুকু রুচিগতভাবে অনাগ্রহের সময়। অনুরূপভাবে তুহর -এর সময়ে একবার সহবাস করার দ্বারা আগ্রহ শিথিল হয়ে যায়। আর যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি, তাকে তুহর ও হায়েজ – উভয় অবস্থায় তালাক দেওয়া যায়। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি তাকে সহবাসকৃতা স্ত্রীর উপর কিয়াস করেছেন। আমাদের দলিল হলো– যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি, তার ক্ষেত্রে আগ্রহ বহাল থাকে। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হায়েজের কারণেও আগ্রহ কমে না। অপরপক্ষে সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তুহর -এর দ্বারা আগ্রহ নবায়িত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) সুন্নত তালাকের প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, সুন্নত তালাক দুই প্রকার। প্রথমত সময়ের দিক থেকে সুন্নত। দ্বিতীয়ত সংখ্যার দিক থেকে সুন্নত। সংখ্যার দিক থেকে সুন্নত তালাক হলো, স্ত্রীকে এক তুহরে এক তালাক দেওয়া। এক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া বা না হওয়া উভয় সমান। পক্ষান্তরে সময়ের দিক থেকে সুন্নত তালাক সহবাসকৃতা স্ত্রীর সাথে নির্দিষ্ট। স্ত্রীকে এমন তুহরে তালাক দেওয়া, যে তুহরে সহবাস

হয়নি। এর দলিল হলো– প্রয়োজনের কারণে তালাকের প্রবর্তন হয়েছে। তাই প্রয়োজন প্রমাণ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর প্রয়োজনের প্রমাণ হলো সহবাসের প্রতি নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সময় তালাক প্রদানে উদ্যোগী হওয়া। আর সে সময়টা হলো সহবাসমুক্ত তুহর। কেননা হায়েজের সময়টুকু রুচিগতভাবে অনাগ্রহের সময়। আবার তুহরের সময় একবার সহবাস করলে আগ্রহ কমে যায়। সুতরাং হায়েজ অবস্থায় এবং সহবাসকৃত তুহরে প্রয়োজনের প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় প্রয়োজনের স্থলবর্তী করে তালাককে কার্যকর করা হয়নি। এ কারণেই আমরা বলে থাকি যে, সময়গত দিক থেকে সুন্নত তালাক হলো, শুধুমাত্র যে তুহরে সহবাস হয়নি, সে তুহরে তালাক দেওয়া; হায়েজ অবস্থায় নয়।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি, তাকে তুহর ও হায়েজ উভয় অবস্থায় তালাক দেওয়া যেতে পারে। তবে ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, এমন স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া মাকরূহ তাহরীমী। তিনি তাকে সহবাসকৃতা স্ত্রীর উপর কিয়াস করেছেন। সহবাসকৃতা স্ত্রীকে যেরূপ হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া মাকরূহ, তেমনি এ ক্ষেত্রেও মাকরূহ হবে।

আমাদের দলিল হলো, যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয়নি, তার ক্ষেত্রে আগ্রহ বহাল থাকে। যতক্ষণ তার থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হয়, ততক্ষণ হায়েজের কারণেও আগ্রহ কমে না। পক্ষান্তরে সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তুহরের কারণে আগ্রহ নবায়িত হয়। এজন্যই যে তুহরে সহবাস হয়নি, এমন তুহরে সহবাসকৃতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ বলে পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন: কিন্তু প্রশ্ন হলো, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) অসহবাসকৃতা স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়াকে বৈধ বলেছেন। অথচ হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসে তুহর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসটি সহবাসকৃতা ও অসহবাসকৃতা উভয় ধরনের স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উত্তর: এর উত্তরে ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসে এসেছে– فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ অর্থাৎ, এটা হলো সেই ইদ্দত যাতে মহিলাদের তালাক দিতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইদ্দতের বিষয়টি শুধুমাত্র সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অসহবাসকৃতা স্ত্রীর কোনো ইদ্দত নেই। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসটি সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

–[ফতহুল কাদীর, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৫৭]

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلٰثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِذَا مَضٰى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرٰى لِأَنَّ الشَّهْرَ فِيْ حَقِّهِمَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ إِلٰى أَنْ قَالَ وَاللَّائِيْ لَمْ يَحِضْنَ وَالْإِقَامَةُ فِي الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتّٰى يُقَدَّرَ الْاِسْتِبْرَاءُ فِيْ حَقِّهِمَا بِالشَّهْرِ وَهُوَ بِالْحَيْضِ لَا بِالطُّهْرِ ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِيْ أَوَّلِ الشَّهْرِ يُعْتَبَرُ الشُّهُوْرُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِهٖ فَبِالْأَيَّامِ فِيْ حَقِّ التَّفْرِيْقِ وَفِيْ حَقِّ الْعِدَّةِ كَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا يُكْمَلُ الْأَوَّلُ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْأَهِلَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِجَارَاتِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বল্প বয়সের কারণে কিংবা বার্ধক্যের কারণে যদি স্ত্রীর হায়েজ না আসে আর স্বামী তাকে সুন্নত তালাক দিতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে এক তালাক দেবে এবং এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরেক তালাক দেবে। কেননা তাদের ক্ষেত্রে মাস হায়েজের স্থলবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ وَّاللَّائِيْ لَمْ يَحِضْنَ অর্থাৎ "তোমাদের যে সকল স্ত্রীর হায়েজ রহিত হয়ে গেছে আর যাদের হায়েজ শুরু হয়নি, যদি তোমরা তাদের ইদ্দতের বিষয়ে সন্দিহান হও, তাহলে [জেনে রেখো] তাদের ইদ্দত তিন মাস"। আর মাসকে হায়েজ -এর স্থলবর্তী করাটা প্রমাণিত। এ কারণেই তাদের ক্ষেত্রে গর্ভমুক্তির বিষয়টি মাস দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। আর গর্ভমুক্তির বিষয়টি হায়েজ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়, তুহর দ্বারা নয়। সুতরাং মাসের শুরুতে তালাক দিলে তিন মাস চাঁদের হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আর মাসের মাঝে হলে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে দিনের দ্বারা মাস হিসাব করা হবে। আর ইদ্দতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত সেটাই। অপর পক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, প্রথম মাসের ভগ্নাংশকে শেষ মাসের ভগ্নাংশ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। আর মধ্যবর্তী দুই মাস চাঁদের হিসেবে গণ্য করা হবে। এটা ইজারা সংক্রান্ত মাসআলার অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ الخ : স্ত্রীর বয়সের স্বল্পতার কারণে কিংবা বার্ধক্যের কারণে যদি হায়েজ না আসে, আর স্বামী তাকে সুন্নত পদ্ধতিতে তালাক দিতে চায় তাহলে আলাদা আলাদাভাবে তিন মাসে তিন তালাক দেবে।

দলিল হলো– স্বল্প বয়স্কা ও বৃদ্ধার ক্ষেত্রে মাস হায়েজের স্থলবর্তী। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে–

وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ وَّاللَّائِيْ لَمْ يَحِضْنَ .

আয়াতের মর্মার্থ হলো– তোমরা এ দু'ধরনের স্ত্রীলোকের [স্বল্প বয়স্কা ও বৃদ্ধা] ইদ্দতের ব্যাপারে সন্দিহান হলে, জেনে রেখো বিধান হলো তাদের ইদ্দত তিন মাস। – এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যদি তাদের হায়েজ আসত, তাহলে তাদের ইদ্দত হতো তিন হায়েজ। কিন্তু তাদের হায়েজ না আসার কারণে তাদের ইদ্দত হয়েছে তিন মাস। সুতরাং মাস যে হায়েজের স্থলবর্তী এ কথা সাব্যস্ত হলো।

আল্লামা হামীদুদ্দীন জরীর (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে لَمْ يَحِضْنَ বলা হয়েছে, لَا يَحِضْنَ বলা হয়নি। কেননা لَا يَحِضْنَ বললে বর্তমানে হায়েজ দেখা যাচ্ছে না– এরূপ ভাবার সম্ভাবনা থাকে। আর لَمْ يَحِضْنَ -এর অর্থ হলো, যার হায়েজই শুরু হয়নি। –[আল বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃ. ১৩]

قَوْلُهُ وَالْإِقَامَةُ فِى الْحَيْضِ الخ : এ বাক্যের দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) হানাফীদের গ্রহণীয় অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। মাস হায়েজের স্থলবর্তী বিশেষভাবে হায়েজ ও তুহর উভয়টির স্থলবর্তী নয়; যেমন কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে হায়েজ ও তুহর উভয়টির স্থলবর্তী হলো মাস। ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে, শামসুল আইম্মা বলেন– আমাদের কেউ কেউ মনে করেন যে, যাদের হায়েজ এখনো শুরু হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে মাস হায়েজের পর্যায়ে। আর যাদের হায়েজ শুরু হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তুহর -এর পর্যায়ে– বিষয়টি এরূপ নয়; বরং তাদের ক্ষেত্রেও মাস হায়েজের পর্যায়ে পরিগণিত হবে।

গ্রহণীয় এ মতটির স্বপক্ষে দলিল হলো, যে দাসীর বয়সের স্বল্পতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ আসে না, তার মালিকানার পরিবর্তন কিংবা অন্য কোনো কারণে গর্ভমুক্তির প্রয়োজন হয়। আর গর্ভমুক্তির বিষয়টি মাস দ্বারা নির্ধারিত হয়। অথচ গর্ভমুক্তির বিষয়টি হায়েজ দ্বারা সাব্যস্ত হয়; তুহর দ্বারা নয়। এ থেকে বুঝা যায়, মাস হায়েজেরই স্থলবর্তী; হায়েজ ও তুহর উভয়টির স্থলবর্তী নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাসকে যদি হায়েজ -এর স্থলবর্তী গণ্য করা হয় তাহলে কোনো মাসে তালাক দেওয়ার অর্থ হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া যা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু যখন মাসকে হায়েজ -এর স্থলবর্তী করা হয়, তখন প্রশ্ন হয়– যেহেতু হায়েজ -এর সর্বোচ্চ সীমা দশদিন, সেহেতু তিন হায়েজ -এর সময়সীমা তিনমাস না হয়ে এক মাস হবে। সুতরাং তিন হায়েজ -এর স্থলবর্তী তিন মাস নয়; একমাস।

এর উত্তরে বলা হয়, এ সময়টি [মাস] প্রকৃতার্থে তুহর, তবে হায়েজ -এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। আর যে বস্তুকে কোনো কিছুর স্থলবর্তী করা হয় তা সবদিক থেকে মূল বস্তুর মতো নয়। আর তাই মাসকে স্থলবর্তী করা হয়েছে শুধুমাত্র ইদ্দত পালন ও গর্ভমুক্তির জন্য; অন্যকোনো হিসেবে নয়। সুতরাং তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে মাস হায়েজের স্থলবর্তী নয় যে, মাসে তালাক দেওয়ার দ্বারা হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া বলে গণ্য হবে।

আর শরিয়তে মাসকে হায়েজ -এর স্থলবর্তী করা হয়েছে ইদ্দত পালনের জন্য। আর ইদ্দত সাধারণত তিন মাসে পূর্ণ হয়। আর এ কারণেই মাসকে এমন হায়েজ -এর স্থলবর্তী করা হয়েছে, যার মধ্যে ইদ্দত বিদ্যমান। মাসকে হায়েজের সময়সীমার স্থলবর্তী করা হয়নি যে, এক মাসেই যথেষ্ট হবে।

অতএব, তালাক যদি মাসের শুরুতে দেওয়া হয়, তাহলে তিন মাস চাঁদের হিসেবে বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ, পূর্ণ তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে। আর মাসের মাঝখানে হলে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে দিনের দ্বারা মাস হিসাব করা হবে। এটা সর্বসম্মত অভিমত। অর্থাৎ, সুন্নত মোতাবেক তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম তালাক ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার পর একত্রিশতম দিনে দ্বিতীয় তালাক দেবে। কেননা প্রত্যেক মাস গণ্য হবে ত্রিশদিনে। আর তাই যেদিন ত্রিশদিন পূর্ণ হবে, সেদিন আরেক তালাক দিলে এক মাসে দুই তালাক হয়ে যাবে।

ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো, ইদ্দত ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা পূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, যে মাসে তালাক দেবে, ঐ মাসের ভগ্নাংশকে শেষ মাসের ভগ্নাংশ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। আর মধ্যবর্তী দুই মাস চাঁদের হিসেবে গণ্য করা হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে মাসের ১৫ তারিখে তালাক দিল, আর মাসটি হলো ২৯ দিনের; তাহলে ঐ মাসের ১৪ দিন আর শেষ মাসের ১৬ দিন এবং মধ্যবর্তী দুই মাস চাঁদের হিসেবে গণ্য হবে– মাস ২৯ দিনের হোক আর ৩০ দিনের হোক। এটি মূলত ইজারার মাসআলার মতো। যেমন– কেউ যদি তিন মাসের জন্য মাসের শুরুতে জমি ইজারা নেয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তিন মাস চাঁদের হিসেবে গণ্য হবে – চাঁদের মাস ২৯ দিনের হোক আর ৩০ দিনের হোক। আর যদি মাসের মাঝখানে ইজারা নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, দিনের দ্বারা তিনমাস তথা ৯০ দিন গণ্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে, প্রথম মাসের ভগ্নাংশকে শেষ মাসের ভগ্নাংশ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। আর মধ্যবর্তী দুই মাস চাঁদের হিসেবে গণ্য করা হবে। বলা হয়, সাহেবাইনের মতের উপর ফতোয়া। কেননা, এ হিসাবটি সহজ।

–[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৫৮ পৃ.]

বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে মহিলাদের হায়েজের বয়স ৯ বছর। তবে কেউ কেউ ৮ ও ৭ বছরের কথাও বলেছেন। আর জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায় ৫৫ বছর বয়সে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَالَ وَيَجُوزُ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَلاَ يَفْصِلَ بَيْنَ وَطْيِهَا وَطَلاَقِهَا بِزَمَانٍ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ وَلاَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ وَاِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهْرُ وَلَنَا اَنَّهُ لاَ يَتَوَهَّمُ الْحَبْلُ فِيْهِمَا وَالْكَرَاهِيَةُ فِيْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاِعْتِبَارِهِ لِاَنَّ عِنْدَ ذٰلِكَ يَشْتَبِهُ وَجْهُ الْعِدَّةِ وَالرَّغْبَةُ وَاِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَكَرَ لٰكِنَّ تَكْثُرُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ لِاَنَّهُ يَرْغَبُ فِيْ وَطْيٍ غَيْرِ مُعَلِّقٍ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ الرَّغْبَةِ فَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبْلِ وَطَلاَقُ الْحَامِلِ يَجُوْزُ عَقِيْبَ الْجِمَاعِ لِاَنَّهُ لاَ يُؤَدِّيْ اِلٰى اِشْتِبَاهِ وَجْهِ الْعِدَّةِ وَ زَمَانُ الْحَبْلِ زَمَانُ الرَّغْبَةِ فِيْ الْوَطْيِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلِّقٍ اَوْ فِيْهَا لِمَكَانِ وَلَدِهِ مِنْهَا فَلاَ يَقِلُّ الرَّغْبَةُ بِالْجِمَاعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে স্ত্রীর হায়েজ আসে না, তাকে তালাক ও সহবাসের মাঝে সময়ের ব্যবধান না করে তালাক দেওয়া জায়েজ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ের মাঝে এক মাসের ব্যবধান করবে। কেননা এ সময়কে হায়েজের স্থলবর্তী করা হয়েছে। অধিকন্তু সহবাসের ফলে আগ্রহ কমে যায়। আর তা সময়ের ব্যবধানে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনে। আর সে সময়টা হলো এক মাস। আমাদের দলিল হলো– এতদুভয়ের ক্ষেত্রে গর্ভধারণের কথা ভাবা যায় না। আর মাকরূহ বলে গণ্য হয়েছে ঋতুমতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতেই। কেননা, তখন ইদ্দত দিকটি অস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) যেদিক থেকে উল্লেখ করেছেন, সেদিক থেকে যদিও আগ্রহ কমে যায়, কিন্তু অন্যদিক থেকে তা বৃদ্ধি পায়। কেননা, সন্তান প্রতিপালনের ভার এড়াতে গর্ভসঞ্চারহীন সহবাসের প্রতি সে আগ্রহী হবে। সুতরাং এ সময়টি আগ্রহের সময়ই হলো। ফলে তা গর্ভকালীন সময়ের ন্যায় হয়ে গেল। গর্ভবতী স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক দেওয়া জায়েজ। কেননা তা তার ইদ্দতের দিককে অস্পষ্ট করে না। আর গর্ভকাল সহবাসের প্রতি আগ্রহের সময়। কারণ তা গর্ভসঞ্চারী নয় কিংবা গর্ভকাল হলো স্ত্রীর প্রতি আগ্রহের কাল কেননা তার সন্তান তার গর্ভে রয়েছে। সুতরাং সহবাসের ফলে আগ্রহ হ্রাস পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَلاَ يَفْصِلَ الخ : অল্প বয়স্কা ও হায়েজ রহিতা স্ত্রীকে তালাক ও সহবাসের মাঝে সময়ের ব্যবধান না করেও তালাক দেওয়া জায়েজ। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত এরূপই। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, সহবাস ও তালাকের মাঝে এক মাসের ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয়।

"আল-মুহীত" কিতাবে ইমাম হালওয়ানী (র.) বলেন, অল্প বয়স্কার ক্ষেত্রে তালাক ও সহবাসের মাঝে ব্যবধান না থাকলেও চলে। কেননা এ ক্ষেত্রে গর্ভধারণের সম্ভাবনা নেই। আর যার ক্ষেত্রে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে তালাক ও সহবাসের মাঝে এক মাসের ব্যবধান রাখা উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৫৮ পৃ.]

ইমাম যুফার (রা.) -এর দলিল হলো- মাস হায়েজের স্থলবর্তী। ঋতুমতী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সহবাস ও তালাকের মাঝে এক হায়েজের ব্যবধান যেমনটা জরুরি, তদ্রূপ হায়েজ রহিতার ক্ষেত্রেও এক মাসের ব্যবধান জরুরি। অধিকন্তু সহবাসের কারণে আগ্রহ কমে যায়। যেমন- ঋতুমতী স্ত্রীকে তুহরের সময় সহবাস করলে আগ্রহ কমে যায়। আর এ আগ্রহটা নতুনভাবে ফিরে আসে সময়ের ব্যবধানে।এ কারণে সহবাস ও তালাকের মাঝে এতটুকু সময় ব্যবধান থাকা জরুরি, যার দ্বারা নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে সে সময়টা হলো এক মাস। এ কারণেই ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত হলো- হায়েজ রহিতা ও অল্প বয়স্কাকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তালাক ও সহবাসের মাঝে এক মাস ব্যবধান থাকা আবশ্যক। যেমন- ঋতুমতী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এক হায়েজ ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

আমাদের দলিল হলো, ঋতুমতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতেই সহবাসের পর তালাক প্রদানকে মাকরূহ বলে গণ্য করা হয়েছে। কেননা গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনার কারণে ইদ্দতের বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে। সে যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত গর্ভমুক্তি পর্যন্ত আর যদি গর্ভবতী না হয়, তাহলে তার ইদ্দত তিন হায়েজ। কিন্তু সে গর্ভবতী কিনা তা জানা যায় না। আর এ অস্পষ্টতার কারণেই ঋতুমতী স্ত্রীর থেকে সহবাসের পর তালাক প্রদানকে মাকরূহ বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু হায়েজ রহিতা ও অল্প বয়স্কার ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চারের কথা কল্পনাই করা যায় না। আর তাই এ দুজনের ক্ষেত্রে সহবাসের পরই তালাক প্রদান জায়েজ হবে এবং তালাক ও সহবাসের মাঝে কোনো সময়ের ব্যবধান জরুরি নয়।

قَوْلُهُ وَالرَّغْبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ الخ : এর দ্বারা ইমাম যুফার (র.) -এর উপস্থাপিত দলিলের জবাব দেওয়া হচ্ছে। ইমাম যুফার (র.) বর্ণনা করেছেন, সহবাসের ফলে আগ্রহ কমে যায়- এটি যেমন ঠিক, আবার অন্যদিক থেকে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টিও ঠিক। কেননা অল্প বয়স্কা ও হায়েজ রহিতার সাথে সহবাসের ফলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। আর সন্তানের দায়দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এ ধরনের গর্ভসঞ্চারহীন সহবাসের প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়। এ থেকে বুঝা যায়, হায়েজ রহিতা ও অল্প বয়স্কার সাথে সহবাস আগ্রহের সময়েই ঘটে থাকে। সুতরাং তা গর্ভকালীন সময়ের ন্যায় হয়ে গেল। আর গর্ভবতীকে সহবাসের পর কোনো ব্যবধান ছাড়াই তালাক দেওয়া জায়েজ।

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوْزُ الخ : গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ও তালাকের মাঝে কোনো ব্যবধান আবশ্যক নয়; বরং সহবাসের পর গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ। কেননা গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের ফলে ইদ্দত অস্পষ্ট হয় না। গর্ভবতীর ইদ্দত হলো গর্ভমুক্তি পর্যন্ত। অধিকন্তু গর্ভকালীন সময়টি হলো সহবাসের প্রতি আগ্রহের সময়। কেননা গর্ভবতীর সাথে সহবাসের ফলে নতুন কোনো গর্ভসঞ্চার হয় না। আর তাই এ সময় সহবাসের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। দ্বিতীয়ত গর্ভবতীর পেটে বাচ্চা থাকার কারণে সন্তানের প্রতি প্রকৃতিগত ভালোবাসার টানে সন্তানের মার প্রতিও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ফলে সহবাসের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়; কমে না।

وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلٰثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ اِلَّا وَاحِدَةً لِاَنَّ الْاَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحَظْرُ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلٰى فُصُوْلِ الْعِدَّةِ وَالشَّهْرُ فِيْ حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُوْلِهَا فَصَارَ كَالْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا وَلَهُمَا اَنَّ الْاِبَاحَةَ لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهْرُ دَلِيْلُهَا كَمَا فِيْ حَقِّ الْاٰئِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ وَهٰذَا لِاَنَّهٗ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلٰى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلُحَ عَلَمًا وَ دَلِيْلًا بِخِلَافِ الْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا لِاَنَّ الْعَلَمَ فِيْ حَقِّهَا اِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ وَهُوَ مَرْجُوٌّ فِيْهَا فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَلَا يُرْجٰى مَعَ الْحَبْلِ وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهٗ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِاَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِيْ غَيْرِهٖ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوْعِيَّتُهٗ وَيُسْتَحَبُّ لَهٗ اَنْ يُّرَاجِعَهَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ وَهٰذَا يُفِيْدُ الْوُقُوْعَ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ الْاِسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْاَمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ اَثَرِهٖ وَهِيَ الْعِدَّةُ وَ دَفْعًا لِضَرَرِ تَطْوِيْلِ الْعِدَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, গর্ভবতী স্ত্রীকে সুন্নত তালাক দিতে হলে প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে এক মাসের ব্যবধান করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সুন্নত মোতাবেক এক তালাক দেবে। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে মূল হলো নিষিদ্ধতা। আর শরিয়তে ইদ্দতের বিভিন্ন অংশে তালাক প্রদানের আদেশ এসেছে। আর গর্ভবতীর ক্ষেত্রে মাস ইদ্দতের বিভিন্ন অংশের অন্তর্গত নয়। সুতরাং সে দীর্ঘায়িত তুহরবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের মতো হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো– তালাকের বৈধতা প্রয়োজনের কারণে। আর মাস হলো প্রয়োজনের প্রমাণস্বরূপ। যেমন হায়েজ রহিতা ও অল্প বয়স্কার ক্ষেত্রে রয়েছে মাসকে প্রয়োজনের প্রমাণ ধর্তব্যের কারণ হলো, সুস্থ স্বভাবের চাহিদা হিসেবে এক মাসের ব্যবধান সহবাসের আগ্রহ নতুনভাবে জাগ্রত হওয়ার সময়। সুতরাং [মাস] প্রয়োজনের আলামত ও দলিল হওয়ার যোগ্য। আর দীর্ঘায়িত তুহরবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আলামত হলো তুহর। আর তা যে-কোনো সময় আশা করা যায়; তবে গর্ভাবস্থায় আশা করা যায় না। কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়, তখন তালাক সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা তালাক প্রদানের নিষিদ্ধতা তালাকের বহির্ভূত কারণে হয়েছে। আর তা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং এর শরয়ী কার্যকারিতা বিলুপ্ত হবে না। তবে স্ত্রীর সাথে রাজ'আত করা তার জন্য

মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে বলেছেন, তোমার ছেলেকে আদেশ কর স্ত্রীকে রাজ'আত করার জন্য। আর তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। এ হাদীস তালাক কার্যকর হওয়াকে প্রমাণ করে এবং রাজ'আত করতে উৎসাহ প্রদানকে প্রমাণ করে। কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত– তা মোস্তাহাব। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, তা ওয়াজিব– আমরের প্রকৃত অর্থের উপর আমল করার জন্য এবং যথাসম্ভব গুনাহ দূরীভূত করার প্রেক্ষিতে, তালাকের ফল তথা ইদ্দত গণনা প্রতিহত করার দ্বারা, আর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষতিকে নিবারণের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ الخ : মাসআলা হলো, গর্ভবতী স্ত্রীকে সুন্নত মোতাবেক তালাক দিতে চাইলে প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে এক তালাকের ব্যবধান করবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে সুন্নত তালাক হলো এক তালাক। তিনি 'মাবসূত' কিতাবে উল্লেখ করেন, হযরত ইবনে মাসউদ (র.), হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত– গর্ভবতীকে এক তালাকের বেশি দিতে পারবে না। এটিই ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত। -[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃ.-১৭]

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো– তালাকের ক্ষেত্রে মূল বিষয় নিষিদ্ধতা। আর শরিয়তে ইদ্দতের বিভিন্ন অংশে পৃথক করে তালাক প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ – 'তাদেরকে তাদের ইদ্দতে তালাক প্রদান করো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– ইদ্দতের তুহরগুলোতে তালাক দাও। তাই ঋতুমতীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তুহরে পৃথকভাবে তালাক প্রদানের বিধান দেওয়া হয়েছে। অপর পক্ষে হায়েজ রহিতা বৃদ্ধা ও অল্প বয়স্কা বালিকার ক্ষেত্রে মাস হলো হায়েজের স্থলবর্তী। এ কারণে তালাককে ইদ্দতের বিভিন্ন অংশে পৃথক করে প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে ঋতুমতীদের মতো মনে করা হয়। কিন্তু গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে মাস ইদ্দতের বিভিন্ন অংশে অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা গর্ভকাল দীর্ঘ হলেও কার্যত একটি তুহররূপেই গণ্য। আর তুহর যত দীর্ঘই হোক না কেন তা ইদ্দতের একটি অংশরূপে গণ্য। তাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাক প্রদান সম্ভব নয়। আর তাই সুন্নত হলো এক তালাক প্রদান করা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, তালাকের বৈধতা এসেছে প্রয়োজনের কারণে। আর মাস হলো প্রয়োজনের প্রমাণস্বরূপ। যেমন– হায়েজ রহিতা ও অল্প বয়স্কার ক্ষেত্রে মাস প্রয়োজনের প্রমাণস্বরূপ। কেননা সুস্থ স্বভাবের চাহিদা হিসেবে এক মাসের ব্যবধান নতুন করে সহবাসের আগ্রহ জাগ্রত হওয়ার সময়। সুতরাং তা গর্ভবতীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আলামত ও দলিল হওয়ার যোগ্য। আর পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুকুম প্রয়োজনের প্রমাণের উপর বর্তায়। এ কারণেই গর্ভবতীকে তালাক দিতে হলে পৃথক পৃথকভাবে তিন মাসে তিন তালাক দিতে হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا الخ : আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দীর্ঘায়িত তুহরবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের উপর কিয়াস করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। যে স্ত্রীলোকের তুহর দীর্ঘায়িত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আলামত হলো তুহর। আর তা যে-কোনো সময় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার মাধ্যমে আশা করা যায়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় নতুন কোনো তুহর -এর আশা করা যায় না। কেননা গর্ভমুক্তির পূর্বে ঋতুস্রাব হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দীর্ঘায়িত তুহরবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়।

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الخ : যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়, তখন সেই তালাক কার্যকর হয়ে যায়। তবে সে পুরুষ গুনাহগার হবে। তালাক কার্যকর হওয়ার দলিল হলো, হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের নিষিদ্ধতা তালাকের বহির্ভূত কারণে হয়েছে। তা হলো, ইদ্দত দীর্ঘায়িত হওয়া। অর্থাৎ হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। কেননা যে হায়েজে তালাক প্রদান করা হয়, ইদ্দতের মধ্যে সেই হায়েজ গণ্য হবে না। এই বহির্ভূত কারণে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান নিষিদ্ধ। সত্তাগতভাবে তা নিষিদ্ধ নয়। এ কারণেই আমরা বলি, হায়েজ অবস্থায় তালাকের শরয়ী কার্যকারিতা বিলুপ্ত হবে না।

শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, এ ধরনের তালাক কার্যকর হবে না। জাহিরিয়্যা সম্প্রদায়ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে।
[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭]

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে রাজ'আত করা পুরুষের জন্য মোস্তাহাব। কেননা হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে, হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও, যেন সে স্ত্রীকে রাজ'আত করে। এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে। কেননা তালাক যদি কার্যকর না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে ওমর (রা.) -কে রাজ'আতের নির্দেশ দিতেন না। তালাক কার্যকর হয়েছে বলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর সাথে রাজ'আতের নির্দেশ দিয়েছেন। দুই. স্ত্রীর সাথে রাজ'আত করতে উৎসাহ প্রদান প্রমাণিত হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, রাজ'আত মোস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মোস্তাহাব হওয়ার দলিল হলো, হাদীসে আমরের সীগাহ- (فَلْيُرَاجِعْهَا) ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমরের দ্বারা ন্যূনতমভাবে মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। আর এখানে মোস্তাহাব হওয়ার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। তা হলো- রাজ'আতের বিষয়টি নিছক স্বামীর হক। আর মানুষের স্বীয় হকের মতে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, রাজ'আত করা ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে স্ত্রীর সাথে রাজ'আত করার ব্যাপারে 'আমর'- এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সাধারণভাবে 'আমর' ওয়াজিব হওয়াকে নির্দেশ করে। অধিকন্তু হায়েজকালীন সময়ে তালাক প্রদানকারী সর্বসম্মতভাবে গুনাহগার হয়। সুতরাং উচিত ছিল তালাককে ফিরিয়ে নেওয়া। কিন্তু সত্তাগতভাবে তালাককে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই বলা হয়, তালাকের ফল তথা ইদ্দতকে প্রতিহত করা বাঞ্ছনীয়, যাতে যথাসম্ভব গুনাহ দূরীভূত হয়। রাজ'আত ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, রাজ'আতের ফলে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষতি নিবারিত হয়।

উল্লেখ্য, হিদায়া গ্রন্থকার- وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ وَاجِبٌ বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে وُجُوبٌ শব্দের উল্লেখ না করে বলেছেন- فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا অর্থাৎ তার উচিত রাজ'আত করা। -[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬২]

قَالَ فَاِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَاِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا قَالَ (رضـ) وَهٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْاَصْلِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِىُّ (رحـ) اَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِى الطُّهْرِ الَّذِىْ يَلِى الْحَيْضَةَ الْاُوْلٰى قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِىُّ (رحـ) مَا ذَكَرَ الطَّحَاوِىُّ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَ مَا ذُكِرَ فِى الْاَصْلِ قَوْلُهُمَا وَوَجْهُ الْمَذْكُوْرِ فِى الْاَصْلِ اَنَّ السُّنَّةَ اَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَلَاقَيْنِ بِحَيْضَةٍ وَالْفَاصِلُ هٰهُنَا بَعْضُ الْحَيْضَةِ فَتَكْمُلُ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تَتَجَزّٰى فَتَتَكَامَلُ وَاِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ فَالطُّهْرُ الَّذِىْ يَلِيْهِ زَمَانُ السُّنَّةِ فَاَمْكَنَ تَطْلِيْقُهَا عَلٰى وَجْهِ السُّنَّةِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْاٰخِرِ اَنَّ اَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ اِنْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ كَاَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِى الْحَيْضِ فَيُسَنُّ تَطْلِيْقُهَا فِى الطُّهْرِ الَّذِىْ يَلِيْهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সে মহিলা পবিত্রতা লাভ করার পর হায়েজা হয় এবং এরপরে পবিত্রতা লাভ করে তখন স্বামী তাকে ইচ্ছা করলে তালাক দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে রেখে দিতে পারে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে এরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, প্রথম হায়েজের পর তুহর -এর সময়ই তাকে তালাক দিতে পারবে। হযরত আবুল হাসান কারখী (র.) বলেন, ইমাম ত্বাহাবী (র.) যা বর্ণনা করেছেন তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর মাবসূতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সাহেবাইনের অভিমত। মাবসূতে উল্লিখিত মতের কারণ হলো, প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে একটি পূর্ণ হায়েজের ব্যবধান থাকা সুন্নত। আর এখানে ব্যবধান আংশিক হায়েজ। সুতরাং দ্বিতীয় হায়েজ দ্বারা তা পূর্ণ করানো হবে। আর যেহেতু হায়েজকে ভাগ করা যায় না, তাই দ্বিতীয়টি পরিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হতে হবে। আর যখন দ্বিতীয় হায়েজটি পূর্ণ হয়ে গেল, তখন পরবর্তী তুহর-ই হবে সুন্নত তালাকের সময়। সুতরাং ঐ সময় তাকে সুন্নত তালাক দেওয়া সম্ভব। আর অন্য মতটির দলিল হলো, রাজ'আতের মাধ্যমে তালাকের প্রতিক্রিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যেন তাকে হায়েজ -এর মধ্যে তালাক দেয়নি। অতএব তাকে নিকটবর্তী তুহরের সময় তালাক দেওয়া সুন্নত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ الخ : হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার সাথে স্বামী যে রাজ'আত করেছিল, তারপরে যখন সেই স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হয়, অতঃপর হায়েজা হয়। আর এই দ্বিতীয় হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে গেলে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে, আবার তালাক না দিয়ে স্ত্রী হিসেবে রেখেও দিতে পারে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (রা.) 'মাবসূত' কিতাবে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্বাহাবী (র.) বর্ণনা করেছেন, প্রথম হায়েজের পর প্রথম তুহরে তালাক দিতে পারবে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেন, ইমাম ত্বাহাবী (র.) যা বর্ণনা করেছেন, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত; আর 'মাবসূত' -এর মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত। উভয় অভিমতের পক্ষেই হাদীস আছে; যেমন মাবসূতে উল্লিখিত বর্ণনার পক্ষের হাদীস হলো–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ ـ (بُخَارِىْ شَرِيْف)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে বললেন, তাকে নির্দেশ দাও যেন সে তার স্ত্রীকে রাজ'আত করে, অতঃপর তুহর পর্যন্ত তাকে আটকে রাখে। অতঃপর হায়েজের পর পবিত্রতা লাভ করলে সে তাকে রেখে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সহবাসের পূর্বে তালাকও দিতে পারে। –[বুখারী শরীফ]

পক্ষান্তরে ইমাম ত্বাহাবী (র.) বর্ণিত মতামতের পক্ষের হাদীস হলো–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তার স্ত্রীকে রাজ'আত করে। এরপর পবিত্রতা লাভ করলে সে যেন তালাক দেয়। –[তিরমিযী শরীফ]

বর্ণিত হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) তা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র যৌক্তিক দলিল বর্ণনা করেছেন। –[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১]

মাবসূতে উল্লিখিত মতের পক্ষে যৌক্তিক দলিল হলো, দুই তালাকের মাঝে একটি পূর্ণ হায়েজের ব্যবধান থাকা সুন্নত। আর এখানে যেহেতু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর তা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন যদি হায়েজ পরবর্তী তুহরে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে দুই তালাকের মাঝে পূর্ণ এক হায়েজের ব্যবধান হয় না; বরং ব্যবধান হয় আংশিক হায়েজ। তাই প্রথম হায়েজকে দ্বিতীয় হায়েজ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। আর যেহেতু হায়েজকে খণ্ডিত করা সম্ভব নয়, তাই দ্বিতীয় হায়েজ পূর্ণরূপে অতিবাহিত করতে হবে। আর যখন দ্বিতীয় হায়েজটি পূর্ণ হয়ে গেল, তখন পরবর্তী তুহরই সুন্নত তালাকের সময় হবে। সুতরাং ঐ সময় তাকে সুন্নত অনুযায়ী তালাক দেওয়া সম্ভব।

আর ইমাম ত্বাহাবী (র.) -এর বর্ণিত মতের পক্ষে দলিল হলো, হায়েজ অবস্থায় যে তালাক পতিত হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যাহারের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যেন হায়েজের মাঝে তাকে তালাক দেয়ইনি। সুতরাং তাকে নিকটবর্তী তুহরের সময় তালাক দেওয়া সুন্নত মোতাবেক হবে।

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا لِلسُّنَّةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً لِأَنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلْوَقْتِ وَ وَقْتُ السُّنَّةِ طُهْرٌ لَا جِمَاعَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلٰثُ السَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُوَ عَلٰى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَهِيَ ضِدُّ السُّنَّةِ وَلَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ سُنِّيٌّ وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ وُقُوعَهُ بِالسُّنَّةِ لَا إِيقَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি তার ঋতুমতী ও সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে যে, সুন্নত মোতাবেক তোমাকে তিন তালাক, আর সে বিশেষ কোনো নিয়ত করেনি, তাহলে প্রত্যেক তুহরে তার উপর একটি তালাক পড়বে। কেননা, এখানে لِلسُّنَّةِ শব্দের لَامٌ [লাম] সময়ের জন্য। আর সুন্নত সময় হলো সহবাসবিহীন তুহর। আর যদি এমন নিয়ত করে যে, একই সময়ে তিন তালাক পতিত হবে, কিংবা প্রত্যেক মাসের শুরুতে এক তালাক পতিত হবে, তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ীই হবে– চাই সে হায়েজ অবস্থায় থাকুক কিংবা তুহর অবস্থায় থাকুক। ইমাম যুফার (র.) বলেন, একত্রে তালাকের নিয়ত করা সহীহ হবে না। কেননা এটা বিদ'আত। আর বিদ'আত সুন্নত পরিপন্থি। আমাদের দলিল হলো– তার শব্দের মধ্যে একত্র নিয়তের সম্ভাবনা আছে। কেননা একত্রে তালাক পতিত হওয়া সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত – এ প্রেক্ষিতে যে, তা পতিত হওয়া সুন্নত দ্বারা সাধিত। অথচ এরূপ তালাক দেওয়া সুন্নত নয়। সুতরাং তার শর্তহীন কথা তা অন্তর্ভুক্ত করবে না; নিয়ত দ্বারা তা অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ الخ : কোনো ব্যক্তি তার ঋতুমতী ও সহবাসকৃতা স্ত্রীকে যদি বলে– "সুন্নত মোতাবেক তোমাকে তিন তালাক"। আর সে বিশেষ কোনো নিয়ত না করে, তাহলে প্রত্যেক তুহরে একটি করে তালাক পতিত হবে। দলিল হলো– أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ বাক্যের لِلسُّنَّةِ -এর لَامْ [লাম] সময়ের জন্য। আর সুন্নত সময় হলো, এমন তুহর যাতে সহবাস হয়নি। আর যদি সে তিন তালাক একই সঙ্গে দেওয়ার নিয়ত করে কিংবা প্রত্যেক মাসের শুরুতে এক তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী একসঙ্গে তিন তালাক কিংবা প্রতি মাসের শুরুতে এক তালাক কার্যকর হবে– সে হায়েজ অবস্থায় থাকুক কিংবা তুহর অবস্থায় থাকুক।

আর যদি সহবাসকৃত তুহরে এমনটি বলে এবং কোনো নিয়ত না করে কিংবা প্রত্যেক তুহরে এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে ঋতুমতী হয়ে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) -এর এক বর্ণনানুসারে সহবাসবিহীন তুহরের ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হবে। আর সহবাসকৃত তুহরের মধ্যে তিন তালাক দিবে না ঋতুমতী হয়ে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। –[আল-বিনায়া - খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১]

ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, একত্র তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা একই সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া বিদ'আত। আর বিদ'আত হলো সুন্নতের বিপরীত। সুতরাং সুন্নত শব্দ বলে বিদ'আত উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আমাদের দলিল হলো, তার কথার দ্বারা একত্রে তিন তালাক পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুন্নত তালাকের দু'টি সুরত।

১. পতিত হওয়ার দিক থেকে সুন্নত। অর্থাৎ, তিন তালাক একবারে পতিত হওয়া সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَلْفًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَالْبَاقِيْ رُدَّ عَلَيْهِ – কেউ তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলে তিন তালাক দ্বারা সে বায়েনা হয়ে যাবে; অবশিষ্ট তালাকগুলো তার দিকেই ফিরে যাবে।

২. পতিত করানো তথা কার্যকর হওয়ার দিক থেকে সুন্নত। অর্থাৎ সহবাসমুক্ত তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়া। সুতরাং স্বামী যখন– أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ বলে তালাক দেয় এবং কোনো নিয়ত না করে, তাহলে নিঃশর্ত সুন্নত দ্বারা পরিপূর্ণ সুন্নত উদ্দেশ্য হবে। আর পরিপূর্ণ সুন্নত হলো, পতিত করা ও হওয়া উভয় দিক দিয়ে তালাক কার্যকর হওয়া। সুতরাং সহবাসমুক্ত তুহরে একটি করে তালাক পতিত হবে। আর যখন সে একই সময়ে তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তখন তা-ই হবে। কেননা তার কথায় পতিত হওয়ার দিক থেকে সুন্নতের সম্ভাবনা আছে।

وَإِنْ كَانَتْ اٰيِسَةً اَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعْدَ شَهْرٍ اُخْرٰى وَبَعْدَ شَهْرٍ اُخْرٰى لِاَنَّ الشَّهْرَ فِيْ حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهْرِ فِيْ حَقِّ ذَوَاتِ الْاَقْرَاءِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَاِنْ نَوٰى اَنْ يَقَعَ الثَّلٰثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدَنَا لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الثَّلٰثِ حَيْثُ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِيْهِ لِاَنَّ نِيَّةَ الثَّلٰثِ اِنَّمَا صَحَّتْ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيْدُ تَعْمِيْمَ الْوَقْتِ وَمِنْ ضَرُوْرَتِهِ تَعْمِيْمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ فَاِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيْمُ الْوَقْتِ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ.

অনুবাদ : আর স্ত্রী যদি হায়েজ রহিতা হয়, কিংবা মাস গণনাকারী [অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা] হয়, তাহলে সেই মুহূর্তেই এক তালাক হয়ে যাবে। আর এক মাস পর দ্বিতীয় এবং পরের মাসে আরেক তালাক হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে মাসই প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ যেমন ঋতুমতীদের ক্ষেত্রে তুহর। বিষয়টি পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি তাৎক্ষণিক তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে তা পতিত হয়ে যাবে। এটা হলো আমাদের মত। কারণ পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যদি বলে, তোমাকে সুন্নত মোতাবেক তালাক, কিন্তু তিন শব্দটি উল্লেখ করেনি, তাহলে এখানে একত্র নিয়ত করা শুদ্ধ হবে না। কেননা তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, সুন্নত মোতাবেক কথাটা সুন্নত সমর্থিত সময় নির্দেশ করে। সুতরাং তাতে সময়ের ব্যাপকতা প্রতীয়মান হয়। আর এ অনিবার্য ফল হলো ঐ সময়ে পতিত তালাকের ব্যাপকতা। অথচ তিন তালাক একত্র করার নিয়ত করলে সময়ের ব্যাপকতা বাতিল হয়ে যাবে। তাই তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ اٰيِسَةً اَوْ مِنْ ذَوَاتِ الخ : আর সহবাসকৃতা স্ত্রী যদি ঋতুমতী না হয়, বরং মাস গণনাকারী তথা হায়েজ রহিত কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা হয়, তাহলে "তোমাকে সুন্নত মোতাবেক তিন তালাক" বলার দ্বারা মুহূর্তেই এক তালাক পতিত হবে। আর এক মাস পর দ্বিতীয় এবং আরেক মাস পর তৃতীয় তালাক পতিত হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে মাসই প্রমাণের দলিল, যেমন- ঋতুমতীদের ক্ষেত্রে তুহর প্রমাণের দলিল। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হায়েজ রহিত স্ত্রীর ক্ষেত্রে মাস হায়েজের স্থলবর্তী।

আর যদি স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে আমাদের মতে, তিন তালাক তাৎক্ষণিক পতিত হবে। এ মাসআলাতেও ইমাম যুফার (র.) -এর মতপার্থক্য আছে। ইতঃপূর্বে উভয় পক্ষের দলিল বর্ণিত হয়েছে

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ الخ : তবে স্বামী যদি সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে "তোমাকে সুন্নত মোতাবেক তালাক" তিন শব্দের উল্লেখ ছাড়া, তাহলে তিন তালাক একত্র করার নিয়ত শুদ্ধ হবে না। কেননা তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল لِلسُّنَّةِ [সুন্নত মোতাবেক] -এর "লাম" সময় নির্দেশ করে। আর এতে সুন্নত সমর্থিত সময়ের ব্যাপকতা প্রতীয়মান হয় আর সময়ের ব্যাপকতা ঐ সময়ে পতিত তালাকের ব্যাপকতাকে অনিবার্য করে। অথচ তিন তালাক একত্র করার নিয়ত করলে সময়ের ব্যাপকতা বাতিল হয়ে যায়। আর এ কারণে তিন তালাক একত্র করার নিয়ত শুদ্ধ হবে না।

فَصْلٌ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُوْنِ وَالنَّائِمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيْمُ الْاِخْتِيَارِ .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক স্বামীর তালাক পতিত হবে, যখন সে সুস্থ মস্তিষ্ক ও বালেগ হয়। নাবালেগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ নাবালেগ ও পাগলের তালাক ছাড়া সকল তালাকই বৈধ। অধিকন্তু পার্থক্যবোধক বিবেকের দ্বারা যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়। আর এরা হলো বিবেকহীন। আর ঘুমন্ত ব্যক্তির তো কোনো ইচ্ছাই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ الخ : এ অনুচ্ছেদে কোন ব্যক্তি তালাক প্রদানে যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, স্বামী যখন সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন সর্বসম্মতভাবে তার তালাক পতিত হবে। তবে স্বামী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় কিংবা পাগল হয়, অথবা ঘুমন্ত হয়, তাহলে তার তালাক পতিত হবে না। এর দলিল হলো, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ - অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের তালাক ব্যতীত সকল তালাকই বৈধ। উল্লেখ্য, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) "আল-হাজর" -এর মধ্যে اَلْمَجْنُوْنُ শব্দের পরিবর্তে اَلْمَعْتُوْهُ শব্দের উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) এ শব্দেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। -[আল-বিনায়া: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। আর যৌক্তিক দলিল হলো, যোগ্যতা সাব্যস্ত হয় পার্থক্যবোধক বিবেকের দ্বারা। আর পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক হলো বিবেকহীন। সুতরাং তারা তালাক প্রদানে যোগ্য নয়। আর তাই তাদের প্রদত্ত তালাকও কার্যকরী হবে না। অপরদিকে ঘুমন্ত ব্যক্তির কোনো ইচ্ছাই নেই বলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, اَلْعَاقِلُ হলো যার কথাবার্তা ও কাজকর্ম সঠিক। আর مَجْنُوْنٌ [পাগল] হলো, যার কথাবার্তা ও কাজকর্ম কোনোটি সঠিক নয়। আর مَعْتُوْهٌ হলো, যার উপলব্ধি শক্তি কম, কথাবার্তায় অসঙ্গতি ও কোনো কিছুর ভুল ব্যাখা করে। তবে সে গালাগালি করে না ও মারামারিও করে না। -[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪]

وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الْاِخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ بِخِلَافِ الْهَازِلِ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ وَلَنَا أَنَّهُ قَصَدَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَعْرِى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اِعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ .

অনুবাদ : বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, বলপ্রয়োগ ইচ্ছার সাথে একত্র হতে পারে না। আর ইচ্ছার দ্বারাই শরিয়তভিত্তিক কর্মকাণ্ড বিবেচ্য। ঠাট্টাকারীর তালাকের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তালাক শব্দ উচ্চারণে সে ইচ্ছাধীন। আমাদের দলিল হলো, যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেছে। সুতরাং তা তালাকের ফলাফল থেকে মুক্ত হবে না- তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বেচ্ছায় তালাক প্রদানকারীর উপর কিয়াস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ الخ : যদি কাউকে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, আর এ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে তালাক পতিত হবে। হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীর অভিমত এটিই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রা.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, বলপ্রয়োগ ও ইচ্ছা একসঙ্গে একত্র হতে পারে না। আর ইচ্ছার দ্বারাই শরিয়তের কর্মসমূহ ধর্তব্য হয়। সুতরাং ইচ্ছা না থাকার কারণে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে পরিহাসচ্ছলে তালাক প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে ঠাট্টাকারী স্বেচ্ছায় তালাক শব্দ উচ্চারণ করেছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষে আরেকটি দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ আমার উম্মত থেকে ভুল-ভ্রান্তি ও বলপ্রয়োগের ফলে কৃত অপরাধের হিসাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের দলিল হলো, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের যোগ্যতা থাকা অবস্থায় তালাক প্রদানের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং এ তালাক প্রদানের ইচ্ছা, তালাকের হুকুম তথা ফলাফল থেকে মুক্ত হবে না - তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর তার প্রয়োজন হলো, তাকে যে বিষয়ের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে, সে তালাক প্রদানের মাধ্যমে ঐ ভীতিকর বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং সে স্বেচ্ছায় -তালাক প্রদানকারীর মতো হয়ে গেল। কেননা, তার সামনে দু'টি মন্দ- ১. জীবন বিপন্ন হওয়া, ২. স্ত্রীকে বিপন্ন করা তালাক প্রদানের মাধ্যমে। সে এ দু' মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লঘুটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে স্বেচ্ছায় তালাক দিয়েছে। তবে সে তালাকের ফলাফলের উপর সন্তুষ্ট নয়। আর তালাকের ফলাফলের প্রতি অসন্তুষ্টি তালাক সাব্যস্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ অসন্তুষ্টি সত্ত্বে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে। যেমন- পরিহাসচ্ছলে তালাক প্রদান করলে অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তালাক পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উপস্থাপিত হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, মূলত আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা আখিরাতের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা থেকে মুক্তির কথা বলেছে; দুনিয়ার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, ভুল-ভ্রান্তির কারণে কৃত অপরাধের জবাবদিহিতা আখিরাতে হবে না; তবে দুনিয়াতে এজন্য তার উপর বিধান প্রয়োগ হবে। যেমন- কেউ ভুলবশত কাউকে হত্যা করলে আখিরাতে তার জবাবদিহিতা নেই বটে, দুনিয়াতে তার উপর দিয়ত [রক্তপণ] ওয়াজিব। অনুরূপভাবে কেউ নামাজে ভুলবশত ওয়াজিব ছেড়ে দিলে আখিরাতে সে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব। সুতরাং উপস্থাপিত হাদীসটি আলোচ্য মাসআলার দলিল হবে না।

وَهٰذَا لِاَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ وَاخْتَارَ اَهْوَنَهُمَا وَهٰذَا اٰيَةُ الْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارُ اِلَّا اَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ وَ ذٰلِكَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِهِ كَالْهَازِلِ وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ وَاخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ (رح) اَنَّهُ لَا يَقَعُ وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (رح) لِاَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ كَزَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ وَلَنَا اَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًا حُكْمًا زَجْرًا لَهُ حَتّٰى لَوْ شَرِبَ فَصُدِّعَ وَ زَالَ عَقْلُهُ بِالصُّدَاعِ نَقُوْلُ اِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَطَلَاقُ الْاَخْرَسِ وَاقِعٌ بِالْاِشَارَةِ لِاَنَّهَا صَارَتْ مَعْهُوْدَةً فَاُقِيْمَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَسَيَأْتِيْكَ وُجُوْهُهُ فِيْ اٰخِرِ الْكِتَابِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : কেননা সে দু'টি মন্দের সম্মুখীন হয়েছে এবং তন্মধ্যে লঘুতরটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আর এটা ইচ্ছা ও গ্রহণের প্রমাণ। তবে তালাকের ফলাফলের প্রতি সে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু তা তালাক সাব্যস্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়– পরিহাসচ্ছলে তালাক প্রদানকারীর ন্যায়। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। ইমাম কারখী ও ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর পছন্দনীয় মতানুযায়ী তালাক পতিত হবে না। এটি হলো ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটি মত। কেননা বিবেক দ্বারা ইচ্ছা বিশুদ্ধ হয়। অথচ নেশাগ্রস্তের বিবেক বিলুপ্ত। সুতরাং ভাং কিংবা ঔষধের কারণে বিবেক বিলুপ্ত হওয়ার মতোই হবে। আমাদের দলিল হলো, তার আকল এমন এক কারণে বিলুপ্ত হয়েছে, যা গুনাহের কাজ। সুতরাং তার সতর্কতার জন্য হুকুমের দিক থেকে বিবেককে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা হবে। অতএব যদি মদপানের পর মাথা ধরে আর মাথা ধরার কারণে বিবেক বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলে থাকি তার তালাক পতিত হবে না। বোবার তালাক ইশারার মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। কেননা তার ইশারা পরিজ্ঞাত। সুতরাং তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইশারাকে কথাবার্তার স্থলবর্তী করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক কিতাবের শেষ দিকে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ الخ : নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে। ইমাম কারখী ও ইমাম ত্বাহাবী (র.) -এর গ্রহণীয় অভিমত হলো, তালাক পতিত হবে না। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর একটি অভিমত। এর দলিল হলো – ব্যক্তির ইচ্ছা তখনই বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে, যখন তার আকল-বিবেক থাকে। আর নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তো কোনো আকলই থাকে না। নেশার কারণে তার আকল বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল ভাং কিংবা ঔষধের কারণে যার বিবেক-আকল বিলুপ্ত হয়েছে। আর এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে তালাক পতিত হয় না। সুতরাং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরও তালাক পতিত হবে না।

আর আমাদের দলিল হলো, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আকল এমন এক কারণে বিলুপ্ত হয়েছে যা গুনাহের কাজ। যেমন মদ্যপান। সুতরাং তার সতর্কতার জন্য হুকুমের দিক থেকে আকলকে বিদ্যমান বলে গণ্য করা হবে। আর তাই তার তালাকের ইচ্ছা পোষণও বিশুদ্ধ হবে এবং তালাক পতিত হবে।

অতএব, কোনো ব্যক্তির যদি মদ্যপানের ফলে তীব্র মাথা ধরা শুরু হয়, আর এ কারণে তার আকল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার প্রদত্ত তালাক পতিত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে আকল বিলুপ্তির কারণ মদ্যপান নয়; বরং মাথাব্যথা।

বলা হয়, হিদায়া গ্রন্থকার বে-খেয়ালবশত "নেশার কারণে আকল বিলুপ্তির কথা বলেছেন।" অথচ সে শরিয়তের হুকুমের আদিষ্ট, যা আকল ছাড়া হয় না। খুব বেশি হলে, তাকে مَغْلُوْبُ الْعَقْلِ [পরাভূত আকলের অধিকারী] বলা যেতে পারে। এর উত্তরে বলা হয়, مَغْلُوْبٌ [পরাভূত] - مَعْدُوْمٌ [বিলুপ্ত] -এর পর্যায়ে। আর তাই বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে।

-[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮]

উল্লেখ্য, ইবনুল হুমাম (র.) سَكْرَانُ [নেশাগ্রস্ত] -এর সংজ্ঞায় বলেন, 'যে ব্যক্তি নেশার ফলে পুরুষ-মহিলা ও আকাশ-পাতালের পার্থক্য করতে পারে না। -[ফাতহুল কাদীর- খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২]

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَاقِعٌ الخ : বোবা ব্যক্তির তালাক ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে পতিত হবে। সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বোবার তালাক, বিবাহ, দাসমুক্তি, কেনাবেচা সবই জায়েজ, সে লিখতে সামর্থ্য হোক বা না হোক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতামত অনুরূপই। -[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮]

বোবা ব্যক্তির তালাক কার্যকর হওয়ার দলিল হলো, তার ইশারা-ইঙ্গিত পরিজ্ঞাত ও পরিচিত। সুতরাং প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার ইশারা-ইঙ্গিতকে বচনের স্থলবর্তী করা হয়েছে।

শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ বলেন, বোবা যদি লিখতে জানে, তাহলে ইশারা-ইঙ্গিতের দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। কেননা, প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে লেখা ইশারা-ইঙ্গিত অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়। আমাদের মাযহাবের কেউ কেউ এরূপ মতামতের পক্ষে। -[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪৭৪]

وَطَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلٰثٌ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) عَدَدُ الطَّلَاقِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَلِاَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالْاٰدَمِيَّةُ مُسْتَدْعِيَةٌ لَهَا وَمَعْنَى الْاٰدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ اَكْمَلُ فَكَانَتْ مَالِكِيَّتُهُ اَبْلَغُ وَاَكْثَرُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَلِاَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا وَلِلرِّقِّ اَثَرٌ فِي تَنْصِيفِ النِّعَمِ اِلَّا اَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَتَجَزّٰى فَتَكَامَلُ عُقْدَتَانِ وَتَاوِيْلُ مَا رُوِىَ اَنَّ الْاِيْقَاعَ بِالرِّجَالِ وَاِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اِمْرَاَةً بِاِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ لِاَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُوْنُ الْاِسْقَاطُ اِلَيْهِ دُوْنَ الْمَوْلٰى .

অনুবাদ : দাসীর তালাক দু'টি– তার স্বামী স্বাধীন হোক বা দাস হোক। আর স্বাধীন নারীর তালাক তিনটি– তার স্বামী স্বাধীন হোক বা দাস হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তালাকের সংখ্যা গণ্য হবে পুরুষের অবস্থার উপর নির্ভর করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ – 'তালাক পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট; আর ইদ্দত নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট'। তাছাড়া মালিকানার বিষয়টি মর্যাদার বিষয়। আর 'মানবতা' হলো মর্যাদার হকদার। আর মানবতার গুণ স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সুতরাং তার মালিকানা হবে অধিক ও বেশি। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ – 'দাসীর তালাক দু'টি আর তার ইদ্দত হলো দুই হায়েজ।' তাছাড়া এজন্য যে, 'সম্ভোগ-স্থান' হালাল হওয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রে একটি নিয়ামত। আর নিয়ামতের পরিমাণকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব রয়েছে। আর এক তালাক খণ্ডিত করা যায় না বলে দুই তালাক পূর্ণ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার ব্যাখ্যা হলো তালাক প্রদান পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। দাস যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে, অতঃপর তালাক প্রদান করে, তাহলে তালাক পতিত হবে। কিন্তু দাসের স্ত্রীর উপর মনিবের তালাক পতিত হবে না। কেননা বিবাহের মালিকানা হলো দাসের নিজস্ব হক। সুতরাং তা রহিত করার ক্ষমতা তার হাতেই থাকবে; মনিবের হাতে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ الخ : তালাকের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। হানাফী মাযহাব অনুসারে, মহিলার অবস্থার ভিত্তিতে তালাকের সংখ্যা গণ্য হবে। অর্থাৎ দাসীর ক্ষেত্রে দু'টি তালাক – তার স্বামী স্বাধীন হোক বা দাস হোক। আর স্বাধীন নারীর তালাক তিনটি– তার স্বামী স্বাধীন হোক বা দাস হোক। হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের অভিমত এটিই। ইবনে হিমাম (র.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর থেকে এ মত সাব্যস্ত নয়। –[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩০]

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তালাকের সংখ্যা পুরুষের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ, স্বামী স্বাধীন পুরুষ হলে তিন তালাকের অধিকারী হবে– তার স্ত্রী স্বাধীন হোক কিংবা দাসী হোক। আর স্বামী দাস হলে দুই তালাকের অধিকারী হবে– তার স্ত্রী স্বাধীন হোক কিংবা দাসী হোক। দু'টি ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পায়–

১. দাসের বৈবাহিক বন্ধনে যদি স্বাধীন স্ত্রী থাকে, তাহলে হানাফীদের মতে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া যাবে; পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাব মতে, দুই তালাক দেওয়া যাবে।
২. স্বাধীন পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনে দাসী হলে, হানাফীদের মতে স্ত্রীর তালাক দু'টি; পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাব মতে, স্ত্রীর তালাক তিনটি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ - 'তালাক পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর ইদ্দত নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট।' এ হাদীসে তালাকের বিপরীতে ইদ্দত এসেছে। ইদ্দতের ক্ষেত্রে সংখ্যার বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে মহিলাদের হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন- স্ত্রী দাসী হলে তার ইদ্দত দুই হায়েজ [হানাফীদের মতে] কিংবা দুই তুহর [শাফেয়ী মাযহাব মতানুসারে]। আর স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েজ কিংবা তিন তুহর। সুতরাং বৈপরীত্য সাব্যস্ত করার জন্য তালাকের ক্ষেত্রে সংখ্যার বিষয়টি পুরুষদের হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ স্বাধীন স্বামী তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে- স্ত্রী স্বাধীন হোক আর দাসী হোক। আর স্বামী দাস হলে দুই তালাক প্রদানের অধিকারী হবে- স্ত্রী স্বাধীন হোক আর দাসী হোক।

قَوْلُهُ لِاَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর যৌক্তিক দলিল হলো, মালিকানার গুণটি মর্যাদার বিষয়। আর মানবতা হলো মর্যাদার হকদার। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ - 'আমি মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ করেছি।' আর মানবতার গুণ স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। দাসের মধ্যে পূর্ণভাবে তা পাওয়া যায় না। সুতরাং মানবতা স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে তার মালিকানাও হবে দাসের তুলনায় অধিক ও বেশি। এ কারণেই স্বাধীন পুরুষ তিন তালাকের অধিকারী হবে, আর দাস হবে দুই তালাকের অধিকারী।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ -'দাসীর তালাক দু'টি, আর তার ইদ্দত হলো দুই হায়েজ।' এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তালাকের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের ভিত্তিতে গণ্য হবে।

আর যৌক্তিক দলিল হলো, স্ত্রীর সম্ভোগ-স্থান হালাল হওয়া স্ত্রীর জন্য একটি নিয়ামত। কেননা এ কারণে সে স্বামী থেকে ভরণ-পোষণ পায়। আর নিয়ামতের পরিমাণকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব আছে। সুতরাং কিয়াস মোতাবেক স্বাধীন স্ত্রীর তালাকের অর্ধেক দেড় তালাকই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তালাককে খণ্ডিত করা যায় না বিধায় দুই তালাক পূর্ণ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হাদীসের জবাব হলো "তালাক পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট" -এর ব্যাখ্যা হচ্ছে তালাক প্রদান পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ হাদীস তাঁদের দলিল হতে পারে না।

হযরত ইবনে আবী শায়বা (র.) তাঁর 'মুসান্নাফ'-এর মধ্যে এ হাদীসকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপর 'মওকূফ' করেছেন। ত্বাবারানী (র.)-ও তার 'মু'জাম'-এর মধ্যে এ হাদীসকে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর উপর মওকূফ করেছেন। আবার আব্দুর রাযযাক (র.)-ও তাঁর 'মুসান্নাফ' -এর মধ্যে হযরত ওসমান (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের উপর "মওকূফ" করে বর্ণনা করেছেন। মওকূফ হাদীস শাফেয়ীদের নিকট দলিলের যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং এ হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যথার্থ নয়। -[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫: পৃষ্ঠা ৩০]

قَوْلُهُ وَاِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَاَةً الخ : মনিব যখন দাসকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে, তখনই তার বিবাহের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা মালিকানার গুণটি হলো মানবতা। আর সত্তাগতভাবে মানুষ স্বাধীন হিসেবে মানবতার গুণটি দাসের মাঝেও বিদ্যমান। আর সে কারণেই বিবাহের মালিকানা যেমন তার নিজস্ব অধিকার, তেমনি তালাক দেওয়ার অধিকারও তারই থাকবে; মনিবের হাতে নয়। তবে এ ক্ষেত্রে মনিবের যদি ক্ষতি হয়, তাহলে তো সেটা তার সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হয়েছে। মনিবই তো স্বেচ্ছায় তাকে বিবাহের মালিক হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। বিধায় সে ক্ষতির দায়ভার তারই উপর বর্তাবে। ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনিব তার এক দাসীর সাথে আমাকে বিবাহ করিয়েছেন। এখন তিনি আমাদের বিচ্ছেদ চান। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের কি হলো যে, স্বীয় গোলামকে দাসীর সাথে বিয়ে দিয়ে বিচ্ছেদ কামনা কর! বিবাহ যে করেছে, একমাত্র তালাক দেওয়ার অধিকার তারই।'

-[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৩; পৃষ্ঠা ৪৭৬]

بَابُ اِيْقَاعِ الطَّلَاقِ

اَلطَّلَاقُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ صَرِيْحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيْحُ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ فَهٰذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ فِى الطَّلَاقِ وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِىْ غَيْرِهِ فَكَانَ صَرِيْحًا وَاِنَّهُ يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَى النِّيَّةِ لِاَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِغَلَبَةِ الْاِسْتِعْمَالِ وَكَذَا اِذَا نَوَى الْاِبَانَةَ لِاَنَّهُ قَصَدَ بِتَنْجِيْزِ مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنْ فِى الْقَضَاءِ لِاَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُدَيَّنُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَحْتَمِلُهُ وَلَوْ نَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنْ فِى الْقَضَاءِ وَلَا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يُدَيَّنُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ لِلتَّخْلِيْصِ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُوْنُ طَلَاقًا اِلَّا بِالنِّيَّةِ لِاَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيْهِ عُرْفًا فَلَمْ يَكُنْ صَرِيْحًا .

পরিচ্ছেদ : তালাক প্রদান

অনুবাদ : তালাক দুই প্রকার– সুস্পষ্ট তালাক ও ইঙ্গিতমূলক তালাক। সুস্পষ্ট তালাক হলো এভাবে বলা– 'তুমি তালাক' কিংবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" এর দ্বারা তালাকে রাজঈ পতিত হবে। কেননা এ সকল শব্দ তালাকের অর্থে ব্যবহৃত হয়; অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এগুলি সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ। আর এরপর নস দ্বারা রাজ'আতের অধিকার থাকে। আর এ তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয় না। কেননা এক্ষেত্রে অধিক ব্যবহারের কারণে শব্দটি তালাকের অর্থে সুস্পষ্ট। অনুরূপ হুকুম যদি সে 'বায়েন' তালাকের নিয়ত করে। কেননা শরিয়ত ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সাথে যে তালাকের কার্যকারিতে সম্পৃক্ত রেখেছে, সেটাকে সে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি তালাক দ্বারা বন্ধন মুক্তির নিয়ত করে, তাহলে বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। কেননা এটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। তবে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এ নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, শব্দটি এ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর যদি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির নিয়ত করে, তাহলে বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা আল্লাহ ও বান্দার মাঝেও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তালাক হলো [বৈবাহিক] বন্ধন বিলুপ্তির জন্য; তা কর্মবন্ধন নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বর্ণনা আছে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শব্দটি মুক্তিদানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর যদি বলে, তুমি مُطْلَقَةٌ - ط হরফটি সাকিন উচ্চারণ করে, তাহলে নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না। কেননা শব্দটি প্রচলিতভাবে তালাক অর্থে ব্যবহৃত নয়। সুতরাং তা সুস্পষ্ট নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার মূল তালাক ও তার গুণ তথা উত্তম হওয়ার ভিত্তিতে তালাকের প্রকারভেদ; যেমন– সুন্নত তালাক, বিদআত তালাক ইত্যাদি বিষয় সামগ্রিকভাবে বর্ণনান্তে এ অধ্যায়ে তালাক প্রদানের দিক থেকে এর শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ اَلطَّلَاقُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ الخ : তালাক প্রদান করা হয় দু ভাবে– ১. সুস্পষ্টভাবে, ২. ইঙ্গিতের মাধ্যমে। সুস্পষ্ট তালাক হলো, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই তালাকের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলি সুস্পষ্ট। যেমন– স্বীয় স্ত্রীকে এভাবে বলা– 'তুমি তালাক, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' এ সকল শব্দের দ্বারা তালাকে রাজঈ পতিত হবে। এর দলিল হলো, প্রচলিত অর্থে এ সকল শব্দ তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। তালাকের অর্থে এ শব্দগুলো খুবই সুস্পষ্ট। এগুলো অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আর সুস্পষ্ট তালাকের পর (البقرة - ٢٢٨) وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ কুরআনের এ ভাষ্য দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হয়। তবে প্রশ্ন হলো, এ আয়াতে رد [প্রত্যাহার করা] শব্দটি বৈবাহিক বন্ধন বিলুপ্তির নির্দেশ করে। তাহলে কিভাবে রাজ'আত সাব্যস্ত হয়? এর উত্তরে বলা হয়, মালিকানা বিলুপ্তির কারণ সংঘটিত হওয়ার পর رد শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং কারণ প্রত্যাহারের বিষয়টি মালিকানা বিলুপ্তি সাব্যস্ত হবে এবং কারণের জন্য তা ভাঙ্গন অর্থে হবে। আর তাই رد [প্রত্যাহার] -কে فَسْخ [ভাঙ্গন] অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। –[আল-বিনায়া– খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩]

সুস্পষ্ট তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। কেননা তালাকের অর্থে এ শব্দাবলি অধিক ব্যবহৃত হয় বলে তা সুস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করতেই নিয়তের প্রয়োজন হয়। আর বর্ণিত শব্দগুলোতে অস্পষ্টতা নেই বলে তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا نَوَى الْاِبَانَةَ الخ : কেউ যদি এসব শব্দের দ্বারা বায়েন তালাকের নিয়ত করে, তথাপি তালাকে রাজঈ হবে। কেননা শরিয়ত বায়েন তালাকের কার্যকারিতাকে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ - (اَلْبَقَرَةُ : ٢٣١) অর্থাৎ আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। –[সূরা বাকারা : ২৩১]

অথচ সে এটাকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং তার ইচ্ছা শরিয়তসম্মত না হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে।

আর যদি তালাক শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থে বন্ধন থেকে মুক্তির নিয়ত করে, তাহলে আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। তবে আল্লাহর ও বান্দার মাঝে এ নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, 'শব্দ' যদি বাহ্যিক অর্থের বিপরীত কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে; আর বক্তা তার বক্তব্যে সে অর্থের নিয়ত করে, তাহলে বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হওয়ার কারণে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে শব্দ যেহেতু সে অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তাই এ নিয়ত আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি তালাক শব্দ দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির নিয়ত করে, তাহলে আদালতের বিচারেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝেও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তালাক শব্দটি 'কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি' অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। তালাক সাব্যস্ত হয় বিবাহ বন্ধন বিলুপ্ত করার জন্য, আর বিবাহবন্ধন কর্মবন্ধন নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তালাক শব্দ দ্বারা কেউ যদি কর্মবন্ধন মুক্তির নিয়ত করে, তাহলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তালাক শব্দটি تَخْلِيْص [রেহাই দান] -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্বামী যেন স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ مُتَخَلِّصَةٌ عَنِ الْعَمَلِ - "তুমি কাজকর্ম থেকে দায়িত্বমুক্ত।"

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ مُطَلَّقَةٌ الخ : কেউ তার স্ত্রীকে যদি বলে– اَنْتِ مُطْلَقَةٌ - طَاء - সাকিন ও لام - যবর উচ্চারণ করে, আর তালাকের নিয়ত না করে, তাহলে তালাক হবে না। কেননা مُطْلَقَةٌ শব্দটি প্রচলিতভাবে তালাক অর্থে ব্যবহৃত নয়। সুতরাং তা তালাক অর্থে সুস্পষ্ট নয় বলে তার নিয়তের উপর নির্ভর করবে। সে যদি এ শব্দ দ্বারা তালাকের উদ্দেশ্য করে, তাহলে তালাক হবে।

قَالَ وَلَا يَقَعُ بِهِ اِلَّا وَاحِدَةً وَاِنْ نَوٰى اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَقَعُ مَا نَوٰى لِاَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفْظِهِ فَاِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُغَةً كَذِكْرِ الْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ وَلِهٰذَا يَصِحُّ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيَكُوْنُ نَصْبًا عَلَى التَّفْسِيْرِ وَلَنَا اَنَّهُ نَعْتُ فَرْدٍ حَتّٰى قِيْلَ لِلْمُثَنّٰى طَالِقَانِ وَلِلثَّلٰثِ طَوَالِقُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ لِاَنَّهُ ضِدُّهُ وَ ذِكْرُ الطَّالِقِ ذِكْرُ لِطَلَاقٍ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَرْاَةِ لَا لِطَلَاقٍ هُوَ تَطْلِيْقٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উক্ত শব্দগুলো দ্বারা শুধু এক তালাক পতিত হবে, যদিও সে একাধিক তালাকের নিয়ত করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যা নিয়ত করবে তা-ই পতিত হবে। কেননা তা উক্ত শব্দের সম্ভাবনাধীন। কারণ طَالِقٌ শব্দের উল্লেখে আভিধানিক অর্থে طَلَاقٌ -এর উচ্চারণ হয়, যেমন- عَالِمٌ শব্দের উচ্চারণে عِلْمٌ -এর উচ্চারণ হয়। এজন্যই এর সাথে সংখ্যা যুক্ত করা শুদ্ধ রয়েছে- তামঈযের ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়ে। আর আমাদের দলিল হলো- طَالِقٌ শব্দটি একজনকে বুঝায়। এ কারণে দু'জন স্ত্রীলোকের জন্য طَالِقَانِ আর তিনজনের জন্য طَوَالِقُ বলা হয়। সুতরাং এতে সংখ্যার সম্ভাবনা নেই। কেননা তা মূল শব্দের অর্থের বিপরীত। আর طَالِقٌ শব্দটি স্ত্রীর গুণ [সিফাত]; طَلَاقٌ -এর গুণ নয়, যার অর্থ তালাক দেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَقَعُ بِهِ اِلَّا وَاحِدَةً الخ : ইমাম কুদূরী (র.) -এর এ উক্তিটি فَهٰذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত اَنْتِ طَالِقٌ، مُطَلَّقَةٌ، طَلَّقْتُكِ - শব্দগুলো দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ এবং শুধু এক তালাক পতিত হবে, যদিও সে একাধিক তালাকের নিয়ত করে। এটি আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, যতটা তালাকের নিয়ত করবে, ততটাই পতিত হবে। ইমাম মালেক (র.), ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত অনুরূপই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর প্রথম দিকের মত এটি ছিল। পরবর্তীতে তিনি এ মত পাল্টিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো- সে ব্যক্তি এক, দুই, তিনের মধ্যে সে সংখ্যক তালাকের নিয়ত করবে, তা-ই পতিত হবে। কেননা তা এ সবের সম্ভাবনা রাখে। কেননা সীগায়ে সিফাত طَالِقٌ শব্দের উল্লেখ্য ক্রিয়ামূল طَلَاقٌ -এর উল্লেখ। যেমন- عَالِمٌ শব্দের উচ্চারণে عِلْمٌ -এর উল্লেখ হয়। সুতরাং طَالِقٌ শব্দটি ক্রিয়ামূল طَلَاقٌ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ক্রিয়ামূলে এক ও একের অধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে। আর এজন্যই طَلَاقٌ -এর সাথে সংখ্যা যোগ করা শুদ্ধ রয়েছে। যেমন বলা হয়- اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا এখানে ثَلَاثًا শব্দটি তামঈযের ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়েছে। তামঈযের মাধ্যমে শব্দের সম্ভাবনামূলক অর্থকে নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং طَالِقٌ শব্দটি কম ও বেশির সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এ সংখ্যার উল্লেখ ব্যাখ্যাস্বরূপ গণ্য হবে।

আমাদের দলিল হলো- طَالِقٌ শব্দটি একজনের অবস্থা বুঝায়। এ কারণে দু'স্ত্রীর জন্য বলা হয় طَالِقَانِ আর তিনজনের জন্য বলা হয় طَوَالِقُ। এতে সংখ্যার সম্ভাবনা নেই। কেননা সংখ্যা হলো মূল শব্দের অর্থের বিপরীত। আর কোনো বস্তু তার বিপরীত কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। এ কারণেই اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা দুই কিংবা তিন তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না।

وَالْعَدَدُ الَّذِى يَقْتَرِنُ بِهِ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلٰثًا كَقَوْلِكَ اَعْطَيْتُهُ جَزِيْلًا اَىْ اِعْطَاءً جَزِيْلًا وَلَوْ قَالَ اَنْتِ الطَّلَاقُ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ فَهِىَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَاِنْ نَوٰى ثَلٰثًا فَثَلٰثٌ وَ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ لِاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحْدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ فَاِذَا ذَكَرَهُ وَ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ وَاِنَّهُ يَزِيْدُهُ وِكَادَةً اَوْلٰى وَاَمَّا وُقُوْعُهُ بِاللَّفْظَةِ الْاُوْلٰى فَلِاَنَّ الْمَصْدَرَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْاِسْمُ يُقَالُ رَجُلٌ عَدْلٌ اَىْ عَادِلٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلٰى هٰذَا لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ اَيْضًا وَلَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى النِّيَّةِ وَيَكُوْنُ رَجْعِيًّا لِمَا بَيَّنَّا اَنَّهُ صَرِيْحُ الطَّلَاقِ لِغَلَبَةِ الْاِسْتِعْمَالِ فِيْهِ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ لِاَنَّ الْمَصْدَرَ يَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ وَالْكَثْرَةَ لِاَنَّهُ اِسْمُ جِنْسٍ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ فَيَتَنَاوَلُ الْاَدْنٰى مَعَ اِحْتِمَالِ الْكُلِّ .

অনুবাদ : আর এর সঙ্গে যুক্ত সংখ্যাটি উহ্য ক্রিয়ামূলের গুণ [সিফাত] -এর অর্থ হলো طَلَاقًا ثَلَاثًا [তিন তালাক]। যেমন– اَعْطَيْتُهُ جَزِيْلًا -এর অর্থ– اِعْطَاءً جَزِيْلًا আর যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا এবং তার কোনো [সুনির্দিষ্ট] নিয়ত না থাকে কিংবা এক অথবা দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের মাধ্যমে তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা সে যদি এককভাবে সিফাত উল্লেখ করত, তাহলে তা দ্বারা তালাক পতিত হতো। সুতরাং সে যখন সিফাত উল্লেখের পাশাপাশি ক্রিয়ামূল উল্লেখ করেছে, যা সিফাতের অর্থকে আরো শক্তিশালী করে, তখন তো তালাক পতিত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর প্রথম শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, ক্রিয়ামূল উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা বিশেষ্য উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়– رَجُلٌ عَدْلٌ -এর অর্থ رَجُلٌ عَادِلٌ। সুতরাং তা اَنْتِ طَالِقٌ -এর পর্যায়ে হয়ে গেল। এর উপর ভিত্তি করে [বলা হয়] কেউ যদি বলে– اَنْتِ طَالِقٌ তাহলে এর দ্বারাও তালাক পতিত হবে এবং নিয়তের প্রয়োজন হবে না। এটা তালাকে রাজ'ঈ হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করছি যে, এটা সুস্পষ্ট তালাক– অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে। আর তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে। কেননা ক্রিয়ামূল ব্যাপক ও আধিক্যের সম্ভাবনা রাখে। কারণ তা ইসমে জিনস সুতরাং সমস্ত ইসমে জিনসের উপর কিয়াস করা হবে। আর তাই আধিক্যের সাথে ন্যূনতমকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْعَدَدُ الَّذِيْ يَقْتَرِنُ بِهِ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। طَالِقٌ সিফাতের শব্দ। এটি ক্রিয়ামূলকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষেত্রে طَالِقٌ শব্দটি স্ত্রীর সিফাত তালাক পতিত হওয়া অর্থে; তালাক প্রদানের অর্থে নয়। আর সংখ্যার সম্ভাবনা তালাক প্রদান অর্থে طَلَاقٌ ক্রিয়ামূলে রয়েছে। সুতরাং طَلَاقٌ -এর উল্লেখ দ্বারা طَلَاقٌ -এর উচ্চারণের উপর প্রমাণ পেশ করা যথার্থ নয়।

আর اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا -এর মাঝে ثَلَاثًا তামঈয নয়; বরং উহ্য ক্রিয়ামূলের সিফাত। অর্থাৎ মূল বাক্য ছিল- اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا যেমন- اَعْطَيْتُهُ جَزِيْلًا বাক্যের মূল হলো- اَعْطَيْتُهُ اِعْطَاءً جَزِيْلًا

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ الطَّلَاقُ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا এ তিনভাবে তালাক দেয় এবং সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ত না করে, অথবা এক কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। দ্বিতীয় (اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ) ও তৃতীয় (اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا) শব্দাবলির মাধ্যমে তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্য। কেননা সে ব্যক্তি যদি শুধু সিফাতের শব্দ (طَالِقٌ) বলত, তাহলেও তালাক পতিত হতো। অথচ এ ক্ষেত্রে সে সিফাতের শব্দের সাথে ক্রিয়ামূল উল্লেখ করেছে, যা সিফাতের অর্থকে আরো সুদৃঢ় করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তালাক পতিত হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আর প্রথমটা (اَنْتِ اَلطَّلَاقُ) দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, অনেক সময় ক্রিয়ামূল দ্বারা বিশেষ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন- رَجُلٌ عَدْلٌ -এর দ্বারা رَجُلٌ عَادِلٌ বুঝানো হয়। তদ্রূপ এখানেও اَلطَّلَاقُ ক্রিয়ামূলের দ্বারা طَالِقٌ উদ্দেশ্য। সুতরাং اَنْتِ اَلطَّلَاقُ-এর অর্থ হলো اَنْتِ طَالِقٌ। আর এর মাধ্যমে তালাক পতিত হয় বলে اَنْتِ اَلطَّلَاقُ -এর দ্বারাও তালাক পতিত হবে।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- اَنْتِ اَلطَّلَاقُ শব্দাবলি যদি اَنْتِ طَالِقٌ -এর পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তিন তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা اَنْتِ طَالِقٌ -এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পতিত হবে না। সুতরাং اَنْتِ اَلطَّلَاقُ -এর দ্বারাও তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না।

উত্তর: এর উত্তর হলো, طَالِقٌ দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত সহীহ না হওয়ার কারণ হলো, তা একক সিফাতের শব্দ। পক্ষান্তরে اَلطَّلَاقُ শব্দটি মূলত ক্রিয়ামূল। সার্বিক দিক থেকে তা طَالِقٌ -এর পর্যায়ে নয়।

اَنْتِ اَلطَّلَاقُ -এর মাধ্যমে এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা তালাকের অর্থে তা অধিক ব্যবহৃত বলে সেটা সুস্পষ্ট তালাক। আর সুস্পষ্ট তালাকের মাধ্যমে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হয়। এ ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উপরিউক্ত শব্দাবলি দ্বারা স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করলে, তিন তালাক পতিত হবে। এর দলিল হিসেবে বলা হয়- তিনটি বাক্যে ক্রিয়ামূল (طَلَاقٌ) উল্লেখ আছে। আর ক্রিয়ামূল ব্যাপক ও আধিক্যের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কেননা, ক্রিয়ামূল হলো ইসমে জিন্‌স। এর দ্বারা সমস্ত ইসমে জিন্‌সের উপর কিয়াস করা হয়। সুতরাং ন্যূনতম [এক] ও সমগ্র [তিন] সব কিছুর সম্ভাবনা রাখে ক্রিয়ামূল। তবে দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না- এটি আমাদের অভিমত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উক্ত শব্দাবলি দ্বারা দুই তালাকের নিয়তও সহীহ হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হলো, দুই তিনের অংশ। সুতরাং তিনের নিয়ত সহীহ হলে, তার কিয়দংশের নিয়ত [দুই]-ও সহীহ হবে।

আমাদের দলিল হলো, ক্রিয়ামূল হচ্ছে ইসমে জিন্‌স। এখানে ইসমে জিনসের প্রকৃত একক- এক তালাক, আর বিধানগত একক- সমগ্র তথা তিন তালাক। দুই সংখ্যাটি প্রকৃত একক নয়, আবার বিধানগত এককও নয়। এজন্যই তিন তালাকের নিয়ত সহীহ হবে, কিন্তু দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না।

তবে দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে দুই হলো জিন্‌সের সামগ্রিক অর্থ। আর স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র সংখ্যা। আর ক্রিয়ামূলে সংখ্যার অর্থের সম্ভাবনা নেই। কেননা ক্রিয়ামূল হলো একত্বের শব্দ, যার মধ্যে এককের অর্থ বিবেচ্য। আর একত্বের অর্থ প্রকৃত একক ও বিধানগত এককের মধ্যে পাওয়া যায়। আর দুই সংখ্যাটি প্রকৃত একক ও বিধানগত এককের কোনোটিই নয়।

وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِيْهَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) هُوَ يَقُوْلُ اِنَّ الثِّنْتَيْنِ بَعْضَ الثَّلٰثِ فَلَمَّا صَحَّتْ نِيَّةُ الثَّلٰثِ صَحَّتْ نِيَّةُ بَعْضِهَا ضُرُوْرَةً وَنَحْنُ نَقُوْلُ نِيَّةُ الثَّلٰثِ اِنَّمَا صَحَّتْ لِكَوْنِهَا جِنْسًا حَتّٰى لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اَمَةً تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْجِنْسِيَّةِ اَمَّا الثِّنْتَانِ فِىْ حَقِّ الْحُرَّةِ عَدَدٌ وَاللَّفْظُ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَهٰذَا لِاَنَّ مَعْنَى التَّوَحُّدِ مُرَاعٰى فِىْ اَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ وَ ذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُثَنّٰى بِمَعْزِلٍ مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ وَقَالَ اَرَدْتُ بِقَوْلِىْ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِىْ اَلطَّلَاقَ اُخْرٰى يُصَدَّقُ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْاِيْقَاعِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَانِ اِذَا كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا .

অনুবাদ : আর বর্ণিত শব্দাবলি দ্বারা দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। তবে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, দুই তিনের কিয়দংশ। আর তাই যখন তিনের নিয়ত বিশুদ্ধ হয়েছে, তখন কিয়দংশের নিয়তও বিশুদ্ধ হবে আবশ্যিকভাবে। জবাবে আমরা বলি, তিনের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, তা জিনস [সমগ্র]। আর তাই দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়ত জিনসের সমগ্রের হিসেবে বিশুদ্ধ হয়। আর স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুই হলো সংখ্যা। শব্দ সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এটা এজন্য যে, একক শব্দাবলির ক্ষেত্রে 'এক'-এর অর্থ সন্নিবেশিত। আর তা فَرْدِيَّةٌ [এককত্ব] ও جِنْسِيَّةٌ [সমগ্রতা] -এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর 'দুই' উভয় থেকে ভিন্ন। আর যদি বলে- اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ এবং বলে, আমি আমার উক্তি طَالِقٌ দ্বারা এক তালাক ও اَلطَّلَاقَ দ্বারা অন্য আরেকটি তালাকের ইচ্ছা পোষণ করেছি, তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবে। কেননা এর প্রত্যেকটি শব্দ তালাক প্রদানের জন্য উপযুক্ত। যেন সে বলল- اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ। সুতরাং সহবাসকৃতার ক্ষেত্রে দুই তালাকে রাজ'ঈ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ اَلطَّلَاقَ বলে طَالِقٌ শব্দ দ্বারা এক তালাক এবং اَلطَّلَاقَ শব্দ দ্বারা আরেক তালাকের নিয়তের কথা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হবে এবং দুই তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। দলিল হলো, طَالِقٌ ও طَلَاقٌ শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটি طَلَاقٌ শব্দের জন্য উপযুক্ত। সুতরাং স্ত্রী যদি সহবাসহীনা হয়, তাহলে প্রথম শব্দ طَالِقٌ দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হবে, আর সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দ হবে অনর্থক। আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয়, তাহলে দুই তালাকে রাজ'ঈ হবে- একটি طَالِقٌ দ্বারা; অপরটি طَلَاقٌ দ্বারা। মূলত তার উক্তিটি এরূপ- اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ যেমন- اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ বাক্যটির প্রকৃত রূপ- اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ الطَّلَاقُ;

এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর। ফখরুল ইসলাম (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, এক তালাক পতিত হবে। -[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪: পৃষ্ঠা ১২]

وَإِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا اَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِاَنَّهُ أُضِيْفَ إِلَى مَحَلِّهِ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ لِاَنَّ التَّاءَ ضَمِيْرُ الْمَرْأَةِ اَوْ يَقُوْلُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ اَوْ عُنُقُكِ طَالِقٌ اَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ اَوْ رُوْحُكِ اَوْ بَدَنُكِ اَوْ جَسَدُكِ اَوْ فَرْجُكِ اَوْ وَجْهُكِ لِاَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ اَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا غَيْرُهُمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَقَالَ فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللّٰهُ الْفُرُوْجَ عَلَى السُّرُوْجِ وَيُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَ وَجْهُ الْعَرَبِ وَهَلَكَ رُوْحُهُ بِمَعْنٰى نَفْسِهِ وَمِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ الدَّمُ فِيْ رِوَايَةٍ يُقَالُ دَمُهُ هَدَرٌ وَمِنْهُ النَّفْسُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذٰلِكَ اِنْ طَلَّقَ جُزْءً شَائِعًا مِثْلُ يَقُوْلُ نِصْفُكِ اَوْ ثُلُثُكِ طَالِقٌ لِاَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلٌّ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَتَجَزّٰى فِيْ حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَثْبُتُ فِي الْكُلِّ ضَرُوْرَةً .

অনুবাদ : আর যদি তালাক শব্দটিকে তার [স্ত্রীর] সমগ্র সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে কিংবা এমন কোনো অঙ্গের সাথে যুক্ত করে, যার দ্বারা সমগ্র সত্তা বুঝানো হয়, তাহলে তালাক পতিত হবে। কেননা তালাককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার যথাস্থানের সাথে। যেমন– সে বলে, তুমি তালাকপ্রাপ্ত (اَنْتِ طَالِقٌ)। কেননা "تَاء" (اَنْتِ) সর্বনাম দ্বারা স্ত্রী বুঝায়। অথবা বলে, 'তোমার ঘাড় তালাক' কিংবা 'তোমার গলা তালাক' কিংবা 'তোমার মাথা তালাক' কিংবা 'তোমার আত্মা তালাক' কিংবা 'তোমার শরীর বা দেহ তালাক' কিংবা 'তোমার গুপ্তাঙ্গ তালাক' কিংবা 'তোমার মুখ তালাক'। কেননা এ শব্দাবলির দ্বারা সমগ্র দেহ বুঝানো হয়। শরীর বা দেহ শব্দটি তো স্পষ্ট। অন্যান্য শব্দগুলোও তদ্রূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ – "একটি গ্রীবা আজাদ করা।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন– فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ – "তাদের গলাসমূহ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَعَنَ اللّٰهُ الْفُرُوْجَ عَلَى السُّرُوْجِ যে লজ্জাস্থান অর্থাৎ, যে সব নারী অশ্বে আরোহণ করে, আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন। তাছাড়া [বাগধারায়] বলা হয়– فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ – "অমুক ব্যক্তি গোষ্ঠীর মাথা।" আরো বলা হয়– (فُلَانٌ) وَجْهُ الْعَرَبِ – "অমুক ব্যক্তি আরবের মুখমণ্ডল।" আরো বলা হয়– هَلَكَ رُوْحُهُ – 'তার প্রাণ শেষ হলো।' এক বর্ণনা মতে, 'রক্ত' শব্দটি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয়– دَمُهُ هَدَرٌ – "তার রক্তপণ মুক্ত।" তদ্রূপ নফস শব্দটি দ্বারা পূর্ণ সত্তা উদ্দেশ্য হওয়া স্পষ্ট। একই হুকুম হবে যদি সে বিস্তীর্ণ অংশকে তালাক দেয়। যেমন বলল– তোমার অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ তালাক। কেননা বিস্তীর্ণ অংশ বেচাকেনা ও অন্যান্য ব্যবহারিকের ক্ষেত্র। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্র রূপেও গণ্য হবে। তবে তালাকের ক্ষেত্রে যেহেতু খণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু অনিবার্যভাবে সর্বাংশে তালাক সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلٰى جُمْلَتِهَا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) আলোচ্য অংশে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হলো, তালাক শব্দটিকে স্ত্রীর সমগ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করলে কিংবা এমন কোনো অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত করলে যা দ্বারা সমগ্র সত্তা বুঝানো হয়, তালাক পতিত হবে। কেননা তালাককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যথাস্থান তথা স্ত্রীর সাথে। স্ত্রীর সমগ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্তকরণের উদাহরণ হলো– اَنْتِ طَالِقٌ। আর স্ত্রীর এমন কোনো অঙ্গের সাথে সম্পৃক্তকরণের উদাহরণ হলো– رَقَبَتُكِ طَالِقٌ [তোমার ঘাড় তালাক]; عُنُقُكِ طَالِقٌ [তোমার গলা তালাক]; رَأْسُكِ طَالِقٌ [তোমার মাথা তালাক]; وَجْهُكِ طَالِقٌ [তোমার মুখ তালাক]; رُوْحُكِ طَالِقٌ [তোমার আত্মা তালাক]; بَدَنُكِ طَالِقٌ [তোমার দেহ তালাক]; جَسَدُكِ طَالِقٌ [তোমার শরীর তালাক]; فَرْجُكِ طَالِقٌ [তোমার লজ্জাস্থান তালাক]।

اَنْتِ طَالِقٌ স্ত্রীর সমগ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হলো اَنْتِ [তুমি] সর্বনামটি দ্বারা স্ত্রীকে বুঝানো হয়। আর বর্ণিত শর্তাবলি দ্বারা সমগ্র সত্তাকে বুঝানো হয়। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, শরীর বা দেহ শব্দটি দ্বারা সমগ্র সত্তাকে যে বুঝানো হয়, তা সুস্পষ্ট। অনুরূপভাবে অন্যান্য শব্দগুলো দ্বারাও সমগ্র সত্তাকে বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ [একটি ঘাড় আজাদ করা –সূরা আন-নিসা : ৯২] -তে رَقَبَةٌ [ঘাড়] দ্বারা ذَاتُ الرَّقَبَةِ তথা গোলাম বুঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এসেছে– فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ "তাদের গলাসমূহ হয়ে গেল"... [সূরা শু'আরা : ৪]। এখানে اَعْنَاقٌ [ঘাড়] দ্বারা সত্তা বুঝানো হয়েছে। কেননা যদি আভিধানিক অর্থে তা ব্যবহৃত হতো, তাহলে আয়াতের পরবর্তী অংশে خَاضِعِيْنَ -এর স্থলে خَاضِعَةً হতো। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَعَنَ اللّٰهُ الْفُرُوْجَ عَلَى السُّرُوْجِ – "যে গুপ্তাঙ্গ অশ্বে আরোহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অভিসম্পাত করুন।" এখানে فُرُوْجٌ দ্বারা গুপ্তাঙ্গ উদ্দেশ্য নয়; বরং গুপ্তাঙ্গের অধিকারিণী উদ্দেশ্য। কেননা, অভিসম্পাত গুপ্তাঙ্গের উপর পড়ে না ; বরং নারীর উপর পড়ে।

হাদীসের মূলনীতির ব্যাখ্যায় এ হাদীসটি গরীব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে– نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَوَاتِ الْفُرُوْجِ اَنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوْجَ – "রাসূলুল্লাহ ﷺ গুপ্তাঙ্গের অধিকারিণীদের [নারীদের] অশ্বে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।" তাছাড়া বাগধারায় বলা হয়– فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ – "অমুক ব্যক্তি গোষ্ঠীর মাথা।" এখানে رَأْسٌ দ্বারা প্রধান বুঝানো হয়েছে। মাথা যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রধান, তেমনি সম্মানী ব্যক্তিও তার গোষ্ঠীর প্রধান হয়ে থাকে। আবার অন্য বাগধারায় এসেছে– فُلَانٌ وَجْهُ الْعَرَبِ – 'অমুক আরবের মুখমণ্ডল' তথা আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এখানে وَجْهٌ [মুখমণ্ডল] দ্বারা সম্মানিতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা সত্তাকে বুঝায়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে– وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ 'আর তোমার প্রতিপালকের সত্তা অবশিষ্ট থাকবে' [সূরা রহমান : ২৭]। আয়াতে وَجْهٌ [মুখমণ্ডল] দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। আবার বলা হয়– هَلَكَ رُوْحُهُ 'তার প্রাণ শেষ হলো' অর্থাৎ, সে শেষ হলো। এখানে رُوْحٌ দ্বারা সম্পূর্ণ সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ الدَّمُ : এক বর্ণনা মতে دَمٌ [রক্ত] শব্দটি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ, রক্ত দ্বারাও সমগ্র সত্তাকে বুঝানো হয়। যেমন বলা হয়– دَمُهُ هَدَرٌ 'তার রক্তপণ মুক্ত।' সুতরাং এ শব্দকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করলে তালাক পতিত হবে। অন্য বর্ণনা মতে তালাক পতিত হবে না।

অনুরূপভাবে نَفْسٌ [সত্তা] শব্দটি দ্বারা পূর্ণ সত্তা উদ্দেশ্য হওয়া সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اِنْ طَلَّقَ جُزْءًا الخ : যদি কেউ স্ত্রীর বিস্তীর্ণ অংশের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে, তাহলে তালাক পতিত হবে যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল– نِصْفُكِ طَالِقٌ – "তোমার অর্ধাংশ তালাক" ; ثُلُثُكِ طَالِقٌ – "তোমার এক-তৃতীয়াংশ তালাক"; رُبُعُكِ طَالِقٌ – "তোমার এক-চতুর্থাংশ তালাক"; سُدُسُكِ طَالِقٌ – "তোমার এক-ষষ্ঠাংশ তালাক" – এগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো, শরীর বিস্তীর্ণ অংশ– বিধানগতভাবে সমগ্ররূপে গণ্য হয়। বেচাকেনা ও অন্যান্য সব ব্যবহারিক বিষয়ের ক্ষেত্ররূপে বিবেচ্য হয়। আর তালাক যেহেতু একটি ব্যবহারিক বিষয়, সেহেতু তালাকের ক্ষেত্ররূপেও তা গণ্য হবে। তবে তালাককে খণ্ডিত করা যায় না বলে আবশ্যিকভাবে সর্বাংশে তালাক সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقَعُ وَكَذَا الْخِلَافُ فِىْ كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهٖ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ لَهُمَا اَنَّهٗ جُزْءٌ مُتَمَتَّعٌ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَمَا هٰذَا حَالُهٗ يَكُوْنُ مَحَلًّا لِحُكْمِ النِّكَاحِ فَيَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيْهِ قَضِيَّةً لِلْاِضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِىْ اِلَى الْكُلِّ كَمَا فِى الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِخِلَافِ مَا اِذَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ النِّكَاحُ لِاَنَّ التَّعَدِّىَ مُمْتَنِعٌ اِذِ الْحُرْمَةُ فِىْ سَائِرِ الْاَجْزَاءِ تَغْلِبُ الْحِلَّ فِىْ هٰذَا الْجُزْءِ وَفِى الطَّلَاقِ الْاَمْرُ عَلَى الْقَلْبِ وَلَنَا اَنَّهٗ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلٰى غَيْرِ مَحَلِّهٖ فَيَلْغُوْ كَمَا اِذَا اَضَافَهٗ اِلٰى رِيْقِهَا اَوْ ظُفْرِهَا وَهٰذَا لِاَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِاَنَّهٗ يُنْبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِى الْيَدِ وَلِهٰذَا لَا تَصِحُّ اِضَافَةُ النِّكَاحِ اِلَيْهِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ لِاَنَّهٗ مَحَلٌّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتّٰى تَصِحَّ اِضَافَتُهٗ اِلَيْهِ فَكَذَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ وَاخْتَلَفُوْا فِى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْاَظْهَرُ اَنَّهٗ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهٗ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ .

অনুবাদ : আর যদি বলে, তোমার হাত তালাক কিংবা তোমার পা তালাক, তাহলে তালাক পতিত হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তালাক পতিত হবে। অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে– যে সকল নির্ধারিত অঙ্গের দ্বারা সমগ্র দেহকে বুঝানো হয় না, সে সকল ক্ষেত্রে। তাঁদের দলিল হলো, এগুলো এমন অঙ্গ, যা বিবাহ-চুক্তির মাধ্যমে ভোগ করা হয়। আর যে সকল অঙ্গের এ অবস্থা সেগুলো বিবাহের বিধানের ক্ষেত্রের অন্তর্গত। সুতরাং তালাকেরও ক্ষেত্র হবে। আর তাই সম্বন্ধ সূত্রের চাহিদায় ঐ অংশটিতে তালাকের হুকুম সাব্যস্ত হবে। অতঃপর সমগ্র দেহ-সত্তায় তালাকের হুকুম বিস্তার লাভ করবে। যেমন বিস্তীর্ণ অংশের ক্ষেত্রে। আর নির্ধারিত অর্থের দিকে বিবাহের সম্বন্ধকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিস্তার লাভ করা অগ্রহণযোগ্য ও নিষিদ্ধ। কারণ অন্য সকল অঙ্গের হারাম হওয়া এ অঙ্গের হালাল হওয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করবে। অপর দিকে তালাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি এর বিপরীত।

আমাদের দলিল হলো, সে তালাককে সম্পৃক্ত করেছে, যা তার ক্ষেত্র নয়, সেদিকে। সুতরাং তা বাতিল হবে। যেমন স্ত্রীর থুথুর দিকে কিংবা নখের দিকে সম্পৃক্ত করলে বাতিল হয়। এর কারণ হলো, যেখানে বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তা-ই হবে তালাকের ক্ষেত্র। কেননা তালাক বন্ধন মুক্তির অর্থ প্রকাশ করে। আর হাতের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। এ কারণেই হাতের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে বিস্তীর্ণ অংশের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আমাদের মতে, তা বিবাহের ক্ষেত্র। এ কারণে বিস্তীর্ণ অংশের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ। তাই তা তালাকের ক্ষেত্র হবে। পেট ও পিঠকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। শক্তিশালী মত হলো, তালাক শুদ্ধ হবে না। কেননা এ দুটি শব্দ দ্বারা সমগ্র শরীর বুঝানো হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ اَوْ رِجْلُكِ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে 'তোমার হাত তালাক' কিংবা 'তোমার পা তালাক', তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা হাত-পা এমন সকল নির্ধারিত অঙ্গ, যার দ্বারা সমগ্র দেহকে বুঝানো হয় না। তবে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, তালাক পতিত হবে। মূলত মতপার্থক্য হলো, যে সকল নির্ধারিত অঙ্গের দ্বারা সমগ্র দেহ অভিব্যক্ত হয় না, সে সকল অঙ্গকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করলে তালাক হবে কিনা? এ ক্ষেত্রে আহনাফের মত হলো, তালাক হবে না। আর ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত হলো, তালাক পতিত হবে।

তাঁদের দলিল হলো, নির্ধারিত অঙ্গ [হাত, পা, নখ, চুল] দ্বারা বিবাহ-চুক্তির মাধ্যমে ভোগ করা যায়। আর যে সকল অঙ্গ দ্বারা বিবাহ-চুক্তির মাধ্যমে ভোগ করা যায়, সেগুলো বিবাহ বিধানের ক্ষেত্ররূপে বিবেচ্য হয়। আর সে সকল অঙ্গ তালাকেরও ক্ষেত্র হয়। সুতরাং সম্বন্ধ সূত্রের চাহিদায় ঐ অঙ্গটিতে তালাকের হুকুম সাব্যস্ত হবে। অতঃপর সমগ্র দেহে তালাকের হুকুম বিস্তৃত হবে। যেমন বিস্তীর্ণ অংশের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে সর্বাংশে তালাক সাব্যস্ত হয়।

প্রশ্ন: এ বক্তব্যের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবাহ বিধানের ক্ষেত্ররূপে বিবেচ্য হয়, তাহলে এগুলোকে বিবাহের সাথে সম্বন্ধীকরণের দ্বারা বিবাহ হবে; অথচ তাঁরাও এ বিষয়টির পক্ষে নয়।

উত্তর: তাঁদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, নির্ধারিত অঙ্গের দিকে বিবাহের সম্বন্ধীকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এর ফলে ঐ নির্ধারিত অঙ্গের হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে, আর অন্যান্য অঙ্গগুলো হারাম হবে। হালাল হওয়ার বিষয়টি অবশিষ্ট অঙ্গগুলোতে বিস্তৃত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা অন্য সকল অঙ্গের হারাম হওয়ার বিষয়টি এ অঙ্গের হালাল হওয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করে। তবে তালাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যখন নির্ধারিত কোনো অঙ্গকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন সে অঙ্গে হারাম সাব্যস্ত হয়। অবশিষ্ট সকল অঙ্গ হালাল। আর হালাল ও হারাম একত্র হলে হারাম প্রাধান্য পাবে। এ কারণেই তাঁদের [ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী (র.)] অভিমত হলো, হাত-পা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করলে সমগ্র দেহে তা বিস্তৃত হয়ে তালাক পতিত হবে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

আমাদের দলিল হলো, যে সকল নির্ধারিত অঙ্গ দ্বারা সমগ্র দেহ অভিব্যক্ত হয় না, সে সকল অঙ্গকে তালাকের সাথে সম্বন্ধীকরণের ফলে তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো, এগুলো তালাকের ক্ষেত্র নয়। সুতরাং তালাক বাতিল হবে। যেমন– স্ত্রীর থুথু কিংবা নখের দিকে তালাককে সম্পৃক্ত করলে, তা বাতিল বলে গণ্য হয়। হাত, পা– এ জাতীয় অঙ্গগুলো তালাকের ক্ষেত্র নয়। কেননা যেখানে বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে তা-ই হবে তালাকের ক্ষেত্র। কারণ তালাক বন্ধন মুক্তির অর্থ প্রকাশ করে। আর হাত, পা– এ জাতীয় অঙ্গের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। এজন্যই এগুলোর দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ নয়। তবে বিস্তীর্ণ অংশের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা বিবাহের ক্ষেত্র। এ কারণে বিস্তীর্ণ অংশের দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করা শুদ্ধ তাই বিস্তীর্ণ অংশ তালাকেরও ক্ষেত্ররূপে বিবেচ্য হবে।

কেউ যদি হাতকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করে হাত দ্বারা ব্যক্তি সত্তাকে উদ্দেশ্য করে; যেমন– কুরআন মাজীদে এসেছে (ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ - سُوْرَةُ الْحَجِّ : ١٠) আয়াতে يَدٌ দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে; আর এ ধরনের সম্বন্ধীকরণের ফলে প্রচলিত অর্থে সমগ্র বুঝালে তালাক পতিত হবে। এ কারণেই ফারসিতে তালাক দিলে তালাক হবে। তবে কোনো আরবি ভাষা-ভাষী [যে ফারসি বুঝে না] ফারসিতে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। –[ফাতহুল কাদীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে পেট ও পিঠকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে– ظَهْرُكِ طَالِقٌ [তোমার পিঠ তালাক]; بَطْنُكِ طَالِقٌ [তোমার পেট তালাক], তাহলে তালাক পতিত হবে কিনা, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, তালাক পতিত হবে। কেননা পেট দ্বারা সত্তা বুঝাবে– এটি ছাড়া বিবাহ সম্ভব নয় বলে। অপর দিকে পিঠ দ্বারা যে সমগ্র দেহ বুঝানো হয় তার প্রমাণ হলো, হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى এখানে ظَهْر শব্দটি দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এগুলো দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কেননা এ শব্দ দুটি দ্বারা সমগ্র দেহ বুঝানো হয় না। এ কারণেই বলা হয়, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– ظَهْرُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তাহলে যিহারকারী বলে গণ্য হবে না।

وَإِنْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ طَالِقًا تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّى وَ ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّى كَذِكْرِ الْكُلِّ وَكَذَا الْجَوَابُ فِيْ كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلٰثًا لِأَنَّ نِصْفَ التَّطْلِيْقَتَيْنِ تَطْلِيْقَةٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلٰثَةِ أَنْصَافٍ تَكُوْنُ ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ ضَرُوْرَةً وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيْقَةٍ قِيْلَ يَقَعُ تَطْلِيْقَتَانِ لِأَنَّهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ فَتَتَكَامَلُ وَقِيْلَ يَقَعُ ثَلٰثُ تَطْلِيْقَاتٍ لِأَنَّ كُلَّ نِصْفٍ يَتَكَامَلُ فِيْ نَفْسِهَا فَيَصِيْرُ ثَلٰثًا .

অনুবাদ : যদি স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক বা তৃতীয়াংশ তালাক দেয়, তাহলে সে এক তালাকপ্রাপ্ত হবে। কেননা তালাক খণ্ডিত হয় না, আর যা খণ্ডিত হয় না তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা পূর্ণটির উল্লেখ করার ন্যায়। একই হুকুম হবে তালাকের যে-কোনো খণ্ডিত অংশ উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যদি সে স্ত্রীকে বলে, তুমি দুই তালাকের দুই অর্ধেক তালাক, তাহলে সে তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে। কেননা দুই তালাকের অর্ধেক হলো এক তালাক। আর যখন সে তিনটি অর্ধেককে একত্র করেছে, তখন আবশ্যিকভাবেই তিন তালাক হবে। আর যদি বলে, তুমি এক তালাকের তিন অর্ধেক তালাক, তাহলে কোনো কোনো মতে, দুই তালাক পতিত হবে। কেননা এর অর্থ এক তালাক ও অর্ধ-তালাক। সুতরাং অর্ধ-তালাক দ্বারা পূর্ণ তালাক সাব্যস্ত হবে। আর কেউ কেউ বলেন, এতে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা প্রতিটি অর্ধ তালাক নিজস্বভাবে পূর্ণ তালাক হবে। সুতরাং তিন তালাক হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক দেয় কিংবা এক-তৃতীয়াংশ তালাক দেয়, তাহলে পূর্ণ তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো, তালাক খণ্ডিত হয় না। আর মূলনীতি হলো, যা খণ্ডিত হয় না তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা পূর্ণটির উল্লেখ করার ন্যায়। সুতরাং অর্ধেক তালাক কিংবা এক-তৃতীয়াংশের উল্লেখ এক তালাকের উল্লেখের মতো। আর তাই এসব শব্দ দ্বারা পূর্ণ এক তালাক পতিত হবে। কেননা, এর ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের কথাবার্তা অনর্থক হয় না এবং হারাম হওয়ার বিষয়টি উদ্দিষ্ট অঙ্গের হালাল হওয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثَةَ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيْقَتَيْنِ [তোমার প্রতি দুই তালাকের তিন অর্ধেক তালাক], তাহলে স্ত্রীর উপর তিনটি তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো, দুই তালাকের অর্ধেক হলো এক তালাক। দ্বিতীয় অর্ধ দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্ধ দ্বারা তৃতীয় তালাক পতিত হবে। তিনটি অর্ধেককে যখন সে একত্র করেছে, তখন আবশ্যিকভাবে তিন তালাক পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় তালাকটি পতিত হবে না। কেননা দুই তালাকের তিন অর্ধ– এক তালাক ও অর্ধ তালাক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কারণ দুই তালাককে অর্ধেক করে ভাগ করলে চারটি অর্ধ তালাক পাওয়া যায়। সুতরাং তিন অর্ধ দ্বারা এক তালাক ও অর্ধ তালাক হবে। আর তাই দুটি তালাক পতিত হবে। –এ যুক্তি যথার্থ নয়। –[ফাতহুল কাদীর; খণ্ড ৪, পৃ. ১৬]

আর যদি স্ত্রীকে বলে "أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيْقَةٍ" – 'তোমার প্রতি এক তালাকের তিন অর্ধেক তালাক', তাহলে কোনো কোনো বর্ণনা মতে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা এখানে এক তালাকের তিন অর্ধেককে একত্র করা হয়েছে। সুতরাং সেটা এক তালাক ও অর্ধ তালাক হবে। আর তালাক খণ্ডিত হয় না, তাই অর্ধেক তালাককে পূর্ণ এক তালাক ধরা হবে। অতএব দুই তালাক হয়ে গেল। আবার কেউ কেউ বলেন, এতে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রত্যেক অর্ধ স্বতন্ত্রভাবে এক বলে তিন অর্ধ তিন তালাক হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلَى ثِنْتَيْنِ اَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَاِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلَى ثَلْثٍ اَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلَى ثَلْثٍ فَهِىَ ثِنْتَانِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا فِى الْاُوْلٰى هِىَ ثِنْتَانِ وَفِى الثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ وَقَالَ زُفَرُ (رح) فِى الْاُوْلٰى لَا يَقَعُ شَئٌ وَفِى الثَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوْبِ لَهُ الْغَايَةُ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ مِنْ هٰذَا الْحَائِطِ اِلَى هٰذَا الْحَائِطِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الْاِسْتِحْسَانُ اَنَّ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامِ مَتٰى ذُكِرَ فِى الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ كَمَا تَقُوْلُ لِغَيْرِكَ خُذْ مِنْ مَالِى مِنْ دِرْهَمٍ اِلَى مِائَةٍ وَلِاَبِى حَنِيْفَةَ (رح) اِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْاَكْثَرُ مِنَ الْاَقَلِّ وَالْاَقَلُّ مِنَ الْاَكْثَرِ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ سِنِّىْ مِنْ سِتِّيْنَ اِلَى سَبْعِيْنَ وَمَا بَيْنَ سِتِّيْنَ اِلَى سَبْعِيْنَ وَيُرِيْدُوْنَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاِرَادَةُ الْكُلِّ فِيْمَا طَرِيْقُهُ طَرِيْقُ الْاِبَاحَةِ كَمَا ذَكَرَا وَالْاَصْلُ فِى الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ ثُمَّ الْغَايَةُ الْاُوْلٰى لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ مَوْجُوْدَةً لِتَرَتُّبِ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَ وُجُوْدُهَا بِوُقُوْعِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَوٰى وَاحِدَةً يُدَيَّنُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِاَنَّ مُحْتَمِلُ كَلَامِهِ لٰكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

অনুবাদ : যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি এক থেকে দুই পর্যন্ত তালাক কিংবা এক থেকে দু'য়ের মধ্যবর্তী তালাক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে, এক থেকে তিন পর্যন্ত তালাক কিংবা এক থেকে তিনের মধ্যবর্তী তালাক, তাহলে দুই তালাক হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রথমটির ক্ষেত্রে দুই তালাক এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তিন তালাক হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, প্রথমটির ক্ষেত্রে তালাকই পতিত হবে না; আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এক তালাক হবে। এটিই কিয়াস। কেননা শেষ সীমা সে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যার জন্য সীমা নির্ধারিত হয়। যেমন কেউ যদি বলে, আমি তোমার নিকট এই দেয়াল থেকে এই দেয়াল পর্যন্ত বিক্রি করলাম। সাহেবাইনের দলিল হলো, এটাই সূক্ষ্ম কিয়াস। যখন এ ধরনের কথা বলা হয় তখন সাধারণ প্রচলনে সমগ্র উদ্দেশ্য হয়। যেমন– তুমি কাউকে বললে, তুমি আমার মালের এক দিরহাম একশ পর্যন্ত নাও। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– এ ধরনের উক্তির অর্থ হচ্ছে সর্বনিম্ন পরিমাণ থেকে অধিক এবং সর্বাধিক পরিমাণ থেকে কম। কেননা লোকে বলে, আমার বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত কিংবা ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে এ কথার দ্বারা আমাদের উল্লিখিত অর্থ উদ্দেশ্য। আর সমগ্রের উদ্দেশ্য হয় ঐ ক্ষেত্রে যেখানে বৈধ বিষয়ের পথ অনুসরণ করা হয়, যেমন সাহেবাইনের উল্লিখিত ক্ষেত্রে হয়েছে। আর নিষিদ্ধতাই হলো তালাকের মূল বিষয়। আর প্রথম সীমাটি বিদ্যমান থাকা অনিবার্য– দ্বিতীয় সীমাটি তার উপর কার্যকর করার জন্য। আর তা সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করবে। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে উল্লিখিত সীমা বিক্রয়ের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে দীনি বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সেটা তার উক্তির সম্ভাবনাভুক্ত রয়েছে। তবে তা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ الخ : এখানে দু'টি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- "اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثِنْتَيْنِ - 'তোমার প্রতি এক থেকে দুই পর্যন্ত তালাক' কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثِنْتَيْنِ" 'তোমার প্রতি এক থেকে দুই পর্যন্ত -এর মধ্যবর্তী তালাক' তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এক তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, কোনো তালাকই পতিত হবে না। ২. আর কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثَلَاثٍ - 'তোমার প্রতি এক থেকে তিন পর্যন্ত তালাক' কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ اِلٰى ثَلَاثٍ - 'তোমার প্রতি এক থেকে তিন পর্যন্ত -এর মধ্যবর্তী তালাক।' তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তিন তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, এক তালাক পতিত হবে।

এ মাসআলাদ্বয়ে মতপার্থক্যের মূল কারণ হলো, স্বামীর উক্তিতে প্রাথমিক সীমা ও শেষ সীমার উল্লেখ আছে। যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (مُغَيَّا) -এর মধ্যে উভয় ধরনের সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে কিংবা কোনোটিই অন্তর্ভুক্ত হবে না কিংবা প্রাথমিক সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে না; কিংবা শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু প্রাথমিক সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে না। বর্ণিত এ চারটি সুরতের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রথমটির পক্ষে তথা যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (مُغَيَّا) তার মধ্যে প্রাথমিক ও শেষ উভয় ধরনের সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম যুফার (র.) দ্বিতীয় সুরতের কথা বলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কোনো সীমাই অন্তর্ভুক্ত হবে না। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তৃতীয় সুরত গ্রহণীয় তথা যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে- তার মাঝে প্রাথমিক সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর চতুর্থ সুরত কারো নিকটই গ্রহণীয় নয়।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে সীমা অর্ন্তভুক্ত নয়। যেমন কেউ যদি বলে, আমি তোমার নিকট এই দেয়াল থেকে এই দেয়াল পর্যন্ত বিক্রি করলাম, তাহলে উভয় দেয়াল বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম যুফার (র.) -এর এ ধরনের মতের [যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে সীমা অন্তর্ভুক্ত নয়] প্রেক্ষিতে তাঁকে একবার ইমাম আবূ হানীফা (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বয়স কত? উত্তরে ইমাম যুফার (র.) বললেন- مَا بَيْنَ سِتِّيْنَ اِلٰى سَبْعِيْنَ 'ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে হবে।' ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, তাহলে তো আপনার বয়স নয় বছর। এ কথা শুনে ইমাম যুফার (র.) একটু চমকে উঠলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল – যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে সীমা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তো প্রাথমিক সীমা ৬০ ও শেষ সীমা ৭০ উভয়টিকে বাদ দিলে নয় বছর হয়। ইমাম যুফার (র.) -এর ভুলের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমন উত্তর দিয়েছেন। আল্লামা 'আইনী (র.) এ ঘটনার বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর স্থলে আবূ জাফরের নাম উল্লেখ করেন। ফখরুল ইসলাম (র.) -এর বর্ণনানুসারে এ ঘটনা ঘটেছিল বাদশাহ রশীদের দরবারে আসমা'ঈ ও ইমাম যুফার (র.) -এর মধ্যে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, সাধারণ প্রচলনে এ ধরনের বাক্যের দ্বারা সমগ্রটুকু উদ্দেশ্য হয়। যেমন কেউ অপর কাউকে যদি বলে- 'তুমি আমার মালের এক দিরহাম থেকে একশ পর্যন্ত নাও।' তাহলে সে একশ দিরহাম পুরোটাই নিতে পারবে। এ থেকে বুঝা যায়, যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রাথমিক ও শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত। আর তাই বর্ণিত প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে দুই তালাক পতিত হবে, আর দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, যদি প্রাথমিক সীমা ও শেষ সীমায় সংখ্যা থাকে আর উভয় সীমার মাঝে কোনো সংখ্যার ব্যবধান থাকে তাহলে সর্বনিম্ন পরিমাণ থেকে অধিক সংখ্যাটি উদ্দেশ্য হবে। যেমন– দ্বিতীয় মাসআলায় مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ -'এক' ও 'তিন' সীমার মাঝে এক সংখ্যার ব্যবধান আছে। এ উদাহরণে সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো এক। এক থেকে অধিক তথা এর পরের সংখ্যাটি হলো দুই। এই 'দুই' হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ থেকে অধিক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি উভয় সীমার মাঝে সংখ্যার ব্যবধান না থাকে, তাহলে সর্বাধিক পরিমাণ থেকে কম উদ্দেশ্য হবে। যেমন– প্রথম মাসআলায় مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ - উভয় সীমার [এক ও দুই] মাঝে সংখ্যার কোনো ব্যবধান না থাকায় সর্বাধিক পরিমাণ দুই থেকে কম এক উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, লোকে বয়স বলার সময় এভাবে প্রকাশ করে– 'আমার বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত কিংবা ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত -এর মধ্যে।' এর দ্বারা উভয়ের মাঝামাঝি বুঝানো হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিলের জবাব হলো, দু'টি সীমা উল্লেখ করা থাকলে সাধারণ প্রচলনে সমগ্রটুকু উদ্দেশ্য হয় বৈধ কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে। যেমন বর্ণিত উদাহরণে দিরহাম গ্রহণ একটি বৈধ বিষয়। তাই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এক দিরহাম থেকে একশ পর্যন্ত গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই মূল বিষয়। সুতরাং তালাকের মাসআলাকে উক্ত বিষয়ের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়।

আর ইমাম যুফার (র.) -এর দলিলের জবাব হলো– দ্বিতীয় সীমাটি কার্যকর হওয়ার জন্য প্রথম সীমাটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর প্রথম সীমাটির অস্তিত্ব তখনই হবে, যখন তা সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই বলা হয়, প্রথম সীমাটি অন্তর্ভুক্ত হবে। আর বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাটি বিক্রয়ের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং দেয়াল বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় সীমা পূর্ব থেকে বিদ্যমান নয়। অথচ সেটা থাকা আবশ্যক, যাতে দ্বিতীয় সীমাটি কার্যকর করা যায়। আর তা সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করবে। এ কারণেই প্রথম সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً يُدَيَّنُ دِيَانَةً الخ : আর যদি أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ বলে এক তালাকের নিয়ত করে তাহলে دِيَانَةً তথা দীনি বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু قَضَاءً তথা আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার কথায় এক তালাকের সম্ভাবনা থাকলেও সেটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থি সম্ভাবনা দীনি বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِيْ ثِنْتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ اَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) تَقَعُ ثِنْتَانِ لِعُرْفِ الْحِسَابِ وَهُوَ قَوْلُ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ (رحـ) وَلَنَا اَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِيْ تَكْثِيْرِ الْاَجْزَاءِ لَا فِيْ زِيَادَةِ الْمَضْرُوْبِ وَ تَكْثِيْرُ اَجْزَاءِ التَّطْلِيْقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا فَاِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَهِيَ ثَلٰثٌ لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فَاِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ وَالظَّرْفُ يُجْمَعُ اِلَى الْمَظْرُوْفِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَاِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الثَّلَاثُ لِاَنَّ كَلِمَةَ فِيْ تَاْتِيْ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ اَيْ مَعَ عِبَادِيْ وَلَوْ نَوَى الظَّرْفَ يَقَعُ وَاحِدَةٌ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا فَيَلْغُوْ ذِكْرُ الثَّانِيْ وَلَوْ قَالَ اِثْنَتَيْنِ فِيْ اِثْنَتَيْنِ وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ فَهِيَ ثِنْتَانِ وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) ثَلٰثٌ لِاَنَّ قَضِيَّتَهُ اَنْ يَكُوْنَ اَرْبَعًا لٰكِنْ لَا مَزِيْدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلٰثِ وَعِنْدَنَا الْاِعْتِبَارُ لِلْمَذْكُوْرِ الْاَوَّلِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : আর যদি বলে, তুমি দু'য়ের মাঝে এক তালাক আর সে 'গুণ' উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা তার কোনো নিয়ত না থাকে তাহলে এক তালাক হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, প্রচলিত অর্থের হিসেবে দুই তালাক পতিত হবে। এটি ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদেরও অভিমত। আমাদের দলিল হলো, গুণের কাজ হচ্ছে বস্তুর অংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে; গুণকৃত বস্তুকে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়। আর একটি তালাকের অংশ বৃদ্ধি তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে না। আর যদি এক তালাক কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা তা এ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কারণ وَاوٌ [এবং] অব্যয়টি একত্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ظَرْفٌ [পাত্র] مَظْرُوْفٌ [পাত্রস্থ বস্তু] -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর স্ত্রী যদি সহবাসহীনা হয়, তাহলে একটি তালাক পতিত হবে। যেমন সে বলল, এক তালাক ও দুই তালাক। আর যদি দু'য়ের সাথে এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা فِيْ [মাঝে] শব্দটি مَعَ [সাথে] অর্থেব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ – 'আমার বান্দাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হও' অর্থাৎ, আমার বান্দাদের সাথে মিলে যাও। আর যদি পাত্র উদ্দেশ্য করে, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা তালাক পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং দ্বিতীয়টার উল্লেখ বাতিল হবে। আর যদি বলে, দু'য়ের মাঝে দুই তালাক এবং অংকের গুণ নিয়ত করে তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তিন তালাক পতিত হবে। কেননা গুণের দাবি হলো চার তালাক হওয়া। কিন্তু তিনের অধিক তালাকের সংখ্যা নেই। আমাদের নিকট উল্লিখিত প্রথম অংশটুকুই শুধু বিবেচ্য– আমরা যা বর্ণনা করেছি তার ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِىْ ثِنْتَيْنِ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِىْ ثِنْتَيْنِ 'তুমি দু'য়ের মাঝে এক তালাক' আর এর দ্বারা সে অংকের 'গুণ' উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা তার কোনো নিয়ত না থাকে, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, দুই তালাক পতিত হবে। এটি ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর অভিমত। তাঁর দলিল হলো, গণিতবিদদের নিকট প্রচলিত অর্থ এটাই। কেননা এ ধরনের বাক্য দ্বারা সাধারণত গুণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর 'এক'-কে 'দুই' দ্বারা গুণ করলে দুই তালাক পতিত হবে।

আমাদের দলিল হলো, বস্তু দুই প্রকার– ১. যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা আছে। যেমন– শরীর। ২. যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কোনোটিই নেই। যেমন– স্পর্শহীন বস্তু, যেসব বস্তুকে স্পর্শ করা যায় না। প্রথম প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে গুণ করার দ্বারা গুণকৃত বস্তুর বৃদ্ধি ঘটে আর দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে গুণের দ্বারা বস্তুর অংশের বৃদ্ধি ঘটে; গুণকৃত বস্তুর নয়। তালাক এ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে তালাকের অংশ বৃদ্ধি পাবে গুণের দ্বারা। আর তালাকের অংশ বৃদ্ধি তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে না। এক তালাককে বিভিন্ন অংশ করে তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে। যেমন– কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفُهَا وَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا – 'তুমি তালাক অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশ', তাহলে এক তালাকই পতিত হবে।' –[আল-বিনায়া, খণ্ড ৫; পৃষ্ঠা ৫১]

আর যদি সে নিয়ত করে– এক তালাক এবং দুই তালাক, তাহলে তিন তালাকই সাব্যস্ত হবে। কেননা, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِىْ ثِنْتَيْنِ -এর মাঝে এ অর্থের সম্ভাবনা আছে। কারণ وَاوْ [এবং] অব্যয়টি একত্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ظَرْف বা পাত্রকে مَظْرُوْف বা পাত্রস্থ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে। সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ বিধান। সহবাসহীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হবে।

আর যদি اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِىْ ثِنْتَيْنِ দ্বারা مَعَ ثِنْتَيْنِ [তুমি দুই সংযুক্ত এক তালাক] নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা فِىْ [মধ্যে] অব্যয়টি مَعَ [সাথে] অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কুরআন মাজীদে এসেছে– وَاحِدَةً فِىْ ثِنْتَيْنِ [দু'য়ের মাঝে এক] দ্বারা পাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা তালাক অন্যের পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং فِىْ ثِنْتَيْنِ [দু'য়ের মাঝে] কথাটির উল্লেখ বাতিল বলে গণ্য হবে। وَاحِدَةً [এক] -এর মাধ্যমে এক তালাক পতিত হবে।

আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اِثْنَتَيْنِ فِىْ اِثْنَتَيْنِ [তুমি দু'য়ের মাঝে দুই তালাক] এবং অংকের হিসাবে গুণের নিয়ত করে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তিন তালাক পতিত হবে। তাঁর দলিল হলো, গুণের হিসেবে এ বক্তব্যের দাবি হলো, চার তালাক পতিত হওয়া। কিন্তু তিনের অধিক তালাকের সংখ্যা নেই, বিধায় তিন তালাকই পতিত হবে। আমাদের দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে স্বামীর উল্লিখিত উক্তির প্রথম অংশ গ্রহণযোগ্য হবে, আর সেটা হলো দুই তালাক।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هٰهُنَا اِلَى الشَّامِ فَهِىَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) هِىَ بَائِنَةٌ لِاَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّوْلِ قُلْنَا لَا بَلْ وَصَفَهُ بِالْقِصَرِ لِاَنَّهُ مَتٰى وَقَعَ وَقَعَ فِى الْاَمَاكِنِ كُلِّهَا وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ اَوْ فِىْ مَكَّةَ فَهِىَ طَالِقٌ فِى الْحَالِ فِىْ كُلِّ الْبِلَادِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِى الدَّارِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانٍ دُوْنَ مَكَانٍ وَاِنْ عَنٰى بِهٖ اِذَا اَتَيْتِ مَكَّةَ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِاَنَّهُ نَوَى الْاِضْمَارَ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ - وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَكَّةَ لِاَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالدُّخُوْلِ وَلَوْ قَالَ فِىْ دُخُوْلِكِ الدَّارَ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لِمُقَارَنَةٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الظَّرْفِيَّةِ -

অনুবাদ : আর যদি সে বলে, তুমি এখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তালাক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে. আর সে রাজ'আতের মালিক হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তা বায়েন তালাক হবে। কেননা সে তালাককে দৈর্ঘ্যের সাথে গুণান্বিত করেছে। আমরা বলি, না; বরং সে সীমাবদ্ধতার সাথে গুণান্বিত করেছে। কেননা তালাক যখন পতিত হয়, তখন সর্বত্রই পতিত হয়। আর যদি বলে, তুমি মক্কায় কিংবা মক্কার মধ্যে তালাক, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ তালাকপ্রাপ্তা হবে– সকল দেশের জন্যই কার্যকর হবে। তদ্রূপ যদি বলে, তুমি ঘরের মধ্যে তালাক। কেননা তালাক কোনো স্থান বাদ দিয়ে কোনো স্থানের সাথে বিশিষ্ট হয় না। আর যদি সে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করে থাকে– যখন তুমি মক্কায় পৌছবে, তখন তালাক হবে; তাহলে দীনি বিচারে বিশ্বাস করা হবে, কিন্তু আদালতের বিচারে নয়। কেননা সে অন্তর্নিহিত অর্থের নিয়ত করেছে, যা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর যদি বলে, যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তুমি তালাক। তাহলে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা সে তালাককে প্রবেশের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর যদি বলে, তোমার ঘরে প্রবেশের মাঝে তালাক, তাহলে তালাক ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। কেননা شَرْط [শর্ত] ও ظَرْف [পাত্র] এর মাঝে মিল রয়েছে। সুতরাং পাত্রের অর্থ অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তের অর্থ প্রযোজ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هٰهُنَا الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هٰهُنَا اِلَى الشَّامِ [তুমি এখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তালাক], তাহলে আমাদের মতে এক তালাক রাজ'ঈ সাব্যস্ত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, এক তালাক বায়েন সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, তালাককে দৈর্ঘ্য গুণের সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর দৈর্ঘ্য দৃঢ়তার অর্থ দেয়। আর দৃঢ়তা ও শক্তিশালীর অর্থটি বায়েন তালাকের মধ্যে পাওয়া যায়; তালাক রাজ'ঈ -এর ক্ষেত্রে সেটা বিদ্যমান নয়। এ কারণেই এক তালাক বায়েন সাব্যস্ত হবে।

আমাদের বক্তব্য হলো– বিষয়টি এরূপ নয়; বরং তালাককে সিরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে সে ব্যক্তি তালাককে সীমাবদ্ধ করেছে। সে একটি নির্দিষ্ট জায়গার সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করেছে। কেননা যখন সে শুধু أَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] উল্লেখ করত, তখন শুধু সিরিয়া নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সাব্যস্ত হতো। সুতরাং তালাককে দৈর্ঘ্য গুণের সাথে গুণান্বিত করার বিষয়টি যথার্থ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الدَّارِ 'তুমি মক্কায় কিংবা মক্কার মধ্যে অথবা ঘরের মধ্যে তালাক', তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে এক তালাক পতিত হবে, যদিও সে মক্কায় কিংবা ঘরে না থাকে। কেননা তালাক কোনো স্থানকে বাদ দিয়ে কোনো স্থানের সাথে বিশিষ্ট হয় না। সর্বত্র ও সব জায়গার জন্যই তালাক কার্যকর হয়। আর যদি এরূপ নির্দিষ্ট স্থানের সাথে তালাককে বিশিষ্ট করার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়– যখন ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে, তখন তালাক হবে, তাহলে দীনি বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হলেও আদালতের বিচারে, গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ ধরনের অন্তর্নিহিত নিয়ত বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত নিয়তের কারণে দীনি বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে, তবে আদালতের বিচারে সে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ – 'তুমি মক্কায় প্রবেশ করলে তালাক', তাহলে মক্কায় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত সে তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কেননা স্বামী তালাককে মক্কায় প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর তাই মক্কায় প্রবেশ করলে সে তালাক হবে। আর যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِكِ الدَّارَ – 'তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করার মাঝে তালাক', তাহলে তালাক ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যখন সে ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সে তালাক হবে। কেননা প্রবেশ করা তালাকের পাত্র হতে পারে না। আর এ সম্ভবের কারণে পাত্রকে শর্তের অর্থে নেওয়া হয়েছে। কেননা শর্ত (شَرْط) ও পাত্র (ظَرْف) -এর মাঝে মিল আছে। যেমন শর্ত শর্তযুক্ত কিছুর পূর্বে হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে পাত্রও পাত্রস্থের পূর্বে হয়ে থাকে।

فَصْلٌ فِىْ اِضَافَةِ الطَّلَاقِ اِلَى الزَّمَانِ

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ لِاَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِىْ جَمِيْعِ الْغَدِ وَ ذٰلِكَ بِوُقُوْعِهِ فِىْ اَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَوْ نَوٰى بِهِ اٰخِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِاَنَّهُ نَوٰى التَّخْصِيْصَ فِى الْعُمُوْمِ وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ وَكَانَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا اَوْ غَدًا الْيَوْمَ فَاِنَّهُ يُؤْخَذُ بِاَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِىْ تَفَوَّهَ بِهِ فَيَقَعُ فِى الْاَوَّلِ فِى الْيَوْمِ وَفِى الثَّانِىْ فِى الْغَدِ لِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْيَوْمَ كَانَ تَنْجِيْزًا وَالْمُنْجَزُ لَا يَحْتَمِلُ الْاِضَافَةَ وَلَوْ قَالَ غَدًا كَانَ اِضَافَةً وَالْمُضَافُ لَا يَتَنَجَّزُ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ الْاِضَافَةِ فَلَغَا اللَّفْظُ الثَّانِىْ فِى الْفَصْلَيْنِ .

অনুচ্ছেদ : তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে

অনুবাদ : আর যদি সে [স্বামী] বলে, তুমি আগামীকাল তালাক, তাহলে ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে তার [স্ত্রীর] উপর তালাক পতিত হবে। কেননা সে তালাককে সমগ্র আগামীকালের সাথে সম্বন্ধ করেছে; আর সেটা প্রথম অংশের তালাক পতিত হওয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। আর যদি তা [আগামীকাল] দ্বারা দিনের শেষাংশ নিয়ত করে, তাহলে দীনি বিচারে তা গ্রহণীয় হবে; আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে ব্যাপকতার মাঝে বিশিষ্টতার নিয়ত করেছে। আর সেটা এর সম্ভাবনা রাখে। এটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর যদি বলে, তুমি আজ-আগামীকাল তালাক কিংবা আগামীকাল-আজ তালাক; তাহলে প্রথম উচ্চারিত শব্দটি বিবেচ্য হবে। সুতরাং প্রথম বাক্যের ক্ষেত্রে 'আজ'ই তালাক পতিত হবে, আর দ্বিতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে আগামীকাল তালাক পতিত হবে। কেননা যখন সে 'আজ' বলেছে, তখন তার অর্থ তাৎক্ষণিক তালাক প্রদান। আর তা [প্রদত্ত তালাককে আগামীকালের সঙ্গে] সম্বন্ধের সম্ভাবনা রাখে না। তবে সে যদি বলে 'আগামীকাল' তাহলে তা সম্বন্ধিত হবে। আর সম্বন্ধিত বিষয় তাৎক্ষণিক হতে পারে না– এতে সম্বন্ধকে বাতিল করা হয় বলে। সুতরাং উভয় অবস্থায় দ্বিতীয় শব্দটি বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) 'তালাক প্রদান-পরিচ্ছেদ' -এ কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম অনুচ্ছেদ তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا [তুমি আগামীকাল তালাক], তাহলে ফজর হওয়ার সাথে সাথে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, স্বামী স্ত্রীর তালাককে আগামীকালের সমগ্রতার সাথে সম্বন্ধ করেছে। আর সেটা বাস্তবায়িত হবে আগামীকালের প্রথম অংশ ফজরে তালাক পতিত হওয়ার মাধ্যমে। আর স্বামী যদি غَدًا [আগামীকাল] দ্বারা দিনের শেষাংশ উদ্দেশ্য করে, তাহলে দীনি বিচারে তা গ্রহণীয় হবে বটে, আদালতের বিচারে গ্রহণীয় হবে না। কেননা সে عُمُوْم [ব্যাপকতা] -এর মাঝে বিশিষ্টতার নিয়ত করেছে। আর তার উক্তি বিশিষ্টতার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু সেটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا [তুমি আজ-আগামীকাল তালাক; কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الْيَوْمَ তাহলে প্রথম উচ্চারিত শব্দটির বিবেচনায় তালাক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং প্রথম বাক্যের ক্ষেত্র - اَلْيَوْمَ [আজ] শব্দের বিবেচনায় আজ'ই তালাক সাব্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে غَدًا [আগামীকাল] শব্দের বিবেচনায় আগামীকাল তালাক পতিত হবে। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– اَلْيَوْمَ [আজ] বলার অর্থ তাৎক্ষণিক তালাক প্রদান। আর তাৎক্ষণিক প্রদত্ত তালাককে اَلْغَدُ [আগামীকাল] -এর সাথে সম্বন্ধীকরণের সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আগামীকাল শব্দটি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর প্রথমে غَدًا [আগামীকাল] উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তালাককে আগামীকালের সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। কেননা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করতে গেলে সম্বন্ধ (اِضَافَتْ) -কে বাতিল করতে হয়, যা যথার্থ নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে اَلْيَوْمَ [আজ] শব্দটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ وَقَالَ نَوَيْتُ اٰخِرَ النَّهَارِ دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِيْ جَمِيْعِ الْغَدِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ غَدًا عَلٰى مَا بَيَّنَّا وَلِهٰذَا يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ وَهٰذَا لِاَنَّ حَذْفَ فِيْ وَاِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ لِاَنَّهُ ظَرْفٌ فِي الْحَالَيْنِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ لِاَنَّ كَلِمَةَ فِيْ لِلظَّرْفِ وَ الظَّرْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي الْاِسْتِيْعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ ضَرُوْرَةَ عَدَمِ الْمُزَاحِمِ فَاِذَا عَيَّنَ اٰخِرَ النَّهَارِ كَانَ التَّعَيُّنُ الْقَصْدِيُّ اَوْلٰى بِالْاِعْتِبَارِ مِنَ الضَّرُوْرِيِّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَدًا لِاَنَّهُ يَقْتَضِي الْاِسْتِيْعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَا بِهٰذِهِ الصِّفَةِ مُضَافًا اِلٰى جَمِيْعِ الْغَدِ نَظِيْرُهُ اِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ عُمْرِيْ وَنَظِيْرُ الْاَوَّلِ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ فِيْ عُمْرِيْ وَعَلٰى هٰذَا الدَّهْرِ وَفِي الدَّهْرِ .

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক' অতঃপর সে বলে, আমি দিনের শেষাংশের নিয়ত করেছি, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিশেষভাবে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে স্ত্রীকে সম্বন্ধিত করেছে তালাকের সাথে সমগ্র আগামীকালে। সুতরাং তা আগামীকাল বলার অনুরূপ হলো, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার ভিত্তিতে। আর এ কারণে নিয়ত না থাকা অবস্থায় আগামীকালের প্রথম অংশে তালাক পতিত হবে। এর কারণ হলো– فِيْ [মধ্যে] -এর উল্লেখ ও অনুল্লেখ উভয়ই সমান। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই তা [আগামীকাল শব্দটি] ظَرْف [পাত্র] -রূপে বিবেচ্য। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, সে তার কথার প্রকৃত অর্থের নিয়ত করেছে কেননা فِيْ [মধ্যে] অব্যয়টি ظَرْف [পাত্র] -এর জন্য [ব্যবহৃত হয়েছে]। আর পাত্র হওয়ার বিষয়টি সামগ্রিকতার দাবি রাখে না। আর প্রথম অংশটি নির্ধারিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী সময় না থাকায় আবশ্যিকভাবে। কিন্তু যখন সে দিনের শেষাংশ নির্ধারিত করল, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময় অনিবার্যরূপে নির্ধারিত সময়ের মোকাবিলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে 'আগামীকাল' কথাটি ভিন্ন। কেননা, তা সামগ্রিকতা দাবি করে। কারণ, স্ত্রীকে সে সমগ্র আগামীকালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তালাক গুণে সম্পর্কিত করেছে। এর উদাহরণ হলো– কেউ বলল, আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবন রোজা রাখব। আর প্রথমটির উদাহরণ হলো, আল্লাহর কসম আমি সারা জীবনের মধ্যে রোজা রাখব। 'এক যুগ' এবং 'এক যুগের মধ্যে' একই মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ [তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক] এবং দিনের শেষাংশের নিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে এবং দিনের শেষাংশেই তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তবে দীনি বিচারে সে গ্রহণযোগ্য।

সাহেবাইনের দলিল হলো, সে ব্যক্তি সমগ্র আগামীকালে স্ত্রীকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তার এ কথাটি 'আগামীকাল' বলার মতো হলো। অর্থাৎ সে ব্যাপকতার মাঝে বিশিষ্টতার নিয়ত করেছে, যা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। আর এ কারণেই তাকে আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না। তবে দীনি বিচারে তার এ ধরনের নিয়ত গ্রহণযোগ্য। আর যেহেতু فِيْ غَدٍ [আগামীকালের মধ্যে] غَدًا [আগামীকাল]-এর অনুরূপ, তাই নিয়ত না করলে আগামীকালের প্রথম অংশে তালাক পতিত হবে। কেননা فِيْ [মধ্যে] কথাটি উল্লেখ থাকা-না থাকা দুই-ই সমান। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই غَدًا [আগামীকাল] শব্দটি ظَرْف [পাত্র]-রূপে বিবেচিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, সে ব্যক্তির দিনের শেষাংশের নিয়তপ্রকৃত অর্থেরই নিয়ত। কেননা فِيْ [মধ্যে] অব্যয়টি ظَرْف [পাত্র] নির্দেশক। আর পাত্র হওয়ার বিষয়টি পাত্রস্থের সামগ্রিকতাকে দাবি করে না; বরং কখনো পাত্রের অংশবিশেষে পাত্রস্থ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং তার উচ্চারিত কথায় দিবসের শেষ অংশের সম্ভাবনার নিয়ত করে, তখন তা প্রকৃত অর্থেরই নিয়ত হয়। এ কারণেই তাকে আদালতের বিচারে গ্রহণ করা হবে এবং দিনের শেষাংশে তালাক সাব্যস্ত হবে।

আর সাহেবাইনের উপস্থাপিত বক্তব্য– 'নিয়ত না থাকা অবস্থায় আগামীকালের প্রথমাংশে তালাক পতিত হয়'– এর উত্তরে বলা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী সময় বিদ্যমান না থাকায় অনিবার্য কারণে দিনের প্রথম অংশটি নির্ধারিত হয়। কিন্তু দিবসের শেষ অংশকে যখন সে নির্ধারণ করল তখন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময় অনিবার্যরূপে নির্ধারিত সময়ের মোকাবিলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

অপর দিকে فِيْ غَدٍ [আগামীকালের মধ্যে] -কে غَدًا [আগামীকাল] -এর উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়। কেননা غَدًا [আগামীকাল] সামগ্রিকতা দাবি করে। কারণ স্ত্রীকে সে সমগ্র আগামীকালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তালাক গুণে সম্পর্কিত করেছে। যেমন কেউ বলল– وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ عُمْرِىْ 'আল্লাহর কসম আমি সারা জীবন রোজা রাখব– [এখানে فِيْ [মধ্যে]-এর উল্লেখ নেই], তাহলে নিষিদ্ধ দিবসগুলো ব্যতীত পুরো জীবন রোজা রাখবে। আর যদি বলে– وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ فِيْ عُمْرِىْ - 'আল্লাহর কসম, আমি সারা জীবনের মধ্যে রোজা রাখব' [এখানে فِيْ [মধ্যে]-এর উল্লেখ আছে], তাহলে কিছুদিন রোজা রাখলেই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে فِيْ [মধ্যে] -এর উল্লেখ নেই বলে সে কসম থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে তখনই, যখন সে সারা জীবন রাখবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে فِيْ [মধ্যে] -এর উল্লেখ আছে বলে সে কসম থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে– সারাজীবনের কিছু সময় রোজা রাখলেই। অনুরূপভাবে وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ [আল্লাহর কসম, আমি এক যুগ রোজা রাখব] فِيْ ছাড়া বললে পূর্ণ এক যুগ রোজা রাখতে হবে। আর وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ فِي الدَّهْرِ [আল্লাহর কসম, আমি এক যুগের মধ্যে রোজা রাখব] فِيْ -সহ বললে এক যুগের কিছুদিন রোজা রাখলেই চলবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ لِاَنَّهُ اَسْنَدَهُ اِلٰى حَالَةٍ مَعْهُوْدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيَلْغُوْ كَمَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ وَلِاَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ اِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ اَوْ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيْقِ غَيْرِهِ مِنَ الْاَزْوَاجِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا اَوَّلَ مِنْ اَمْسِ وَقَعَ السَّاعَةَ لِاَنَّهُ مَا اَسْنَدَهُ اِلٰى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ اِخْبَارًا اَيْضًا فَكَانَ اِنْشَاءً وَالْاِنْشَاءُ فِى الْمَاضِىْ اِنْشَاءٌ فِى الْحَالِ فَيَقَعُ السَّاعَةَ .

অনুবাদ : আর যদি সে বলে, 'তুমি গতকাল তালাক' অথচ আজ তাকে বিবাহ করেছে, তাহলে কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা সে তালাককে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি। সুতরাং তা অনর্থক হবে। যেমন কেউ যদি বলে– আমার সৃষ্টির পূর্বেই তুমি তালাক। অধিকন্তু বিবাহের অধীনে না থাকার সংবাদ দিয়ে কিংবা অন্য স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে বাক্যটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করা সম্ভব। আর যদি গতকালের পূর্বে তাকে বিবাহ করে থাকে, তাহলে সে মুহূর্তে তালাক পতিত হবে। কেননা সে তালাককে এমন অবস্থার সাথে যুক্ত করেনি, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি। আর সংবাদরূপে বাক্যটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা সৃজন অর্থে হবে। আর অতীতকালের সৃজন বর্তমান কালের সৃজন হিসেবে ধর্তব্য। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ [তুমি গতকাল তালাক] অথচ তাকে আজকে বিবাহ করেছে মাত্র, তাহলে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। এর যৌক্তিক দলিল হলো, সে ব্যক্তি তালাককে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি অর্থাৎ, সে তালাককে এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যখন সে ঐ মহিলাকে বিবাহই করেনি। সুতরাং তার কথা অনর্থক বলে পতিত হবে এবং কোনো তালাকই সাব্যস্ত হবে না। যেমন কেউ যদি বলে– اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ [আমার জন্মের পূর্বেই তুমি তালাক], তাহলে কোনো তালাকই সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো– اَنْتِ طَالِقٌ اَمْسِ [তুমি গতকাল তালাক] বাক্যটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করা সম্ভব। এভাবে যে, সে এ বাক্যের দ্বারা এ খবর দিচ্ছে যে, গতকাল তুমি আমার বিবাহধীনে ছিলে না কিংবা অন্য স্বামীর পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্তা ছিলে। বাক্যটি কাঠামোগত দিক থেকে সংবাদসূচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ ব্যাখ্যার আলোকে তালাক পতিত হবে না এবং তার কথাও অনর্থক বলে বিবেচিত হবে না।

আর যদি গতকালের পূর্বে তাকে বিবাহ করে থাকে, তাহলে 'তুমি গতকাল তালাক' কথার দ্বারা তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। যৌক্তিক দলিল হলো, এক্ষেত্রে স্বামী তালাককে এমন কোনো অবস্থার সাথে যুক্ত করেনি, যা তালাকের মালিকানার পরিপন্থি। কেননা সে ইতঃপূর্বেই তাকে বিবাহ করেছে। অধিকন্তু তার এ কথাকে সংবাদবাচক বাক্য হিসেবে গণ্য করে বাক্যটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। তার কথাটিকে সংবাদ অর্থে গ্রহণ অসম্ভব হওয়ার কারণে সেটাকে 'সৃজন' অর্থে গ্রহণ করা হবে। আর মূলনীতি হলো, অতীতকালের সৃজন বর্তমানকালের সৃজন হিসেবে ধর্তব্য। অর্থাৎ বর্তমানে থেকে অতীতে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করলে তা বর্তমানে সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاَنَّهُ اَسْنَدَهُ اِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ طَلَّقْتُكِ وَاَنَا صَبِيٌّ اَوْ نَائِمٌ اَوْ يَصِحُّ اِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتَى لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ مَتَى مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ وَسَكَتَ طُلِّقَتْ لِاَنَّهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى زَمَانٍ خَالٍ عَنِ التَّطْلِيْقِ وَقَدْ وُجِدَ حَيْثُ سَكَتَ وَهٰذَا لِاَنَّ كَلِمَةَ مَتَى وَمَتَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقْتِ لِاَنَّهُمَا مِنْ ظُرُوْفِ الزَّمَانِ وَكَذَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى مَا دُمْتُ حَيًّا اَيْ وَقْتَ الْحَيٰوةِ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَمُوْتَ لِاَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالْيَاْسِ عَنِ الْحَيٰوةِ وَهُوَ الشَّرْطُ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ اِنْ لَمْ اٰتِ الْبَصْرَةَ وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهٖ هُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তুমি তালাক' তাহলে কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা সে তালাককে এমন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা তালাকের [মালিকানার] পরিপন্থি। সুতরাং এটা এরূপ হবে– আমি শৈশব অবস্থায় কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে তালাক দিলাম। কিংবা এ কারণে যে বাক্যটিকে সংবাদরূপে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা সম্ভব। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি বলে– তুমি তালাক, তোমাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত কিংবা যে পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দিই কিংবা যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে তালাক না দিই– এবং সে চুপ করে থাকে, তাহলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে। কেননা সে তালাককে এমন একটি সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা তালাক থেকে মুক্ত। আর সে যখন নীরব হলো তখন সে সময়টি বিদ্যমান হয়েছে। আর তা এজন্য যে, مَتَى [যে পর্যন্ত], مَتَى مَا [যে পর্যন্ত না] অব্যয়গুলি স্পষ্ট সময় নির্দেশক। কেননা উভয়টি সময়ের পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে مَا [যতক্ষণ] অব্যয়টি সময়ের জন্য ব্যবহৃত। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– مَا دُمْتُ حَيًّا - অর্থাৎ জীবিতকালে। আর যদি বলে– যদি তোমাকে তালাক না দিই তবে তুমি তালাক', তাহলে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা তালাক না দেওয়া সাব্যস্ত হবে না – জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর এটিই শর্ত। যেমন তার বক্তব্য– আমি যদি বসরায় গমন না করি [তাহলে তুমি তালাক]। স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীর মৃত্যুর অনুরূপ। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ [আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তুমি তালাক] তাহলে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা সে তালাককে তালাকের মালিকানার পরিপন্থি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার কোনো অধিকারই তার নেই। তাই এ ক্ষেত্রে কোনো তালাক পতিত হবে না। সুতরাং তার এ বাক্য এ কথার ন্যায় হবে যে, আমি শৈশব অবস্থায় কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে তালাক দিলাম।

অথবা স্বামীর উক্ত কথাকে কাঠামোগত দিক থেকে সংবাদবাচক বাক্য হিসেবে অভিহিত করে বিশুদ্ধ করা সম্ভব। যেন সে এর দ্বারা তার বিবাহাধীনে না থাকার কিংবা অন্য স্বামীর পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে।

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ [তুমি তালাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দিই] কিংবা বলে– أَنْتِ طَالِقٌ مَتٰى لَمْ أُطَلِّقْكِ [তুমি তালাক, যে পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দেই] কিংবা বলে– أَنْتِ طَالِقٌ مَتٰى مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ [তুমি তালাক, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে তালাক না দেই], এরপর স্বামী চুপ করে থাকে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এটি সর্বসম্মত মত। –[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭] এর দলিল হলো, বর্ণিত তিনটি বাক্যে তালাককে তালাক থেকে মুক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর নীরবতা অবলম্বন করা মাত্র সে সময়টি পাওয়া গেছে। এর ব্যাখ্যায় হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– আরবি ভাষায় مَتٰى [যে পর্যন্ত] ও مَتٰى مَا [যে পর্যন্ত না] শব্দ দু'টি স্পষ্ট সময় নির্দেশক। কেননা উভয়টি ظَرْفُ زَمَانٍ [সময়ের পাত্র] হিসেবে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে مَا [যতক্ষণ] – অব্যয়টিও সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনে এসেছে– وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - "আর তিনি আমাকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন জীবিত থাকাকালে।" –[সূরা মরিয়ম : ৩১] এ আয়াতে– مَا دُمْتُ حَيًّا [যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি] অর্থ : مُدَّةَ دَوَامِيْ حَيًّا – জীবিতকালে।

مَا [যতক্ষণ] অব্যয়টি শর্তের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী – مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ - "আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা বারণ করার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না -তিনি ব্যতীত।"–[সূরা ফাতির : ২] এ আয়াতে مَا অব্যয়টি শর্তের জন্য এসেছে। এ مَا অব্যয়টি যখন সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, অর্থাৎ তালাক পতিত হবে। আর যখন শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। –[আল বিনায়া, খণ্ড ৫, পৃ. ৫৯]

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ [যদি তোমাকে তালাক না দেই, তাহলে তুমি তালাক], তাহলে স্বামীর মৃত্যুর সময় তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ জীবনের সম্ভাবনা থেকে নিরাশ হলে তালাক সাব্যস্ত হবে। এর দলিল হলো, সে তালাককে সম্পৃক্ত করেছে তালাক না দেওয়ার সাথে। আর তালাক না দেওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন সে জীবনের সম্ভাবনা থেকে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হবে। সুতরাং মৃত্যুর সময় যখন তালাক না দেওয়া সাব্যস্ত হবে, তখন তালাক পতিত হবে। এ মাসআলাটি এরূপ, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল– إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ 'আমি যদি বসরায় গমন না করি, তাহলে তুমি তালাক', তাহলে তালাক পতিত হবে তখনই, যখন বসরায় গমনের সম্ভাবনা থেকে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীর মৃত্যুর অনুরূপ। অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যেমন তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তালাক পতিত হবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। তবে نَوَادِرْ -এর বর্ণনায় ভিন্নতা আছে। স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে তালাক পতিত হবে না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তালাক পতিত হওয়ার ফলাফল হলো, স্বামী তার মিরাস পাবে না। কেননা, মৃত্যুর পূর্বেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। –[আল-বিনায়া- খণ্ড ৫, পৃ. ৬০]

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَوْ اِذَا مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى يَمُوْتَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا تُطَلَّقُ حِيْنَ سَكَتَ لِاَنَّ كَلِمَةَ اِذَا لِلْوَقْتِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَقَالَ قَائِلُهُمْ شِعْرٌ وَاِذَا تَكُوْنُ كَرِيْهَةٌ اُدْعٰى لَهَا * وَاِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعٰى جُنْدَبُ . فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَتٰى وَمَتٰى مَا وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ لَا يَخْرُجُ الْاَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِالْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ مَتٰى شِئْتِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهٗ يُسْتَعْمَلُ فِى الشَّرْطِ اَيْضًا قَالَ قَائِلُهُمْ شِعْرٌ وَاسْتَغْنِ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى * وَاِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ . فَاِنْ اُرِيْدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تُطَلَّقْ فِى الْحَالِ وَاِنْ اُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ تُطَلَّقْ فَلَا تُطَلَّقُ بِالشَّكِّ وَالْاِحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَسْاَلَةِ الْمَشِيَّةِ لِاَنَّهٗ عَلٰى اِعْتِبَارِ اَنَّهٗ لِلْوَقْتِ لَا يَخْرُجُ الْاَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَلٰى اِعْتِبَارِ اَنَّهٗ لِلشَّرْطِ يَخْرُجُ وَالْاَمْرُ صَارَ فِىْ يَدِهَا فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَالْاِحْتِمَالِ هٰذَا الْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نِيَّةٌ اَمَّا اِذَا نَوَى الْوَقْتَ يَقَعُ فِى الْحَالِ وَلَوْ نَوَى الشَّرْطَ يَقَعُ فِىْ اٰخِرِ الْعُمُرِ لِاَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُمَا .

অনুবাদ : আর যদি বলে, তুমি তালাক, যখন আমি তোমাকে তালাক না দিই, কিংবা যখন না আমি তোমাকে তালাক না দিই, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে, [স্বামীর] মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সে চুপ করলেই তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা إِذَا [যখন] অব্যয়টি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। [যেমন] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।' আর কবির ভাষায়- 'যখন খারাপ কিছু ঘটে, তখন আহূত হই আমি। আর যখন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তখন আহূত হয়- জুনদুব।' সুতরাং তা مَتٰى [যে পর্যন্ত] এবং مَتٰى مَا [যে পর্যন্ত না] -এর অনুরূপ হলো। আর এ কারণেই কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাক - যখন তুমি চাও' তাহলে বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর ফলে স্ত্রীর অধিকার থেকে তার ইচ্ছা চলে যাবে না। যেমন যদি সে বলে- যে পর্যন্ত তুমি চাও, তুমি তালাক। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো- إِذَا [যখন] অব্যয়টি শর্তের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়- 'তুমি নির্ভীক থাকো যতক্ষণ তোমার প্রভু তোমাকে প্রাচুর্যশীল রাখেন; আর যখন তুমি অভাবে পড়বে তখন ধৈর্য ধর।' সুতরাং যদি তা দ্বারা শর্ত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর যদি তা দ্বারা সময় উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে। অতএব, সন্দেহ ও সম্ভাবনার কারণে তালাক হবে না। পক্ষান্তরে ইচ্ছার মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা إِذَا [যখন] অব্যয়টি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার হিসেবে ইচ্ছার বিষয়টি স্ত্রীর কর্তৃত্ব থেকে চলে যাবে না। আর শর্তের ভিত্তিতে চলে যাবে। আর তালাকের ইচ্ছার বিষয়টি স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন [আলোচ্য মাসআলায়]। সুতরাং সন্দেহ ও সম্ভাবনার কারণে তা চলে যাবে না। স্বামীর যখন কোনো নিয়ত থাকে না, তখনই এ মতপার্থক্য। আর যদি সে ['যখন'-এর মাধ্যমে] সময় উদ্দেশ্য করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। আর যদি শর্তের উদ্দেশ্য করে থাকে, তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা إِذَا অব্যয়টি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ [যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই, তখন তুমি তালাক] কিংবা বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ – [যখন না আমি তোমাকে তালাক দিব, তখন তুমি তালাক], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তালাক সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, যখন সে এ কথা বলে চুপ হবে, তখনই তালাক পতিত হবে। তাঁদের দলিল হলো– إِذَا শব্দটি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ "যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে।" [সূরা তাকভীর : ১]। এ আয়াতে إِذَا অব্যয়টি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কবিতায় পাওয়া যায়– وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لَهَا ٭ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ অর্থাৎ, মন্দের সময় আহূত হই আমি ٭ ভালোর বেলায় আহূত হয় জুনদুব। এখানেও إِذَا অব্যয়টি সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং إِذَا অব্যয়টি مَتَى مَا ও مَتَى -এর মতো হয়ে গেল। এ কারণেই কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ – [যখন তুমি চাও, তখনই তুমি তালাক] তাহলে ঐ বৈঠক থেকে উঠার ফলে স্ত্রীর ইচ্ছা শেষ হয়ে যাবে না; যেমন– أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ -এর ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইচ্ছা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতরাং مَتَى -এর ক্ষেত্রে যে বিধান কার্যকর হবে, إِذَا -এর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর পূর্বে বর্ণিত মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে যে, مَتَى -এর ক্ষেত্রে স্বামী নীরবতা অবলম্বন করা মাত্র তালাক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং إِذَا -এর ক্ষেত্রেও তা-ই হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– إِذَا অব্যয়টি শর্তের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির কবিতায় এসেছে–

وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى ٭ وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ .

এ কবিতায় إِذَا শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, تُصِبْكَ জযমবিশিষ্ট হয়েছে।

মোটকথা, إِذَا অব্যয়টি শর্তের অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, অনুরূপভাবে তা সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ أَوْ إِذَا مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ - বাক্যে إِذَا - দ্বারা শর্ত উদ্দেশ্য হলে, তৎক্ষণাৎ তালাক সাব্যস্ত হবে না, যেমন إِنْ অব্যয় দ্বারা উচ্চারিত বাক্যের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ তালাক সাব্যস্ত হয় না। আর যদি إِذَا - অব্যয় দ্বারা সময় উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক সাব্যস্ত হবে। যেমন– مَتَى অব্যয় দ্বারা উচ্চারিত বাক্যের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক সাব্যস্ত হয়। এ থেকে বুঝা যায়, তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ও সম্ভাবনার অবকাশ আছে। এ কারণেই আমরা বলি যে, তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে না।

আর সাহেবাইন (র.) দলিলস্বরূপ যে ইচ্ছার মাসআলাটি (أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ) উপস্থাপন করেছেন, তা ভিন্ন একটি বিষয়। কেননা এ বক্তব্যে إِذَا অব্যয়টি দ্বারা সময় উদ্দেশ্য হলে স্ত্রীর ইচ্ছা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেমন– أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ -এর ক্ষেত্রে ইচ্ছা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আর যদি إِذَا অব্যয়টি দ্বারা শর্ত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বৈঠক থেকে উঠে গেলে তার ইচ্ছার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। তাহলে এখানে দু'ধরনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অথচ ইচ্ছার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে স্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে আছে। সুতরাং সন্দেহ ও সম্ভাবনার কারণে তার থেকে ইচ্ছা চলে যাবে না। অতএব إِذَا -এর অর্থ مَتَى হওয়ার কারণে এমনটি হয়নি, যা সাহেবাইন (র.) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মধ্যকার উপরোল্লিখিত মতপার্থক্যটি তখনই হবে, যখন স্বামী তার এ বক্তব্যের দ্বারা কোনো কিছু উদ্দেশ্য করবে না। আর যদি সে إِذَا দ্বারা সময় উদ্দেশ্য করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক হবে। আর যদি সে শর্তের উদ্দেশ্য করে, তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্তে তালাক সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ بِهٰذِهِ التَّطْلِيْقَةِ مَعْنَاهُ قَالَ ذٰلِكَ مَوْصُوْلًا بِهٖ وَالْقِيَاسُ اَنْ يَقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ اِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) لِاَنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيْهِ وَاِنْ قَلَّ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ زَمَانَ الْبِرِّ مُسْتَثْنًى عَنِ الْيَمِيْنِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ لِاَنَّ الْبِرَّ هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَلَا يُمْكِنُهُ تَحَقُّقُ الْبِرِّ اِلَّا اَنْ يُجْعَلَ هٰذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنًى وَاَصْلُهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ فَاشْتَغَلَ بِالنُّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهٖ وَاَخَوَاتُهُ عَلٰى مَا يَاْتِيْكَ فِي الْاَيْمَانِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'তুমি তালাক যখন তোমাকে তালাক না দিই, তুমি তালাক' তাহলে এই [দ্বিতীয়] তালাক দ্বারা সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। এর অর্থ হলো, যদি সে পূর্ববর্তী কথার সাথে সংযুক্ত করে বলে। আর কিয়াস মতে, সময়ের সাথে সম্বন্ধিত তালাক পতিত হবে। সুতরাং সহবাসকৃত স্ত্রী হলে দুই তালাক পতিত হবে। এটি ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। কেননা এমন একটি সময় পাওয়া গেছে, যাতে স্ত্রীকে সে তালাক দেয়নি– যদিও সে সময় অল্প হোক। আর সেটা হলো 'তুমি তালাক' বলা থেকে অবসর হওয়ার পূর্ববর্তী সময়টুকু। কিয়াসের কারণ হলো কসম পূর্ণ করার সময়টুকু অবস্থার প্রেক্ষিতে শর্তের বহির্ভূত ধরা হবে। কেননা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই হলো, শর্তের উদ্দেশ্য। আর এ পরিমাণ সময়কে শর্তের বহির্ভূত না ধরলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচ্য মাসআলার মূল হলো, কোনো ব্যক্তি কসম করল যে, এই ঘরে বাস করবে না আর সে মুহূর্ত থেকেই সে আসবাবপত্র সরানোর কাজে লেগে গেল। এ ধরনের অন্যান্য মাসআলা কসম অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে – اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ [তুমি তালাক যখন তোমাকে তালাক না দেই, তুমি তালাক] আর পরবর্তী– اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] পূর্ববর্তী কথার সাথে সংযুক্ত করে বলে, মাঝে কোনো কিছুর ব্যবধান না থাকে, তাহলে দ্বিতীয়– اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা এক তালাক পতিত হবে।

কিয়াসের দাবি হলো– مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ -এর সাথে সম্বন্ধিত তালাকও পতিত হবে। তাহলে দ্বিতীয় اَنْتِ طَالِقٌ - দ্বারা এক তালাক এবং مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ -এর সাথে সম্বন্ধিত اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা আরেক তালাক, এ দুই তালাক পতিত হবে। স্ত্রী সহবাসকৃতা হলে এই দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত এটিই। তাঁর দলিল হলো– اَنْتِ طَالِقٌ -কে এমন একটি সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, যে সময়ে সে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি। আর সে সময়টি পাওয়া গেছে, যদিও তা অল্প সময় হোক। আর শর্ত পাওয়ার কারণে – اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ – বাক্যের দ্বারা এক তালাক ও পরবর্তী اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা আরেক তালাক পতিত হবে। এজন্যই ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ মাসআলায় দুই তালাক পতিত হবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, কেউ কসম করলে কসম পূর্ণ করার জন্য এতটুকু সময় আবশ্যক, যে সময়ে সে তার কসম পূর্ণ করতে পারে। কেননা কসম করার উদ্দেশ্য হলো– কসম পূর্ণ করা। আর এ পরিমাণ সময়কে বহির্ভূত না ধরলে কসম রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং اَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ اُطَلِّقْكِ -এর পরে এতটুকু সময়ের ব্যবধান জরুরি, যে সময়ে اَنْتِ طَالِقٌ উচ্চারণ করবে।

قَوْلُهُ وَاَصْلُهُ مَنْ حَلَفَ الخ : এ মতপার্থক্যের মূল হলো, কসম অধ্যায়ের একটি মাসআলা। সেটি হলো– কোনো ব্যক্তি কসম করে বলল, সে এই ঘরে বাস করবে না। আর সে মুহূর্তেই সে আসবাবপত্র সরানোর কাজে লেগে গেল, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। আর ইমাম যুফার (র.) কিয়াসের ভিত্তিতে সে কসম ভঙ্গকারী হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ সংক্রান্ত অন্যান্য মাসআলা কসম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا طُلِّقَتْ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمِعْيَارُ وَهٰذَا أَلْيَقُ بِهِ وَيُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ وَالطَّلَاقُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّةً دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهُوَ اللُّغَةُ ـ

অনুবাদ : আর কেউ যদি কোনো মহিলাকে বলে, 'যেদিন তোমাকে বিবাহ করব, সেদিনই তুমি তালাক' এরপর সে তাকে রাত্রে বিবাহ করল, তাহলে সে [স্ত্রী] তালাকপ্রাপ্তা হবে। কেননা 'দিন' বলে কখনো দিনের আলোকিত অংশটুকু বুঝানো হয়। সুতরাং দিন দ্বারা আলোকিত অংশটুকু উদ্দেশ্য হবে, যখন তার সাথে প্রলম্বিত কোনো কিছু যুক্ত হবে। যেমন রোজার ক্ষেত্রে ও স্ত্রীকে ইচ্ছা প্রদানের ক্ষেত্রে। কেননা [এখানে] সময় দ্বারা পরিমাপ উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় তা [দিনের অংশটুকু] উদ্দেশ্য করাই যুক্তিযুক্ত। আর কখনো কখনো দিন বলে সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ 'যেদিন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।' এখানে দিন দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং তার সাথে যখন অপ্রচলিত কাজ যুক্ত হবে, তখন দিন শব্দটি সাধারণ সময় অর্থে প্রযোজ্য হবে। আর তালাক এ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তা রাত ও দিনকে শামিল করবে। আর যদি বলে, দিন দ্বারা আমি দিনের আলোকিত অংশকেই বুঝিয়েছি, তাহলে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে তার কথার প্রকৃত অর্থের নিয়ত করেছে। তবে 'রাত্র' শব্দটি শুধু অন্ধকার অংশটুকুকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর দিন শব্দটি শুধু সময়ের আলোকিত অংশটুকুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি আভিধানিক অর্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ الخ : কেউ যদি কোনো মহিলাকে বলে– يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যেদিন তোমাকে বিবাহ করব, সেদিনই তুমি তালাক] অতঃপর সে মহিলাকে রাত্রে বিবাহ করে, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা লক্ষণীয়– ১. نَهَارٌ [দিবস] : সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দিনের আলোকিত অংশটুকুকে نَهَارٌ বলে। ২. لَيْلٌ [রাত্র] : সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অন্ধকার অংশটুকু বুঝানোর জন্য لَيْلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩. يَوْمٌ [দিন] : এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন, দিবসের আলোকিত অংশ ও সাধারণ সময় উভয়টির ক্ষেত্রে يَوْمٌ শব্দটি প্রযোজ্য। আর অধিকাংশের অভিমত হলো– يَوْمٌ -এর প্রকৃত অর্থ হলো, দিবসের আলোকিত অংশ। আর সাধারণ সময় হলো এর রূপক অর্থ। قَرِيْنَةٌ [ইঙ্গিত] -এর ভিত্তিতে উপরোল্লিখিত দু'টি অর্থের একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর قَرِيْنَةٌ [ইঙ্গিত] হলো– يَوْمٌ -এর সঙ্গে প্রলম্বিত কোনো কাজ যুক্ত হলে يَوْمٌ - দ্বারা দিনের আলোকিত অংশটুকু উদ্দেশ্য। আর يَوْمٌ -এর সাথে অপ্রলম্বিত কোনো কাজ যুক্ত হলে يَوْمٌ দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। প্রলম্বিত কাজ হলো, যে কাজ করতে কিছু সময় ক্ষেপণ হয়। যেমন– রোজা, স্ত্রীকে ইচ্ছাপ্রদান ইত্যাদি। আর অপ্রলম্বিত কাজ হলো, যা সম্পাদন করতে সময় ক্ষেপণ করতে হয় না। যেমন– তালাক প্রদান।

يَوْمٌ -এর সঙ্গে অপ্রলম্বিত কাজ যুক্ত হলে يَوْمٌ শব্দটি সাধারণ সময় অর্থে প্রযোজ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ [যেদিন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে]। এখানে يَوْمٌ দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় يَوْمٌ শব্দটি দিন-রাত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তাই দিন-রাতের যে কোনো সময় বিবাহ করুক না কেন তালাক পতিত হবে। কেননা يَوْمٌ -এর সাথে এখানে অপ্রলম্বিত কাজ তালাক সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং يَوْمٌ দ্বারা এ ক্ষেত্রে সাধারণ সময় উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই দিন ও রাত উভয়টিই তার কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে। তবে স্বামী যদি يَوْمٌ দ্বারা বিশেষভাবে দিনের আলোকিত অংশ বুঝায়, তাহলে আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে তার কথা দ্বারা প্রকৃত অর্থের উদ্দেশ্য করেছে

فَصْلٌ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَاِنْ نَوٰى طَلَاقًا وَلَوْ قَالَ اَنَا مِنْكِ بَائِنٌ اَوْ عَلَيْكِ حَرَامٌ يَنْوِى الطَّلَاقَ فَهِىَ طَالِقٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَقَعُ الطَّلَاقُ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ اَيْضًا اِذَا نَوٰى لِاَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتّٰى مَلَكَتِ الْمُطَالَبَةَ بِالْوَطْىِ كَمَا يَمْلِكُ هُوَ الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِيْنِ وَكَذَا الْحِلُّ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِاِزَالَتِهِمَا فَيَصِحُّ مُضَافًا اِلَيْهِ كَمَا يَصِحُّ مُضَافًا اِلَيْهَا كَمَا فِى الْاِبَانَةِ وَالتَّحْرِيْمِ وَلَنَا اَنَّ الطَّلَاقَ لِاِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ اَلَا تَرٰى اَنَّهَا هِىَ الْمَمْنُوْعَةُ عَنِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ اٰخَرَ وَالْخُرُوْجِ وَلَوْ كَانَ لِاِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكٌ وَلِهٰذَا سُمِّيَتْ مَنْكُوْحَةً بِخِلَافِ الْاِبَانَةِ لِاَنَّهَا لِاِزَالَةِ الْوُصْلَةِ وَهِىَ مُشْتَرِكَةٌ وَبِخِلَافِ التَّحْرِيْمِ لِاَنَّهُ لِاِزَالَةِ الْحِلِّ وَهُوَ مُشْتَرِكٌ فَصَحَّتْ اِضَافَتُهُمَا اِلَيْهِمَا وَلَا تَصِحُّ اِضَافَةُ الطَّلَاقِ اِلَّا اِلَيْهَا .

অনুচ্ছেদ : বিবিধ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত'– তাহলে কিছুই হবে না, যদিও তালাকের নিয়ত করে। আর যদি বলে, 'আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন' কিংবা 'আমি তোমার জন্য হারাম'– আর এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রথমটির ক্ষেত্রেও তালাক পতিত হবে, যদি সে নিয়ত করে। কেননা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহের মালিকানায় শরিক। এ কারণেই স্ত্রী সহবাস দাবি করতে পারে, যেমন স্বামী সহবাসের সুযোগ দানের দাবি করতে পারে। অনুরূপভাবে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রেও উভয়ে শরিক। আর তালাক এ দুটিকে বিলুপ্ত করার জন্য নির্ধারিত। সুতরাং তালাক স্বামীর দিকেও সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ, যেরূপ স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ। যেমন– 'বিচ্ছিন্ন' ও 'হারাম' শব্দ দুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আমাদের দলিল হলো, তালাক বন্ধন মুক্তির জন্য। আর বন্ধন রয়েছে স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষেত্রে নয়। তুমি কি জান না; স্ত্রীর প্রতিই বিধি-নিষেধ আরোপিত অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এবং স্বামীর গৃহ ছেড়ে বের হওয়া থেকে। আর যদি তালাক মালিকানা বিলুপ্তির জন্য হয়েও থাকে, তথাপি স্ত্রীর উপর মালিকানা রয়েছে। কেননা স্ত্রী মালিকানাধীন আর স্বামী মালিক। এ কারণে তাকে বিবাহিতা/বিবাহকৃতা বলা হয়। পক্ষান্তরে 'বিচ্ছিন্ন হওয়া' শব্দটি ভিন্ন। কেননা তা সম্পর্ক বিলুপ্তি বুঝায়। আর সম্পর্কের মধ্যে উভয়ের অংশীদারিত্ব আছে। 'হারাম' শব্দটিও ভিন্ন। কেননা তা 'বৈধতা' বিলুপ্তির অর্থ বুঝায়। আর এ ক্ষেত্রে উভয়ের অংশীদারিত্ব আছে। সুতরাং এ শব্দটিকে উভয়ের দিকে সম্বন্ধ করা শুদ্ধ হবে। সুতরাং তালাকের সম্বন্ধ শুধু স্ত্রীর দিকেই করা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ অনুচ্ছেদে তালাককে স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধকরণ সম্পর্কিত মাসআলা বিবৃত হয়েছে। পুরুষের দিকে তালাককে সম্পর্কিতকরণের বিপরীত হলো স্ত্রীর দিকে তালাককে সম্পর্কিতকরণ। এজন্যই তিন্ন অনুচ্ছেদে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنَا مِنْكِ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ [আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত], তাহলে তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্ত্রীকে বলে- اَنَا مِنْكِ بَائِنٌ [আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন] কিংবা اَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ [আমি তোমার জন্য হারাম], আর এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিয়ত করলে اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ -এর মাধ্যমেও তালাক পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, বিবাহের মালিকানায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শরিক। এজন্যই স্ত্রী স্বামীর কাছে সহবাস দাবি করতে পারে, যেমন স্বামী সহবাসের সুযোগ দানের দাবি করতে পারে। অনুরূপভাবে হালাল হওয়ার বিষয়েও স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরিক। আর বিবাহের মালিকানা ও হালাল হওয়া – এ দুটিকে বিলুপ্ত করার জন্য তালাক নির্ধারিত। সুতরাং তালাক যেরূপ স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ, তদ্রূপ স্বামীর দিকেও সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ। যেমন- اِبَانَة [বিচ্ছিন্ন হওয়া] ও تَحْرِيْم [হারাম হওয়া] দু'টি শব্দকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ।

আমাদের দলিল হলো, তালাক বন্ধন মুক্তির জন্য। আর বন্ধন রয়েছে স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষেত্রে নয়। যেমন- স্ত্রী অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করতে পারে না, স্ত্রীর উপর স্বামীর গৃহ ছেড়ে বের হওয়ার প্রতি বিধি-নিষেধ আছে। সুতরাং বৈবাহিক বন্ধন যেহেতু স্ত্রীর ক্ষেত্রে রয়েছে, তাই তালাকও স্ত্রীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে; স্বামীর দিকে হবে না। এ কারণে اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ [আমি তোমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত] -এর মাধ্যমে স্বামীর দিকে তালাককে সম্পৃক্ত করা যথার্থ হবে না, যদিও সে নিয়ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য – "তালাক মালিকানা বিলুপ্তি করার জন্য নির্ধারিত" – এ কথাকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবুও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব [আলোচ্য মাসআলায়] সাব্যস্ত হবে না। কেননা বিবাহের মালিকানা শুধু স্ত্রীর উপর রয়েছে। কেননা স্ত্রী স্বামীর মালিকানাধীন এবং স্বামীই মালিক। এজন্যই স্ত্রীকে مَنْكُوْحَة [বিবাহকৃতা] বলা হয়। সুতরাং মালিকানা যেহেতু স্ত্রীর উপরে, তাই তালাকও স্ত্রীর উপরে পতিত হবে; স্বামীর উপরে নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর প্রদত্ত কিয়াসের উত্তর হলো- اِبَانَة [বিচ্ছিন্ন হওয়া] -এর বিষয়টি ভিন্ন। এটিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ। কেননা, এ শব্দটি সম্পর্ক বিলুপ্তির অর্থ বুঝায়। আর সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অংশীদারিত্ব আছে। তদ্রূপ تَحْرِيْم [হারাম হওয়া] -এর বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা তা বৈধতা বিলুপ্তির জন্য নির্ধারিত। আর হালাল হওয়ার মধ্যে উভয়ের অংশীদারিত্ব আছে। সুতরাং এ শব্দটিকেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ। অতএব اَنَا بَائِنٌ مِنْكِ কিংবা اَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ -এর উপর কিয়াস করে اَنَا مِنْكِ طَالِقٌ -এর মাধ্যমে তালাক পতিত হওয়ার অভিমত পোষণ যথার্থ নয়।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اٰخِرًا وَعَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رح) وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَوَّلًا تَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) فِيْ كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيْمَا اِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا شَيْءَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَذْكُوْرُ هٰهُنَا قَوْلَ الْكُلِّ فَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) رِوَايَتَانِ لَهُ اَنَّهُ اَدْخَلَ الشَّكَّ فِي الْوَاحِدَةِ لِدُخُوْلِ كَلِمَةِ اَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفْيِ فَيَسْقُطُ اِعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبْقٰى قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ لَا لِاَنَّهُ اَدْخَلَ الشَّكَّ فِيْ اَصْلِ الْاِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ لَهُمَا اَنَّ الْوَصْفَ مَتٰى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوْعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا تَطْلُقُ ثَلٰثًا وَلَوْ كَانَ الْوُقُوْعُ بِالْوَصْفِ لَلَغٰى ذِكْرُ الثَّلٰثِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيْقَةِ اِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوْتُ الْمَحْذُوْفُ مَعْنَاهُ اَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلٰى مَا مَرَّ وَاِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُّ دَاخِلًا فِيْ اَصْلِ الْاِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ.

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'তোমার প্রতি এক তালাক কিংবা নয়', তাহলে কিছুই হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এভাবে জামিউস সাগীর গ্রন্থে বিষয়টিকে বিনা মতপার্থক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর শেষ অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম মতে, এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। 'কিতাবুত-তালাক' -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেন– 'তুমি এক তালাক কিংবা কিছুই না'। উভয় মাসআলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে উল্লিখিত [জামিউস সাগীরের] মত সর্বসম্মত হলে [বুঝতে হবে] ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা আছে। তাঁর দলিল হলো, সে এক তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে أو [কিংবা] অব্যয়কে 'তালাক' ও 'না-বাচক' -এর মাঝে প্রয়োগ করার কারণে। সুতরাং এক তালাকের হিসাব রহিত হয়ে যাবে। আর 'তুমি তালাক' কথাটি শুধু আংশিক থাকবে। পক্ষান্তরে 'তুমি তালাক কিংবা নয়' কথাটি ভিন্ন। কেননা সে মূল তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তালাক পতিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো– [তালাক] গুণকে যখন সংখ্যার সাথে যুক্ত করা হয়, তখন সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা তালাক পতিত হয়।তুমি কি দেখ না, যদি সহবাসহীনা স্ত্রীকে 'তুমি তিন তালাক' বলে যে, তাহলে তিন তালাকই সাব্যস্ত হয়। যদি গুণবাচক শব্দ দ্বারা পতিত হতো, তাহলে 'তিন' শব্দটি অর্থহীন হতো। এর কারণ হলো, বস্তুত যা পতিত হয়, তা হলো উহ্য গুণান্বিত বিষয়টি অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্তা এক তালাকে; যেমন পূর্বে গেছে। আর যার সঙ্গে সংখ্যা সংশ্লিষ্ট, তা-ই যখন পতিত হয়, তখন মূল তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং কোনো কিছুই পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا الخ : যদি কেউ স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا [তুমি এক তালাক কিংবা নয়] - তাহলে তালাক পতিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– 'জামিউস সাগীর' কিতাবে মাসআলাটিকে বিনা মতপার্থক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দ্বিতীয় মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর প্রথম মত ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হলো, তার এ কথার দ্বারা এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। 'মাবসূত' কিতাবের 'কিতাবুত-তালাক' -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا شَيْئَ [তুমি এক তালাক কিংবা কিছুই না], তাহলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর উভয় মাসআলা [اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا এবং اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا شَيْئَ] -এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

জামিউস-সাগীরে বর্ণিত মতটি যদি সর্বসম্মত হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। একটি মত হলো– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا - মাসআলায় কোনো কিছুই পতিত হবে না। দ্বিতীয় মত হলো– এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। প্রথম মতটি জামিউস সাগীরে বর্ণিত হয়েছে, আর দ্বিতীয় মতটি 'মাবসূত' -এর 'কিতাবুত-তালাক' -এ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ اَوْ [কিংবা] -কে এক তালাক ও না-বাচক শব্দের মাঝে প্রয়োগ করার কারণে তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই এক তালাকের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। আর اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] কথাটি বহাল থাকবে। আর এ কথার দ্বারা এক তালাকে রাজ'ঈ হয় বলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। পক্ষান্তরে اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ لَا [তুমি তালাক কিংবা নয়] - কথাটি ভিন্ন। কেননা এখানে মূল তালাকের ক্ষেত্রেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কোনো তালাকই পতিত হবে না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, তালাক গুণটি যখন সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়; যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اِثْنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا [তুমি এক/দুই/ তিন তালাক] তখন সংখ্যার উল্লেখের দ্বারা তালাক পতিত হয়; গুণের দ্বারা নয়। আর কেউ যদি তার সহবাসহীনা স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا [তুমি তিন তালাক], তাহলে তিন তালাকই সাব্যস্ত হয়। তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি যদি গুণের ভিত্তিতে হতো তাহলে ثَلَاثًا [তিন]-এর উল্লেখ অনর্থক হতো। সংখ্যার ভিত্তিতে তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো– বস্তুতঃ যা পতিত হয়, তাহলো উহ্য ধাতু। সুতরাং اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً [তুমি এক তালাকপ্রাপ্তা] -এর অর্থ হবে اَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً [তুমি তালাকপ্রাপ্তা, এক তালাক]। আর যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা-ই যখন পতিত হয় তখন মূল তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সন্দেহের সৃষ্টি হলো। আর সন্দেহের কারণে কোনো তালাকই পতিত হবে না।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِيْ اَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ لِاَنَّهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلٰى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ لِاَنَّ مَوْتَهُ يُنَافِي الْاَهْلِيَّةَ وَمَوْتُهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَابُدَّ مِنْهُمَا وَاِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ اِمْرَأَتَهُ اَوْ شِقْصًا مِنْهَا اَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا اَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ اَمَّا مِلْكُهَا اِيَّاهُ فَلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوْكِيَّةِ وَاَمَّا مِلْكُهُ اِيَّاهَا فَلِاَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضَرُوْرِيٌّ وَلَا ضَرُوْرَةَ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِيْ وَلَوْ اِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ لِاَنَّ الطَّلَاقَ يَسْتَدْعِيْ قِيَامَ النِّكَاحِ وَلَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِيْ لَا مِنْ وَجْهٍ وَلَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَذَا اِذَا مَلَكَتْهُ اَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يَقَعُ لِاَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَا عِدَّةَ هُنَالِكَ حَتّٰى حَلَّ وَطْيُهَا لَهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুমি তালাক' কিংবা 'তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুমি তালাক' তাহলে কিছুই হবে না। কেননা সে তালাককে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা তালাকের পরিপন্থি। কারণ তার [স্বামীর] মৃত্যু তালাক প্রদানের যোগ্যতার পরিপন্থি। আর স্ত্রীর মৃত্যু তালাকের ক্ষেত্র থাকার পরিপন্থি। অথচ উভয়ের বিদ্যমানতা জরুরি। স্বামী যদি স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর কোনো অংশের মালিক হয়ে যায় কিংবা স্ত্রী যদি স্বামীর কিংবা স্বামীর কোনো অংশের মালিক হয়ে যায়, তাহলে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে– দুই ধরনের মালিকানার মাঝে বৈপরীত্য থাকার কারণে। স্ত্রী স্বামীর মালিক হলে– মালিক হওয়া ও মালিকানাধীন হওয়া একই ক্ষেত্রে একত্র হয়। আর স্বামী স্ত্রীর মালিক হলে বৈপরীত্যের কারণ হলো, বিবাহের মালিকানা অত্যাবশ্যক আর দেহসত্তার মালিকানা থাকায় প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। সুতরাং তা [বিবাহের সূত্রের মালিকানা] বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রীকে ক্রয় করে অতঃপর তালাক দেয়, তাহলে কোনো কিছুই হবে না। কেননা তালাক বিবাহের উপস্থিতিকে দাবি করে। আর বৈপরীত্যের সাথে বিবাহের অস্তিত্ব নেই– আংশিকভাবে নেই আবার সামগ্রিকভাবেও নেই। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি স্বামীর কিংবা স্বামীর কোনো অংশের মালিক হয়, তাহলে তালাক পতিত হবে না [উভয় মালিকানার মাঝে] বৈপরীত্যের কারণে, যা আমরা [ইতঃপূর্বে] বলেছি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তালাক পতিত হবে। কেননা তার ইদ্দত ওয়াজিব। প্রথম সুরত এর বিপরীত। কারণ সেখানে কোনো ইদ্দত নেই বলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِيْ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِيْ [তুমি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তালাক] কিংবা বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِكَ [তুমি তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে তালাক], তাহলে সর্বসম্মতভাবে তালাক পতিত হবে না।

উল্লেখ্য, مَعَ [সাথে] অব্যয়টি ক্রিয়ামূলের সাথে আসলে তা بَعْدَ [পরে] -এর অর্থ দেয়। যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ [তোমাকে বিবাহ করার সাথে সাথে তুমি তালাক] বাক্যে مَعَ অর্থ بعد অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করার পর পরই তুমি তালাক। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায় مَعَ مَوْتِىْ কিংবা مَعَ مَوْتِكِ অর্থ بَعْدَ مَوْتِىْ তথা আমার মৃত্যুর পরেই তুমি তালাক কিংবা بَعْدَ مَوْتِكِ তথা তোমার মৃত্যুর পরেই তুমি তালাক।

আলোচ্য মাসআলায় তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো, তালাককে এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা তালাকের পরিপন্থি। এর কারণ হলো, স্বামীর মৃত্যুর ফলে সে তালাক প্রদানের যোগ্যতা হারায়, আর স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে তালাকের ক্ষেত্রই থাকে না। অথচ তালাক পতিত হওয়ার জন্য উভয়ের বিদ্যমানতা জরুরি।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ اِمْرَأَتَهُ الخ : স্বামী যদি ক্রয়, উত্তরাধিকার, উপহার ইত্যাদির যে-কোনো পন্থায় স্ত্রীর মালিকানা লাভ করে কিংবা স্ত্রীর অংশবিশেষের মালিক হয়, অনুরূপভাবে স্ত্রীও যদি স্বামীর কিংবা স্বামীর কোনো অংশের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কেননা বিবাহ সূত্রের মালিকানা ও দেহসত্তার মালিকানার মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। এর কারণ হলো– স্ত্রী যখন স্বামীর মালিক হয়ে যায়, তখন মালিক হওয়া ও মালিকানাধীন হওয়া একই ক্ষেত্রে একত্র হচ্ছে। কেননা বিবাহ সূত্রের মালিকানার দাবি হলো, স্ত্রী মালিকানাধীন হবে। আর দেহসত্তার মালিকানার দাবি হলো, স্ত্রী মালিক হবে। আর একই ক্ষেত্রে দু'ধরনের মালিকানা একত্র হতে পারে না। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

আর স্বামী যখন তার স্ত্রীর মালিক হয়, তখন বৈপরীত্যের কারণ হলো– বিবাহ সূত্রের মালিকানা প্রয়োজনভিত্তিক সাব্যস্ত। কেননা স্বাধীন সত্তার উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি কিয়াস পরিপন্থি। এজন্যই এ মালিকানা জরুরি প্রয়োজনভিত্তিক। আর দেহসত্তার মালিকানা থাকা অবস্থায় প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। সুতরাং বিবাহসূত্রের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ক্রয় করে অতঃপর তালাক দেয়, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা তালাকের দাবি হলো, বিবাহের বিদ্যমানতা। আর দেহসত্তার মালিকানা থাকার কারণে বিবাহের অস্তিত্ব না থাকার কারণ হলো, এ ক্রয়কৃত দাসীর জন্য ইদ্দত ওয়াজিব নয়। আর সামগ্রিকভাবে বিবাহের অস্তিত্ব না থাকার কারণ হলো, বিবাহ সূত্রের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে স্বাধীন স্ত্রী যদি দাস স্বামীর মালিকানা লাভ করে কিংবা তার অংশবিশেষের মালিক হয়, তাহলে তালাক হবে না। কেননা মালিক হওয়া ও মালিকানাধীন হওয়া একই ক্ষেত্রে একত্র হতে পারে না– বিবাহ সূত্রের মালিকানা ও দেহভিত্তিক মালিকানার মাঝে বৈপরীত্যের কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। স্ত্রী যদি স্বামীর মালিক হয়ে যায় আর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে। কেননা এই মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব। আর ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া থেকে বুঝা যায়, আংশিকভাবে বিবাহের অস্তিত্ব ছিল। এজন্যই তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতের মাসআলাটি ভিন্ন। অর্থাৎ স্বামী তার দাসী স্ত্রীকে ক্রয় করার পর তালাক দিলে তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো, এই মহিলার জন্য ইদ্দত ওয়াজিব নয়। এজন্যই ঐ মালিক স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ। আর ইদ্দত না থাকার কারণে আংশিকভাবে বিবাহের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ কারণেই এ সুরতে তালাক পতিত হবে না।

وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ فَأَعْتَقَهَا مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطْلِيقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَنْتَظِمُهُمَا وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَلِلْحُكْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ وَالْمَذْكُورُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيقُ لِأَنَّ فِي التَّعْلِيقَاتِ يَصِيرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ عِنْدَنَا وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ يُوجَدُ بَعْدَهُ ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيقِ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعِتْقِ فَيُصَادِفُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً بِالثِّنْتَيْنِ يَبْقَى شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ قُلْنَا قَدْ يُذْكَرُ لِلتَّأَخُّرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ .

অনুবাদ : অন্যের দাসী থাকা অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তোমার মনিব তোমাকে আজাদ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুই তালাক। এরপর মনিব তাকে আজাদ করল, তাহলে স্বামীর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা স্বামী তালাক প্রদানকে আজাদ করা বা আজাদ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কারণ عِتْق শব্দটি উভয় অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর শর্ত হলো তা-ই, যা বর্তমানে অস্তিত্বহীন, কিন্তু অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে এবং তার সাথে হুকুমের সম্পর্ক থাকে। আর বর্ণিত বিষয়টি এই গুণসম্পন্ন। আর এর সঙ্গে তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা আমাদের মতে, সম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় তালাক প্রদান বলে সাব্যস্ত হবে। আর যখন তালাক প্রদান আজাদ করা কিংবা আজাদ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হলো, তখন তালাক প্রদান তার পরেই সাব্যস্ত হবে। আর তালাক প্রদানের পরে তালাকের অস্তিত্ব লাভ হবে। সুতরাং তালাক আজাদ হওয়া থেকে বিলম্বিত হবে। অতএব, প্রদত্ত তালাক স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে– আজাদ হওয়ার অবস্থায়। সুতরাং দুই তালাক দ্বারা চূড়ান্ত হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো مَعَ [সঙ্গে] শব্দটি যুক্ততা বুঝায়। [এর উত্তরে] আমরা বলি, বিলম্ব অর্থেও তা উল্লেখ করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - 'নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সহজতা।' এখানে مَعَ [সাথে] দ্বারা 'পরে', বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শর্তের যে অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি, সে আলোকে مَعَ [সংঙ্গে] শব্দটিকে 'পরে' অর্থে গ্রহণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ الخ : এক ব্যক্তি তার স্ত্রী – যে অন্যের দাসী, তাকে বলল– أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ - 'তোমার মনিব তোমাকে আজাদ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুই তালাক।' অতঃপর মনিব তাকে আজাদ করল, তাহলে দুই তালাকে রাজ'ঈ হবে। স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। আলোচ্য মাসআলায় তিনটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

১. تَعْلِيْق [সম্পৃক্তকরণ] বলা হয় এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে সম্পৃক্তকরণ। যাকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাকে বলা হয় مَشْرُوط [শর্তযুক্ত]। আর যার উপর সম্পৃক্ত করা হয়, তাকে বলে شَرْط [শর্ত]। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শর্ত হলো এমন একটি বিষয় যা বর্তমানে অবিদ্যমান, কিন্তু বিদ্যমানতার সম্ভাবনা থাকে এবং তার সাথে হুকুমের সম্পর্ক থাকে। আলোচ্য মাসআলায় এ বিষয়টি পাওয়া যায়। কেননা আজাদ করার বিষয়টি বর্তমানে অবিদ্যমান, কিন্তু বিদ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং হুকুম [তালাক] তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং আজাদ হওয়াটা হলো শর্ত, আর তালাক পতিত হওয়াটা হলো শর্তযুক্ত।

২. তালাক প্রদান [تَطْلِيْق] কর্মটি আজাদ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত; তালাকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা স্বামী তালাক প্রদান কর্মটির মালিক; আর তালাক পতিত হওয়া একটি শরয়ী বিধান; তা ব্যক্তি মালিকানার উর্ধ্বে। এ কারণে তালাক প্রদানের বিষয়টি স্বামীর পক্ষ থেকেই সম্পৃক্ত হয়। এ বিষয়টিকে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আজাদ করার সঙ্গে তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা সম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মতে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় তালাক প্রদান বলে সাব্যস্ত হবে।

৩. তালাক প্রদান [تَطْلِيْق] আজাদ করা বা আজাদ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা عِتْق শব্দটি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। প্রাসঙ্গিক এ আলোচনার পর আলোচ্য মাসআলার দলিলের মোদ্দাকথা হলো– স্বামী তালাক প্রদানকে আজাদ করা/হওয়ার সাথে যুক্ত করেছে। তাহলে আজাদ করা/ হওয়া এক্ষেত্রে শর্ত, আর তালাক প্রদান তার ফলাফল। আর ফলাফল যেহেতু শর্তের পরে হয়ে থাকে, সেহেতু আজাদ করা/ হওয়ার পরে তালাক প্রদান সাব্যস্ত হবে। এরপরে তালাকের অস্তিত্ব লাভ হবে। কেননা তালাক প্রদানের হুকুম হলো তালাক হওয়া। আর কোনো বস্তুর হুকুম সে বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পরে হয়ে থাকে। সুতরাং আজাদ করা/হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। আর আজাদ স্ত্রী দুই তালাকের দ্বারা চূড়ান্তভাবে হারাম হয় না। সুতরাং দুই তালাক সাব্যস্ত হওয়ার পর স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

قَوْلُهُ يَبْقَى شَيْئٌ الخ : এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলায় مَعَ [সঙ্গে] উল্লিখিত হয়েছে যা সংযুক্তির অর্থ দেয়। সুতরাং আজাদ হওয়ার পরে নয়; বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কথা।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়– আরবি ব্যাকরণের একটি মূলনীতি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, مَعَ [সঙ্গে] অব্যয়টি যদি ক্রিয়ামূলের সাথে উল্লেখ করা হয় তখন তা بَعْدَ [পরে/বিলম্ব] অর্থে আসে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে সহজতা]। আয়াতের অর্থ হলো– إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا - 'নিশ্চয় কষ্টের পরেই রয়েছে সহজতা।' কেননা مَعَ [সঙ্গে] অব্যয়টি اَلْعُسْرُ [কষ্ট হওয়া] ক্রিয়ামূলের সাথে আসার কারণে بَعْدَ [বিলম্ব/পরে] -এর অর্থ বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় সহজতা ও কষ্ট পরস্পর বৈপরীত্যপূর্ণ দু'টি বিষয় একত্র হওয়া আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাটিতেও مَعَ عِتْقِ [আজাদের সঙ্গে সঙ্গে] অর্থ– بَعْدَ عِتْقِ 'আজাদের পরপরই।'

وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْغَدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلٰثُ حِيَضٍ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَرَنَ الْإِيْقَاعَ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى حَيْثُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ الَّذِىْ عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ أَصْلُهُ الْإِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ فَيَكُوْنُ التَّطْلِيْقُ مُقَارِنًا لِلْعِتْقِ ضَرُوْرَةً فَتُطَلَّقُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَصَارَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُوْلٰى وَلِهٰذَا يُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِثَلٰثِ حِيَضٍ وَلَهُمَا أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَ ثُمَّ الْعِتْقُ يُصَادِفُهَا وَهِىَ أَمَةٌ فَكَذَا الطَّلَاقُ وَالطَّلْقَتَانِ تُحَرِّمَانِ الْأَمَةَ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُوْلٰى لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطْلِيْقَ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلٰى مَا قَرَّرْنَاهُ وَبِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيْهَا بِالْإِحْتِيَاطِ وَكَذَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيْظَةُ يُؤْخَذُ فِيْهَا بِالْإِحْتِيَاطِ وَلَا وَجْهَ إِلٰى مَا قَالَ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ فَالطَّلَاقُ يُقَارِنُ التَّطْلِيْقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ فَيَقْتَرِنَانِ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী বলে, আগামীকাল হলে তুমি দুই তালাক আর তার মনিবও বলল, আগামীকাল হলে তুমি আজাদ। তাহলে আগামীকাল হওয়ার পর সে তার জন্য হালাল হবে না– অন্য স্বামীকে বিবাহ করা পর্যন্ত। আর তার ইদ্দত হলো তিন হায়েজ। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। কেননা স্বামী তালাক প্রদানকে মনিবের আজাদ করার সঙ্গে যুক্ত করেছে। যেহেতু মনিব যে শর্তের সঙ্গে আজাদকরণকে সম্পৃক্ত করেছে, তার সঙ্গেই স্বামী তালাক প্রদানকে সম্পৃক্ত করেছে। আর সম্পৃক্ত বিষয়টি শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় কারণরূপে সাব্যস্ত হয়। আর আজাদ হওয়া আজাদ করার সঙ্গে সংযুক্ত। কেননা আজাদ করা আজাদ হওয়ার কারণ। এটি এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে যে, সক্ষমতা কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই জরুরি ভিত্তিতে তালাক প্রদান আজাদ হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে। সুতরাং আজাদ হওয়ার পর তালাক হবে। কাজেই এটি প্রথমোক্ত মাসআলার অনুরূপ হলো। আর এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে তার ইদ্দত তিন হায়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে। শায়খাইনের দলিল হলো, স্বামী তালাককে এমন একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে, যার সঙ্গে মনিব আজাদ করার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর আজাদকরণ যেহেতু তার সঙ্গে দাসী অবস্থায় যুক্ত হচ্ছে, তাই তালাক ও দাসী অবস্থায় যুক্ত হবে। আর দুই তালাক দাসীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হুরমত সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সে তালাক প্রদানকে মনিবের আজাদ করার সাথে যুক্ত করেছে। আর তাই আজাদ হওয়ার পর তালাক সাব্যস্ত হবে। ইতঃপূর্বে আমরা যা সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি, তার ভিত্তিতে। আর ইদ্দতের

মাসআলাটিও ভিন্ন। কেননা ইদ্দতের ক্ষেত্রে সতর্কতার দিকটি গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে চূড়ান্ত হুরমতের ক্ষেত্রেও সতর্কতার বিষয়টি গ্রহণ করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) যা বলেছেন, তার কোনো [যুক্তিযুক্ত] কারণ নেই। কেননা কার্যকারণ হওয়ার কারণে আজাদ হওয়ার বিষয়টি আজাদ করার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাহলে তালাকও সংযুক্ত হবে তালাক প্রদানের সাথে। কেননা তালাক প্রদান তালাক সাব্যস্ত হওয়ার মূল। সুতরাং উভয়টি একসঙ্গে কার্যকর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اِذَا جَاءَ غَدٌ فَاَنْتِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে [যে অন্যের দাসী] বলে– اِذَا جَاءَ غَدٌ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ [যখন আগামীকাল হবে, তখন তুমি আজাদ]; আর তার মনিবও তাকে বলল– اِذَا جَاءَ غَدٌ فَاَنْتِ حُرَّةٌ [যখন আগামীকাল হবে, তখন তুমি তালাক], তাহলে আগামীকাল হওয়ার পর সে দাসী স্ত্রী দুই তালাকপ্রাপ্তা হবে। যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আর তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দুই তালাকে রাজ'ঈ হবে। স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী তালাক প্রদানকে মনিবের আজাদ করার সঙ্গে যুক্ত করেছে। কেননা তালাক প্রদানকে এমন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যে শর্তের সাথে মনিবও আজাদ করার বিষয়টাকে সম্পৃক্ত করেছে। আর সে শর্তটি হলো, আগামীকালের আগমন। আর এ সম্পৃক্ত বিষয়টি শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময়ই কারণরূপে সাব্যস্ত হয়। আর আজাদ হওয়া আজাদ করার সঙ্গে সংযুক্ত। কেননা, আজাদ করা আজাদ হওয়ার ইল্লত তথা কারণ। আর ইল্লত তথা কারণ-এর মূল হলো, সক্ষমতা কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ বান্দার কর্ম তার সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, তালাক প্রদান ও আজাদ করা উভয়টির জন্য যেহেতু শর্ত একটিই, সেহেতু অনিবার্যভাবেই তালাক প্রদান আজাদ হওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। সুতরাং আজাদ হওয়ার পরেই তালাক সাব্যস্ত হবে। কাজেই এটা প্রথমোক্ত মাসআলার অনুরূপ হলো। প্রথমোক্ত মাসআলায় স্ত্রী আজাদ হওয়ার পর দুই তালাক পতিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে এখানেও তা-ই হবে। আর আজাদ মহিলা দুই তালাকের দ্বারা চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না। আর এ কারণেই সর্বসম্মতিক্রমে তার ইদ্দত তিন হায়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফাতহুল কাদীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মনিবের কথা اَنْتِ حُرَّةٌ [তুমি স্বাধীন] এবং স্বামীর কথা اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ [তুমি দুই তালাক] উভয়টিই আগামীকালের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে আজাদ করা এবং তালাক প্রদান একই সময়ে ঘটেছে। আর 'তুমি দুই তালাক'-এ কথার তুলনায় 'তুমি স্বাধীন' কথাটি اَوْجَزُ [সংক্ষিপ্ত]। আর বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে اَوْجَزُ আগে ঘটে বলে অত্র মাসআলায় প্রথমত আজাদ হওয়ার বিষয়টি আগে ঘটবে, অতঃপর তালাক পতিত হবে। আর আজাদ মহিলার ক্ষেত্রে দুই তালাকের দ্বারা চূড়ান্ত হুরমত সাব্যস্ত হয় না। আর এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বর্ণিত মাসআলায় দুই তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, স্বামী তালাককে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যার সঙ্গে মনিব আজাদ করার বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছে। আর আজাদ করার বিষয়টি দাসী অবস্থায় ঘটেছে বিধায় তালাকও দাসী অবস্থায় পতিত হবে। আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক চূড়ান্ত হুরমত সাব্যস্ত করে। এ কারণেই আলোচ্য মাসআলায় ঐ দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুই তালাক চূড়ান্ত হুরমত সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে প্রথম মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সেখানে তালাক প্রদানকে মনিবের আজাদকরণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই আজাদকরণ হলো শর্ত, আর তালাক প্রদান তার ফলাফল। আর ফলাফল শর্তের পরেই হয়ে থাকে। এ কারণেই এই প্রথম মাসআলায় আজাদ হওয়ার পরে তালাক পতিত হবে। ইদ্দতের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা ইদ্দতের ক্ষেত্রে সতর্কতার উপর আমল করা হয়। আর এ সতর্কতার কারণেই সেখানে তার ইদ্দত তিন হায়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে দলিল পেশ করেছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা আজাদ করা আজাদ হওয়ার ইল্লত [কার্যকারণ] হওয়ার কারণে যদি আজাদ হওয়া আজাদ করার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে তালাক প্রদান তালাকের কার্যকারণ হওয়ার কারণে তালাকও তালাক প্রদানের সাথে সংযুক্ত হবে। সুতরাং উভয়টি একসঙ্গে কার্যকর হবে।

فَصْلٌ فِى تَشْبِيْهِ الطَّلَاقِ وَ وَصْفِهِ

وَمَنْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا يُشِيْرُ بِالْاِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَهِىَ ثَلَاثٌ لِاَنَّ الْاِشَارَةَ بِالْاَصَابِعِ تُفِيْدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِىْ مَجْرَى الْعَادَةِ اِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا (اَلْحَدِيْثُ) وَاِنْ اَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَاِنْ اَشَارَ بِالثِّنْتَيْنِ فَهِىَ ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا وَالْاِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُوْرَةِ مِنْهَا وَقِيْلَ اِذَا اَشَارَ بِظُهُوْرِهَا فَبِالْمَضْمُوْمَةِ مِنْهَا وَاِذَا كَانَ تَقَعُ الْاِشَارَةُ بِالْمَنْشُوْرَةِ مِنْهَا فَلَوْ نَوَى الْاِشَارَةَ بِالْمَضْمُوْمَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً وَكَذَا اِذَا نَوَى الْاِشَارَةَ بِالْكَفِّ حَتّٰى يَقَعَ فِى الْاُوْلٰى ثِنْتَانِ دِيَانَةً وَفِى الثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لٰكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هٰكَذَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهُ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ فَبَقِىَ الْاِعْتِبَارُ لِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ ـ

অনুচ্ছেদ : তুলনা দিয়ে তালাক দেওয়া এবং তালাকের সাথে যুক্ত করা

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি এরূপ তালাক' – আর সে বৃদ্ধাঙ্গুলি, শাহাদাত ও মধ্যমা দ্বারা ইঙ্গিত করে, তাহলে তা তিন তালাক হবে। কেননা আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা প্রচলিত সংখ্যা বুঝায় – যখন তা অস্পষ্ট সংখ্যার সাথে যুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا "মাস হলো এরূপ এবং এইরূপ এবং এরূপ"....... [আল-হাদীস]। আর যদি এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর দুই আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলে দুই তালাক হবে। এর কারণ আমরা [ইতঃপূর্বে] বলেছি। ইশারা বিবেচ্য হবে ছড়ানো আঙ্গুলের দ্বারা। আর কেউ কেউ বলেন, আঙ্গুলের পৃষ্ঠ দ্বারা ইশারা করলে গুটানো আঙ্গুলগুলোর দ্বারা ইশারা বিবেচ্য হবে। ছড়ানো আঙ্গুল দ্বারা যখন ইশারা বিবেচ্য হবে, সেক্ষেত্রে যদি সে দু'টি গুটানো আঙ্গুলের ইশারার নিয়ত করে, তাহলে দীনি বিচারে তা বিশ্বাস্য, কিন্তু আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে হাতের তালুর দ্বারা ইশারার নিয়ত করলে প্রথম সুরতে দীনি বিচারে দুই তালাক এবং দ্বিতীয় সুরতে এক তালাক হবে। কেননা তা এটার সম্ভাবনা রাখে। তবে তা বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থি। আর যদি সে 'এরূপ' না বলে, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা [আঙ্গুলের ইশারা] কোনো অস্পষ্ট সংখ্যার সাথে যুক্ত হয়নি। সুতরাং 'তুমি তালাক' – তার [এই] কথাটিই বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) তালাক ও তার প্রকারভেদের বর্ণনা শেষে তুলনা দিয়ে তালাক দেওয়া এবং তালাকের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, বর্তমান আলোচনা হলো وَصْف, যা مَوْصُوْف [তথা পূর্ববর্তী আলোচনা]-এর পরেই আসে। এই মূল বিষয়ে আলোকপাত করার পর গ্রন্থকার সে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলোর বর্ণনা শুরু করেছেন। −[নিহায়া]।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে− أَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا [তুমি এরূপ তালাক], আর সে বৃদ্ধাঙ্গুলি, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। এর যৌক্তিক দলিল হলো, আঙ্গুলের ইশারা যদি অস্পষ্ট সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মে তা সংখ্যা বুঝায়। যেমন− হাদীসে এসেছে−

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ হাদীসে মাস গণনার ক্ষেত্রে আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন যে, মাস ২৯ দিনেও হয়। নবীজী ﷺ বলেছেন− اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا - অর্থাৎ 'মাস হলো এরূপ, এরূপ এবং এরূপ।' প্রথম দুই সুরতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই হাতের সমস্ত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন। আর তৃতীয় বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে গুটিয়ে রেখেছেন।

আর যদি هٰكَذَا [এরূপ] বলে এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে, তাহলে এক তালাক হবে। আর দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলে দুই তালাক হবে পূর্বোল্লিখিত দলিলের কারণে। অর্থাৎ, আঙ্গুলের ইশারা যদি অস্পষ্ট সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মে তা সংখ্যা বুঝায়।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْشُوْرَةِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ছড়ানো আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিবেচ্য হবে। তবে কারো কারো মত হলো, যদি আঙ্গুলের পৃষ্ঠ দ্বারা ইশারা করে, তাহলে গুটানো আঙ্গুলগুলো উদ্দেশ্য হবে। গুটানো আঙ্গুলগুলোর ভিত্তিতে তালাকের সংখ্যা বিবেচ্য হবে। ছড়ানো আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিবেচ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি ছড়ানো আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে কেউ যদি দু'টি বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা ইশারার নিয়ত করে, তাহলে দীনি বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি আঙ্গুলের পরিবর্তে হাতের তালুর ইশারার নিয়ত করে, তাহলে প্রথম সুরতে দীনি বিচারে দুই তালাক পতিত হবে, আর দ্বিতীয় সুরতে এক তালাক পতিত হবে। কেননা এটার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। আর এ কারণেই আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আদালতের বিচারে আঙ্গুলের দ্বারা ইশারাই বিবেচ্য হবে। হাতের তালুর ইশারার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর স্বামী যদি أَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] -এর সাথে هٰكَذَا [এরূপ] না বলে, তাহলে এক তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ইশারা কোনো অস্পষ্ট সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সুতরাং أَنْتِ طَالِقٌ [তোমার প্রতি তালাক] কথাটাই গ্র বিবেচ্য হবে।

وَإِذَا وُصِفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَّةِ كَانَ بَائِنًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقَعُ رَجْعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ شُرِعَ مُعَقِّبًا لِلرَّجْعَةِ فَكَانَ وَصْفُهُ بِالْبَيْنُونَةِ خِلَافَ الْمَشْرُوعِ فَيَلْغُو كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ وَلَنَا أَنَّهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْنُونَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ فَيَكُونُ هٰذَا الْوَصْفُ لِتَعْيِينِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ أَمَّا إِذَا نَوَى الثَّلٰثَ فَثَلٰثٌ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ عَنَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِهِ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أُخْرَى يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ بَائِنَتَانِ لِأَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ يَصْلُحُ لِابْتِدَاءِ الْإِيقَاعِ ـ

অনুবাদ : তালাকের সাথে যদি অতিরিক্ততা বা কঠোরতার গুণ যুক্ত করা হয়, তাহলে তালাক বায়েন হবে। যেমন বলল– তুমি তালাকে বায়েন কিংবা অকাট্য তালাক। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সহবাসের পরে হলে, এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা তালাক রাজ'আতযোগ্য করেই প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তাতে বায়েন হওয়ার গুণটি শরিয়তের অনুমোদন দানের বিপরীত। সুতরাং তা অনর্থক হবে। যেমন কেউ যদি বলে– তুমি এমন তালাক যে, তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনো অধিকার আমার নেই। আমাদের দলিল হলো, সে তালাককে এমন একটি গুণে গুণান্বিত করেছে, তালাক শব্দটি যার সম্ভাবনা রাখে। আর তাই তো [দেখুন না !] সহবাসের পূর্বে এবং ইদ্দতের পরে তা দ্বারা বায়েন হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ গুণটি দুই সম্ভাবনার কোনো একটি নির্ধারণের জন্য গণ্য হবে। আর রাজ'আতের মাসআলাটি গ্রহণীয় নয়। সুতরাং আর কোনো নিয়ত না থাকলে, কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক হবে। এর কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি। আর যদি 'তুমি তালাক' দ্বারা একটি এবং 'বায়েন' বা 'অকাট্য' দ্বারা আরেকটি তালাকের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দু'টি বায়েন তালাক হবে। কেননা এ গুণটি প্রাথমিকভাবে তালাক প্রদানের যোগ্যতা রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا وُصِفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ الخ : তালাকের সাথে যদি কঠোরতা কিংবা অতিরিক্ততার কোনো গুণ সংযোজিত হয়– যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ [তুমি তালাকে বায়েন] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ [তোমার প্রতি অকাট্য তালাক] তাহলে স্ত্রী তালাকে বায়েন হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সহবাসের পরে হলে এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতও এরূপ। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ৮৩]

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্পষ্ট তালাককে শরিয়ত রাজ'আতযোগ্য করে অনুমোদন করেছে। সুতরাং তাতে বায়েন হওয়ার গুণ আরোপ করা শরিয়তের অনুমোদনের পরিপন্থি। ফলে তা বাতিল হবে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى أَنْ لَا رَجْعَةَ لِيْ عَلَيْكِ [তোমার প্রতি এমন তালাক যে, তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনো অধিকার আমার নেই], তাহলে তালাকে রাজ'ঈ হবে, অনুরূপ আলোচ্য মাসআলায় এক তালাকে রাজ'ঈ হবে।

আমাদের দলিল হলো, স্বামী তালাককে এমন একটি গুণে গুণান্বিত করেছে, যে গুণের সম্ভাবনা রাখে তালাক শব্দটি। 'তুমি তালাক' – এ কথার মধ্যেও বায়েন হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। এ কারণেই তো, স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে সুস্পষ্ট তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়। অনুরূপভাবে ইদ্দতের পরে এ শব্দ দ্বারা বায়েন হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং সুস্পষ্ট তালাকের উপর আরোপিত গুণটি বায়েন ও রাজ'ঈ – এ দুই সম্ভাবনার কোনো একটি নির্ধারণের জন্য গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) রাজ'আত সংক্রান্ত যে মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন তা আমাদের মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলে- 'তোমার প্রতি এমন তালাক যে, তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনো অধিকার আমার নেই' - তাহলে আমাদের মতে, একটি বায়ন তালাক হবে, যদি তার কোনো নিয়ত না থাকে কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ عَنٰى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন- أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ [তোমার প্রতি বায়েন তালাক] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ [তোমার প্রতি অকাট্য তালাক]- বাক্যে যদি أَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা একটি তালাক এবং بَائِنٌ কিংবা اَلْبَتَّةَ - এই আরোপিত গুণ দ্বারা আরেকটি তালাক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দু'টি বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা بَائِنٌ ও اَلْبَتَّةَ - এই আলোচ্য গুণগুলো প্রাথমিকভাবে তালাক প্রদানের যোগ্যতা রাখে। যেমন- কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ بَائِنٌ [তুমি বায়েন] এবং তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে এখানেও এই গুণগুলো দ্বারা আরেকটি তালাক উদ্দেশ্য করা যাবে। আর দ্বিতীয় তালাকটি বায়ন হওয়ার কারণে প্রথম তালাকটিও বায়েন হবে। কেননা একই মহিলার উপর তালাকে রাজ'ঈ ও তালাকে বায়েন একই সঙ্গে পতিত হতে পারে না। যদিও কেউ কেউ এ ধরনের মত পোষণ করেছেন যে, প্রথমটা দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ ও দ্বিতীয়টা দ্বারা তালাকে বায়েন হবে। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ৮৫]।

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوْصَفُ بِهٰذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُوْنَةُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ وَكَذَا قَالَ أَخْبَثَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسْوَأَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ السُّنَّةُ فَيَكُوْنُ الْبِدْعَةُ وَطَلَاقُ الشَّيْطَانِ بَائِنًا وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ بَائِنًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُوْنُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ حَيْضٍ فَلَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُوْنُ رَجْعِيًّا لِأَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْنُوْنَةُ بِالشَّكِّ . وَكَذَا إِذَا قَالَ كَالْجَبَلِ لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وَ ذٰلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ وَكَذَا إِذَا قَالَ مِثْلَ الْجَبَلِ لِمَا قُلْنَا وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَكُوْنُ رَجْعِيًّا لِأَنَّ الْجَبَلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيْهًا بِهِ فِي تَوَحُّدِهِ .

অনুবাদ : তদ্রূপ তালাকে বায়েন হবে যখন বলে, তোমার প্রতি নিকৃষ্টতম তালাক। কেননা তালাকের ফলাফলের বিচারে এমন গুণে গুণান্বিত করা হয়। আর সে ফলাফল হলো তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং তা তার উক্তি 'বায়েন' বলার মতো হলো। অনুরূপভাবে যদি বলে, অতিশয় ঘৃণিত তালাক কিংবা অতি মন্দ তালাক। পূর্বে এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। তদ্রূপ যদি বলে, শয়তানের তালাক কিংবা বিদ'আতী তালাক। কেননা রাজ'ঈ হলো সুন্নত তালাক। কাজেই বিদ'আতী তালাক কিংবা শয়তানের তালাক বায়েন হবে। 'তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক' -এর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, নিয়ত ছাড়া বায়েন তালাক হবে না। কেননা বিদ'আত তালাক কখনো কখনো হায়েজ অবস্থায় প্রদানের মাধ্যমেও হয়। সুতরাং নিয়ত আবশ্যক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বামী যখন বলে, তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক কিংবা শয়তানি তালাক, তাহলে তা তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা এ গুণটি হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদানের মাধ্যমেও পাওয়া যায়। সুতরাং সন্দেহের কারণে বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, পাহাড়ের ন্যায় [তালাক দিলাম]। কেননা পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা অবশ্যিকভাবেই অতিরিক্ত প্রমাণ করে। আর তা অতিরিক্ত গুণ সাব্যস্ত করার দ্বারা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যদি বলে, পাহাড়ের সদৃশ তালাক। এর কারণ আমরা বলেছি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা পাহাড় একটি বস্তু। সুতরাং পাহাড়ের সাথে এ উপমা এককত্বের মাঝে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ الخ : যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত চারটি বিশেষণে বিশেষায়িত করে; যেমন– أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ [তোমার প্রতি নিকৃষ্টতম তালাক]; أَنْتِ طَالِقٌ أَخْبَثَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسْوَأَهُ [তোমার প্রতি অতিশয় ঘৃণিত তালাক কিংবা অতি মন্দ তালাক]; أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ [তোমার প্রতি শয়তানী তালাক]; أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ [তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক] – তাহলে স্ত্রীর প্রতি তালাকে বায়েন পতিত হবে। পূর্ববর্ণিত أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ -এর মতোই এগুলোর হুকুম আবর্তিত হবে। অর্থাৎ, যদি স্বামী উপরিউক্ত বিশেষায়িত কথাগুলো দ্বারা তালাক দেয়, আর কোনো নিয়ত না করে, কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি أَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা এক তালাক এবং বিশেষণগুলোর দ্বারা আরেক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে দু'টি বায়েন তালাক পতিত হবে।

أَفْحَشُ، أَخْبَثُ، أَسْوَأُ এ জাতীয় বিশেষণ যোগের ফলে বায়েন তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, তালাকের ফলাফলের লক্ষ্যে এ জাতীয় বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়। আর এর ফলাফল হলো, তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সুতরাং তা أَنْتِ بَائِنٌ -এর মতো হলো। আর طَلَاقَ الشَّيْطَانِ ، طَلَاقَ الْبِدْعَةِ বিশেষণের ফলে তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার কারণ হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন, তালাকে রাজ'ঈ হলো সুন্নত মোতাবেক তালাক। সুতরাং বিদ'আতী বা শয়তানি তালাক অবশ্যই বায়েন তালাক হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের এ বক্তব্যকে যথার্থ বলা যায় না। কেননা রাজ'ঈ তালাক হওয়ার জন্য সুন্নত মোতাবেক তালাক হওয়া জরুরি নয়। যেমন– হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তা তালাকে রাজ'ঈ হিসেবে গণ্য হলেও সুন্নত মোতাবেক তালাক নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ [তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক] তাহলে নিয়ত ছাড়া বায়েন তালাক হবে না। কেননা বিদ'আতী তালাক কখনো 'বায়েন' হওয়ার কারণে হয়, আবার কখনো হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদানের মাধ্যমেও হয়। সুতরাং বায়েন তালাক হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ [তোমার প্রতি বিদ'আতী তালাক] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ [তোমার প্রতি শয়তানি তালাক], তাহলে তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা তালাকের এ গুণ হায়েজের অবস্থায় তালাক প্রদানের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সন্দেহের কারণে বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ كَالْجَبَلِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ كَالْجَبَلِ [পাহাড়ের ন্যায় তোমার প্রতি তালাক] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ الْجَبَلِ [তোমার প্রতি পাহাড়ের সদৃশ তালাক], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। তালাকে বায়েন হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা অনিবার্যভাবে অতিরিক্ততা প্রমাণ করে। আর অতিরিক্ততা সংখ্যাগত দিকে থেকে যেমন হয়, তেমনি গুণগত দিক থেকেও হয়। এ ক্ষেত্রে গুণগত দিক থেকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত হবে। আর অতিরিক্ততা হলো 'বায়েন' হওয়া। সুতরাং আলোচ্য কথাগুলোর দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হবে।
আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পাহাড় হলো একটি বস্তু। আর পাহাড়ের সাথে তালাকের এই উপমা এককত্বের ক্ষেত্রে গণ্য হবে। অর্থাৎ পাহাড় যেমন এক, তদ্রূপ তোমার প্রতি এক তালাক। সুতরাং এ ধরনের তুলনা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হবে না।

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اَشَدَّ الطَّلَاقِ اَوْ كَاَلْفٍ اَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ ثَلٰثًا اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّدَّةِ وَهُوَ الْبَائِنُ لِاَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْاِنْتِقَاضَ وَالْاِرْتِفَاضَ اَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি (স্বামী) স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি কঠিনতম তালাক কিংবা হাজারের মতো তালাক কিংবা ঘর ভর্তি তালাক, তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তা-ই হবে। প্রথমটির কারণ এই যে, তালাককে সে কঠোরতার সাথে গুণান্বিত করেছে; আর সেটা হলো বায়েন তালাক। কেননা, তা ভেঙ্গে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করার সম্ভাবনা রাখে না। পক্ষান্তরে তালাকে রাজ'ঈতে সে সম্ভাবনা আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اَشَدَّ الطَّلَاقِ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اَشَدَّ الطَّلَاقِ [তোমার প্রতি কঠিনতম তালাক]; কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ كَاَلْفٍ [তোমার প্রতি হাজারের মতো তালাক]; কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ مِلْأَ الْبَيْتِ [তোমার প্রতি ঘর ভর্তি তালাক], তাহলে এ তিনটি উপমার প্রতিটির ক্ষেত্রেই স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হবে। তবে স্বামী যদি এসব উপমার দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে।

প্রথম উপমা– اَنْتِ طَالِقٌ اَشَدَّ الطَّلَاقِ [তোমার প্রতি কঠিনতম তালাক] দ্বারা তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো– স্বামী এখানে তালাককে কঠোরতার গুণের সাথে বিশেষায়িত করেছে। আর এ কঠোরতা বিশেষণটি বায়েন তালাকের মাঝে বিদ্যমান। কেননা, বায়েন তালাকের পর তালাককে ভেঙ্গে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করার অবকাশ থাকে না। এ কারণেই বায়েন তালাক পতিত হবে। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা সে তালাক ধাতুর উল্লেখ করেছে, যা এক তালাককে সাব্যস্ত করে, আর তিন তালাককে সমষ্টিগতভাবে একের হুকুম রাখে।

দ্বিতীয় উপমা– اَنْتِ طَالِقٌ كَاَلْفٍ [তোমার প্রতি হাজারের মতো তালাক] দ্বারা তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো– اَلْفٌ [হাজার] শব্দটি দ্বারা কখনো শক্তিমত্তার ক্ষেত্রে তুলনা/উপমা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আবার কখনো সংখ্যার ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়ে থাকে। যেমন প্রচলিত আছে– هُوَ اَلْفُ رَجُلٍ [সে একাই একহাজার]। অর্থাৎ, সে একহাজার লোকের ন্যায় শক্তিশালী। এখানে হাজার শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির শক্তিমত্তার উপমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কথায় শক্তিমত্তা ও সংখ্যা উভয়ের সম্ভাবনা থাকার কারণে উভয়টির নিয়তই শুদ্ধ হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় উভয়ের মতে অল্পতরটি সাব্যস্ত হবে। আর তিন তালাকের তুলনায় একটি বায়েন তালাক কম ও লঘু বলে একটি বায়েন তালাকই সাব্যস্ত হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নিয়ত না থাকলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা اَلْفٌ [হাজার] সংখ্যাবাচক শব্দ। আর বাহ্যিকভাবে সংখ্যার তুলনায় উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলাটি এরূপ হল্লো, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ اَلْفٍ - 'তোমার প্রতি একহাজার সংখ্যার মতো তালাক।' আর এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে তিন তালাক পতিত হয়।

তৃতীয় উপমা– اَنْتِ طَالِقٌ مِلْأَ الْبَيْتِ [তোমার প্রতি ঘর ভর্তি তালাক] দ্বারা তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো– কোনো জিনিস তার মর্যাদাগত বড়ত্ব দ্বারা কখনো ঘর পূর্ণ করে, আবার কখনো পূর্ণ করে তার অধিক সংখ্যা দ্বারা। আর তালাকের ক্ষেত্রে বায়েন হওয়ার মধ্য দিয়ে গুরুত্বতা প্রকাশ পায় এবং তিন তালাক হওয়ার মধ্য দিয়ে সংখ্যাধিক্য প্রকাশ পায়। উভয়টির সম্ভাবনা থাকার কারণে যে নিয়তই করবে, সে নিয়ত দুরস্ত হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় অল্পতরটি সাব্যস্ত হবে– সেটিই হলো এক তালাকে বায়েন।

وَإِنَّمَا تَصِحُّ فِيْهِ الثَّلْثُ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهٰذَا التَّشْبِيْهِ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَفِي الْعَدَدِ أُخْرٰى يُقَالُ هُوَ أَلْفُ رَجُلٍ وَيُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ فَيَصِحُّ نِيَّةُ الْأَمْرَيْنِ وَعِنْدَ فُقْدَانِهَا يَثْبُتُ أَقَلُّهُمَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ يَقَعُ الثَّلْثُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ لِأَنَّهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِيْهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ أَلْفٍ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعَظْمَةٍ فِيْ نَفْسِهِ وَقَدْ يَمْلَأُ لِكَثْرَتِهِ فَأَيُّ ذٰلِكَ نَوٰى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَعِنْدَ اِنْعِدَامِ النِّيَّةِ ثَبَتَ الْأَقَلُّ ثُمَّ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ مَتٰى شُبِّهَ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ يَقَعُ بَائِنًا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ ذُكِرَ الْعِظَمُ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّشْبِيْهَ يَقْتَضِيْ زِيَادَةَ وَصْفٍ وَعِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) إِنْ ذُكِرَ الْعِظَمُ يَكُوْنُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ قَدْ يَكُوْنُ فِي التَّوْحِيْدِ عَلَى التَّجْرِيْدِ أَمَّا ذِكْرُ الْعِظَمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) إِنْ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مِمَّا يُوْصَفُ بِالْعِظَمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنًا وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيٌّ وَقِيْلَ مُحَمَّدٌ (رحـ) مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقِيْلَ مَعَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَبَيَانُهُ فِيْ قَوْلِهِ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِثْلَ عِظَمِ رَأْسِ الْإِبْرَةِ وَمِثْلَ الْجَبَلِ مِثْلَ عِظَمِ الْجَبَلِ ـ

অনুবাদ : আর তালাক-ক্রিয়ামূল উল্লেখের কারণে তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। দ্বিতীয়টির কারণ এই যে, কখনো এ ধরনের তুলনা শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আবার কখনো সংখ্যার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– সে একাই এক হাজার। আর এ কথার দ্বারা শক্তিমত্তা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং শক্তিশালী হওয়া ও সংখ্যা উভয়ের নিয়তই শুদ্ধ হবে। আর নিয়ত না থাকলে উভয়ের মধ্যে লঘুটি সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, নিয়ত না থাকলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা এটা সংখ্যা। সুতরাং বাহ্যিকভাবে সংখ্যার তুলনা উদ্দেশ্য হবে। কাজেই তা এরূপ হলো– তোমার প্রতি এক হাজার সংখ্যার মতো তালাক। তৃতীয়টির কারণ এই যে, কেননা কোনো জিনিস ঘর পূর্ণ করে সত্তাগত মর্যাদা দ্বারা, আবার কখনো পূর্ণ করে তার আধিক্য দ্বারা সুতরাং যে নিয়তই করবে, তা-ই বিশুদ্ধ হবে। আর নিয়ত না থাকলে অল্পতরটি সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মূলনীতি হলো, তালাককে যখন কোনো কিছুর সাথে উপমা দেয়, তখন বায়েন তালাক হবে– উপমার বস্তু যা-ই হোক না কেন; বড়ত্বের কথা উল্লেখ করুক বা না করুক। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে– উপমা গুণের অতিরিক্ততা প্রমাণ করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, বড়ত্ব প্রকাশক কিছু উল্লেখ করলে বায়েন তালাক হবে; অন্যথায় নয়। উপমার বস্তু যা-ই হোক। কেননা, বড়ত্ব থেকে মুক্ত উপমাটি এককত্বের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। কিন্তু বড়ত্বের উল্লেখ অবধারিতভাবে অতিরিক্ত গুণ প্রকাশের জন্য হবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে,

যার সাথে উপমা দেওয়া হয়, তা যদি মানুষের নিকট গুরুতর গুণে গুণান্বিত হয়, তাহলে বায়েন তালাক হবে; অন্যথায় তালাকে রাজ'ঈ হবে। কোনো কোনো মতে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে রয়েছেন। আবার কোনো কোনো মতে, তিনি আবূ ইউসুফ (র.) -এর সাথে রয়েছেন। আর এই মতপার্থক্যের প্রকাশ ঘটে স্বামীর এ কথায়– সুইয়ের মাথার মতো; সুইয়ের মাথার মতো বড় কিংবা পাহাড়ের মতো বা পাহাড়ের মতো বড়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْاَصْلُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : এ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি মূলনীতি উল্লেখ করেন। মূলনীতিটি হলো– তালাককে যখন কোনো কিছুর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়, তখন বায়েন তালাক হয়– উপমার বস্তুটি যাই হোক।

গুরুতরতার কথা উল্লেখ থাক বা না থাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, যদি গুরুতরতা প্রকাশক শব্দ উল্লেখ থাকে তাহলে তালাকে বায়েন হবে অন্যথায় নয়; উপমার বস্তু যাই হোক। কেননা কখনো কখনো উপমাটি গুরুতরতা থেকে মুক্ত অবস্থায় এককত্বের উদ্দেশ্যেও হয়ে থাকে। আর গুরুতরতা শব্দের উল্লেখ অবধারিতভাবেই অতিরিক্ত অর্থ দেবে। অপর দিকে ইমাম যুফার (র.) বলেন, উপমার বাছাই (مُشَبَّه بِهٖ) যদি এমন হয়, যা মানুষের নিকট গুরুতর বিশেষণে বিশেষায়িত হয়ে থাকে, তাহলে বায়েন তালাক হবে। অন্যথায় রাজ'ঈ তালাক হবে– গুরুতরতার কথা উল্লেখ থাক বা না থাক।

তালাককে যদি এমন বিশেষণের সাথে বিশেষায়িত করা হয়, যা অতিরিক্ততার অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত এমনটিই। আর যদি তালাককে এমন বিশেষণের সাথে বিশেষায়িত করা হয়, যা অতিরিক্ততার অর্থ প্রকাশ করে না, তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ اَحْسَنَ الطَّلَاقِ اَوْ اَجْمَلَ الطَّلَاقِ [তোমার প্রতি সর্বোত্তম তালাক বা সুন্দরতম তালাক], তাহলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের ক্ষেত্রে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সঙ্গে রয়েছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর সাথে রয়েছেন।

উপরিউক্ত মতামত নিম্নোক্ত উদাহরণগুলোতে অভিব্যক্ত হয়। যেমন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ رَأْسِ الْاِبْرَةِ [তোমার প্রতি সুইয়ের মাথার মতো তালাক], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, একটি রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ عِظَمِ رَأْسِ الْاِبْرَةِ [তোমার প্রতি সুইয়ের মাথার মতো বড় তালাক], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, বায়েন তালাক পতিত হবে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তালাকে রাজ'ঈ হবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ الْجَبَلِ [তুমি পাহাড়ের মতো তালাক] - তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর যদি বলে– اَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ عِظَمِ الْجَبَلِ [তোমার প্রতি পাহাড়ের মতো বড় তালাক], তাহলে উক্ত তিন ইমামের মতেই তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট তালাককে পাহাড়ের সাথে উপমা দেওয়ার কারণে বায়েন তালাক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট গুরুতরতা প্রকাশক শব্দ উল্লেখ থাকার কারণে এবং ইমাম যুফার (র.) -এর নিকট উপমার বাছাই এখানে পাহাড়, যা মানুষের নিকট গুরুতর বিশেষণে বিশেষায়িত– এ কারণে বায়েন তালাক পতিত হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً اَوْ عَرِيْضَةً اَوْ طَوِيْلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ لِاَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَائِنُ وَمَا يَصْعَبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ لِهٰذَا الْاَمْرِ طَوْلٌ وَعَرْضٌ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّةٌ لِاَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ لَا يَلِيْقُ بِهٖ فَيَلْغُوْ وَلَوْ نَوَى الثَّلٰثَ فِيْ هٰذِهِ الْفُصُوْلِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ لِتَنَوُّعِ الْبَيْنُوْنَةِ عَلٰى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে, 'তোমার প্রতি একটি প্রচণ্ড তালাক, কিংবা প্রশস্ত তালাক অথবা লম্বা তালাক', তাহলে একটি বায়েন তালাক হবে। কেননা যে তালাকের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়, তা স্বামীর জন্য প্রচণ্ড হবে। আর সেটি হলো বায়েন তালাক। যে জিনিসের ক্ষতিপূরণ কঠিন হয়ে থাকে, এ ধরনের বিষয়কে বিস্তৃত ও দীর্ঘ বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে। কেননা এ ধরনের বিশেষণ তালাকের সঙ্গে মানানসই নয়; সুতরাং তা বাতিল বিবেচ্য হবে। আর যদি এ ক্ষেত্রগুলোতে তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে– বায়েন তালাক বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সকল শব্দ দ্বারা যে তালাক পতিত হয়, তা বায়েন তালাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় প্রচণ্ডতা, দৈর্ঘ্য কিংবা প্রশস্ততা বিশেষণে তালাককে বিশেষায়িত করে, তাহলে বায়েন তালাক পতিত হবে। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন, স্বামীর জন্য এমন ধরনের তালাক প্রচণ্ড হবে, যে তালাকের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়– রাজ'আত কিংবা অন্য কোনোভাবে। আর সে ধরনের তালাক হলো বায়েন তালাক। আর স্বামীর পক্ষে যে জিনিসের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়, সেটিকে দীর্ঘ ও বিস্তৃত বলা হয়।

ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, যেহেতু এ ধরনের উপমা বাছাই মানুষের নিকট গুরুতর বিশেষণে বিশেষায়িত নয়, তাই বায়েন তালাক হবে না; বরং রাজ'ঈ তালাক হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের কথার দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা প্রচণ্ডতা, দৈর্ঘ্য কিংবা বিস্তৃত-বিশেষণগুলো তালাকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এসব বিশেষণ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তালাক হলো বিমূর্ত। সুতরাং বিশেষণগুলো বাতিল গণ্য হবে। শুধুমাত্র– اَنْتِ طَالِقٌ – "তোমার প্রতি তালাক"– কথার দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى الثَّلٰثَ فِى الخ : উল্লিখিত সুরতগুলোতে স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা বায়েন তালাক দুই প্রকার। চূড়ান্ত বায়েন তালাক ও সাধারণ বায়েন তালাক। তিন তালাকের নিয়ত করলে চূড়ান্ত বায়েন তালাকের নিয়ত হিসেবে বিবেচ্য হবে। স্বামীর কথায় এ ধরনের নিয়তের অবকাশ আছে বলে তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। তবে ইমাম যাহিদ আত্তাবী (র.) জামিউ সাগীরের ব্যাখ্যায় প্রচণ্ডতা, দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃত বিশেষণযোগে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম সারাখসী (র.)-ও একই কথা বলেছেন। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ৯০]

فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثَلٰثًا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا لِاَنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ لِاَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلٰثًا عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ اِيْقَاعًا عَلٰى حِدَةٍ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً فَاِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْاُوْلٰى وَلَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ اِيْقَاعٌ عَلٰى حِدَةٍ اِذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيْ اٰخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدْرَهُ حَتّٰى يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ فَتَقَعُ الْاُوْلٰى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا الثَّانِيَةُ وَهِيَ مُبَانَةٌ وَكَذَا اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهَا بَانَتْ بِالْاُوْلٰى وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا لِاَنَّهُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ فَكَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْعَدَدُ فَاِذَا مَاتَتْ قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ فَاتَ الْمَحَلُّ قَبْلَ الْاِيْقَاعِ فَبَطَلَ وَكَذَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا لِمَا بَيَّنَّا وَهٰذِهِ تُجَانِسُ مَا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى .

অনুচ্ছেদ : সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে

অনুবাদ : সহবাসের পূর্বে কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তখন স্ত্রীর উপর তা পতিত হবে। কেননা তালাক পতিত হচ্ছে উহ্য শব্দমূল দ্বারা। কারণ তার অর্থ طَلَاقًا ثَلَاثًا - "তুমি তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা– পূর্বে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার ভিত্তিতে। অতএব, 'তুমি তালাক' কথাটা ভিন্নভাবে সাব্যস্ত হবে না; বরং একত্রে সবগুলো পতিত হবে। আর যদি [সহবাসহীনা স্ত্রীকে] ভিন্ন ভিন্নভাবে [তিন] তালাক দেয়, তাহলে প্রথমটি দ্বারা বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। যেমন বলল– তুমি তালাক, তালাক, তালাক। কেননা প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্নভাবে পতিত হবে। কারণ সে তার কথার শেষাংশে এমন কিছু উল্লেখ করেনি, যা দ্বারা প্রথম অংশের মধ্যে পরিবর্তন আসে, যাতে প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর নির্ভরশীল হয়। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে প্রথমটি পতিত হবে, আর দ্বিতীয়টি তার সঙ্গে যুক্ত হবে, এমন অবস্থায় যে, সে বায়েন হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে যখন [স্বামী] স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি এক তালাক, আরো এক তালাক, তখন এক তালাকই পতিত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সে প্রথম তালাকেই বায়েন হয়ে গেছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি তালাক 'এক' আর 'এক' বলার পূর্বেই স্ত্রী মারা যায়, তবে এ তালাক বাতিল হয়ে যাবে। [কেননা, সে তালাক] বিশেষণটিকে সংখ্যার সাথে মিলিত করেছে। সুতরাং সংখ্যাটি পতিত হবে। আর সে যখন সংখ্যা উচ্চারণের আগে মারা গেল তখন তালাক পতিত হওয়ার আগেই ক্ষেত্র রহিত হয়ে গেল। কাজেই সেই তালাক বাতিল বলে গণ্য হবে। আর একই হুকুম হবে, যদি বলে, তোমার প্রতি তালাক 'দুই' অথবা 'তিন'। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। এ মাসআলাটিও মর্মগতভাবে পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো, সহবাস তথা জৈবিক চাহিদা পূরণ করা। এ কারণেই সহবাসের পর তালাক প্রদান করা হলো আসল তথা মূল। আর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করা হয়। পারিপার্শ্বিকতার কারণে। সঙ্গত কারণেই হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ অনুচ্ছেদকে পরে উল্লেখ করেছেন, আর মূলকে আগে উল্লেখ করেছেন। -[ফতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৯]

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ الخ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবন আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের অভিমত এটিই। 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা'-তে হযরত জাবির ইবনে যায়েদ, ত্বাউস, আতা (র.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে, সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে, এক তালাক পতিত হবে। 'মাবসূত' কিতাবে এটিকে হাসান বসরী (র.) -এর অভিমত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৫]

তিন তালাক পতিত হওয়ার দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তালাক গুণটিকে যখন সংখ্যার সাথে যুক্ত করা হয়, তখন তালাক সংখ্যা দ্বারা পতিত হবে; বিশেষণ উল্লেখ দ্বারা নয়। এর কারণ হলো- মূলত যা পতিত হয়, তা হলো উহ্য ধাতুটি অর্থাৎ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا "তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তিন তালাক।" সুতরাং أَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাকপ্রাপ্তা] শুধু একথাটির দ্বারা তালাক পতিত হবে না; বরং একত্রে সবগুলো অর্থাৎ, তিন তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ الخ : স্বামী যদি সহবাসহীনা স্ত্রীকে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়, এভাবে যে- أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ - [তুমি তালাক, তালাক, তালাক] ; তাহলে প্রথম তালাক দ্বারাই স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা শেষোক্ত তালাক দু'টি পতিত হওয়ার কোনো পাত্র অবশিষ্ট নেই। আর তাই শব্দ দুটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি তিন তালাককে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে এবং কথার শেষাংশে এমন কিছু [যথা- শর্ত, ব্যতিক্রম ইত্যাদি] উল্লেখ করে, যার ফলে প্রথম অংশের মধ্যে পরিবর্তন আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সহবাসহীনা স্ত্রীও তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে। যেমন কেউ যদি সহবাসহীনা স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ [তুমি তালাক, তালাক, তালাক যদি ঘরে প্রবেশ কর], তাহলে একই সঙ্গে একত্রে সে তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় -"তুমি তালাক, তালাক, তালাক" দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তালাক স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা এখানে স্বামীর কথার শেষাংশে এমন কোনো শর্তের উল্লেখ নেই যা দ্বারা তার কথার প্রথমাংশের মধ্যে পরিবর্তন আসে, যাতে প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর নির্ভরশীল হয়। সুতরাং প্রথম শব্দ [তালাক] দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি এমন অবস্থায় গিয়ে তার সাথে যুক্ত হবে যে, সে বায়েন হয়ে গেছে। তার উপর কোনো ইদ্দত ওয়াজিব নয় এবং সে তালাকের পাত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً [তোমার প্রতি এক তালাক, আরো এক তালাক], তাহলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম وَاحِدَةً [এক তালাক] দ্বারা স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে; দ্বিতীয় وَاحِدَةً বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা দ্বিতীয়টি তার সঙ্গে এমন অবস্থায় যুক্ত হবে যে, সে বায়েনা হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الخ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً [তোমার প্রতি তালাক 'এক'] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ [তোমার প্রতি তালাক 'দুই'] কিংবা أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا [তোমার প্রতি তালাক 'তিন'], আর 'এক'/'দুই'/'তিন' উচ্চারণের পূর্বেই স্ত্রী মারা যায়, তাহলে কোনো তালাকই পতিত হবে না। স্বামীর কথা এ ক্ষেত্রে বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, তালাক বিশেষণটিকে স্বামী সংখ্যার সাথে মিলিত করেছে। আর তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যা বিবেচ্য হয়; গুণ বিবেচ্য হয় না। কিন্তু সংখ্যা উচ্চারণের আগেই যখন সে মারা গেল তখন তালাক পতিত হওয়ার আগেই ক্ষেত্র রহিত হয়ে গেল। সুতরাং তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَهٰذَا تَجَانُسٌ অর্থাৎ বর্ণিত তিনটি মাসআলা মর্মের দিক দিয়ে একই রকম। مَاقَبْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সহবাসের পূর্বে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا [তোমার প্রতি তিন তালাক] তাহলে স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হবে। আলোচ্য মাসআলা তিনটি এ মাসআলার অনুরূপ, তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে সংখ্যা বিবেচ্য হওয়ার দিক থেকে। তবে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্ণিত মাসআলায় স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কেননা সেখানে বিবাহ বিদ্যমান অবস্থায় সংখ্যা পাওয়া গেছে। আর আলোচ্য তিনটি মাসআলায় তালাক পতিত হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে সংখ্যার উচ্চারণের আগে স্ত্রী মারা যাওয়ার কারণে তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রই রহিত হয়ে গেছে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ اَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَالْاَصْلُ اَنَّهُ مَتٰى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ وَاَدْخَلَ بَيْنَهُمَا حَرْفَ الظَّرْفِ اِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُوْرِ اٰخِرًا كَقَوْلِهٖ جَاءَنِيْ زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو وَاِنْ لَمْ يَقْرِنْهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَتْ صِفَةً لِلْمَذْكُوْرِ اَوَّلًا كَقَوْلِهٖ جَاءَنِيْ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو وَاِيْقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِيْ اِيْقَاعٌ فِي الْحَالِ لِاَنَّ الْاِسْنَادَ لَيْسَ فِيْ وُسْعِهٖ فَالْقَبْلِيَّةُ فِيْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ صِفَةٌ لِلْاُوْلٰى فَتَبِيْنُ بِالْاُوْلٰى فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالْبَعْدِيَّةُ فِيْ قَوْلِهٖ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةٌ لِلْاَخِيْرَةِ فَحَصَلَتِ الْاِبَانَةُ بِالْاُوْلٰى وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَنَّ الْقَبْلِيَّةَ صِفَةٌ لِلثَّانِيَةِ لِاِتِّصَالِهَا بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَضٰى اِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيْ وَاِيْقَاعُ الْاُوْلٰى فِي الْحَالِ غَيْرَ اَنَّ الْاِيْقَاعَ فِي الْمَاضِيْ اِيْقَاعٌ فِي الْحَالِ اَيْضًا فَتَقْتَرِنَانِ فَتَقَعَانِ وَكَذَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْاُوْلٰى فَاقْتَضٰى اِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَاِيْقَاعَ الْاُخْرٰى قَبْلَ هٰذِهٖ فَتَقْتَرِنَانِ ـ

অনুবাদ : আর যদি [সহবাসকৃতা] স্ত্রীকে বলে, তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক কিংবা এক তালাকের পর এক তালাক, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, উল্লিখিত দু'টি জিনিসের মাঝে যদি কালবাচক শব্দ থাকে এবং কালবাচক শব্দের সাথে সর্বনাম যুক্ত করা হয়, তাহলে এ কালবাচক শব্দ পরবর্তী শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন কেউ বলল– আমার নিকট যায়েদ এসেছে, তার পূর্বে আমর। আর যদি [কালবাচক শব্দের সাথে] সর্বনাম যুক্ত না হয়, তাহলে পূর্বোল্লিখিত শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন কেউ বলল– যায়েদ এসেছে আমরের পূর্বে। আর অতীতে তালাক দেওয়ার অর্থ বর্তমানে তালাক দেওয়া। কেননা অতীতের সাথে [তালাক] সম্পৃক্ত করার সাধ্য তার নেই। সুতরাং 'তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক' বক্তব্যে পূর্ববর্তীতার বিষয়টি প্রথমোক্ত তালাকের বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাক দ্বারাই স্ত্রী বায়েন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। অপর পক্ষে 'তুমি এক তালাক, যার পরেও এক তালাক' বক্তব্যে পরবর্তীতার বিষয়টি শেষোক্ত শব্দের বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাক দ্বারাই স্ত্রী বায়েন হয়ে যাবে। আর যদি বলে, তুমি এক তালাক, যার পূর্বে এক তালাক রয়েছে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা সর্বনাম যুক্ত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তীতার বিষয়টি এখানে দ্বিতীয় শব্দের বিশেষণ। তাই দ্বিতীয় তালাকটি অতীতে এবং প্রথম তালাকটি বর্তমানে পতিত হওয়ার দাবি করে। কিন্তু বিগত সময়ে তালাক প্রদান বর্তমান সময়ে তালাক প্রদান হিসেবে গণ্য। সুতরাং একত্রে হবে এবং একসঙ্গে হবে। তদ্রূপ যদি বলে, 'তুমি এক তালাকের পর এক তালাক' – তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা পরবর্তীতা এখানে প্রথম শব্দের বিশেষণ। সুতরাং প্রথম তালাকটি তৎক্ষণাৎ এবং অপর তালাকটি এর পূর্বে হওয়া দাবি করে। তাই উভয়টি একত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ الخ : আলোচ্য ইবারতে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) সহবাসহীনা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের চারটি সুরত উল্লেখ করেছেন– ১. أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ [তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক] , ২. أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ [তুমি এমন এক তালাক, যার পরে এক তালাক রয়েছে], ৩. أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ [তুমি এমন এক তালাক, যার পূর্বে এক তালাক রয়েছে], ৪. أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ [তুমি এক তালাকের পর এক তালাক]।

প্রথম দুটি সুরতে এক তালাক পতিত হবে। আর পরবর্তী দুটি সুরতে দুই তালাক পতিত হবে। এ চারটি সুরতে নিম্নোক্ত দুটি মূলনীতি প্রযোজ্য– ১. উল্লিখিত দুটি জিনিসের মাঝে কালবাচক শব্দ قَبْلَ [আগে] বা بَعْدَ [পরে] থাকে এবং কালবাচক শব্দের সাথে সর্বনাম সংযুক্ত হয়, তাহলে এ কালবাচক শব্দ পরবর্তী শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন– جَاءَنِي زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو [আমার নিকট যায়েদ এসেছে, তার পূর্বে আমর]। এ উদাহরণে পূর্ববর্তীতা পরবর্তী শব্দ عَمْرٍو [আমর] -এর বিশেষণ। অর্থাৎ আমর যায়েদের পূর্বে এসেছে। আর যদি কালবাচক শব্দের সাথে সর্বনাম যুক্ত না হয়, তাহলে তা পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হবে। যেমন– جَاءَنِي زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو [আমার নিকট যায়েদ এসেছে আমরের পূর্বে]। এ উদাহরণে পূর্ববর্তীতা পূর্ববর্তী শব্দ زَيْد [যায়েদ] -এর বিশেষণ। অর্থাৎ যায়েদ আমরের পূর্বে এসেছে। ২. বিগত সময়ে তালাক প্রদানের অর্থ হলো– বর্তমান সময়ে তালাক দেওয়া। কেননা বিগত সময়ের সাথে তালাককে যুক্ত করার সাধ্য স্বামীর নেই। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সহবাসহীনা স্ত্রী এক তালাকের দ্বারা বায়েনা হয়ে যায়। তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা সহবাসহীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এক তালাকের পর তার মধ্যে তালাকের কোনো ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকে না।

এবার মূল মাসআলার ব্যাখ্যায় আসা যাক। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ [তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক], তাহলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হবে। কেননা উপরোল্লিখিত এক নম্বর মূলনীতি অনুসারে কালবাচক শব্দ - قَبْلَ [আগে] পূর্ববর্তী وَاحِدَةً [এক] -এর বিশেষণ। অর্থাৎ প্রথম وَاحِدَةً [এক তালাক] আগে পতিত হবে; অতঃপর দ্বিতীয় وَاحِدَةً [এক তালাক] পতিত হবে। আর যখন প্রথম এক তালাক পতিত হয়ে গেল তখন সহবাসহীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালাকের কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এক তালাকে বায়েন হয়ে যাবে।

আর স্বামী যদি বলে– أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ [তুমি এক তালাক, যার পর এক তালাক রয়েছে], তাহলেও এক তালাক পতিত হবে। কেননা এখানে কালবাচক শব্দ بَعْدَ [পরে] -টি পরবর্তী وَاحِدَةً [এক তালাক] -এর বিশেষণ। অর্থাৎ দ্বিতীয় وَاحِدَةً [এক তালাক] আগে পতিত হবে; অতঃপর প্রথম وَاحِدَةً [এক তালাক] পতিত হবে। আর দ্বিতীয় وَاحِدَةً [এক তালাক] পতিত হওয়ার পর সহবাসহীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে আর কোনো তালাকের ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا الخ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ [তুমি এমন এক তালাক, যার পূর্বে এক তালাক রয়েছে] তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। এখানে কালবাচক শব্দ قَبْلَ [পূর্বে] পরবর্তী وَاحِدَةً -এর বিশেষণ। তাই দ্বিতীয় তালাকটি বিগত সময়ে এবং প্রথম তালাকটি বর্তমান সময়ে পতিত হওয়ার দাবি করে আর বিগত সময়ে তালাক প্রদানের অর্থ বর্তমান সময়ে তালাক দেওয়া। সুতরাং উভয় তালাকই বর্তমানে একত্রে একসঙ্গে পতিত হবে। আর সহবাসহীনা স্ত্রীকে একই সঙ্গে দুই তালাক প্রদান করা যায়। সুতরাং দুই তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ الخ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ [তুমি এক তালাকের পর এক তালাক] তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা এখানে بَعْدَ [পরে] প্রথম وَاحِدَةً [এক তালাক] -এর বিশেষণ। সুতরাং এ বাক্যটি প্রথম তালাকটি তৎক্ষণাৎ এবং অপর এক তালাক এর পূর্বে হওয়া দাবি করে। আর বিগত সময়ে এক তালাক প্রদান বর্তমানে এক তালাক প্রদান হিসেবে গণ্য। সুতরাং উভয় তালাকই বর্তমানে একত্রে একসঙ্গে পতিত হবে

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَانِ وَعَنْ اَبِيْ يُوسُفَ (رح) فِيْ قَوْلِهِ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِاَنَّ الْكِنَايَةَ تَقْتَضِيْ سَبْقَ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ لَا مَحَالَةَ وَفِي الْمَدْخُوْلِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْوُجُوْهِ كُلِّهَا لِقِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ بَعْدَ وُقُوْعِ الْاُوْلٰى وَلَوْ قَالَ لَهَا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا تَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَدَخَلَتْ طُلِّقَتْ ثِنْتَيْنِ بِالْاِجْمَاعِ لَهُمَا اَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَتَعَلَّقْنَ جُمْلَةً كَمَا اِذَا نَصَّ عَلَى الثِّنْتَيْنِ اَوْ اَخَّرَ الشَّرْطَ وَلَهُ اَنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيْبَ فَعَلٰى اِعْتِبَارِ الْاَوَّلِ تَقَعُ ثِنْتَانِ وَعَلٰى اِعْتِبَارِ الثَّانِيْ لَا تَقَعُ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَمَا اِذَا اَنْجَزَ بِهٰذِهِ اللَّفْظَةِ فَلَا يَقَعُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِالشَّكِّ .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি [স্ত্রীকে] বলে, তুমি এক তালাকের সঙ্গে এক তালাক, কিংবা এমন একটি তালাক, যার সঙ্গে আরেকটি তালাক আছে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা 'সঙ্গে' শব্দটি সংযুক্তির জন্য আসে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, স্বামীর উক্তি 'যার সঙ্গে আরেকটি তালাক আছে' – এতে এক তালাক পতিত হবে। কেননা সর্বনাম দ্বারা যে তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অগ্রবর্তীতা অপরিহার্য। সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সকল সুরতে দুটি তালাক পতিত হবে। কেননা প্রথম তালাকটি পতিত হওয়ার পরও তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি [সহবাসকৃতা] স্ত্রীকে বলে, 'তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি এক তালাক, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এক তালাক পতিত হবে। আর সাহেবাইন বলেন, দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার প্রতি এক তালাক, আরো এক তালাক, যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর। আর স্ত্রী গৃহে প্রবেশ করল, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে দুই তালাক পতিত হবে। সাহেবাইনের দলিল হলো– وَاوْ [আর] অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় তালাক একত্রভাবে শর্তের সাথে যুক্ত হবে। যেমন– স্পষ্টভাবে দুই তালাক বলার ক্ষেত্রে কিংবা শর্তকে বক্তব্যের শেষে যোগ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, সাধারণভাবে একত্রীকরণ সংযুক্ততা এবং ধারাবাহিকতার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রথমটির হিসেবে দুই তালাক পতিত হবে, আর দ্বিতীয়টির হিসেবে এক তালাক পতিত হবে। যেমন– উক্ত শব্দ দ্বারা শর্তহীন তালাক প্রদান করলে হতো। সুতরাং সন্দেহ অবস্থায় একের অধিক তালাক পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ [তুমি এক তালাকের সঙ্গে এক তালাক] কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَهَا وَاحِدَةٌ [তুমি এমন একটি তালাক, যার সঙ্গে আরেকটি তালাক রয়েছে], তাহলে স্ত্রী দুই তালাকপ্রাপ্তা হবে। কেননা مع [সঙ্গে] অব্যয়টি সংযুক্ততাবাচক। সুতরাং দুটি তালাকই একসঙ্গে পতিত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, مَعَهَا وَاحِدَةٌ -এর সুরতে এক তালাক পতিত হবে। দলিল হলো– مَعَهَا -এর মধ্যে যে সর্বনাম আছে, তা দ্বারা যে তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার অগ্রবর্তীতা অপরিহার্য। তখন পরবর্তী তালাকটি এমন অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে যে, প্রথম তালাক দ্বারাই সে বায়েন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বর্ণিত সব সুরতে সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুটি তালাক পতিত হবে। কেননা সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রথম তালাকটি পতিত হওয়ার পরও তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ الخ : সহবাসহীনা স্ত্রীকে একাধিক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে যদি শর্তারোপ করা হয় এবং وَاوْ [আর] -এর মাধ্যমে একটিকে অপরটির উপর عَطْف করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে দুটি সুরত হতে পারে– ১. শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হবে, ২. কিংবা শর্তকে বাক্যের শেষে উল্লেখ করা হবে। যদি শর্তকে বাক্যের শেষে উল্লেখ করা হয়, যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَّ وَاحِدَةً اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ [তোমার প্রতি এক তালাক আরো এক তালাক যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর], তাহলে সর্বসম্মতভাবে দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি শর্তকে বাক্যের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়, যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَّ وَاحِدَةً [যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি এক তালাক ও আরো এক তালাক] আর সে স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এক তালাক পতিত হবে। আর সাহেবাইনের মতে, দুই তালাক পতিত হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো– وَاوْ [আর] অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় তালাক একত্রভাবে শর্তের সাথে যুক্ত হবে। যেমন স্পষ্টভাবে দুই তালাক বলার ক্ষেত্রে; যথা– স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ [যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে দুই তালাক], তাহলে দুই তালাক একত্রে পতিত হবে। অনুরূপভাবে শর্তকে বক্তব্যের শেষে যোগ করার ক্ষেত্রে দুই তালাক সর্বসম্মতভাবে পতিত হয়। সুতরাং শর্তকে বক্তব্যের শুরুতে যোগ করার ক্ষেত্রেও দুই তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– وَاوْ অব্যয়যোগে দুটি জিনিসকে সাধারণভাবে একত্রীকরণ যেমন সংযুক্ততার সম্ভাবনা রাখে, তেমনি তা ধারাবাহিকতার সম্ভাবনাও রাখে। সংযুক্ততার সম্ভাবনার ভিত্তিতে দুই তালাক পতিত হবে, আর ধারাবাহিকতার সম্ভাবনার ভিত্তিতে এক তালাক পতিত হবে। যেমন– স্বামী যদি স্ত্রীকে স্পষ্ট শর্তহীন ভাষায় তালাক প্রদান করে এভাবে যে– اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَّ وَاحِدَةً طَلَاقٌ [তুমি এক তালাক, একই তালাক], তাহলে এক তালাক পতিত হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আলোচ্য মাসআলায় একের অধিক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। আর সন্দেহ অবস্থায় একের অধিক তালাক পতিত হবে না।

بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ لِأَنَّهُ مُغَيِّرٌ صَدْرَ الْكَلَامِ فَيَتَوَقَّفُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً وَلَا مُغَيِّرَ فِيمَا إِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وَلَوْ عَطَفَ بِحَرْفِ الْفَاءِ فَهُوَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ فِيمَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ (رحـ) وَ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (رحـ) أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةً بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

অনুবাদ : অপর পক্ষে বাক্যের শেষে শর্তযুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শর্ত বাক্যের প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে। সুতরাং প্রথমাংশ শর্তের উপরে নির্ভরশীল হবে। সুতরাং তালাকও একত্রে পতিত হবে। আর শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হলে বাক্যের শেষে কোনো পরিবর্তনকারী নেই। সুতরাং তা নির্ভরশীল থাকবে না। আর যদি ক্রমবাক্য অব্যয় যোগে বলা হয়, তাহলে ইমাম কারখী (র.) -এর বর্ণনা অনুযায়ী অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর ফকীহ আবুল্লায়ছ (র.) বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে এক তালাক পতিত হবে। কেননা ক্রমবাচক অব্যয়টি পরবর্তীতার জন্য ব্যবহৃত। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَّرَ الخ : এর দ্বারা সাহেবাইনের প্রদত্ত দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সাহেবাইন (র.) বক্তব্যের প্রথমাংশে শর্ত যোগ করার বিষয়টিকে বক্তব্যের শেষাংশে শর্ত যোগ করার উপর যে কিয়াস করেছেন, তা যথার্থ নয়। কেননা বাক্যের শেষে শর্ত যোগ করার ক্ষেত্রে শর্ত বাক্যের প্রথমাংশে পরিবর্তন করে দেয়। সুতরাং বাক্যের প্রথমাংশও শর্তের উপর নির্ভরশীল হবে। অতএব, শর্ত পাওয়ার পরে দুটি তালাক একই সঙ্গে পতিত হবে। পক্ষান্তরে শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হলে বাক্যের শেষে কোনো পরিবর্তনকারী নেই। সুতরাং বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। এ কারণেই তালাক দুটি ধারাবাহিকভাবে পতিত হবে। আর স্ত্রী সহবাসহীনা হওয়ার কারণে প্রথম তালাক দ্বারাই বায়েনা হয়ে যাবে; দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকবে না। অদ্রূপ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ -এর উপর সাহেবাইন (র.) যে কিয়াস করেছেন সেটিও ঠিক নয়। কেননা এ বাক্যে সুস্পষ্টভাবে দুই তালাক বলার কারণে ধারাবাহিকতার কোনো সম্ভাবনা নেই। অপর পক্ষে وَاوٌ [এবং/আর] অব্যয়যোগে বাক্যে ধারাবাহিকতার সম্ভাবনা থাকে।

قَوْلُهُ وَلَوْ عَطَفَ بِحَرْفِ الْفَاءِ الخ : আর যদি ক্রমবাক্য অব্যয় [যেমন- فَا - অতঃপর, অনন্তর] যোগে বলা হয়, যেমন- أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً [তোমার প্রতি এক তালাক, অতঃপর এক তালাক], তাহলে ইমাম কারখী (র.) -এর বর্ণনানুসারে অনুরূপ মতপার্থক্য আছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এক তালাক পতিত হবে, আর সাহেবাইনের মতে, দুই তালাক পতিত হবে। ইমাম কারখী (র.) وَاوٌ অব্যয়যোগে عَطْف করাকে فَا অব্যয়যোগে عَطْف করার সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। আর ফকীহ্ আবুল্লায়ছ (র.) বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে এক তালাক পতিত হবে। কেননা ক্রমবাচক অব্যয় فَا - টি পরবর্তীতার জন্য আসে। সুতরাং তা ثُمَّ [অতঃপর] ও بَعْدَ [পরে] -এর অর্থে হয়ে গেল। -[ফতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃ. ৫৪]

وَاَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِيْ وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ اِلَّا بِالنِّيَّةِ اَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ لِاَنَّهَا غَيْرُ مَوْضُوْعَةٍ لِلطَّلَاقِ بَلْ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَابُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ اَوْ دَلَالَتِهٖ قَالَ وَهِيَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا ثَلٰثَةُ اَلْفَاظٍ يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ وَلَا تَقَعُ بِهَا اِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَوْلُهٗ اِعْتَدِّيْ وَاسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ وَاَنْتِ وَاحِدَةٌ اَمَّا الْاُوْلٰى فَلِاَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْاِعْتِدَادَ عَنِ النِّكَاحِ وَتَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ نَوَى الْاَوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيَّتِهٖ فَيَقْتَضِيْ طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَاَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِاَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْاِعْتِدَادِ لِاَنَّهٗ تَصْرِيْحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهٖ وَتَحْتَمِلُ الْاِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقَهَا .

অনুবাদ : আর তালাকের দ্বিতীয় প্রকার হলো ইঙ্গিতসূচক তালাক। এক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়া কিংবা অবস্থাগত ইঙ্গিত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। কেননা ইঙ্গিতসূচক শব্দ মূলত তালাকের জন্য গঠিত নয়; বরং তা তালাক ও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত দ্বারা কিংবা অবস্থাগত ইঙ্গিত দ্বারা তালাকের অর্থটি নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। ইঙ্গিতসূচক তালাক দুই প্রকার। প্রথমত তিনটি শব্দ এমন রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ হয় এবং শুধুমাত্র একটি তালাক পতিত হয়। আর সেগুলো হলো স্বামীর উক্তি– তুমি গণনা কর; তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর; তুমি এক। প্রথমটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, বিবাহ-বিচ্ছেদজনিত ইদ্দতের দিন গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে; আবার আল্লাহর নিয়ামত গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে। যদি সে প্রথমটির উদ্দেশ্য করে, তাহলে তার নিয়তের কারণে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর তা তালাকের পূর্ববর্তীতা দাবি করে। আর তালাকের পরে রাজ'আতের অবকাশ আছে। দ্বিতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তা ইদ্দতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা ইদ্দতের যা উদ্দেশ্য, সেটাই এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইদ্দতের কথা বলার মতোই হলো। আবার তালাক প্রদানের জন্য গর্ভাশয় খালি করার আদেশও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِيْ وَهُوَ الْكِنَايَاتُ الخ : اَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِيْ -এর যোগসূত্র হলো তালাক প্রদান অধ্যায়ের শুরুতে গ্রন্থকারের উক্তি– فَالصَّرِيْحُ مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ বাক্যের সাথে। ইমাম কুদূরী (র.) তালাককে সুস্পষ্ট ও ইঙ্গিতসূচক -এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুস্পষ্ট তালাকের বর্ণনা শেষ করে এখন ইঙ্গিতসূচক তালাকের বিবরণ দিচ্ছেন। كِنَايَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে– যার মর্মার্থ অস্পষ্ট ও গোপন থাকে। ইঙ্গিতসূচক শব্দযোগে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার নিয়ত কিংবা অবস্থাগত ইঙ্গিত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে, রাগ কিংবা অন্য কোনো অবস্থায় ব্যবহৃত ইঙ্গিতসূচক শব্দের ক্ষেত্রে অবস্থাগত ইঙ্গিত নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে– স্বামীর নিয়ত না থাকলে। আর ইমাম শাফেয়ী

(র.) -এর মতে, স্বামী ও স্ত্রীর নিয়ত ছাড়া রাগ কিংবা অন্য কোনো অবস্থায় ব্যবহৃত ইঙ্গিতসূচক শব্দের দ্বারা তালাক পতিত হবে না। আর আমাদের মতে, এ ক্ষেত্রে শুধু স্বামীর নিয়তই যথেষ্ট। আর ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ইঙ্গিতবাচক শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১০৫]

ইঙ্গিতসূচক শব্দের দ্বারা নিয়ত ছাড়া কিংবা অবস্থাগত ইঙ্গিত ছাড়া তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো, ইঙ্গিতসূচক শব্দ মূলত, তালাকের জন্য গঠিত নয়; বরং তা তালাক ও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত দ্বারা অথবা অবস্থাগত ইঙ্গিত দ্বারা তালাকের অর্থটি নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ قَالَ وَهِىَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অস্পষ্ট তালাক দুই প্রকার। প্রথমত যার দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ পতিত হয়। দ্বিতীয়ত যার দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হয়। প্রথম প্রকারের মধ্যে তিনটি শব্দ আছে- ১. اِعْتَدِّىْ [তুমি গণনা কর] ২. اِسْتَبْرِئِىْ رَحِمَكِ [তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর] ৩. اَنْتِ وَاحِدَةٌ [তুমি এক]। এ তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির মধ্যে দুটি অর্থের সম্ভাবনা আছে। তাই নিয়ত কিংবা অবস্থাগত ইঙ্গিত দ্বারা যে-কোনো একটি অর্থ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রথম শব্দ اِعْتَدِّىْ [তুমি গণনা কর] দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ইদ্দতের দিন গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে; আবার আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত গণনা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং স্বামী যদি প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য করে থাকে তাহলে সেটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর এ অর্থটি তালাকের পূর্ববর্তীতা দাবি করে। কেননা তালাক প্রদান ব্যতিরেকে ইদ্দতের দিন গণনা করার আদেশ বিশুদ্ধ নয়। আর তালাক পরবর্তীতে স্ত্রীকে রাজ'আতের অবকাশ থাকে।

আর দ্বিতীয় শব্দ اِسْتَبْرِئِىْ رَحِمَكِ [তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর] দ্বারা ইদ্দতের অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো গর্ভাশয়কে মুক্ত করা। সুতরাং তা ইদ্দতের কথা বলার মতোই হলো। আবার এ শব্দের দ্বারা তালাক প্রদানের পদ্ধতি হিসেবে গর্ভাশয় খালি করার আদেশও হতে পারে। কেননা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে সুন্নত মোতাবেক তালাক প্রদান করা হয়। সুতরাং স্বামী যদি প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য করে থাকে, তাহলে সেটিই নির্দিষ্ট হবে। আর এ অর্থটিও তালাকের পূর্ববর্তীতা দাবি করে।

আর তৃতীয় শব্দ- اَنْتِ وَاحِدَةٌ [তুমি এক] -এর وَاحِدَةٌ সংখ্যাটি উহ্য তালাক শব্দের বিশেষণ হতে পারে অর্থাৎ- تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً। আবার অন্য অর্থের সম্ভাবনা আছে। যেমন- স্বামী স্ত্রীর প্রশংসার্থে বলল, তুমি আমার একমাত্র স্ত্রী কিংবা তুমি তোমার বংশে অনন্যা। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও স্বামী যদি প্রথম অর্থের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে।

মোদ্দাকথা হলো, পূর্বোল্লিখিত শব্দগুলো যেহেতু তালাক এবং অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তাই নিয়তের প্রয়োজন হবে এবং এ শব্দগুলো দ্বারা এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। এর দলিল হলো, প্রথম শব্দ দুটির ক্ষেত্রে দাবি হিসেবে اَنْتِ طَالِقٌ [তোমার প্রতি তালাক] কথাটি রয়েছে, আর তৃতীয় শব্দটির মধ্যে উহ্য হিসেবে اَنْتِ طَالِقٌ [তোমার প্রতি তালাক] রয়েছে। আর স্বামী যদি এ কথাটি স্পষ্টভাবে বলত, তাহলে এক তালাকই পতিত হতো। সুতরাং উহ্য অবস্থায় এক তালাক পতিত হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে اَنْتِ وَاحِدَةٌ [তুমি এক] দ্বারা তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না। কেননা সংখ্যাটি স্ত্রীর বিশেষণ। এখানে তালাক অর্থের কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমাদের মতে, নিয়ত করলে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। কেননা সুস্থ, বিবেকবানের কথায় এ অর্থ গ্রহণের অবকাশ আছে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, এ কথার দ্বারা স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। কেননা সমস্ত ইঙ্গিতসূচক শব্দের দ্বারা তাঁর মতে তালাকে বায়েন পতিত হয়।

-[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১০৭]

وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوْفٍ مَعْنَاهُ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَهُ وَالطَّلَاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ وَتَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ قَوْمِهِ وَلَمَّا احْتَمَلَتْ هٰذِهِ الْأَلْفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى النِّيَّةِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ فِيْهَا مُقْتَضًى أَوْ مُضْمَرٌ وَلَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا أَوْلَى وَفِيْ قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَذْكُوْرًا لٰكِنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِيْ نِيَّةَ الثَّلْثِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُمَيِّزُوْنَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْإِعْرَابِ .

অনুবাদ : আর তৃতীয় শব্দটির ক্ষেত্রে কারণ হলো, সংখ্যাটি উহ্য ক্রিয়ামূল তথা 'এক তালাক' -এর বিশেষণ হতে পারে। সুতরাং যখন সে এই নিয়ত করবে, তখন ধরা হবে যেন তালাক শব্দটিই উচ্চারণ করেছে। আর তালাক পরবর্তীতে রাজ'আত করার অধিকার থাকে। অনুরূপভাবে অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– সে তার একমাত্র স্ত্রী কিংবা তার বংশে অনন্যা। আর এ শব্দগুলো যেহেতু তালাক এবং অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু নিয়তের প্রয়োজন হবে এবং একটি মাত্র তালাক পতিত হবে। কেননা এ শব্দগুলোতে 'তোমার প্রতি তালাক' কথাটি দাবি হিসেবে কিংবা উহ্য হিসেবে রয়েছে। আর তা স্পষ্ট হলে এক তালাকই পতিত হতো। সুতরাং উহ্য অবস্থায় একটি [তালাক] পতিত হওয়া আরো স্বাভাবিক। স্বামীর উক্তি 'এক' -ক্ষেত্রে যদিও ক্রিয়ামূল বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এক সংখ্যার স্পষ্ট উল্লেখ তিন তালাকের নিয়তের পরিপন্থি। আর অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে وَاحِدَةً [এক] -এর স্বরচিহ্ন ধর্তব্য নয়। এটিই বিশুদ্ধ। কারণ সাধারণ মানুষ স্বরচিহ্নের কারণগুলোতে পার্থক্য করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِيْ قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– أَنْتِ وَاحِدَةٌ -এর মধ্যে তালাক শব্দমূল বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– وَاحِدَةً [এক] সংখ্যার সুস্পষ্ট উল্লেখ তিন তালাকের নিয়তকে প্রতিহত করে এ কারণেই তিন তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِعْرَابِ الْوَاحِدَةِ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জামিউস সাগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লিখিত কোনো কোনো মাশায়িখের মতকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আরবি শব্দে তালাকের সাথে واحدة [এক] উল্লেখ করলে অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে إِعْرَابٌ [স্বরচিহ্ন] ধর্তব্য নয়। তা যবরযুক্ত হোক, আর পেশযুক্ত হোক কিংবা ছাকিনবিশিষ্ট হোক- যে-কোনো স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রেই তালাক পতিত হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১০৭]।

قَالَ وَبَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَإِنْ نَوَى ثَلٰثًا كَانَ ثَلٰثًا وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَحَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ وَالْحَقِيْ بِأَهْلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَفَارَقْتُكِ وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِيْ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَتَقَنَّعِيْ وَتَخَمَّرِيْ وَاسْتَتِرِيْ وَاغْرُبِيْ وَاخْرُجِيْ وَاذْهَبِيْ وَقُوْمِيْ وَابْتَغِي الْأَزْوَاجَ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অন্যান্য ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা যদি তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে। আর তিনের নিয়ত করলে তিন তালাক হবে। আর দু'য়ের নিয়ত করলে এক তালাকে বায়েন হবে। যেমন– স্বামীর উক্তি 'তুমি বিচ্ছিন্ন, কর্তিত, হারাম, তোমার লাগাম তোমার কাঁধে, তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও, তুমি মুক্ত, তোমাকে মাফ করে দিলাম, তোমার পরিবারের নিকট তোমাকে দিয়ে দিলাম, তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তোমাকে পৃথক করে দিলাম, তোমার বিষয় তোমার হাতে, তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর, তুমি স্বাধীন, মুখে নেকাব পরিধান কর, মাথায় উড়না দাও, পর্দা কর, বের হও, যাও, দাঁড়াও, স্বামী অনুসন্ধান কর ইত্যাদি। কেননা, এ সকল শব্দ তালাক ও অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং নিয়ত জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَبَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى الخ : ইঙ্গিতসূচক শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম প্রকারের আলোচনা শেষ করে গ্রন্থকার দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা শুরু করেছেন। পূর্ববর্ণিত তিনটি শব্দ [اِعْتَدِّىْ، اِسْتَبْرِئِىْ رَحِمَكِ، أَنْتِ وَاحِدَةٌ] ব্যতীত অন্যান্য ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা যদি এক তালাক কিংবা দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক হবে। যেমন, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– أَنْتِ بَائِنٌ [তুমি বিচ্ছিন্ন]। بَائِنٌ শব্দটি اَلْبَيْنُوْنَةُ থেকে এসেছে। এর অর্থ– اَلْقَطْعُ - 'বিচ্ছিন্ন হওয়া'।

أَنْتِ بَتَّةٌ [তুমি কর্তিত, তোমাকে কর্তন করা হলো]। بَتَّةٌ শব্দটি اَلْبَتُّ থেকে এসেছে। এর অর্থও হলো اَلْقَطْعُ - 'বিচ্ছিন্ন হওয়া।'

أَنْتِ بَتْلَةٌ [তুমি বিচ্ছিন্ন]।

أَنْتِ حَرَامٌ [তুমি হারাম]। এর অর্থ– اَلْمَمْنُوْعُ - 'নিষিদ্ধ'।

حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ [তোমার লাগাম তোমার কাঁধে]। এটি একটি প্রবচন। উটকে যখন কাঁধে বোঝা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন এ কথা বলা হয়।

اِلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ [তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হও]।

اَنْتِ خَلِيَّةٌ [তুমি মুক্ত]।

اَنْتِ بَرِيَّةٌ [তুমি বন্ধনহীন, তোমাকে মাফ করে দিলাম]।

وَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ [তোমার পরিবারকে তোমাকে দিয়ে দিলাম]।

سَرَّحْتُكِ [আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম]।

فَارَقْتُكِ [তোমাকে পৃথক করলাম]।

اَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে দিলাম]।

اِخْتَارِىْ [তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর]।

اَنْتِ حُرَّةٌ [তুমি স্বাধীন]।

تَخَمَّرِىْ [মুখে নেকাব পরিধান কর]।

اِسْتَتِرِىْ [মাথায় উড়না দাও]।

اِغْرُبِىْ [পর্দা কর]।

اُخْرُجِىْ [বের হও/ দূর হও]।

اِذْهَبِىْ [চলে যাও]।

قُوْمِىْ [উঠ, দাঁড়াও]।

اِبْتَغِى الْاَزْوَاجَ [স্বামী সন্ধান কর]।

উপরিউক্ত শব্দগুলো তালাক ও অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এজন্য তালাকের অর্থ নির্ধারণের জন্য নিয়্যত জরুরি।

قَالَ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِيْ حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِى الْقَضَاءِ وَلَا يَقَعُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا اَنْ يَنْوِيَهُ قَالَ (رض) سَوّٰى بَيْنَ هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ وَهٰذَا فِيْمَا لَا يَصْلُحُ رَدًّا وَالْجُمْلَةُ فِيْ ذٰلِكَ اَنَّ الْاَحْوَالَ ثَلٰثَةٌ حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِىَ حَالَةُ الرِّضَاءِ وَحَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَحَالَةُ الْغَضَبِ وَالْكِنَايَاتُ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَيَصْلُحُ سَبًّا وَشَتِيْمَةً فَفِيْ حَالَةِ الرِّضَاءِ لَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْ إِنْكَارِ النِّيَّةِ لِمَا قُلْنَا وَفِيْ حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَمْ يُصَدَّقْ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَلَا يَصْلُحُ رَدًّا فِى الْقَضَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ بَائِنٌ بَتَّةٌ حَرَامٌ إِعْتَدِّىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ إِخْتَارِىْ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ مُرَادَهُ الطَّلَاقُ عِنْدَ سُؤَالِ الطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا مِثْلَ قَوْلِهِ إِذْهَبِىْ اُخْرُجِىْ قُوْمِىْ تَقَنَّعِىْ تَخَمَّرِىْ وَمَا يَجْرِىْ هٰذَا الْمَجْرٰى لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَهُوَ الْاَدْنٰى فَحُمِلَ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে তালাকের আলোচনা প্রসঙ্গে হলে আদালতের বিচারে এতে তালাক পতিত হবে। কিন্তু নিয়ত করা ব্যতীত আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) উপরিউক্ত শব্দাবলিকে সমান সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এ হুকুম [ইমাম কুদূরী (র.) কর্তৃক বর্ণিত] ঐ সব শব্দাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো প্রত্যাখ্যান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না। এ ব্যাপারে মোদ্দাকথা হলো, অবস্থা মোট তিন প্রকার। সাধারণ অবস্থা : তা হলো সন্তুষ্টির অবস্থা; তালাকের আলোচনার অবস্থা; অসন্তুষ্টির অবস্থা। অনুরূপভাবে ইঙ্গিতসূচক শব্দগুলোও তিন প্রকার : প্রথমত, [ঐ সব শব্দ] যা তালাক প্রার্থনার অনুকূল উত্তর ও প্রত্যাখ্যান উভয়ের জন্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেগুলো উত্তর হতে পারে, প্রত্যাখ্যান হতে পারে না। তৃতীয়ত, যেগুলো উত্তর হতে পারে আবার গালিগালাজও হতে পারে। সন্তুষ্টির অবস্থায় উক্ত শব্দাবলি দ্বারা নিয়ত ছাড়া তালাক হবে না। আর নিয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তালাকের আলোচনা চলা-অবস্থায় যে সকল শব্দ উত্তর হতে পারে, প্রত্যাখ্যান হতে পারে না সেগুলোর ক্ষেত্রে [নিয়ত করিনি বললে] আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। যেমন স্বামীর উক্তি– তুমি মুক্ত, তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হলো, কিংবা কর্তন করা হলো, তুমি হারাম, গণনা কর, তোমার বিষয় তোমার হাতে, ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর। কেননা তালাক চাওয়ার সময় বাহ্যত তালাক প্রদানই তার উদ্দেশ্য হবে। আর যে শব্দগুলো উত্তর হতে পারে, আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে; যেমন স্বামীর কথা– চলে যাও, বের হও, উঠে যাও, নেকাব পরো, উড়না মাথায় দাও এবং এ জাতীয় অন্যান্য শব্দ। কেননা এগুলো প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর তাই নিকটবর্তী। সুতরাং সে অর্থেই একে প্রয়োগ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الخ : ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি দ্বারা তালাকের নিয়ত ছাড়া তালাক পতিত হবে না– এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তালাকের আলোচনা প্রসঙ্গে ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি দ্বারা নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক প্রসঙ্গে আলোচনাকালে স্বামী যদি ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি দ্বারা স্ত্রীকে সম্বোধন করে, তাহলে তালাকের নিয়ত না থাকার দাবি করলেও আদালতের বিচারে তালাক পতিত হবে। যদিও দীনি বিচারে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) তালাকের আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলিকে সমান সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটি সাধারণ হুকুম নয়; বরং এ হুকুম ঐ শব্দাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না।

এ বিষয়ে মোদ্দাকথা হলো, তালাক প্রদানের অবস্থা তিন প্রকার হতে পারে– ১. স্বাভাবিক খুশি ও সন্তুষ্টির অবস্থা, ২. তালাকের আলোচনার অবস্থা অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাকের আলোচনা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, ৩. ক্রোধের অবস্থা। অনুরূপভাবে ইঙ্গিতসূচক শব্দগুলোও তিন প্রকার। প্রথমত, এমন সব ইঙ্গিতসূচক শব্দ যা স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার উত্তর হতে পারে, আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমন সব ইঙ্গিতসূচক শব্দ যেগুলো স্ত্রীর তালাকের প্রার্থনার উত্তর হতে পারে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান হতে পারে না। তৃতীয়ত, ঐ সব ইঙ্গিতসূচক শব্দ যেগুলো উত্তর হতে পারে; আবার গালিগালাজও হতে পারে।

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ, স্বাভাবিকভাবে খুশি ও সন্তুষ্টির অবস্থায় এসব শব্দের দ্বারা নিয়ত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। আর স্বামী তালাকের নিয়তকে অস্বীকার করলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এসব শব্দ তালাক ও অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং যে-কোনো একটিকে নির্ধারণ করতে নিয়ত জরুরি।

দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, তালাকের আলোচনা চলা অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার ইঙ্গিতসূচক শব্দ তথা যে শব্দগুলো স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার অনুকূল উত্তর হতে পারে; প্রত্যাখ্যান হতে পারে না– সেগুলোর ক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে, তালাকের নিয়ত করিনি, তাহলে আদালতের বিচারে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। এ ধরনের শব্দ হলো আটটি। যথা– خَلِيَّةٌ [তুমি মুক্ত]; بَرِيَّةٌ [তুমি বন্ধনহীন]; بَائِنٌ [তুমি বিচ্ছিন্ন]; بَتَّةٌ [তোমাকে কর্তন করা হলো]; حَرَامٌ [তুমি হারাম]; إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর]; أَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে]; إِخْتَارِيْ [তোমার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর]। কেননা স্ত্রী যখন স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, আর স্বামী এসব শব্দের কোনো একটি দিয়ে উত্তর দেয়, তাহলে বাহ্যত তালাক প্রদানই তার উদ্দেশ্য হবে। আর বিচারক বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করেই বিচারকার্য সমাধা করেন।

আর প্রথম প্রকার ইঙ্গিতসূচক শব্দ অর্থাৎ, যেগুলো স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার অনুকূল উত্তর হতে পারে, আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে– এমন শব্দাবলির ক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে, তালাকের নিয়ত করিনি, তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবে। এ ধরনের শব্দ সাতটি। যথা– إِذْهَبِيْ [চলে যাও]; أُخْرُجِيْ [বের হও]; قُوْمِيْ [উঠে যাও]; تَقَنَّعِيْ [নেকাব পরো]; تَخَمَّرِيْ [মুখে নেকাব পরো]; أُغْرُبِيْ [পর্দা কর]; إِسْتَتِرِيْ [মাথায় উড়না দাও]। কেননা, এসব শব্দ তালাক ছাড়া অন্যান্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ, প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে। আর তা-ই নিকটবর্তী। সুতরাং সে অর্থেই একে প্রয়োগ করা হবে।

আর তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, ক্রোধের অবস্থায় সকল ইঙ্গিতসূচক শব্দের ক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে, 'আমি তালাকের নিয়ত করিনি'; তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এসব শব্দ স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান বা গালি হতে পারে। তবে যে সকল শব্দ শুধু তালাকের সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান বা গালি হতে পারে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে স্বামীর তালাকের নিয়ত না থাকার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধরনের শব্দ তিনটি। যথা– إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর]; إِخْتَارِيْ [নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর]; أَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে]। কেননা, ক্রুদ্ধ অবস্থা তালাকের ইচ্ছা প্রমাণ করে। সুতরাং তালাকের নিয়ত না করার দাবিকে গ্রহণ করা হবে না।

وَفِيْ حَالَةِ الْغَضَبِ يُصَدَّقُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ اَوِ السَّبِّ اِلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ وَالشَّتْمِ كَقَوْلِهٖ اِعْتَدِّيْ وَاخْتَارِيْ وَاَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاِنَّهٗ لَا يُصَدَّقُ فِيْهَا لِاَنَّ الْغَضَبَ يَدُلُّ عَلٰى اِرَادَةِ الطَّلَاقِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِيْ قَوْلِهٖ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكِ وَلَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكِ وَخَلَّيْتُ سَبِيْلَكِ وَفَارَقْتُكِ اَنَّهٗ يُصَدَّقُ فِيْ حَالَةِ الْغَضَبِ لِمَا فِيْهَا مِنْ اِحْتِمَالِ مَعْنَى السَّبِّ ـ

অনুবাদ : আর ক্রোধের অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে [তার তালাকের নিয়ত না থাকার দাবি] গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এগুলো প্রত্যাখ্যান বা গালি দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে যে সকল শব্দ তালাকের সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান বা গালি হতে পারে না; যেমন– গণনা কর, নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর, তোমার বিষয় তোমার হাতে– এ সকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ক্রোধ তালাকের ইচ্ছা প্রমাণ করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বামীর উক্তি – 'তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই, তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই, তোমার পথ খুলে দিয়েছি, আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করলাম' – এগুলোর ক্ষেত্রে ক্রোধের অবস্থায় তার দাবি প্রমাণ করা হবে। কেননা এতে গালির অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِيْ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ক্রোধের অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكِ [তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই]; কিংবা لَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكِ [তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই] خَلَّيْتُ سَبِيْلَكِ [তোমার পথ খুলে দিয়েছি]; কিংবা فَارَقْتُكِ [আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করেছি]; এবং তালাকের নিয়ত না থাকার দাবি করে, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ শব্দগুলোতে গালির অর্থের সম্ভাবনা আছে। যেমন– তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই -এর অর্থ তুমি এটুকুও যোগ্য নও যে, তোমার দিকে আমার মালিকানা সম্পর্কিত করব। 'তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই' বাক্যটি গালি অর্থে আসে এভাবে যে, তোমার বদভ্যাসের কারণে তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই। অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতার কারণে আমি তোমাকে পথ খুলে দিয়েছি, তোমাকে পৃথক করে দিয়েছি।

ثُمَّ وُقُوْعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلٰثَةِ الْأُوَلِ مَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقَعُ بِهَا رَجْعِيٌّ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهَا كِنَايَاتٌ عَنِ الطَّلَاقِ وَلِهٰذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَيَنْتَقِصُ بِهَا الْعَدَدُ وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيْحِ وَلَنَا اَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا إِلٰى مَحَلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَا خَفَاءَ فِى الْاَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ اَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلٰى إِثْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ التَّدَارُكِ وَلَا يَقَعُ فِى عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَيْسَتْ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ لِأَنَّهَا عَوَامِلُ فِى حَقَائِقِهَا وَالشَّرْطُ تَعَيُّنُ اَحَدِ نَوْعَيِ الْبَيْنُوْنَةِ دُوْنَ الطَّلَاقِ وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ لِثُبُوْتِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلٰى زَوَالِ الْوُصْلَةِ وَاِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ فِيْهَا لِتَنَوُّعِ الْبَيْنُوْنَةِ إِلٰى غَلِيْظَةٍ وَخَفِيْفَةٍ وَعِنْدَ اِنْعِدَامِ النِّيَّةِ يَثْبُتُ الْاَدْنٰى وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِأَنَّهُ عَدَدٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ـ

অনুবাদ : আর প্রথম তিনটি ছাড়া অন্যগুলোর দ্বারা বায়েন তালাক হওয়া আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এগুলো দ্বারা তালাকে রাজ'ঈ হবে। কেননা এগুলো দ্বারা তালাক পতিত হয়। কারণ এগুলো তালাকের প্রতি ইঙ্গিতকারী। এজন্যই এগুলোতে নিয়ত শর্ত এবং এগুলোর দ্বারা তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর তালাক পরবর্তীতে রাজ'আত সাব্যস্ত হয়। যেমন– স্পষ্ট তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে। আর আমাদের দলিল হলো, বিচ্ছেদ কর্মটি শরিয়ত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত ব্যক্তি থেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। আর [স্বামীর] যোগ্যতা ও [স্ত্রীর তালাকের যথার্থ] ক্ষেত্র হওয়ার বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। শরিয়ত প্রদত্ত ক্ষমতার প্রমাণ এই যে, এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে প্রতিকারের পথ রুদ্ধ না হয়ে যায়। আর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও রাজ'আতের মাধ্যমে স্ত্রীর দায়ভার তার উপর না পড়ে যায়। আর এই শব্দগুলো প্রকৃতার্থে তালাকের প্রতি ইঙ্গিতকারী নয়। কেননা এ শব্দগুলো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত। আর বায়েনের দুই প্রকারের একটিকে নির্ধারণ করার জন্যই নিয়তের শর্ত; তালাকের অর্থ নির্ধারণের জন্য নয়। আর তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারাই সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়। আর তিন তালাকের নিয়ত সহীহ হওয়ার কারণ হলো, বায়েনের প্রকারভেদ লঘু ও গুরু হওয়া। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় [বিচ্ছেদের] লঘু প্রকারটি সাব্যস্ত হবে। আমাদের মতে, দুই তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কেননা তা [দুই] একটি নিছক সংখ্যা। পূর্বে আমরা এর কারণ বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোল্লিখিত তিনটি শব্দ– إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর]; إِسْتَبْرِئِيْ رَحِمَكِ [তুমি তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর]; انت واحدة [তুমি এক] দ্বারা সর্বসম্মতভাবে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। এ তিনটি শব্দ ছাড়া অন্যান্য ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা আমাদের মতে, তালাকে বায়েন পতিত হবে। এটিই সর্বসাধারণ সাহাবীগণের অভিমত। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১১৫] আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অন্যান্য ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি দ্বারাও তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমত অনুরূপ এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমদ (র.) -এর মতও এটিই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, এসব শব্দ তালাকের প্রতি

ইঙ্গিতকারী, বিধায় এগুলো দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। এজন্যই এ শব্দগুলো দ্বারা তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ত করা শর্ত। আর ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি দ্বারা তালাক প্রদান করলে তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায়। অর্থাৎ তিনের স্থলে দু'য়ের মালিকানা থেকে যায়। আর তালাক পরবর্তীতে স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত করে, স্পষ্ট তালাকের ক্ষেত্রে যেমন রাজ'আত সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলিল হলো, বিচ্ছেদকরণ কর্মটি উপযুক্ত ব্যক্তির থেকে প্রয়োগ হয়েছে, যার শরিয়ত প্রদত্ত ক্ষমতা আছে। এই বিচ্ছেদকরণ কর্মটি উপযুক্ত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর যোগ্যতার ব্যাপারে যেমন অস্পষ্টতা নেই, তেমনি স্ত্রী তালাকের যথার্থ ক্ষেত্র হওয়ার বিষয়েও কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রয়োজনের খাতিরেই শরিয়ত কর্তৃক একটি বায়েন তালাক প্রদানের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা অনেক সময় স্বামী রাজ'আতের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না; আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পথও যেন একেবারে বন্ধ না হয়ে যায়, সেটিও কামনা করে। স্বামীর এ উদ্দেশ্য তালাকে রাজ'ঈ দ্বারা সম্ভব নয়, আর তিন তালাকের দ্বারাও সম্ভব নয়; বরং এক তালাকে বায়েনের দ্বারা তা সম্ভব। কেননা, এ ক্ষেত্রে রাজ'আতের মাধ্যমে স্ত্রীর দায়ভার তার উপর পড়ে না, আবার হিলা ব্যতীতই বিবাহ নবায়ন করে তাকে গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই শরিয়ত একটি বায়েন তালাক প্রদানের অধিকার দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য ছিল, এ শব্দগুলি তালাকের প্রতি ইঙ্গিতকারী– এটি যথার্থ নয়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এ শব্দগুলো তালাকের প্রতি ইঙ্গিতকারী নয়। কেননা, এ শব্দগুলো তাদের প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। রূপক অর্থে তালাকের ইঙ্গিতসূচক বলা হয়েছে। কেননা, এসব শব্দ যে অর্থ প্রদান করে, সেগুলোতে অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে তালাকের নিয়ত করলে সেই অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং এসব শব্দ তাদের প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতার্থে এগুলো তালাকের প্রতি ইঙ্গিতকারী নয়।

قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ تَعْيِيْنُ اَحَدِ نَوْعَيِ الْبَيْنُوْنَةِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য– وَلِهٰذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। 'বায়েন' দুই প্রকার– একটি গুরু, অপরটি লঘু। 'বায়েন' -এর এই দু প্রকারের একটিকে নির্ধারণ করার জন্যই মূলত নিয়তের শর্তটি ছিল; তালাকের অর্থ নির্ধারণ করার জন্য নয়। সুতরাং নিয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য যদি তালাকের অর্থ নির্ধারণ করা হতো, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতো।

قَوْلُهُ وَانْتِقَاصُ الْعَدَدِ الخ : এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্যের জবাব দেওয়া হয়েছে। তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারাই সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়। আর তার অনিবার্য ফল হিসেবে একটি তালাক সাব্যস্ত হয়। এ কারণে স্বামীর হাতে বিদ্যমান তালাকের সংখ্যা তিনটি থেকে একটি কমে যায়। সুতরাং সংখ্যা কমে যাওয়া এবং বায়েন তালাকের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। অতএব, তালাকে বায়েনের কারণেই সংখ্যা কমে যায়।

اِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, এই ইঙ্গিতসূচক শব্দগুলো যদি তাদের প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে اَنْتِ بَائِنٌ [তুমি বায়েন তালাকপ্রাপ্তা] বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বিশুদ্ধ হবে না। যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বিশুদ্ধ নয়।

উত্তর : এর উত্তরে বলা হয়- اَنْتِ بَائِنٌ [তোমার প্রতি বায়েন তালাক] বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো বায়েন তালাক দুই প্রকার। একটি গুরু [مُغَلَّظَةٌ] অপরটি লঘু [مُخَفَّفَةٌ]। গুরু তালাকটি তিন তালাকরূপে কার্যকর হয়। সুতরাং নিয়তের দ্বারা বায়েন -এর একপ্রকার নির্ধারিত হওয়ার সুবাদে তিন তালাক সাব্যস্ত হচ্ছে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় বায়েন তালাকের লঘু প্রকারটি সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ الخ : আমাদের মতে, দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, শুদ্ধ হবে। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত। বিস্তারিত বিবরণ এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِعْتَدِّيْ إِعْتَدِّيْ إِعْتَدِّيْ وَقَالَ نَوَيْتُ بِالْأُوْلٰى طَلَاقًا وَبِالْبَاقِيْ حَيْضًا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُ اِمْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالْإِعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ وَإِنْ قَالَ لَمْ اَنْوِ بِالْبَاقِيْ شَيْئًا فَهِيَ ثَلٰثٌ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوٰى بِالْأُوْلَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَّلَاقِ بِهٰذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيْ نَفْيِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَمْ اَنْوِ بِالْكُلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأَوَّلَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْحَالَ عِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ تَكُنْ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَفِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ عَلٰى نَفْيِ النِّيَّةِ إِنَّمَا يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِيْنِ لِأَنَّهُ اَمِيْنٌ فِي الْإِخْبَارِ عَمَّا فِيْ ضَمِيْرِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِيْنِ مَعَ الْيَمِيْنِ ـ

অনুবাদ : আর সে যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি গণনা কর, গণনা কর, গণনা কর, আর বলে, প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি আর অন্য দুটি দ্বারা হায়েজ বুঝিয়েছি, তাহলে আদালতের বিচারে তার কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তার কথার প্রকৃত অর্থের নিয়ত করেছে। তাছাড়া সাধারণত স্বামী তালাকের পরে তার স্ত্রীকে ইদ্দত গণনার আদেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থাও তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর যদি সে বলে, অবশিষ্ট দুটি দ্বারা কিছুই নিয়ত করিনি, তাহলে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা সে যখন প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে, তখন বিদ্যমান অবস্থাটি তালাকের আলোচ্য অবস্থা হয়ে গেল। সুতরাং এ অবস্থাগত প্রমাণের মাধ্যমে অবশিষ্ট শব্দ দুটি তালাকের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল। তাই নিয়ত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, শব্দত্রয় দ্বারা কোনো তালাকের নিয়ত করিনি, তাহলে কিছুই পতিত হবে না। কেননা এখানে কোনো বাহ্যিক অবস্থা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না। তদ্রূপ যদি বলে যে, তৃতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি, প্রথম দুটি দ্বারা নিয়ত করিনি। তাহলে শুধু একটি তালাকই সাব্যস্ত হবে। কেননা প্রথম দুটি শব্দ বলার সময় তালাকের আলোচনার অবস্থা ছিল না। আর যে সকল ক্ষেত্রে নিয়ত অস্বীকারের বিষয়ে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে বলা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে শপথসহ তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা তার মনের নিহিত কথা অবহিত করার ব্যাপারে সেই একমাত্র আমানতদার হিসেবে গণ্য। আর আমানতদারের কথা গ্রহণযোগ্য হয় শপথসহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِعْتَدِّيْ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিনবার বলে– إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর], إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর], إِعْتَدِّيْ [তুমি গণনা কর] আর বলে, প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা ইদ্দত হিসেবে হায়েজ গণনা করা বুঝিয়েছি, তাহলে আদালতের বিচারে তার কথা গ্রহণ করা হবে। এটিই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত। এর দলিল হলো, সে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য

করেছে। আর প্রথম শব্দটি দ্বারা তার কথার সম্ভাব্য অর্থ গ্রহণ করেছে। এ কারণে উভয় নিয়তই আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে। এছাড়া স্বামী সাধারণত তালাকের পর তার স্ত্রীকে ইদ্দত গণনার আদেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থাও তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ কারণেও তার নিয়ত আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্বামী যদি বলে, আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা কোনো কিছুরই নিয়ত করিনি, তাহলে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা স্বামী যখন প্রথম শব্দটির মাধ্যমে তালাকের নিয়ত করেছে, তখন বিদ্যমান অবস্থাটি তালাকের আলোচ্য অবস্থা হয়ে গেল। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ অবস্থাগত প্রমাণের মাধ্যমে তালাকের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের মাধ্যমে নিয়তের অস্বীকার বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে সে যদি বলে, শব্দ তিনটির দ্বারা কোনো তালাকের নিয়তই করিনি, তাহলে কিছুই পতিত হবে না। কেননা এখানে এমন কোনো বাহ্যিক অবস্থা নেই, যা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যদি তৃতীয় শব্দের দ্বারা তালাকের নিয়ত করে কিন্তু প্রথম দুটি দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে, তাহলে শুধুমাত্র একটি তালাক পতিত হবে। কেননা প্রথম দুটি শব্দ বলার সময় তালাকের আলোচনার অবস্থা ছিল না।

قَوْلُهُ وَفِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ الخ : এ ক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো– যে সকল ক্ষেত্রে নিয়ত অস্বীকারের বিষয়ে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে বলা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে শপথ সহ তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার মনের গোপন বিষয় জানানোর ব্যাপারে সেই একমাত্র আমানতদার হিসেবে বিবেচিত। আর আমানতদারের কথা শপথ সহ গ্রহণযোগ্য হয়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এ মাসআলার সম্ভাব্য বেশ কিছু সুরত উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১. তিনটি শব্দ দ্বারাই তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ২. শুধু প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ৩. প্রথমটি দ্বারা শুধু ইদ্দত হিসেবে হায়েজ গণনার নিয়ত করা হয়েছে। ৪. প্রথম দুটি শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ৫. প্রথমটি ও তৃতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ৬. দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা তালাকের এবং প্রথমটি দ্বারা হায়েজ -এর নিয়ত করা হয়েছে। এ ছয়টি সুরতের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হবে।

৭. দ্বিতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ৮. প্রথমটি দ্বারা তালাক ও দ্বিতীয়টি দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ৯. প্রথমটি দ্বারা তালাক ও তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১০. শেষোক্ত দুটি শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ১১. প্রথম দুটি শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১২. প্রথমটি ও তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১৩. প্রথমটা ও দ্বিতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১৪. প্রথমটা ও তৃতীয়টি দ্বারা তালাক এবং দ্বিতীয়টা দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১৫. প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি দ্বারা হায়েজ এবং তৃতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ১৬. প্রথমটি ও তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজ এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ১৭. দ্বিতীয়টি দ্বারা শুধু হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। এ এগারটি সুরতে দুই তালাক পতিত হবে। ১৮. তিনটি শব্দের দ্বারাই হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ১৯. তৃতীয়টি দ্বারা শুধু তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ২০. তৃতীয়টি দ্বারা শুধু হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ২১. দ্বিতীয়টি দ্বারা তালাক ও তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। ২২. দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা হায়েজ এবং প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করা হয়েছে। ২৩. শেষোক্ত দুটি শব্দের দ্বারা শুধুমাত্র হায়েজের নিয়ত করা হয়েছে। এ ছয়টি সুরতে শুধুমাত্র এক তালাক পতিত হবে। আর যদি কোনো নিয়ত না করে, তাহলে কোনো তালাকই পতিত হবে না। –[ফতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃ. ৬৪]

بَابُ تَفْوِيْضِ الطَّلَاقِ

فَصْلٌ فِى الْاِخْتِيَارِ : وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِى يَنْوِى بِذٰلِكَ الطَّلَاقَ أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِىْ مَجْلِسِهَا ذٰلِكَ فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِىْ عَمَلٍ أٰخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجْلِسُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَلِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ الْفِعْلِ مِنْهَا وَالتَّمْلِيْكَاتُ تَقْتَضِىْ جَوَابًا فِى الْمَجْلِسِ كَمَا فِى الْبَيْعِ لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ أُعْتُبِرَتْ سَاعَةً وَاحِدَةً إِلَّا أَنَّ الْمَجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالذِّهَابِ عَنْهُ وَمَرَّةً بِالْاِشْتِغَالِ بِعَمَلٍ أٰخَرَ إِذْ مَجْلِسُ الْأَكْلِ غَيْرُ مَجْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ وَمَجْلِسُ الْقِتَالِ غَيْرُهُمَا ـ

পরিচ্ছেদ : তালাকের ক্ষমতা প্রদান

অনুচ্ছেদ : ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়ত করে বলে, 'তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ কর', কিংবা তাকে বলে, 'তুমি নিজেকে তালাক প্রদান কর, তাহলে সে ঐ বৈঠকে থাকা পর্যন্ত নিজেকে তালাক প্রদান করতে পারবে। কিন্তু যদি সে ঐ বৈঠক থেকে উঠে যায় কিংবা অন্য কোনো কাজ শুরু করে, তাহলে বিষয়টি তার কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা যাকে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করা হয়, তার জন্য বৈঠকই বিবেচ্য সকল সাহাবায়ে কেরামের 'ইজমা'-এর ভিত্তিতে। তাছাড়া এটা হলো স্ত্রীকে একটি কাজের অধিকার প্রদান। আর অধিকারমূলক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান বৈঠকেই জবাব দাবি করে; যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। কেননা বৈঠকের মুহূর্তসমূহকে একই মুহূর্ত বিবেচনা করা হয়। তবে বৈঠক পরিবর্তন হয় কখনো বৈঠক থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে, আবার কখনো পরিবর্তন হয় অন্য কাজে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে। কেননা খাওয়ার বৈঠক তো বিতর্কের বৈঠক থেকে ভিন্ন। আর ঝগড়ার আসর এতদুভয় থেকে আলাদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ تَفْوِيْضِ الطَّلَاقِ : তালাক প্রদানে স্বামীর নিজস্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রসঙ্গ ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন ভিন্ন পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার (র.) তালাক প্রদানের এ ক্ষমতা অন্যকে প্রদান সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। তালাকের ক্ষমতা প্রদান পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ আছে- ১. فَصْلٌ فِى الْاِخْتِيَارِ [ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের অনুচ্ছেদ]।
২. فَصْلٌ فِى الْأَمْرِ بِالْيَدِ [বিষয়টি হাতে অর্পণ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ]।
৩. فَصْلُ الْمَشِيْئَةِ [ইচ্ছা প্রসঙ্গ অনুচ্ছেদ]

তালাক-ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের নিরিখে যদিও যুক্তিযুক্ত নয়, তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য। কেননা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত। যেমন তাদের থেকে বর্ণিত– إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذٰلِكَ فَإِذَا قَامَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا [যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করবে, তখন তার ইচ্ছাধিকার ঐ আসরেই বিবেচ্য হবে। আসর থেকে উঠে গেলে স্ত্রীর আর ইচ্ছাধিকার থাকবে না]। –[ফাতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃ. ৬৯] সাহাবায়ে কেরামের কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِيْ الخ : মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের নিয়ত করে বলে– اِخْتَارِيْ [তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ কর]; কিংবা طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক প্রদান কর], তাহলে স্ত্রী ঐ আসরে থাকা পর্যন্ত নিজেকে তালাক প্রদান করতে পারবে। তবে স্ত্রী যদি ঐ আসর থেকে উঠে যায় কিংবা অন্য কোনো কাজ শুরু করে, তাহলে তাকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ বাতিল হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, কিয়াসের ভিত্তিতে اِخْتَارِيْ [তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ কর] দ্বারা নিয়ত থাকা সত্ত্বেও তালাক পতিত না হওয়ার কথা। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اِخْتَرْتُكِ مِنْ نَفْسِيْ [আমি নিজেই তোমাকে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করলাম] কিংবা اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ مِنْكِ [আমি তোমার থেকে নিজেই ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করলাম], তাহলে তালাক পতিত হয় না। ব্যক্তি নিজেই যে জিনিসের মালিক নয়, সে আবার অন্যকে কিভাবে সে জিনিসের মালিক বানাবে? তবে সাহাবায়ে কেরামের 'ইজমা'-এর কারণে এ ক্ষেত্রে কিয়াসের এ দাবি পরিত্যাজ্য। ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা'-সাপেক্ষে প্রমাণিত। আর স্ত্রীকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকার ঐ বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়টিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক দলিল হলো, ইচ্ছাধিকার প্রদান হলো স্ত্রীকে একটি কাজের অধিকার প্রদান। আর অধিকার প্রদানমূলক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান আসরেই জবাব দাবি করে। যেমন– বেচাকেনার ক্ষেত্রে যে আসরে প্রস্তাব দেওয়া হয়, ঐ আসরেই কবুল/প্রস্তাব গ্রহণ পাওয়া আবশ্যক। কেননা আসরের মুহূর্তসমূহকে একই মুহূর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই তো একই আসরে যদি একটি সিজদার আয়াতকে বারবার তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে একটিই সিজদা ওয়াজিব হয়। সুতরাং স্ত্রী ঐ আসরেই তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখবে। আসর পরিবর্তন হলে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা আর থাকবে না। আর আসর পরিবর্তন হয় দুভাবে–

১. আসর থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে আসর পরিবর্তন হয়।

২. অন্য কোনো কাজে মনোনিবেশ করলেও আসর পরিবর্তন হয়। যেমন– খাওয়া-দাওয়ার আসরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিতর্ক শুরু হলে আসর পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ الْاِفْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ثُمَّ لَابُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِيْ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ تَخَيُّرَهَافِيْ نَفْسِهَا وَيَحْتَمِلُ تَخَيُّرَهَا فِيْ تَصَرُّفٍ اٰخَرَ غَيْرَهُ فَاِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِيْ قَوْلِهِ اِخْتَارِيْ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَالْقِيَاسُ اَنْ لَّا يَقَعَ بِهٰذَا شَيْءٌ وَاِنْ نَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْاِيْقَاعَ بِهٰذَا اللَّفْظِ فَلَا يَمْلِكُ التَّفْوِيْضَ اِلٰى غَيْرِهِ اِلَّا اَنَّا اِسْتَحْسَنَّاهُ لِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّهُ بِسَبِيْلٍ مِنْ اَنْ يَّسْتَدِيْمَ نِكَاحَهَا اَوْ يُفَارِقَهَا فَيَمْلِكُ اِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِيْ حَقِّ هٰذَا الْحُكْمِ ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثُبُوْتِ اخْتِصَاصِهَا بِهَا وَ ذٰلِكَ فِي الْبَائِنِ وَلَا يَكُوْنُ ثَلٰثًا وَاِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذٰلِكَ لِأَنَّ الْاِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ بِخِلَافِ الْاِبَانَةِ لِأَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ قَدْ تَتَنَوَّعُ .

অনুবাদ : আর শুধু দাঁড়ানোর দ্বারা তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা বিমুখ হওয়ার প্রমাণ। তবে বাই-ই-সরফ ও বাই-ই সলম -এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হলো করায়ত্ত না করে বৈঠক থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। আর তার বক্তব্য 'ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে' -এর ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি। কেননা এর অর্থ যেমন স্ত্রীকে তার নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রদান হতে পারে, তেমনি অন্য কোনো বিষয়ে ইচ্ছাধিকার প্রদানও হতে পারে। স্ত্রী যদি তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে স্বামীর উক্তি "ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর" -এর প্রেক্ষিতে, তাহলে একটি বায়েন তালাক হবে। কিয়াস মতে, এর দ্বারা কোনো কিছুই পতিত হবে না, যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে। কেননা স্বামী এ ধরনের শব্দের দ্বারা তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং অন্যকেও তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে না। তবে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার কারণে আমরা এটাকে সূক্ষ্ম কিয়াসের মাধ্যমে বৈধতা দান করেছি। অধিকন্তু বিবাহকে অব্যাহত রাখা এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারী তো স্বামী। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সে তার স্থলবর্তী করতে পারবে। আর এর দ্বারা প্রদত্ত তালাক বায়েন হবে। কেননা নিজের বিষয়ে নিজের একক মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে তার নিজেকে গ্রহণ করা সাব্যস্ত হবে। আর বায়েন তালাকের মাধ্যমেই তা হতে পারে। আর তিন তালাক পতিত হবে না, যদিও স্বামী সে নিয়ত করে। কেননা নিজের মালিকানা গ্রহণ একাধিক প্রকার হয় না। তবে বায়েনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা বায়েন একাধিক প্রকার হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ الخ : স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বৈঠকে শুধু দাঁড়ানোর দ্বারাই বাতিল হয়ে যায়। কেননা বৈঠক থেকে দাঁড়ানো ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টির প্রতি উপেক্ষার শামিল। তবে بَيْعُ الصَّرْفِ [স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বেচাকেনা] ও بَيْعُ السَّلَمِ [নগদের বিনিময়ে বাকি পণ্য বিক্রয়] -এর বিষয়টি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে শুধু বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর ফলে এ ধরনের বেচাকেনা বাতিল বলে গণ্য হবে না। কেননা এ ধরনের বেচাকেনায় পণ্য কবজা না করে বৈঠক থেকে আলাদা হওয়া। ফলে বেচাকেনা ভঙ্গ হয়ে যায়। শুধুমাত্র বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর বিষয়টি পাওয়া যায়নি। এ কারণেই এ ধরনের বেচাকেনার ক্ষেত্রে শুধু দাঁড়ানোর দ্বারা বেচাকেনা বাতিল হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামীর উক্তি – 'ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] -এর ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত আবশ্যক। কেননা إِخْتَارِىْ -এর অর্থ যেমন স্ত্রীকে তার নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রদান হতে পারে, তেমনি অন্যকোনো বিষয় যেমন– ভরণ-পোষণ, থাকার বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার প্রদানও হতে পারে।

قَوْلُهُ فَإِنْ إِخْتَارَتْ نَفْسَهَا الخ : স্বামীর কথা– إِخْتَارِىْ [ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] -এর ভিত্তিতে স্ত্রী যদি সেই আসরেই তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে, তাহলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েনা হবে। হযরত কাযী (র.) বলেন, এটিই হযরত আলী (রা.) -এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতে, একটি তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর ইমাম মালেক (র.) -এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১২৪]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কিয়াসের দাবি হলো, কোনো তালাক না হওয়া, যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে। কেননা স্বামী এ ধরনের শব্দযোগে তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এ শব্দের দ্বারা কিভাবে অন্যকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে? তবে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার কারণে আমরা এটাকে সূক্ষ্ম কিয়াসের মাধ্যমে বৈধ বলেছি। অধিকন্তু স্বামীর অধিকার আছে যে, সে বিবাহকে অব্যাহত রাখতে পারে, আবার স্ত্রীকে পরিত্যাগও করতে পারে। সুতরাং সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে তার স্থলবর্তী করতে পারে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ الخ : إِخْتَارِىْ [তোমার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] দ্বারা স্ত্রীকে প্রদত্ত অধিকার বলে প্রদত্ত তালাক বায়ন হবে। কেননা স্ত্রী তার নিজেকে গ্রহণ করা সাব্যস্ত হবে তখনই, যখন নিজের বিষয়ে নিজের একক মালিকানা অর্জন হবে অর্থাৎ স্বামীর মালিকানা বিদূরিত হয়ে স্ত্রীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটা বায়েন তালাকের মাধ্যমেই হতে পারে। তবে স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করলেও তিন তালাক পতিত হবে না। কেননা নিজের মালিকানা গ্রহণ একাধিক ভাগে বিভক্ত হয় না। পক্ষান্তরে أَنْتِ بَائِنٌ বলে তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, বায়েনকে লঘু ও গুরু এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এজন্য ইচ্ছাধিকারের ক্ষেত্রে তিন তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় না।

قَالَ وَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِيْ كَلَامِهِ اَوْ فِيْ كَلَامِهَا حَتّٰى لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِيْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ فَهُوَ بَاطِلٌ لِاَنَّهُ عُرِفَ بِالْاِجْمَاعِ وَهُوَ فِى الْمُفَسَّرِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَلِاَنَّ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ وَلَا تَعَيُّنَ مَعَ الْاِبْهَامِ وَلَوْ قَالَ اِخْتَارِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ لِاَنَّ كَلَامَهُ مُفَسَّرٌ وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَتَضَمَّنُ اِعَادَتَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ اِخْتَارِيْ اِخْتِيَارَةً فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ لِاَنَّ الْهَاءَ فِى الْاِخْتِيَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْاِتِّحَادِ وَالْاِنْفِرَادِ وَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِيْ يَتَّحِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ اُخْرٰى فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ وَلَوْ قَالَ اِخْتَارِيْ فَقَالَتْ اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ يَقَعُ الطَّلَاقُ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ لِاَنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামীর বক্তব্যে কিংবা স্ত্রীর বক্তব্যে 'নিজেকে' কথাটার উল্লেখ থাকা অপরিহার্য। তাই স্বামী যদি বলে, গ্রহণ কর আর স্ত্রী বলল– গ্রহণ করলাম, তাহলে তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুজনের কোনো একজনের পক্ষ হতে ব্যাখ্যাকৃত হওয়ার সাথে। তাছাড়া অস্পষ্ট কথা অস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা হতে পারে না। আর অস্পষ্টতার অবস্থায় কোনো দিক নির্ধারিত হতে পারে না। স্বামী যদি বলে, 'তুমি নিজেকে গ্রহণ কর' আর স্ত্রী বলে– গ্রহণ করলাম, তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা স্বামীর বক্তব্য ব্যাখ্যাকৃত আর স্ত্রীর বক্তব্য তার জবাবে এসেছে। সুতরাং স্বামীর বক্তব্যের স্পষ্টতা তার কথায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, তুমি তোমার ইচ্ছাধিকার একবার গ্রহণ কর, আর স্ত্রী বলে, আমি গ্রহণ করলাম। কেননা ইচ্ছাধিকার শব্দের 'তা' একবার বুঝায়। আর স্ত্রী, তার নিজেকে গ্রহণ করাটা কখনো একবার হয়, আবার কখনো একাধিকবার হয়। আর স্বামীর পক্ষ থেকে কথাটা স্পষ্টতা সহ হয়েছে। আর স্বামী যদি বলে, 'তুমি গ্রহণ কর' আর স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম, তাহলে স্বামী তালাকের নিয়ত করলে তালাক হবে। কেননা স্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্টতা সহ হয়েছে। আর স্বামী যা নিয়ত করেছে, তা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ الخ : ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী কিংবা স্ত্রীর কথায় نَفْس [নিজেকে] অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কোনো শব্দের [যেমন– تَطْلِيْقَة ،اِخْتِيَارَة] উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এ কারণেই স্বামী যদি বলে, اِخْتَارِيْ [ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] আর জবাবে স্ত্রী বলে, اِخْتَرْتُ [ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করলাম], তাহলে তালাক পতিত হবে না। এর দলিল হলো, اِخْتِيَار তথা ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তালাক প্রদানের গ্রহণযোগ্যতা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেক্ষেত্রে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনের কোনো একজনের কথায় نَفْس শব্দের কিংবা অনুরূপ কোনো শব্দের উল্লেখ থাকে। আর ইজমা যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক সেভাবেই তা বহাল থাকে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, স্বামীর বক্তব্য إِخْتَارِىْ [তোমার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] অস্পষ্ট। আর এর জবাবে স্ত্রীর বক্তব্য إِخْتَرْتُ [আমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করলাম]-ও অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট কথা অস্পষ্ট কথার ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ কারণেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর অস্পষ্টতার অবস্থায় তালাক নিয়তের ফলে তালাকের নির্ধারিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إِخْتَارِىْ نَفْسَكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে إِخْتَارِىْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে গ্রহণ কর], আর স্ত্রী তার জবাবে نَفْسٌ [নিজেকে] শব্দের উল্লেখ না করেই বলে- إِخْتَرْتُ [আমি গ্রহণ করলাম], তাহলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হবে। এর দলিল হলো, স্বামীর কথায় نَفْسٌ শব্দটির উল্লেখ থাকায় তা স্পষ্ট। আর স্বামীর বক্তব্যের জবাবে স্ত্রীর বক্তব্য এসেছে। এ কারণেই স্বামীর বক্তব্যের স্পষ্টতা স্ত্রীর বক্তব্যেরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা সাধারণ নিয়ম হলো, প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু, জবাবের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং স্ত্রীর উত্তরের মোদ্দাকথা হলো, তুমি আমাকে নিজেকে গ্রহণের যে আদেশ দিয়েছ, আমি তা নিজে গ্রহণ করলাম।

আর স্বামী যদি বলে- إِخْتَارِىْ إِخْتِيَارَةً [তুমি তোমার ইচ্ছাধিকার একবার গ্রহণ কর] আর স্ত্রী তার উত্তরে বলে- إِخْتَرْتُ [আমি গ্রহণ করলাম], তাহলেও একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো إِخْتِيَارَةً -এর মধ্যকার ة দ্বারা একবার বুঝানো হয়। তাহলে স্বামীর কথার মর্মার্থ দাঁড়ায় সে তার স্ত্রীকে এমন কিছুর ইচ্ছাধিকার প্রদান করতে চাচ্ছে, যা একবার হয়, আবার একাধিকবারও হয়। আর নিজেকে গ্রহণ করাটাই কখনো একবার হয়, আবার কখনো একাধিকবার হয়। এজন্য স্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে এক তালাক দ্বারা, তাহলে একবারের বিষয়টি পাওয়া যায়; আর যদি নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে তিন তালাক দ্বারা, তাহলে একাধিকবারের বিষয়টি পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে কথাটা স্পষ্টতা সহ হয়েছে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে إِخْتَارِىْ [তুমি গ্রহণ কর], আর স্ত্রী এর জবাবে বলে إِخْتَرْتُ نَفْسِىْ [আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম], তাহলে স্বামী তালাকের নিয়ত করলে একটি তালাকে বায়েন পতিত হবে। এর দলিল হলো, এক্ষেত্রে স্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্ট। আর স্বামী যে তালাকের নিয়ত করেছে, তা তার কথার সম্ভাবনাভুক্ত।

وَلَوْ قَالَ اِخْتَارِىْ فَقَالَتْ اَنَا اَخْتَارُ نَفْسِىْ فَهِىَ طَالِقٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا تُطَلَّقَ لِاَنَّ هٰذَا مُجَرَّدُ وَعْدًا وَيَحْتَمِلُهُ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَقَالَتْ اَنَا اُطَلِّقُ نَفْسِىْ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاِنَّهَا قَالَتْ لَا بَلْ اَخْتَارُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَاعْتَبَرَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَوَابًا مِنْهَا وَلِاَنَّ هٰذِهِ الصِّيْغَةَ حَقِيْقَةٌ فِى الْحَالِ وَتَجُوْزُ فِى الْاِسْتِقْبَالِ كَمَا فِىْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَاَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا اُطَلِّقُ نَفْسِىْ لِاَنَّهُ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ قَائِمَةٍ وَلَا كَذٰلِكَ قَوْلُهَا اَنَا اَخْتَارُ نَفْسِىْ لِاَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُوَ اِخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি বলে, 'তুমি গ্রহণ কর' আর স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করছি, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে। কিয়াস মতে, তালাক হবে না। কেননা এটা নিছক প্রতিশ্রুতি কিংবা তালাক সৃজন অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি নিজেকে তালাক প্রদান কর আর স্ত্রী বলল, আমি নিজেকে তালাক দিচ্ছি। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস। কেননা তিনি বলেছিলেন, 'না; বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করছি।' আর রাসূল ﷺ এটা তাঁর পক্ষ থেকে জবাবরূপে গণ্য করেছেন অধিকন্তু এ রূপান্তরটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের জন্য আর রূপক অর্থে ভবিষ্যৎকালের জন্য। যেমন– কালিমায়ে শাহাদাত এবং সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 'নিজেকে তালাক দিচ্ছি' কথাটা ভিন্ন। কেননা এটাকে বর্তমান অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ বিদ্যমান কোনো অবস্থার বর্ণনা এটা নয়। আমি নিজেকে গ্রহণ করছি– কথাটা সেরূপ নয়। কেননা এটা বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ। আর তা হলো নিজের সত্তাকে গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اِخْتَارِىْ فَقَالَتْ اَنَا الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اِخْتَارِىْ [তুমি গ্রহণ কর], আর এর উত্তরে স্ত্রী বলে– اَنَا اَخْتَارُ نَفْسِىْ [আমি নিজেকে গ্রহণ করছি], তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। কিয়াসের দাবি হলো, এর মাধ্যমে তালাক পতিত হবে না। কেননা স্ত্রী اَخْتَارُ বলেছে, যা فِعْلُ مُضَارِعٍ [এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল উভয়টির সম্ভাবনা রাখে]। স্ত্রী যদি শব্দটিকে ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহার করে তাহলে এটা নিছক প্রতিশ্রুতি। নিছক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তালাক পতিত হবে না। আর স্ত্রী এ শব্দের দ্বারা বর্তমানকাল উদ্দেশ্য করলেও তাতে ভবিষ্যতের অর্থের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, طَلِّقِىْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক প্রদান কর]; আর এর জবাবে স্ত্রী বলল, اَنَا اُطَلِّقُ نَفْسِىْ [আমি নিজেকে তালাক দিচ্ছি], তাহলে তালাক পতিত হবে না। অনুরূপভাবে اَخْتَارُ نَفْسِىْ -এর মাধ্যমে তালাক হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে–

لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِيْ فَقَالَ : إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِيْ "يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا إِلٰى قَوْلِهِ أَجْرًا عَظِيْمًا" . فَقُلْتُ : فَفِيْ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ الَّذِيْ فَعَلْتُ .

অর্থ: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন, তখন আমাকে দিয়ে সূচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলব, উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দেবে না; বরং তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ করে দেবে। তিনি জানতেন, আমার পিতামাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইরশাদ করেছেন– "হে নবী, আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করি। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর। তবে তোমাদের সৎকর্ম পরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সূরা আহযাব : ২৮-২৯]।

এ আয়াত শোনার পর আমি আরজ করলাম, এ ব্যাপারে আমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। এরপর রাসূল ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ আমার মতোই করলেন।"

এ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য– فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ [আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি] -কে রাসূল ﷺ জবাবরূপে বিবেচনা করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর বক্তব্যে مُضَارِعْ -এর শব্দ (أُرِيْدُ) উল্লেখ করেছেন, যা ভবিষ্যতের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা যায়– مُضَارِعْ -এর শব্দ দ্বারাও ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো– مُضَارِعْ -এর শব্দ প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালের জন্য, আর রূপক অর্থে ভবিষ্যতের জন্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব বলে বর্তমানের অর্থই উদ্দেশ্য হবে। যেমন কালিমায়ে শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ -এর মধ্যে أَشْهَدُ . مُضَارِعْ -এর শব্দে বর্তমানকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে أَشْهَدُ . مُضَارِعْ -এর শব্দ বর্তমানকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِيْ [আমি নিজেকে গ্রহণ করছি] এ বাক্যটিকে أَنَا أُطَلِّقُ نَفْسِيْ [আমি নিজেকে তালাক দিচ্ছি] বাক্যের সাথে কিয়াস করা যথার্থ হবে না। কেননা أُطَلِّقُ শব্দটিকে বর্তমান অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু أَخْتَارُ [আমি গ্রহণ করছি] শব্দটিকে বর্তমান অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। এর কারণ হলো, তালাক দেওয়া একটি মৌখিক বিষয়, আর কোনো কিছুকে গ্রহণ করার বিষয়টি আন্তরিক। তাছাড়া أُطَلِّقُ শব্দটিকে বর্তমানকাল অর্থে গ্রহণ করলে তা কোনো ঘটনার বিবরণ হবে। আর কোনো ঘটনার বিবরণের জন্য পূর্বে একটি ঘটনা থাকা জরুরি। অথচ এক্ষেত্রে এ শব্দটি উচ্চারণের পূর্বে এমন কিছু ঘটেনি, যার বিবরণস্বরূপ এ শব্দটি উক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِيْ [আমি নিজেকে গ্রহণ করছি] বক্তব্যটি ভিন্ন। কেননা এটা হলো বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ। কারণ নিজেকে গ্রহণ করা অন্তরের বিষয়। আর মৌখিক উচ্চারণ হলো ঐ অন্তরে বিদ্যমান বিষয়টির বিবরণ।

وَلَوْ قَالَ لَهَا إِخْتَارِىْ إِخْتَارِىْ إِخْتَارِىْ فَقَالَتْ إِخْتَرْتُ الْأُوْلٰى وَالْوُسْطٰى وَالْأَخِيْرَةَ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا فِىْ قَوْلِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَا يَحْتَاجُ إِلٰى نِيَّةِ الزَّوْجِ وَقَالَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً وَإِنَّمَا لَا يَحْتَاجُ إِلٰى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِدَلَالَةِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ إِذِ الْاِخْتِيَارُ فِىْ حَقِّ الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِىْ يَتَكَرَّرُ لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُوْلٰى وَمَا يَجْرِىْ مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ لَا يُفِيْدُ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيْبِ وَلٰكِنْ يُفِيْدُ مِنْ حَيْثُ الْإِفْرَادِ فَيُعْتَبَرُ فِيْمَا يُفِيْدُ وَلَهُ أَنَّ هٰذَا وَصْفٌ لَغْوٌ لِأَنَّ الْمُجْتَمِعَ فِى الْمِلْكِ لَا تَرْتِيْبَ فِيْهِ كَالْمُجْتَمِعِ فِى الْمَكَانِ وَالْكَلَامِ لِلتَّرْتِيْبِ وَالْإِفْرَادُ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ فَإِذَا لَغَا فِىْ حَقِّ الْأَصْلِ لَغَا فِىْ حَقِّ الْبِنَاءِ. وَلَوْ قَالَ إِخْتَرْتُ إِخْتِيَارَةً فَهِىَ ثَلٰثٌ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِأَنَّهَا لِلْمَرَّةِ فَصَارَتْ كَمَا إِذَا صَرَحَتْ بِهَا وَلِأَنَّ الْاِخْتِيَارَةَ لِلتَّاكِيْدِ وَبِدُوْنِ التَّاكِيْدِ يَقَعُ الثَّلٰثُ فَمَعَ التَّاكِيْدِ أَوْلٰى .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর; আর স্ত্রী বলে প্রথমটি, মধ্যবর্তীটি ও শেষটি গ্রহণ করলাম। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তিন তালাক হয়ে যাবে। স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, এক তালাক হবে। স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন না থাকার কারণ হলো, শব্দটির বারংবার উল্লেখ তালাকের নির্দেশ করে। কেননা তালাকের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার গ্রহণ বারংবার হতে পারে। সাহেবাইনের দলিল হলো, প্রথম শব্দটি ও তদস্থলবর্তী শব্দের উল্লেখ যদিও ধারাবাহিকতার অর্থে কার্যকর নয়, কিন্তু একক অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর। সুতরাং কার্যকর বিষয়ে শব্দগুলো বিবেচ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, এটি একটি অর্থহীন বিশেষণ। কেননা যে তিনটি তালাক মালিকানায় জমা হয়েছে, তাতে কোনো ক্রম নেই। যেমন– কোনো স্থানে একত্রিতদের মাঝে কোনো ক্রম নেই। আর শব্দগুলো ক্রম প্রকাশক, একক হলো তার অনিবার্য অর্থ সুতরাং 'মূল'-এর ক্ষেত্রে যখন শব্দগুলো অকার্যকর হয়ে গেল, তখন তার উপর ভিত্তিকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও অকার্যকর গণ্য হবে। আর [স্বামীর উপরিউক্ত কথার প্রেক্ষিতে] স্ত্রী যদি বলে, 'আমি একবার গ্রহণ করলাম' তাহলে সকলের মতে, তিন তালাক হয়ে যাবে। কেননা শুধু গ্রহণ করলাম বললেও তিন তালাক সাব্যস্ত হতো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আরো ভালোভাবেই তা হবে। কারণ 'একবার' শব্দটি তালাকের বিশেষণ নয়; বরং তা জোর দেওয়ার জন্য ধর্তব্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِخْتَارِىْ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিনবার إِخْتَارِىْ [তুমি গ্রহণ কর] বলে, আর স্ত্রী এর জবাবে বলে– إِخْتَرْتُ الْأُوْلٰى وَالْوُسْطٰى وَالْأَخِيْرَةَ [আমি প্রথমটি, মধ্যবর্তীটি ও শেষটি গ্রহণ করলাম], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তিন তালাক হয়ে যাবে– স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন হবে না এবং نَفْس [নিজেকে] শব্দের উল্লেখও আবশ্যক নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, একটি তালাক পতিত হবে।

স্বামীর তালাকের নিয়তের প্রয়োজন না থাকার কারণ হলো- اَخْتَارُ শব্দটি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, যা তালাকের অর্থকে নির্দেশ করে। কেননা স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার গ্রহণ বারবার হতে পারে তালাকের ক্ষেত্রেই। সুতরাং তালাকের অর্থের ইঙ্গিত থাকায় স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দগুলো সংখ্যার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর। তারতীব তথা ক্রম প্রকাশের অর্থে এগুলো কার্যকর নয়। সুতরাং যে বিষয়ে শব্দগুলো কার্যকর, সে বিষয়ে সেগুলো বিবেচ্য হবে। অতএব, স্ত্রী যেন স্বামীর উত্তরে বলল- اِخْتَرْتُ التَّطْلِيْقَةَ الْاُوْلٰى "আমি প্রথম তালাকটি গ্রহণ করেছি।" অর্থাৎ 'প্রথম' শব্দটি দ্বারা যা অর্পণ করা হয়েছে তা আমি গ্রহণ করেছি। আর 'প্রথম' শব্দটি দ্বারা অর্পিত হয়েছে এক তালাক। আর তাই এক তালাক পতিত হবে। কারণ اُوْلٰى শব্দটি اَوَّلُ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ- প্রথম সংখ্যা। وُسْطٰى শব্দটি اَوْسَطُ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ- মধ্যবর্তী সংখ্যা। আর اُخْرٰى শব্দটির অর্থ- শেষোক্ত সংখ্যা। এগুলো হলো ক্ষেত্র, যা ক্রমবাচক নয়। সুতরাং এগুলো দ্বারা সংখ্যা বুঝাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো- প্রথম, মধ্যম ও শেষ – এগুলো অর্থহীন বিশেষণ। কেননা যে তিনটি তালাক স্ত্রীর মালিকানায় জমা হয়েছে, তাতে কোনো ক্রম নেই। যেমন- কোনো স্থানে একত্রিত একাধিক লোকের মধ্যে কোনো ক্রম থাকে না। আর যে ক্ষেত্রে ক্রম নেই, সে ক্ষেত্রে ক্রম বুঝানোর জন্য যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা অর্থহীন। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম, মধ্যম ও শেষ শব্দগুলো মূলত ক্রম প্রকাশক; সংখ্যা হলো তার অনিবার্য অর্থ। সুতরাং ক্রম প্রকাশের ক্ষেত্রে যখন শব্দগুলো অকার্যকর হয়ে গেল, তখন সংখ্যা অর্থেও তা অকার্যকর হবে। আর যখন শব্দগুলো উভয় ক্ষেত্রেই অর্থহীন হয়ে পড়ল তখন শুধু স্ত্রীর বক্তব্য اِخْتَرْتُ [গ্রহণ করলাম] অবশিষ্ট থাকল। আর স্বামী যখন তিনবার اِخْتَارِىْ [তুমি গ্রহণ কর] বলে, আর এর উত্তরে স্ত্রী اِخْتَرْتُ [আমি গ্রহণ করলাম] বলে, তখন তিন তালাক পতিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তিন তালাক পতিত হবে।

আর স্বামীর তিনবার اِخْتَارِىْ কথার উত্তরে স্ত্রী যদি বলে- اِخْتَرْتُ اِخْتِيَارَةً তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তিন তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো- اِخْتِيَارَةً -এর تَاءْ . مَرَّةً [একবার] -এর অর্থে এসেছে। সুতরাং স্ত্রী যেন বলল- اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ مَرَّةً 'আমি একবারেই গ্রহণ করলাম।' আর এর দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়। অধিকন্তু اِخْتِيَارُ শব্দটি জোর প্রদানের জন্য এসেছে। সুতরাং জোর প্রদান ছাড়া শুধু গ্রহণ করলাম বললে যেখানে তিন তালাক সাব্যস্ত হতো, সেখানে তাকিদ/জোর প্রদান সহ তো তিন তালাক পতিত হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত।

আর স্বামীর তিনবার اِخْتَارِىْ কথার উত্তরে স্ত্রী যদি বলে- طَلَّقْتُ نَفْسِىْ [আমি নিজকে তালাক দিলাম] কিংবা اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ [একটি তালাকের মাধ্যমে আমি নিজকে গ্রহণ করলাম, তাহলে একটি তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। কেননা এই শব্দটি ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধনমুক্তি সাব্যস্ত করে। কারণ طَلَّقْتُ . تَطْلِيْقَةٌ -এগুলো সুস্পষ্ট শব্দ। আর সুস্পষ্ট শব্দ ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধনমুক্তি সাব্যস্ত করে এবং এতে তালাকে রাজ'ঈ সাব্যস্ত হয়।

وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِاَنَّ هٰذَا اللَّفْظَ يُوْجِبُ الْاِنْطِلَاقَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَاَنَّهَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَاِنْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِيْ تَطْلِيْقَةٍ اَوْ اِخْتَارِيْ تَطْلِيْقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِاَنَّهُ جَعَلَ لَهَا الْاِخْتِيَارَ لٰكِنْ بِتَطْلِيْقَةٍ وَهِيَ مُعَقَّبَةٌ لِلرَّجْعَةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে, আমি নিজেকে তালাক দিলাম কিংবা একটি তালাকের মাধ্যমে নিজেকে গ্রহণ করলাম, তাহলে একটি তালাক হবে। আর এরপরে স্বামীর রাজ'আতের অধিকার থাকবে। কেননা এ শব্দটি ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধন মুক্তি সাব্যস্ত করে। সুতরাং যেন সে ইদ্দতের পর নিজেকে গ্রহণ করল। আর স্বামী যদি বলে, এক তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার হাতে, কিংবা একটি তালাকের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর; আর স্ত্রী [এর জবাবে] বলল, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম, তাহলে সে একটি তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। কেননা স্বামী তাকে ইচ্ছাধিকার দান করেছে, কিন্তু সেটা এক তালাকের দ্বারা আবদ্ধ। আর এটি এমন একটি শব্দ, যার পিছনে রাজ'আত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَكَاَنَّهَا اِخْتَارَتْ الخ : এর মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, বর্ণিত হুকুমটি 'তালাকের ক্ষমতা প্রদান' -এর মোতাবেক হবে না। কেননা স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে। আর اِخْتِيَارٌ - শব্দের দ্বারা 'তালাকে বায়ন' কার্যকর হয়; তালাকে রাজ'ঈ নয়।

উত্তর : এর উত্তর হলো, স্ত্রী যেন ইদ্দতের পর হতে নিজেকে গ্রহণ করল। আর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বায়ন তালাক সাব্যস্ত হয়। সুতরাং হুকুম তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান মোতাবেক হয়েছে।

এখানে হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ অভিমত পোষণ করেন যে, يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ [স্বামীর রাজ'আতের অধিকার থাকবে] অংশটুকু ভুল। লেখকের অসাবধানতার কারণে এমনটি হয়েছে। কেননা স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ভিত্তিতেই স্ত্রী সেই ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করেছে। আর এ ক্ষেত্রে বায়ন তালাক পতিত হয়। কারণ اِخْتِيَارٌ তালাকের প্রতি ইঙ্গিতসূচক একটি শব্দ। আর ইঙ্গিতসূচক শব্দের মাধ্যমে বায়ন তালাক পতিত হয়। সুতরাং শুদ্ধ ইবারত হবে– فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ মাবসূত, জামিউল কাবীর, জামিউস সাগীর, যিয়াদাত প্রভৃতি গ্রন্থে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِيْ تَطْلِيْقَةٍ [এক তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার হাতে] কিংবা اِخْتَارِيْ تَطْلِيْقَةً [একটি তালাকের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর]; আর স্ত্রী স্বামীর এ কথার জবাবে বলে– اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ [আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম] তাহলে একটি তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। কেননা, স্ত্রীকে تَطْلِيْقَةٌ শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর تَطْلِيْقَةٌ শব্দের মাধ্যমে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হয়। সুতরাং এখানেও তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে, স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

فَصْلٌ فِى الْاَمْرِ بِالْيَدِ

وَاِنْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِى ثَلٰثًا فَقَالَتْ قَدْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ فَهِىَ ثَلٰثٌ لِاَنَّ الْاِخْتِيَارَ يَصْلُحُ جَوَابًا لِلْاَمْرِ بِالْيَدِ لِكَوْنِهِ تَمْلِيْكًا كَالتَّخْيِيْرِ وَالْوَاحِدَةُ صِفَةُ الْاِخْتِيَارَةِ فَصَارَ كَاَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَبِذٰلِكَ يَقَعُ الثَّلٰثُ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ اَوْ اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ لِاَنَّ الْوَاحِدَةَ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوْفٍ وَهُوَ فِى الْاُوْلٰى اَلْاِخْتِيَارَةُ وَفِى الثَّانِيَةِ التَّطْلِيْقَةُ اِلَّا اَنَّهَا تَكُوْنُ بَائِنَةً لِاَنَّ التَّفْوِيْضَ فِى الْبَائِنِ ضَرُوْرَةُ مِلْكِهَا اَمْرَهَا وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَصِيْرُ الصِّفَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى التَّفْوِيْضِ مَذْكُوْرَةً فِى الْاِيْقَاعِ وَاِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ فِىْ قَوْلِكَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ وَالْخُصُوْصَ وَنِيَّةُ الثَّلٰثِ نِيَّةُ التَّعْمِيْمِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اِخْتَارِىْ لِاَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

পরিচ্ছেদ : তালাকের বিষয়টি স্ত্রীর হাতে অর্পণ প্রসঙ্গে

অনুবাদ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে' এতে তিন তালাকের নিয়ত করে; আর স্ত্রী বলে, 'আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম', তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা গ্রহণ করা শব্দটি হতে অর্পণের বিষয়টির জবাবে হতে পারে। কারণ উক্ত বক্তব্যের অর্থ হলো, তালাকের মালিক বানানো যেমন ইচ্ছাধিকার প্রদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর 'একবার' কথাটি 'গ্রহণ' -এর বিশেষণ। সুতরাং সে যেন বলল, 'আমি নিজেকে একবারেই গ্রহণ করলাম।' আর তা দ্বারা তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী বলে, 'আমি নিজেকে এক দ্বারা তালাক দিলাম' কিংবা 'আমি নিজেকে এক তালাক দ্বারা গ্রহণ করলাম', তাহলে একটি বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা 'এক' কথাটি উহ্য ক্রিয়ামূলের বিশেষণ। আর প্রথম বাক্যে ক্রিয়ামূল হলো 'গ্রহণ' আর দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়ামূল হলো 'তালাক'। তবে তা বায়েন তালাক হবে। কেননা এ ক্ষমতা প্রদান বায়েন তালাকের ব্যাপারে হয়েছে– তার বিষয়ের অনিবার্য মালিকানা প্রদানের চাহিদা হিসেবে। আর স্ত্রীর কথা স্বামীর কথার জবাবে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা প্রদানের সময় যে বিশেষণ বিবেচ্য ছিল, প্রয়োগের সময়ও সেটি বিবেচ্য হবে। 'তোমার বিষয় তোমার হাতে' – বক্তব্যে তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, বাক্যটি ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্ভাবনা রাখে। আর তিন তালাকের নিয়ত করা হলো ব্যাপকতার নিয়ত করা। তবে 'ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর'-স্বামীর এ বক্তব্যটি ভিন্ন। কেননা তা ব্যাপকতার অবকাশ রাখে না। আমরা ইতঃপূর্বে তা সাব্যস্ত করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : تَفْوِيْضُ طَلَاقٍ তথা স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হলো فِى الْاَمْرِ بِالْيَدِ [তালাকের বিষয়টি স্ত্রীর হাতে অর্পণ প্রসঙ্গে]। হিদায়া গ্রন্থাকার (র.) تَفْوِيْضُ طَلَاقٍ -এর প্রথম অনুচ্ছেদের বিস্তারিত আলোচনার পর এবার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন।

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে] এবং তিন তালাকের নিয়ত করে; আর স্ত্রী এর উত্তরে বলে– اِخْتَرْتُ نَفْسِىْ بِوَاحِدَةٍ [আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম], তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। তিন তালাকের নিয়ত না করলে আমাদের মতে, একটি বায়েন তালাক পতিত হবে, আর ইমাম

শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, একটি রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে। আর ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, তিন তালাক পতিত হবে। যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে আদালতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে আমাদের মতে, একটি তালাক পতিত হবে। ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১৩৪]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলায় দুটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন–

১. اِخْتِيَارٌ [গ্রহণ করা] শব্দটি اَمْرٌ بِالْيَدِ [হাতে অর্পণের বিষয়টি] -এর জবাব হতে পারে। কেননা تَخْيِيْر [এখতিয়ার প্রদান] শব্দটির মাধ্যমে যেমন তালাকের মালিক বানানো হয়, তেমনি اَمْرٌ بِالْيَدِ শব্দটিও তালাকের মালিক বানানোর প্রতি ইঙ্গিত করে। উভয় শব্দ একই ধরনের বলে একটি অপরটির জবাব হতে পারে।

২. তিন তালাক পতিত হওয়ার দলিল হলো, স্ত্রীর বক্তব্য وَاحِدَةٌ শব্দটি উহ্য اِخْتِيَارَةٌ -এর বিশেষণ। এটি কোনো তালাকের সংখ্যাগত বিশেষণ নয়। সুতরাং স্ত্রী যেন বলল– اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِاخْتِيَارَةٍ وَاحِدَةٍ অর্থাৎ, আমি নিজেকে একবারেই গ্রহণ করলাম। আর এর দ্বারা তিন তালাক পতিত হয়। সুতরাং স্ত্রীর উক্ত বক্তব্যের দ্বারাও তিন তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ الخ : স্বামীর কথা– اَمْرُكِ بِيَدِكِ -[তোমার বিষয় তোমার হাতে] -এর জবাবে স্ত্রী যদি বলে– طَلَّقْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ [আমি নিজেকে এক দ্বারা তালাক দিলাম]; কিংবা اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ [আমি নিজেকে এক তালাক দ্বারা গ্রহণ করলাম]; তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। এর দলিল হলো, স্ত্রীর জবাবের মধ্যে যে وَاحِدَةٌ [এক] শব্দটি রয়েছে, তা উহ্য ক্রিয়ামূলের বিশেষণ। তাহলে প্রথম বক্তব্যে অর্থাৎ اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ -এর ক্ষেত্রে উহ্য ক্রিয়ামূল হলো اِخْتِيَارَةٌ [গ্রহণ]। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (طَلَّقْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ) উহ্য ক্রিয়ামূল হলো تَطْلِيْقَةٌ [তালাক]। তবে এর দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো– اَمْرُكِ بِيَدِكِ শব্দটি ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর ইঙ্গিতসূচক শব্দের দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয়। সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে বায়েন তালাকের ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করেছে। আর বায়েন তালাকের ক্ষমতা প্রদান অনিবার্যভাবে বায়েন তালাক হওয়াকেই দাবি করে। মোটকথা, স্ত্রীকে বায়েন তালাকের ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। আর স্ত্রীর বক্তব্য স্বামীর কথার প্রেক্ষিতে হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে বায়েন হওয়ার বিশেষণটি যেভাবে বিবেচ্য হবে, তদ্রূপ তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই বিশেষণটি বিবেচ্য হবে, যাতে স্ত্রীর কথা স্বামীর বক্তব্যের মোতাবেক হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, اَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে] বলে তিন তালাকের নিয়ত করা সহীহ/বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এ বাক্যটির মধ্যে عُمُوْمٌ [ব্যাপকতা] ও خُصُوْص [বিশিষ্টতা] -এর সম্ভাবনা রয়েছে। শায়খুল ইসলাম (র.) বলেন, اَمْرٌ শব্দটি এমন একটি বিশেষ্য যা ব্যাপকতার অর্থে আসে, সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ -এর মাঝে اَلْاَمْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য সব কিছুই। সুতরাং এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করলে তা ইঙ্গিতসূচক হয়ে যাবে, যার অর্থ طَلَاقُكِ بِيَدِكِ [তোমার তালাক তোমার হাতে]। তার طَلَاقٌ [তালাক] শব্দটি ক্রিয়ামূল। এটি ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তিন তালাকের নিয়ত করার অর্থ ব্যাপকতার নিয়ত করা। কিন্তু اِخْتَارِيْ [তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] শব্দটি দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করা বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো, শব্দটি ব্যাপকতার অবকাশ রাখে না। এর বিস্তারিত বিবরণ 'ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ অনুচ্ছেদ' -এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

টীকা : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, اِخْتَارِيْ [তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] -এর উত্তরে স্ত্রী যদি বলে– اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِتَطْلِيْقَةٍ – [আমি নিজেকে এক তালাক দ্বারা গ্রহণ করলাম] তাহলে গ্রন্থকারের বর্ণনানুসারে একটি তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে– এটি ভুল। কেননা আমাদের এ আলোচ্য মাসআলায় বলা হলো স্বামীর বক্তব্য– اَمْرُكِ بِيَدِكِ -এর জবাবে স্ত্রী اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِتَطْلِيْقَةٍ বললে একটি বায়েন তালাক পতিত হয়। তদ্রূপ উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। কারণ গ্রন্থকারের নিকট উভয় মাসআলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيْهِ اللَّيْلُ وَاِنْ رَدَّتِ الْاَمْرَ فِىْ يَوْمِهَا بَطَلَ اَمْرُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ بِيَدِهَا اَمْرُ بَعْدَ غَدٍ لِاَنَّهٗ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقْتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْاَمْرُ اِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ فَكَانَا اَمْرَيْنِ فَبِرَدِّ اَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْاٰخَرُ وَقَالَ زُفَرُ (رح) هُمَا اَمْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ قُلْنَا اَلطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ التَّاقِيْتَ وَالْاَمْرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُهٗ فَيُوَقَّتُ الْاَمْرُ بِالْاَوَّلِ وَيُجْعَلُ الثَّانِىْ اَمْرًا مُبْتَدَأً ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'আজ এবং আগামী পরশু তোমার বিষয় তোমার হাতে' তাহলে মধ্যবর্তী রাত্রিটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর স্ত্রী যদি আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে শুধু আজকের দিনের ক্ষমতা বাতিল হবে; আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে থেকে যাবে। কেননা সে স্পষ্টভাবে দুটি সময়ের কথা উল্লেখ করেছে, যার মাঝে একই প্রকারের আরেকটি সময় আছে। কিন্তু প্রদত্ত ক্ষমতা ঐ মধ্যবর্তী সময়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কারণ, একক শব্দের দ্বারা 'আজকের দিন' উল্লেখ করলে রাত্রিটি তার অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং দুটো সময় আলাদা হবে। তাই একদিনের বিষয় প্রত্যাখ্যান করলে অন্য দিনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়টি একই বিষয়। যেমন– যদি বলে, তুমি আজ ও আগামী পরশু তালাক। আমাদের বক্তব্য হলো, তালাক নির্ধারিত সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। অপর পক্ষে নিজের সম্পর্কে ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়টি সময়াবদ্ধতার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রথম দিনের বিষয় ঐ দিনের সাথে আবদ্ধ থাকবে। আর দ্বিতীয় দিনের বিষয়টিকে নতুন বিষয়রূপে গণ্য করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ [আজ ও আগামী পরশু তোমার বিষয় তোমার হাতে], তাহলে আজকের দিনের পর আগত রাত্রিটি তার এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং স্ত্রী যদি রাতে নিজের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে না। আর যদি আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে শুধু আজকের দিনের ক্ষমতা বাতিল হবে, কিন্তু আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে থেকে যাবে।

মধ্যবর্তী রাতটি তার এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ হলো, স্বামী একক শব্দের দ্বারা يَوْمٌ [আজকের দিন] উল্লেখ করেছে, যার ফলে মধ্যবর্তী রাত্রিটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর স্ত্রী আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করলে আগামী পরশুর ক্ষমতা বাতিল না হওয়ার কারণ হলো, স্বামী সুস্পষ্টভাবে দু'টি সময়ের কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ আজকের দিন ও আগামী পরশু। আর এ দুই সময়ের মাঝখানে একই প্রকারের আরেকটি সময় রয়েছে অর্থাৎ, আগামীকাল। সুতরাং তাকে দুটি আলাদা সময়ে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর একটিকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা অপরটি প্রত্যাখ্যাত হয় না। এ কারণেই আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করলে আগামী পরশু দিনের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যাত হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়টি অভিন্ন বিষয়। আর তাই আজকের দিনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করলে আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে অবশিষ্ট থাকবে না। বিষয়টি এরূপ হলো– যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ [তুমি আজ এবং আগামী পরশু তালাক], তাহলে আজকের দিনেই একটি তালাক পতিত হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়, স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিকে তালাকের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়। কেননা তালাক নির্ধারিত সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। তাইতো যে স্ত্রী আজকের দিনে তালাকপ্রাপ্তা হবে, সে আগামীকালও তালাকপ্রাপ্তা বলেই গণ্য থাকবে। অপর পক্ষে নিজের সম্পর্কে ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়টি সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রথম দিনের বিষয় ঐ দিনের সাথে আবদ্ধ থাকবে। আর দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি ভিন্ন একটি বিষয়রূপে গণ্য করা হবে। মূল বক্তব্য ছিল এরূপ– اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَاَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ غَدٍ অর্থাৎ, 'আজ তোমার বিষয় তোমার হাতে এবং আগামী পরশু তোমার বিষয় তোমার হাতে।'

وَلَوْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِىْ ذٰلِكَ وَاِنْ رَدَّتِ الْاَمْرَ فِىْ يَوْمِهَا لَا يَبْقَى الْاَمْرُ فِىْ يَدِهَا فِى الْغَدِ لِاَنَّ هٰذَا اَمْرٌ وَاحِدٌ لِاَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَقْتٌ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْكَلَامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَشْوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِىْ يَوْمَيْنِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهَا اِذَا رَدَّتِ الْاَمْرَ فِى الْيَوْمِ لَهَا اَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا غَدًا لِاَنَّهَا لَا تَمْلِكُ رَدًّا لِاَمْرٍ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدًّا لِاِيْقَاعٍ وَجْهِ الظَّاهِرِ اَنَّهَا اِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا الْيَوْمَ لَا يَبْقٰى لَهَا الْخِيَارُ فِى الْغَدِ فَكَذَا اِذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا بِرَدِّ الْاَمْرِ لِاَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لَا يَمْلِكُ اِلَّا اخْتِيَارَ اَحَدِهِمَا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ اِذَا قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَاَمْرُكِ بِيَدِكِ غَدًا اَنَّهُمَا اَمْرَانِ لِمَا اَنَّهُ ذَكَرَ لِكُلِّ وَقْتٍ خَبَرًا عَلٰى حِدَةٍ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ وَاِنْ قَالَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ وَلَمْ تَعْلَمْ بِقُدُوْمِهِ حَتّٰى جَنَّ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُّ فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقْرُوْنُ بِهِ عَلٰى بَيَاضِ النَّهَارِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَيَتَوَقَّتُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِىْ بِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি বলে, 'আজ এবং আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে', তাহলে এতে রাত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর স্ত্রী যদি আজই বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আগামীকাল তার হাতে বিষয়টি অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এটি একই বিষয়। কারণ উল্লিখিত দুই সময়ের মাঝে একই প্রকারের আরেকটি সময় মধ্যবর্তী হয়নি, যাকে বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করেনি। কখনো এমন হয় যে, আলোচনার আসর রাত এসে যাওয়ার পর শেষ হয় না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন সে বলল, দুদিনের জন্য তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত, স্ত্রী যদি বিষয়টিকে আজকের দিনে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আগামী দিন সে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। কেননা সে স্বামীর ক্ষমতা প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, যেরূপ তালাক প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। জাহিরী রেওয়ায়েত -এর কারণ হলো, স্ত্রী যখন আজকের দিনে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করল তখন আগামী দিনের জন্য তার ইচ্ছাধিকার বাকি থাকবে না। তদ্রূপ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে সে যখন স্ত্রীকে গ্রহণ করল, তখন পরের দিনে তার ইচ্ছাধিকার বাকি থাকবে না। কেননা দুটি জিনিসের মাঝে যখন কাউকে কোনো ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়, তখন সে দুটির একটিকেই শুধু গ্রহণ করার অধিকার থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কেউ স্ত্রীকে বলে, আজ তোমার বিষয়টি তোমার হাতে এবং আগামীকাল তোমার বিষয়টি তোমার হাতে, তাহলে দুটি বিষয়রূপে গণ্য হবে। কেননা প্রতিটি সময়ের জন্য সে আলাদা হুকুম উল্লেখ করেছে। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত সুরতটি ভিন্ন। আর স্বামী যদি বলে, অমুক যেদিন আসবে, সেদিন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে। পরে অমুক আসল, কিন্তু স্ত্রী তার আগমনের কথা জানতে পারেনি, এমন কি

রাত হয়ে গেল, তাহলে তার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা ইচ্ছাধিকার একটি প্রলম্বিত বিষয়। সুতরাং তার সাথে সংযোজিত 'দিন' শব্দটি দিবসের আলোকিত অংশের অর্থেই প্রযোজ্য হবে। ইতঃপূর্বে আমরা বিষয়টি সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং তার সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا অর্থাৎ 'আজ এবং আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে', তাহলে আজ ও আগামী কালের মধ্যবর্তী রাত্রিটি ইচ্ছাধিকারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর স্ত্রী যদি আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আগামীকাল তার হাতে প্রদত্ত ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না। এর দলিল হলো, এখানে আজ ও আগামীকাল ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি এক ও অভিন্ন। কারণ, উল্লিখিত দুই সময়ের মাঝে সমগোত্রীয় কোনো সময় পৃথককারী হিসেবে নেই। স্বামীর কথায় এরূপ সময় অন্তর্ভুক্ত নেই। অথচ কখনো কখনো এমন হয় যে, আলোচনা ও পরামর্শের বৈঠক রাত আসার পরও শেষ হয় না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন স্বামী স্ত্রীকে বলল– أَمْرُكِ بِيَدِكِ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ, দুদিনের জন্য তোমার বিষয়টি তোমার হাতে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত [আল-আমালী' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর বর্ণনা মোতাবেক ও 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে শামসুল আইম্মা সারখসী (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক] আছে যে, স্ত্রী যদি ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি আজকের দিনে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আগামী দিন সে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। এর দলিল হলো– স্ত্রী যেরূপ তালাক প্রদানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, তদ্রূপ স্ত্রীকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকারও প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক], তাহলে তালাক পতিত হবে, স্ত্রী গ্রহণ করুক বা না করুক। অনুরূপভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে], তাহলে স্ত্রীর জন্য ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে, যদিও স্ত্রী তা গ্রহণ না করে। সুতরাং স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে যখন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান হয় না, তখন সে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

'জাহিরী রেওয়ায়েত' -এর কারণ হলো, স্ত্রী যখন আজকের দিনে নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করবে, তখন আগামী কালের জন্য তার ইচ্ছাধিকার আর বাকি থাকবে না। অনুরূপভাবে আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে যখন সে নিজের স্বামীকে গ্রহণ করবে, তখন পরের দিনের জন্য তার ইচ্ছাধিকার বাকি থাকবে না। কেননা দুটি জিনিসের মাঝে যখন কাউকে এখতিয়ার প্রদান করা হয়, তখন সে দুটির একটিকে শুধু গ্রহণ করার অধিকার রাখে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ غَدًا অর্থাৎ 'আজ তোমার বিষয়টিকে তোমার হাতে এবং আগামীকাল তোমার বিষয়টি তোমার হাতে', তাহলে দুটি বিষয়রূপে গণ্য হবে। কেননা স্বামী আজকের দিন এবং আগামীকাল এ দুটি সময়ের প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুকুম উল্লেখ করেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত সুরতটি ভিন্ন। কেননা সেটা এক ও অভিন্ন বিষয় ছিল। কারণ এখতিয়ার পুনর্বার উল্লিখিত হয়নি।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ [অমুক যেদিন আসবে, সেদিন তোমার বিষয়টি তোমার হাতে]; পরে অমুক আসল, কিন্তু স্ত্রী তার আগমনের কথা জানতে পারেনি; যখন জানতে পারল যে, অমুক এসেছে, তখন রাত হয়ে গেছে; তাহলে স্ত্রীকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। এর দলিল হলো– ইচ্ছাধিকার একটি প্রলম্বিত বিষয়। আর ইতঃপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, يَوْمٌ [দিন] যদি فِعْلٌ مُمْتَدٌّ [প্রলম্বিত বিষয়] -এর সাথে যুক্ত হয়, তখন 'দিন' দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশ বুঝায়। তাই এখানে ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। সূর্য অস্ত গেলে তার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তাকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ خَيَّرَهَا فَمَكَثَتْ يَوْمًا وَلَمْ تَقُمْ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ لِأَنَّ هٰذَا تَمْلِيكُ التَّطْلِيقِ مِنْهَا لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ وَهِيَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا أَوْ بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهَا لِأَنَّ هٰذَا تَمْلِيكٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَازِمٌ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ وَلَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيقُ وَإِذَا اعْتُبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ وَمَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْخِيَارِ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ إِذِ الْقِيَامُ يُفَرِّقُ الرَّأْيَ بِخِلَافِ مَا إِذَا مَكَثَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ قَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ فَيَبْقَى إِلٰى أَنْ يُوجَدَ مَا يَقْطَعُهُ أَوْ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَقَوْلُهُ مَكَثَتْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ يُرَادُ بِهِ عَمَلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَتْ فِيهِ لَا مُطْلَقُ الْعَمَلِ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি স্ত্রীর বিষয়টিকে স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে, কিংবা তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে, আর স্ত্রী সে জায়গায় একদিন অবস্থান করে এবং সে উঠে না যায়, তাহলে অন্য কাজ শুরু না করা পর্যন্ত তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কেননা এর অর্থ স্ত্রীকে তালাকের মালিকানা প্রদান করা। কেননা মালিক সে-ই, যে তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারে। আর এই স্ত্রীর অবস্থা অনুরূপ। আর মালিকানা প্রদান বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। ইতঃপূর্বে আমরা তা বর্ণনা করেছি। অতঃপর স্ত্রী যখন স্বামীর কথা শুনতে পায়, তখন তার সে বৈঠকই বিবেচ্য হবে। আর যদি স্ত্রী শুনতে না পায়, তাহলে যে বৈঠকে সে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে কিংবা সংবাদ তার কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বৈঠক বিবেচ্য হবে। কেননা এটা এমন মালিকানা, যাতে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। সুতরাং বৈঠক শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। আর স্বামীর বৈঠক বিবেচ্য হবে না। কারণ তার ক্ষেত্রে শর্তারোপ বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নিছক মালিকানা প্রদান। এতে শর্তারোপের বিষয় জড়িত নয়। আর যখন স্ত্রীর বৈঠক বিবেচ্য হলো, তখন বৈঠক তো কখনো অন্যত্র প্রস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। আবার কখনো উক্ত বৈঠকে থেকেই অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়ার দ্বারা। ইচ্ছাধিকার প্রদান প্রসঙ্গে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি। আর ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি দাঁড়ানো মাত্র তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেননা এটি উপেক্ষা করার প্রমাণ। কারণ উঠে দাঁড়ানো মতামতকে বিচ্ছিন্ন করে। অপর পক্ষে যদি একদিন পর্যন্ত বসে থাকে; না দাঁড়ায় এবং অন্য কোনো কাজ শুরু না করে, তাহলে ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না। কেননা বৈঠক কখনো দীর্ঘ হয়, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কর্তনকারী পাওয়া না যায় কিংবা উপেক্ষার কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়। একদিন অবস্থানের বিষয়টি সময়সীমা নির্ধারণ হিসেবে নয়। আর 'যতক্ষণ না সে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়' –বক্তব্য দ্বারা এমন কাজ উদ্দেশ্য, যা ঐ কাজকে কর্তনকারীরূপে পরিচিত, যে কাজে স্ত্রীলোকটি বিদ্যমান রয়েছে। যে-কোনো কাজ উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا الخ : স্বামী যদি স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে অর্পণ করে অর্থাৎ, স্ত্রীকে বলে– أَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে] কিংবা স্ত্রীকে তার ইচ্ছাধিকার প্রদান করে অর্থাৎ, স্ত্রীকে বলে– اِخْتَارِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে গ্রহণ কর], আর ঐ বৈঠকে স্ত্রী একদিন অবস্থান করে বৈঠক থেকে উঠে না যায়, তাহলে অন্য কাজ শুরু না করা পর্যন্ত তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। এর দলিল হলো, স্ত্রীর বিষয়টিকে স্ত্রীর হাতে অর্পণ কিংবা স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের অর্থ হলো– তাকে তালাকের মালিকানা প্রদান করা। কেননা, মালিক ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীর অবস্থা অনুরূপ। আর মালিকানা প্রদান মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ الخ : স্বামী যে বৈঠকে স্ত্রীর হাতে বিষয়টি অর্পণ করে দেবে, স্ত্রী যদি ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকে, তাহলে তার সে বৈঠকই বিবেচ্য হবে। আর স্ত্রী যদি ঐ বৈঠকে উপস্থিত না থাকে, তাহলে যে বৈঠকে সে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে কিংবা সংবাদ তার কাছে এসে পৌছবে, সেই বৈঠকই বিবেচ্য হবে। এর দলিল হলো– স্ত্রীর হাতে অর্পণের বিষয়টি এমন মালিকানা প্রদান, যাতে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। কেননা, أَمْرُكِ بِيَدِكِ [তোমার বিষয় তোমার হাতে] -এর অর্থ– إِنْ أَرَدْتِ طَلَاقَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তোমার তালাক চাইলে তুমি তালাক]। আর মালিকানা প্রদান বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ; বৈঠক শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকে না। আর শর্তারোপের বিষয়টি বৈঠক শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকে। যেমন স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক], তাহলে তা ঐ বৈঠক শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। সুতরাং মালিকানার দাবি হলো, স্ত্রীর হাতে অর্পণের বিষয়টি বৈঠকের সাথে বিশিষ্ট হওয়া; আর শর্তারোপের দাবি হলো, বৈঠকের সাথে বিশিষ্ট না হওয়া; বরং বৈঠক শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকা। আর এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে হাতে অর্পণের বিষয়টিকে দুটি অবস্থার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে– ১. স্বামী যে বৈঠকে স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে অর্পণ করেছে, সে বৈঠকে স্ত্রী উপস্থিত থাকলে মালিকানা প্রদান অর্থে বিবেচ্য হবে। ২. সে বৈঠকে স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে শর্তারোপের অর্থে বিবেচ্য হবে এবং হাতে অর্পণের বিষয়টি মজলিস শেষ হওয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীর বৈঠক বিবেচ্য নয়। আর তাই স্বামী যদি বৈঠক থেকে উঠে যায়, আর স্ত্রী বসে থাকে, তাহলে স্ত্রীর এখতিয়ার বহাল থাকবে। কেননা স্বামীর ক্ষেত্রে শর্তারোপ বার্ধতামূলক; এমন কি বিষয়টি স্বামী প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে না। পক্ষান্তরে বেচাকেনার বিষয়টি ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বৈঠকই বিবেচ্য। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে কেউ প্রস্তাবের পর অপরজন বৈঠক থেকে উঠে গেলে [প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বেই] বেচাকেনা বাতিল বলে পরিগণিত হবে। কেননা বিক্রয় নিছক মালিকানা প্রদান। এতে শর্তারোপের বিষয় মিশ্রিত নয়। এ কারণেই ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার যে কেউ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে নিজের মত পাল্টাতে পারে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বৈঠক দু'ভাবে পরিবর্তন হতে পারে। বৈঠক থেকে অন্যত্র প্রস্তাবের মাধ্যমে কখনো বৈঠক পরিবর্তিত হয়। আবার কখনো ঐ বৈঠকেই অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে বৈঠক পরিবর্তিত হয়। এ বিষয়টি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ পরিচ্ছেদ –এ আলোচিত হয়েছে।

ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি স্ত্রী বৈঠক থেকে দাঁড়ালেই তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেননা বৈঠক থেকে দাঁড়ানো উপেক্ষা করার প্রমাণ। আর উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যমে মতামতকে নাকচ করে দেওয়া হয়। তবে স্ত্রী যদি একদিন পর্যন্ত ঐ বৈঠকে বসে থাকে, না দাঁড়ায় এবং অন্য কোনো কাজ শুরু না করে, তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা বৈঠক কখনো দীর্ঘ হয়, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বৈঠককে বিচ্ছিন্নকারী কোনো কিছু না পওয়া যাবে কিংবা উপেক্ষার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীকে প্রদত্ত ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য– مَكَثَتْ يَوْمًا অর্থাৎ বৈঠকে একদিন অবস্থানের বিষয়টি সময়সীমা নির্ধারণ হিসেবে নয়। একদিনের অতিরিক্তও যদি স্ত্রী বসে থাকে এবং বৈঠককে উপেক্ষার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলেও তার ইচ্ছাধিকার তার হাতে বহাল থাকবে। আর مَا لَمْ تَأْخُذْ فِيْ عَمَلٍ أٰخَرَ [যতক্ষণ না সে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়] ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর এ বক্তব্যের দ্বারা যে-কোনো কাজ উদ্দেশ্য নয়; বরং এমন কাজ উদ্দেশ্য, যা বৈঠককে কর্তনকারীরূপে পরিচিত।

وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلٰى خِيَارِهَا لِاَنَّهُ دَلِيْلُ الْاِقْبَالِ فَاِنَّ الْقُعُوْدَ اَجْمَعُ لِلرَّأْيِ وَكَذَا اِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتْ اَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ لِاَنَّ هٰذَا اِنْتِقَالٌ مِنْ جِلْسَةٍ اِلٰى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُوْنُ اِعْرَاضًا كَمَا اِذَا كَانَتْ مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتْ قَالَ عَنْهُ وَهٰذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَ ذُكِرَ فِيْ غَيْرِهِ اَنَّهَا اِذَا كَانَتْ قَاعِدَةً فَاتَّكَأَتْ لَا خِيَارَ لَهَا لِاَنَّ الْاِتِّكَاءَ اِظْهَارُ التَّهَاوُنِ بِالْاَمْرِ فَكَانَ اِعْرَاضًا وَالْاَوَّلُ هُوَ الْاَصَحُّ وَلَوْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتْ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَلَوْ قَالَتْ اَدْعُوْ اَبِيْ اَسْتَشِيْرُ اَوْ شُهُوْدًا اُشْهِدُهُمْ فَهِيَ عَلٰى خِيَارِهَا لِاَنَّ الْاِسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّى الصَّوَابِ وَالْاِشْهَادَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْاِنْكَارِ فَلَا يَكُوْنُ دَلِيْلَ الْاِعْرَاضِ وَاِنْ كَانَتْ تَسِيْرُ عَلٰى دَابَّةٍ اَوْ فِيْ مَحْمِلٍ فَوَقَفَتْ فَهِيَ عَلٰى خِيَارِهَا وَاِنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا لِاَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ وَ وُقُوْفَهَا مُضَافٌ اِلَيْهَا وَالسَّفِيْنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ لِاَنَّ سَيْرَهَا غَيْرُ مُضَافٍ اِلٰى رَاكِبِهَا اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى اِيْقَافِهَا وَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ يَقْدِرُ .

অনুবাদ : আর যদি স্ত্রী দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ে, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কেননা বসে পড়া আগ্রহের প্রমাণ। কারণ বসার অবস্থা চিন্তাকে অধিকতর সুসংহত করে। তদ্রূপ যদি বসা অবস্থা থেকে হেলান দেয় কিংবা হেলান অবস্থা থেকে উঠে বসে। কেননা এটা হলো এক অবস্থার বসা থেকে অন্য অবস্থার বসায় যাওয়া। সুতরাং এটা উপেক্ষার প্রমাণ নয়। যেমন– সে যদি হাঁটু তুলে বসা অবস্থায় ছিল, পরে আসন করে বসল। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা হলো জামিউস্-সাগীর -এর বর্ণনা। অন্যত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন, যদি সে বসা অবস্থা থেকে হেলান দেয়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। কেননা হেলান দেওয়ার অর্থ বিষয়টার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। সুতরাং এটা উপেক্ষা বলে বিবেচ্য হবে। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিকতর বিশুদ্ধ। আর যদি বসা অবস্থা থেকে পার্শ্ব শয়ন করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। আর যদি স্ত্রী বলে, আমি পরামর্শের জন্য আমার বাবাকে ডাকব, কিংবা সাক্ষী হওয়ার জন্য লোক ডাকব, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কেননা পরামর্শ হলো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার উদ্দেশ্যে, আর সাক্ষী বানানো পরবর্তীতে স্বামীর অস্বীকার থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা উপেক্ষা বলে বিবেচিত হবে না। যদি সওয়ারিতে বা হাওদায় আরোহণ অবস্থায় চলতে থাকে এবং বিষয়টি শুনে থেমে যায়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। আর যদি চলা অব্যাহত রাখে, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সওয়ারির চলা এবং থামা তার দিকেই সম্পর্কিত হবে আর নৌকা এবং জাহাজ গৃহের স্থলবর্তী । কেননা জলযানের চলা তার যাত্রীর দিকে সম্পর্কিত নয়। কারণ সে তো তা থামাতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে সওয়ার তার সওয়ারিকে থামাতে সক্ষম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً الخ : স্বামী স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানকালে স্ত্রী দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল; স্বামীর কথা শুনে সে বসে পড়ল, তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। এর দলিল হলো, বসা বিষয়টির প্রতি আগ্রহী হওয়ার প্রমাণ। কারণ দাঁড়ানো অবস্থার চেয়ে বসা অবস্থা চিন্তাকে অধিকতর সুসংহত করে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি বিষয়টি শোনার পর বসা অবস্থা থাকে হেলান দেয় কিংবা হেলান অবস্থা থেকে উঠে বসে, তাহলেও স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। তার ইচ্ছাধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হলো, এটা এক অবস্থার বসা থেকে অন্য অবস্থার বসায় যাওয়া। এর দ্বারা উপেক্ষা বুঝা যায় না। এটা এরূপ হলো, যেমন স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানকালে সে হাঁটু তুলে বসেছিল, স্বামীর কথা শোনার পর সে আসন করে বসল, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্ত্রী বিষয়টি শোনার পর বসা অবস্থা থেকে হেলান দিলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকার এ হুকুমটা জামিউস-সাগীর -এর বর্ণনা।

'মাবসূত' -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী যদি বিষয়টি শোনার পর বসা অবস্থা থেকে হেলান দেয়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। কেননা হেলান দেওয়ার অর্থ বিষয়টির প্রতি কর্ণপাত না করা; বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা। সুতরাং হেলান দেওয়া উপেক্ষা বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রথমোক্ত জামিউস-সাগীর -এর মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। অর্থাৎ স্ত্রী বিষয়টি শোনার পর বসা অবস্থা থেকে হেলান দিলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتْ الخ : আর স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানকালে যদি সে বসা অবস্থা থেকে পার্শ্ব শয়ন করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর বর্ণনানুসারে, তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। আর হাসান ইবনে আবী মালিক (র.)-এর বর্ণনানুসারে, স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে।

আর স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানকালে স্ত্রী যদি বলে– أَدْعُوْ أَبِيْ أَسْتَشِيْرُ অর্থাৎ, 'আমার এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমি বাবাকে ডাকব' কিংবা বলে– أَدْعُوْ شُهُوْدًا অর্থাৎ 'আমার এ বিষয়ে সাক্ষী থাকার জন্য লোক ডাকব'। [কোনো কোনো নুসখায় أُدْعُ [তুমি ডাক] নির্দেশসূচক শব্দের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, স্ত্রী তার চাকর কিংবা অন্য কাউকে নির্দেশ দেয় বাবাকে ডাকার জন্য কিংবা সাক্ষী আনার জন্য] ; তাহলেও ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। কেননা পরামর্শ করা হয় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। আর সাক্ষী রাখা হয়, যাতে পরবর্তীতে স্বামী বিষয়টি অস্বীকার করতে না পারে। সুতরাং স্ত্রীর এ ধরনের প্রকাশ উপেক্ষার প্রমাণ বহন করে না।

'যখীরা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে স্ত্রী যদি এমন কাউকে না পায়, যে তার জন্য সাক্ষী ডাকবে, অতঃপর সে নিজেই দাঁড়িয়ে যায় তাতে স্থান পরিবর্তন না করে, তাহলে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না – উপেক্ষার প্রমাণ না থাকার কারণে; আবার কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে– বৈঠক পরিবর্তনের কারণে।

–[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১৪৩]

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ تَسِيْرُ عَلٰى دَابَّةٍ الخ : আর স্ত্রী সওয়ারিতে কিংবা হাওদায় আরোহণ অবস্থায় স্বামী যদি তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে, আর স্ত্রী বিষয়টি শুনে সওয়ারি থামিয়ে ফেলে, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। আর যদি চলা অব্যাহত রাখে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সওয়ারির চলা এবং থামা স্ত্রীর দিকেই সম্পর্কিত হবে। কারণ সে চালক হিসেবে সওয়ারি চলা উপেক্ষার প্রমাণ বহন করে। আর সওয়ারি থেকে নেমে পড়লে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে দাঁড়ানো থেকে বসার বিষয়টি ভিন্ন। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৩]

আর নৌকা এবং জাহাজ গৃহের স্থলবর্তী। অর্থাৎ নৌকা চলতে থাকলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা জলযানের চলা যাত্রীর দিকে সম্পর্কিত নয়। কারণ সে তো থামাতে সক্ষম নয়। তাই তা উপেক্ষার প্রমাণ বহন করে না। পক্ষান্তরে আরোহী তার সওয়ারিকে থামাতে সক্ষম বলে সওয়ারির চলা অব্যাহত থাকলে ইচ্ছাধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে।

فَصْلٌ فِي الْمَشِيَّةِ

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلٰثًا وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذٰلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا وَهٰذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي مَعْنَاهُ إِفْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ وَهُوَ إِسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْأَدْنٰى مَعَ إِحْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ فَلِهٰذَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلٰثِ وَيَنْصَرِفُ إِلَى وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ رَجْعِيَّةً لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَهُوَ رَجْعِيٌّ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً لِأَنَّهُ جِنْسٌ فِي حَقِّهَا .

অনুচ্ছেদ : ইচ্ছা প্রসঙ্গ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি নিজেকে তালাক দাও', আর তার কোনো নিয়ত না থাকে কিংবা এক তালাকের নিয়ত করে; আর স্ত্রী বলে, 'আমি নিজেকে তালাক দিলাম, তাহলে তা একটি তালাকে 'রাজ'ঈ' হবে। আর যদি নিজেকে তিন তালাক দেয়, আর স্বামীও সে নিয়ত করে, তাহলে তার উপর তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা স্বামীর কথা 'তালাক দাও' -এর অর্থ হলো, 'তুমি তালাকের কাজ সম্পাদন কর'। আর তা ['তালাক' শব্দটি] জাতিবাচক শব্দ। সুতরাং সমস্ত জাতিবাচক শব্দের মতোই এখানেও সমগ্রের সম্ভাবনা সহ সর্বনিম্নটি সাব্যস্ত করে। এ কারণেই এক্ষেত্রে তিন তালাকের নিয়ত কার্যকর হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় এক তালাকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর সে এক তালাকটি 'রাজঈ' হবে। কেননা তাকে স্পষ্ট তালাক ন্যস্ত করা হয়েছে। আর তাতে 'রাজ'ঈ' তালাক হয়। যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে সহীহ হবে না। কেননা এটা সংখ্যার নিয়ত। তবে স্ত্রী দাসী হলে ভিন্ন কথা। কেননা তার ক্ষেত্রে দুই হলো সমগ্র তালাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ فِي الْمَشِيَّةِ : تَفْوِيضُ طَلَاقٍ -এর দুটি অনুচ্ছেদের পর এখান থেকে তৃতীয় অনুচ্ছেদের আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে। এ অনুচ্ছেদের বিষয় হচ্ছে- مَشِيَّةٌ যা বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। অর্থ- ইচ্ছা করা, চাওয়া। এ অনুচ্ছেদে স্ত্রীর চাওয়ার সাথে সম্পর্কিত তালাকের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে- طَلِّقِي نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] এবং স্বামীর কোনো নিয়ত না থাকে কিংবা স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে আর স্ত্রী স্বামীর এ কথার উত্তরে বলে- طَلَّقْتُ نَفْسِي [আমি নিজেকে তালাক দিলাম], তাহলে একটি তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর স্বামীর উক্ত কথার উত্তরে স্ত্রী যদি নিজেকে তিন তালাক দেয় আর স্বামীও সে নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। উভয় মাসআলার দলিল হলো- طَلِّقِي [তালাক দাও] স্বামীর এ কথার অর্থ- اِفْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ [তুমি তালাকের কাজ সম্পাদন কর]। অর্থাৎ নির্দেশবাচক শব্দ (طَلِّقِي) -এর মাঝে ক্রিয়ামূল নিহিত আছে। ক্রিয়ামূল [তালাক] হচ্ছে জিনস তথা জাতিবাচক শব্দ। আর জাতিবাচক শব্দ সর্বনিম্ন তথা فَرْدٌ حَقِيقِيٌّ [প্রকৃত একক] -কে যেমন অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি সমগ্র তথা فَرْدٌ حُكْمِيٌّ [বিধানগত একক] -এরও সম্ভাবনা রাখে। এটিই হলো যাবতীয় জাতিবাচক শব্দের হুকুম। এ কারণেই طَلِّقِي [তালাক দাও] বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বিধানসম্মত। আর নিয়ত না থাকলে فَرْدٌ حَقِيقِيٌّ তথা এক তালাকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর সে এক তালাকটি রাজ'ঈ হবে। কেননা স্ত্রীকে স্পষ্টভাবে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হয়।

আর طَلِّقِي نَفْسَكِ [নিজেকে তালাক দাও] -এর মাধ্যমে স্বামী যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে সে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মতানুসারে, দুই তালাকের নিয়ত করা বিধিসম্মত। [আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৬]

দুই তালাকের নিয়ত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হলো- দুই নিছক সংখ্যা। ক্রিয়ামূল দ্বারা সংখ্যার নিয়ত করা সিদ্ধ নয়। দুই তালাকের সর্বনিম্নও নয় এবং সমগ্রও নয়। অবশ্য স্ত্রী যদি দাসী হয়, তাহলে স্বামী দুই তালাকের নিয়ত করতে পারবে। কেননা দাসীর ক্ষেত্রে দুই হলো সমগ্র তালাক।

وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتْ اَبَنْتُ نَفْسِيْ طُلِّقَتْ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ إِخْتَرْتُ نَفْسِيْ لَمْ تُطَلَّقْ لِاَنَّ الْاِبَانَةَ مِنْ اَلْفَاظِ الطَّلَاقِ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ لَوْ قَالَ اَبَنْتُكِ يَنْوِيْ بِهِ الطَّلَاقَ اَوْ قَالَتْ اَبَنْتُ نَفْسِيْ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ اَجَزْتُ ذٰلِكَ بَانَتْ فَكَانَتْ مُوَافَقَةً لِلتَّفْوِيْضِ فِي الْاَصْلِ اِلَّا اَنَّهَا زَادَتْ فِيْهِ وَصْفًا وَهُوَ تَعْجِيْلُ الْاِبَانَةِ فَيَلْغُو الْوَصْفُ الزَّائِدُ وَثَبَتَ الْاَصْلُ كَمَا اِذَا قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِخِلَافِ الْاِخْتِيَارِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَلْفَاظِ الطَّلَاقِ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهٖ اِخْتَرْتُكِ اَوْ اِخْتَارِيْ يَنْوِي الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ قَالَتْ اِبْتِدَاءً اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ فَقَالَ الزَّوْجُ اَجَزْتُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ اِلَّا اَنَّهٗ عُرِفَ طَلَاقًا بِالْاِجْمَاعِ اِذَا حَصَلَ جَوَابًا لِلتَّنْجِيْزِ وَقَوْلُهٗ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لَيْسَ بِتَنْجِيْزٍ فَيَلْغُوْ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهٗ لَا يَقَعُ شَيْءٌ بِقَوْلِهَا اَبَنْتُ نَفْسِيْ لِاَنَّهَا اَتَتْ بِغَيْرِ مَا فُوِّضَ اِلَيْهَا اِذِ الْاِبَانَةُ تُغَايِرُ الطَّلَاقَ .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'তুমি নিজেকে তালাক দাও, আর স্ত্রী বলল, আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম, তাহলে তালাক [রাজ'ঈ] হবে। আর যদি স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম, তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা 'বায়েন' শব্দটি তালাকের শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। দেখুন না, স্বামী যদি তালাকের নিয়তে বলে, 'আমি তোমাকে বায়েন তালাক দিলাম' কিংবা স্ত্রী বলে, 'আমি নিজেকে বায়েন-তালাক দিলাম, আর স্বামী তার উত্তরে বলে– 'আমি তা অনুমোদন করলাম', তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং মূল তালাকের ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে স্ত্রীর একমত হওয়া সাব্যস্ত হলো। তবে স্ত্রী তাতে একটি অতিরিক্ত বিশেষণ যুক্ত করেছে, আর তা হলো, বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করা। সুতরাং অতিরিক্ত বিশেষণ বাতিল হবে এবং মূল তালাক সাব্যস্ত হবে। যেমন স্ত্রী যদি বলে, 'আমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক দিলাম।' এক তালাকে রাজ'ঈ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তালাকের শব্দ নয়। এজন্যই স্বামী যদি বলে, 'আমি তোমাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করলাম' কিংবা 'তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর' আর এ কথা দ্বারা তালাক প্রদানের নিয়ত করে, তাহলে তালাক হবে না। আর স্ত্রী যদি শুরু করে এই বলে যে, 'আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম', আর স্বামী তার উত্তরে বলে 'আমি তা অনুমোদন করলাম', তাহলে কিছুই হবে না। তবে স্বামীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের জবাবে ঐ কথাটি হলে ইজমার মাধ্যমে সেটা তালাকরূপে সাব্যস্ত হবে। অথচ 'তুমি নিজেকে তালাক দাও' স্বামীর এ বক্তব্য ইচ্ছাধিকার প্রদান নয়। সুতরাং তা বাতিল হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীর কথা– 'আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম' -এ কথার দ্বারা কিছু হবে না। কেননা সে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছে, যা তার হাতে অর্পণ করা হয়নি। কারণ বায়েন প্রদান তালাক থেকে ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِي نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও], আর স্ত্রী এর উত্তরে বলে– أَبَنْتُ نَفْسِي [আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম], তাহলে তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী জবাবে বলে– اِخْتَرْتُ نَفْسِي [আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম], তাহলে তালাক পতিত হবে না। বর্ণিত এ দুটি সূরতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো– اَلإبَانَة [বায়েন হওয়া] শব্দটি তালাকের শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। আর তাই স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে স্বামী যদি বলে– أَبَنْتُكِ [আমি তোমাকে বায়ন তালাক দিলাম] কিংবা স্ত্রী বলে– أَبَنْتُ نَفْسِي – 'আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম'; আর স্বামী এর উত্তরে বলে– أَجَزْتُ ذٰلِكَ – 'আমি তা অনুমোদন করলাম', তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বক্তব্য أَبَنْتُ نَفْسِي – "আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম" স্বামীর বক্তব্য طَلِّقِي نَفْسَكِ "নিজেকে তালাক দাও" -এর মূল তালাকের ব্যাপারে এক হয়েছে। তবে স্ত্রী উত্তরে একটি অতিরিক্ত বিশেষণ 'বায়েন হওয়া' -কে যুক্ত করেছে। সুতরাং মূল তালাক সাব্যস্ত হবে আর অতিরিক্ত বিশেষণটি বাতিল হবে। এটা এরূপ হলো যেমন– طَلِّقِي نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] -এর জবাবে স্ত্রী বলল– طَلَّقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً [আমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক দিলাম], তাহলে মূল তালাক সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ : অর্থাৎ, 'নিজেকে তালাক দাও' -স্বামীর এ কথার উত্তরে স্ত্রীর বক্তব্য 'আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম' -এর দ্বারা এক তালাকে রাজ'ঈ হওয়াই যুক্তিযুক্ত দাবি। এ মাসআলাটি 'জামিউস সাগীর' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সুস্পষ্টভাবে রাজ'ঈ কথাটি উল্লেখ করেননি; বরং তিনি هِيَ طَالِقٌ [সে তালাকপ্রাপ্তা হবে] বলেছেন। এ কারণেই হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এখানে يَنْبَغِي শব্দের দ্বারা বর্ণনা দিয়েছেন।
–[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১৪৭]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْاِخْتِيَارِ الخ : এ ইবারতটুকু গ্রন্থকারের উক্তি– لِأَنَّ الْاِبَانَةَ مِنْ اَلْفَاظِ الطَّلَاقِ -এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ اَلإبَانَة [বায়েন হওয়া] শব্দটি তালাকের শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা اَلْاِخْتِيَار [ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করা] শব্দটি তালাকের শব্দ নয়। এজন্যই স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اِخْتَرْتُكِ [আমি তোমাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করলাম] কিংবা اِخْتَارِيْ [তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর] এবং এ কথার দ্বারা স্বামী তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তালাক হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে বলে– اِخْتَرْتُكِ কিংবা اِخْتَارِيْ কিংবা স্ত্রী কথার সূচনা করে বলে– اِخْتَرْتُ نَفْسِي আর স্বামী তার উত্তরে বলে– أَجَزْتُ [আমি অনুমোদন করলাম] তাহলে কিছুই হবে না। আসলে اِخْتِيَار শব্দের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে তালাক পতিত হবে তখনই, যখন তা স্বামীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের জবাবে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যখন বলবে اِخْتَارِيْ [তুমি নিজেকে গ্রহণ কর], আর স্ত্রী এর জবাবে বলবে اِخْتَرْتُ نَفْسِي [আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম], তখন তালাক হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় স্বামীর বক্তব্য طَلِّقِي نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] ইচ্ছাধিকার প্রদান নয়। আর তাই স্ত্রীর বক্তব্য (اِخْتَرْتُ نَفْسِي) স্বামীর বক্তব্য (طَلِّقِي نَفْسَكِ) -এর মোতাবেক হওয়ার কারণে বাতিল বলে পরিগণিত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, স্বামীর বক্তব্য طَلِّقِي نَفْسَكِ -এর জবাবে স্ত্রী যদি বলে أَبَنْتُ نَفْسِي [আমি নিজেকে বায়েন তালাক দিলাম], তাহলে কিছুই হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রেও স্ত্রীর বক্তব্য স্বামীর কথার মোতাবেক হয়নি। কারণ স্বামী তাকে তালাক অর্পণ করেছে, আর সে নিজেকে বায়েন তালাক দিয়েছে। আর বায়েন প্রদান করা তালাক থেকে ভিন্ন।

وَإِنْ قَالَ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ لِأَنَّهُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيْقِهَا وَالْيَمِيْنُ تَصَرُّفٌ لَازِمٌ وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِأَنَّهُ تَمْلِيْكٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ وَإِنَابَةٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ يَقْبَلُ الرُّجُوْعَ .

অনুবাদ : স্বামী যদি বলে, 'তুমি নিজেকে তালাক দাও', তাহলে সে এ কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। কেননা এতে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। কেননা এখানে তালাককে স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর শর্তারোপের বিষয় হলো বাধ্যতামূলক কর্ম। যদি স্ত্রী বৈঠক থেকে উঠে যায়, তাহলে [তার তালাক প্রদানের ক্ষমতা] বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তা মালিকানা প্রদান। পক্ষান্তরে যদি বলে, তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও, তবে তা ভিন্ন। কেননা তাকে উকিল এবং প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং তা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং প্রত্যাহারযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ الخ : স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] -এর মাধ্যমে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণের পর তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। এর দলিল হলো, স্বামীর বক্তব্যে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। কেননা এখানে তালাককে স্ত্রী কর্তৃক তালাক প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর শর্তারোপের বিষয়টি বাধ্যতামূলক কর্ম হওয়ার কারণে স্বামী তার বক্তব্যকে প্রত্যাহার করতে পারবে না। আর স্ত্রী যদি ঐ বৈঠক থেকে উঠে যায়, তাহলে তার তালাক প্রদানের ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ স্বামী طَلِّقِيْ نَفْسَكِ কথার দ্বারা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মালিক বানিয়েছে। আর মালিকানা প্রদানের বিষয়টি বৈঠকের সাথে সীমাবদ্ধ। এ কারণেই বৈঠক থেকে উঠে গেলে স্ত্রীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ [তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও], তাহলে স্বামী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে পারবে। কেননা এ বিষয়টি ভিন্ন। কারণ এখানে স্ত্রীকে নায়েব ও উকিল নিয়োগ করা হয়েছে– তার সতীনকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে। আর উকিল নিয়োগের বিষয়টি বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং তা প্রত্যাহারযোগ্য। এ কারণেই এ সুরতে স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীর কথা طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] -এর মধ্যে শর্তারোপের অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ إِنْ طَلَّقْتِ نَفْسَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যদি তুমি নিজেকে তালাক দাও, তাহলে তুমি তালাক]। অনুরূপভাবে طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ [তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও] -এর অর্থ হলো– إِنْ أَرَدْتِ طَلَاقَهَا فَهِيَ طَالِقٌ [যদি তুমি তোমার সতীনের তালাক চাও, তাহলে সে তালাক], তাহলে এতদুভয়ের মাঝে বিধানগত পার্থক্য কেন? এর জবাবে বলা হয়, শর্তারোপের অর্থ এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করার মাধ্যমে পাওয়া যায়, যার বিদ্যমান হওয়াটা সংশয়পূর্ণ; অবশ্যম্ভাবী নয়। আর স্ত্রীর হাতে সতীনের তালাক প্রদানকে অর্পণ করলে তা প্রকৃতিগতভাবেই অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তা শর্ত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] বক্তব্যে স্ত্রীকে মালিকানা প্রদান করা হয়েছে; আর طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ [তুমি তোমার সতীনকে তালাক দাও] বক্তব্যে স্ত্রীকে নায়েব বা উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। মালিকানা প্রদান ও উকিল নিয়োগের মাঝে পার্থক্য হলো, মালিক সে-ই, যে নিজের জন্য কার্য সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে উকিল অন্যের জন্য কাজ করে। স্ত্রী নিজেকে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের জন্য কার্য সম্পাদন করে, আর সতীনকে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য কার্য সম্পাদন করে থাকে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مَتٰى شِئْتِ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ لِاَنَّ كَلِمَةَ مَتٰى عَامَّةٌ فِى الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ فِىْ اَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ وَاِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ فَلَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَهُ اَنْ يَّرْجِعَ لِاَنَّهُ تَوْكِيْلٌ وَاِنَّهُ اِسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِاِمْرَأَتِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِاَنَّهَا عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيْكًا لَا تَوْكِيْلًا وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْهَا اِنْ شِئْتَ فَلَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ خَاصَّةً وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اَنْ يَّرْجِعَ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ لِاَنَّ التَّصْرِيْحَ بِالْمَشْيَّةِ كَعَدَمِهِ لِاَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشْيَّتِهِ فَصَارَ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ اِذَا قِيْلَ لَهُ بِعْهُ اِنْ شِئْتَ وَلَنَا اَنَّهُ تَمْلِيْكٌ لِاَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَشْيَّةِ وَالْمَالِكُ هُوَ الَّذِىْ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشْيَّتِهِ وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِاَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দাও, তাহলে স্ত্রী বৈঠকে এবং বৈঠকের বাইরে তালাক প্রদান করতে পারবে। কেননা, مَتٰى [যখন] শব্দটি সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। সুতরাং এ কথাটি এরূপ হয়ে যাবে, যখন সে বলল– যে সময়ই তোমার ইচ্ছা হয়। আর স্বামী যদি কোনো ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর, তাহলে সে বৈঠকে এবং বৈঠকের পরে তালাক প্রদান করতে পারবে। আর স্বামী তা প্রত্যাহার করতে পারবে। কেননা, এর অর্থ উকিল বানানো এবং সাহায্য গ্রহণ করা। সুতরাং তা বাধ্যতামূলক হবে না, আবার বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধও থাকবে না। পক্ষান্তরে নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর বক্তব্য– 'তুমি নিজেকে তালাক দাও' -এ বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে তো নিজের জন্য কর্তা। সুতরাং তা মালিক বানানো; উকিল নিয়োগ নয়। আর যদি স্বামী কোনো ব্যক্তিকে বলে, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তাহলে সে শুধু বৈঠকেই তালাক দিতে পারবে, আর স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা আর প্রথমটা সমান। কেননা, ইচ্ছার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা না বলার মতোই। কারণ, সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবে। সুতরাং সে বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের মতো হলো– যখন তাকে বলা হয় যে, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে তা বিক্রি কর। আর আমাদের দলিল হলো, বাক্যটির অর্থ মালিক বানানো। কেননা, সে তার মালিকানাকে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর মালিক সে-ই, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করে। আর তালাক শর্তারোপের সম্ভাবনা রাখে। বিক্রয় এর বিপরীত। কারণ, এতে শর্তারোপের সুযোগ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مَتٰى الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مَتٰى شِئْتِ [তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে তালাক দাও], তাহলে স্ত্রী নিজেকে ঐ বৈঠকে তালাক দিতে পারবে এবং বৈঠকের পরও তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এর দলিল হলো– مَتٰى [যখন] শব্দটি সকল সময়ের জন্য ব্যাপক

সুতরাং এ কথাটির অর্থ এরূপ হলো, যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও, যে সময়ই তোমার ইচ্ছা হয়]। আর এ ব্যাপক সময়ের কারণে বৈঠক ও বৈঠকের বাইরে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ اِمْرَأَتِيْ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি কোনো ব্যক্তিকে বলে– طَلِّقْ اِمْرَأَتِيْ [তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর], তাহলে সে ব্যক্তির ইচ্ছাধিকার যেমন ঐ বৈঠকে বহাল থাকবে, তদ্রূপ বৈঠকের বাইরেও বহাল থাকবে। অর্থাৎ, সে বৈঠকে এবং বৈঠকের পরে তালাক প্রদান করতে পারবে। আর স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে। এর দলিল হলো– طَلِّقِيْ اِمْرَأَتِيْ [তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর] -এর মাধ্যমে স্বামী অন্য ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করেছে এবং তালাক প্রদানে তার সাহায্য কামনা করেছে। সুতরাং তা বাধ্যতামূলক হবে না, আবার বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধও থাকবে না। এ কারণেই তালাক প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিলের ইচ্ছাধিকার ঐ বৈঠকে ও বৈঠকের পরেও বহাল থাকবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার কথা প্রত্যাহারের অধিকার রাখবে। তবে স্বামী যদি বলে– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও], তাহলে স্ত্রীর জন্য তালাক প্রদানের এ ক্ষমতা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। এ দুই মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হলো, স্বামীর কথা– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও] -এর অর্থ– স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মালিক বানানো। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের জন্য কাজ করছে। আর উকিল হলো সে-ই, যে অন্যের জন্য কাজ করে। আর পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, মালিক বানানোর ক্ষেত্রে স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারে না এবং মালিকানা বৈঠকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি অন্যকোনো ব্যক্তিকে বলে– طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ [তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও], তাহলে সে ব্যক্তি শুধু ঐ বৈঠকেই তালাক দিতে পারবে; বৈঠকের পরে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। আর স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ কথা অর্থাৎ طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ [তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও] এবং প্রথমোক্ত কথা– طَلِّقْ اِمْرَأَتِيْ [তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও] সমান। অর্থাৎ, তালাক প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিলের ইচ্ছাধিকার বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, ইচ্ছার কথা স্পষ্টভাবে বলা না বলার মতোই। কেননা, তালাক প্রদানের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবে। কারণ, এটা তার ইচ্ছাধিকার। সুতরাং উভয়টি একই রকম হওয়ার কারণে طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ -এর হুকুম طَلِّقْ اِمْرَأَتِيْ -এর হুকুমের অনুরূপ হবে। যেমন বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলকে কেউ যদি বলে– بِعْهُ إِنْ شِئْتَ [তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে তা বিক্রি কর], তাহলে উকিলের ইচ্ছাধিকার বৈঠকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং বৈঠকের পরও উকিলের ক্ষমতা বহাল থাকবে এবং উকিল নিয়োগদাতা তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে। তদ্রূপ এখানেও তালাক প্রদানের ক্ষমতা বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে।

আমাদের দলিল হলো– طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ বাক্যটির অর্থ মালিক বানানো। এটি এমন মালিকানা, যেখানে শর্তারোপের অর্থ আছে। সুতরাং মালিক বানানো হিসেবে এ ইচ্ছাধিকার বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর শর্তারোপের অর্থের দিক থেকে এটি একটি বাধ্যতামূলক কর্ম। সুতরাং স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ الخ : এর মাধ্যমে ইমাম যুফার (র.) -এর প্রদত্ত কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। তালাকের বিষয়টিকে বিক্রয়ের উপর কিয়াস করা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, তালাকে শর্তারোপের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্তারোপের সুযোগ নেই।

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَهِىَ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهَا مَلَكَتْ اِيْقَاعَ الثَّلٰثِ فَتَمْلِكُ اِيْقَاعَ الْوَاحِدِ ضَرُوْرَةً وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلٰثًا لَمْ يَقَعْ شَىْءٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهَا اَتَتْ بِمَا مَلَكَتْهُ وَ زِيَادَةٌ فَصَارَ كَمَا اِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ اَلْفًا وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهَا اَتَتْ بِغَيْرِ مَا فُوِّضَ اِلَيْهَا فَكَانَتْ مُبْتَدِأَةً وَهٰذَا لِاَنَّ الزَّوْجَ مَلَّكَهَا الْوَاحِدَةَ وَالثَّلٰثُ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ لِاَنَّ الثَّلٰثَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكَّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدُ فَرْدٌ لَا تَرْكِيْبَ فِيْهِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُضَادَّةِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ لِاَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَكَذَا هِىَ فِى الْمَسْـاَلَةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّهَا مَلَكَتِ الثَّلٰثَ اَمَّا هٰهُنَا لَمْ تَمْلِكِ الثَّلٰثَ وَمَا اَتَتْ بِمَا فُوِّضَ اِلَيْهَا فَلَغَا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি নিজেকে তিন তালাক দাও', আর সে এক তালাক দেয়, তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। কেননা, সে তিন তালাক প্রয়োগের মালিকানা লাভ করেছে। সুতরাং আবশ্যিকভাবে তার এক তালাক প্রয়োগের মালিকানাও থাকবে। আর যদি স্বামী তাকে বলে, 'তুমি নিজেকে এক তালাক দাও', আর সে নিজেকে তিন তালাক দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, কিছুই হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, এক তালাক পতিত হবে। কেননা, সে যে তালাকের মালিক হয়েছিল, তা অতিরিক্ত সহ প্রয়োগ করেছে। সুতরাং তা এমন হলো যে, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, সে এমন তালাক প্রয়োগ করেছে, যা তার হাতে অর্পণ করা হয়নি। সুতরাং সে সূচনাকারী হলো। এর কারণ হলো, স্বামী তাকে এক তালাকের মালিক বানিয়েছে। আর তিন একের বিপরীত। কেননা, তিন এমন সংখ্যার নাম, যা সম্মিলিত ও একত্র। আর এক হলো একক সংখ্যা, যাতে যৌগিকতা নেই। সুতরাং বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা আছে। স্বামীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে মালিকানার সূত্রে বলেছে। প্রথম মাসআলাটিতে স্ত্রী সম্পর্কেও একই কথা। কেননা, সে তিন তালাকের মালিক হয়েছে। কিন্তু এখানে সে তিন তালাকের মালিক হয়নি এবং তার হাতে যা অর্পণ করা হয়েছে, তা সে প্রয়োগ করেনি। সুতরাং তা বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا الخ : মাসআলা : কেউ যদি স্ত্রীকে বলে- طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا [তুমি নিজেকে তিন তালাক দাও], আর স্ত্রী নিজেকে এক তালাক প্রয়োগ করে, তাহলে এক তালাক পতিত হবে। কেননা, স্বামী তাকে তিন তালাক প্রয়োগের জন্য মালিক বানিয়েছে। সুতরাং এক তালাক প্রয়োগেরও সে মালিক থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً [তুমি নিজেকে এক তালাক দাও], আর সে নিজেকে তিন তালাক দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে কোনো তালাকই পতিত হবে না। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমত এটিই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, এক তালাক পতিত হবে। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত। সাহেবাইনের দলিল হলো, স্বামী স্ত্রীকে যেটুকুর মালিক বানিয়েছিল, সে তা অতিরিক্ত সহ প্রয়োগ করেছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হয়ে গেল; যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে যদি বলে– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ [তুমি নিজেকে তালাক দাও], আর স্ত্রী নিজেকে এক তালাক প্রদানের পাশাপাশি তার সতীনকেও তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রীকে যেটুকুর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল, ঠিক ততটুকুই সাব্যস্ত হবে, আর সে যে অতিরিক্ত প্রয়োগ করেছে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন– স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দেয়, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে, অবশিষ্টগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় এক তালাক পতিত হবে, আর অবশিষ্ট দুটি বাতিল হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, স্ত্রী এমন তালাক প্রয়োগ করেছে, যা তার হাতে অর্পণ করা হয়নি। কারণ, স্বামী তাকে এক তালাক প্রদানের জন্য মালিক বানিয়েছে, কিন্তু সে প্রয়োগ করেছে তিন তালাক। আর তিন একের বিপরীত। কেননা, তিন এমন একটি সংখ্যা, যা সম্মিলিত ও একত্র। এটি যৌগিক। অপর পক্ষে এক হলো একক সংখ্যা, যাতে যৌগিকতা নেই। সুতরাং এক ও তিনের মাঝে বৈপরীত্যের ভিত্তিতে ভিন্নতা আছে। তাই স্ত্রী যখন তার হাতে অর্পিত তালাকের বিপরীত প্রয়োগ করেছে, তখন সে নিজের পক্ষ থেকে সূচনাকারী হয়েছে। আর স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নিজ থেকেই প্রথমে যে তালাক প্রদান করে, তা পতিত হয় না। পক্ষান্তরে স্বামীর এক হাজার তালাক দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে মালিকানার সূত্রে বক্তব্য উচ্চারণ করেছে। সুতরাং সে তার ইচ্ছামতো বলতে পারে, তবে পাত্রের যোগ্যতার ভিত্তিতে তা কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে প্রথম মাসআলায়ও স্ত্রী মালিকানার সূত্রে বক্তব্য উচ্চারণ করেছে। কেননা, সে তিন তালাকের মালিক ছিল, প্রয়োগ করেছে এক তালাক। কিন্তু এখানে সে তিন তালাকের মালিকানা লাভ করেনি এবং তার হাতে যা অর্পণ করা হয়েছে, তা সে প্রয়োগ করেনি। সুতরাং তা বাতিল হবে– স্বামী-স্ত্রীর কথার মাঝে মিল না থাকার কারণে।

وَاِنْ اَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً وَاَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا اَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ فَمَعْنَى الْاَوَّلِ اَنْ يَقُوْلَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُوْلُ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِيَّةً لِاَنَّهَا اَتَتْ بِالْاَصْلِ وَ زِيَادَةِ وَصْفٍ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَلْغُوْ الْوَصْفُ وَيَبْقَى الْاَصْلُ وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ اَنْ يَقُوْلَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقُوْلُ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَتَقَعُ بَائِنَةً لِاَنَّ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَغْوٌ مِنْهَا لِاَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ اِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَى اِيْقَاعِ الْاَصْلِ دُوْنَ تَعْيِيْنِ الْوَصْفِ فَصَارَ كَاَنَّهَا اِقْتَصَرَتْ عَلَى الْاَصْلِ فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِىْ عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًّا ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন তালাক প্রদানের নির্দেশ করে, যারপর স্বামীর রাজ'আতের অধিকার থাকে– আর স্ত্রী বায়েন তালাক দেয় অথবা যদি সে স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদানের আদেশ করে, আর সে রাজ'ঈ তালাক প্রদান করে, তাহলে স্বামী যে তালাক প্রদানের আদেশ করেছে, তা-ই পতিত হবে। প্রথম মাসআলার সুরত হলো, স্বামী তাকে বলল, তুমি নিজেকে এমন একটি তালাক প্রদান কর, যাতে আমি রাজ'আতের মালিক হই। আর স্ত্রী বলল, আমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক প্রদান করলাম, তাহলে রাজ'ঈ তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে অতিরিক্ত বিশেষণ সহ মূল বিষয়টি প্রয়োগ করেছে; যেমন আমরা আলোচনা করলাম। সুতরাং অতিরিক্ত বিশেষণটি বাতিল হয়ে যাবে এবং মূল বিষয়টি বহাল থাকবে। আর দ্বিতীয় মাসআলার সুরত হলো– স্বামী তাকে বলল, তুমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক প্রদান কর, আর সে বলল– আমি নিজেকে একটি রাজ'ঈ তালাক প্রদান করলাম, তাহলে বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা, স্ত্রীর বক্তব্য 'একটি রাজ'ঈ'বাতিল। কারণ, স্বামী যখন অর্পিত তালাকের বিশেষণ নির্ধারণ করে দিয়েছে, তখন স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কাজ হলো মূল তালাক প্রয়োগ করা, বিশেষণ নির্ধারণ করা নয়। সুতরাং সে যেন মূল তালাকটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং স্বামীর নির্ধারিত বিশেষণ সহই তা সাব্যস্ত হবে– বায়েন হোক কিংবা রাজ'ঈ হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ اَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাকে রাজ'ঈ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়, আর স্ত্রী বায়েন তালাক প্রদান করে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদানের নির্দেশ দেয়, আর স্ত্রী রাজ'ঈ তালাক প্রদান করে, তাহলে স্বামীর নির্দেশ অনুসারে তালাক পতিত হবে।

প্রথম মাসআলার সুরত হলো, স্বামী স্ত্রীকে বলল– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ [তুমি নিজেকে এমন একটি তালাক প্রদান কর, যাতে আমার রাজ'আত করার অধিকার থাকে], আর স্ত্রী এর উত্তরে বলল– طَلَّقْتُ نَفْسِىْ وَاحِدَةً بَائِنَةً [আমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক প্রদান করলাম], তাহলে একটি রাজ'ঈ তালাক সাব্যস্ত হবে। দলিল হলো, স্ত্রী নিজেকে অতিরিক্ত বিশেষণ [বায়েন হওয়া] সহ মূল তালাক প্রদান করেছে। সুতরাং স্বামীর কথায় যে বিশেষণের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মূল তালাকটি বহাল থাকবে।

দ্বিতীয় মাসআলার সুরত হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً [তুমি নিজেকে একটি বায়েন তালাক প্রদান কর], আর স্ত্রী বলল– طَلَّقْتُ نَفْسِىْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً [আমি নিজেকে একটি রাজ'ঈ তালাক প্রদান করলাম], তাহলে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। দলিল হলো, স্ত্রীর রাজ'ঈ কথাটি বাতিল। কেননা, স্বামী নিজেই স্ত্রীকে অর্পিত তালাকের বিশেষণ ঠিক করে দিয়েছে, তা হলো বায়েন হওয়া। এখন স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কাজ হলো মূল তালাকটি প্রয়োগ করা; বিশেষণ নির্ধারণ করা তার প্রয়োজনীয় কাজ নয়। সুতরাং সে যেন মূল তালাকটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তাই স্বামী যে বিশেষণটি নির্ধারণ করেছে, তা-ই সাব্যস্ত হবে– সে বিশেষণটি বায়েন হোক কিংবা রাজ'ঈ হোক।

মোদ্দাকথা হলো, স্বামী স্ত্রীকে অতিরিক্ত বিশেষণ সহ মূল তালাক অর্পণ করেছে, আর স্ত্রী বিশেষণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করায় মূল তালাক সাব্যস্ত হবে, আর বিশেষণটি বাতিল হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا إِنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَئٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْتِ الثَّلٰثَ وَهِىَ بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلٰثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ ثَلٰثًا فَكَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِأَنَّ مَشِيَّةَ الثَّلٰثِ لَيْسَتْ بِمَشِيَّةٍ لِلْوَاحِدَةِ كَإِيْقَاعِهَا وَقَالَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَشِيَّةَ الثَّلٰثِ مَشِيَّةٌ لِلْوَاحِدَةِ كَمَا أَنَّ إِيْقَاعَهَا إِيْقَاعٌ لِلْوَاحِدَةِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি তাকে বলে, 'তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর, আর সে নিজেকে এক তালাক প্রদান করল, তাহলে কিছুই হবে না। কেননা, বাক্যটির অর্থ হলো, যদি তুমি তিন তালাক প্রদানের ইচ্ছা কর, তাহলে তিন তালাক প্রদান কর। আর এক তালাকের মাধ্যমে সে তিন তালাকের ইচ্ছা করেনি। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি। আর সে যদি তাকে বলে 'তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে নিজেকে এক তালাক প্রদান কর।' আর সে নিজেকে তিন তালাক প্রদান করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, একই হুকুম সাব্যস্ত হবে। কেননা, এক তালাকের ইচ্ছা করা তিন তালাকের ইচ্ছা করা নয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, এক তালাক পতিত হবে। কেননা, তিন তালাকের ইচ্ছার মধ্যে এক তালাকের ইচ্ছাও অন্তর্ভুক্ত। যেমন– তিন তালাকের প্রয়োগ এক তালাক প্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং শর্ত পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا إِنْ شِئْتِ [তুমি যদি চাও, তাহলে নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর], আর স্ত্রী নিজেকে এক তালাক প্রদান করে; তাহলে কোনো তালাকই পতিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমত এটিই। দলিল হলো, স্বামীর উপরিউক্ত কথার অর্থ إِنْ شِئْتِ ثَلَاثًا অর্থাৎ, তুমি যদি তিন তালাক প্রদান করতে চাও, তাহলে তিন তালাক প্রদান কর। তাহলে স্বামী তালাক প্রদানের জন্য তিনের ইচ্ছাকে শর্ত করেছে। আর স্ত্রী যেহেতু এক তালাক প্রদান করেছে, সেহেতু শর্ত পাওয়া যায়নি। আর শর্ত বিদ্যমান না থাকলে তালাকও পতিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ [তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে নিজেকে এক তালাক প্রদান কর], আর স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, কোনো তালাকই পতিত হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, এক তালাক পতিত হবে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন একের বিপরীত। কেননা, তিন এমন সংখ্যার নাম, যা সম্মিলিত, একত্র ও যৌগিক। আর এক হলো একক সংখ্যা, যাতে যৌগিকতা নেই। সুতরাং তিন তালাকের ইচ্ছা এক তালাকের ইচ্ছা নয়। কেননা, শর্ত ছিল স্ত্রী যদি এক তালাক চায়, তাহলে তা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে তিন তালাকের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি বলে তালাক পতিত হবে না। সুতরাং বিষয়টি এরূপ হলো যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً [তুমি নিজেকে এক তালাক দাও], আর স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কোনো তালাকই হবে না। কেননা, তাঁর মতে তিন তালাক পতিত করা এক তালাক পতিত করা নয়।

আর সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, তিন তালাকের ইচ্ছার মধ্যে এক তালাকের ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত। যেমন– তিন তালাক প্রয়োগ এক তালাক প্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং শর্ত বিদ্যমান থাকায় এক তালাক পতিত হবে।

এ মতপার্থক্যের মূলকথা হলো– ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এক তালাকের ইচ্ছা তিন তালাকের ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত নয়; তদ্রূপ এক তালাক প্রদান তিন তালাক প্রদানের অন্তর্গত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, এক তালাকের ইচ্ছা তিন তালাকের ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ اِنْ شِئْتَ فَقَالَ شِئْتُ يَنْوِى الطَّلَاقَ بَطَلَ الْاَمْرُ لِاَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيَّةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِىَ اَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ وَهُوَ اِشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْاَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ شِئْتُ وَاِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِاَنَّهُ لَيْسَ فِى كَلَامِ الْمَرْاَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيْرَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلَاقَهَا وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِى غَيْرِ الْمَذْكُورِ حَتّٰى لَوْ قَالَ شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ اِذَا نَوٰى لِاَنَّهُ اِيْقَاعٌ مُبْتَدَأٌ اِذِ الْمَشِيَّةُ تُنْبِئُ عَنِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَرَدْتُّ طَلَاقَكِ لِاَنَّهُ لَا يُنْبِئُ عَنِ الْوُجُودِ وَكَذَا اِذَا قَالَتْ شِئْتُ اِنْ شَاءَ اَبِى اَوْ شِئْتُ اِنْ كَانَ كَذَا لِاَمْرٍ لَمْ يَجِئْ بَعْدُ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْمَاتِىَّ بِهِ مَشِيَّةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَبَطَلَ الْاَمْرُ وَاِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ اِنْ كَانَ كَذَا لِاَمْرٍ قَدْ مَضٰى طُلِّقَتْ لِاَنَّ التَّعْلِيْقَ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تَنْجِيْزٌ .

অনুবাদ : আর সে যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি তালাক। আর স্ত্রী বলে– তুমি যদি চাও, তাহলে আমিও চাই। আর স্বামী তালাকের নিয়তে বলে– আমি চাইলাম, তাহলে হাতে অর্পণের বিষয়টি বাতিল হয়ে গেল। কেননা, স্বামী তালাককে শর্তহীন চাওয়ার সাথে যুক্ত করেছে, আর সে শর্তযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি। আর শর্তযুক্ত চাওয়ার অর্থ হলো যা উদ্দেশ্য করা হয়নি, তার সাথে প্রবৃত্ত হওয়া। সুতরাং বিষয়টি তার ইচ্ছাধিকার বহির্ভূত হয়ে যাবে। আর স্বামীর কথা– 'আমি চাইলাম' দ্বারা তালাক পতিত হবে না, যদিও সে তালাকের নিয়ত করে। কেননা, স্ত্রীর কথায় তালাকের উল্লেখ নেই, যাতে স্বামীকে স্ত্রীর তালাকের ইচ্ছা পোষণকারী বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আর অনুল্লেখ কোনো বিষয়ে নিয়ত কার্যকরী হয় না। তবে স্বামী যদি বলে, 'আমি তোমার তালাক চাইলাম', তাহলে তালাক পতিত হবে– যদি এ কথার দ্বারা তালাকের নিয়ত করে। কেননা, এটা নতুনভাবে তালাক প্রয়োগ করা হলো। কারণ, 'চাইলাম' কথাটি অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। পক্ষান্তরে স্বামীর কথা 'আমি তোমার তালাকের ইচ্ছা করলাম' – ভিন্ন বিষয়। কেননা, [এ ক্ষেত্রে] ইচ্ছা করলাম কথাটা অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে না। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী বলে, যদি আমার বাবা চান, তাহলে আমি চাই কিংবা এখনো ঘটেনি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলল, যদি অমুক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাই। কেননা, আমরা আলোচনা করেছি যে, স্ত্রী শর্তযুক্ত ইচ্ছা পোষণ করেছে। সুতরাং তালাক পতিত হবে না এবং হাতে অর্পণের বিষয়টি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি 'ঘটে গেছে' এমন কোনো বিষয় প্রসঙ্গে বলে যে, 'যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাইলাম', তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, কোনো সংঘটিত শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হলো, তাৎক্ষণিক প্রয়োগ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ [তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি তালাক], আর স্ত্রী এ কথার জবাবে বলে– شِئْتُ اِنْ شِئْتَ [যদি তুমি চাও, তাহলে আমিও চাই], আর স্বামী তালাকের নিয়ত করে, তাহলে স্ত্রীর হাতে অর্পিত ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, স্বামী শর্তহীন চাওয়ার সাথে স্ত্রীর তালাককে যুক্ত করেছে, আর স্ত্রী শর্তহীনভাবে তালাক চায়নি; বরং শর্তযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ স্বামীর চাওয়া

সাথে যুক্ত করেছে। সুতরাং স্বামীর আরোপিত শর্ত পাওয়া যায়নি বলে তালাক পতিত হবে না। অধিকন্তু স্ত্রীর উচ্চারিত কথার অর্থ হলো যা উদ্দেশ্য করা হয়নি, তার সাথে প্রবৃত্ত হওয়া। আর এর দ্বারা উপেক্ষা বুঝায়। সুতরাং তার হাতে অর্পিত বিষয়টি তার ইচ্ছাধিকার বহির্ভূত হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি স্ত্রীর কথা– شِئْتُ اِنْ شِئْتَ [যদি তুমি চাও, তাহলে আমিও চাই] -এর উত্তরে স্বামী বলে– شِئْتُ [আমি চাইলাম], তাহলে তালাক পতিত হবে না, যদিও স্বামী তার এ কথার দ্বারা তালাকের নিয়ত করে। কেননা, স্ত্রীর কথায় তালাকের কোনো উল্লেখ নেই, যাতে স্বামী স্ত্রীর তালাক চেয়েছে বলে সাব্যস্ত করা যায়। আর স্বামী নিয়ত করা সত্ত্বেও তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো, অনুচ্চারিত কোনো বিষয়ে নিয়ত কার্যকর হয় না। আর এখানে স্বামী-স্ত্রী কারো কথায় তালাকের উল্লেখ নেই। সুতরাং স্বামীর নিয়ত কার্যকর হবে না। তবে স্বামী যদি তালাকের নিয়তে বলে– شِئْتُ طَلَاقَكِ [আমি তোমার তালাক চাইলাম], তাহলে তালাক পতিত হবে। কেননা, এখানে নতুনভাবে তালাক প্রয়োগ করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, شِئْتُ طَلَاقَكِ [আমি তোমার তালাক চাইলাম] স্বামীর এ কথার দ্বারা তালাক সাব্যস্ত হবে; কিন্তু اَرَدْتُ طَلَاقَكِ [আমি তোমার তালাকের ইচ্ছা করলাম] বললে তালাক সাব্যস্ত হবে না। এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো– شِئْتُ গৃহীত হয়েছে شَيْئٌ থেকে। আর شَيْئٌ -এর অর্থ مَوْجُوْد [বিদ্যমান]। সুতরাং شِئْتُ অর্থ اَوْجَدْتُ আর তালাক প্রদান ব্যতীত اِيْجَاد طَلَاق তথা তালাক পাওয়া যায় না। এ কারণেই شِئْتُ طَلَاقَكِ দ্বারা তালাক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে اَلْاِرَادَةُ -এর অর্থ হলো اَلطَّلَبُ [অনুসন্ধান]। যেমন হাদীসে এসেছে– اَلْحُمّٰى رَائِدُ الْمَوْتِ এখানে رَائِدٌ -এর অর্থ طَالِبَةٌ সুতরাং اَرَدْتُ طَلَاقَكِ -এর অর্থ হলো– طَلَبْتُ طَلَاقَكِ আর طَلَبُ طَلَاقٍ তথা তালাককে অনুসন্ধানের ফলে তালাক পতিত হয় না বলে এ বাক্যের মাধ্যমে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে اَلْاِرَادَةُ ও اَلْمَشِيْئَةُ -এর অর্থ একই। তাহলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর: এর উত্তরে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে উভয়টির অর্থ একই, কিন্তু বান্দার দিকে যখন সম্পর্কিত করা হয়, তখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১৫৬]।

আর স্ত্রী যদি– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتَ [তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি তালাক] স্বামীর এ কথার উত্তরে বলে– شِئْتُ اِنْ شَاءَ اَبِىْ [যদি আমার বাবা চান, তাহলে আমি চাই] কিংবা شِئْتُ اِنْ كَانَ كَذَا [যদি অমুক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাই] অর্থাৎ, 'এখনো ঘটেনি 'এমন কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে বলে, তাহলে তালাক পতিত হবে না। এর দলিল ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর তালাককে শর্তহীন চাওয়ার সাথে যুক্ত করেছে, আর স্ত্রী শর্তযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুতরাং স্বামীর আরোপিত শর্ত পাওয়া যায়নি; বরং স্ত্রীর উচ্চারিত কথার অর্থ হলো, যা উদ্দেশ্য করা হয়নি তার সাথে প্রবৃত্ত হওয়া। তাই বিষয়টি স্ত্রীর এখতিয়ার বহির্ভূত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ اِنْ كَانَ كَذَا الخ : আর যদি স্ত্রী 'ঘটে গেছে' এমন কোনো বিষয় প্রসঙ্গে বলে– شِئْتُ اِنْ كَانَ كَذَا [যদি তা এমন হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাইলাম], তাহলে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। কেননা, তালাককে সংঘটিত কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হলো, তাৎক্ষণিক তালাক প্রয়োগ করা। যেমন কেউ যদি বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كَانَ السَّمَاءُ فَوْقَنَا [আসমান যদি আমাদের উপরে হয়, তাহলে তুমি তালাক], তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো– شِئْتُ طَلَاقَكِ [আমি তোমার তালাক চাইলাম] বাক্যে 'তালাক' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তালাক পতিত হওয়ার জন্য আলাদাভাবে নিয়তের প্রয়োজন না থাকার কথা।

উত্তর : এর উত্তরে বলা হয়, বাক্যটিতে দু'ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে– ১. সাধারণভাবে তালাকের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য, ২. পতিত হওয়ার দিক থেকে তালাকের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য। সুতরাং পতিত হওয়া হিসেবে তালাকের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করতে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে।

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ اَوْ اِذَا مَا شِئْتِ اَوْ مَتٰى شِئْتِ اَوْ مَتٰى مَا شِئْتِ فَرَدَّتِ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ اَمَّا كَلِمَةُ مَتٰى وَمَتٰى مَا فَلِاَنَّهَا لِلْوَقْتِ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا كَاَنَّهُ قَالَ فِي اَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْاِجْمَاعِ وَلَوْ رَدَّتِ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنْ رَدًّا لِاَنَّهُ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ شَاءَتْ فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيْكًا قَبْلَ الْمَشِيَّةِ حَتّٰى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا اِلَّا وَاحِدَةً لِاَنَّهَا تَعُمُّ الْاَزْمَانَ دُوْنَ الْاَفْعَالِ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيْقَ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ تَطْلِيْقٍ وَاَمَّا كَلِمَةُ اِذَا وَاِذَا مَا فَهِيَ وَمَتٰى سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اِنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ لِلشَّرْطِ كَمَا يَسْتَعْمِلُ لِلْوَقْتِ لٰكِنَّ الْاَمْرَ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, যখন তুমি ইচ্ছা করবে তখন তুমি তালাক, আর স্ত্রী যদি বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রত্যাখ্যান সাব্যস্ত হবে না এবং তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধও থাকবে না। কেননা, مَتٰى مَا ও مَتٰى [উভয়টির অর্থ যখন] শব্দদ্বয় সময়বাচক। আর তা সকল সময়ের মধ্যে ব্যাপক। যেন সে বলল, যে-কোনো সময় তুমি ইচ্ছা করবে। সুতরাং সর্বসম্মতভাবে তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর যদি সে বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা, সে তাকে ঐ সময়ের জন্য তালাকের মালিক বানিয়েছে, যখন সে ইচ্ছা করবে। সুতরাং ইচ্ছা করার পূর্বে তো মালিক বানানো সাব্যস্ত হয়নি, যাতে তার প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যাত হয়। আর সে নিজেকে এক তালাকের বেশি দিতে পারবে না। কেননা, 'যখন' শব্দটি সময়ের ব্যাপারে ব্যাপকতা জ্ঞাপন করলেও 'কর্মের' ব্যাপারে নয়। সুতরাং সকল সময়ে তালাক প্রদানের মালিক হবে। কিন্তু এক তালাকের পর আরেক তালাকের মালিক হবে না। আর اِذَا - اِذَا مَا [যখন] এবং مَتٰى [যে সময়] শব্দগুলো সাহেবাইনের নিকট একই রকম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদিও এ শব্দগুলি শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়; যেমন– সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিষয়টি যখন স্ত্রীর অধিকারে ন্যস্ত হয়ে গেছে, তখন সন্দেহের কারণে অধিকার বহির্ভূত হবে না। পূর্বে এটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ [যখন তুমি চাইবে, তখন তুমি তালাক] কিংবা اِذَا -এর স্থলে اِذَا مَا অথবা مَتٰى অথবা مَتٰى مَا ব্যবহার করে বলে; আর স্ত্রী যদি তার হাতে এই ইচ্ছাধিকার অর্পণের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রত্যাখ্যান সাব্যস্ত হবে না; বরং প্রত্যাখ্যান করার পরও সে নিজেকে এক তালাক দিতে পারবে। আর সর্বসম্মতভাবে এ বিষয়টি বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং স্ত্রী যদি বৈঠক থেকে উঠে যায় কিংবা অন্যকোনো কর্মে লিপ্ত হয়,তথাপি সে নিজেকে এক তালাক প্রয়োগ করতে পারবে।

এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– مَتٰى مَا ও مَتٰى শব্দগুলো সময়বাচক। আর তা সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। যেন স্বামী বলল– اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ اَىِّ وَقْتٍ شِئْتِ [যে-কোনো সময় তুমি ইচ্ছা করবে, তুমি তালাক]। সুতরাং ব্যাপক সময়ের কারণে তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর স্ত্রী যদি স্বীয় এখতিয়ারকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা, স্বামী স্ত্রীকে ঐ সময়ের জন্য তালাকের মালিক বানিয়েছে, যখন স্ত্রী ইচ্ছা করবে। সুতরাং তার ইচ্ছা করার পূর্বে তালাকের মালিক বানানো সাব্যস্ত হবে না এবং তার প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতও হবে না।

এ ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেকে এক তালাকের বেশি দিতে পারবে না; বরং সে নিজেকে এক তালাক প্রয়োগ করতে পারবে। কেননা, مَتٰى مَا ও مَتٰى শব্দগুলো সময়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা জ্ঞাপক হলেও 'কর্মে'র ক্ষেত্রে তা ব্যাপকতার জন্য আসে না। সুতরাং সময়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকতার কারণে স্ত্রী সকল সময়ে তালাক প্রদানের মালিক হবে, কিন্তু এক তালাকের পরে আরেক তালাকের মালিক হবে না।

قَوْلُهُ وَاَمَّا كَلِمَةُ اِذَا وَاِذَا مَا فَهِىَ الخ : আর اِذَا ۔ اِذَامَا এবং مَتٰى এ সকল শব্দ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট সমান। সুতরাং مَتٰى -এর যে হুকুম اِذَا ও اِذَا مَا -এর ক্ষেত্রে একই হুকুম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে اِذَا ও اِذَا مَا এ শব্দগুলো যেরূপ সময়বাচক, তদ্রূপ এগুলি শর্তের জন্যও ব্যবহৃত হয়। আর শর্তের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার দাবি হলো, এখতিয়ার বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; পক্ষান্তরে সময়বাচক হওয়ার দাবি হলো, বৈঠক শেষ হওয়ার ফলে স্ত্রীর এখতিয়ার আর থাকবে না। আর বিষয়টি যখন স্ত্রীর অধিকারে ন্যস্ত আছে, সেহেতু সন্দেহের কারণে অধিকার বহির্ভূত হবে না।

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتّٰى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلٰثًا لِاَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا تُوْجِبُ تَكْرَارَ الْاَفْعَالِ اِلَّا اَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصَرِفُ اِلَى الْمِلْكِ الْقَائِمِ حَتّٰى لَوْ عَادَتْ اِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاَنَّهُ مِلْكٌ مُسْتَحْدَثٌ وَلَيْسَ لَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلٰثًا فِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِاَنَّهَا تُوْجِبُ عُمُوْمَ الْاَفْرَادِ لَا عُمُوْمَ الْاِجْتِمَاعِ فَلَا تَمْلِكُ الْاِيْقَاعَ جُمْلَةً وَجَمْعًا .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, যতবার তুমি ইচ্ছা করবে, তুমি তালাক, তাহলে স্ত্রী নিজেকে একের পর এক তিন তালাক প্রদান করতে পারবে। কেননা, 'যতবার' শব্দটি কর্মের পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত করে। তবে এই শর্তযুক্ততা বর্তমান মালিকানার দিকেই শুধু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং অন্য স্বামী গ্রহণের পর যদি এ স্বামীর কাছে ফিরে আসে এবং নিজেকে তালাক প্রদান করে, তাহলে কিছুই হবে না। কেননা, এটা নতুন সৃষ্ট মালিকানা। আর সে নিজেকে এক শব্দে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে না। কেননা, শব্দটি সংখ্যার ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে, কিন্তু সংখ্যা সমবেত হওয়া সাব্যস্ত করে না। সুতরাং সে এক শব্দে এবং একত্রে তালাক প্রদানের অধিকারিণী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ [যতবার তুমি ইচ্ছা করবে, ততবার তুমি তালাক], তাহলে স্ত্রী নিজেকে একের পর এক তিন তালাক দিতে পারবে। এর দলিল হলো– كُلَّمَا [যতবার] শব্দটি কর্মের বারংবারতা সাব্যস্ত করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ [যতবার তাদের চামড়াগুলো জ্বলে-পুড়ে যাবে। [সূরা নিসা : আয়াত নং ৫৬]। আর তাই স্ত্রীর একের পর এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাধিকার থাকবে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ التَّعْلِيْقَ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো– كُلَّمَا শব্দটি যদি কর্মের বারংবারতা-ই সাব্যস্ত করে, তাহলে অন্য স্বামীর ঘর করার পর আবার যদি সে এ স্বামীর কাছে ফিরে আসে, তাহলে সে পুনর্বার তালাক প্রদানের অধিকারিণী হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

উত্তর : এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শর্তযুক্ততা বর্তমান মালিকানার দিকেই শুধু প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ, স্বামীর বর্তমান মালিকানায় যেসব তালাক আছে, সে সবই স্ত্রীর নিকট অর্পিত হবে। দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর আবার যখন সে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসবে, তখন নিজেকে তালাক দিলে তালাক হবে না। কেননা, এটা নতুনভাবে সৃষ্ট মালিকানা।

'যতবার চাও' -এর সূত্র ধরে স্ত্রী নিজেকে এক শব্দে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে না। কেননা, كُلَّمَا [যতবার] শব্দটি সংখ্যার ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে, কিন্তু সংখ্যা সমবেত হওয়া সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এক শব্দে এবং একত্রে তালাক প্রদানের এখতিয়ার স্ত্রীর থাকবে না। কারো কারো মতে جُمْلَةً [এক শব্দে] এবং جَمْعًا [একত্রে] শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। আবার কেউ কেউ বলেন– جُمْلَةً হলো– স্ত্রী যদি নিজেকে এভাবে তালাক দেয়– طَلَّقْتُ نَفْسِيْ ثَلٰثًا [আমি নিজেকে তিন তালাক দিলাম]; পক্ষান্তরে جَمْعًا -এর সুরত হলো– طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً [আমি নিজেকে তালাক দিলাম একটি, একটি এবং একটি]। –[ইনায়া]

وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ اَوْ اَيْنَ شِئْتِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى تَشَاءَ وَاِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيَّةَ لَهَا لِاَنَّ كَلِمَةَ حَيْثُ وَاَيْنَ مِنْ اَسْمَاءِ الْمَكَانِ وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلُّقَ لَهٗ بِالْمَكَانِ فَيَلْغُوْ وَيَبْقٰى ذِكْرُ مُطْلَقِ الْمَشِيَّةِ فَتَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الزَّمَانِ لِاَنَّ لَهٗ تَعَلُّقًا بِهٖ حَتّٰى يَقَعَ فِيْ زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ فَوَجَبَ اِعْتِبَارُهٗ خُصُوْصًا وَعُمُوْمًا ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক, যেখানে তুমি চাইবে বা যে স্থানে তুমি চাইবে, তাহলে সে চাওয়ার পূর্বে তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর যদি সে বৈঠক থেকে উঠে যায়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা, حَيْثُ [যেখানে] ও اَيْنَ [যে স্থানে] শব্দ দুটি স্থানবাচক। আর স্থানের সাথে তালাকের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং স্থানের উল্লেখ বাতিল আর শর্তহীন ইচ্ছার উল্লেখ বহাল থাকবে। ফলে তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। পক্ষান্তরে সময়বাচক শব্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সময়ের সাথে তালাকের সংশ্লিষ্টতা আছে। তাইতো এক সময় তালাক সাব্যস্ত হয়, কিন্তু অন্য সময় হয় না। সুতরাং বিশিষ্টতা ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে- اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ [তুমি তালাক, যেখানে তুমি চাইবে] কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ اَيْنَ شِئْتِ [তুমি তালাক, যে স্থানে তুমি চাইবে], তাহলে স্ত্রী তালাক চাওয়ার পূর্বে তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর যদি সে বৈঠক থেকে উঠে যায়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। দলিল হলো- حَيْثُ [যেখানে] এবং اَيْنَ [যে স্থানে] শব্দদ্বয় স্থানবাচক। আর তালাক নির্দিষ্ট কোনো স্থানের সাথে বিশিষ্ট হয় না। আর তাইতো কেউ যদি তালাককে নির্দিষ্ট কোনো স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, তাহলে সব জায়গায় তালাক পতিত হবে। সুতরাং স্থানের উল্লেখ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং শুধু শর্তহীন ইচ্ছার উল্লেখ বহাল থাকবে। যেন স্বামী স্ত্রীকে বলল- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ [তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি তালাক]। আর বৈঠক থেকে উঠে গেলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। যেমন- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ -এর ক্ষেত্রে স্ত্রী বৈঠক থেকে উঠে গেলে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকে না।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, আলোচ্য মাসআলায় যদি স্থানের উল্লেখ বাতিল হয় এবং শুধু শর্তহীন ইচ্ছার উল্লেখ বহাল থাকে, তাহলে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ [যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক] -এর ক্ষেত্রে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হয়, তদ্রূপ اَنْتِ طَالِقٌ شِئْتِ অর্থাৎ শর্তহীন ইচ্ছার উল্লেখের ক্ষেত্রেও তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে। কেননা, শর্তের হরফ না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান।

উত্তর: এর উত্তরে বলা হয়- حَيْثُ এবং اَيْنَ কিছুটা হলেও বিলম্ব অর্থে আসে। আর শর্তের হরফও একই অর্থ প্রদান করে। এ কারণে حَيْثُ ও اَيْنَ -কে রূপকভাবে শর্তের হরফ اِنْ -এর অর্থে ধরা হয়েছে। সুতরাং اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ কিংবা طَالِقٌ اَيْنَ شِئْتِ -এর অর্থ হলো- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ। আর এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হয় না। অনুরূপভাবে এখানেও তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে না; বরং ইচ্ছার শর্ত পাওয়ার পরই তালাক পতিত হবে। আর اَيْنَ ও حَيْثُ -কে اِذَا কিংবা غَيْر অর্থে না ধরে اِنْ অর্থে ধরার কারণ হলো, শর্তের হরফের মধ্যে اِنْ হলো মূল ও আসল। আর অন্যের বিপরীতে মূলকে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ الزَّمَانِ لِاَنَّ لَهٗ تَعَلُّقًا بِهٖ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, সময়বাচক শব্দের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সময়ের সাথে তালাকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাইতো এক সময়ে তালাক সাব্যস্ত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে হয় না। আর তাই বিশিষ্টতা [خُصُوْص] ও ব্যাপকতার [عُمُوْم] ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। যেমন- اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا [তুমি আগামীকাল তালাক] -এর ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা বিবেচ্য. আর اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ اَىِّ وَقْتٍ شِئْتِ [তুমি তালাক, যে সময় তুমি চাইবে] -এর ক্ষেত্রে ব্যাপকতা বিবেচ্য। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬২]

وَاِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ طُلِّقَتْ تَطْلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِيَّةِ فَاِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً اَوْ ثَلْثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذٰلِكَ نَوَيْتُ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِاَنَّ عِنْدَ ذٰلِكَ تَثْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيَّتِهَا وَاِرَادَتِهِ اَمَّا اِذَا اَرَادَتْ ثَلْثًا وَالزَّوْجُ اَرَادَ وَاحِدَةً بَائِنَةً اَوْ عَلَى الْقَلْبِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ لِاَنَّهُ لَغَا تَصَرُّفُهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِىَ اِيْقَاعُ الزَّوْجِ وَاِنْ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ يُعْتَبَرُ مَشِيَّتُهَا فِيْمَا قَالُوْا جَرْيًا عَلٰى مُوْجَبِ التَّخْيِيْرِ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فِى الْاَصْلِ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ مَا لَمْ تُوْقِعِ الْمَرْأَةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً اَوْ بَائِنَةً اَوْ ثَلْثًا وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْعِتَاقُ لَهُمَا اَنَّهُ فَوَّضَ التَّطْلِيْقَ اِلَيْهَا عَلٰى اَىِّ صِفَةٍ شَاءَتْ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْلِيْقِ اَصْلِ الطَّلَاقِ بِمَشِيَّتِهَا لِيَكُوْنَ لَهَا الْمَشِيَّةُ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ اَعْنِىْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَبَعْدَهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ لِلْاِسْتِيْصَافِ يُقَالُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ وَالتَّفْوِيْضُ فِىْ وَصْفِهِ يَسْتَدْعِىْ وُجُوْدَ اَصْلِهِ وَ وُجُوْدُ الطَّلَاقِ بِوُقُوْعِهِ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাক, যেভাবে ইচ্ছা কর', তাহলে এক তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্বামী রাজ'আতের মালিক হবে। অর্থাৎ, স্ত্রীর চাওয়ার পূর্বে। আর স্ত্রী যদি বলে, আমি একটি বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাক চাইলাম, আর স্বামী বলে, আমি সেটিই নিয়ত করেছিলাম, তাহলে সে যেমন বলবে, তেমনই হবে। কেননা, স্ত্রীর চাওয়া ও স্বামীর ইচ্ছার মাঝে ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রী যদি তিন তালাক চায়, আর স্বামী একটি বায়েন তালাক ইচ্ছা করে কিংবা বিষয়টি যদি উল্টা হয়, তাহলে একটি রাজ'ঈ তালাক হবে। কেননা, স্বামীর সাথে কথার মিল না থাকার কারণে স্ত্রীর বক্তব্য বাতিল হবে। সুতরাং স্বামীর তালাক প্রয়োগ বহাল থাকবে। আর স্বামীর নিয়ত না থাকলে মাশায়েখগণ ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রের উপর কিয়াস করে বলেছেন, স্ত্রীর চাওয়াটাই বিবেচ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে বলেছেন, এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক প্রয়োগ না করবে, তালাক হবে না; সে রাজ'ঈ কিংবা বায়েন অথবা তিন তালাক যা ইচ্ছা চাইতে পারে। দাসমুক্তির ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য। সাহেবাইনের দলিল হলো, স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে– যে বিশেষণে সে তালাককে চায়। অতএব, মূল তালাককে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত রাখা জরুরি, যাতে সর্বাবস্থায় তার ইচ্ছা কার্যকরী হতে পারে অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে হোক কিংবা পরে হোক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, 'কিভাবে' শব্দটি বিশেষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা হয়– কিভাবে তোমার সকাল হয়েছে? আর বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণ মূল বিষয়ের অস্তিত্ব দাবি করে। আর তালাকের অস্তিত্ব হয় তা পতিত হওয়ার মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ [তুমি তালাক, যেভাবে তুমি ইচ্ছা কর], তাহলে স্ত্রী চাওয়ার পূর্বেই এক তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে। অতঃপর স্ত্রী যদি স্বামীর কথার প্রেক্ষিতে একটি বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাক চায়, আর স্বামীও সেটা নিয়ত করে, তাহলে তা-ই পতিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'মাবসূত' কিতাবে উল্লেখ করেন, এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে- اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ বলার দ্বারা তালাক হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তালাক প্রয়োগ না করবে। আর স্ত্রী রাজ'ঈ কিংবা বায়েন অথবা তিন তালাক যা ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে।

মোদ্দাকথা হলো, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ [তুমি তালাক, যেভাবে তুমি ইচ্ছা কর], তাহলে মূল তালাক স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে কিনা, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মূল তালাক স্ত্রীর চাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না; বরং স্ত্রী চাওয়ার পূর্বেই এক তালাক পতিত হবে। স্ত্রী সহবাসহীনা হলে তার ইচ্ছাধিকারও বহাল থাকবে না। আর সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে একটি রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে এবং ঐ বৈঠকে স্ত্রীর তালাকের বিশেষণ নির্ধারণের [রাজ'ঈ, বায়েন কিংবা তিন তালাক] ইচ্ছাধিকার থাকবে। স্ত্রী তালাককে যে-কোনো বিশেষণে বিশেষিত করার পর স্বামী যদি কোনো কিছুর নিয়ত না করে, তাহলে মুতাআখ্খিরীন ফুকাহায়ে কেরামের মতে, স্ত্রীর চাওয়াটাই গ্রহণযোগ্য হবে– ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তার উপর কিয়াস করে তারা এ কথা বলেন। আর স্বামী যদি তালাকের নিয়ত করে, তাহলে দুটি সুরত হতে পারে– ১. স্ত্রীর চাওয়া এবং স্বামীর ইচ্ছার মাঝে ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে কিংবা ২. ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে না। যদি স্ত্রীর চাওয়া এবং স্বামীর ইচ্ছার মাঝে ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়, তাহলে সেটাই পতিত হবে। আর যদি ঐকমত্য সাব্যস্ত না হয়; যেমন– স্ত্রী তিন তালাক চায়, আর স্বামী একটি বায়েন তালাক ইচ্ছা করে কিংবা বিষয়টি যদি এর উল্টা হয়, তাহলে একটি রাজ'ঈ তালাক হবে। কেননা, স্বামীর সাথে কথার মিল না হওয়ায় স্ত্রীর বক্তব্য বাতিল হবে। সুতরাং স্বামীর তালাক প্রয়োগ বহাল থাকবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, স্বামীর বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ -এর দ্বারা তালাক সাব্যস্ত হবে না– সহবাসের পূর্বেও হবে না, পরেও হবে না। তবে স্ত্রী তালাক চাইলে তালাক পতিত হবে। তাহলে, সাহেবাইনের মতে, মূল তালাক স্ত্রীর চাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের দলিল হলো, স্ত্রী তালাককে যে বিশেষণেই চায়, সেই বিশেষণে তার হাতে স্বামী তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কেননা, كَيْفَ [যেভাবে] শব্দটি সাধারণভাবে অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তাই মূল তালাককে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত রাখা অপরিহার্য, যাতে সহবাসের পূর্বে এবং পরে সর্বাবস্থায় তার ইচ্ছা কার্যকরী হতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– كَيْفَ [যেভাবে] শব্দটি বিশেষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়; মূল বিষয়টি জানতে চাওয়ার জন্য নয়। যেমন বলা হয়– كَيْفَ اَصْبَحْتَ 'কিভাবে তোমার সকাল হয়েছে'– সুস্থভাবে নাকি অসুস্থভাবে? এ থেকে বুঝা গেল যে, বিশেষণের ক্ষেত্রে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর বিশেষণ প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ মূল বিষয়ের অস্তিত্ব দাবি করে।

আর তালাক প্রয়োগ না করলে তালাকের অস্তিত্ব হয় না। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, স্ত্রীর তালাক চাওয়ার পূর্বেই মূল তালাক পতিত হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন এজন্য যে, আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীকে তালাকের অবস্থার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর তালাকের অবস্থা كَمْ [সংখ্যা] ও كَيْفَ [পদ্ধতির]-এর ক্ষেত্রে সমভাবে আসে। সুতরাং এ থেকে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করতে নিয়তের প্রয়োজন।

قَوْلُهُ فِيْمَا قَالُوْا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) মুতাআখ্খিরীন তথা পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের অভিমত এ ক্ষেত্রে বর্ণনা করার কারণ হলো, মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই।

[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃ. ১৬৩]

قَوْلُهُ قَالَ فِى الْاَصْلِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'মাবসূত' -এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। এভাবে বলার কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে এই মতপার্থক্য উল্লেখ করেননি। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৪]

وَاِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ اَوْمَا شِئْتِ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ لِاَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ لِلْعَدَدِ فَقَدْ فَوَّضَ اِلَيْهَا اَىَّ عَدَدٍ شَاءَتْ فَاِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِ بَطَلَ وَاِنْ رَدَّتِ الْاَمْرَ كَانَ رَدًّا لِاَنَّ هٰذَا اَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ خِطَابٌ فِى الْحَالِ فَيَقْتَضِى الْجَوَابَ فِى الْحَالِ ـ

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক, যে পরিমাণ তুমি চাও কিংবা যত চাও, তাহলে সে যত সংখ্যক ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রদান করতে পারবে। কেননা, শব্দদ্বয় সংখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সে যত সংখ্যা তালাক ইচ্ছা করবে তত সংখ্যাই তার হাতে অর্পণ করা হয়েছে। যদি সে বৈঠক থেকে উঠে যায়, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা, এটা অভিন্ন বিষয়, আর তা বর্তমান সময়ের জন্য সম্বোধন। সুতরাং বর্তমান সময়েই জবাব আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ الخ **:** মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে- اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ [তুমি তালাক, যে পরিমাণ তুমি চাও], কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ مَا شِئْتِ [তুমি তালাক যত চাও], তাহলে স্ত্রী নিজেকে এক তালাক কিংবা দুই তালাক অথবা তিন তালাক প্রদান করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বৈঠক ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। মোদ্দাকথা, আলোচ্য মাসআলায় সর্বসম্মতভাবে মূল তালাক স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। এর দলিল হলো- كَمْ ও مَا অব্যয় দুটি সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেন স্বামী তালাকের সংখ্যা স্ত্রীর হাতে অর্পণ করেছে। সুতরাং স্ত্রী যত সংখ্যক ইচ্ছা নিজের উপর তালাক প্রদান করতে পারবে।

স্ত্রী বৈঠক থেকে উঠে গেলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, বৈঠক থেকে দাঁড়ানো উপেক্ষার প্রমাণ। আর স্ত্রী যদি তার ইচ্ছাধিকার প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তার ইচ্ছাধিকার প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কেননা, এটা অভিন্ন বিষয়। এখানে এমন কোনো শব্দ নেই, যা বারংবারতা নির্দেশ করে। আর অভিন্ন একটি বিষয় হওয়ার কারণে উত্তরও অভিন্ন হওয়ার দাবি করে, যাতে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে মিল থাকে। আর উত্তর বর্তমান সময়ে হওয়া চাই। কেননা, এ বাক্যে এমন কোনো শব্দ নেই, যা সময়ের ব্যাপকতাকে নির্দেশ করে। আর বর্তমান সময়েই উত্তরের আবশ্যকতার কারণে اِذَا ও مَتٰى -এর দ্বারা ব্যবহৃত বাক্যের হুকুম এ হুকুম থেকে ভিন্ন হয়েছে। কেননা, এ দুটি অব্যয় সময়ের জন্য আসে।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো- كَمْ অব্যয়টি সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে مَا অব্যয়টি যেরূপ সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ সময়ের জন্যও আসে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- مَا دُمْتُ حَيًّا [আমি যতদিন বেঁচে থাকব] -এ আয়াতে مَا সময়ের জন্য এসেছে। সুতরাং স্ত্রীর হাতে তালাকের সংখ্যা অর্পণের ব্যাপারে সন্দেহ হলো। আর এ সন্দেহের কারণে সংখ্যার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না।

উত্তর: এর উত্তরে বলা হয়, مَا অব্যয়টি যদিও সংখ্যা এবং সময় উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে সংখ্যার অর্থে তার ব্যবহার বেশি। এটা এভাবে যে, হাতে ক্ষমতা অর্পণ মালিকানার অর্থকে সাব্যস্ত করে। আর মালিকানা বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর مَا যখন 'সংখ্যা' অর্থে আসবে তখনই তা বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে; সময়ের অর্থে আসলে হবে না।

-[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৬]

وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ وَلَا تُطَلِّقُ ثَلْثًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا تُطَلِّقُ ثَلْثًا اِنْ شَاءَتْ لِاَنَّ كَلِمَةَ مَا مُحْكَمَةٌ فِى التَّعْمِيْمِ وَكَلِمَةُ مِنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيْزِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ كَمَا اِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِىْ مَا شِئْتَ اَوْ طَلِّقْ مِنْ نِسَائِىْ مَنْ شَاءَتْ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ كَلِمَةَ مِنْ حَقِيْقَةٌ لِلتَّبْعِيْضِ وَمَا لِلتَّعْمِيْمِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا وَفِيْمَا اِسْتَشْهَدَا بِهِ تَرْكُ التَّبْعِيْضِ لِدَلَالَةِ اِظْهَارِ السَّمَاحَةِ اَوْ لِعُمُوْمِ الصِّفَةِ وَهِىَ الْمَشِيَّةُ حَتّٰى لَوْ قَالَ مَنْ شِئْتَ كَانَ عَلَى الْخِلَافِ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজেকে তিন তালাক হতে যত ইচ্ছা তালাক দাও, তাহলে সে নিজেকে এক বা দুই তালাক দিতে পারবে। তবে তিন তালাক দিতে পারবে না। এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, স্ত্রী চাইলে তিন তালাক দিতে পারবে। কেননা, مَا [যতটা] শব্দটি ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত। আর مِنْ [হতে/থেকে] শব্দটি কখনো কখনো ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শব্দটিকে এখানে তালাকের জিনস [সমগ্র পরিমাণ] ব্যাখ্যার অর্থে গ্রহণ করা হবে। যেমন বলা হয়– তুমি তোমার খাবার হতে যা ইচ্ছা খাও, কিংবা আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যে চায়, তাকে তালাক দাও। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– مِنْ [হতে/থেকে] অব্যয়টি প্রকৃতপক্ষে আংশিকতা জ্ঞাপক, আর مَا [যতটা] অব্যয়টি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সুতরাং উভয়টি কার্যকরী হবে। আর সাহেবাইন (র.) প্রমাণ হিসেবে যে দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন, [তন্মধ্যে প্রথমটিতে] আংশিকতার অর্থ বর্জন করা হয়েছে– প্রকাশের ইঙ্গিত থাকার কারণে এবং [দ্বিতীয়টিতে] বিশেষণের ব্যাপকতার কারণে। আর তা [বিশেষণ] হলো, চাওয়া [যে চায়]। এজন্যই যদি বলে, 'আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যাকে তুমি ইচ্ছা কর তাকে তালাক দাও, তাহলে সেখানেও মতপার্থক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلٰثٍ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلٰثٍ مَا شِئْتِ [তুমি নিজেকে তিন তালাক হতে যত ইচ্ছা তালাক দাও], তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, স্ত্রী নিজেকে একটি তালাক কিংবা দুটি তালাক দিতে পারবে। তিন তালাক দেওয়ার ইচ্ছাধিকার স্ত্রীর নেই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, স্ত্রী চাইলে নিজেকে তিন তালাকও দিতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো– مَا অব্যয়টি ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট। আর مِنْ অব্যয়টি কখনো কখনো ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ [সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। [সূরা হজ্জ : আয়াত– ৩০]। এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো مِنْ অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপক। আবার কখনো এ দু'টি অন্য অর্থেও আসে। সুতরাং স্বামীর কথায় সুনির্দিষ্ট ও সম্ভাবনাময় উভয়টি পাওয়া যায়।

সুতরাং مِنْ অব্যয়টিকে এখানে তালাকের জিনস [সমগ্র পরিমাণ] ব্যাখ্যার অর্থে গ্রহণ করা হয়। এখন স্বামীর কথার অর্থ দাঁড়ায়– তুমি নিজেকে যতটা ইচ্ছা [তিন পর্যন্ত] তালাক দাও। অর্থাৎ, স্ত্রীর নিজেকে তিন তালাক পর্যন্ত প্রদানের অধিকার আছে। যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে বলল– كُلْ مِنْ طَعَامِيْ مَا شِئْتَ [তুমি আমার খাবার হতে যা ইচ্ছা খাও]। এখানে অনুমতি ব্যাপকার্থে। অর্থাৎ, অল্প খাওয়ারও অনুমতি আছে আবার সবটুকু খাওয়ারও অনুমতি আছে। অনুরূপভাবে স্বামী যদি কাউকে বলে– طَلِّقْ مِنْ نِسَائِيْ مَنْ شَاءَتْ [আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যে চায়, তাকে তালাক প্রদান কর], তাহলে সবাই যদি তালাক চায়, তাহলে সবাইকে তালাক দিতে পারবে। এ দুটি উদাহরণে مِنْ অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপনের জন্য আসেনি; বরং সমগ্র পরিমাণের ব্যাখ্যার অর্থে এসেছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায় مِنْ ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– مِنْ অব্যয়টি প্রকৃতপক্ষে আংশিকতা জ্ঞাপক, আর مَا অব্যয়টি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। আর উভয় অর্থই কার্যকরী করা সম্ভব। যেমন আংশিক ও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হবে এভাবে যে, দুই এমন একটি সংখ্যা, যা 'এক' সংখ্যার হিসেবে ব্যাপকতা জ্ঞাপক এবং 'তিন' সংখ্যার হিসেবে আংশিকতা জ্ঞাপক। তবে 'এক' -কে এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইঙ্গিতসূচক হিসেবে। কেননা, যখন দুটি তালাক প্রয়োগের ইচ্ছাধিকার রয়েছে, তখন একটি তালাক প্রয়োগের ইচ্ছাধিকার থাকাটা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং আংশিকতা এবং ব্যাপকতা উভয় অর্থের উপর আমল করা সম্ভব বলে কোনোটিকেই পরিত্যাগ করা হবে না।

আর সাহেবাইন (র.) প্রমাণস্বরূপ যে দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন, তার জবাব হলো– উভয় মাসআলায় আংশিকতার অর্থ বর্জন করার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম উদাহরণে খুশি প্রকাশের ইঙ্গিত রয়েছে। আর এটা তখনই হবে, যখন সমস্ত খাবার গ্রহণের অনুমতি থাকবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে ইঙ্গিত হলো– বিশেষণের ব্যাপকতা। 'যে চায়' -এর মধ্যে চাওয়া বিশেষণটি ব্যাপক এ কারণে এ উদাহরণে হুকুমের মধ্যেও ব্যাপকতা আসবে।

স্বামী যদি طَلِّقْ مِنْ نِسَائِيْ مَنْ شَاءَتْ [আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যে চায়, তাকে তালাক প্রদান কর] - এ কথার স্থলে বলে– طَلِّقْ مِنْ نِسَائِيْ مَنْ شِئْتَ [অর্থাৎ, আমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যাকে তুমি ইচ্ছা কর, তাকে তালাক দাও], তাহলে একই ধরনের মতপার্থক্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, একজন স্ত্রী ব্যতীত সবাইকে তালাক দিতে পারবে, যাতে مِنْ অব্যয়টি দ্বারা আংশিকতা জ্ঞাপনের উপর আমল করা হয়। আর এখানে বিশেষণের ব্যাপকতা প্রকাশের ইঙ্গিত বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, কোনো পার্থক্য বিচার ছাড়া সব স্ত্রীকেই তালাক দিতে পারবে। কেননা, তাঁদের মতে مِنْ অব্যয়টি তালাকের জিনস [সমগ্র পরিমাণ] ব্যাখ্যার অর্থে এসেছে; আংশিকতা জ্ঞাপনের জন্য নয়।

بَابُ الْاَيْمَانِ فِى الطَّلَاقِ

وَإِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيْبَ النِّكَاحِ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ لِامْرَأَةٍ اِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَقَعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَنَا اَنَّ هٰذَا تَصَرُّفُ يَمِيْنٍ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِى الْحَالِ لِاَنَّ الْوُقُوْعَ عِنْدَ الشَّرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذٰلِكَ اَثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمُتَصَرِّفِ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى نَفْيِ التَّنْجِيْزِ وَالْحَمْلُ مَاثُوْرٌ عَنِ السَّلَفِ كَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا .

পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত তালাক

অনুবাদ : কেউ যদি তালাক প্রদানকে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে বিবাহের পরেই তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন– কেউ কোনো এক মহিলাকে বলল, তোমাকে যদি বিবাহ করি, তাহলে তুমি তালাক। কিংবা যে কোনো স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করব, সে তালাক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এতে তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ [বিবাহের পূর্বে তালাক নেই]। আমাদের দলিল হলো, শর্ত ও পরিণতি বিদ্যমান হওয়ার কারণে এটা শর্তারোপিত বিষয়। আর তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বর্তমানে বিবাহের মালিকানা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। কেননা, তালাক পতিত হবে শর্ত পাওয়ার সময়, আর তখন মালিকানা বিদ্যমান থাকা সুনিশ্চিত। শর্ত পাওয়ার পূর্বে তার কার্যকারিতা নিষিদ্ধ। আর তা বক্তব্য উচ্চারণকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আলোচ্য হাদীসটি তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকরী না হওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। এর উপর প্রয়োগ ইমাম শা'বী, যুহরী ও অন্যান্য পূর্ববর্তীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْاَيْمَانِ فِى الطَّلَاقِ : اَيْمَانٌ শব্দটি يَمِيْنٌ -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ– اَلْقُوَّةُ তথা শক্তি, বল। কবির ভাষায়– اِنَّ الْمَقَادِيْرَ بِالْاَوْقَاتِ نَازِلَةٌ ٭ وَلَا يَمِيْنَ عَلٰى دَفْعِ الْمَقَادِيْرِ অর্থাৎ 'তাকদীর যথাসময়েই আসে। তা প্রতিহত করার কোনো শক্তি নেই। কবিতায় يَمِيْنٌ শব্দটি اَلْقُوَّةُ [শক্তি] অর্থে এসেছে। ডান হাতকেও আরবিতে يَمِيْنٌ বলে; যেহেতু বাম হাতের তুলনায় তা অধিক শক্তিশালী। আল্লাহর নামে শপথ করাকেও يَمِيْنٌ বলা হয়। কেননা, শপথের মাধ্যমে শপথকৃত বস্তুটি পালন কিংবা বর্জনে জোর প্রদান করা হয়। আর তালাকের ক্ষেত্রে يَمِيْنٌ -এর অর্থ হলো– عِبَارَةٌ عَنْ تَعْلِيْقِهٖ بِاَمْرٍ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنَى الشَّرْطِ অর্থাৎ, তালাককে শর্তযুক্ত করা।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) প্রথমত শর্তমুক্ত/শর্তহীন তালাক ও তার প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন; অতঃপর শর্তযুক্ত তালাকের আলোচনা শুরু করেছেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, শর্তহীন তালাক হলো আসল, আর শর্তযুক্ত তালাক তার শাখা। আর মূল শাখার অগ্রবর্তী। অধিকন্তু শর্তযুক্ত তালাকের ক্ষেত্রে শর্তের হরফ উল্লেখ থাকে বলে তা مُرَكَّبٌ [যৌগিক]; পক্ষান্তরে শর্তহীন তালাক হলো مُفْرَدٌ [একক]। আর মূলনীতি হলো, একক যৌগিকের অগ্রবর্তী। এ কারণেই শর্তহীন তালাকের আলোচনা প্রথমে এবং শর্তযুক্ত তালাকের আলোচনা পরবর্তীতে উল্লিখিত হয়েছে।

–[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯; ফাতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০১]

قَوْلُهُ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি তালাক প্রদানকে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে– إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে তুমি তালাক] কিংবা كُلُّ إِمْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ [যে-কোনো স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করি, সে তালাক], তাহলে হানাফী মাযহাব অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া মাত্র তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ ধরনের কথায় তালাক হবে না। ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতও অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, সুনানে ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত হাদীস– لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ [বিবাহের পূর্বে তালাক নেই]। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার কোনো এক স্ত্রীলোককে বিবাহের সম্বন্ধ পাঠান। সে মহিলার অভিভাবক এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলে বসলেন– إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلٰثًا [যদি আমি তাকে বিবাহ করি, তাহলে সে তিন তালাক]। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ﷺ বললেন– لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ [বিবাহের পূর্বে তালাক নেই]। হযরত আলী (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত মু'আয (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে সে তালাক পতিত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, বক্তার বক্তব্যে শর্ত [شَرْط] ও পরিণতি [جَزَا] বিদ্যমান হওয়া-সাপেক্ষে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর শর্ত সহীহ হওয়ার জন্য বর্তমানে বিবাহের মালিকানা থাকা শর্ত নয়; বরং তালাক পতিত হওয়ার সময় মালিকানা থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যেহেতু শর্ত পাওয়ার সময় বৈবাহিক মালিকানা সুনিশ্চিতভাবে বিদ্যমান, সেহেতু তালাক তথা পরিণতি সাব্যস্ত হবে। আর শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বে বক্তব্যটির ক্রিয়া হলো, হলফকৃত বস্তু থেকে নিবারণ। আর তা হলফকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে সময় তালাকের পাত্র থাকা আবশ্যক নয়। শর্ত সহীহ হওয়ার জন্য উচ্চারণকারী/হলফকারীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা হয়, আলোচ্য হাদীসটি তাৎক্ষণিক তালাক কার্যকরী না হওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। হাদীসে বলা হয়েছে, বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু আমাদের আলোচনা হচ্ছে তালাক প্রদানকে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। সুতরাং এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা সঠিক হয়নি। এ হাদীস তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকরী না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শা'বী (র.), ইমাম যুহরী (র.) ও অন্যান্য পূর্ববর্তীগণ থেকে বর্ণিত রয়েছে। মূলত হানাফী ও শাফেয়ীগণের মাঝে তালাককে সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের মূল বিষয় হলো– শাফেয়ীগণের মতে, তালাককে সম্পৃক্তকরণকালে ও শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় বৈবাহিক মালিকানা তথা 'স্বামী-স্বত্ব' বিদ্যমান থাকা শর্ত। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকা শর্ত। সম্পৃক্তকরণকালে বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়।

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا : ইমাম শা'বী (র.) ও ইমাম যুহরী (র.) ছাড়া অন্যান্য পূর্ববর্তীগণ; যেমন– সালিম, কাসেম, ইবরাহীম নাখ'ঈ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, আসওয়াদ, আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান প্রমুখ।

وَإِذَا اَضَافَهُ اِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيْبَ الشَّرْطِ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ لِامْرَأَتِهِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَهٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِى الْحَالِ وَالظَّاهِرُ بَقَاءُهُ اِلَى وَقْتِ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ يَمِيْنًا اَوْ اِيْقَاعًا ـ

অনুবাদ : আর যদি তালাককে কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে তালাক শর্তের পরই পতিত হবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– 'তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক।' এটি সর্বসম্মত। কেননা, শর্ত আরোপের সময় বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। আর বাহ্যত শর্ত অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত তা [বৈবাহিক মালিকানা] বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং শর্তসাপেক্ষরূপে কিংবা তালাক প্রদান হিসেবে বক্তব্যটি সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا اَضَافَهُ اِلَى شَرْطٍ وَقَعَ الخ : কেউ যদি স্ত্রীর তালাক প্রদানকে ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ [তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক], তাহলে শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পরপরই অর্থাৎ, ঘরে প্রবেশের সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে। এটি সর্বসম্মত অভিমত। এর দলিল হিসেবে বলা হয়, শর্তযুক্ত বিষয় শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় শর্তহীন বিষয়ের মতোই হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِى الْحَالِ الخ : এর মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকাকালে শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পরপরই তালাক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তার বৈবাহিক মালিকানা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন– কেউ তার স্ত্রীকে শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই শর্তহীন তালাক প্রদান করল। সুতরাং বৈবাহিক মালিকানা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে স্বামীর শর্তারোপের বিষয়টি সহীহ না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উত্তর: এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শর্ত আরোপের সময় বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। আর শর্ত অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকার বিষয়টি স্বাভাবিক। কেননা, সাব্যস্তকৃত কোনো বিষয় সর্বদা বিদ্যমান থাকাটাই হলো আসল। বিশেষত বিবাহ, যা সারা জীবনের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং বৈবাহিক মালিকানা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে ধর্তব্য হবে না। আর শর্ত আরোপের সময় 'স্বামী-স্বত্ব' বিদ্যমান থাকার কারণে আমাদের মতে, বক্তব্যটি শর্ত সাপেক্ষরূপে সহীহ হবে, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, তালাক প্রদান হিসেবে বক্তব্যটি সহীহ হবে।

قَوْلُهُ يَمِيْنًا اَوْ اِيْقَاعًا : এ কথার দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মধ্যকার মতপার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তালাককে কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে [যেমন– স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক] ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বক্তব্য উচ্চারণকালে তালাক প্রদানের বিষয়টি পাওয়া যাওয়ার কারণে ঘরে প্রবেশের সাথে তালাক প্রদান সম্পৃক্ত হবে না; বরং তালাক পতিত হওয়া সম্পৃক্ত হবে। পক্ষান্তরে আমাদের মতে, বক্তব্য উচ্চারণকালে তার কথা শুধুমাত্র শর্তযুক্ত। আর শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় তালাক পতিত হবে। সুতরাং ঘরে প্রবেশের সময় স্বামী যেন বলল, তুমি তালাক। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উসূলুল ফিকহ -এর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفُهُ إِلَى مِلْكٍ لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ مُخِيفًا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالظُّهُورُ بِأَحَدِ هٰذَيْنِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَبِهِ. فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ تُطَلَّقْ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَمَا أَضَافَهُ إِلَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ وَلَابُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلُّ وَكُلَّمَا وَمَتَى وَمَتَى مَا لِأَنَّ الشَّرْطَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَلَامَةِ وَهٰذِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيهَا أَفْعَالٌ فَتَكُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ صِرْفٌ لِلشَّرْطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا وَكَلِمَةُ كُلٌّ لَيْسَ شَرْطًا حَقِيقَةً لِأَنَّ مَا يَلِيهَا اِسْمٌ وَالشَّرْطُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْأَجْزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ إِلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ لِتَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالْاِسْمِ الَّذِي يَلِيهَا مِثْلُ قَوْلِكَ كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ.

অনুবাদ : শর্তারোপকারী তালাকের অধিকারী না হলে কিংবা তালাককে অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত না করলে তালাককে শর্তযুক্ত করা সহীহ হবে না। কেননা, জাযা [শর্তের পরিণতি] -এর অস্তিত্ব সম্ভাবনাপূর্ণ হতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য সতর্ককারীরূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য। আর তখন শর্তারোপের মর্মার্থ তথা শক্তির প্রকাশ ঘটবে। আর পরিণতির সম্ভাব্যতা এই দুই অবস্থায় সাব্যস্ত হতে পারে। মালিকানার কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা স্বয়ং মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করার নামান্তর। কেননা, মালিকানার কারণ সাব্যস্ত হওয়ার সময় মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। সুতরাং পুরুষ যদি কোনো অপরিচিত মহিলাকে বলে, 'যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক', অতঃপর সে তাকে বিবাহ করে আর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে তালাক হবে না। কেননা, বক্তব্য উচ্চারণকারী [সে সময়] তালাকের মালিক নয় এবং তালাককে মালিকানা কিংবা মালিকানার সূত্র কোনোটার সাথেই সম্পৃক্ত করেনি। অথচ [এই] দু'টির কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। শর্তবাচক শব্দগুলো হলো– إِنْ [যদি], إِذَا - إِذَا مَا [যখন], كُلُّ [যে-কোনো], كُلَّمَا [যখনই], مَتَى - مَتَى مَا [যখন]। কেননা, শর্ত আলামতের অর্থ থেকে নির্গত। আর এ শব্দাবলির সাথে ক্রিয়া জড়িত। সুতরাং সেই ক্রিয়ার সংগঠন শর্তভঙ্গের আলামত হিসেবে গণ্য হবে। إِنْ [যদি] শব্দটি নিছক শর্তের জন্য ব্যবহৃত। কেননা, তাতে সময়ের কোনো অর্থ নেই। আর অন্যান্যগুলো তার [إِنْ-এর] অনুগামী। আর كُلُّ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে শর্তের জন্য নয়। কেননা, এর সংলগ্ন শব্দটি বিশেষ্য [إِسْم]। অথচ শর্ত হবে এমন একটি বিষয়, যার সাথে পরিণতি [جَزَاء] যুক্ত হয়। আর পরিণতি [جَزَاء] যুক্ত হয় ক্রিয়ার সঙ্গে। তবে كُلُّ [যে-কোনো] -কে শর্তবাচক অব্যয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তার সংলগ্ন বিশেষ্যটির সংলগ্ন একটি ক্রিয়ার কারণে। যেমন বলা হয়– كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ [যে-কোনো দাস আমি ক্রয় করব, সে স্বাধীন হবে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এখানে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হলো, তালাককে শর্তযুক্ত করা তখনই শুধু সহীহ হবে, যখন শর্তারোপকারী তালাকের অধিকারী হবে কিংবা তালাককে মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক]। এখানে শর্তারোপকারী অর্থাৎ, স্বামী তালাকের অধিকারী হওয়ার কারণে শর্তযুক্ত করা যথার্থ হয়েছে। কিংবা এক ব্যক্তি কোনো স্ত্রীলোককে বলল– إِنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তুমি তালাক]। এ স্থলে শর্তারোপকারী তালাককে মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে তালাককে শর্তযুক্ত করা যথার্থ হয়েছে। এর দলিল হলো– جَزَاءٌ তথা শর্তের পরিণতি -এর অস্তিত্ব সম্ভাবনাপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, যাতে তা সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য সতর্কবাণী হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সে সময় يَمِيْنٌ [শর্তারোপ] -এর মর্মার্থের প্রকাশ ঘটবে। আর يَمِيْنٌ -এর অর্থ হলো– 'নিবারণী শক্তি'। আর এই নিবারণী শক্তির প্রকাশ বর্ণিত দুটি অবস্থা তথা তালাকের অধিকারী হওয়া কিংবা তালাককে অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত করার সাথে সাব্যস্ত হয়। মালিকানার سَبَبٌ [সূত্র] -এর সাথে সম্পৃক্ত করা স্বয়ং মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করার নামান্তর। যেমন– إِنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ حُرٌّ [যদি আমি তোমাকে ক্রয় করি, তাহলে তুমি স্বাধীন] বক্তব্যটি إِنْ مَلَكْتُكِ فَأَنْتِ حُرٌّ [যদি আমি তোমার মালিক হই, তাহলে তুমি স্বাধীন] বক্তব্যের সমার্থক। –[ইনায়া]

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি অপরিচিত কোনো মহিলাকে বলে– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক]; এরপর সে ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বিবাহ করে এবং স্ত্রী হওয়ার পর ঐ মহিলা সেই গৃহে প্রবেশ করে, তাহলে তালাক হবে না। এ মাসআলাটি পূর্ববর্ণিত উসূলের একটি শাখা মাসআলা। এ ক্ষেত্রে তালাক না হওয়ার দলিল হলো, এ বক্তব্য উচ্চারণকারী ব্যক্তি শর্তারোপের সময় তালাকের মালিক ছিল না এবং তালাককে মালিকানা কিংবা মালিকানার সূত্র কোনোটির সাথেই সে সম্পৃক্ত করেনি। অথচ তালাককে মালিকানা কিংবা মালিকানা সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে বিবাহের পরে ঘরে প্রবেশ করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, এ মাসআলায় তালাক পতিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, কোনো বিষয়কে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করলে শর্ত বিদ্যমানকালে তা শর্তহীন বিষয়ের মতোই হয়। এর উত্তরে বলা হয়– কোনো বিষয়কে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করলে শর্ত বিদ্যমানকালে তা শর্তহীন বিষয়ের মতো তখনই হবে, যখন শর্তের সাথে সম্পৃক্তকরণ সহীহ্ হবে। বর্ণিত মাসআলায় শর্তের সাথে সম্পৃক্তকরণ সহীহ্ নয়। –[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৫]

قَوْلُهُ وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ وَإِذَا وَإِذَا مَا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) শর্তবাচক শব্দাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে اَلْفَاظٌ [শব্দের] উল্লেখ করেছেন; حُرُوْفٌ [শব্দের] উল্লেখ করেননি। কেননা, শর্তবাচক শব্দাবলির মধ্যে শুধুমাত্র إِنْ -حَرْفٌ [অব্যয়]। অন্যান্যগুলি إِسْمٌ [বিশেষ্য]। আর اَلْفَاظٌ বললে অব্যয় ও বিশেষ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণেই হিদায়া গ্রন্থকার (র.) حُرُوْفٌ না বলে اَلْفَاظٌ বলেছেন। শর্তবাচক শব্দগুলোর মধ্যে إن হলো আসল আর অন্যান্য শব্দগুলো إِنْ -এর অনুগামী।

গ্রন্থকার ৭ টি শর্তবাচক শব্দের উল্লেখ করেছেন। যথা– إِنْ [যদি] إِذَا . إِذَا مَا [যখন] كُلُّ [যে-কোনো] كُلَّمَا [যখনই] مَتٰى - مَتٰى مَا [যখন]। হযরত ইবনে নাফীস (র.) 'শরহুল মুফাসসাল' -এ আরো চারটি শর্তবাচক শব্দের উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো– مَنْ . مَا . مَهْمَا . أَيٌّ

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَلَامَةِ الخ : এখানে شَرْط -এর নামকরণ বর্ণনা করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর এ ইবারতটি বাহ্যিকভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, কর্তার বর্ণনানুসারে شَرْط নির্গত হয়েছে عَلَامَةٌ থেকে। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ, اِشْتِقَاقٌ -এর অর্থ হলো, দুটি শব্দের মাঝে শাব্দিক ও অর্থগত মিল থাকবে। কিন্তু عَلَامَةٌ ও شَرْط -এর মাঝে শব্দগত কোনো মিল নেই। তাই ব্যাখ্যাকারগণ হিদায়া গ্রন্থকারের এ উক্তিটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, شَرْط [رَاءٌ সাকিনযুক্ত] নির্গত হয়েছে شَرَط [رَاءٌ যবর যুক্ত] থেকে, যার অর্থ আলামত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [বস্তুত কিয়ামতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। [সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৮]। এ আয়াতে أَشْرَاطٌ অর্থ عَلَامَاتٌ [আলামত/লক্ষণসমূহ]।

قَوْلُهُ ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ صِرْفٌ لِلشَّرْطِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন- إِنْ অব্যয়টি নিছক শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়। শর্তবাচক শব্দগুলোর মধ্যে إِنْ অব্যয়টি হলো আসল। কেননা, إِنْ -এর মাঝে কালজনিত কোনো অর্থ নেই। আর অন্য শর্তবাচক শব্দগুলো إِنْ -এর অনুগামী। কেননা, সেগুলোতে إِنْ -এর অর্থ নিহিত রয়েছে।

كُلٌّ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে শর্তের জন্য নয়। কেননা, كُلٌّ -এর সংলগ্ন শব্দটি বিশেষ্য। অথচ شَرْط হলো তা-ই, যার সাথে কোনো جَزَاءٌ বা পরিণতি যুক্ত হয়। আর جَزَاءٌ বা পরিণতি যুক্ত হয় কোনো فِعْل [ক্রিয়া] -এর সাথে اِسْم [বিশেষ্য] -এর সাথে নয়। তবে كُلٌّ শব্দটিকে শর্তবাচক অব্যয়ের সাথে যুক্ত করার কারণ হলো- كُلٌّ শব্দের সাথে যে اِسْم মিলিত হয়, তার সাথে একটি فِعْل [ক্রিয়া] থাকে। সেটা হলো পরবর্তী جَزَاءٌ -এর শর্ত। যেমন বলা হয়- كُلُّ عَبْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ [যে-কোনো গোলাম আমি ক্রয় করব, সেটিই আজাদ হবে]। এ উদাহরণে كُلٌّ -এর সংলগ্ন اِسْم [বিশেষ্য] -টির সাথে একটি فِعْل [ক্রিয়া] সংশ্লিষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, شَرْط চার প্রকার। যথা- ১. شَرْعِيٌّ [শরয়ী শর্ত]। যেমন – নামাজ আদায়ের জন্য অজু করা শর্ত। ২. عَقْلِيٌّ [যৌক্তিক শর্ত]। যেমন- ইলমের জন্য জীবন শর্ত; জীবনের জন্য ইল্ম শর্ত নয়। ৩. عُرْفِيٌّ [পারিভাষিক শর্ত]। যেমন- ছাদে উঠার জন্য সুস্থতা শর্ত। ৪. لُغَوِيٌّ [আভিধানিক শর্ত]। যেমন- কেউ তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক। এ স্থলে তালাকের জন্য ঘরে প্রবেশ শর্ত। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৭]

قَالَ فَفِيْ هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ اِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ انْحَلَّتْ وَانْتَهَتِ الْيَمِيْنُ لِاَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُوْمِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً فَبِوُجُوْدِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُّ الشَّرْطُ وَلَا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِدُوْنِهِ اِلَّا فِيْ كَلِمَةِ كُلَّمَا فَاِنَّهَا تَقْتَضِيْ تَعْمِيْمَ الْاَفْعَالِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ الْاٰيَةَ وَمِنْ ضَرُوْرَةِ التَّعْمِيْمِ التَّكْرَارُ . قَالَ فَاِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَيْ بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ الْمَمْلُوْكَاتِ فِيْ هٰذَا النِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَاءُ وَبَقَاءُ الْيَمِيْنِ بِهٖ وَبِالشَّرْطِ وَفِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ (رح) وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সুতরাং এ সকল শব্দের ক্ষেত্রে যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন শর্তযুক্ত বিষয়টি শেষ হয়ে যাবে। কেননা, আভিধানিকভাবে শব্দগুলো ব্যাপকতা ও পৌনঃপুনিকতা দাবি করে না। সুতরাং কর্মটি একবার সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা শর্তের সমাপ্তি ঘটবে। আর শর্ত ব্যতীত শপথ তথা অঙ্গীকার অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে كُلَّمَا [যখনই] শব্দটি ব্যতিক্রম। কেননা, তা কর্মের ব্যাপকতা দাবি করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ الْاٰيَةَ [যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখনই ....]। কর্মের ব্যাপকতার অনিবার্য দাবি হলো পৌনঃপুনিকতা। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর অন্য স্বামীর পর যদি এ স্ত্রীকে বিয়ে করে এবং শর্তটি পুনরায় সংঘটিত হয়, তাহলে কিছুই হবে না। কেননা, পূর্ববর্তী বিবাহের সূত্রে লব্ধ তিন তালাকের অধিকার পূর্ণ প্রয়োগ করার জَزَاء [পরিণতি] অবশিষ্ট নেই। অথচ শর্ত ও পরিণতির বিদ্যমানতা দ্বারাই অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর ভিন্নমত আছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিষয়টি আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَفِيْ هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ اِذَا وُجِدَ الخ : كُلَّمَا শব্দটি ব্যতীত অন্যান্য শর্তবাচক শব্দগুলোর হুকুম হলো, শর্ত পাওয়া গেলে অঙ্গীকার শেষ হয়ে যাবে। কেননা, كُلَّمَا শব্দটি ব্যতীত অন্যান্য শর্তবাচক শব্দগুলো আভিধানিকভাবে ব্যাপকতা ও পৌনঃপুনিকতা দাবি করে না। তাই একবার ক্রিয়াটি পাওয়া গেলে শর্তের সমাপ্তি ঘটে। আর শর্ত ব্যতীত অঙ্গীকার অব্যাহত থাকে না। পক্ষান্তরে كُلَّمَا শব্দটি ক্রিয়ার ব্যাপকতা দাবি করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ [আর যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখনই সে চামড়ার পরিবর্তে তাদেরকে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যাতে তারা আজাব ভোগ করে। [সূরা নিসা : আয়াত-৫৬]। আর ক্রিয়ার ব্যাপকতা অনিবার্যভাবে পৌনঃপুনিকতা দাবি করে। এ কারণেই كُلَّمَا শব্দটির ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরও অঙ্গীকার অব্যাহত থাকে।

قَوْلُهُ قَالَ فَاِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ الخ : মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে كُلَّمَا শব্দ প্রয়োগ করে বলে- كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ [যখনই তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে, তখনই তুমি তালাক]; আর স্ত্রী পরপর তিনবার সেই ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে সে তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে। অতঃপর অন্য স্বামীর বিবাহ ও তালাক হওয়ার পর পূর্ববর্তী স্বামী যদি এ স্ত্রীকে আবার বিবাহ করে এবং শর্তটি পুনর্বার ঘটে অর্থাৎ, ঐ স্ত্রী পুনর্বার সেই ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে কোনো তালাক হবে না। কেননা, এ স্বামী পূর্ববর্তী বিবাহের সূত্রে প্রাপ্ত তিন তালাকের অধিকার পূর্ণ প্রয়োগ করেছে। সুতরাং جَزَاء [পরিণতি] অবশিষ্ট নেই। আর পরিণতি অবশিষ্ট না থাকায় অঙ্গীকারও শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অঙ্গীকার হলো শর্ত ও পরিণতির উল্লেখ। আর অঙ্গীকার শেষ হওয়ার কারণে ঘরে প্রবেশের পর তালাক পতিত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তাই এ সুরতে তালাক পতিত হবে না। তবে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, এ সুরতে তালাক পতিত হবে। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নতুন অভিমতও অনুরূপ। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

-[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮০]

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَىٰ نَفْسِ التَّزَوُّجِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ لِاَنَّ اِنْعِقَادَهَا بِاِعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ وَ ذٰلِكَ غَيْرُ مَحْصُوْرٍ قَالَ وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ لَا يُبْطِلُهَا لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ فَبَقِيَ وَالْجَزَاءُ بَاقٍ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ فَبَقِيَ الْيَمِيْنُ ثُمَّ اِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِيْ مِلْكِهِ اِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِاَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَلَا يَبْقَى الْيَمِيْنُ لِمَا قُلْنَا وَاِنْ وُجِدَ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ اِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاِنْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ .

অনুবাদ : আর كُلَّمَا [যখনই] শব্দটি যদি স্বয়ং বিবাহ শব্দের সাথে যুক্ত হয়; যেমন সে বলল– যখনই আমি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করব, তখনই সে তালাক হবে, তাহলে প্রতিবারই তালাক হবে। এমন কি অন্য স্বামীর ঘর করে আসার পরও। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামী যে তালাকের অধিকারী হয়, তার ভিত্তিতে শর্ত সংশ্লিষ্ট হয়েছে। আর বিবাহ অসংখ্য হতে পারে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অঙ্গীকারের [শর্ত উচ্চারণের] পর বৈবাহিক মালিকানার বিলুপ্তি শর্তকে বাতিল করে না। কেননা, শর্ত এখনো পাওয়া যায়নি। সুতরাং তা বহাল থাকবে। অন্যদিকে جَزَاءٌ [পরিণতি] -এর ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকার কারণে সেটাও বহাল রয়েছে। সুতরাং শর্তও বহাল থাকবে। অতঃপর যদি তালাকের মালিকানা বিদ্যমান অবস্থায় শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে অঙ্গীকার পূর্ণ হয়ে গেল এবং তালাক পতিত হবে। কেননা, শর্ত পাওয়া গেছে এবং ক্ষেত্রটি جَزَاءٌ [পরিণতি]-এর যোগ্য হয়েছে। সুতরাং جَزَاءٌ [পরিণতি] কার্যকর হবে। তবে শর্ত [অঙ্গীকার] অবশিষ্ট থাকবে না। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে শর্তটি যদি বৈবাহিক মালিকানার অবর্তমানে পাওয়া যায়, তাহলে শর্তের উপস্থিতির কারণে শর্ত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষেত্রটি না থাকার কারণে কোনো তালাক পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَىٰ نَفْسِ التَّزَوُّجِ الخ : **মাসআলা :** কেউ যদি স্বয়ং বিবাহ শব্দের সাথে كُلَّمَا শব্দটি যুক্ত করে বলে– كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ [যখনই আমি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করব, তখনই সে তালাক হবে], তাহলে সে ব্যক্তি যতবারই বিবাহ করবে, ততবারই তাঁর স্ত্রী তালাক হবে। এমন কি অন্য স্বামীর স্ত্রীত্বে থেকে আসার পরও। এর দলিল হলো– এ ক্ষেত্রে শর্ত সংশ্লিষ্ট হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামী যে তালাকের অধিকারী হয় তার ভিত্তিতে। আর বিবাহ অসংখ্য হতে পারে, তাই তালাকও অসংখ্য হবে। কেননা, সূত্রের পৌনঃপুনিকতা যার উপর সূত্র আরোপিত [مُسَبَّبٌ], তার পৌনঃপুনিকতা দাবি করে।

قَوْلُهُ فَإِنْ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অঙ্গীকারের পরে [শর্তারোপের পরে] যদি বৈবাহিক মালিকানা চলে যায়, তাহলে অঙ্গীকার [শর্ত] বাতিল হয় না। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক]; অতঃপর ঘরে প্রবেশের পূর্বে তাকে বায়েন তালাক প্রদান করল, তাহলে 'স্বামী-স্বত্ব' বিলুপ্তির কারণে শর্ত বাতিল হবে না; বরং পূর্ববর্তী শর্ত বহাল থাকবে। সুতরাং পুনঃবিবাহের পরে স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলে শর্ত কার্যকর হবে এবং তালাক হবে। এর দলিল হলো শর্ত ও جَزَاءْ [পরিণতি] -এর বিদ্যমানতার দ্বারাই অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে শর্ত এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি। সুতরাং তা বহাল রয়েছে। অন্যদিকে جَزَاءْ [পরিণতি]-এর ক্ষেত্র তথা স্ত্রীলোকটি বিদ্যমান থাকার কারণে جَزَاءْ [পরিণতি] -ও বহাল রয়েছে। সুতরাং শর্ত ও পরিণতি বিদ্যমান থাকার কারণে অঙ্গীকারও বহাল থাকবে।

প্রশ্ন: প্রশ্ন হতে পারে– আমরা মেনে নিলাম যে, এ ক্ষেত্রে جَزَاءْ [পরিণতি]-এর ক্ষেত্র বহাল রয়েছে। তবে পরিণতির জন্য বৈবাহিক মালিকানা জরুরি। অথচ এখানে বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান নেই। সুতরাং অঙ্গীকারও বহাল থাকবে না।

উত্তর : এর উত্তরে বলা হয়, আমাদের আলোচনা পরিণতি [جَزَاءْ] -এর সংঘটন নিয়ে নয়; বরং অঙ্গীকার [শর্ত] বহাল থাকা নিয়ে। আর প্রাথমিকভাবে শর্তের জন্য মালিকানা আবশ্যক নয়। যেমন– إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে তুমি তালাক] উচ্চারণের মাধ্যমে শর্তারোপ করা সহীহ। অথচ এখানে শর্তারোপকালে শর্ত উচ্চারণকারী তালাকের মালিক ছিল না। সুতরাং প্রাথমিকভাবে যেহেতু শর্তের জন্য মালিকানা আবশ্যক নয়, সেহেতু শর্ত বহাল থাকার জন্য মালিকানার আবশ্যকতা না হওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِىْ مِلْكِهِ الخ : তালাকের অধিকার বিদ্যমান অবস্থায় যদি শর্ত পাওয়া যায়; যেমন– সে ব্যক্তি ঐ মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করল, অতঃপর শর্ত পাওয়া গেল, তাহলে তালাক হয়ে যাবে এবং শর্তও পূর্ণ হয়ে যাবে। তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু [ঘরে প্রবেশ করা] তালাকের অধিকার বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট جَزَاءْ [পরিণতি] তথা তালাকও পতিত হবে। আর শর্ত পূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, বক্তব্যে إِنْ অব্যয়টি পৌনঃপুনিকতাকে নির্দেশ করে না। সুতরাং একবার শর্ত পাওয়া গেলেই শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যদি শর্তটি স্বামী-স্বত্বের অবর্তমানে সম্পন্ন হয়; যেমন– পুনরায় ঐ মহিলাকে বিবাহ করার আগেই শর্ত সম্পন্ন হয়, তাহলে তালাক হবে না, তবে শর্ত শেষ হয়ে যাবে। তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হলো এখানে তালাকের ক্ষেত্র নেই। আর শর্ত সম্পন্ন হওয়ার কারণে শর্ত পাওয়া গেছে।

وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ اِلَّا اَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ لِاَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْاَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَلِاَنَّهُ مُنْكِرٌ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ وَ زَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ . فَاِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ اِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِىْ حَقِّ نَفْسِهَا مِثْلَ اَنْ يَقُوْلَ اِنْ حِضْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ فَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ طُلِّقَتْ هِىَ وَلَمْ تُطَلَّقْ فُلَانَةٌ وَ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ اِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَّا يَقَعَ لِاَنَّهُ شَرْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِى الدُّخُوْلِ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهَا اَمِيْنَةٌ فِىْ حَقِّ نَفْسِهَا اِذْ لَا يُعْلَمُ ذٰلِكَ اِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا كَمَا قِيْلَ فِىْ حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْغِشْيَانِ وَلٰكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِىْ حَقِّ ضَرَّتِهَا بَلْ هِىَ مُتَّهَمَةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِىْ حَقِّهَا .

অনুবাদ : যদি শর্তের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হয়, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে স্ত্রী যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে [তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে]। কেননা, স্বামী মূল অবস্থার দাবিদার। আর সেটা হলো শর্তের অনুপস্থিতি। অধিকন্তু স্বামী তালাক পতিত হওয়া এবং অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, অপর পক্ষে স্ত্রী তা দাবি করেছে। আর যদি শর্তটি স্ত্রীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব না হয়, তাহলে তার নিজের ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। যেমন স্বামী যদি বলে, 'তুমি ঋতুমতী হলে তুমি এবং অমুক তালাক', আর স্ত্রী বলল, আমি ঋতুমতী হয়েছি, তাহলে সে নিজে তালাকপ্রাপ্তা হবে, কিন্তু অন্য স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। আর সাধারণ কিয়াসের দাবি হলো, তালাক পতিত না হওয়া। কেননা, ঋতুমতী হওয়ার বিষয়টি হলো শর্ত। ফলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; যেমন গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের ব্যাপারে আমানতদার। কেননা, বিষয়টি তার দিক থেকেই শুধু জানা সম্ভব। সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে; যেমন ইদ্দতের ব্যাপারে এবং সহবাসের বৈধতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু সতীনের ব্যাপারে সে হলো সাক্ষ্য প্রদানকারী; বরং তার বক্তব্য সন্দেহজনক। সুতরাং সতীনের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الشَّرْطِ الخ : শর্ত সম্পন্ন হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হলে [যেমন স্বামী বলল– শর্ত সম্পন্ন হয়নি, সুতরাং তালাকও হয়নি আর স্ত্রী বলল, শর্ত সম্পন্ন হয়েছে, সুতরাং তালাকও হয়েছে] স্ত্রীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন যে, স্বামী মূল অবস্থার দাবিদার। কেননা, মূল অবস্থা হলো শর্তের অনুপস্থিতি। যার বক্তব্য আসল অবস্থার পক্ষে, সে হলো مُدَّعٰى عَلَيْهِ তাহলে এখানে স্ত্রী مُدَّعِيَةٌ আর স্বামী مُدَّعٰى عَلَيْهِ আর হাদীসে এসেছে, مُدَّعِىْ -এর নিকটে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে مُدَّعٰى عَلَيْهِ -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, স্বামী তালাক পতিত হওয়া এবং অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। আর স্ত্রী উভয়টির দাবিদার। সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়; আর তাই আলোচ্য মাসআলাতেও স্ত্রীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهَا الخ : মাসআলা : যদি শর্তটি এমন হয় যা স্ত্রীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়, তাহলে শর্ত সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে তার কথা কেবল তার নিজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল- إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ - 'যদি তুমি ঋতুগ্রস্ত হও, তাহলে তুমি ও অমুক স্ত্রী তালাক'; পরে স্ত্রী বলল, আমি ঋতুগ্রস্ত হয়েছি, তাহলে তার ক্ষেত্রে তালাক হবে, কিন্তু তার সতীনের ক্ষেত্রে তালাক হবে না। এ সিদ্ধান্তটি অবশ্য স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর কথা অস্বীকার করে নেয়, তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রেই তালাক হবে।

আলোচ্য মাসআলায় তালাক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবি হচ্ছে, তালাক সাব্যস্ত না হওয়া। কেননা, স্বামীর উক্তি- إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ -এর মাঝে ঋতুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি হলো শর্ত। স্ত্রী এ শর্ত সম্পন্ন হওয়ার দাবিদার, আর স্বামী অস্বীকারকারী। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। এ কারণেই এখানে স্ত্রীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, ঘরে প্রবেশ করাকে শর্ত করে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক]; আর স্ত্রী বলে, শর্ত সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু স্বামী অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অপর দিকে সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, স্ত্রীলোকটি নিজের ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ হতে আমানতদার। কেননা, স্ত্রীলোকেরা তাদের জরায়ুতে যা কিছু আছে, তা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমানতদার এবং আদিষ্টও বটে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ - "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়।" [সূরা বাকারা- ২২৮]। স্ত্রীলোক নিজের ব্যাপারে আমানতদার হওয়ার কারণ হলো, ঋতুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি তার দিক থেকেই শুধু বলা সম্ভব। আর মূলনীতি হলো, আমানতদারের কথা তার নিজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই স্ত্রীলোকটির কথা এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন- ইদ্দত ও সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়।

ইদ্দতের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মর্মার্থ হলো, স্ত্রী বলল- আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে কিংবা শেষ হয়নি; এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; স্বামীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ স্ত্রী যদি বলে, আমি এখন সহবাসের উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

সতীনের ব্যাপারে স্ত্রীর ভূমিকা হলো সাক্ষ্য প্রদানকারীর; বরং তার বক্তব্য সন্দেহজনক। কেননা, কখনো কখনো ব্যক্তির মনে এমন জেদের উদ্রেক ঘটে যে, আমি থাকি বা না থাকি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন না থাকে। আর তাই সতীনের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ اَنْ يُعَذِّبَكِ اللّٰهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِيْ حُرٌّ فَقَالَتْ اُحِبُّهُ اَوْ قَالَ اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِيْ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَهٰذِهٖ مَعَكِ فَقَالَتْ اُحِبُّكَ طُلِّقَتْ هِيَ وَلَمْ يَعْتِقِ الْعَبْدُ وَلَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يَتَيَقَّنُ بِكِذْبِهَا لِاَنَّهَا لِشِدَّةِ بُغْضِهَا اِيَّاهُ قَدْ تُحِبُّ التَّخْلِيْصَ مِنْهُ بِالْعَذَابِ وَفِيْ حَقِّهَا اِنْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِاَخْبَارِهَا وَاِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَفِيْ حَقِّ غَيْرِهَا بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى الْاَصْلِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে স্বামী যদি বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুনে আজাব দেবেন, তুমি যদি এটা পছন্দ কর, তাহলে তুমি তালাক এবং আমার দাস আজাদ। আর স্ত্রী উত্তরে বলল, আমি তা পছন্দ করি; কিংবা স্বামী বলল, তুমি যদি আমাকে ভালোবাস, তাহলে তুমি এবং তোমার সাথে এই স্ত্রীও তালাক। আর উত্তরে স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে সে নিজে তালাকপ্রাপ্তা হবে, কিন্তু দাস মুক্ত হবে না এবং সতীনেরও তালাক হবে না। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। স্ত্রী মিথ্যা বলেছে– এটা নিশ্চিত নয়। কেননা, স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণে সে তার থেকে আজাবের বিনিময়ে হলেও মুক্ত হতে পছন্দ করে। আর তার নিজের ক্ষেত্রে হুকুমটি তার বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যদিও সে মিথ্যাবাদী হয়। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি মূলের উপর তথা ভালোবাসা ও পছন্দের উপর বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ الخ : এখানে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) দুটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। প্রথম মাসআলাটি হলো, স্বামী যদি জাহান্নামের আজাব পছন্দ করার উপর স্ত্রীর তালাক এবং গোলাম আজাদকে সম্পৃক্ত করে বলে– اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ اَنْ يُعَذِّبَكِ اللّٰهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِيْ حُرٌّ - অর্থাৎ, 'তুমি যদি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুনে আজাব দেবেন, তাহলে তুমি তালাক এবং আমার গোলাম আজাদ।' এর উত্তরে স্ত্রী বলে, 'আমি জাহান্নামের আজাব পছন্দ করি', তাহলে তার এ কথা তার নিজের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে তালাক হয়ে যাবে, কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং দাস মুক্তও হবে না।

দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো, স্বামী যদি নিজেকে ভালোবাসার উপর স্ত্রী ও তার সতীনের তালাককে সম্পৃক্ত করে বলে– اِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِيْ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَهٰذِهٖ مَعَكِ - 'যদি তুমি আমাকে ভালোবাস, তাহলে তুমি এবং তোমার সাথে এই স্ত্রীটিও তালাক', আর স্ত্রী উত্তরে বলে– 'আমি তোমাকে পছন্দ করি', সে-ই শুধু তালাক হয়ে যাবে; তার সতীন তালাক হবে না। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকটি নিজের ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ হতে আমানতদার। আর সতীন ও গোলামের ব্যাপারে সে হলো সাক্ষ্য প্রদানকারী। আর আমানতদারের বক্তব্য শুধু তার ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য; অন্যের ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلَا يَتَيَقَّنُ بِكِذْبِهَا الخ : এ বাক্যের দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, স্ত্রীর বক্তব্য নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো, স্ত্রী নিজের বক্তব্যে সত্যবাদী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'সে জাহান্নামের শাস্তি পছন্দ করে' -এ বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কেননা, কোনো মুসলমান জাহান্নামের শাস্তিকে পছন্দ করতে পারে না। সুতরাং তার বক্তব্য মিথ্যা হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

উত্তর: এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্ত্রীলোকটিকে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী বলা যায় না। কেননা, স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্বেষের কারণে মূর্খতাবশত আজাবের বিনিময়ে হলেও স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা সে পোষণ করতে পারে সুতরাং তাকে তার বক্তব্যের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী বলা যায় না বলে ভালোবাসা ও পছন্দ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত শুধু নিজের ক্ষেত্রে তার বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যদিও সে মিথ্যাবাদী হয়। আর অন্যের ক্ষেত্রে তথা গোলাম আজাদ ও সতীন তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি মূল বিষয় তথা ভালোবাসা ও পছন্দের উপর বহাল থাকবে। তার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না; বরং যেহেতু জাহান্নাম পছন্দ না করা এবং এ ধরনের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা না থাকাই হলো স্বাভাবিক অবস্থা, সেহেতু অন্যের ক্ষেত্রে আসল ও স্বাভাবিক অবস্থার উপরই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে।

وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَسْتَمِرَّ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ مَا يَنْقَطِعُ دُوْنَهُ لَا يَكُوْنُ حَيْضًا فَإِذَا تَمَّتْ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِيْنِ حَاضَتْ لِأَنَّهُ بِالْإِمْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ . وَلَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا لِأَنَّ الْحَيْضَةَ بِالْهَاءِ هِيَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا وَلِهٰذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِيْ حَدِيْثِ الْإِسْتِبْرَاءِ وَكَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَ ذٰلِكَ بِالطُّهْرِ .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি তাকে বলে, যখন তুমি ঋতুগ্রস্তা হবে, তখন তুমি তালাক; অতঃপর সে রক্তস্রাব দেখতে পেল, তাহলে তিনদিন স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা, এর চেয়ে কম সময়ে যে রক্তস্রাব বন্ধ হবে, তা হায়েজ বলে গণ্য হবে না। যখন তিনদিন পূর্ণ হবে তখন আমরা হায়েজের সূচনা সময় থেকে তালাকের হুকুম আরোপ করব। কেননা, প্রলম্বিত হওয়ার ফলে জানা গেল যে, এটা জরায়ু থেকে নির্গত হয়েছে। সুতরাং শুরু থেকেই তা হায়েজ বলে গণ্য হবে। আর স্বামী যদি বলে, যখন তোমার একটি হায়েজ হবে, তখন তুমি তালাক, তাহলে হায়েজ থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা, হায়জা -এর 'তা' দ্বারা পূর্ণ একটি হায়েজ বুঝায়। এ কারণেই হাদীসে ইসতিবরাতে [মুদ্দতবিহীন সহবাসের বৈধতার ব্যাপারে জরায়ু মুক্ত হওয়া সংক্রান্ত হাদীস] حَيْضَةً [হায়যা] শব্দটিকে পূর্ণ হায়েজ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর হায়েজ শেষ হওয়ার দ্বারাই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আর তা হয় পবিত্রতার দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যখন তুমি ঋতুমতী হবে, তখন তুমি তালাক] আর স্ত্রী রক্তস্রাব দেখতে পায়, তাহলে তালাক হবে না; যতক্ষণ না রক্তস্রাব তিনদিন স্থায়ী হয়। দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের হানাফীদের মতে, হায়েজের নিম্নসীমা তিনদিন ও তিনরাত। সুতরাং এর কম সময়ে যে রক্তস্রাব বন্ধ হবে, তা হায়েজ বলে গণ্য হবে না; বরং তা ইস্তিহাযা। তবে রক্তস্রাব তিনদিন পূর্ণ হলে হায়েজের সূচনাকাল থেকে তালাকের হুকুম আরোপিত হবে। কেননা, রক্তস্রাব তিনদিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার কারণে জানা গেল যে, এ রক্ত জরায়ু থেকে নির্গত হয়েছে। সুতরাং সূচনাকাল থেকেই তা হায়েজ হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট অবশ্য একদিন ও একরাত্রি অতিবাহিত হলেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। [আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৫]

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ [যখন তোমার একটি হায়েজ হবে, তখন তুমি তালাক], তাহলে হায়েজ থেকে পবিত্র না হলে সে তালাক হবে না। এর দলিল হলো- حَيْضَةً -এর تَاءْ দ্বারা পূর্ণ একটি হায়েজ বুঝা যায়। আর হায়েজ শেষ হওয়ার দ্বারাই হায়েজ -এর পূর্ণতা হয়। আর হায়েজ শেষ হয় পবিত্র হওয়ার মাধ্যমে। এ কারণেই حَدِيْثُ الْإِسْتِبْرَاءِ [মুদ্দতহীন সহবাসের বৈধতার ব্যাপারে জরায়ু মুক্ত হওয়া সংক্রান্ত হাদীস] -তে حَيْضَةً শব্দটিকে পূর্ণ হায়েজ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসের ইবারত নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَغَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ تَحِيْضَ حَيْضَةً . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাস গোত্রের যুদ্ধবন্দিনীদের সম্পর্কে বলেছেন, কোনো গর্ভবতীর সঙ্গে গর্ভ প্রসবের পূর্বে এবং অগর্ভবতীর সঙ্গে এক হায়েজের পূর্বে সহবাস করা যাবে না। -[আবূ দাউদ] আলোচ্য হাদীসে حَيْضَةً দ্বারা পূর্ণ একটি হায়েজ উদ্দেশ্য।

وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا طُلِّقَتْ حِيْنَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُوْمُ لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا صُمْتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِمِعْيَارٍ وَقَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدْتِ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيْقَةٌ وَفِي التَّنَزُّهِ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ لِأَنَّهَا لَوْ وَلَدَتِ الْغُلَامَ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخْرَى بِهِ لِأَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغُلَامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شَيْءٌ آخَرُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ حَالُ الْانْقِضَاءِ فَإِذَا فِي حَالٍ يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ يَقَعُ ثِنْتَانِ فَلَا يَقَعُ الثَّانِيَةُ بِالشَّكِّ وَالْاِحْتِمَالِ وَالْأَوْلَى أَنْ نَأْخُذَ بِالثِّنْتَيْنِ تَنَزُّهًا أَوْ احْتِيَاطًا وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِيْنٍ لِمَا بَيَّنَّا.

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তাকে বলে, 'যখন তুমি একদিন রোজা রাখবে, তখন তুমি তালাক; তাহলে যেদিন সে রোজা রাখবে, সেদিন সূর্যাস্তের সময় থেকে তালাক হবে। কেননা, দিনকে যখন প্রলম্বিত কোনো ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়, তখন দিবসের আলোকিত অংশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তাকে বলে, 'যখন তুমি রোজা রাখবে।' [তাহলে রোজা শুরু করা মাত্র তালাক হয়ে যাবে] কেননা, সে রোজাকে সময় দ্বারা আবদ্ধ করেনি। আর রোজা অস্তিত্ব লাভ করেছে রোকন ও শর্তসহ। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি পুত্র সন্তান প্রসব কর, তাহলে তুমি এক তালাক, আর যদি তুমি কন্যা সন্তান প্রসব কর, তাহলে তুমি দুই তালাক। অতঃপর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল, তবে কোনটি প্রথম তা জানা যায়নি, তাহলে আদালতের বিচারে এক তালাক পতিত হবে, আর সন্দেহমুক্ত হিসেবে দুই তালাক পতিত হবে এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, সে যদি প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে থাকে, তাহলে এক তালাক হবে এবং কন্যা সন্তান প্রসব হওয়ার দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হবে। অপর প্রসব দ্বারা তালাক পতিত হবে না। কেননা, তা ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা। আর যদি প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করে, তাহলে দুই তালাক পতিত হবে এবং পুত্র সন্তান প্রসব দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হবে। এই প্রসব দ্বারা তালাক হবে না। কেননা, আমরা উল্লেখ করেছি যে, তা হলো ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা। সুতরাং এক অবস্থায় এক তালাক হচ্ছে, আরেক অবস্থায় দুই তালাক হচ্ছে। অতএব সন্দেহ ও সম্ভাবনার কারণে দ্বিতীয় তালাকটি পতিত হবে না। তবে উত্তম হলো, আমরা দুই তালাকের সিদ্ধান্ত নেব সন্দেহমুক্ত ও সতর্কতার দিক থেকে। আর ইদ্দত নিশ্চিতভাবেই পূর্ণ হয়ে যাবে– পূর্ববর্ণিত কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا অর্থাৎ, 'যখন তুমি রোজা রাখবে, তখন তুমি তালাক', তাহলে স্ত্রী রোজা রাখার দিন সূর্যাস্তের সময় থেকে তালাক হবে। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন– يَوْمٌ [দিন] -কে যখন কোনো প্রলম্বিত কাজের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন 'দিন' দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; সাধারণ সময় বুঝায় না। আলোচ্য মাসআলায় 'রোজা' একটি প্রলম্বিত কাজ। সুতরাং يَوْمٌ [দিন] দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশ উদ্দেশ্য হবে। আর তালাক পতিত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দিন রোজা রাখা শর্ত হবে। সুতরাং শর্ত পাওয়া গেলে তালাক হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ – 'যখন তুমি রোজা রাখবে, তখন তুমি তালাক' অর্থাৎ, 'দিন' -এর উল্লেখ না করে, তাহলে রোজা শুরু করা মাত্র তালাক হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী এখানে রোজাকে তার সময়কাল দ্বারা আবদ্ধ করেনি। সাধারণভাবে রোজা কর্মটি রোকন ও শর্তসহ অস্তিত্ব লাভ করে ফেলেছে। এ কারণেই তালাক পতিত হবে।

উল্লেখ্য, রোজার রুকন হলো– اَلْمُفْطِرَاتُ الثَّلَاثُ তথা খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রীসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। আর শর্ত হলো– নিয়ত করা, হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدْتِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– إِذَا وَلَدْتِ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ অর্থাৎ, তুমি যদি পুত্র সন্তান প্রসব কর, তাহলে তুমি এক তালাক; আর তুমি যদি কন্যা সন্তান প্রসব কর, তাহলে তুমি দুই তালাক; আর স্ত্রী একই সঙ্গে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল, তাহলে কয়েকটি সুরত হতে পারে। যথা– ১. যদি জানা যায়, প্রথম পুত্র সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে এক তালাক সাব্যস্ত হবে এবং কন্যা সন্তান প্রসব হওয়ার দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত হলো গর্ভপাত। এরপরে আর কোনো তালাক পতিত হবে না। ২. যদি জানা যায় যে, প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে এবং পরবর্তী পুত্র সন্তান প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। ৩. যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হয়; যেমন স্বামী বলে– প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব হয়েছে; আর স্ত্রী বলে– প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব হয়েছে, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী অতিরিক্ত তালাককে অস্বীকার করছে। ৪. যদি জানা না যায় কোনটি প্রথমে হয়েছে [কিতাবে বর্ণিত আলোচ্য মাসআলা], তাহলে আদালতের বিচারে এক তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা, একটি তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তবে সন্দেহমুক্ততার দৃষ্টিতে দীনি বিচারে দুই তালাক পতিত হবে।

এর দলিল হলো, যদি প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে, তাহলে এক তালাক হবে এবং কন্যা সন্তান প্রসব দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হবে। কেননা, পুত্র সন্তান প্রসবের পরে এই মহিলা গর্ভবতী। আর গর্ভবতীর ইদ্দত হলো গর্ভপাত। আর এই কন্যা সন্তান প্রসবের দ্বারা কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ সময়টি ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা। আর তা বৈবাহিক সম্পর্কের পরিসমাপ্তির সময়। তাই এ সময় অন্য কিছু কার্যকরী হবে না।

আর যদি প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করে, তাহলে দুই তালাক হবে এবং পুত্র সন্তান প্রসবের দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হবে। আর এ পুত্র সন্তান প্রসবের কারণে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। পূর্ববর্তী দলিলের কারণে যে, এ প্রসবটি হলো ইদ্দত সমাপ্তির অবস্থা। মোটকথা, এক অবস্থায় এক তালাক সাব্যস্ত হবে, আরেক অবস্থায় দুই তালাক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং একটি তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। আর দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। তাই নিছক সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে দ্বিতীয় তালাকটি সাব্যস্ত হবে না। এ কারণেই আদালতের বিচারে এক তালাক পতিত হবে। তবে সন্দেহমুক্ততা ও সতর্কতার দিক থেকে দুই তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়াই উত্তম। আর উপরিউক্ত দলিলের কারণে ইদ্দত নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍو وَأَبَا يُوْسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا عَمْرٍو ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ أَبَا يُوْسُفَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلْثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُوْلٰى وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَقَعُ وَهٰذِهِ عَلٰى وُجُوْهٍ مَا إِنْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ فِي الْمِلْكِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهٰذَا ظَاهِرٌ أَوْ وُجِدَا فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِيْ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَيْضًا لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَنْزِلُ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأَوَّلُ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِيْ فِي الْمِلْكِ وَهِيَ مَسْئَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ لَهُ اِعْتِبَارُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِيْ إِذْ هُمَا فِيْ حُكْمِ الطَّلَاقِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَنَا أَنَّ صِحَّةَ الْكَلَامِ بِأَهْلِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَّا أَنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ حَالَةَ التَّعْلِيْقِ لِيَصِيْرَ الْجَزَاءُ غَالِبَ الْوُجُوْدِ لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَيَصِحُّ الْيَمِيْنُ وَعِنْدَ تَمَامِ الشَّرْطِ لِيَنْزِلَ الْجَزَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَفِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ الْحَالُ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِيْنِ فَيَسْتَغْنِيْ عَنْ قِيَامِ الْمِلْكِ إِذْ بَقَاؤُهُ بِمَحَلِّهِ وَهُوَ الذِّمَّةُ.

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তাকে বলে, তুমি যদি আবূ আমর ও আবূ ইউসুফের সঙ্গে কথা বল, তাহলে তুমি তিন তালাক। এরপর স্বামী তাকে এক তালাক দিল এবং সে বায়েনপ্রাপ্ত হলো ও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল অতঃপর আবূ আমরের সাথে কথা বলল। এরপর স্বামী আবার তাকে বিবাহ করল। অতঃপর সে আবূ ইউসুফের সঙ্গে কথা বলল, তাহলে পূর্ববর্তী এক তালাকের সাথে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তালাক হবে না। এ মাসআলার বিভিন্ন সুরত রয়েছে। প্রথমত, যদি বৈবাহিক মালিকানায় উভয় শর্ত সম্পন্ন হয়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, যদি উভয় শর্ত বৈবাহিক মালিকানাবিহীন অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে তালাক হবে না তৃতীয়ত, যদি প্রথম শর্তটি বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি বৈবাহিক মালিকানা অবিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তখনও তালাক হবে না। কেননা, جَزَاءٌ [পরিণতি] বৈবাহিক মালিকানা না থাকা অবস্থায় পতিত হয় না। সুতরাং তালাক হবে না। চতুর্থত, প্রথম শর্তটি বৈবাহিক মালিকানার অবিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়– এটিই হলো কিতাবে বর্ণিত বিরোধপূর্ণ মাসআলা। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, প্রথম শর্তটিকে দ্বিতীয় শর্তের উপর কিয়াস। কেননা, তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে উভয় শর্ত অভিন্ন শর্তের মতো। আর আমাদের দলিল হলো, বক্তার যোগ্যতার উপর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল তবে বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকা শর্ত– শর্ত আরোপের সময় যাতে চলমান অবস্থার নিরিখে পরিণতির অস্তিত্ব সুসম্ভাব্য হয় এবং শর্ত শুদ্ধ হয় এবং শর্ত সম্পূর্ণ হওয়ার সময়ও যাতে পরিণতি সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা, তা বৈবাহিক মালিকানা ছাড়া পতিত হয় না। অপর পক্ষে এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হলো শর্ত বিদ্যমান থাকার অবস্থা। সুতরাং তখন বৈবাহিক মালিকানা বিদ্যমান থাকার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় গণ্য হবে। কেননা, শর্তের বিদ্যমানতা ক্ষেত্রের বিদ্যমানতার সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো শর্ত আরোপকারীর জিম্মা তথা দায়িত্ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍو وَأَبَا يُوسُفَ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে- إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍو الخ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا [যদি তুমি আবূ আমর ও আবূ ইউসুফের সঙ্গে কথা বল, তাহলে তুমি তিন তালাক]; অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাক দিল এবং স্ত্রী বায়েনা হয়ে গেল; আর তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল; এরপর বিবাহ বিচ্ছেদ অবস্থায় সে আবূ আমরের সাথে কথা বলল; অতঃপর স্বামী তাকে আবার বিবাহ করল এবং স্ত্রী অবস্থায় সে আবূ ইউসুফের সাথে কথা বলল, তাহলে পূর্ববর্তী এক তালাকের সাথে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, কোনো তালাক পতিত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলার কয়েকটি সুরত আছে। যথা- ১. উভয় শর্ত যদি স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, তালাকের শর্ত স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। ২. উভয় শর্ত যদি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তালাক পতিত হবে না। ৩. প্রথম শর্তটি যদি স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে এ সুরতেও তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, جَزَاءٌ [পরিণতি] তথা তালাক স্বামী-স্বত্ব না থাকা অবস্থায় পতিত হয় না; তাই তালাক হবে না। ৪. প্রথম শর্তটি যদি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় এবং দ্বিতীয় শর্তটি বিদ্যমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়, [কিতাবের মতনে বর্ণিত আমাদের ও ইমাম যুফার (র.) -এর মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মাসআলা], তাহলে আমাদের মতে, পূর্ববর্তী এক তালাকের সাথে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে, আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, কোনো তালাক পতিত হবে না।

এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, তিনি প্রথম শর্তটিকে দ্বিতীয় শর্তের নিরিখে কিয়াস করেন। এর মর্মার্থ দুটি- প্রথমত, দ্বিতীয় শর্তটি যদি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে পরিণতি তথা তালাক সাব্যস্ত হবে না। তদ্রূপ প্রথম শর্তটি যদি স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তালাক সাব্যস্ত না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শর্তের সময় তালাক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেরূপ স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকা শর্ত, তদ্রূপ প্রথম শর্তটি সম্পন্ন হওয়ার সময়ও তালাক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকা শর্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা, তালাক সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে উভয় শর্ত মূলত অভিন্ন শর্তের মতো। আর যদি একটি শর্ত হয়, তাহলে স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় তালাক পতিত হয় না। সুতরাং এখানেও স্বামী-স্বত্ব অবিদ্যমান অবস্থায় তালাক সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বক্তার বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। বক্তা বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ফলে বক্তব্য প্রদানে গ্রহণযোগ্য হয়। এ কারণেই বক্তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর শর্তের ক্ষেত্র হলো শর্তারোপকারীর জিম্মা তথা দায়িত্ব।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ الْمِلْكَ يُشْتَرَطُ الخ : এ বাক্যের মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হচ্ছে, বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতার জন্য যখন বক্তার বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতাই যথেষ্ট এবং শর্তের ক্ষেত্র হলো বক্তব্য উচ্চারণকারীর জিম্মা, তখন শর্তারোপের সময় স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকার শর্ত কেন করা হলো?

উত্তর: এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শর্তারোপের সময় স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকার শর্ত এজন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে চলমান অবস্থার [যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তার না থাকার প্রমাণ যেহেতু নেই, সেহেতু উক্ত অবস্থায়ই বহাল রয়েছে বলে ধরে নেওয়া] নিরিখে পরিণতি [جَزَاءٌ] -এর অস্তিত্ব সুসম্ভাব্য হয়। অর্থাৎ, শর্তারোপের সময় যখন স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকে তখন চলমান অবস্থার নিরিখে শর্ত সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার অস্তিত্ব সুসম্ভাব্য। আর যখন পরিণতির অস্তিত্ব সুসম্ভাব্য হয়, তখন শর্ত শুদ্ধ হয়। আর শর্ত সম্পন্ন হওয়ার সময়ও স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাতে পরিণতি [جَزَاءٌ] সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা, পরিণতির অস্তিত্ব তথা তালাক স্বামী-স্বত্বের বিদ্যমানতা ছাড়া পতিত হতে পারে না। আর শর্তায়ন ও শর্তের অস্তিত্ব লাভ- এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হলো শর্ত বাক্যের বিদ্যমান থাকার অবস্থা। আর শর্ত বহালের ক্ষেত্রে স্বামী-স্বত্বের বিদ্যমানতার প্রয়োজন নেই। কেননা, শর্ত বাক্যের বিদ্যমানতা তার ক্ষেত্রের বিদ্যমানতার সাথে সম্পৃক্ত। আর ক্ষেত্র হলো শর্তারোপকারীর জিম্মা, যা সর্বদা বিদ্যমান। এ কারণেই মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী-স্বত্বের বিদ্যমান থাকার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় গণ্য হবে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا فَطَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا اٰخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَأَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) هِىَ طَالِقٌ مَا بَقِىَ مِنَ الطَّلَقَاتِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) وَأَصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِىَ يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُوْدُ إِلَيْهِ بِالثَّلٰثِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَ زُفَرَ (رح) لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ فَتَعُوْدُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِىَ وَسَنُبَيِّنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তিন তালাক; এরপর সে স্ত্রীকে দুই তালাক দিল, আর [তালাকপ্রাপ্তা] স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করল এবং সে স্বামী তার সাথে সহবাস করল, অতঃপর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এল এবং ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, তিন তালাক হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তিন তালাকের অবশিষ্ট তালাকটি পতিত হবে। এটি ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত। মতপার্থক্যের মূল হলো– শায়খাইনের মতে, তিনের কমসংখ্যক তালাকগুলো দ্বিতীয় স্বামী দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসবে তিন তালাক সহ। অপর পক্ষে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তিনের কম সংখ্যক তালাকগুলো বিলুপ্ত হবে না। সুতরাং স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর নিকট শুধু অবশিষ্ট তালাক সহ ফিরে আসবে। পরবর্তীতে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا - 'যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তিন তালাক' এরপর সে তাৎক্ষণিকভাবে স্ত্রীকে দুই তালাক দিল; আর এই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকটি ইদ্দত পূর্ণ করে অন্য স্বামীকে বিয়ে করল এবং তার সাথে সহবাস করল, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পূর্ণ করার পর আবার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এল এবং উক্ত ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তিন তালাকের অবশিষ্ট যে একটি তালাক রয়েছে, তা-ই পতিত হবে। এটি ইমাম যুফার (র.) -এরও অভিমত। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের একটি জামাত থেকে এরূপ মতামতই বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِىَ الخ : এ মতপার্থক্যের মূলভিত্তি হলো, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তিনের কম সংখ্যক তালাকগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এ স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর নিকট শর্তসাপেক্ষ তিন তালাক সহ ফিরে আসবে। অপর দিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তিনের কম সংখ্যক তালাকগুলো দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না। সুতরাং স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর নিকট শুধু অবশিষ্ট তালাকসহ ফিরে আসবে। পরবর্তীতে এ মাসআলাটি সবিস্তারে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَقَعُ الثَّلٰثُ لِأَنَّ الْجَزَاءَ ثَلٰثٌ مُطْلَقٌ لِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَقَدْ بَقِيَ إِحْتِمَالُ وُقُوْعِهَا فَيَبْقَى الْيَمِيْنُ وَلَنَا أَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هٰذَا الْمِلْكِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَانِعَةُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ وَالْيَمِيْنُ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ أَوِ الْحَمْلِ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ فَاتَ بِتَنْجِيْزِ الثَّلٰثِ الْمُبْطِلِ لِلْمَحَلِّيَّةِ فَلَا تَبْقَى الْيَمِيْنُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَبَانَهَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقٍ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ .

অনুবাদ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তিন তালাক' অতঃপর স্বামী বলল, 'তুমি তিন তালাক'। এরপর স্ত্রীলোকটি অন্যকে বিবাহ করল এবং সহবাস হলো অতঃপর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এল; তারপর উক্ত ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে কিছুই হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা, পরিণতি হলো শর্তমুক্ত তিন– শব্দটি শর্তমুক্ত থাকার কারণে। আর তিন তালাকের অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং শর্তটিও বহাল থাকবে। আমাদের দলিল হলো, পরিণতি হচ্ছে বর্তমান বৈবাহিক মালিকানার তিন তালাক। কেননা, এই তিন তালাকই [ঘরে প্রবেশ করা থেকে] নিবারণকারী। কারণ, যে মালিকানা [দ্বিতীয় বিবাহের পর] সৃষ্টি হবে তার অনস্তিত্ব দৃশ্যমান। অথচ শর্তারোপ করা হয় নিবারণ কিংবা উদ্বুদ্ধকরণের জন্য। আর আমরা যা [তিন তালাক] উল্লেখ করলাম, সেটাই যখন পরিণতি [جزاء] হলো, সেটা নিঃশর্ত তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে গেছে, যেটা [তিন তালাক] ক্ষেত্র হওয়ার যোগ্যতাকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং শর্তারোপের কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকবে না। অপর পক্ষে বায়েন হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, পরিণতির ক্ষেত্র বহাল থাকার কারণে পরিণতিও বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا [তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তিন তালাক] অতঃপর স্বামী أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا [তুমি তিন তালাক] -এর মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে তিন তালাক দিল। স্ত্রীলোকটি ইদ্দত পূর্ণ করার পর অন্যকে বিবাহ করল এবং স্বামীর সাথে তার একান্ত মিলন হলো। অতঃপর এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিল এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করল আর উক্ত ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে আমাদের মতে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, তিন তালাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَزَاءَ ثَلٰثٌ مُطْلَقٌ الخ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, উচ্চারিত শর্ত শর্তমুক্ত থাকার কারণে পরিণতি [جَزَاءٌ] হলো শর্তমুক্ত তিন। সুতরাং এ কথার দ্বারা শর্তমুক্ত তিন তালাক বুঝাবে। বর্তমান স্বামীত্বের মধ্যেও হতে পারে, আবার ভবিষ্যতে স্বামী-স্বত্বেও হতে পারে। আর শর্তমুক্ত তিন তালাকের অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে তালাক লাভের পর পুনঃবিবাহের সম্ভাবনার কারণে। সুতরাং শর্ত বহাল থাকার কারণেও ক্ষেত্র তথা স্ত্রী বিদ্যমান থাকার কারণে পরিণতি [তিন তালাক] সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলিল হলো, আলোচ্য শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি [جَزَاءٌ] শর্তমুক্ত তিন তালাক নয়; বরং পরিণতি হচ্ছে বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। কেননা, পরিণতি তা-ই, যা শর্তের অস্তিত্ব লাভে ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নিবারণকারী কিংবা উদ্বুদ্ধকারী। এ দুই উদ্দেশ্যের কোনো একটির জন্য শর্তযুক্ত বাক্য উচ্চারিত হয়। আর এখানে ঘরে প্রবেশ থেকে নিবারণকারী হলো বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক; পরবর্তীতে বিবাহের বলে অর্জিত তালাক নয়। আর যে স্বামীত্বের অধিকার দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা অর্জিত হয়, তার অনস্তিত্বই বর্তমানে দৃশ্যমান। সুতরাং সেটা ভয় প্রদর্শন দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব, এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, আলোচ্য শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি হচ্ছে বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। আর নিঃশর্ত তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে সেটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেননা, তিন তালাক প্রদান বিবাহের বা তালাকের ক্ষেত্র হওয়ার যোগ্যতাই বাতিল করে দেয়। সুতরাং শর্তযুক্ত বাক্যের কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকবে না। ফলে স্ত্রীলোকটি উক্ত ঘরে প্রবেশ করলে কোনো তালাক হবে না।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি- إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا [যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তোমার উপর তিন তালাক] বলার পরে এক কিংবা দুই তালাকের মাধ্যমে বায়েনা করে দেয়, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর পরে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসে, তাহলেও পূর্ববর্তী শর্ত বহাল থাকবে। কেননা, ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকার কারণে পরিণতির কার্যকারিতাও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ স্ত্রীলোকটি যদি উক্ত ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে তিন তালাক পতিত হবে।

وَلَوْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اِذَا جَامَعْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ طُلِّقَتْ ثَلٰثًا وَاِنْ لَبِثَ سَاعَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَاِنْ اَخْرَجَهُ ثُمَّ اَدْخَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَكَذَا اِذَا قَالَ لِاَمَتِهِ اِذَا جَامَعْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ اَوْجَبَ الْمَهْرَ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ اَيْضًا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْاِتِّحَادِ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ الْجِمَاعَ اِدْخَالُ الْفَرْجِ فِى الْفَرْجِ وَلَا دَوَامَ لِلْاِدْخَالِ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَخْرَجَ ثُمَّ اَوْلَجَ لِاَنَّهُ وُجِدَ الْاِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ اِلَّا اَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ لِشُبْهَةِ الْاِتِّحَادِ بِالنَّظَرِ اِلَى الْمَجْلِسِ وَالْمَقْصُوْدِ وَاِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقْرُ اِذِ الْوَطْىُ لَا يَخْلُوْ عَنْ اَحَدِهِمَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا بِاللَّبَاثِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) لِوُجُوْدِ الْمِسَاسِ وَلَوْ نَزَعَ ثُمَّ اَوْلَجَ صَارَ مُرَاجِعًا بِالْاِجْمَاعِ لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে তুমি তিন তালাক, এরপর সে তার সাথে সহবাস করল, তাহলে দুই গুপ্তাঙ্গ যখন মিলিত হবে তখনই তিন তালাক হবে। যদি সে কিছু সময় এ অবস্থায় থাকে, তাহলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে পুরুষাঙ্গ [যৌনাঙ্গ থেকে] বের করে, আবার প্রবেশ করায়, তাহলে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে একই হুকুম হবে, যদি মনিব তার দাসীকে বলে– যখন আমি তোমার সাথে সহবাস করব, তখন তুমি আজাদ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে– প্রথম সুরতেও মহর ওয়াজিব হবে– স্থায়িত্ব দ্বারা সহবাস সাব্যস্ত হওয়ার কারণে, তবে তার উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে না। জাহিরী রেওয়ায়েতের কারণ হলো– সহবাস অর্থ 'গুপ্তাঙ্গে গুপ্তাঙ্গ প্রবিষ্টকরণ।' আর প্রবিষ্টকরণের জন্য স্থায়িত্ব হয় না। পক্ষান্তরে বের করার পর পুনরায় প্রবিষ্টকরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এখানে তালাকের পর প্রবিষ্টকরণ সম্পন্ন হয়েছে। তবে "হদ্দ" ওয়াজিব হবে না মজলিস ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে অভিন্ন হওয়ার সন্দেহের কারণে। আর যখন হদ্দ ওয়াজিব হবে না, তখন মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, সহবাস উভয়ের কোনো একটি থেকে মুক্ত নয়। আর তালাক যদি রাজ'ঈ হয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, স্থায়িত্ব দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ, সকাম স্পর্শ পাওয়া গেছে। আর যদি বের করে পুনরায় প্রবেশ করায়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে সে রাজ'আতকারী বলে গণ্য হবে– সহবাস পাওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اِذَا جَامَعْتُكِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اِذَا جَامَعْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا - 'আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে তুমি তিন তালাক', এরপর তার সাথে সহবাস করল, তাই দুই যৌনাঙ্গ একত্রে মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিন তালাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে যদি কিছু সময় থাকে যা তার জন্য হারাম, তাহলে সেজন্য স্বামীর উপর মহরে মিছিল [مَهْرِ مِثْلٍ] ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে ব্যক্তি পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায়, তাহলে

তার উপর সহবাস হারাম হওয়ার কারণে মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হয়ে যাবে। অদ্রূপ একই হুকুম হবে, মনিব যদি তার দাসীকে বলে- إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ - যদি তোমার সাথে আমি সহবাস করি, তাহলে তুমি আজাদ।' অর্থাৎ, মনিব যদি দাসীর সাথে সহবাস করে এবং দাসীর যোনিতে পুরুষাঙ্গ কিছু সময় রাখে, তাহলে তার উপর মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) أَوْجَبَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রথম সুরতেও অর্থাৎ, দুই যৌনাঙ্গ মিলিত হওয়া অবস্থায় স্বামী যদি কিছু সময় থাকে, তাহলে স্বামীর উপর মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী তালাক হয়েছে। আর এ অবস্থায় কিছু সময় থাকার দ্বারা নতুন একটি সহবাস সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে সে ব্যক্তি তিন তালাক পতিত হওয়ার পর সহবাস করল আর চূড়ান্তরূপে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আর সহবাস হারাম হওয়ার কারণে মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হয়। তাই এক্ষেত্রেও মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, বর্ণিত সুরতে স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়ার পর এ অবস্থায় কিছু সময় থাকলে যদি নতুন একটি সহবাস সাব্যস্ত হয়, তাহলে হারাম সহবাস হওয়ার কারণে স্বামীর উপর জেনার শাস্তি আরোপিত হওয়া উচিত। অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-ও এ ক্ষেত্রে হদ্দ [শাস্তি] -এর কথা বলেননি, শুধু মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন।

উত্তর : এর উত্তরে বলা হয়, সন্দেহাতীতভাবেই স্বামীর উপর জেনার শাস্তি আরোপিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রবিষ্ট করানো হালাল আর স্থায়িত্ব হারাম, এ দুটি কর্মে অভিন্নতার সন্দেহ দেখা দিয়েছে উভয় ক্রিয়ার মজলিস ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার কারণে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সহবাসের প্রথম পর্যায়টি [প্রবিষ্ট করানো] 'হদ্দ' -কে ওয়াজিব করে না, তবে দ্বিতীয় পর্যায়টি [প্রবিষ্টকরণের পর কিছু সময় স্থায়িত্ব] 'হদ্দ' -কে ওয়াজিব করে। আর যেহেতু উভয় ক্রিয়ার মজলিস ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার কারণে ক্রিয়া দু'টিতে অভিন্নতার সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তাই 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعَ الخ : জাহিরে রেওয়ায়েতের দলিল হলো, সহবাস বলা হয় স্বামীর পুরুষাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবিষ্টকরণকে। আর তিন তালাকের পর এ অর্থ পাওয়া যায় না। তাই সহবাস হারাম না হওয়ার কারণে মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ الخ : এর মর্মার্থ হলো, দুই যৌনাঙ্গের মিলনের মাধ্যমে স্থায়িত্বের দ্বারা নতুন সহবাসের হুকুম হবে সেখানেই, যেখানে স্থায়িত্ব ঘটে। আর প্রবিষ্টকরণ [إِدْخَال] ক্রিয়াটিতে স্থায়িত্ব নেই। সে কারণেই ঐ ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ বের করার পূর্ব পর্যন্ত একটিই সহবাস হবে। তবে সে যদি পুরুষাঙ্গ বের করার পর পুনরায় প্রবেশ করায়, তাহলে এই প্রবিষ্টকরণ তালাকের পর সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর তাই স্বামীর উপর মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও জেনার 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে না। কেননা, প্রবিষ্টকরণ ও বের করা উভয় ক্রিয়ার মজলিস ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার কারণে ক্রিয়া দু'টিতেও অভিন্নতার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং যখন 'হদ্দ' ওয়াজিব হবে না, তখন অবশ্যই মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] ওয়াজিব হবে। কেননা, হারাম সহবাস 'হদ্দ' কিংবা মহরে মিছিল [مَهْر مِثْل] উভয়টির কোনো একটি থেকে মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ, মহরে মিছিল কিংবা 'হদ্দ' এ দু'টির যে-কোনো একটি ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا يَصِيْرُ الخ : আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً [যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে তুমি এক তালাক] এবং এরপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীর উপর একটি রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে। আর যদি এ অবস্থায় কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। তবে এর কারণ হিসেবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মিলনকালে স্থায়িত্ব নতুন করে প্রবিষ্টকরণের পর্যায়ে। সুতরাং তালাকের পরে সহবাস সম্পন্ন হওয়ার কারণে রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) রাজ'আত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, কাম সহকারে স্পর্শ পাওয়া গেছে। আর স্বামী যদি পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। কেননা, এখানে স্বতন্ত্র সহবাস পাওয়া গেছে।

فَصْلٌ فِى الْاِسْتِثْنَاءِ

وَاِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ اَوْ عِتَاقٍ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا بِهِ لَا حَنَثَ عَلَيْهِ وَلِاَنَّهُ اَتٰى بِصُوْرَةِ الشَّرْطِ فَيَكُوْنُ تَعْلِيْقًا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِنَّهُ اِعْدَامٌ قَبْلَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ هٰهُنَا فَيَكُوْنُ اِعْدَامًا مِنَ الْاَصْلِ وَلِهٰذَا يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الشُّرُوْطِ وَلَوْ سَكَتَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْاَوَّلِ فَيَكُوْنُ الْاِسْتِثْنَاءُ اَوْ ذِكْرُ الشَّرْطِ بَعْدَهُ رُجُوْعًا عَنِ الْاَوَّلِ قَالَ وَكَذَا اِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّ بِالْاِسْتِثْنَاءِ خَرَجَ الْكَلَامُ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ اِيْجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبْطِلِ بِخِلَافِ مَا اِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِاَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْاِسْتِثْنَاءُ.

অনুচ্ছেদ : ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাক' আর 'ইনশাআল্লাহ' কথাটি মিলিতভাবে বলে, তাহলে তালাক হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'কেউ যদি তালাক কিংবা আজাদ শব্দযোগে হলফ করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে 'ইনশাআল্লাহ' বলে, তাহলে তা কার্যকর হবে না।' তাছাড়া সে শর্তের রূপ ব্যবহার করেছে। সুতরাং এদিক থেকে তা শর্তযুক্ত বাক্য হলো। আর তা শর্তের পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টিকে অস্তিত্বহীন রাখা। আর এখানে শর্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে না। সুতরাং তা মূলত অস্তিত্বহীন গণ্য হবে। আর এটি বাহ্যত শর্ত রাখার কারণেই অন্য সকল শর্তের ন্যায় এটিরও বক্তব্যের সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। আর যদি চুপ থাকে, তাহলে বাক্যের প্রথমাংশ কার্যকর হবে। সুতরাং ব্যতিক্রমবাচক বা শর্তবাচক শব্দ ব্যবহারের অর্থ হবে বক্তব্যের প্রথমাংশ থেকে ফিরে আসা। অনুরূপভাবে স্বামী যদি ইনশাআল্লাহ্ উচ্চারণের পূর্বে স্ত্রী মারা যায় [তাহলে তালাক হবে না]। কেননা, ব্যতিক্রমবাচক শব্দের কারণে বাক্যটি কার্যকর হওয়া থেকে সরে এসেছে। আর মৃত্যু কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়; বাতিলকারী নয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পূর্বে মারা যায় তাহলে এর বিপরীত। কেননা, তখন ব্যতিক্রমবাচক বাক্য মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى الْاِسْتِثْنَاءِ : اَلْاِسْتِثْنَاءُ -এর অর্থ হলো– اَلتَّكَلُّمُ بِالْبَاقِىْ بَعْدَ الثُّنْيَا অর্থাৎ, ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ।

تَعْلِيْقٌ তথা শর্তারোপের দ্বারা পুরো বক্তব্য থেকে নিবারণ করা হয়, আর اِسْتِثْنَاءٌ দ্বারা বক্তব্যের অংশবিশেষকে নিবারণ করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে اِسْتِثْنَاءٌ -এর তুলনায় تَعْلِيْقٌ শক্তিশালী। আর তাই গ্রন্থকার প্রথমত تَعْلِيْقٌ -এর বর্ণনা করেছেন, অতঃপর اِسْتِثْنَاءٌ -এর বর্ণনা শুরু করেছেন। আর اِنْ شَاءَ اللّٰهُ সংক্রান্ত মাসআলা যেহেতু বাহ্যত শর্তের রূপ,

সেহেতু অনুচ্ছেদের শুরুতেই এ সংক্রান্ত মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন। কুরআন শরীফে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ -কে اِسْتِثْنَاءٌ শব্দের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ [আর তারা ইনশাআল্লাহ বলে না] [সূরা কলম : আয়াত- ১৮] এ কারণেই ইনশাআল্লাহ সংক্রান্ত মাসআলা اِسْتِثْنَاءٌ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য শর্ত নাকি পূর্ববর্তী বাক্যকে বাতিলকারী, এ নিয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, 'ইনশাআল্লাহ' পূর্ববর্তী বাক্যকে বাতিলকারী শব্দ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে পূর্ববর্তী বাক্যের শর্তস্বরূপ।

মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটিকে তালাকের সাথে সংলগ্ন করে বলে- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ [তুমি তালাক, ইনশাআল্লাহ], তাহলে স্ত্রী তালাক হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী-

مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ اَوْ عِتَاقٍ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا بِهٖ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ অর্থাৎ, কেউ যদি [স্ত্রীর উদ্দেশ্যে] তালাক কিংবা [দাস-দাসীর উদ্দেশ্যে] আজাদ শব্দ প্রয়োগ করে হলফ করে এবং তার সংলগ্ন করে ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে তা কার্যকর হবে না।'

তাছাড়া তালাক না হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ হলো, বক্তব্য উচ্চারণকারী বক্তব্যকে শর্তের রূপে ব্যবহার করেছে। এদিক থেকে বাক্যটি শর্তযুক্ত। আর শর্তযুক্ত বাক্যে শর্ত সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টিকে অস্তিত্বহীন রাখা হয়। আর এখানে শর্ত তথা আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শুরু থেকে পরিণতি অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হবে। তাই বক্তব্যটি বাহ্যত শর্তের রূপে হওয়ার কারণে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটিকে সংলগ্নভাবে উল্লেখের/উচ্চারণের শর্ত করা হয়েছে। অন্য সকল শর্তের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে।

আর যদি স্বামী اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] বলার পরে কিছুক্ষণ চুপ থাকে, অতঃপর ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে প্রথম বক্তব্য দ্বারা তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, অধিকাংশ আলেমের মতে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْفَصِلٌ [বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ] সহীহ নয়। এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে اِسْتِثْنَاءٌ -এর উল্লেখ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে শর্তের [ইনশাআল্লাহর] উল্লেখের অর্থ হবে প্রথম বক্তব্য থেকে ফিরে আসা। অথচ স্বামীর সে এখতিয়ার নেই।

অনুরূপভাবে তালাক হবে না- যদি স্বামীর ইনশাআল্লাহ উচ্চারণের পূর্বে স্ত্রী মারা যায়। কেননা, ব্যতিক্রমবাচক শব্দ ব্যবহারের কারণে তার বক্তব্য কার্যকর হওয়া থেকে বের হয়ে এসেছে। আর তাই হুকুমও বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ الخ : এর মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, কার্যকারিতার বিষয়টি স্ত্রীর জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়েছে। আর ব্যতিক্রমবাচক শব্দের ব্যবহার তার পরে হয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্র না থাকার কারণে ব্যতিক্রমবাচক শব্দের ব্যবহার বাতিল বলে গণ্য হবে। ফলে কার্যকারিতা সহীহ হবে। এ কারণে এ ক্ষেত্রে তালাক পতিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, মৃত্যু কার্যকারিতার অন্তরায়; বাতিলকারী নয়। আর তাই 'তুমি তালাক' এ কথাটি পূর্ণভাবে উচ্চারণের পূর্বে যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহলে তালাক কার্যকরী হবে না। আর اِسْتِثْنَاءٌ কিংবা شَرْطٌ মৃত্যুর কারণে বাতিল হয় না। কেননা, মৃত্যুর দ্বারা যেমন কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যায়, তেমনি اِسْتِثْنَاءٌ -এর দ্বারাও কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে 'তুমি তালাক' -এ কথা উচ্চারণের পরে এবং 'ইনশাআল্লাহ' উচ্চারণের পূর্বে যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, এ সুরতে ব্যতিক্রম জ্ঞাপক বাক্যটি মূল বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] -এর সাথে যুক্ত হয়নি।

وَإِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا اِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثِنْتَيْنِ وَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا اِلَّا ثِنْتَيْنِ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً وَالْاَصْلُ اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الثُّنْيَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَمَعْنَاهُ اَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانٍ عَلَىَّ دِرْهَمٌ وَبَيْنَ قَوْلِهٖ عَشَرَةٌ اِلَّا تِسْعَةً فَيَصِحُّ اِسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ لِاَنَّهُ يَبْقَى التَّكَلُّمُ بِالْبَعْضِ بَعْدَهُ وَلَا يَصِحُّ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ لِاَنَّهُ لَا يَبْقٰى بَعْدَهُ شَيْءٌ لِيَصِيْرَ مُتَكَلِّمًا بِهٖ وَصَارِفًا لِلَّفْظِ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ اِذَا كَانَ مَوْصُوْلًا بِهٖ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَفِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ ثِنْتَانِ فَيَقَعَانِ وَفِى الثَّانِىْ وَاحِدَةٌ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ اِلَّا ثَلٰثًا يَقَعُ الثَّلٰثُ لِاَنَّهُ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : আর স্বামী যদি বলে, 'তুমি তিন তালাক, তবে একটি ছাড়া', তাহলে দুই তালাক সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বামী বলে, 'তুমি তিন তালাক, তবে দুটি ছাড়া', তাহলে একটি তালাক সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হলো– ব্যতিক্রমবাচক শব্দ ব্যবহারের অর্থ হলো, ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ। এটিই বিশুদ্ধ মত। এর অর্থ হলো, ব্যতিক্রমের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই সে উচ্চারণ করেছে। কেননা, বক্তার বক্তব্য – 'অমুক আমার কাছে এক দিরহাম পাবে' এবং 'নয় দিরহাম কম দশ দিরহাম পাবে' – এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং সমগ্র থেকে অংশবিশেষ বাদ দেওয়া শুদ্ধ হবে। কেননা, এরপর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ বহাল থাকবে। তবে সমগ্র থেকে সমগ্রকে বাদ দেওয়া শুদ্ধ হবে না। কেননা, এরপর এমন কোনো অংশ বাকি থাকে না, যার দিকে মূল শব্দটিকে ফিরানো যায় এবং বক্তাকে ঐ অংশের মর্মে শব্দটিকে উচ্চারণকারী বলা যায়। ব্যতিক্রমবাচক শব্দ প্রয়োগ শুদ্ধ হবে তখনই, যখন তা মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয়; যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। যখন এটি সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন প্রথম সুরতে ব্যতিক্রম অবশিষ্ট হচ্ছে দুই তালাক। সুতরাং তা পতিত হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে হচ্ছে এক। সুতরাং এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি স্বামী বলে, 'তুমি তিন তালাক এ থেকে তিন বাদ' তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা, তা সমগ্র থেকে সমগ্রের ব্যতিক্রম। সুতরাং এ ধরনের ব্যতিক্রম শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا إِلَّا وَاحِدَةً : মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا إِلَّا وَاحِدَةً الخ [তুমি তিন তালাক, তবে একটি ছাড়া], তাহলে স্ত্রী দুই তালাকপ্রাপ্তা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ দুই উদাহরণের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, কম ও বেশি উভয় ধরনের إِسْتِثْنَاءْ -ই শুদ্ধ, যদিও ফাররা নাহুবিদ-এর নিকট এ ধরনের ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

এ মাসআলার ভিত্তি হলো- إِسْتِثْنَاءْ অর্থ- ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ। অর্থাৎ, ব্যতিক্রমের পর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর যা অবশিষ্ট থাকে, তার উচ্চারণ। এ কারণেই 'অমুক আমার কাছে এক দিরহাম পাবে' আর 'অমুক আমার কাছে নয় দিরহাম কম দশ দিরহাম পাবে' – এ বাক্য দুটির মর্মে কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা, সমগ্র [كُلٌّ] থেকে অংশবিশেষ [بَعْضٌ] বাদ দেওয়া শুদ্ধ। কেননা, ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট অংশের উচ্চারণ বহাল থাকে। কিন্তু সমগ্র [كُلٌّ] থেকে সমগ্র [كُلٌّ] -কে বাদ দেওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা, ব্যতিক্রমের পর এমন কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না, যার দিকে মূল শব্দটিকে প্রত্যাবর্তন করানো যায় এবং বক্তাকে ঐ অংশের মর্মে শব্দটিকে উচ্চারণকারী বলা যায়। আর ব্যতিক্রমবাচক শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ হওয়ার জন্য মূল বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত হওয়া জরুরি।

এ আলোচনার আলোকে ফলাফল দাঁড়ায়- প্রথম সুরতে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ থেকে ব্যতিক্রম অবশিষ্ট হচ্ছে দুই তালাক। সুতরাং দুই তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ থেকে ব্যতিক্রম অবশিষ্ট হচ্ছে এক তালাক। সুতরাং এক তালাকই পতিত হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে- أَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا إِلَّا ثَلٰثًا [তুমি তিন তালাক, তবে তিন বাদ] তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা, এ বাক্যে সমগ্র থেকে সমগ্রের ব্যতিক্রম হয়েছে, যা শুদ্ধ নয়। কেননা, ব্যতিক্রমের পর এমন কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকছে না, যার দিকে মূল শব্দটিকে প্রত্যাবর্তন করানো যায় এবং বক্তাকে ঐ অংশের মর্মে উচ্চারণকারী বলা যায়।

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيْضِ

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مِيْرَاثَ لَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا تَرِثُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِهٰذَا الْعَارِضِ وَهِيَ السَّبَبُ وَلِهٰذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ وَلَنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَاخِيْرِ عَمَلِهِ إِلٰى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ يَبْقٰى فِيْ حَقِّ بَعْضِ الْآثَارِ فَجَازَ أَنْ يَبْقٰى فِيْ حَقِّ إِرْثِهَا عَنْهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْاِنْقِضَاءِ لِأَنَّهُ لَا إِمْكَانَ وَالزَّوْجِيَّةُ فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِإِرْثِهِ عَنْهَا فَيَبْطُلُ فِيْ حَقِّهِ خُصُوْصًا إِذَا رَضِيَ بِهِ.

পরিচ্ছেদ : রোগী ব্যক্তির তালাক

অনুবাদ : স্বামী যখন তার স্ত্রীকে তার মৃত্যুরোগকালে বায়েন তালাক দেয়, তারপর সে স্ত্রীর ইদ্দতের সময়ে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মারা যায়, তাহলে তার কোনো মিরাস নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই মিরাস পাবে না। কেননা, এ উদ্ভূত অবস্থার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেছে। আর এটাই হলো মিরাস লাভের সূত্র। আর এ কারণেই স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী তার মিরাসের অধিকারী হয় না। আমাদের দলিল হলো, স্বামীর মৃত্যুরোগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্ত্রীর মিরাস লাভের সূত্র। স্বামী তা বাতিল করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং স্ত্রী থেকে ক্ষতি রোধকল্পে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার আমল বিলম্বিত করার মাধ্যমে তার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করা হবে। আর সেটা সম্ভব। কেননা, কোনো কোনো বিষয়ে ইদ্দতকালে বিবাহকে বহাল বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং স্বামী থেকে স্ত্রীর মিরাস লাভের ক্ষেত্রেও তা বহাল বলে বিবেচনা করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইদ্দত শেষ হওয়ার পরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বহাল রাখার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এ অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর মিরাস লাভের সূত্র নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে মিরাসের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। বিশেষত সে যখন সম্মত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ পরিচ্ছেদে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাকের হুকুম আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার সুস্থ ব্যক্তির তালাক সম্পর্কিত আলোচনা শেষে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা হয়, রোগ হলো আরোপিত বিষয়, আর সুস্থতা হলো মূল। আর মূল বিষয় আরোপিত বিষয়ের পূর্বগামী হয়ে থাকে। এ কারণে প্রথমত সুস্থ ব্যক্তির তালাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; অতঃপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فِىْ مَرَضِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার মৃত্যুরোগ শয্যায় তার স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই তাকে বায়েন তালাক দেয়, তারপর স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় সে মারা যায় আর স্ত্রী মিরাস পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে। এ মাসআলায় নিম্নোক্ত শর্তগুলি লক্ষণীয়–

১. মাসআলাটিকে তালাকে বায়েন -এর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কেননা, তালাকে রাজ'ঈ দিলে তো স্ত্রী বিবাহের হুকুম বহাল থাকার কারণেই মিরাস পাবে। কারণ, রাজ'ঈ তালাকের পর ইদ্দতকালীন সময়ে সবদিক থেকে বিবাহ বহাল থাকে।

২. বায়েন তালাককে মৃত্যুরোগ শয্যার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কেননা, স্বামী যদি স্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেয়, অতঃপর সুস্থ হয়ে যায় এরপর মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না।

৩. স্ত্রীর অসম্মতির সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতিতে তালাক দিলে স্ত্রী মিরাস পাবে না।

৪. স্ত্রী মিরাসের যোগ্য হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কেননা, স্ত্রী যদি আহলে কিতাব হয় কিংবা দাসী হয়, তাহলেও সে মিরাস পাবে না।

৫. ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামীর মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কেননা, স্বামী যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরে মারা যায়, তাহলেও স্ত্রী মিরাস পাবে না। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরও স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মিরাস পাবে।

ইনায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করার নাম طَلَاقُ الْفَارِّ তথা পলাতকের তালাক। এর বিধান যেরূপ স্বামীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হয়, অনুরূপভাবে স্ত্রীর পক্ষ থেকেও সাব্যস্ত হবে। যেমন– স্ত্রী তার মৃত্যুরোগ শয্যায় মুরতাদ হয়ে গেলে [নাউযুবিল্লাহ] তার স্বামী তার মিরাস পাবে।

মোটকথা, হানাফী মাযহাব মতে, ইদ্দত অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী তার মিরাস পাবে। আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মারা গেলে মিরাস পাবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, উভয় ক্ষেত্রেই মিরাস পাবে না– ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী মারা যাক, কিংবা ইদ্দত পরবর্তী সময়ে মারা যাক।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিরাসের সূত্র হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। আর বায়েন তালাক দেওয়ার কারণে এই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই মিরাসের বিধান সূত্র ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আর এ কারণেই এ সময়ে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে স্বামী মিরাস পাবে না।

আমাদের যৌক্তিক দলিল হলো, মৃত্যুরোগ শয্যায় মিরাস পাওয়ার সূত্র হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। কেননা, এ সময়ে স্ত্রীর অধিকার স্বামীর সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বায়েন তালাক প্রদানের মাধ্যমে মিরাসের অধিকার বাতিল করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। তাই তার এই অশুভ পদক্ষেপের কার্যকারিতা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময় বিলম্বিত করে তার ইচ্ছাকে প্রতিহত করা হবে স্ত্রীকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার ক্ষতি রোধ করার জন্য।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, তালাকের কার্যকারিতা বিলম্বিত করার কারণ যদি স্ত্রীর স্বার্থহানি রোধ করা হয়, তাহলে এ বিধান সহবাসকৃতা ও সহবাসহীনা, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ও পরে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ সর্বক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকরী নয়। কেননা, মৃত্যুরোগ শয্যায় স্বামী যদি সহবাসহীনা স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং মারা যায়, তাহলে সে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে না। অনুরূপভাবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি স্বামী মারা যায়, তাহলেও স্ত্রী মিরাস পাবে না।

উত্তর : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) وَقَدْ أَمْكَنَ الخ বাক্যের দ্বারা উত্থাপিত এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের মূলকথা হলো– তালাকের কার্যকারিতা বিলম্বিত করার কারণ অবশ্যই স্ত্রীর স্বার্থহানি রোধ করা। তবে এ পদক্ষেপের কার্যকারিতা সে পর্যন্তই বিলম্ব করা হবে, যে পর্যন্ত বিলম্ব করা সম্ভব। আর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তালাকের কার্যকারিতা বিলম্ব করা সম্ভব। কেননা, কোনো কোনো বিষয়ে ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বহাল থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে কোনোভাবেই বিবাহ বহাল থাকে না। এ কারণে ইদ্দতের পর পর্যন্ত তালাকের কার্যকারিতাকে বিলম্ব করা হয়নি। আর সহবাসহীনা স্ত্রীর উপর যেহেতু ইদ্দতই ওয়াজিব নয়, তাই তার ক্ষেত্রে তালাকের কার্যকারিতাকে বিলম্ব করা হয়নি।

আমাদের মতের পক্ষে নকলী দলিলও আছে, যদিও হিদায়া গ্রন্থকার (র.) তা উল্লেখ করেননি। স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো– হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁর মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিলেন। স্ত্রী [তুমাযির রা.] -এর ইদ্দত অবস্থায় তিনি মারা গেলেন। হযরত ওসমান (রা.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) -এর স্ত্রী তুমাযির (রা.) -এর মিরাস প্রাপ্তির ফয়সালা দিলেন। সাহাবীগণের কেউ এ ফয়সালার বিরোধিতার করেননি। এর দ্বারা মৌন ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রশ্ন হয় যে, পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– 'যদি বিষয়টির ফয়সালা আমার উপর ন্যস্ত করা হতো, তাহলে আমি তুমাযির (রা.)-কে মিরাসের অধিকারী হওয়ার ফয়সালা দিতাম না।' এর জবাবে বলা হয়, এ বিষয়ে যে সময় সাহাবীগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে, সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ছোট বাচ্চা ছিলেন। আর পরবর্তীগণের মতপার্থক্য পূর্ববর্তীগণের দ্বারা সংঘটিত ইজমার প্রতিপক্ষ হয় না। অধিকন্তু হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– إِنَّ إِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ অর্থাৎ, মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী মিরাস পাবে। হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর প্রদত্ত কিয়াসের জবাবে বলা হয়, মৃত্যুরোগ শয্যায় বিবাহ সম্পর্ক স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর মিরাস লাভের কারণ নয়। কেননা, এ সময় স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়; স্বামীর অধিকার স্ত্রীর সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। এ কারণে স্বামীর ক্ষেত্রে মিরাসের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। বিশেষত সে যখন স্বেচ্ছায় তালাক প্রদানের মাধ্যমে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا بِاَمْرِهَا اَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِىْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا اَوْ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْ لِاَنَّهَا رَضِيَتْ بِاِبْطَالِ حَقِّهَا وَالتَّاخِيْرُ لِحَقِّهَا وَاِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِىْ لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتْهُ لِاَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِىَّ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنْ بِسُؤَالِهَا رَاضِيَةً بِبُطْلَانِ حَقِّهَا .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে তারই কথা মতো তিন তালাক প্রদান করে কিংবা তাকে বলে, তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর আর স্ত্রী নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কিংবা স্বামী থেকে খোলা' তালাক নিল অতঃপর ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী মারা গেল, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে না। কেননা, সে তার অধিকার বাতিল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছে। অথচ তার অধিকার রক্ষার্থেই বিলম্বকরণ হয়েছিল। আর যদি স্ত্রী বলে, আমাকে রাজ'ঈ তালাক দাও, আর স্বামী তাকে তিন তালাক দিল, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে। কেননা, রাজ'ঈ তালাক বিবাহকে বিলুপ্ত করে না। সুতরাং তা চাওয়ার দ্বারা নিজের হক বাতিলের ব্যাপারে সম্মত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا بِاَمْرِهَا اَوْ قَالَ الخ : মাসআলা : আলোচ্য মাসআলার তিনটি সুরত রয়েছে। যথা– ১. স্ত্রী স্বামী থেকে তিন তালাক চেয়েছে, আর স্বামী তাকে মৃত্যুরোগ শয্যায় তিন তালাক দিয়েছে। ২. স্বামী তার মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে নিজের ব্যাপারে তালাক প্রদানের ইচ্ছাধিকার দিল, আর স্ত্রী নিজের ব্যাপারে তালাকের সিদ্ধান্ত নিল। ৩. স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় স্বামী থেকে অর্থের বিনিময়ে খোলা' তালাক নিল। এ তিন সুরতেই স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে না। কেননা, বর্ণিত তিন সুরতেই স্ত্রী নিজের হক বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে। প্রথম সুরতে স্ত্রী নিজেই স্বামী থেকে তিন তালাক চেয়েছে। দ্বিতীয় সুরতে স্ত্রী নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচ্ছিন্নতা কামনা করেছে, যা সম্মতির প্রমাণ। তৃতীয় সুরতে অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে খোলা' তালাক নিয়েছে– এটাও সম্মতির প্রমাণ।

অথচ তার অধিকার রক্ষার্থেই তালাকের কার্যকারিতা বিলম্বিত করা হয়েছিল। সুতরাং স্ত্রী যখন নিজেই নিজের অধিকার বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে, তখন অন্যের উপরও তার অধিকার সংরক্ষণের দায়ভার অর্পণ করা যায় না।

আর স্ত্রী যদি স্বামী থেকে তালাকে রাজ'ঈ চায়, কিন্তু স্বামী তার মৃত্যুরোগ শয্যায় তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে। এর দলিল হলো, তালাকে রাজ'ঈ বিবাহ-বন্ধন বিলুপ্ত করে না। সুতরাং এ কথা বলা যায় না যে, স্ত্রী স্বামী থেকে তালাকে রাজ'ঈ চেয়ে নিজের অধিকার বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে; বরং স্বামী তাকে তিন তালাক দেওয়া প্রমাণ করে যে, স্বামী নিজের সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত করার অশুভ পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই স্ত্রীর স্বার্থহানি রোধকল্পে সে স্বামীর মিরাস পাবে।

وَاِنْ قَالَ لَهَا فِيْ مَرَضِ مَوْتِهٖ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ ثَلٰثًا فِيْ صِحَّتِيْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ اَوْ اَوْصٰى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ وَمِنَ الْمِيْرَاثِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَجُوْزُ اِقْرَارُهٗ وَ وَصِيَّتُهٗ وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فِيْ مَرَضِهٖ بِاَمْرِهَا ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ اَوْ اَوْصٰى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ وَمِنَ الْمِيْرَاثِ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا اِلَّا عَلٰى قَوْلِ زُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ لَهَا جَمِيْعُ مَا اَوْصٰى وَمَا اَقَرَّ بِهٖ لِاَنَّ الْمِيْرَاثَ لَمَّا بَطَلَ بِسُؤَالِهَا زَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْاِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى اَنَّهُمَا لَمَّا تَصَادَقَا عَلَى الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صَارَتْ اَجْنَبِيَّةً عَنْهُ حَتّٰى جَازَ لَهٗ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُخْتَهَا فَانْعَدَمَتِ التُّهْمَةُ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীকে বলে, আমার সুস্থ অবস্থায় তোমাকে আমি তিন তালাক দিয়েছিলাম এবং তোমার ইদ্দতও শেষ হয়ে গেছে; আর স্ত্রীও তাকে সত্য প্রতিপন্ন করে, অতঃপর স্বামী তার জন্য কিছু ঋণ স্বীকার করে কিংবা তার জন্য অসিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, মিরাস এবং তা থেকে নিম্ন পরিমাণটি স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তার ঋণ স্বীকার ও অসিয়ত বৈধ হবে। আর স্বামী যদি তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীর কথা মতো তিন তালাক দেয়, অতঃপর স্ত্রীর জন্য ঋণ স্বীকার করে কিংবা তার জন্য অসিয়ত করে, তাহলে সকলের মতে, মিরাস ও তা থেকে নিম্ন পরিমাণটি স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। তবে ইমাম যুফার (র.) -এর মতানুসারে অসিয়ত ও ঋণের সবটুকুই স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। কেননা, স্ত্রী তালাক চাওয়ার ফলে যখন তার মিরাস বাতিল হলো তখন ঋণ স্বীকার ও অসিয়তের প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়ে গেল। প্রথম মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল হলো, তালাক প্রদান ও ইদ্দত শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে অপরিচিত ব্যক্তি হয়ে গেল। আর তাইতো স্ত্রীর বোনকে তার জন্য বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং অভিযোগ রহিত হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَالَ لَهَا فِيْ مَرَضِ مَوْتِهٖ الخ : আলোচ্য ইবারতে দুটি মাসআলা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যথা- ১. স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যায় তার স্ত্রীকে বলল, সুস্থ অবস্থায় আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছিলাম, আর তোমার ইদ্দতও পূর্ণ হয়েছে এবং স্ত্রীও স্বামীর বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করল। এরপর স্বামী স্ত্রীর জন্য কিছু ঋণ স্বীকার করল কিংবা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অসিয়ত করল। ২. স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রী তার থেকে তিন তালাক চাইল, আর স্বামীও তাকে তিন তালাক প্রদান করল। অতঃপর ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীর জন্য ঋণ স্বীকার করল কিংবা কোনো অসিয়ত করল।

উপরিউক্ত দু'টি সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে মিরাস এবং ঋণ ও অসিয়তের মধ্যে যেটি কম পরিমাণের, সেটিই স্ত্রী পাবে। ঋণ কিংবা অসিয়তের পরিমাণ কম হলে সেটি স্ত্রীকে দেওয়া হবে; আর যদি মিরাসের পরিমাণ কম হয়, তাহলে সেটিই স্ত্রী পাবে। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, যে পরিমাণ ঋণ স্বীকার করেছে কিংবা অসিয়ত করেছে, সে পরিমাণই স্ত্রী

লাভ করবে। এ পরিমাণটি মিরাস থেকে কম হোক কিংবা বেশি হোক। আর সাহেবাইনের মতে, প্রথম মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা-ই হবে। অর্থাৎ স্ত্রী অসিয়ত ও ঋণের সবটুকুই লাভ করবে। আর দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা-ই হবে। অর্থাৎ মিরাস এবং ঋণ ও অসিয়তের মধ্যে যেটি কম পরিমাণের, সেটিই স্ত্রী লাভ করবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, স্ত্রীর জন্য ঋণ স্বীকার এবং অসিয়তের প্রতিবন্ধকতা ছিল মিরাসের অধিকারী হওয়া। কিন্তু প্রথম মাসআলায় স্বামীর কথাকে সত্য বলে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে তালাক চাওয়ার মাধ্যমে মিরাসের অধিকার বাতিল হয়েছে। ফলে ঋণ স্বীকার ও অসিয়তের প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়ে গেছে। সুতরাং স্বামীর ঋণ স্বীকার ও অসিয়ত করা বৈধ হয়েছে। অতএব, স্বামী মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ততটুকু লাভ করবে, যতটুকু স্বামী তার জন্য ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত করেছে। এ পরিমাণ মিরাস থেকে কম হোক বা বেশি হোক।

প্রথম মাসআলায় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী-স্ত্রী যখন তালাক পতিত হওয়া ও ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে, তখন সে মহিলা তার জন্য অপরিচিতা হয়ে গেছে। সে আর মিরাসের অধিকারী নয়। এ কারণেই তো স্ত্রীলোকটির বোনকে এ অবস্থায় বিবাহ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। সুতরাং একজন ওয়ারিশকে অন্যদের উপর অধিক প্রদানের অভিযোগের অবকাশ রহিত হয়ে গেছে। এজন্যই তো স্ত্রীলোকটির অনুকূলে তার সাক্ষ্য তখন গ্রহণযোগ্য এবং স্ত্রীলোকটিকে জাকাত দেওয়া বৈধ। সুতরাং স্ত্রীলোকটি অপিরিচিতা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হলো। আর কোনো অপরিচিতের জন্য ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত করা যেমন বৈধ, তেমনি এ স্ত্রীলোকটির জন্যও ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত করা বৈধ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, তখন পর্যন্ত ইদ্দত বহাল থাকার কারণে অভিযোগের অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, একজন ওয়ারিশকে অন্যদের উপর অধিক প্রদানের অভিযোগ একটি গোপন বিষয়, যা সম্পর্কে অবগত হওয়া কঠিন। এজন্য সিদ্ধান্ত গোপন বিষয়ের উপর আবর্তিত হয় না; বরং অভিযোগের অনুকূল প্রমাণের উপরই সিদ্ধান্ত আবর্তিত হয়। এখানে অভিযোগের প্রমাণ হলো, স্ত্রীর ইদ্দত তখনও বহাল রয়েছে। আর এই অভিযোগের অবকাশ থাকার কারণেই ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত বৈধ নয়। তাই ইদ্দত বহাল থাকার কারণে স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত বৈধ হবে না।

এ কারণেই বিবাহ ও আত্মীয়তার উপর সিদ্ধান্ত আবর্তিত হয়। আর অভিযোগের অবকাশ থাকার কারণেই স্বামী-স্ত্রীর একের সাক্ষ্য অপরের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী একমত হওয়ার কারণে ইদ্দতই বহাল থাকে না। সুতরাং অভিযোগের অবকাশও নেই। এ কারণেই প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়ত করা বৈধ হবে।

উভয় মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, অভিযোগ ও সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় মাসআলায় সর্বসম্মতভাবে অভিযোগের অবকাশ বিদ্যমান। প্রথম মাসআলায় অভিযোগের অবকাশ বিদ্যমান থাকার কারণ হলো স্বামীর ঋণ স্বীকার এবং অসিয়ত প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করার জন্য কোনো কোনো সময় স্ত্রী স্বেচ্ছায় তালাকের সম্মতি প্রকাশ করতে পারে, যাতে তার প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মিরাস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকেও আরো অধিক সম্পদ স্ত্রী যেন পায়। এতে অন্যান্য ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। এটিই হলো অভিযোগ। অনুরূপভাবে এরূপ সন্দেহেরও অবকাশ রয়েছে যে, তালাকই হয়নি; বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তালাক ও ইদ্দতপূর্তি স্বীকার করার ব্যাপারে একমত হয়েছে, যাতে স্বামী স্ত্রীকে প্রাপ্য মিরাসের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানপূর্বক অনুগ্রহ করতে পারে। আর ঋণ স্বীকার এবং অসিয়ত করার মাধ্যমে এটি হয়। মোটকথা, এই অভিযোগ ও সন্দেহ হচ্ছে মিরাসের চেয়ে অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে। মিরাসের সমপরিমাণ সম্পদ ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়তের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ ও সন্দেহ নেই। এ কারণেই মিরাসের সমপরিমাণকে বৈধ বিবেচনা করা হয়েছে। আর তাই মিরাস এবং ঋণ অসিয়তের মধ্যে যেটি কম পরিমাণের, সেটিই স্ত্রী লাভ করবে। অসিয়ত কিংবা স্বীকৃত ঋণের পরিমাণ যদি মিরাসের চেয়ে কম হয়, তাহলে সেটিই স্ত্রী পাবে। আর যদি মিরাস অসিয়ত কিংবা স্বীকৃত ঋণ থেকে কম হয়, তাহলে মিরাসই স্ত্রী লাভ করবে।

اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ تُقْبَلُ شَهَادَتُهٗ لَهَا وَيَجُوْزُ وَضْعُ الزَّكٰوةِ فِيْهَا بِخِلَافِ الْمَسْاَلَةِ الثَّانِيَةِ لِاَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ وَهِىَ سَبَبُ التُّهْمَةِ وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلٰى دَلِيْلِ التُّهْمَةِ وَلِهٰذَا يُدَارُ عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَةِ وَلَا عِدَّةَ فِى الْمَسْاَلَةِ الْاُوْلٰى وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِى الْمَسْاَلَتَيْنِ اَنَّ التُّهْمَةَ قَائِمَةٌ لِاَنَّ الْمَرْاَةَ قَدْ تَخْتَارُ الطَّلَاقَ لِيَنْفَتِحَ بَابُ الْاِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَزِيْدُ حَقُّهَا وَالزَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَاضَعَانِ عَلَى الْاِقْرَارِ بِالْفُرْقَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيَبُرَّهَا الزَّوْجُ بِمَالِهٖ زِيَادَةً عَلٰى مِيْرَاثِهَا وَهٰذِهِ التُّهْمَةُ فِى الزِّيَادَةِ فَرَدَدْنَاهَا وَلَا تُهْمَةَ فِىْ قَدْرِ الْمِيْرَاثِ فَصَحَّحْنَاهُ وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِىْ حَقِّ الزَّكٰوةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تُهْمَةَ فِىْ حَقِّ هٰذِهِ الْاَحْكَامِ ـ

অনুবাদ : তুমি লক্ষ্য কর না যে, স্ত্রীর জন্য তার সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য ও তাকে জাকাত দেওয়াও বৈধ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, ইদ্দত তখনও বহাল রয়েছে, যা অভিযোগের সূত্র। আর অভিযোগের প্রমাণের উপর হুকুম আবর্তিত হয়। আর এ কারণে বিবাহ ও আত্মীয়তার উপর সিদ্ধান্ত আবর্তিত হয়। অপর পক্ষে প্রথম মাসআলায় ইদ্দত নেই। উভয় মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো– [উভয় ক্ষেত্রে] অভিযোগের অবকাশ বিদ্যমান। কেননা, কখনো কখনো স্ত্রী তালাকের ইচ্ছাধিকার গ্রহণ করে তার জন্য ঋণ স্বীকার ও অসিয়তের পথ উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে, যাতে তার অধিকার বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তালাক ও ইদ্দত শেষ হওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পারে, যাতে স্বামী স্ত্রীকে মিরাসের চেয়ে অধিক প্রদানপূর্বক অনুগ্রহ করতে পারে। এ অভিযোগ অতিরিক্ততার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই আমরা সেটিকে প্রতিহত করেছি। আর মিরাসের সমপরিমাণের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ নেই। তাই আমরা সেটিকে শুদ্ধ বলেছি। আর সাধারণত জাকাত, বিবাহ, সাক্ষ্য প্রদান– এসব ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয় না। তাই এ সকল বিষয়ে অভিযোগের অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً الخ : এ ইবারতের দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) সাহেবাইন (র.) -এর উপস্থাপিত দলিলের জবাব দিয়েছেন। জবাবের মোদ্দাকথা হলো, মিরাসের ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের মতানৈক্যের কৌশল অবলম্বন করা হয় বলে সেক্ষেত্রে অভিযোগের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আহকাম তথা জাকাত, বোন-বিবাহ এবং সাক্ষীর ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কৌশল অবলম্বন করা হয় না। কেননা, স্ত্রীর অনুকূলে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কিংবা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার জন্য অথবা অনুগ্রহবশত স্ত্রীকে জাকাত দেওয়ার জন্য তালাক পতিত হওয়া ও ইদ্দতপূর্তির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মতৈক্য অবলম্বনের কৌশল হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। সুতরাং এ সকল বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

قَالَ وَمَنْ كَانَ مَحْصُوْرًا اَوْ فِىْ صَفِّ الْقِتَالِ فَطَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلٰثًا لَمْ تَرِثْهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ فِىْ قِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ وَرِثَتْ اِنْ مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْوَجْهِ اَوْ قُتِلَ وَاَصْلُهُ مَا بَيَّنَّا اَنَّ اِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ اِسْتِحْسَانًا وَاِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ بِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَاِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضٍ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكَ غَالِبًا كَمَا اِذَا كَانَ صَاحِبَ الْفِرَاشِ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لَا يَقُوْمُ بِحَوَائِجِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْاَصِحَّاءُ ـ وَقَدْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ بِمَا هُوَ فِىْ مَعْنَى الْمَرَضِ فِىْ تَوَجُّهِ الْهَلَاكِ الْغَالِبِ وَمَا يَكُوْنُ الْغَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةُ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْفِرَارِ فَالْمَحْصُوْرُ وَالَّذِىْ فِىْ صَفِّ الْقِتَالِ الْغَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةُ لِاَنَّ الْحِصْنَ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِّ وَكَذَا الْمَنَعَةُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْفِرَارِ وَالَّذِىْ بَارَزَ اَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَيَتَحَقَّقُ بِهِ الْفِرَارُ وَلِهٰذَا اَخَوَاتٌ تَخْرُجُ عَلٰى هٰذَا الْحَرْفِ وَقَوْلُهُ اِذَا مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْوَجْهِ اَوْ قُتِلَ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا اِذَا مَاتَ بِذٰلِكَ السَّبَبِ اَوْ بِسَبَبٍ اٰخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ اِذَا قُتِلَ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি অবরুদ্ধ অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের সারিতে থেকে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে সে স্বামীর মিরাস পাবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, কিংবা কিসাস বা রজম হিসেবে হত্যার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে– যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় বা নিহত হয়। এর মূল কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী সূক্ষ্ম কিয়াস মতে মিরাস পাবে। আর ফাঁকির হুকুম সাব্যস্ত হবে স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর মিরাসের অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। আর তা সম্পৃক্ত হবে, এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল থাকে। যেমন– এরূপ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল যে, সুস্থ লোক যেমন অভ্যস্ত সেভাবে নিজের প্রয়োজন নিজে সে সারতে পারছে না। অবশ্য 'ফাঁকি দান'-এর হুকুম সাব্যস্ত হয় প্রবল মৃত্যু-আশঙ্কার ক্ষেত্রে রোগতুল্য বিষয় দ্বারাও। অপর পক্ষে নিরাপত্তার সম্ভাবনা প্রবল– এরূপ অবস্থার দ্বারা মিরাস থেকে ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং অবরুদ্ধ ব্যক্তি কিংবা যুদ্ধের সারিতে অবস্থিত ব্যক্তির নিরাপত্তার সম্ভাবনাই প্রবল। কেননা, দুর্গ হলো শত্রুর হামলা প্রতিরোধের জন্য, অনুরূপভাবে সৈন্যদলও। সুতরাং এর দ্বারা ফাঁকি দানের হুকুম সাব্যস্ত হবে না। আর যে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ে নেমেছে, কিংবা হত্যা করার জন্য যাকে উপস্থিত করা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে যেহেতু মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল, সেহেতু এর দ্বারা ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এ জাতীয় আরো শাখা মাসআলা বের হয়। যখন ঐ অবস্থায় মারা যায় কিংবা নিহত হয় – বক্তব্যটি প্রমাণ করে যে, ঐ কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন– রোগের কারণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি যখন নিহত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ كَانَ مَحْصُوْرًا اَوْ فِىْ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় কিংবা রণাঙ্গনে সৈন্যদের সারিতে অবস্থানরত অবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, এরপর সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে মিরাস পাবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি যুদ্ধের সারি থেকে বের হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয় অথবা কিসাস কিংবা রজমের কারণে হত্যা করার জন্য তাকে উপস্থিত করা হয়। আর এ অবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং ঐ অবস্থায় সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে।

আলোচ্য মাসআলায় মিরাস পাওয়া কিংবা মিরাস না পাওয়ার মূল কারণ আমরা পরিচ্ছেদের শুরুতেই বর্ণনা করেছি যে, اِمْرَأَةُ الْفَارِّ তথা মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে মিরাস পাবে; কিয়াস অনুযায়ী স্ত্রী মিরাস পাবে না। কেননা, মিরাস পাওয়ার সূত্র হলো, মৃত্যুর কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে স্বামী যেহেতু মৃত্যুর পূর্বে তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলেছে, সেহেতু মিরাস পাওয়ার সূত্র বিদ্যমান নেই। আর সূত্র ব্যতীত হুকুম সাব্যস্ত হয় না। এজন্যই এ মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে মিরাস পাবে না। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি হলো, স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে। কেননা, স্বামী উদ্ভূত অবস্থায় তালাক প্রদানের মাধ্যমে মিরাসের মূলভিত্তি বিবাহ-বন্ধনকে বাতিল করতে চাচ্ছে। তাই স্ত্রীর স্বার্থহানি রোধকল্পে স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে। অধিকন্তু হাদীসে এসেছে- إِنَّ امْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ - অর্থাৎ, মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী মিরাস পাবে।

'ফাঁকি দান' -এর হুকুম কখন সাব্যস্ত হবে, এ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন- স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর মিরাসের অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে। আর স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর মিরাসের অধিকার সম্পৃক্ত হয় তখনই, যখন স্বামী এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল হয়। যেমন- স্বামী এমনভাবে শয্যাশায়ী হয়ে গেল যে, সুস্থ লোকের মতো নিজের প্রয়োজন নিজে সারতে পারে না। যেমন- নামাজের সময় মসজিদে যেতে পারে না, পায়খানা-প্রস্রাব সারতে টয়লেটে যেতে পারে না।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ফকীহ্ শয্যাশায়ী বলে বিবেচ্য হবে তখনই, যখন তিনি মসজিদে যেতে অক্ষম হন, আর দোকানি যখন বাজারে যেতে অক্ষম হয় এবং স্ত্রীলোক যখন ছাদে আরোহণ করতে অক্ষম হয়, তখন তাদেরকে শয্যাশায়ী বলা হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বাড়ির ভিতরের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু বাড়ির বাইরের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে না পারে, তাহলে ওলামায়ে বুখারার মতে, এমন রোগী শয্যাশায়ীর হুকুমে পড়বে; আর ওলামায়ে বলখের মতে, সে সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মুতাআখ্খিরীন ওলামায়ে কেরামের মতে, অন্যের সাহায্য ছাড়া যদি কেউ তিনটি পদক্ষেপ ফেলতে পারে, তাহলে তাকে সুস্থ বলা হবে, তবে এ মতটি দুর্বল।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْفِرَارِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মিরাস থেকে ফাঁকিদানের হুকুম শুধুমাত্র অসুস্থতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রবল মৃত্যু আশঙ্কার ক্ষেত্রে রোগসমতুল্য অন্যান্য বিষয় দ্বারাও 'ফাঁকি দান' সাব্যস্ত হয়। যেমন- নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণকালে ঝড় উঠলে নৌকাডুবির প্রবল আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় সে ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, তাহলে মিরাস থেকে ফাঁকি দানের হুকুম সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যে অবস্থায় নিরাপত্তার সম্ভাবনা প্রবল, সে অবস্থা দ্বারা ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে না।

এ মূলনীতির আলোকে বলা যায়, যে ব্যক্তি দুর্গে অবরুদ্ধ কিংবা রণাঙ্গনে সৈন্য-সারিতে আছে, তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সম্ভাবনাই প্রবল। এজন্য এ ক্ষেত্রে মিরাস থেকে ফাঁকি দানের হুকুম সাব্যস্ত হবে না। নিরাপত্তার সম্ভাবনা প্রবল হওয়ার কারণ, দুর্গ হচ্ছে শত্রুর হামলা প্রতিহত করার জন্য। 'সৈন্যবল' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

আর যে ব্যক্তি সৈন্য-সারি থেকে বের হয়ে শত্রুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে কিংবা হত্যা করার জন্য হাজির করা হয়েছে, তার ক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল। তাই এ অবস্থায় তালাক দেওয়ার দ্বারা মিরাসের ব্যাপারে ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا اَخَوَاتُ الخ : আলোচ্য মূলনীতির ভিত্তিতে এ জাতীয় আরো কিছু অনুসিদ্ধান্ত বের হয়। যেমন- গর্ভবতী মহিলা সুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ে। গর্ভপাতের ব্যথা শুরু হলে সে অসুস্থ ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ إِذَا مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَجْهِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উক্তি- إِذَا مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْوَجْهِ اَوْ قُتِلَ [যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় কিংবা নিহত হয়] প্রমাণ করে যে, ঐ কারণে কিংবা অন্যকোনো কারণে মৃত্যু হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন- এক ব্যক্তি রোগের কারণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে। সে যদি নিহত হয়, তাহলেও তার স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে- মিরাসের ব্যাপারে ফাঁকি দান সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَانَتْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ وَهٰذَا عَلَى وُجُوْهٍ إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيْءِ الْوَقْتِ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ إِمَّا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ بِمَجِيْءِ الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ أَوْ صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ وَكَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ التَّعْلِيْقِ فِي حَالِ تَعَلُّقِ حَقِّهَا بِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثْ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) تَرِثُ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ فَكَانَ إِيْقَاعًا فِي الْمَرَضِ وَلَنَا أَنَّ التَّعْلِيْقَ السَّابِقَ يَصِيْرُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكْمًا لَا قَصْدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ ـ

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি যদি সুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে, 'যখন মাস শুরু হবে, কিংবা যখন তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে, কিংবা যখন অমুক জোহর নামাজ পড়বে, কিংবা অমুক যখন এই ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তুমি তালাক; অতঃপর স্বামী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর এ সকল শর্ত পাওয়া গেল, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। আর এ সকল শর্ত রোগশয্যা অবস্থায় হলে স্ত্রী মিরাস পাবে। তবে 'যখন তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর' বক্তব্যটি ভিন্ন। আলোচ্য মাসআলার কয়েকটি সুরত রয়েছে। তালাককে কোনো সময় আসার সাথে কিংবা অপর কোনো ব্যক্তির কাজের সাথে কিংবা নিজের কাজের সাথে কিংবা স্ত্রীর কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা। প্রতিটিরই আবার দুই অবস্থা– শর্তারোপ হবে সুস্থাবস্থায় আর শর্ত সম্পন্ন হবে অসুস্থাবস্থায়। অথবা উভয়টিই হবে অসুস্থ অবস্থায়। প্রথম দুই সুরত, তা হলো– সময়ের আগমনের সাথে শর্তারোপ করা; যেমন স্বামী বলল– 'যখন মাস শুরু হবে, তখন তুমি তালাক' কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাজের সাথে শর্তারোপ করা। যেমন স্বামী বলল– 'অমুক যখন এই ঘরে প্রবেশ করবে কিংবা জোহরের নামাজ পড়বে।' উভয় সুরতে যদি শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন হয় অসুস্থাবস্থায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, [মিরাস থেকে] ফাঁকি দানের ইচ্ছা সাব্যস্ত হয়েছে স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার অবস্থায় শর্তারোপের মাধ্যমে। আর যদি শর্তারোপ সুস্থ অবস্থায় এবং শর্ত অসুস্থ অবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, মিরাস পাবে। কেননা, শর্তযুক্ত বিষয় শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় শর্তহীন বিষয়ের মতো হয়। সুতরাং এটি অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেওয়া বলে গণ্য হবে। আর আমাদের দলিল হলো, পূর্বের শর্তযুক্ত তালাক শর্ত সম্পন্ন হওয়ার সময় তালাক দেওয়া বলে সাব্যস্ত হয় কার্যকরীভাবে; স্বেচ্ছায় নয়। আর ইচ্ছা ছাড়া জুলুম হয় না সুতরাং তার কর্মকে রদ করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ الخ : আলোচ্য ইবারতে শর্তারোপের চারটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে।

১. স্বামী সুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলে- إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ – যখন মাস শুরু হবে, তখন তুমি তালাক, ২. إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ – যখন তুমি এই ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তুমি তালাক, ৩. إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ – যখন অমুক জোহরের নামাজ পড়বে, তখন তুমি তালাক, ৪. إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ – অমুক যখন এই ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তুমি তালাক।

উল্লেখ্য, فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] – এ কথা দ্বারা বায়েন তালাক উদ্দেশ্য। কেননা, মিরাস থেকে ফাঁকি দানের বিধান বায়েন তালাক দ্বারাই সাব্যস্ত হয়।

উপরিউক্ত চারটি সুরতে স্বামী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর যদি শর্ত সম্পন্ন হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। আর এ সকল শর্তারোপ যদি রোগশয্যার অবস্থায় হয়, তাহলে দ্বিতীয় সুরত [যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক] ব্যতীত অন্যান্য সুরতে স্ত্রী মিরাস পাবে।

আলোচ্য মাসআলার সুরতে হাল কয়েক প্রকার। প্রথমত, তালাককে সময়ের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করা। দ্বিতীয়ত কোনো ব্যক্তির কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা; তৃতীয়ত, নিজের কোনো কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা; চতুর্থত, স্ত্রীর কোনো কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা। এগুলোর প্রতিটিরই আবার দুটি সুরত হতে পারে- ১. শর্তারোপ হবে সুস্থাবস্থায় এবং শর্ত সম্পন্ন হবে অসুস্থ অবস্থায়। ২. উভয়টিই হবে অসুস্থাবস্থায়।

অবশ্য আরো দুটি সুরত আছে। তা হলো- অসুস্থাবস্থায় শর্তারোপ হবে, তবে শর্ত সম্পন্ন হবে সুস্থাবস্থায় কিংবা উভয়টিই সুস্থাবস্থায়। এ দুটি সুরতে সন্দেহাতীতভাবে তালাক হবে এবং স্ত্রী মিরাস পাবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ দুটি সুরত উল্লেখ করেননি।

উপরিউক্ত চারটি সুরতে হালকে দুই দিয়ে গুণ দিলে মোট আটটি সুরত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে আলোচিত হলো-

প্রথম দুই সুরতে অর্থাৎ, তালাককে যদি সময়ের আগমনের সাথে শর্তারোপ করে বলে- إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ [যখন মাস হবে, তখন তুমি তালাক] কিংবা তালাককে অন্যকোনো ব্যক্তির কাজের সাথে শর্তারোপ করে যদি বলে- إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ أَوْ صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ [অমুক যখন এই ঘরে প্রবেশ করবে কিংবা জোহরের নামাজ পড়বে, তখন তুমি তালাক]; আর উভয় সুরতে শর্তারোপ ও শর্তের অস্তিত্ব দুটোই যদি অসুস্থাবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে।

এর দলিল হলো, এ দুই সুরতে স্বামীর পক্ষ থেকে ফাঁকি দানের ইচ্ছা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, স্বামী স্ত্রীর তালাক প্রদানকে এমন অবস্থায় শর্তারোপ করেছে, যখন তার সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক ও অধিকার সম্পৃক্ত হয়েছে। আর আমাদের মাযহাব মতে, মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী মিরাস পায়। তাই এখানেও স্ত্রী মিরাস পাবে।

আর উপরিউক্ত দুই সুরতে শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় হয়, আর শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, মিরাস পাবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, শর্তযুক্ত তালাক শর্তটি সম্পন্ন হওয়ার সময় ঠিক সেভাবেই পতিত হয়, যেভাবে নিঃশর্ত তালাক পতিত হয়। সুতরাং এটি এমন হয়ে গেল যেন সে অসুস্থাবস্থায় তালাক দিয়েছে। এরূপ তালাককে طَلَاقُ الْفَارِّ তথা ফাঁকিদাতার তালাক বলা হয়। আর ফাঁকিদাতার তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী থেকে মিরাস পায়। সুতরাং এখানেও স্ত্রী মিরাস পাবে।

আর আমাদের দলিল হলো, পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক শর্তের অস্তিত্ব লাভকালে কার্যকরীভাবে (حُكْمًا) তালাক দেওয়া বলে সাব্যস্ত হয়; স্বেচ্ছাকৃতভাবে (قَصْدًا) নয়।

দুটি মাসআলার দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত। একটি মাসআলা হলো, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাককে শর্তযুক্ত করল, আর শর্তের অস্তিত্ব লাভকালে সে ব্যক্তি পাগল হলেও তালাক সাব্যস্ত হবে। অথচ পাগলের তালাক পতিত হয় না। অন্য মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর তালাককে শর্তযুক্ত করল, অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক না দেওয়ার ব্যাপারে কসম করল, এরপর শর্ত পাওয়া গেল, তাহলে সে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক যদি শর্তের অস্তিত্ব লাভকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তালাক দেওয়া হতো, তাহলে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী বলে বিবেচ্য হতো। সুতরাং এ দুটি মাসআলা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক শর্ত সম্পন্ন হওয়ার সময় তালাক দেওয়া হয় বলে সাব্যস্ত হয় কার্যকরীভাবে; স্বেচ্ছাকৃতভাবে নয়। আর ইচ্ছা ছাড়া জুলুম সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং স্বামীর কর্ম এ ক্ষেত্রে রদ হবে না। আর তার কর্মকে যখন রদ করা যায় না, তখন সুস্থাবস্থায় তালাক প্রদান বলে তা গণ্য হবে। সুতরাং তার স্ত্রী ফাঁকিদাতার স্ত্রী বলে গণ্য না হওয়ার কারণে স্বামী থেকে মিরাস পাবে না।

فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ يَصِيْرُ فَارًّا لِوُجُوْدِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدٌّ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيْقِ أَلْفُ بُدٍّ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا ـ

অনুবাদ : আর তৃতীয় সুরতটি, তাহলো স্বামী নিজের কোনো কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে তখন শর্তারোপ সুস্থাবস্থায় ও শর্ত অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হোক কিংবা উভয়টিই অসুস্থাবস্থায় হোক এবং তা অপরিহার্য কর্ম হোক অথবা পরিহারযোগ্য কর্ম হোক, সে [মিরাস থেকে] ফাঁকি দানকারীরূপে গণ্য হবে। কেননা, অসুস্থাবস্থায় শর্তারোপ কিংবা শর্তটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার বাতিল করার ইচ্ছা বিদ্যমান রয়েছে। যদি শর্তটি এমন হয় যে, তা অপরিহার্য, তাহলে শর্তারোপ না করার হাজারো উপায় ছিল। সুতরাং স্ত্রীর ক্ষতি রোধকল্পে তার কর্মকে প্রতিহত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ الخ : আর তৃতীয় সুরতে অর্থাৎ, স্বামী যখন স্ত্রীর তালাককে নিজের কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, তখন দুটি সুরত হতে পারে– ১. শর্তারোপ সুস্থাবস্থায় আর শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় হতে পারে। ২. কিংবা উভয়টি অসুস্থাবস্থায় হতে পারে। স্বামী যে কাজের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করেছে, সে কাজটি অপরিহার্য কর্ম হতে পারে; যেমন- পানাহার, ফরজ নামাজ ইত্যাদি; আবার সে কাজটি পরিহার করা সম্ভব এমন কর্মও হতে পারে। যেমন– কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলা। এ তৃতীয় সুরতে সর্বাবস্থায় স্বামী ফাঁকি দানকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যায় তালাককে শর্তারোপ দ্বারা কিংবা শর্তটি সম্পন্ন করার দ্বারা স্ত্রীর হক নষ্ট করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং স্বামীর কর্মকে রদ করা হবে স্ত্রীর ক্ষতি রোধ করার জন্য।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ الخ : এ ইবারত দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, স্বামী যদি তালাককে এমন কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, যা অপরিহার্য; যেমন– ফরজ নামাজের সাথে তালাকের শর্তারোপ করে। তাহলে তো এ কাজটি করতে সে বাধ্য। সুতরাং তার কর্ম রদ করা হবে না।

উত্তর: এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এমন শর্তারোপ না করার তো হাজারো উপায় ছিল। এরূপ শর্তারোপের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এ কারণেই তার কর্মকে রদ করা হবে।

وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُمْ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ كَكَلَامِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَرِثْ لِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَابُدَّ لَهَا مِنْهُ كَأَكْلِ الطَّعَامِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ وَكَلَامِ الْأَبَوَيْنِ تَرِثُ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِمَا لَهَا فِي الْإِمْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْعُقْبٰى وَلَا رِضَاءَ مَعَ الْإِضْطِرَارِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَلَا إِشْكَالَ أَنَّهُ لَا مِيْرَاثَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَابُدَّ لَهَا مِنْهُ فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعْدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رح) تَرِثُ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَلْجَأَهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِلُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ كَأَنَّهَا اٰلَةٌ لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ .

অনুবাদ : আর চতুর্থ সুরত হলো, স্বামী যখন স্ত্রীর কোনো কর্মের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করবে, তখন শর্তারোপ ও শর্ত অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয় আর কাজটি তার জন্য পরিহারযোগ্য; যেমন– যায়েদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি, তাহলে সে মিরাস পাবে না। কেননা, এতে সে সম্মত আছে। আর যদি কাজটি তার জন্য অপরিহার্য হয়; যেমন– পানাহার, জোহরের নামাজ, পিতামাতার সাথে কথা বলা, তাহলে সে মিরাস পাবে। কেননা, সে এগুলো করতে বাধ্য। এজন্য যে, এগুলো থেকে বিরত থাকলে দুনিয়াতে 'মৃত্যু' কিংবা আখিরাতে শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। আর বাধ্য করার সাথে সম্মতি থাকে না। আর শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় এবং শর্ত অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয়, আর কাজটি স্ত্রীর জন্য পরিহারযোগ্য, তাহলে তার মিরাস না পাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন নেই। আর কাজটি যদি স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য হয়, তাহলেও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট একই জবাব। এটি ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত। কেননা, স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো কর্ম পাওয়া যায়নি– স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হওয়ার পর। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, স্বামী তাকে কাজটিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে। সুতরাং কাজটি স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে। স্ত্রী যেন তার জন্য যন্ত্র ছিল– যেমন বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ الخ : আর চতুর্থ সুরতে অর্থাৎ, স্বামী যখন তালাককে স্ত্রীর কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে, তখন যদি শর্তারোপ ও শর্ত দুটোই অসুস্থাবস্থায় হয় আর কাজটিও এমন, যা স্ত্রীর পক্ষে পরিহার করা সম্ভব; যেমন– নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলা, তাহলে মিরাস পাবে না। কেননা, শর্তযুক্ত কাজটি সম্পাদন করার দ্বারা বুঝা যায়, স্ত্রী নিজের অধিকার

বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে ; অন্যথায় সে এ কাজটি করত না। আর শর্তযুক্ত কাজটি যদি নামাজ পড়া, পানাহার করা, মা-বাবার সাথে কথা বলার মতো অপরিহার্য হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, স্ত্রী উক্ত কর্ম সম্পাদনে বাধ্য। কেননা, এ থেকে বিরত থাকলে দুনিয়ায় মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, যেমন পানাহারের ক্ষেত্রে; আবার আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে যেমন– নামাজ ও পিতামাতার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে। আর বাধ্য হয়ে কোনো কাজ সম্পাদন করার দ্বারা সম্মতি প্রকাশ পায় না। সুতরাং এ কথা বলা যায় না যে, এ স্ত্রী নিজের অধিকার বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে।

আর শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় হয় এবং শর্তের অস্তিত্ব ঘটে অসুস্থাবস্থায়, আর কাজটি এমন যা পরিহার করা সম্ভব; যেমন– ঘরে প্রবেশ করা, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। আর শর্তযুক্ত কাজটি যদি অপরিহার্য হয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, স্ত্রী মিরাস পাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, স্ত্রী মিরাস পাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী যখন তালাককে শর্তযুক্ত করেছে, তখন তার সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত ছিল না। আর যখন স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হয়েছে, তখন স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো আচরণ ও কর্ম পাওয়া যায়নি। সুতরাং স্বামীকে মিরাস ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। আর তাই স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে না।

পক্ষান্তরে শায়খাইনের দলিল হলো, শর্তযুক্ত কাজটি অপরিহার্য হওয়ার কারণে স্বামী কাজটি করতে স্ত্রীকে বাধ্য করেছে। সুতরাং কাজটি স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে। এ কাজটি সম্পাদনে স্ত্রী যেন স্বামীর জন্য যন্ত্রস্বরূপ। যেমন– বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যায়েদ বকরকে অন্যের সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করল, আর বকর তা ধ্বংস করলে জরিমানা যায়েদের উপর বর্তাবে। কেননা, বাধ্য ব্যক্তির কর্ম বাধ্যকারীর দিকেই সম্পৃক্ত হয়। অনুরূপভাবে এখানেও স্ত্রীর কাজটি স্বামীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। স্বামী যেন তার অসুস্থাবস্থায় শর্তযুক্ত কাজটি সম্পাদন করেছে। এ কারণেই স্ত্রী অধিকারিণী হবে। কেননা, তার স্বামী এ ক্ষেত্রে মিরাস থেকে ফাঁকিদাতা হিসেবে বিবেচ্য। –[আইনী, ইনায়া]

قَالَ وَاِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْ وَقَالَ زُفَرُ (رح) تَرِثُ لِاَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِيْنَ اَوْقَعَ فِى الْمَرَضِ وَقَدْ مَاتَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ وَ لٰكِنَّا نَقُوْلُ الْمَرَضُ اِذَا تَعَقَّبَهُ بَرْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ لِاَنَّهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَرَضُ الْمَوْتِ فَتَبَيَّنَ اَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لِهِ فَلَا يَصِيْرُ الزَّوْجُ فَارًّا وَلَوْ طَلَّقَهَا فَارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْلَمَتْ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْ وَاِنْ لَمْ تَرْتَدَّ بَلْ طَاوَعَتْ اِبْنَ زَوْجِهَا فِى الْجِمَاعِ وَرِثَتْ وَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّهَا بِالرِّدَّةِ اَبْطَلَتْ اَهْلِيَّةَ الْاِرْثِ اِذِ الْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ اَحَدًا وَلَا بَقَاءَ لَهُ بِدُوْنِ الْاَهْلِيَّةِ وَبِالْمُطَاوَعَةِ مَا اَبْطَلَتِ الْاَهْلِيَّةَ لِاَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا يُنَافِى الْاِرْثَ وَهُوَ الْبَاقِىْ بِخِلَافِ مَا اِذَا طَاوَعَتْ فِىْ حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِاَنَّهَا تُثْبِتُ الْفُرْقَةَ فَتَكُوْنُ رَاضِيَةً بِبُطْلَانِ السَّبَبِ وَبَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অসুস্থাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় অতঃপর সে সুস্থ হয় এবং মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, সে মিরাস পাবে। কেননা, সে অসুস্থাবস্থায় ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা করেছে এবং ইদ্দতকালীন সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমরা বলি, অসুস্থতার পর সুস্থতা লাভ সুস্থতারই পর্যায়ে। কেননা, এর দ্বারা মৃত্যুরোগ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো যে, স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর কোনো অধিকার সম্পৃক্ত হয়নি। সুতরাং স্বামী ফাঁকি দানকারী হবে না। আর স্বামী [মৃত্যুরোগ শয্যায়] স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর আল্লাহ না করুন সে যদি মুরতাদ হয়ে যায় অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে, এরপর স্বামী তার মৃত্যুরোগ শয্যা থেকেই মারা যায় আর সে ইদ্দত অবস্থায় থাকে, তাহলে সে মিরাস পাবে না। আর যদি মুরতাদ না হয়; বরং সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করে, তাহলে মিরাস পাবে। [উভয়ের মধ্যকার] পার্থক্যের কারণ হলো, সে মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা বাতিল করে দিয়েছে। কেননা, মুরতাদ কারো ওয়ারিশ হয় না। আর যোগ্যতা ছাড়া মিরাসের অধিকার থাকে না। আর যৌনাচারের সুযোগ দেওয়ার দ্বারা যোগ্যতা বাতিল করেনি। কেননা, হুরমত মিরাসের পরিপন্থি নয়। সুতরাং তা বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে বিবাহ বিদ্যমান থাকাকালে [যৌনাচারের] সুযোগ দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। সুতরাং সে [উত্তরাধিকারের] সূত্র বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে। অপর দিকে তিন তালাকের পর সুযোগ দানের দ্বারা বিবাহের হুরমত সাব্যস্ত হয় না, তালাক তা থেকে অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে। সুতরাং উভয় অবস্থা ভিন্ন হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ : জামিউস সাগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জামিউস সাগীরের অধিকাংশ নুসখায় قَالَ শব্দটির উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি অসুস্থাবস্থায় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, অতঃপর সে সুস্থ হয় এবং ইদ্দতের মধ্যে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামী থেকে মিরাস পাবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী তার অসুস্থাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে স্ত্রীকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করেছে; আর স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় সে মারাও গেছে। সুতরাং তার স্ত্রী মিরাস থেকে ফাঁকিদাতার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। আর ফাঁকিদাতার স্ত্রী মিরাস পায়। অতএব, এখানেও স্ত্রী মিরাস পাবে। আর তালাক প্রদান ও মৃত্যুর মধ্যকার সুস্থতা ধর্তব্য নয়। এর উত্তরে আমরা বলি, অসুস্থতার পর যদি সুস্থতা লাভ হয়, তাহলে তা হলো সুস্থতারই শামিল। কেননা, এ সুস্থতা দ্বারা মৃত্যুরোগ শয্যা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর কোনো হক সম্পর্কিত হয়নি। সুতরাং এই তালাকের দ্বারা স্বামী ফাঁকি দানকারী হবে না। আর তাই স্ত্রীও মিরাসের অধিকারী হবে না।

উল্লেখ্য, জামিউস সাগীরে ইমাম যুফার (র.) -এর এই মতপার্থক্য বর্ণিত হয়নি, অনুরূপভাবে 'আসল' [اَلْأَصْلُ] -এর মাঝেও উল্লিখিত হয়নি। হাকিম (র.) -তার মুখতাসারেও ইমাম যুফার (র.) -এর এ মতপার্থক্য উল্লেখ করেননি।

-[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২১]

قَوْلُهُ لَوْ طَلَّقَهَا فَارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ الخ : স্বামী যদি মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে তিন তালাক কিংবা একটি বায়েন তালাক প্রদানের পর আল্লাহ না করুন স্ত্রীলোকটি মুরতাদ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করে, অতঃপর স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যায় থেকেই মারা যায়; আর এ সবকিছুই ঘটে ইদ্দতের মধ্যে, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। পক্ষান্তরে স্বামীর তালাক প্রদানের পর স্ত্রী মুরতাদ না হয়ে যদি সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করে, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো, মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কেননা, মুরতাদ কারো ওয়ারিশ হতে পারে না। আর যোগ্যতা ছাড়া মিরাসের অধিকার থাকে না। এ কারণেই মুরতাদ হওয়ার সুরতে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবে না। পক্ষান্তরে সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদানের কারণে ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়নি। কেননা, এ আচরণের দ্বারা উভয়ের মাঝে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর এ হুরমত উত্তরাধিকারের পথে অন্তরায় নয়; বরং তা বিবাহের পরিপন্থি। যেমন মা, বোনের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা উত্তরাধিকারের পরিপন্থি নয়। সুতরাং সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদানকালে উত্তরাধিকার অবশিষ্ট রয়েছে বলে তা বহাল থাকবে।

পক্ষান্তরে বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্ত্রী যদি সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ দেয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে স্ত্রী মিরাস পাবে না। কেননা, এ আচরণের ফলে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকটি উত্তরাধিকারের কারণ বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর এ ধরনের কর্মে লিপ্ত হলে এবং তার ইদ্দত অবস্থায় স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যায় মারা গেলে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে হুরমত পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে অতঃপর সৎপুত্রের সাথে যৌনাচারের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং এখানে বিচ্ছেদ স্বামীর পক্ষ থেকে ঘটেছে। আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুরোগ শয্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়, তাহলে সে স্ত্রীকে ফাঁকিদাতার স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। আর ফাঁকি দানের ফলে স্ত্রী স্বামীর মিরাস পায়। সুতরাং উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হলো।

وَمَنْ قَذَفَ إِمْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَلَاعَنَ فِى الْمَرَضِ وَرِثَتْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا تَرِثُ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِى الْمَرَضِ وَرِثَتْهُ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَهٰذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِعْلٍ لَابُدَّ لَهَا مِنْهُ اِذْ هِىَ مَلْجَأَةٌ إِلَى الْخُصُوْمَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَاءِ عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ وَإِنْ اٰلٰى إِمْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتْ بِإِيْلَاءٍ وَهُوَ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ وَإِنْ كَانَ الْإِيْلَاءُ أَيْضًا فِى الْمَرَضِ وَرِثَتْ لِأَنَّ الْإِيْلَاءَ فِى مَعْنٰى تَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِمَضِىِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ خَالٍ عَنِ الْوِقَاعِ فَيَكُوْنُ مُلْحَقًا بِالتَّعْلِيْقِ بِمَجِىْءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَالطَّلَاقُ الَّذِىْ يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَةَ تَرِثُ بِهِ فِى جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ حَتّٰى يَحِلَّ الْوَطْئُ فَكَانَ السَّبَبُ قَائِمًا وَكُلَّمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَرِثُ إِنَّمَا تَرِثُ إِذَا مَاتَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : কেউ যদি সুস্থাবস্থায় তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করে, আর অসুস্থ অবস্থায় লি'আন করে, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মিরাস পাবে না। আর যদি অসুস্থাবস্থায় অভিযোগ করে, তাহলে সকলের মতেই মিরাস পাবে। এ সুরতটি সংযুক্ত অপরিহার্য কোনো কাজ দ্বারা শর্তযুক্ততার সাথে। কেননা, এখানে স্ত্রী জেনার অপবাদ রহিত করার জন্য বিবাদে যেতে বাধ্য। আমরা এর কারণ বর্ণনা করেছি। আর যদি স্বামী সুস্থাবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করে অতঃপর ঈলার কারণে অসুস্থাবস্থায় বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। আর যদি 'ঈলা'-ও অসুস্থাবস্থায় হয়, তাহলে মিরাস পাবে। কেননা, ঈলা অর্থ– তালাককে শর্তযুক্ত করা সহবাসমুক্ত চার মাসের সাথে। সুতরাং তা সময়ের আগমনের সাথে শর্তযুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে তালাকের পর স্বামী রাজ'আতের মালিক হয়, সে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, আমরা বর্ণনা করেছি যে, রাজ'ঈ তালাক বিবাহকে বিলুপ্ত করে না, আর তাইতো সে সময় সহবাস বৈধ। সুতরাং [উত্তরাধিকারের] সূত্র বিদ্যমান রয়েছে। আর যত স্থানে আমরা উল্লেখ করেছি 'স্ত্রী মিরাস পাবে' সেখানে এর অর্থ হবে, স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মারা গেলে সে মিরাস পাবে। আমরা তা বর্ণনা করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَذَفَ إِمْرَأَتَهُ وَهُوَ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি সুস্থাবস্থায় নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগ আরোপ করে এবং মৃত্যুরোগ শয্যায় লি'আন [একে অপরকে অভিসম্পাত] করে, আর বিচারক উভয়ের বিচ্ছেদের ফয়সালা দেয় অতঃপর স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে এ স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে। এটি হলো শায়খাইনের অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, সে মিরাস পাবে না।

আর যদি স্বামী অসুস্থাবস্থায় ব্যভিচারের অভিযোগ করে, তাহলে সকলের মতেই স্ত্রী মিরাসের অধিকারী হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ হুকুমটি এমন শর্তযুক্ত তালাকের সাথে সংযুক্ত হবে, যেখানে তালাককে এমন একটি কাজের সাথে শর্তারোপ করা হয়, যা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। কেননা, স্ত্রী এখানে আদালতে বিবাদে যেতে বাধ্য– নিজের প্রতি আরোপিত জেনার অপবাদ রহিত করার জন্য। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদে স্ত্রীর সম্মতি ছিল না; বরং স্বামীই তাকে লি'আনে যেতে বাধ্য করেছে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, শর্তারোপ যদি সুস্থাবস্থায় এবং শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থাবস্থায় হয়, আর কাজটি যদি অপরিহার্য হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, স্ত্রী মিরাস পাবে। কারণ, স্বামী কাজটি করার জন্য তাকে বাধ্য করেছে। সুতরাং কাজটি স্বামীর প্রতিই সম্পৃক্ত হবে। স্ত্রী যেন তার জন্য যন্ত্রবৎ ছিল।

قَوْلُهُ وَإِنْ آلَى إِمْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি সুস্থাবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করে [অর্থাৎ, আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, চার মাস আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না] অতঃপর ঈলার কারণে তথা সহবাসমুক্ত চার মাস অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় স্বামীর অসুস্থাবস্থায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে না। এর দলিল হলো– বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামীর 'ঈলা'-এর দিকে সম্পর্কিত। মৃত্যুরোগ শয্যায় স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের সূত্র কিংবা শর্ত কোনোটিই সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং স্বামীকে মিরাস থেকে ফাঁকিদাতা বলে গণ্য করা যায় না। আর তাই স্ত্রীও মিরাস পাবে না।

পক্ষান্তরে 'ঈলা' ও বিচ্ছেদ উভয়টিই যদি অসুস্থাবস্থায় হয়, অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইদ্দত অবস্থায় স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, 'ঈলা'-এর অর্থ হলো, সহবাসমুক্ত চার মাসের সাথে তালাককে শর্তযুক্ত করা। সুতরাং এ সুরতটি নির্ধারিত সময়ের আগমনের সাথে তালাককে শর্তযুক্ত করার শামিল। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, তালাককে সময়ের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করলে; যেমন– যখন মাস শুরু হবে, তখন তুমি তালাক; এবং শর্তারোপ এবং শর্তের অস্তিত্ব দুটোই যদি অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক ও অধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার অবস্থায় শর্তারোপের মাধ্যমে ফাঁকি দানের ইচ্ছা সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী মিরাস পাবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالطَّلَاقُ الَّذِىْ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আলোচ্য ইবারতে দুটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. স্বামী যদি মৃত্যুরোগ শয্যায় তার স্ত্রীকে তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করে অতঃপর স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। পূর্বে এর কারণ উল্লিখিত হয়েছে যে, তালাকে রাজ'ঈ বিবাহকে বিলুপ্ত করে না। তাইতো তালাকে রাজ'ঈর পর সহবাসের বৈধতা থাকে। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে বিবাহ-বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং স্ত্রী মিরাস পাবে।
২. 'স্ত্রী মিরাস পাবে' – যত জায়গায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই এর অর্থ হলো, স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলে তবেই স্ত্রী মিরাস পাবে। এ অধ্যায়ের শুরুতেই তা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। যেমন–

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ فِىْ مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ . وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مِيْرَاثَ لَهَا .

অর্থাৎ, পুরুষ যদি তার মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, তারপর স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে স্ত্রী তার মিরাস পাবে; আর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তাহলে স্ত্রীর কোনো মিরাস নেই।

بَابُ الرَّجْعَةِ

وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً رَجْعِيَّةً اَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فِيْ عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذٰلِكَ اَوْ لَمْ تَرْضَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَابُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِاَنَّ الرَّجْعَةَ اِسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ سُمِّيَ اِمْسَاكًا وَهُوَ الْاِبْقَاءُ وَاِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْاِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ لِاَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ اِنْقِضَائِهَا ـ

পরিচ্ছেদ : রাজ'আত

অনুবাদ : পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক কিংবা দুই তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করে, তাহলে সে তার ইদ্দতের ভিতরে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে সে সম্মত হোক বা না হোক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ – "তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে" [সূরা তালাক : আয়াত– ২] –কোনো পার্থক্য বিচার না করে। আর ইদ্দত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কেননা রাজ'আত অর্থ হলো বৈবাহিক মালিকানা অব্যাহত রাখা। দেখুন না কুরআনে এটাকে اِمْسَاك তথা ধরে রাখা বলা হয়েছে। আর ইদ্দতের সময়ের মধ্যেই অব্যাহত রাখা সাব্যস্ত। কেননা ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে বৈবাহিক মালিকানা থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : নীতিগতভাবে তালাকের পর রাজ'আত সাব্যস্ত হয় বলে উল্লেখের ক্ষেত্রেও তালাকের আলোচনার পর রাজ'আতের আলোচনা করা হয়েছে। رَجْعَتْ - শব্দটি ـِ رَا -কে যেরযোগে رِجْعَتْ ও যবরযোগে رَجْعَتْ - উভয়ভাবে পড়া যায়। তবে যবরযোগে পড়াই অধিক বিশুদ্ধ। رَجَعَ يَرْجِعُ বাবে ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়– فِعْلِ لَازِمْ [অকর্মক ক্রিয়া] ও فِعْلِ مُتَعَدِّىْ [সকর্মক ক্রিয়া উভয়ভাবে। যেমন– فِعْلِ لَازِمْ [অকর্মক ক্রিয়া] হিসেবে কুরআন শরীফে এসেছে– لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ [আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি .... [সূরা মুনাফিকূন : আয়াত– ৮]; فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اَبِيْهِمْ [অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করল ... [সূরা ইউসুফ : আয়াত– ৬৩] : وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ [নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হব ... [সূরা বাকারা, আয়াত– ১৫৬]। আর فِعْلِ مُتَعَدِّىْ [সকর্ম ক্রিয়া] হিসেবে কুরআনে এসেছে– فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ [বস্তুত আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোনো বিশেষ শ্রেণীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান ...... [সূরা তাওবা : আয়াত–৮৩] ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ [অতঃপর তুমি দৃষ্টিকে বারবার ফিরাও .....[সূরা মুলক : আয়াত– ৪]। আর رُجُوْع -শব্দটি مَصْدَر لَازِمْ [অকর্মক ক্রিয়ামূল] যেমন– جُلُوْس ও قُعُوْد । আর اَلرَّجْعُ শব্দটি مَصْدَر مُتَعَدِّىْ [সকর্মক ক্রিয়ামূল]।

শরিয়তের পরিভাষায় রাজ'আত বলা হয়– إِسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ – 'বৈবাহিক মালিকানাকে অব্যাহত রাখা।' রাজ'আতের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য– ১. সুস্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়া। যেমন– اَنْتِ طَالِقٌ [তুমি তালাক] : طَلَّقْتُكِ [আমি তোমাকে তালাক দিলাম] কিংবা কিছু ইঙ্গিতসূচক শব্দের মাধ্যমে তালাক দেওয়া, যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেমন– اِعْتَدِّيْ [তুমি ইদ্দত পালন কর]; إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ [তোমার জরায়ু মুক্ত কর]; اَنْتِ وَاحِدَةٌ [তুমি এক]। ২. তালাকের বিনিময়ে মাল সম্পদ না নেওয়া ৩. তিন তালাক না দেওয়া ৪. স্ত্রী সহবাসকৃতা হওয়া ৫. ইদ্দত বিদ্যমান থাকা।

রাজ'আত কুরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত। এজন্য রাজ'আতের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে–

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [তাহলে স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে]। فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ [অতঃপর তারা যখন ইদ্দতকালে পৌছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে......[সূরা তালাক : আয়াত–২]। হাদীসে এসেছে, হযরত ওমর (রা.) -কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন– مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا [তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়]। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাওদা (রা.) -কে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আর রাজ'আত সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে এক তালাক কিংবা দুই তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করে, তাহলে স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে– স্ত্রী সম্মত থাকুক কিংবা না থাকুক এর দলিল হলো– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ অর্থাৎ অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে কিংবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে– ... [সূরা তালাক : আয়াত– ২]। এ আয়াতে শর্তহীনভাবে রাজ'আতের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতির মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। দ্বিতীয় দলিল হলো, আবূ দাউদ শরীফে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ (رض) ثُمَّ رَاجَعَهَا অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.) -কে তালাক দিলেন অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নিলেন।' অধিকন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসে এসেছে– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে বললেন– তুমি তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়।

রাজ'আতের জন্য ইদ্দত বিদ্যমান থাকা জরুরি। এর দলিল হলো– রাজ'আতের অর্থ হচ্ছে, স্বামী-স্বত্ব অব্যাহত রাখা তাইতো কুরআন শরীফে রাজ'আতকে إِمْسَاكٌ বলা হয়েছে। এর অর্থ– ধরে রাখা। আর স্বামী-স্বত্বকে অব্যাহত রাখা কেবল ইদ্দতের সময়ের ভিতরেই সম্ভব। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্বত্ব অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রও শেষ হয়ে যায়।

وَالرَّجْعَةُ اَنْ يَقُوْلَ رَاجَعْتُكِ اَوْ رَاجَعْتُ اِمْرَأَتِيْ وَهٰذَا صَرِيْحٌ فِي الرَّجْعَةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ قَالَ اَوْ يَطَأُهَا اَوْ يُقَبِّلُهَا اَوْ يَمُسُّهَا بِشَهْوَةٍ اَوْ يَنْظُرُ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ اِلَّا بِالْقَوْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِاَنَّ الرَّجْعَةَ بِمَنْزِلَةِ اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ حَتّٰى يَحْرُمَ وَطْيُهَا وَعِنْدَنَا هُوَ اِسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ وَسَنُقَرِّرُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْاِسْتِدَامَةِ كَمَا فِيْ اِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَالدَّلَالَةُ فِعْلٌ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهٰذِهِ الْاَفَاعِيْلُ تَخُصُّ بِهٖ خُصُوْصًا فِيْ حَقِّ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِاَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ بِدُوْنِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيْبِ وَغَيْرِهِمَا وَالنَّظَرُ اِلٰى غَيْرِ الْفَرْجِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَاكِنِيْنَ وَالزَّوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَّةِ فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَّقَهَا فَيَطُوْلُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : আর রাজ'আত হলো, এ কথা বলা, 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম' কিংবা 'আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।' এটা রাজ'আতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট শব্দ। এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কিংবা সে তার সাথে সঙ্গম করল কিংবা তাকে চুম্বন করল কিংবা কামসহ স্পর্শ করল কিংবা তার যৌনাঙ্গের দিকে কামসহ তাকাল। এটা আমাদের অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কথা বলতে সক্ষম অবস্থায় কেবল বলার দ্বারাই রাজ'আত সহীহ হবে। কেননা রাজ'আত নতুন বিয়ের পর্যায়ে। অন্যথায় তার সাথে সঙ্গম করা হারাম। আমাদের মতে, এটা হলো বিবাহকে অব্যাহত রাখা, যেমনটা আমরা বর্ণনা করেছি। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তা বিস্তারিত বর্ণনা করব। আর কর্মও কখনো কখনো অব্যাহত রাখার দলিল হতে পারে। যেমন– ইচ্ছাধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে। আর রাজ'আত এমন কর্ম দ্বারাই সাব্যস্ত হবে, যা বিবাহের সাথে বিশিষ্ট। আর উপরিউক্ত কর্মগুলো বিবাহের সাথে বিশিষ্ট, বিশেষত স্বাধীন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কাম ব্যতীত স্পর্শ ও তাকানোর হুকুম ভিন্ন। কেননা এটা বিবাহ ছাড়াও বৈধ হতে পারে। যেমন– ধাত্রী, চিকিৎসক ও অন্যদের ক্ষেত্রে হয়। আর যৌনাঙ্গ ছাড়া তাকানো একত্রে বসবাসকারীর মাঝেও হতে পারে। আর ইদ্দতকালে স্বামী তার সাথে বসবাস করতে পারে। সুতরাং সে কর্ম দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হলে অবশ্যই সে তাকে তালাক দেবে। এতে তার ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرَّجْعَةُ اَنْ يَقُوْلَ رَاجَعْتُكِ اَوْ رَاجَعْتُ الخ : রাজ'আতের পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে সরাসরি একথা বলা যে– رَاجَعْتُكِ [আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম]; কিংবা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বলা– رَاجَعْتُ اِمْرَأَتِيْ [আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম]। এ হলো রাজ'আতের ব্যাপারে স্পষ্ট পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। 'আল-মুহীত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে– اِرْتَجَعْتُكِ، رَجَعْتُكِ، رَدَدْتُكِ، اَمْسَكْتُكِ [আমি তোমাকে ধরে রাখলাম] এ শব্দগুলো রাজ'আতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট; এগুলোতে কোনো নিয়তের প্রয়োজন পড়ে না।

আর রাজ'আতের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবাচক শব্দ হলো- اَنْتِ عِنْدِىْ كَمَا كُنْتِ [তুমি যেমন ছিলে, সেরূপ আমার কাছে তুমি]; اَنْتِ اِمْرَأَتِىْ [তুমি আমার স্ত্রী]। এগুলোর দ্বারা যদি রাজ'আতের নিয়ত করে, তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামী যদি [এক তালাক কিংবা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে তার ইদ্দত অবস্থায়] সঙ্গম করে কিংবা চুম্বন করে কিংবা কামসহ স্পর্শ করে কিংবা কামসহ যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। এটা হলো আমাদের মত। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (র.) প্রমুখের অভিমতও এটি। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এগুলোর দ্বারা যদি রাজ'আতের নিয়ত করে, তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাকশক্তি থাকা অবস্থায় কেবল কথার মাধ্যমেই রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। বাক-ক্ষমতা না থাকলে [যেমন- বোবা] তখন ইঙ্গিতের মাধ্যমে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট রাজ'আত নতুন বিবাহের সমতুল্য। এজন্যই তাঁর মতে, ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ।

আর আমাদের মতে রাজ'আত হলো, বিবাহকে অব্যাহত রাখা। তাইতো কুরআন শরীফে রাজ'আতকে اِمْسَاكٌ বা ধরে রাখা বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِىُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْىَ বাক্যের অধীনে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। আর উচ্চারণের মতো কর্মও [যেমন- স্পর্শ করা] কখনো কখনো অব্যাহত রাখার প্রমাণ হয়ে থাকে। যেমন- ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খেয়ার বা ইচ্ছাধিকার রহিতকরণের বিষয়টিতে কর্ম অব্যাহত রাখার প্রমাণ। অর্থাৎ কেউ তিনদিনের খেয়ার বা ইচ্ছাধিকার রহিতকরণের ভিত্তিতে দাসী বিক্রয় করল। আর এ সময়ের মধ্যে দাসীর সাথে সঙ্গম করলে তা মালিকানা অব্যাহত রাখার প্রমাণ হবে। অনুরূপভাবে তালাকে রাজ'ঈর ক্ষেত্রেও ইদ্দতকালে সঙ্গম বিবাহ অব্যাহত রাখার প্রমাণ হবে। আর রাজ'আত এমন কোনো কর্ম দ্বারাই সাব্যস্ত হবে, যা বিবাহের সাথে বিশিষ্ট। আর সঙ্গম করা, চুম্বন করা, কামসহ স্পর্শ করা কিংবা যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো বিবাহের সাথে বিশিষ্ট, বিশেষত স্বাধীন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে। বিবাহ ছাড়া স্বাধীন স্ত্রীলোককে সম্ভোগের অন্য কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে দাসীকে বিবাহ সূত্রে ও মালিকানা সূত্রে সম্ভোগ করা যায়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ الخ : এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উত্তেজনা ব্যতীত স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কিংবা তার যৌনাঙ্গের দিকে তাকালে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কাম ব্যতীত এসব কর্ম বিবাহের সাথে বিশিষ্ট নয়। বিবাহ ছাড়াও এগুলো বৈধ হতে পারে। যেমন- ধাত্রী, চিকিৎসক, জেনার সাক্ষীর ক্ষেত্রে কাম ছাড়া এসব কর্ম শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। সুতরাং কাম ব্যতীত এসব কর্ম রাজ'আতের প্রমাণ হবে না।

গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টি দানের দ্বারাও রাজ'আত সাব্যস্ত হবে না। কেননা একত্রে বসবাসকারীদের মাঝেও কখনো কখনো অন্যত্র দৃষ্টি পড়তে পারে। আর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তার সাথে বসবাস করে থাকে। গুপ্তাঙ্গ ছাড়া যদি অন্যত্র তাকানোর দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্বামী যখন তাকে বৈবাহিক বন্ধনে রাখার কোনো ইচ্ছা পোষণ করে না, তখন অবশ্যই তাকে পুনর্বার তালাক দেবে, এতে স্ত্রীলোকটির ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যাবে। এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ। যেমন কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا .

'আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।' -[সূরা বাকারা : আয়াত- ২৩১]

قَالَ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِيْ اَحَدِ قَوْلَيْهِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (رحـ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَالْاَمْرُ لِلْاِيْجَابِ وَلَنَا اِطْلَاقُ النُّصُوْصِ عَنْ قَيْدِ الْاِشْهَادِ وَلِاَنَّهُ اِسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيْهِ فِيْ حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا فِى الْفَيْئِ فِى الْاِيْلَاءِ اِلَّا اَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْاِحْتِيَاطِ كَيْلَا يَجْرِىَ التَّنَاكُرُ فِيْهَا وَمَا تَلَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْمُفَارَقَةِ وَهُوَ فِيْهَا مُسْتَحَبٌّ وَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُعْلِمَهَا كَيْلَا تَقَعَ فِى الْمَعْصِيَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাজ'আতের ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব। তবে সাক্ষী না রাখলেও রাজ'আত শুদ্ধ হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর দুটি মতের একটিতে বলেন, শুদ্ধ হবে না। এটা ইমাম মালেক (র.) -এরও অভিমত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ [তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখ]। আর নির্দেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আমাদের দলিল হলো, নসসমূহ সাক্ষীর শর্ত থেকে মুক্ত রয়েছে। অধিকন্তু এটা হলো, বিবাহকে অব্যাহত রাখা। আর বিবাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শর্ত নয়। যেমন ঈলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে। তবে অধিক সতর্কতার জন্য সাক্ষী রাখা উত্তম, যাতে এ নিয়ে সমালোচনার সুযোগ না থাকে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উপস্থাপিত আয়াতটি এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাইতো সাক্ষী রাখাকে বিচ্ছেদের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তা মোস্তাহাব। তবে স্ত্রীকে তা জানিয়ে দেওয়া উত্তম, যাতে সে গুনাহে লিপ্ত না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আমাদের মতে রাজ'আতের উপর দুজন সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব। এর পদ্ধতি হলো, দুজন পুরুষ মুসলমানকে বলবে 'তোমরা সাক্ষী থেক, আমি আমার স্ত্রীকে রাজ'আত করলাম।' 'মাবসূত' গ্রন্থে রয়েছে – রাজ'আতের উপর সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব– এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আম্মার (রা.) -এর অভিমত। তবে স্বামী যদি সাক্ষী না রাখে তাহলেও রাজ'আত শুদ্ধ হবে। ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমতও অনুরূপ। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ২৩০]

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দুটি মতের একটি অনুসারে সাক্ষী ছাড়া রাজ'আত শুদ্ধ হবে না। এটি ইমাম মালেক (র.) -এরও অভিমত। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বর্ণনা করেন– اَلْمَذْكُوْرُ فِىْ كُتُبِهِمْ اَنَّهَا تَصِحُّ بِلَا اِشْهَادٍ وَاَنَّهُ مَنْدُوْبٌ وَكَذَا فِىْ شَرْحِ الطَّحَاوِىْ- অর্থাৎ মালিকী মাযহাবের কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে, সাক্ষ্য ছাড়াই রাজ'আত সহীহ হবে। তবে সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব। শরহে ত্বাহাবীতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। -[ফতহুল কাদীর : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৪]

মোদ্দাকথা, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর একটি বর্ণনা ও ইমাম মালেক (র.) -এর একটি বর্ণনা মতে রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। তবে এ বর্ণনা মতে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম মালেক (র.) বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি, কিন্তু রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। -[ফতহুল কাদীর]

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) -এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ - অর্থাৎ অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে কিংবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দিবে। আর তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখ। -[সূরা তালাক : আয়াত : ২] এ আয়াতে وَأَشْهِدُوا [তোমরা সাক্ষী রেখ] আদেশবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর আদেশবাচক ক্রিয়া ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করে। এ কারণেই রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব।

আর আমাদের দলিল হলো- রাজ'আত সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্যে সাক্ষীর শর্তের কথা নেই। যেমন-

১. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [... তাহলে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। সূরা বাকারা : আয়াত- ২২৮]

২. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [.... তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দিবে। সূরা তালাক, আয়াত-২]

৩. اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ [তালাকে রাজ'ঈ হলো দুবার পর্যন্ত - তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে .... সূরা বাকারা, আয়াত- ২২৯]

৪. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا [... তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে ফিরিয়ে নিতে কোনো পাপ নেই। সূরা বাকারা : আয়াত- ২৩০]। আবার হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে নির্দেশ দিয়েছেন-

مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا [তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়]। এসব আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্ত নেই। এরপরও যদি সাক্ষীর শর্তারোপ করা হয়, তাহলে কুরআন ও হাদীসের শর্তমুক্ত ভাষ্যকে শর্তযুক্ত করা লাযিম আসে, যা জায়েজ নয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের যৌক্তিক দলিল হলো, রাজ'আত হলো বিবাহকে অব্যাহত রাখা। আর বিবাহ অব্যাহত রাখার জন্য সাক্ষ্য শর্ত নয়। সুতরাং রাজ'আতের জন্যও সাক্ষ্য শর্ত হবে না। যেমন- 'ঈলা' -এর ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষ্য শর্ত নয়। কেননা এটাও বিবাহকে অব্যাহত রাখার নাম। তবে অধিক সতর্কতার জন্য রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখাই উত্তম, যাতে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর না জানার ফলে জনগণের মধ্যে খারাপ ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, অমুক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে; ইদ্দত শেষ হওয়ার পরও স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখেছে। অর্থাৎ, এ নিয়ে যাতে সমালোচনার সুযোগ না থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল হিসেবে যে আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন তা মূলত উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাইতো আয়াতে সাক্ষী রাখার বিষয়টিকে বিচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে- أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ। অথচ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা সকলের মতেই মোস্তাহাব মাত্র। এ কারণে রাজ'আতের ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা মোস্তাহাব।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্ত্রীকে রাজ'আতের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া উত্তম, যাতে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়নি ভেবে অন্যত্র বিবাহ করা এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করার মাধ্যমে স্ত্রী গুনাহে লিপ্ত না হয়। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি স্ত্রীকে অবহিত না করে, তবুও রাজ'আত সহীহ হবে।

وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إِنْ شَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهَمًا إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ تَرْتَفِعُ التُّهْمَةُ وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ -

অনুবাদ : আর যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, অতঃপর স্বামী বলে, 'আমি তাকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছি আর স্ত্রীও তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে এটা রাজ'আত হবে। আর যদি স্ত্রী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা স্বামী এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে, যা বর্তমান অবস্থায় সে চাইলেও তার অধিকার রাখে না। সুতরাং এ বিষয়ে তার উপর অভিযোগ আসতে পারে। তবে স্ত্রীর সত্যায়ন দ্বারা অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, স্ত্রীর উপর শপথ আসবে না। আর এটা হলো ছয়টি মাসআলার একটি, যাতে শপথ গ্রহণের প্রশ্নে মতপার্থক্য আছে। বিবাহ অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْتُ الخ : মাসআলা : ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছি, আর স্ত্রীও স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে এ রাজ'আত গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর কথা অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সেটা রাজ'আত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এর দলিল হিসেবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামী এমন একটি বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে, যা তার ইচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থায় সম্পন্ন করার অধিকার সে রাখে না। সুতরাং এ বিষয়ে সে অভিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। এ কারণেই স্ত্রী স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করলে রাজ'আত গ্রহণযোগ্য হবে। এ মাসআলাটি এমন, যেমন বেচাকেনার ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত উকিলকে অপসারণের পর যদি সে বলে, 'আমি উকিল থাকাকালীন সময়ে বিক্রি করেছি', তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে মুয়াক্কেল [উকিল নিয়োগকর্তা] যদি তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে ইদ্দত অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমাকে গতকাল ফিরিয়ে নিয়েছি', আর স্ত্রী অস্বীকার করে, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে স্বামী এমন একটি বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছে, যা বর্তমান অবস্থায় সম্পন্ন করার অধিকার রাখে। সুতরাং গতকাল রাজ'আত সাব্যস্ত না হলে, সে যেন অদ্য রাজ'আত করল। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩২]

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন- وَقَدْ مَرَّ فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ -এর বিবরণ বিবাহ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতার্থে বিবাহ অধ্যায়ে এ মাসআলা বর্ণিত হয়নি; বরং دَعْوٰى سُكُوْتِ عَلَى الْبِكْرِ - মাসআলায় হিদায়া গ্রন্থকার (র.) শুধু এটুকু উল্লেখ করেছেন- فَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهِيَ مَسْئَلَةُ الْإِسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ অতঃপর তিনি বলেছেন- وَسَيَأْتِيْكَ فِي الدَّعْوٰى । এতটুকু বর্ণনার দ্বারা এ কথা বলা যায় না যে, এর বিবরণ বিবাহ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কেননা সেখানে রাজ'আত কথার উল্লেখ পর্যন্তও নেই। -[আল-বিনায়া : খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ২৩৩]

وَاِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِيْ لَمْ يَصِحَّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا تَصِحُّ لِاَنَّهَا صَادَفَتِ الْعِدَّةَ اِذْ هِيَ بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا اِلَى اَنْ تُخْبِرَ وَقَدْ سَبَقَتْهُ الرَّجْعَةُ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِيْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهَا صَادَفَتْ حَالَةَ الْاِنْقِضَاءِ لِاَنَّهَا اَمِيْنَةٌ فِي الْاِخْبَارِ عَنِ الْاِنْقِضَاءِ فَاِذَا اَخْبَرَتْ دَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى سَبْقِ الْاِنْقِضَاءِ وَاَقْرَبُ اَحْوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَّوْجِ وَمَسْاَلَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْاِتِّفَاقِ فَالطَّلَاقُ يَقَعُ بِاِقْرَارِهِ بَعْدَ الْاِنْقِضَاءِ وَالْمُرَاجَعَةُ لَا يَثْبُتُ بِهِ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি বলে, আমি তোমাকে রাজ'আত করলাম; এর উত্তরে স্ত্রী তাকে বলল, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, রাজ'আত শুদ্ধ হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, শুদ্ধ হবে। কেননা রাজ'আত ইদ্দতের সাথে মিলিত হয়েছে স্ত্রীর সংবাদ প্রদান পর্যন্ত ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে। আর রাজ'আত সংবাদ প্রদানের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। তাই স্বামী যদি এ অবস্থায় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আর উত্তরে স্ত্রী বলে, আমার ইদ্দত তো শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে রাজ'আত মিলিত হয়েছে। আর ইদ্দত পূর্ণতার ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে স্ত্রীই আমানতদার। সুতরাং সে যখন সংবাদ দিল, তখন বুঝা গেল যে, সংবাদ দেওয়ার আগেই ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে। আর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিকটতম সময় হলো, স্বামীর বক্তব্য উচ্চারণের সময়। আর তালাকের মাসআলাটিও মতানৈক্যপূর্ণ। যদি সর্বসম্মত হয়েও থাকে, তাহলে আমাদের বক্তব্য হলো, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারাও তালাক সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে রাজ'আত স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার এক তালাক কিংবা দুই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমাকে রাজ'আত করলাম' আর সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী এর উত্তরে বলে, 'আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে', তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, রাজ'আত শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতও এটি পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, রাজ'আত শুদ্ধ হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, রাজ'আত ইদ্দতের সাথে মিলিত হয়েছে। কেননা চলমান অবস্থার নিরিখে ইদ্দত শেষ হওয়া সম্পর্কে স্ত্রীর সংবাদ প্রদান পর্যন্ত ইদ্দত বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক। আর ইদ্দত অবস্থায় রাজ'আত করা শুদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রেও রাজ'আত শুদ্ধ হবে। কেননা রাজ'আত স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণেই স্বামী যদি উক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, আর স্ত্রী উত্তরে বলে, 'আমার ইদ্দত তো শেষ হয়ে গেছে', তাহলে এ ক্ষেত্রে তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্বে তালাক উচ্চারিত হয়েছে

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, রাজ'আতের উচ্চারণ ইদ্দত সমাপ্তির পর হয়েছে। কেননা ইদ্দতের সমাপ্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী আমানতদার। সে ছাড়া তা জানার কোনো উপায় নেই। কেননা তার জরায়ুতে যা আছে সে সম্পর্কে সে-ই ভালো জানে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়।' মোটকথা, স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সংবাদপ্রদান এ কথার প্রমাণ যে, ইদ্দতের সমাপ্তি হয়েছে খবর প্রদানের অগ্রে। তবে কতটুকু আগে ইদ্দতের সমাপ্তি ঘটেছে, এ সম্পর্কে বলা হয়, সমাপ্তির নিকটতম সময় হলো, স্বামীর উপরিউক্ত বক্তব্য উচ্চারণের সময়। যেহেতু ইদ্দত শেষ হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় প্রমাণসহ জানা নেই, সুতরাং নিকটতম সময়টিকেই সমাপ্তিকাল ধরে নেওয়া হয়। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর রাজ'আত পাওয়া গেছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, রাজ'আত শুদ্ধ হবে না।

আর সাহেবাইন (র.) তালাকের মাসআলার উপর কিয়াস করে যে দলিল উপস্থাপন করেছেন, তার জবাবে বলা হয়- তালাকের মাসআলাটির মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং মতানৈক্যপূর্ণ কোনো মাসআলার উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়। অধিকন্তু, যদি আমরা মেনেও নিই যে, মাসআলাটি মতৈক্যপূর্ণ তথাপি এর দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। কেননা তালাক তো ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে রাজ'আত স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ ধরনের কিয়াস শুদ্ধ নয়।

وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْاَمَةِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلٰى وَكَذَّبَتْهُ الْاَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا اَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلٰى لِاَنَّ بُضْعَهَا مَمْلُوْكٌ لَهٗ فَقَدْ اَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهٖ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْاِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ وَهُوَ يَقُوْلُ حُكْمُ الرَّجْعَةِ يَبْتَنِىْ عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِى الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيْمَا يَبْتَنِىْ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلٰى وَكَذَا عِنْدَهٗ فِى الصَّحِيْحِ لِاَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِى الْحَالِ وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لِلْمَوْلٰى وَلَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِىْ اِبْطَالِهٖ بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لِاَنَّ الْمَوْلٰى بِالتَّصْدِيْقِ فِى الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهٗ مَعَ الْعِدَّةِ وَاِنْ قَالَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِىْ وَقَالَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلٰى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِاَنَّهَا اَمِيْنَةٌ فِىْ ذٰلِكَ اِذْ هِىَ الْعَالِمَةُ بِهٖ ـ

অনুবাদ : দাসীর স্বামী যদি তার [স্ত্রীর] ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বলে, আমি [ইদ্দতের মাঝেই] রাজ'আত করেছি, আর দাসীর মনিব তার কথাকে সত্য বলে সমর্থন করে, কিন্তু দাসী তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তবে সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর সাহেবাইন বলেন, মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। [তাঁদের দলিল হলো] কেননা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর দাসীর যৌনাঙ্গের মালিকানা মনিবের জন্য সাব্যস্ত হয়। আর মনিব তার একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার স্বামীর অনুকূলে হওয়ার স্বীকার করছে। সুতরাং বিষয়টি দাসীর বিপক্ষে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার স্বীকারোক্তির সমতুল্য হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রাজ'আতের হুকুমের ভিত্তি ইদ্দতের উপর নির্ভরশীল। আর ইদ্দত [পূর্ণ হওয়া না হওয়া] -এর ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য। কাজেই ইদ্দতের উপর নির্ভরশীল বিষয়গুলোর হুকুমও একই হবে। আর বিষয়টি যদি বিপরীত হয় [অর্থাৎ মনিব প্রত্যাখ্যান করে আর দাসী সমর্থন করে] তবে সাহেবাইনের মতে, মনিবের কথাই গ্রহণীয় হবে। বিশুদ্ধতম মতানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতও তা-ই। কেননা দাসী বর্তমানে তার ইদ্দত পূর্ণ করে নিয়েছে। ফলে মনিবের [তার সাথে] সহবাসের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। আর মনিব সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করার ক্ষেত্রে দাসীর কথা গ্রহণীয় হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মনিব রাজ'আতের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করে রাজ'আতের সময় দাসীর ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। [আর এটাতো সর্বজনবিদিত কথা যে,] ইদ্দত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মনিবের সম্ভোগ অধিকার প্রমাণিত হয় না। [কাজেই তার কথাও গ্রহণীয় হবে না]। আর দাসী যদি বলে যে, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। অপর পক্ষে স্বামী ও মনিব বলে, শেষ হয়নি। তবে [এ ক্ষেত্রে] দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ ব্যাপারে দাসী আমানতদার। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে কেবল সেই অবগত হতে পারে [অন্য কেউ নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا قَالَ زَوْجُ الْاَمَةِ بَعْدَ الخ : ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর দাসীর স্বামী যদি বলে যে, আমি ইদ্দত চলাকালীন তোমাকে রাজ'আত করে নিয়েছি, তবে এ মাসআলার চারটি সুরত হতে পারে। যথা- ১. মনিব এবং দাসী উভয়েই স্বামীর কথার সমর্থন করবে। ২. মনিব এবং দাসী উভয়েই স্বামীর কথা প্রত্যাখ্যান করবে। ৩. স্বামীর কথা মনিব সমর্থন করবে এবং দাসী প্রত্যাখ্যান করবে। ৪. তৃতীয় সুরতের বিপরীত তথা মনিব স্বামীর কথা প্রত্যাখ্যান করবে এবং দাসী সমর্থন করবে

প্রথম সুরত তথা স্বামীর কথা মনিব ও দাসী উভয়েই সমর্থন করা অবস্থায় ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে রাজ'আত বিশুদ্ধ হবে।

আর দ্বিতীয় সুরত তথা স্বামীর কথা যখন মনিব ও দাসী উভয়েই প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বামী ও তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় তখন কারো নিকটই রাজ'আত বৈধ বিবেচিত হবে না।

আর তৃতীয় সুরত [যা কিতাবের আলোচ্য মাসআলাও বটে] তথা মনিব যদি স্বামীর কথা সমর্থন করে, অথচ স্ত্রী [দাসী] তার কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং আপন দাবির পক্ষে স্বামীর নিকট কোনো প্রমাণও বিদ্যমান না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে কার কথা গ্রহণীয় হবে এ নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে–

জমহুরের মতামত : জমহুর তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম যুফার, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মত হলো, এ ক্ষেত্রে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

সাহেবাইনের মতামত : সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর দাসীর যৌনাঙ্গে মনিবের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই এমতাবস্থায় স্বামীর অনুকূলে দাসীর সম্ভোগ অঙ্গের স্বীকারোক্তি নিজের একান্ত হকের স্বীকারোক্তিরই নামান্তর হবে। [যা সে স্বামীকে প্রদান করতে সম্মত হয়েছে]। কাজেই তার এ কথা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। বিষয়টি দাসীর বিপক্ষে মনিবের বিবাহের স্বীকারোক্তির সমতুল্য হলো। যেমন মনিব যদি বলে যে, আমি আমার দাসীকে অমুকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছি, তবে এ ক্ষেত্রে মনিবের কথা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতেও মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ জমহুরের দলিল হলো, রাজ'আতের হুকুম প্রমাণিত হওয়া স্ত্রীর ইদ্দত বাকি থাকা এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। [অর্থাৎ যদি রাজ'আত করার সময় ইদ্দত বাকি থাকে তবে তা প্রমাণিত হবে, আর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে রাজ'আত প্রমাণিত হবে না]। আর ইদ্দত বাকি থাকা বা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কাজেই ইদ্দতের উপর যে রাজ'আত নির্ভরশীল সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর চতুর্থ সুরত [যা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ -এ ইবারতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তা হলো, যদি বাদী তার স্বামীর কথার সমর্থন করে, কিন্তু মনিব তা প্রত্যাখ্যান করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বাদীর সম্ভোগ অঙ্গ একান্তই মনিবের হক। উল্লিখিত সুরতে স্বামী মনিবের বিপক্ষে উক্ত জিনিসের দাবিদার। [مُدَّعِىْ] আর মনিব তার অস্বীকারকারী [مُنْكِرْ]। আর এটাতো সুবিদিত যে, কোনো জিনিস প্রমাণের ক্ষেত্রে مُدَّعِىْ তথা দাবিদারের নিকট প্রমাণ বিদ্যমান না থাকলে مُنْكِرْ তথা অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিশুদ্ধতম মতও এটিই যে, এ ক্ষেত্রে মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আপাতদৃষ্টিতে দাসী তার ইদ্দত পূর্ণ করে ফেলেছে। ফলে বাহ্যিকভাবে মনিব তার দাসীর মাঝে সহবাসের অধিকার অর্জন করেছে। কাজেই দাসী ও তার স্বামীর কথার ভিত্তিতে যদি রাজ'আত প্রমাণিত হয়, তবে মনিবের তার দাসীর সাথে সহবাসের অধিকার রহিত হবে। অথচ সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধুই স্বীকারোক্তি অন্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মনিবের প্রতিষ্ঠিত অধিকার রহিতকরণে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত সুরত তথা যে সুরতে মনিব স্বামীর কথার সমর্থন করে অথচ দাসী তা প্রত্যাখ্যান করে, তা এর বিপরীত। কেননা, ঐ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মনিব রাজ'আতের ক্ষেত্রে স্বামীর কথার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে যেন রাজ'আতের সময় ইদ্দত বাকি থাকারই স্বীকারোক্তি প্রদান করল। আর ইদ্দত থাকা অবস্থায় দাসীর সাথে মনিবের সম্ভোগ অধিকার প্রমাণিত হয় না। কাজেই এ সুরতে দাসীর কথা গ্রহণ করার মাধ্যমে মনিবের কোনো অধিকার যেহেতু রহিত করা হয় না বিধায় এ ক্ষেত্রে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; মনিবের কথা নয়।

যদি দাসী বলে যে, আমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর সময়ও এতদিন অতিবাহিত হয়েছে, যার মাঝে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া সম্ভবও বটে। অপর দিকে স্বামী ও মনিব বলে যে, তোমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়নি, তবে এ ক্ষেত্রে দাসীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার প্রশ্নে দাসী হলো আমানতদার। বিষয়টির ক্ষেত্রে সে ব্যতীত অন্য কেউ যেহেতু অবগতি লাভ করতে পারবে না, তাই তার কথাই গ্রহণীয় হবে।

وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ حَتّٰى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ كَامِلٍ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَانْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ ـ

অনুবাদ : তৃতীয় হায়েজের রক্তস্রাব যদি দশদিনের মাথায় বন্ধ হয় তাহলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ রহিত হয়ে যায়– মহিলা গোসল না করলেও। পক্ষান্তরে যদি রক্তস্রাব দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত অথবা একটি নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে না। কেননা হায়েজের সর্বোচ্চ সময়সীমা দশদিনের বেশি হতে পারে না। কাজেই রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া মাত্রই সে হায়েজ হতে মুক্ত হবে। ফলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الخ : তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী নারীর তৃতীয় হায়েজের রক্ত যদি পূর্ণ দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বন্ধ হয়, তাহলে এ নারী হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করলেও তার স্বামী তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শুধুই রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার দ্বারা তার রাজ'আতের অধিকার রহিত হয় না, যতক্ষণ না সে নারী গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে। অথবা হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর নামাজের একটি পূর্ণ ওয়াক্ত তার উপর অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা স্বামীর রাজ'আতের অধিকার রহিত হওয়া স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আর স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া তৃতীয় হায়েজের হতে ফারেগ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আর তৃতীয় হায়েজ হতে ফারেগ হওয়া পবিত্রতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল। কাজেই হায়েজ সময়সীমা যদি পূর্ণ দশদিন হয়, তবে শুধুমাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জিত হবে। কেননা দশদিনের বেশি হায়েজ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা বিদ্যমান না থাকায় দশদিনের মাথায় রক্তস্রাব বন্ধ দ্বারাই এ মহিলা হায়েজ হতে মুক্ত হলো এবং তার ইদ্দতও শেষ হলো, ফলে স্বামীর রাজ'আতের অধিকারও রহিত হলো। চাই সে মহিলা গোসল করুক বা না করুক।

আর তৃতীয় হায়েজের রক্ত যদি দশদিনের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হায়েজের রক্ত পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণে যথারীতি গোসল করার দ্বারা অথবা পবিত্র নারীর উপর যে সকল আহকাম কার্যকর হয়ে থাকে সেরূপ কোনো হুকুম কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে হায়েজ বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি সুদৃঢ় করতে হবে। যেমন– হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর গোসল করার পূর্বে উক্ত নারীর উপর নামাজের একটি পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হলে নামাজ তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, যা পবিত্র নারীদের আহকামের অন্তর্গত।

পক্ষান্তরে সে রমণী যদি কিতাবিয়া [ইহুদি বা খ্রিস্টান] নারী হয়, আর তার হায়েজ দশদিনের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে শুধুমাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার দ্বারাই তার রাজ'আত অধিকার রহিত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে তার গোসল করারও প্রয়োজন নেই এবং রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর একটি পূর্ণ নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ারও দরকার নেই। কেননা, সে নারী অমুসলিম হওয়ার দরুন শরিয়তের পক্ষ হতে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন বা নামাজ ওয়াজিব হওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অতিরিক্ত কোনো আলামত তার থেকে আশা করা যায় না। ফলে শুধুমাত্র রক্তস্রাব বন্ধ হওয়াকেই যথেষ্ট বিবেচনা করা হবে।

وَفِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ فَلَابُدَّ اَنْ يَعْتَضِدَ الْاِنْقِطَاعُ بِحَقِيْقَةِ الْاِغْتِسَالِ اَوْ بِلُزُوْمِ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمَضِيِّ وَقْتِ الصَّلٰوةِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً لِاَنَّهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِيْ حَقِّهَا اَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفٰى بِالْاِنْقِطَاعِ وَ تَنْقَطِعُ اِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) هٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اِذَا تَيَمَّمَتْ اِنْقَطَعَتْ وَهٰذَا قِيَاسٌ لِاَنَّ التَّيَمُّمَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ حَتّٰى يَثْبُتَ بِهٖ مِنَ الْاَحْكَامِ مَا يَثْبُتُ بِالْاِغْتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهٖ وَلَهُمَا اَنَّهُ مُلَوِّثٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَاِنَّمَا اُعْتُبِرَ طَهَارَةً ضَرُوْرَةً اَنْ لَا تَتَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ وَهٰذِهِ الضَّرُوْرَةُ تَتَحَقَّقُ حَالَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ لَا فِيْمَا قَبْلَهَا مِنَ الْاَوْقَاتِ وَالْاَحْكَامُ الثَّابِتَةُ اَيْضًا ضَرُوْرِيَّةٌ اِقْتِضَائِيَّةٌ ثُمَّ قِيْلَ تَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الشُّرُوْعِ عِنْدَهُمَا وَقِيْلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِيَتَقَرَّرَ حُكْمُ جَوَازِ الصَّلٰوةِ.

অনুবাদ : অপর পক্ষে দশদিনের কম সময়ে রক্ত পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই যথারীতি গোসল করার মাধ্যমে কিংবা [হায়েজমুক্ত] পবিত্র নারীদের উপর [শরিয়তের পক্ষ থেকে] যে সকল আহকাম কার্যকর হয়, নামাজের একটি [পূর্ণ] সময় অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে সে ধরনের কোনো হুকুম কার্যকর হওয়ার দ্বারা হায়েজ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি সুদৃঢ় হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে সে স্ত্রী কিতাবিয়া নারী হলে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা তার ক্ষেত্রে হায়েজ বন্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো আলামত আশা করা যায় না। [যেহেতু শরিয়তের পক্ষ হতে নামাজ বা গোসলের কোনো হুকুম তার উপর নেই]। তাই তার জন্য শুধু হায়েজ বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। গোসলের পরিবর্তে [পানি না থাকা অবস্থায়] তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করলেও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতানুসারে রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এটা হলো ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি অনুসারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু তায়াম্মুম করলেই অধিকার রহিত হয়ে যাবে। [নামাজ না পড়লেও]। এটা হলো সাধারণ কিয়াসের দাবি। কেননা পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম হলো [গোসলের মতোই] পূর্ণ তাহারাত। তাই গোসল দ্বারা যে সকল হুকুম প্রমাণিত হয় তায়াম্মুম দ্বারাও সে সকল হুকুম প্রমাণিত হবে। কাজেই [হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে] তায়াম্মুম ও গোসল একই পর্যায়ভুক্ত হবে। শায়খাইনের দলিল হলো, মাটি হচ্ছে মূলত কদর্যকারী; পবিত্রকারী নয়। তদুপরি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করাকে [শরিয়তের পক্ষ হতে] ত্বাহারাত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যাতে করে [বান্দার উপর] ওয়াজিব ও ফরজ অধিক না হয়ে যায়। আর [ত্বাহারাতের] এ প্রয়োজন কেবল নামাজ আদায়ের সময়ই সাব্যস্ত হয়; এর পূর্বে নয়। আর যে সকল হুকুম তায়াম্মুম দ্বারা সাব্যস্ত হয় সেগুলো অপরিহার্য প্রয়োজনের দাবিরূপেই স্বীকৃত। কেউ কেউ বলেন, শায়খাইনের মতে, নামাজ শুরু করা মাত্রই রাজ'আতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে, আবার কেউ কেউ বলেন, নামাজ শেষ করার পর রহিত হবে। যাতে নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ الخ : আর তালাকে রাজ'ঈর ইদ্দত গণনাকারিণী রমণীর তৃতীয় হায়েজের রক্তস্রাব যদি দশদিনের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর সে নারী [পানি না থাকার কারণে] তায়াম্মুম করে নফল অথবা ফরজ নামাজ আদায় করে ফেলে, তাহলে শায়খাইনের নিকট রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের নিকট রাজ'আতের অধিকার রহিত হওয়ার বিষয়টি তায়াম্মুম ও নামাজ আদায় করা উভয়টার সাথেই সম্পর্কযুক্ত হবে। আর শায়খাইনের এ মতামতের ভিত্তি হলো সূক্ষ্ম কিয়াস।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উক্ত রমণী শুধুমাত্র তায়াম্মুম করার দ্বারাই রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। নামাজ আদায় করা না করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইমাম যুফার ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মতও তা-ই। সাধারণ কিয়াসের দাবিও এটিই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, পানির অবিদ্যমান অবস্থায় অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষমতার সময় তায়াম্মুমই হলো [গোসলের ন্যায়] পূর্ণ ত্বাহারাত। কাজেই তায়াম্মুম দ্বারাও সেসব হুকুম প্রমাণিত হবে গোসলের দ্বারা যা প্রমাণিত হয়। যেমন– মসজিদে প্রবেশ করা, কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা, কুরআনে কারীম স্পর্শ করা, নামাজ আদায় করা এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

শায়খাইনের দলিল হলো, প্রকৃতপক্ষে তায়াম্মুম পবিত্রকারী নয়; বরং কদর্যকারী। কেননা তায়াম্মুম মূলত মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিস দ্বারা করতে হয়। আর মাটি শরীরকে পানির মতো পবিত্র করে না; বরং ময়লাযুক্ত করে দেয়। তদুপরি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরিয়তে ইসলাম তায়াম্মুমকে পবিত্রকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

তায়াম্মুমকে পবিত্রকারী হিসেবে সাব্যস্ত করার প্রয়োজনটি এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হয়, অপর দিকে শরিয়তের পক্ষ হতে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করা না হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির দায়িত্বে অনেক ফরজ ও ওয়াজিব জমা হয়ে যাবে, যা তার পক্ষে পরবর্তীতে আদায় করা খুবই কষ্টসাধ্য হবে। তাই উক্ত প্রয়োজনের সময় তায়াম্মুমকে শরিয়তের পক্ষ হতে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর উক্ত প্রয়োজনীয়তা কেবল নামাজ আদায় করার সময়ই প্রমাণিত হবে; তার পূর্বে নয়। কাজেই এ কথা প্রমাণিত হলো যে, যদি তায়াম্মুমের পর নামাজ আদায় করা হয় তবে সে তায়াম্মুম পবিত্রকারী সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় নয়। এজন্যই আমরা বলেছি যে, তায়াম্মুমের পর যদি নামাজ আদায় করা হয়, তবে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবার দরুন রাজ'আতের অধিকার বিলুপ্ত হবে। আর যদি তায়াম্মুমের পর নামাজ আদায় করা না হয়, তাহলে উক্ত তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত না হবার দরুন রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَالْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ الخ : এ ইবারত দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত মূলনীতি তথা গোসল দ্বারা যে সকল আহকাম প্রমাণিত হয় তায়াম্মুম দ্বারাও সে সকল আহকাম প্রমাণিত হয়– এর জবাব প্রদান করেছেন। জবাবের সারকথা এই যে, তায়াম্মুম দ্বারা উল্লিখিত আহকামগুলো প্রমাণিত হয়েছে মূলত নামাজ বৈধ হওয়ার প্রয়োজনের ভিত্তিতেই। কেননা তায়াম্মুমের দ্বারা কুরআনে কারীম তেলাওয়াত বৈধ হয় নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার তাকিদেই। কেননা নামাজের মাঝে কুরআনে কারীম হতে তেলাওয়াত করা নামাজেরই রুকন। অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ তো এজন্যই যে, মসজিদ হলো নামাজেরই স্থান। আর সিজদায়ে তিলাওয়াত তো কেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণেই বৈধ। কেননা এমনটি হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক যে, নামাজি নামাজের মাঝে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে ফেলবেন, আর সে জন্যই তাকে সিজদা

করতে হবে। আর কুরআনে কারীম স্পর্শ করার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দেবে যখন নামাজি নামাজ বৈধ হওয়া পরিমাণ তেলাওয়াত করার পূর্বেই ভুলে যাবে। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি কুরআনে কারীম খুলে দেখার মুখাপেক্ষী হবে। আর এটা তো কুরআনে কারীম স্পর্শ করা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।

অনেকেই শায়খাইনের উক্ত দলিলের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই বলে যে, তায়াম্মুম হলো طَهَارَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ। আর এ কথাতো সুবিদিত যে, اَلثَّابِتُ بِالضَّرُوْرَةِ لَا تَتَعَدّٰى مَوْضِعَهَا অর্থাৎ, 'প্রয়োজনবশত যে জিনিস প্রমাণিত হয় তা তার গণ্ডি অতিক্রম করে না।' এ মূলনীতির দাবিতো এটাই যে, তায়াম্মুমের পর নামাজ আদায় করলেও তার দ্বারা রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে না। যতক্ষণ না উক্ত মহিলা গোসল করে অথবা তার উপর নামাজের একটি পূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়।

উক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, নিঃসন্দেহে اَلثَّابِتُ بِالضَّرُوْرَةِ لَا تَتَعَدّٰى مَوْضِعَهَا এটি একটি মূলনীতি। কিন্তু অপর দিকে এ মূলনীতিও সুপ্রমাণিত যে اَلضَّرُوْرِيُّ مَتٰى مَا ثَبَتَ ثَبَتَ بِجَمِيْعِ لَوَازِمِهٖ অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যখন কোনো জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল বিষয় নিয়েই অস্তিত্বে আসে। সুতরাং নামাজ আদায়ের সময় পবিত্রতার হুকুম প্রমাণ করার দ্বারা হায়েজ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি তার সাথে لَازِمِيْ [অপরিহার্য] হয়ে যায়। আর হায়েজ বন্ধ হওয়ার সাথে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। আর ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে রাজ'আতের অধিকার রহিত হওয়ার হুকুম সংশ্লিষ্ট। আর মূলনীতি এই যে, অপরিহার্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ও অপরিহার্য হয়ে যায়। এজন্যই নামাজ আদায়ের সময় পবিত্রতার হুকুম প্রমাণ করার দ্বারা রাজ'আতের অধিকার রহিত হওয়ার হুকুমও প্রমাণিত হবে।

কারো কারো নিকট নামাজ শুরু করার সাথে সাথেই শায়খাইনের নিকট রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আবার কারো কারো নিকট নামাজ শেষ করার পর রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা নামাজ শুরু করার পরের অবস্থা নামাজ শুরু করার পূর্বের অবস্থার মতোই। সুতরাং নামাজের মাঝে যদি পানি পাওয়া যায় এবং তা ব্যবহারে সক্ষমতা সৃষ্টি হয়, তাহলে তায়াম্মুমের প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে না। পক্ষান্তরে শেষ করে ফেলার পরের বিষয়টি তার বিপরীত।

وَإِذَا اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُضْوًا فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ إِنْقَطَعَتْ قال (رض) وَهٰذَا إِسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضْوِ الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِأَنَّهَا غَسَلَتِ الْأَكْثَرَ وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُضْوِ أَنْ تَبْقَى لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَّى وَ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضْوِ يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وُصُوْلِ الْمَاءِ إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ أَخْذًا بِالْإِحْتِيَاطِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْعُضْوِ الْكَامِلِ لِأَنَّهُ لَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجُفُوْفُ وَلَا يَغْفَلُ عَنْهُ عَادَةً فَافْتَرَقَا وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّ تَرْكَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ كَتَرْكِ عُضْوٍ كَامِلٍ وَعَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) بِمَنْزِلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضْوِ لِأَنَّ فِي فَرْضِيَّتِهِ إِخْتِلَافًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ.

অনুবাদ : যদি [উক্ত মহিলা] গোসল করে এবং ভুলে শরীরের কোনো অংশে পানি না পৌছে, আর তা পূর্ণ এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে রাজ'আত-অধিকার রহিত হবে না। আর যদি তা এক অঙ্গের কম হয়, তবে রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। পূর্ণ অঙ্গের শুষ্কতার ক্ষেত্রে সাধারণ কিয়াসের দাবি হলো, রাজ'আতের অধিকার থাকবে না। কেননা সে অধিকাংশ শরীর ধৌত করেছে। পক্ষান্তরে এক অঙ্গের কমের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি হচ্ছে, রাজ'আত-অধিকার বহাল থাকবে। কেননা জানাবাত ও হায়েজের হুকুম টুকরা টুকরা হয় না। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, পূর্ণ এক অঙ্গ ও খণ্ড অঙ্গ এ উভয়টির মাঝে পার্থক্যের কারণও এটাই– এক অঙ্গের কম হলে [জায়গা] অল্প পরিমাণ হওয়ার কারণে অতি দ্রুত শুকিয়ে যায়। কাজেই ঐ অংশে পানি না পৌছার কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই আমরা সতর্কতার ভিত্তিতে বলেছি যে, রাজ'আত, অধিকার রহিত হবে; কিন্তু অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না। কিন্তু পূর্ণ অঙ্গের বিষয়টি হলো এর বিপরীত। কেননা তা এত দ্রুত শুকিয়ে যায় না এবং মানুষ সাধারণত তার ক্ষেত্রে ভুলও করে না। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য সূচিত হলো। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া বর্জন করা পূর্ণ এক অঙ্গ ছেড়ে দেওয়ারই নামান্তর। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর আরেক বর্ণনা মতে, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এরও মত, এটি এক অঙ্গের কমের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা এ দু'অঙ্গ ধৌত করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য কোনো অঙ্গ ধৌত করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا الخ : যদি দশদিনের পূর্বে হায়েজের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর উক্ত মহিলা গোসল করে ফেলে, কিন্তু ভুলবশত শরীরের কোনো অংশে পানি না পৌছে, আর সে অংশ যদি পূর্ণ এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে রাজ'আত-অধিকার রহিত হবে না। এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি শুষ্ক থাকার কারণে তার গোসল হয়নি বিধায় তার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়নি। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিলে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে সে অংশ যদি এক অঙ্গের চেয়ে কম হয় তবে রাজ'আত-অধিকার রহিত হয়ে যাবে। স্বামী ফিরিয়ে নিলে তা বৈধ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উক্ত মাসআলা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের দাবি হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি শুষ্ক থাকলে রাজ'আত-অধিকার অবশিষ্ট থাকবে না। আর এক অঙ্গের চেয়ে কম হলে রাজ'আত-অধিকার বিদ্যমান থাকবে।

হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার লেখক বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর কিতাবসমূহে কিয়াসের مَحَلّ তথা কেন্দ্রবিন্দু পূর্ণ এক অঙ্গ নাকি এক অঙ্গের কম তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয় যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট কিয়াসের مَحَلّ তথা কেন্দ্রবিন্দু হলো পূর্ণ এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি। কাজেই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পূর্ণ এক অঙ্গের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি হলো, রাজ'আতের অধিকার বিদ্যমান থাকবে না। কেননা মহিলা তার অধিকাংশ শরীর ধৌত করে ফেলেছে। আর لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ এ মূলনীতির ভিত্তিতে যেন তার পূর্ণ শরীরেই পানি পৌঁছে গেছে, ফলে তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর রাজ'আতের অধিকার বিদ্যমান থাকে না। এটাই হলো কিয়াসের দাবি। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি হলো, পূর্ণ এক অঙ্গ অথবা তার চেয়ে বেশি শুষ্ক থাকলে রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে না। কেননা শরীরের অংশবিশেষ শুষ্ক থাকার কারণে পবিত্রতা অর্জিত হয়নি, বিধায় তার ইদ্দতও বাকি থেকে গেছে। আর ইদ্দত বাকি থাকা অবস্থায় রাজ'আতের অধিকারও বিদ্যমান থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট مَحَلِّ قِيَاسٍ তথা কিয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হলো এক অঙ্গের চেয়ে কম। তাই তিনি বলেন, এক অঙ্গের চেয়ে কমের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি হলো, রাজ'আতের অধিকার বিদ্যমান থাকবে। কেননা, হায়েজ ও জানাবাতের হুকুম যেহেতু খণ্ডিত হয় না, তাই এক অঙ্গের চেয়ে কম শুষ্ক থাকলেও তার শরীরে যথারীতি حَدَث বিদ্যমান থাকে। আর حَدَث বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইদ্দতও বাকি থাকে। ইদ্দত বাকি থাকলে রাজ'আতের অধিকারও রহিত হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো, পূর্ণ এক অঙ্গ ও এক অঙ্গের চেয়ে কম – এ উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণও এটাই যে, এক অঙ্গের চেয়ে কম পরিমাণে স্বল্প হওয়ার কারণে খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়, সুতরাং ঐ অংশে পানি না পৌঁছার কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা হতেও তো পারে যে, সে অংশে পানি পৌঁছেছিল বটে; কিন্তু দ্রুত শুকিয়ে গেছে। তাই আমরা সতর্কতার ভিত্তিতে বলেছি যে, এমতাবস্থায় রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে বটে; তবে সে নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। যদি অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তা বৈধ হবে না। কেননা সে অংশ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি উক্ত অংশে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর বাস্তবেও যদি তা-ই হয় তবে সে মহিলার শরীরে حَدَث বিদ্যমান থাকার কারণে তার ইদ্দতও বাকি রয়েছে। আর ইদ্দত বাকি থাকা অবস্থায় অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যদি পূর্ণ এক অঙ্গ শুষ্ক থাকে, তাহলে রাজ'আত-অধিকার রহিত হবে না। কেননা পূর্ণ একটি অঙ্গ এত দ্রুত শুষ্ক হয় না এবং সাধারণত মানুষ এক অঙ্গের কথা ভুলেও যায় না। কাজেই সে অঙ্গ ধৌত করা হয়নি এটাই মনে করা হবে। আর এক অঙ্গ ধৌত না করার কারণে গোসল অপূর্ণ থেকে যাবে এবং ইদ্দতও বিদ্যমান থাকবে। ফলে রাজ'আতের অধিকারও অবশিষ্ট থাকবে। উক্ত আলোচনার দ্বারা পূর্ণ অঙ্গ ও খণ্ড অঙ্গ শুষ্ক থাকার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হলো।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّ تَرْكَ الْمَضْمَضَةِ الخ : যদি কোনো মহিলার ইদ্দতের তৃতীয় হায়েজ দশদিনের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায় এবং সে গোসলও করে ফেলে; কিন্তু কুলি করা অথবা নাকে পানি দেওয়া বর্জন করে, তবে তার হুকুমের ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি অভিমত রয়েছে–

প্রথম অভিমত : প্রথম অভিমত হলো, এমতাবস্থায় রাজ'আতের অধিকার রহিত হবে না। যেমন– একটি পূর্ণ অঙ্গ শুষ্ক থাকলে রাজ'আত-অধিকার রহিত হয় না। এ রেওয়ায়েত অনুসারে নাকে পানি দেওয়া, কুলি করা প্রতিটিই একটি পূর্ণ অঙ্গের পর্যায়ভুক্ত হবে। উল্লিখিত অভিমতটি ইমাম হিশাম (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অভিমত : দ্বিতীয় অভিমত, যা ইমাম কারখী (র.) বর্ণনা করেছেন তা এই যে, উক্ত সুরতে রাজ'আতের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এ সুরতে কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া বর্জন করা এক অঙ্গের চেয়ে কম অংশ শুষ্ক থাকার পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা গোসলের মাঝে নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা অজু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই সুন্নত। আর আমাদের নিকট অজুতে সুন্নত, আর গোসলে ফরজ। পক্ষান্তরে শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ গোসলের মাঝে ধৌত করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। দ্বিতীয় এ রেওয়ায়েতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এরও অভিমত।

وَمَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَامِلٌ اَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ لَمْ اُجَامِعْهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ لِاَنَّ الْحَبَلَ مَتٰى ظَهَرَ فِىْ مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ ذٰلِكَ دَلِيْلُ الْوَطْىِ مِنْهُ وَكَذَا اِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا وَاِذَا ثَبَتَ الْوَطْىُ تَاَكَّدَ الْمِلْكُ وَالطَّلَاقُ فِىْ مِلْكٍ مُتَاَكِّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَيَبْطُلُ زَعْمُهُ بِتَكْذِيْبِ الشَّرْعِ اَلَا يَرٰى اَنَّهُ يَثْبُتُ بِهٰذَا الْوَطْىِ الْاِحْصَانُ فَلَاَنْ تَثْبُتَ بِهِ الرَّجْعَةُ اَوْلٰى وَتَاوِيْلُ مَسْاَلَةِ الْوِلَادَةِ اَنْ تَلِدَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِاَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ تَنْقَضِى الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ فَلَا تَتَصَوَّرُ الرَّجْعَةُ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক প্রদান করে, কিংবা স্বামীর ঔরসের সন্তান প্রসবের পর তালাক প্রদান করে আর বলে, আমি তার সাথে সহবাসই করিনি, তবে তার রাজ'আতের অধিকার বিদ্যমান থাকবে। কেননা যখন এতটা সময়ের মাঝে গর্ভ প্রকাশ পায়, যার মাঝে স্বামীর পক্ষ হতে গর্ভসঞ্চারের ধারণা করা যায়, তখন এটাকে তার সঞ্চারিত গর্ভ বলেই ধরে নেওয়া হবে– রাসূল ﷺ -এর এ কথার ভিত্তিতে– اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ - "শয্যা যার সন্তান তার।" আর এটা স্বামীর পক্ষ হতে সহবাসের একটা দলিল। অনুরূপভাবে যখন সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথে সংযুক্ত হবে তখন তাকে সহবাসকারীরূপে গণ্য করা হবে। আর যখন সহবাস প্রমাণিত হবে তখন [উক্ত নারীর উপর] স্বামীর স্বত্ব ও অধিকার সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আর সুদৃঢ় অধিকার অবস্থায় তালাক প্রদান করলে রাজ'আতের অধিকার সহই তা সাব্যস্ত হয়। আর সহবাস না করার ধারণা [বক্তব্য] শরিয়তের পক্ষ হতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে বাতিল হিসেবে প্রতিপন্ন হবে। এটা তো জানা কথা যে, উপরিউক্ত সহবাসের দ্বারা اِحْصَانٌ [বিবাহিত হওয়ার শাস্তি প্রযোজ্য হওয়া] সাব্যস্ত হয়। সুতরাং রাজ'আতের অধিকার তো আরো স্বাভাবিকভাবেই সাব্যস্ত হবে। সন্তান প্রসবের মাসআলাটির ব্যাখ্যা হলো, তালাক দেওয়ার পূর্বে সন্তান প্রসব করবে। কেননা তালাকের পরে প্রসব করলে তো প্রসবের দ্বারাই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তখন রাজ'আতের কল্পনা করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তালাক প্রদান করে অথবা তার স্ত্রী তালাক প্রদান করার পূর্বে তার বৈবাহিক বন্ধনে থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসব করার পর তাকে তালাক দেয় এবং বলে যে, আমি আমার উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাসই করিনি। এতদসত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাজ'আত করতে চায় করতে পারবে। শরিয়তের পক্ষ হতে তাকে রাজ'আত করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। আর স্বামীর এ কথা যে, আমি তার সাথে সহবাসই করিনি শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা [শরিয়তের দৃষ্টিতে] স্ত্রীর গর্ভ যখন এতটুকু সময়ের মাঝে প্রকাশিত হবে, যতটুকু সময়ের মাঝে প্রকাশিত হলে উক্ত গর্ভকে স্বামীর সঞ্চারিত গর্ভ হিসেবে সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়, তবে উক্ত গর্ভকে স্বামীর সঞ্চারিত গর্ভ হিসেবেই সাব্যস্ত করা হবে। যেমন তালাক প্রদান করার পর যদি উক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারী ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই কোনো সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের পিতৃপরিচয় তালাক প্রদানকারীর সঙ্গেই যুক্ত হবে। তখন ধরে নিতে হবে যে, তালাক প্রদানের দিন সে নারী গর্ভবতী ছিল।

সে সন্তানের পিতৃপরিচয় তালাক প্রদানকারীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মূল দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 'শয্যা যার সন্তান তার।' অন্য এক হাদীসে রয়েছে- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ - "শয্যা যার সন্তান তার, ব্যভিচারী বঞ্চিত।" মোটকথা, সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সঙ্গে সংযুক্ত করার কারণে সে সহবাসকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা সহবাস ছাড়া সন্তান জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং যখন স্বামী সহবাসকারী সাব্যস্ত হলো তখন মহিলার উপর স্বামীর স্বত্ব ও অধিকার সুদৃঢ় হয়ে যাবে। অর্থাৎ মহিলা সহবাসকৃতা সাব্যস্ত হবে। সুদৃঢ় স্বামী-স্বত্ব থাকা অবস্থায় তথা সহবাসকৃত কোনো স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে তাকে রাজ'আত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। এজন্যই এ সুরতে স্বামীকে রাজ'আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

থেকে গেল স্বামীর কথা- "আমি তার সাথে সহবাসই করিনি" শরিয়তের পক্ষ হতে মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (র.) এ মাসআলার আলোচনা প্রসঙ্গে এ স্থলে একটি প্রশ্ন-উত্তরের অবতারণা করেছেন।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো এই - সন্তানের পিতৃপরিচয়ের বিষয়টি হলো এখানে دَلَالَة তথা নির্দেশনা। আর স্বামীর কথা- 'আমি তার সাথে সহবাসই করিনি' - এটা হলো صَرِيْح তথা সুস্পষ্ট। আর صَرِيْح তথা সুস্পষ্ট সর্বদাই دَلَالَة তথা নির্দেশনার উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। কাজেই স্বামীর কথা, 'আমি তার সাথে সহবাসই করিনি' তা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং স্বামীর জন্য রাজ'আত অধিকার প্রমাণিত না হওয়া উচিত।

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হলো, دَلَالَة তথা নির্দেশক বিষয়টি হলো রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে। আর صَرِيْح তথা সুস্পষ্ট বক্তব্যটি হলো সাধারণ মানুষের। আর শারে' তথা রাসূল ﷺ -এর কথা মিথ্যা হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের কথা মিথ্যা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই রাসূল ﷺ -এর নির্দেশক শব্দ সাধারণ মানুষের সুস্পষ্ট কথা বা শব্দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে। আর শক্তিশালী কথাই সব সময় গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে; দুর্বল কথা নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামী-স্বত্ব বা অধিকার সুদৃঢ় অবস্থায় তালাক প্রদান করলে রাজ'আত-অধিকার প্রমাণিত হয়। তার দলিল এই যে, উপরিউক্ত সহবাস দ্বারা اِحْصَانٌ [বিবাহিত হওয়ার শাস্তি প্রযোজ্য হওয়া] সাব্যস্ত হয়। অথচ শাস্তি ওয়াজিব করার মাঝে اِحْصَانٌ -এর দখল রয়েছে। সুতরাং রাজ'আত যার সাথে শাস্তির কোনোই সম্পর্ক নেই তাতো উক্ত সহবাসের দ্বারা আরো স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ وَتَاوِيْلُ مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ الخ : আর সন্তান প্রসবের মাসআলাটির ব্যাখ্যা হলো, উক্ত মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্বেই সন্তান প্রসব করতে হবে। কেননা তালাকের পর সন্তান প্রসব করলে তো প্রসব দ্বারাই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তখন রাজ'আতের বিষয় কল্পনাও করা যাবে না।

فَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا وَ قَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ تَأَكُّدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقُّهُ وَلَمْ يَصِرْ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِخِلَافِ الْمَهْرِ لِأَنَّ تَأَكُّدَ الْمَهْرِ الْمُسَمّٰى يَبْتَنِي عَلٰى تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا خَلَا بِهَا وَقَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ صَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقٰى فِي الْبَطْنِ هٰذِهِ الْمُدَّةَ فَأُنْزِلَ وَاطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ عَلٰى اِعْتِبَارِ الثَّانِي يَزُوْلُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَفْعَلُ الْحَرَامَ ۔

অনুবাদ : যদি দরজা বন্ধ করে অথবা পর্দা টানিয়ে স্বামী স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় আর বলে যে, আমি তার সাথে সহবাস করিনি, অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে সে রাজ'আতের অধিকার পাবে না। কেননা স্বামী-স্বত্ব বা অধিকার দৃঢ় হয় সহবাসের মাধ্যমে। আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। সুতরাং তার নিজের অধিকারের ক্ষেত্রে তাকে সত্যবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। আর রাজ'আত হলো তার নিজের হক। অপর দিকে শরিয়তের পক্ষ হতেও তার বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়নি। কিন্তু মহরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা নির্ধারিত মহর সুদৃঢ় হওয়ার বিষয়টি বিনিময়কৃত অঙ্গ অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল; স্বামীর হস্তগত করার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবুও যদি সে রাজ'আত করে নেয় অর্থাৎ একান্তে মিলিত হওয়ার পর এবং সহবাস করিনি বলার পর অতঃপর দু'বছরের একদিন পূর্বেও কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে উক্ত রাজ'আত সহীহ হবে। কেননা সে সন্তানের পিতৃপরিচয় সেই স্বামীর সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে, যেহেতু স্ত্রী তার ইদ্দত শেষ হওয়ার কথাও স্বীকার করেনি, আর সন্তান এ পরিমাণ সময় মাতৃগর্ভে অবস্থান করতেও পারে। সুতরাং তাকে তালাকের পূর্বে সহবাসকারীরূপে গণ্য করা হবে; তালাকের পরে নয়। কেননা তালাকের পরে সহবাস হলে [এর কারণে সন্তান গর্ভে আসলে] তো পূর্বে সহবাস না হওয়ার কারণে [ইদ্দতের অপেক্ষা ছাড়াই] শুধুমাত্র তালাকের দ্বারাই [বিবাহ] বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সুতরাং পরবর্তী এ তালাক হারাম হবে। আর মুসলমান হারাম কাজে লিপ্ত হবে না। [এটাই স্বাভাবিক]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَغْلَقَ بَابًا الخ : কিতাবে মাবসুতের كِتَابُ الطَّلَاقِ -এর বর্ণনানুসারে وَأَغْلَقَ بَابًا এবং أَرْخٰى سِتْرًا এই দুই বাক্যের মাঝে أَوْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর جَامِعِ صَغِيْر -এর ইবারতে দুই বাক্যের মাঝে وَاوْ ব্যবহার করা হয়েছে। ইবারতদ্বয়ের মাঝে مَبْسُوْط -এর كِتَابُ الطَّلَاقِ -এর ইবারতই অধিক বিশুদ্ধ।

সূরতে মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় অথবা পর্দা টেনে দেয় এবং বলে যে, আমি তার সাথে সহবাস করিনি। অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে সে আর রাজ'আতের অধিকারপ্রাপ্ত হবে না। কেননা সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে ইদ্দত গণনা করা ছাড়াই সে বায়েনা হয়ে যায় বিধায় সে রাজ'আত করতে পারবে না। কেননা স্বামী-স্বত্ব সুদৃঢ় হয় সহবাসের দ্বারা। আর স্বামী সহবাসের কথা অস্বীকার করছে। সুতরাং তার অধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে তার কথার সত্যতা স্বীকার করা হবে। কেননা রাজ'আত করা একমাত্র স্বামীর অধিকার। কাজেই রাজ'আতের অধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِرْ مُكَذَّبًا شَرْعًا : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে :

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, শরিয়তের পক্ষ হতে স্বামীর সহবাস না করার দাবিকে মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কেননা শরিয়তের পক্ষ হতে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব করা হয়েছে। অথচ পূর্ণ মহর সহবাসের পর তালাক প্রদান করলেই ওয়াজিব হয়, সহবাস পূর্ব তালাকের মাধ্যমে নয়। কাজেই স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হওয়াটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, "আমি তার সাথে সহবাস করিনি"–স্বামীর এ দাবি শরিয়তের নিকট গ্রহণীয় নয়; বরং তার এ দাবিতে তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর স্বামী যখন তার উক্ত দাবিতে শরিয়তের নিকট মিথ্যুক সাব্যস্ত হলো, তখন বলতেই হয় যে, তার এ তালাক সহবাসের পরই পতিত হয়েছে। আর সহবাসের পর তালাক প্রদান করলে স্বামীর রাজ'আতের অধিকার বিদ্যমান থাকে, বিধায় উক্ত সুরতে স্বামীর রাজ'আত-অধিকার বিদ্যমান থাকা উচিত।

উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর : নির্ধারিত মহর সুদৃঢ় হওয়া নির্ভর করে স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর নিকট বিনিময়কৃত অঙ্গ তথা যৌনাঙ্গ সমর্পণের মাধ্যমে; স্বামীর পক্ষ হতে তা হস্তগত তথা সহবাস করার মাধ্যমে নয়। কাজেই স্বামী-স্ত্রী একান্ত নিভৃতিতে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা স্বামী সহবাসকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল যে, "আমি তার সাথে সহবাস করিনি" স্বামীর এ দাবির ব্যাপারে তাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হয়নি।

প্রথমোক্ত মাসআলাটি এর বিপরীত। কেননা স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া এবং সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সহবাস ব্যতীত হতেই পারে না। কাজেই উক্ত সুরতে সে তার দাবিতে মিথ্যুক প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ بَعْدَ مَا خَلَا بِهَا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, "আমি তার সাথে সহবাস করিনি" এ কথা বলার পর স্বামী যদি তাকে রাজ'আতের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়; অতঃপর তার স্ত্রী দু'বছরের একদিন পূর্বে কোনো সন্তান প্রসব করে তবে তার পূর্বের রাজ'আত শুদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত দু'বছরের গণনা তালাকের দিবস হতে শুরু হবে; রাজ'আতের দিবস হতে নয়।

রাজ'আত সহীহ হওয়ার দলিল হলো, উক্ত সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে; অন্য কারো সাথে নয়। কেননা স্ত্রী তার ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে সন্তান দু'বছর পর্যন্ত মায়ের পেটে অবস্থান করতে পারে। কাজেই উক্ত সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়াই প্রমাণ করে যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে।

এখন দেখার বিষয় হলো এই যে, স্বামী তাকে তালাক প্রদানের পূর্বে তার সাথে সহবাস করেছে না পরে। তালাকের পূর্বে বা পরে উভয় অবস্থাতেই সহবাস সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েই এটাকে তালাক-পূর্ব সহবাস হিসেবে গণ্য করব। কারণ হলো, এটাকে তালাকের পরের সহবাস হিসেবে গণ্য করা হলে তা হারাম সাব্যস্ত হবে। কেননা যদি তালাকের পূর্বে সহবাস না করা হয় তাহলে ইদ্দতের অপেক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র তালাকের দ্বারাই বায়েনা তথা বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে। আর বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হওয়ার পর উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তা হারাম হবে। আর মুসলমান হারাম কাজে লিপ্ত হবে না, এটাই স্বাভাবিক।

فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ أُخَرَ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنٍ أُخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّه وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَيَكُوْنُ الْوَلَدُ الثَّانِيْ مِنْ عُلُوْقٍ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَصِيْرُ مُرَاجِعًا وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلٰثَةَ أَوْلَادٍ فِيْ بُطُوْنٍ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْأَوَّلُ طَلَاقٌ وَالْوَلَدُ الثَّانِيْ رَجْعَةٌ وَكَذَا الثَّالِثُ لِأَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتْ مُعْتَدَّةً وَبِالثَّانِيْ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوْقُ بِوَطْيٍ حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِيْ بِوِلَادَةِ الْوَلَدِ الثَّانِيْ لِأَنَّ الْيَمِيْنَ مَعْقُوْدَةٌ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَبِالْوَلَدِ الثَّالِثِ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا ذَكَرْنَا وَتَقَعُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ بِوِلَادَةِ الثَّالِثِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ لِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ حِيْنَ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি যদি সন্তান প্রসব কর, তবে তুমি তালাক। আর সে সন্তান প্রসব করল। অতঃপর আরেক সন্তান প্রসব করল, তাহলে রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গর্ভসঞ্চারের মাধ্যমে আর তা হবে ছয় মাসের পর। যদিও তা দু'বছরের বেশি সময়ের ব্যবধানে হয়, আর স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে। কেননা, প্রথম সন্তান প্রসবের দ্বারা তার উপর তালাক পতিত হয়েছে এবং ইদ্দত আবশ্যক হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তানটি ইদ্দত পালনকালীন স্বামীর পক্ষ হতে [নব] গর্ভসঞ্চার দ্বারা হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। কেননা, স্ত্রী এখনো ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি। সুতরাং স্বামী রাজ'আতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে, যখনই তুমি সন্তান প্রসব করবে তখনই তোমার উপর তালাক। অতঃপর সে ভিন্ন ভিন্ন গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করল, তবে প্রথম সন্তান দ্বারা এক তালাক হবে এবং দ্বিতীয় সন্তান দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে, অনুরূপ তৃতীয় সন্তান দ্বারাও। কেননা, প্রথম সন্তান প্রসব হওয়ার দ্বারা তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী ইদ্দত পালনকারী সাব্যস্ত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। এর কারণ পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইদ্দত চলাকালীন নতুন সহবাসের দ্বারা সন্তান গর্ভে এসেছে বলে ধারণা করা হবে। দ্বিতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। কেননা, كُلَّمَا [যখনই] শব্দ দ্বারা [তার] সত্যায়ন হয়েছে। তারপর ইদ্দত সাব্যস্ত হবে। আবার তৃতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা একই কারণে সে বিবাহ পুনরায় বহালকারী হবে এবং তৃতীয় তালাকও পতিত হবে, তৃতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা। তবে এবার হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। কেননা, এই গর্ভবতী মহিলা [তৃতীয়] তালাক সাব্যস্ত হওয়ার সময় ঋতুমতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدْتِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, সন্তান প্রসব করলে তুমি তালাক। আর স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করে। অতঃপর ছয় মাস পর স্ত্রী দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করে, তাহলে দ্বিতীয় সন্তানের প্রসবই রাজ'আত হিসেবে পরিগণিত হবে।

মোটকথা, স্বামী উক্ত কথা বলার পর যদি স্ত্রী দুটি সন্তান প্রসব করে, আর দুই সন্তান প্রসবের মাঝে কমপক্ষে ছয় মাসের ব্যবধান থাকে– চাই দ্বিতীয় সন্তান দুই বছরের পূর্বে প্রসব করুক বা দুই বছরের পর, সর্বাবস্থায়ই রাজ'আত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

দলিল এই যে, প্রথম বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে সে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে এবং তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কাজেই দ্বিতীয় সন্তান প্রসব সম্পর্কে বলা হবে যে, স্বামী ইদ্দত চলাকালীন সময়ে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল। যার ফলে এ দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হলো। অপর পক্ষে মহিলা এখনো ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার ঘোষণাও প্রদান করেনি, বিধায় উক্ত পুরুষ তালাকে রাজ'ঈপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে তার ইদ্দত চলাকালীন সহবাসকারী সাব্যস্ত হবে এবং রাজ'আতকারী প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে– كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ [তুমি যখনই কোনো সন্তান প্রসব করবে তখনই তুমি তালাক] অতঃপর উক্ত স্ত্রী স্বতন্ত্র তিন গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করে। অর্থাৎ দুই সন্তানের মাঝে ছয় মাস অথবা ততোধিক ব্যবধান থাকে তবে তার হুকুম হলো, প্রথম সন্তান প্রসবের দ্বারা এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা প্রথমে রাজ'আত প্রমাণিত হবে অতঃপর তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারাও প্রথমে রাজ'আত প্রমাণিত হবে এবং এর পরপরই তৃতীয় তালাক পতিত হবে।

এর দলিল এই যে, উক্ত ব্যক্তির কথা كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ -এর দ্বারা সন্তান প্রসবের সাথে তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি শর্ত বা সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দরুন প্রথম সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই এক তালাক পতিত হবে। আর মহিলা ইদ্দত পালনকারী সাব্যস্ত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা রাজ'আত প্রমাণিত হবে। কেননা, ছয় মাস পর দ্বিতীয় সন্তানের প্রসবই এ কথার প্রমাণ যে, ইদ্দত চলাকালীন উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করা হয়েছে। আর এ কথা তো সুবিদিত যে, ইদ্দত চলাকালীন সহবাস রাজ'আত প্রমাণিত করে, বিধায় রাজ'আত সাব্যস্ত হবে।

অপর দিকে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা দ্বিতীয় তালাক এজন্য পতিত হবে যে, كُلَّمَا [যখনই] শব্দ দ্বারা কসম সংঘটিত করা এ কথারই দাবি করে যে, পুনঃপুন শর্তের অস্তিত্বের কারণে তার جَزَا তথা ফলাফলও পুনঃপুন পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার পর পুনরায় ইদ্দত ওয়াজিব হবে।

অতঃপর যখন তৃতীয় সন্তান প্রসব হবে তখন রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। কেননা, দ্বিতীয় সন্তানের ছয় মাস পর তৃতীয় সন্তানের জন্মগ্রহণ এ কথারই দলিল বহন করে যে, ইদ্দত চলাকালীন উক্ত রমণীর সাথে পুনরায় সহবাস করা হয়েছে। আর তালাকে রাজ'ঈর ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার সাথে সহবাস করার দ্বারা রাজ'আত প্রমাণিত হয়। অতঃপর তৃতীয় সন্তান প্রসবের দ্বারা তৃতীয় তালাকও পতিত হবে। কেননা, كُلَّمَا শব্দের দাবি এটাই। তৃতীয় তালাকের পর হায়েজের মাধ্যমে উক্ত মহিলার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তৃতীয় তালাক পতিত হওয়ার সময় উক্ত মহিলা ঋতুমতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَشَوَّفُ وَتَتَزَيَّنُ لِأَنَّهَا حَلَالٌ لِلزَّوْجِ إِذِ النِّكَاحُ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤْذِنَهَا أَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَكُونُ مُجَرَّدَةً فَيَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَطُولُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَهُ ذَٰلِكَ لِقِيَامِ النِّكَاحِ وَلِهٰذَا لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا عِنْدَنَا وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (الْآيَة) وَلِأَنَّ تَرَاخِيَ عَمَلِ الْمُبْطِلِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبْطِلَ عَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ وَلِهٰذَا تُحْتَسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنَ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمْلِكِ الزَّوْجُ الْإِخْرَاجَ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَيَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مَعْنَاهُ الْإِسْتِحْبَابُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

অনুবাদ : রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সাজগোজ ও প্রসাধন করবে। কেননা, উভয়ের মাঝে বিবাহ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে স্বামীর জন্য সে হালাল। তদুপরি রাজ'আত করে নেওয়াই হলো মোস্তাহাব। আর সাজগোজ হলো সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী। কাজেই তা শরিয়তসম্মত হবে। তবে স্বামীর জন্য মোস্তাহাব হলো তার [স্ত্রীর] অনুমতি না নিয়ে অথবা পদধ্বনি দ্বারা তাকে অবহিত না করে তার ঘরে প্রবেশ না করা। অর্থাৎ, তার রাজ'আতের ইচ্ছা যদি না থাকে। কেননা, হয়তো সে বিবস্ত্র হয়ে থাকতে পারে। ফলে এমন স্থানে দৃষ্টি পড়তে পারে, যাতে রাজ'আতকারী হয়ে যাবে। তখন সে তাকে পুনরায় তালাক প্রদান করবে, এভাবে তার ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যাবে। রাজ'আতের ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে এ স্ত্রীকে নিয়ে সফর করা তার জন্য জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার জন্য তা জায়েজ। কেননা, বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যই তো আমাদের মতানুসারে সে তার সাথে সহবাস করতে পারে। আমাদের দলিল হলো আয়াতে কারীমা وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ - 'তাদের ঘর হতে তাদেরকে বের করো না।' তাছাড়া এজন্য যে, বিবাহ সম্পর্ক বাতিলকারী [তালাকের] কার্যকারিতা বিলম্বিত করা হয়েছে রাজ'আতের [সুযোগ দানের] প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে; কিন্তু যখন সে রাজ'আত করল না এমন কি তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেল, তখন এ কথা প্রকাশ পেল যে, এ ব্যাপারে তার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিবাহ বাতিলকারী তালাক অস্তিত্ব লাভের শুরু হতেই কার্যকরী হয়েছে। এজন্যই পিছনের [চলে যাওয়া] হায়েজগুলোকে ইদ্দতের হিসেবের মাঝে ধরা হয়। তাই রাজ'আতের ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে স্বামী তাকে নিয়ে সফরে বের হতে পারবে না। [বরং সাক্ষী রেখে আগে ফিরিয়ে নিতে হবে] যাতে ইদ্দত বাতিল হয়ে যায় এবং স্বামীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অবশ্য আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, সাক্ষী রাখার বিষয়টি হলো মোস্তাহাবভিত্তিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَشَوَّفُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য উচিত হলো, ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সেজেগুজে প্রসাধন অবলম্বন করে থাকা। অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে প্রসাধনী ব্যবহারের মাধ্যমে সজ্জিত করে রাখা। কেননা, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর জন্য হালাল। এজন্য যে, তাদের উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কারণেই তো তালাকে রাজ'ঈর সুরতে উত্তরাধিকার এবং বৈবাহিক সম্পর্কের সমস্ত হুকুম বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে উক্ত স্বামী যদি বলে যে- كُلُّ إِمْرَأَةٍ لِيْ طَالِقٌ [আমার যত স্ত্রী রয়েছে সকলেই তালাক], তাহলে উক্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও তার মাঝে শামিল হবে এবং তার উপরও তালাক পতিত হবে।

প্রশ্ন: যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করার পর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলে তাকে সাথে নিয়ে সফর করা তেমনি বৈধ হতো, যেমন তালাক প্রদান করা হয়নি এমন স্ত্রীকে নিয়ে সফর করা বৈধ। অথচ আপনারা তাকে সাথে নিয়ে সফর করা বৈধ মনে করেন না?

উত্তর: উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না। উক্ত আয়াতে কারীমা রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের ভিত্তিতেই রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: কিন্তু যদি কেউ এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, শুধু সফর করাকেই রাজ'আতের দলিল সাব্যস্ত করা হলো না কেন?

উত্তর: তখন তার উত্তরে বলা হবে যে, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে আপন গৃহ হতে বের করা নিষিদ্ধ বিষয়। আর রাজ'আত করা হলো মোস্তাহাব। এ দুটি জিনিস একটি অপরটির বিপরীত। আর বিপরীতধর্মী দু'জিনিসের একটিকে অপরটির জন্য দলিল সাব্যস্ত করা যায় না। এজন্য শুধু সফর করাকে রাজ'আতের দলিল সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

গ্রন্থকার বলেন, রাজ'আত করা হলো মোস্তাহাব। আর সাজগোজ করা স্বামীকে রাজ'আতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী। এজন্যই রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীর সাজগোজ করা এবং প্রসাধন অবলম্বন করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا الخ : রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীর স্বামীর জন্য মোস্তাহাব হলো, স্ত্রীকে অবহিত না করে তার ঘরে প্রবেশ না করা। আর এ হুকুম সে সময় যখন স্বামী তাকে রাজ'আত না করার সিদ্ধান্ত নেবে। কেননা, হয়তো বা স্ত্রী তার ঘরের মাঝে কাপড় ছেড়েও বসে থাকতে পারে। কাজেই তাকে অবগত না করে তার গৃহে প্রবেশ করলে স্ত্রীর এমন অঙ্গের উপর নজর পড়ে যেতে পারে, যার দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। আর তাকে রাজ'আত করার ইচ্ছে যেহেতু স্বামীর নেই, তাই সে তাকে পুনরায় তালাক প্রদান করবে। এতে করে অযথা উক্ত মহিলার ইদ্দত দীর্ঘ হবে। এজন্যই এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে যে, উক্ত স্ত্রীর গৃহে প্রবেশের পূর্বে জুতার আওয়াজ অথবা অন্যকোনো পন্থায় তাকে অবহিত করতে হবে। [যাতে সে সতর্ক হয়]।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتّٰى الخ : রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে স্বামী তার ইদ্দতকালীন সময়ে সফরে বের হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাব হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তাকে রাজ'আত করার ব্যাপারে সাক্ষী নির্ধারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সাথে নিয়ে সফর করতে পারবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, সাক্ষী নির্ধারণ করা ছাড়াই স্বামী তাকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতে পারবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল এই যে, তালাকে রাজ'ঈ -এর পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ ঠিক থাকে। আর এই বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকার কারণেই আমাদের মতানুসারে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। কাজেই বিবাহিতা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেরূপ সফর করা বৈধ অনুরূপ রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করাও বৈধ।

আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ অর্থাৎ, 'তোমরা তাদেরকে আপন গৃহ হতে বের করে দিও না' -এ আয়াত। মুফাস্সিরীনে কেরামের মত হলো, উক্ত আয়াত রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই উক্ত তাফসীর অনুসারে আয়াতের তরজমা হবে, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে তাদের গৃহ হতে তোমরা বের করে দিও না। আয়াতের ভিত্তিতে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, স্বামীর জন্য তাদেরকে নিয়ে বের হওয়া বৈধ হবে না।

তাছাড়া যুক্তির দাবিও তো এটিই। কেননা, তালাক হলো বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদকারী। কাজেই উচিত তো এটিই ছিল যে, তালাকের অস্তিত্বের সাথে সাথেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু তালাকের এ হুকুমকে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে, যাতে স্বামী রাজ'আত করতে চাইলে তার সুযোগ পায়। কিন্তু স্বামী যখন রাজ'আত করা হতে বিরত থাকল এবং ইদ্দতও শেষ হয়ে গেল তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্বামীর রাজ'আত করার প্রয়োজন ছিল না। আর যখন রাজ'আতের প্রয়োজন ছিল না প্রমাণিত হলো, তখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক সে সময় হতেই কার্যকরী হবে যখন হতে তার অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। আর এজন্যই ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যে হায়েজ হয়েছে তা ইদ্দতের মাঝেই গণ্য হবে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে তালাক অস্তিত্ব লাভ করার সময় হতেই যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হলো, তখন উক্ত নারী বায়েন তালাকপ্রাপ্তার মতোই হলো। আর বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সাথে নিয়ে যেমন সফর করা স্বামীর জন্য বৈধ নয় অনুরূপ রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সফর করাও নিষিদ্ধ হবে। তবে স্বামী যদি তাকে সাক্ষীর উপস্থিতিতে রাজ'আত করে নেয়, তবে ইদ্দত বাতিল সাব্যস্ত হবে এবং তাকে সাথে নিয়ে সফর করা বৈধ হবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা حَتّٰى يُشْهِدَ عَلٰى رَجْعَتِهَا -এর দ্বারা রাজ'আত মোস্তাহাব প্রমাণিত হবে; ওয়াজিব নয়। যেমনটি শুরু অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি।

وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْيَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يُحَرِّمُهُ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُوْدِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَنَا اَنَّهَا قَائِمَةٌ حَتّٰى يَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِاَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّدَارُكُ عِنْدَ اِعْتِرَاضِ النَّدَمِ وَهٰذَا الْمَعْنٰى يُوْجِبُ اِسْتِبْدَادَهُ بِهٖ وَ ذٰلِكَ يُؤْذِنُ بِكَوْنِهٖ اِسْتِدَامَةً لَا اِنْشَاءً اِذِ الدَّلِيْلُ يُنَافِيْهِ وَالْقَاطِعُ اُخِّرَ عَمَلُهُ اِلٰى مُدَّةٍ اِجْمَاعًا اَوْ نَظَرًا لَهُ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ ـ

অনুবাদ : রাজ'ঈ তালাক সহবাস হারাম করে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তালাকে রাজ'ঈ তা হারাম করে। কেননা, কর্তনকারী তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের দলিল হলো, সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তো স্ত্রীর অসম্মতি ছাড়াই স্বামী তাকে রাজ'আত করতে পারে। কেননা, রাজ'আতের অধিকার মূলত স্বামীর কল্যাণের দিক লক্ষ্য করেই নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে অনুশোচনার সময় বিষয়টি তার পক্ষে সংশোধন করা সম্ভব হয়, আর এ উদ্দেশ্যটি রাজ'আতের ব্যাপারে স্বামীর একক ক্ষমতার দাবি করে। আর এটা প্রমাণ করে যে, রাজ'আতের অর্থ হলো স্বত্ব অব্যাহত ও বহাল রাখা; নতুনভাবে স্বত্ব সৃষ্টি করা নয়। কেননা, দলিল এর বিপরীতমুখী। আর কর্তনকারী তালাকের কার্যকারিতা একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে কিংবা তার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে বিলম্বিত করা হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْيَ الخ : তালাকে রাজ'ঈ সহবাসকে হারাম করে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

আহনাফের নিকট তালাকে রাজ'ঈ সহবাসকে হারাম করে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত হলো, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য হারাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর একটি অভিমতও তা-ই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই স্বামী-স্ত্রীর সহবাস বৈধ ছিল। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্নকারী তালাক পাওয়া যাওয়ার কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছে। এজন্যই রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম।

আমাদের দলিল এই যে, রাজ'ঈ তালাক পতিত হওয়ার পরেও বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এজন্যই তো স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই স্বামী তাকে রাজ'আত করতে পারে। যদি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, তাহলে এ নারী অপরিচিতা সাব্যস্ত হতো এবং তার সম্মতি ছাড়া কিছুতেই রাজ'আত বৈধ হতো না।

হিদায়া গ্রন্থকার বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার প্রমাণস্বরূপ বলেছেন যে, অনুশোচনার সময় স্বামী যাতে তার এ ভুলের সংশোধন করতে পারে এজন্যই তাকে রাজ'আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম স্বামীকে রাজ'আতের এ অধিকার প্রদান করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। স্বামীর প্রতি শরিয়তের উক্ত অনুগ্রহই এ কথা প্রমাণ করে যে, রাজ'আতের ব্যাপারে স্বামীর ক্ষমতা একক। কেননা, স্বামী রাজ'আতের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতার অধিকারী না হলে তার প্রতি অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হতো না। এজন্য যে, স্ত্রী হয়তোবা কোনো সময় রাজ'আতের ব্যাপারে সম্মত হতো না। এসব দৃষ্টিতে রাজ'আতের ক্ষেত্রে স্বামী একক ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই প্রমাণিত হয়।

আর স্বামী রাজ'আতের ব্যাপারে একক ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই এ কথার দলিল যে, রাজ'আত বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকারই নাম, বৈবাহিক সম্পর্কের সূচনার নাম নয়। আর এটাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সহবাস করা হারাম নয়। এজন্যই আহনাফের মাযহাব হলো, রাজ'ঈ তালাক অবস্থায় স্ত্রীসহবাস অবৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَالْقَاطِعُ اُخِّرَ عَمَلُهُ اِلٰى مُدَّةٍ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব প্রদান করা হয়েছে। জবাব হলো, বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী তালাকের অস্তিত্ব বৈবাহিক সম্পর্কের বিদ্যমান থাকার সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কেননা, উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তালাকের কার্যকারিতা ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে। অথবা স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ করতে গিয়ে তালাকের কার্যকারিতাকে বিলম্ব করে দেওয়া হয়েছে।

فَصْلٌ فِيْمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ

وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلٰثِ فَلَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِى الْعِدَّةِ وَبَعْدَ اِنْقِضَائِهَا لِاَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ بَاقٍ لِاَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهُ وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِى الْعِدَّةِ لِاِشْتِبَاهِ النَّسَبِ وَلَا اِشْتِبَاهَ فِىْ اِطْلَاقِهٖ .

অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায়

অনুবাদ : তালাকে বায়েন তিনের কম হলে স্বামী তাকে ইদ্দতের মাঝে অথবা ইদ্দতের পর বিবাহ করতে পারবে। কেননা, হালাল হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, তা বিলুপ্ত হওয়া তৃতীয় তালাকের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এর পূর্বে তার বিলুপ্তি ঘটে না। ইদ্দতের মধ্যে অন্যকে বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, পিতৃপরিচয় সন্দেহযুক্ত হওয়া। আর স্বামীর জন্য বৈধতা প্রদানে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে তালাকে রাজ'ঈর সুরতসমূহের সংশোধনের পন্থা বর্ণনা করেছেন। আর তালাকে রাজ'ঈ ছাড়া অন্যান্য তালাকের সংশোধনের পন্থা এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلٰثِ الخ : প্রথম সুরত হলো, যদি তালাকে বায়েন তিনের কম তথা এক অথবা দুটি হয় তাহলে স্বামীর জন্য এ অধিকার আছে যে, সে ইচ্ছা করলে ইদ্দতের মাঝে অথবা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে। দলিল হলো, উক্ত মহিলা এখনো হালাল হওয়ার ক্ষেত্র [তথা আদমের সন্তান হওয়া এবং মাহরাম না হওয়া] হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, হালাল হওয়ার বিষয়টি বিলুপ্ত হওয়া তৃতীয় তালাকের সাথে সম্পৃক্ত فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ – এ আয়াতের এর দলিলের ভিত্তিতে। কারণ হলো, কোনো জিনিসের অস্তিত্ব যদি কোনো শর্তের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে উক্ত শর্ত অস্তিত্বে না আসলে সে জিনিসও অস্তিত্বহীন থেকে যায়। এজন্যই তৃতীয় তালাকের পূর্বে হারাম হওয়ার বিষয়টিও অস্তিত্বহীন থাকবে। সুতরাং যেহেতু হালাল হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে, তাই স্বামী তাকে ইদ্দতের মাঝে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِى الْعِدَّةِ الخ : এ ইবারতের দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে স্বামীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে যে দলিল প্রদান করা হয়েছে, তা কুরআনে কারীমের আয়াতের পরিপন্থি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ উক্ত আয়াতে ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করতেও বারণ করেছেন। আর কুরআনে কারীমের আয়াতের বিপরীতে অন্য কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে স্বামীর জন্যও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ না হওয়া চাই।

উত্তর : উক্ত আয়াতে কারীমার মাঝে ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নিষিদ্ধতা স্বামী ছাড়া অন্যদের জন্য; স্বামীর জন্য নয়। এর দলিল হলো, ইদ্দত পালনকারীণীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ এজন্য যে, যাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় সন্দেহযুক্ত হয়ে না যায়। অথচ স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাঝে উক্ত সন্দেহ নেই, বিধায় তার সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দূষণীয় নয়।

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلٰثًا فِى الْحُرَّةِ اَوْ ثِنْتَيْنِ فِى الْاَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَوْ يَمُوْتُ عَنْهَا وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَالثِّنْتَانِ فِىْ حَقِّ الْاَمَةِ كَالثَّلٰثِ فِىْ حَقِّ الْحُرَّةِ لِاَنَّ الرِّقَّ مُتَنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ عَلٰى مَا عُرِفَ ثُمَّ الْغَايَةُ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَشَرْطُ الدُّخُوْلِ ثَبَتَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ وَهُوَ اَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْىِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُوْنَ الْإِعَادَةِ إِذِ الْعَقْدُ اُسْتُفِيْدَ بِإِطْلَاقِ إِسْمِ الزَّوْجِ اَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْاٰخَرِ رُوِىَ بِرِوَايَاتٍ وَلَا خِلَافَ لِاَحَدٍ فِيْهِ سِوٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتّٰى لَوْ قَضٰى بِهِ الْقَاضِىْ لَا يَنْفُذُ وَالشَّرْطُ الْاِيْلَاجُ دُوْنَ الْاِنْزَالِ لِاَنَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيْهِ وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিন তালাক এবং দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুই তালাক হয়, তাহলে যতক্ষণ না সে সহবাস করবে অতঃপর তাকে তালাক প্রদান করবে কিংবা তাকে রেখে মারা যাবে, ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এ মাসআলার দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অতঃপর সে যদি তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে 'নিকাহ' করে। এখানে তালাক দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য। আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকই স্বাধীন স্ত্রীলোকের তিন তালাকের সমতুল্য। কেননা, ফিকহশাস্ত্রে এটা স্থির রয়েছে যে, দাসত্ব [সহবাসের] ক্ষেত্রের হালালত্বকে অর্ধেক করে দেয়। আর হালাল না হওয়ার সীমা হলো দ্বিতীয় স্বামীকে বিবাহ করা। আর সেটি নিঃশর্ত রয়েছে। আর নিঃশর্তে বিবাহ সম্পর্ক বিশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। আর দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসের শর্ত আয়াতের ইঙ্গিতার্থ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা এভাবে যে, আয়াতে উল্লিখিত نِكَاحٌ শব্দকে সহবাস অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাতে অর্থের পুনঃউল্লেখের পরিবর্তে নতুন অর্থ সাব্যস্ত হয়। কেননা, زَوْجًا [স্বামী] শব্দটি দ্বারা আক্দে নিকাহ এমনিই বুঝা যায়। সুতরাং نِكَاحٌ শব্দকে عَقْد -এর অর্থে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিংবা বলা যায় যে, মশহুর হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতে অতিরিক্ত শর্ত সংযোজন করা হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে– لَا تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْاٰخَرِ অর্থাৎ, 'প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীর মধুরতার স্বাদ গ্রহণ করবে।' হাদীসটি

বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এ শর্তটির ব্যাপারে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) ছাড়া অন্য কারো বিরোধ নেই। কিন্তু তার মতটি [মশহুর হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে] গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি বিচারক তার মতানুসারে ফয়সালা করলে তা কার্যকরও হবে না। [এক্ষেত্রে] শর্ত হচ্ছে, লিঙ্গ প্রবেশ করানো; বীর্যস্খলন নয়। কেননা, এটা হচ্ছে সহবাসের পূর্ণতা ও চরমত্ব। আর পূর্ণতা হলো অতিরিক্ত শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلٰثًا فِى الْحُرَّةِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনা স্ত্রীকে তিন তালাক অথবা দাসী স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে, তাহলে এ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার উক্ত স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীর সাথে বিশুদ্ধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করবে এবং তাকে তালাক প্রদান করবে অথবা তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করবে।

উক্ত মাসআলার দলিল হলো– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ কুরআনে কারীমের এ আয়াত। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মত হলো, উক্ত আয়াত দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য।

আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক স্বাধীনা নারীর তিন তালাকেরই সমপর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, স্বাধীনা নারী যেমন তিন তালাকের দ্বারা স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ বাঁদিও দুই তালাকের দ্বারা স্বামীর জন্য হারাম সাব্যস্ত হয়।

দলিল এই যে, দাস-দাসী হওয়াটাই অন্যায়ের শাস্তিকে অর্ধেক করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ অর্থাৎ, "যদি দাসীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তার উপর স্বাধীনা নারীর [উক্ত কাজে লিপ্ত হলে যে শাস্তি হয় সে] শাস্তির অর্ধেক শাস্তি আপতিত হবে।" সুতরাং গোলাম হওয়া শাস্তিকে যেমন অর্ধেক করে দেয় অনুরূপভাবে গোলাম হওয়া নিয়ামতকে অর্ধেক করে দেওয়ারও কারণ সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর সহবাস ক্ষেত্র তথা যৌনাঙ্গ হালাল হওয়াটাও একটা নিয়ামত। কাজেই দাসীকে দেড় তালাক দিলেই সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তালাক যেহেতু বিভাজ্য হয় না, তাই অর্ধেক তালাকও পূর্ণ এক তালাক হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং দাসীর স্বামী দুই তালাকের মালিক হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْغَايَةُ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিশুদ্ধরূপে বিবাহ হওয়া শর্ত এজন্যই যে حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এ আয়াতে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মতলক তথা শর্তহীন রাখা হয়েছে। বিশুদ্ধ বিবাহ বা ফাসেদ বিবাহ কোনোটার সাথেই শর্তযুক্ত করা হয়নি। আর যখন কোনো কিছুকে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয় তখন তার দ্বারা فَرْدٌ كَامِلٌ [পরিপূর্ণ সত্তা] উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই এখানে মুতলক বিবাহ দ্বারা পরিপূর্ণ বিবাহই উদ্দেশ্য হবে। আর পরিপূর্ণ বিবাহ বিশুদ্ধ বিবাহের দ্বারাই হতে পারে; ফাসেদ বিবাহের দ্বারা নয়। এজন্যই প্রথম স্ত্রী হালাল হওয়ার জন্য আমরা বিশুদ্ধ বিবাহকে শর্তযুক্ত করেছি।

قَوْلُهُ وَشَرْطُ الدُّخُوْلِ ثَبَتَ الخ : আর এ মহিলার সাথে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করাকে আয়াতের ইঙ্গিতার্থ অথবা হাদীসে মশহুর দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আয়াতের ইঙ্গিতার্থের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ হলো– حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এ আয়াতের মাঝে نِكَاحٌ শব্দ [যা تَنْكِحَ শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে] সহবাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, عَقْدٌ তথা বন্ধন অর্থে নয়। কেননা, আয়াতের زَوْجًا غَيْرَهُ এ শব্দের মাঝেই عَقْدٌ বা বন্ধনের অর্থ নিহিত রয়েছে। কেননা, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পৃথিবীর

কেউ زَوْجٌ তথা স্বামী হতে পারে না। কাজেই تَنْكِحَ শব্দ দ্বারাও যদি عَقْد -এর অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আয়াতের মাঝে অর্থের পুনরাবৃত্তির দ্বারা تَاكِيْد সৃষ্টি হবে। আর যদি تَنْكِحَ শব্দকে সহবাসের অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন আয়াতের মাঝে অর্থের নতুনত্ব সৃষ্টি হবে। আর নিয়ম হলো- اَلْإِفَادَةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ [নতুনত্ব পুনরাবৃত্তির চেয়ে উত্তম] কাজেই আয়াতের মাঝে উল্লিখিত تَنْكِحَ শব্দকে সহবাসের অর্থে ব্যবহার করা হবে, এতে করে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসের বিষয়টি প্রমাণিত হবে।

হাদীসের দ্বারা সহবাসের শর্ত এভাবে প্রমাণিত হবে যে, রাসূল ﷺ -এর যুগে হযরত রিফাআ (রা.) তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তার স্ত্রী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! রিফাআ আমাকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর আমি আব্দুর রহমানের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু আমি আব্দুর রহমানকে সহবাসে খুবই দুর্বল পেয়েছি।' রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ ইচ্ছে তা-ই। রাসূল ﷺ বললেন- لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهٗ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ অর্থাৎ, না, তুমি তার স্বাদ এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করার পূর্বে নয়। এ কথার দ্বারা সহবাসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য পুনরায় হালাল হওয়ার শর্ত হলো, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করা। উল্লিখিত হাদীসটি হলো মশহুর। আর মশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ততা করা জায়েজ আছে। কাজেই আয়াতের মাঝে ব্যবহৃত تَنْكِحَ শব্দকে সহবাসের অর্থে ব্যবহার না করলেও আয়াতকে উক্ত হাদীসের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, সহবাসের শর্তারোপের ক্ষেত্রে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) ছাড়া অন্য কারো দ্বিমত নেই। আর হাদীসে মশহুর -এর কারণে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.)-এর উক্ত মত গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন কি যদি এ মাসআলায় কোনো বিচারক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) -এর মতানুসারে ফয়সালা করেন, তবে সে ফয়সালাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কোনো মুফতি তার কথার ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করেন তবে আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত সৃষ্টিজীবের পক্ষ হতে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। -[আইনী]

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর তরে বৈধ হওয়ার জন্য তার যৌনাঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করানোই যথেষ্ট; বীর্যপাত করা শর্ত নয়। কেননা, বীর্যপাত হলো সহবাসের পূর্ণতার আলামত। আর হালাল হওয়ার জন্য সহবাসের পূর্ণতা একটি অতিরিক্ত শর্ত। আর অতিরিক্ত শর্ত দলিল ছাড়া প্রমাণিত হবে না।

وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِى التَّحْلِيْلِ كَالْبَالِغِ لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِىْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُوَ شَرْطٌ بِالنَّصِّ وَمَالِكٌ (رح) يُخَالِفُنَا فِيْهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَفَسَّرَهُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ اِمْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَاَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْاَوَّلِ وَمَعْنٰى هٰذَا الْكَلَامِ اَنْ يَتَحَرَّكَ اٰلَتُهُ وَيَشْتَهِىْ وَاِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا لِاِلْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُوْلِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ اِلَى الْاِيْجَابِ فِىْ حَقِّهَا اَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَاِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهٖ تَخَلُّقًا ـ

অনুবাদ : প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সমতুল্য। কেননা, এখানে বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস বিদ্যমান। আর নস তথা আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত শর্ত। ইমাম মালেক (র.) এ বিষয়ে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর তাঁর বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো, আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি [তা-ই]। বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে লিখেছেন, যে বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, কিন্তু তার মতো বালক সহবাস করতে পারে, এমন বালক যদি কোনো স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীলোকটির উপর গোসল ওয়াজিব হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, বালকটির লিঙ্গোত্থান ও কামেচ্ছা হয়। স্ত্রীলোকটির উপর গোসল ওয়াজিব হবে লিঙ্গদ্বয়ের মিলনের ফলে। কেননা, সেটি স্ত্রীলোকটির বীর্যস্খলনের কারণ। আর তার ক্ষেত্রেই গোসল ওয়াজিব করার কারণ দেখা দিয়েছে। অবশ্য বালকটির উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। যদিও অভ্যাস ও শিক্ষার জন্য তাকেও গোসল করতে বলা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِى التَّحْلِيْلِ كَالْبَالِغِ الخ : বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সমতুল্য। এর দলিল হলো, এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বিবাহের মাঝে সহবাস পাওয়া গিয়েছে। আর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতের দ্বারা এটাকেই শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.) আমাদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরের সহবাস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রা.) -এর নিকট স্ত্রীর যৌনাঙ্গে শুধুমাত্র পুরুষের যৌনাঙ্গ প্রবেশ করানোই যথেষ্ট নয়; বরং বীর্যপাতও শর্ত। আর বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরের পক্ষে যেহেতু বীর্যপাত করা সম্ভব নয়, তাই এ কিশোর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সমতুল্য হতে পারে না।

ইমাম মালেক (র.) -এর উক্ত মতের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বোল্লিখিত দলিলই যথেষ্ট। আর ইমাম আতরাজী (র.) বলেন, ইমাম মালেক (র.)-এর বিপরীতে দলিল হলো- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এ আয়াত। ইমাম কাকী (র.) বলেন, ইমাম মালেক (র.) -এর মতের বিপরীত দলিল হলো প্রসিদ্ধ হাদীসে উসায়লা।

قَوْلُهُ وَفَسَّرَهُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর নামক কিতাবে مُرَاهِقْ তথা বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরের ব্যাখ্যায় বলেছেন, বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর বলা হয় ঐ বালককে যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। তবে এমন বালক সহবাস করতে সক্ষম।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, যদি কোনো স্ত্রীলোক এমন বালকের সাথে সহবাস করে তবে উক্ত স্ত্রীলোকটির উপর গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি উক্ত স্ত্রীলোক কারো তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকে, তাহলে এ কিশোরের সহবাস দ্বারা সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, উক্ত কিশোর সহবাসের পর তাকে তালাক প্রদান করতে হবে এবং মহিলার ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে।

قَوْلُهُ مَعْنٰى هٰذَا الْكَلَامِ اَنْ يَتَحَرَّكَ الخ : বয়ঃসন্ধিক্ষণ কিশোরের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে কথা বলেছেন, তার অর্থ হলো, উক্ত কিশোরের লিঙ্গোত্থান হয় এবং তার সহবাসের প্রতি আগ্রহ ও কামেচ্ছা হয়। এ শর্ত এজন্যই আরোপ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ উভয়েই পরস্পরের স্বাদ আস্বাদন করার শর্তারোপ করেছেন। আর স্বাদ আস্বাদন লিঙ্গোত্থান ও কামেচ্ছা ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ : আর বিশেষ করে মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা, যৌনাঙ্গদ্বয়ের বস্ত্রবিহীন সংস্পর্শ ও প্রবিষ্টকরণ পাওয়া গেছে। আর এটাই হলো মহিলার বীর্যস্খলনের কারণ। তাই বাহ্যিক কারণকে অন্তর্নিহিত কারণের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করে গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়েছে। অপর দিকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ কিশোরের উপর গোসল ওয়াজিব নয়। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ার দরুন সে শরিয়তের হুকুম পালনে বাধ্য নয়। তবে তাকে গোসলে অভ্যস্ত করার জন্য গোসলের নির্দেশ প্রদান করা হবে।

قَالَ وَ وَطْئُ الْمَوْلٰى اَمَتَهٗ لَا يُحِلُّهَا لِاَنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ وَاِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيْلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوْهٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ وَهٰذَا هُوَ مَحْمَلُهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْيِهَا حَلَّتْ لِلْاَوَّلِ لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِىْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ اِذِ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِاَنَّهٗ فِىْ مَعْنَى الْمُوَقَّتِ فِيْهِ وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِفَسَادِهٖ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهٗ يَصِحُّ النِّكَاحُ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِاَنَّهٗ اِسْتَعْجَلَ مَا اَخَّرَهُ الشَّرْعُ فَيُجَازٰى بِمَنْعِ مَقْصُوْدِهٖ كَمَا فِىْ قَتْلِ الْمُوْرِثِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাসীর সাথে মনিবের সহবাস তাকে [প্রথম স্বামীর জন্য] হালাল বানাবে না। কেননা, আয়াতে বর্ণিত সীমা হচ্ছে স্বামীর সাথে "নিকাহ"। আর যদি উক্ত মহিলাকে হালাল করার শর্তে বিবাহ করে তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়, তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত।' বিবাহের আকদের সময় হালাল করার শর্তারোপ করাই হচ্ছে হাদীসটির প্রয়োগক্ষেত্র। তবে [শর্তারোপের পরেও] যদি সহবাসের পর তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে। এজন্য যে, বিশুদ্ধ বিবাহে সহবাস হয়েছে কেননা, [তালাকের] শর্তারোপ দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের শর্তারোপ বিবাহকে ফাসেদ করে দেয়। কেননা, এটা نِكَاحٌ مُوَقَّتٌ 'সাময়িক বিবাহের সমার্থক'। [বিশুদ্ধ বিবাহ যেহেতু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত সেহেতু] ফাসেদ হওয়ার কারণে এ বিবাহ উক্ত মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে বিবাহ তো শুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে তা তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না। কেননা, শরিয়ত যেটাকে বিলম্বিত করেছে সেটাকে সে তাড়াহুড়ো করে পেতে চেয়েছে। সুতরাং তার উদ্দেশ্যকে বিরত রেখে তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন- যার থেকে মিরাস পাবে [ওয়ারিশ কর্তৃক] তাকে হত্যা করার বিষয়টি। [সে ক্ষেত্রে ওয়ারিশ মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَ وَطْئُ الْمَوْلٰى اَمَتَهٗ لَا يُحِلُّهَا الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে [যে অন্যের দাসীও বটে] দুই তালাক প্রদান করে। অতঃপর তার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর তার মনিব তার সাথে সহবাস করে, তবে মনিবের এ সহবাসের দ্বারা সে তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। দলিল হলো- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতের মাঝে উক্ত স্ত্রীলোককে তার প্রথম স্বামীর জন্য হারাম থাকার শেষ সীমা বর্ণনা করা হয়েছে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পর্যন্তকে। আর মনিবকে যেহেতু স্বামী বলা হয় না, বিধায় মনিবের সহবাস প্রথম স্বামীর জন্য হালাল সাব্যস্ত করবে না।

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একবার হযরত ওসমান (রা.) -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মনিব তার দাসীর সাথে সহবাস করলে মনিবের এ সহবাস উক্ত দাসীকে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল সাব্যস্ত করবে কিনা ? সে সময় হযরত ওসমান (রা.) -এর দরবারে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওসমান এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বললেন, মনিবের সহবাস উক্ত দাসীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল সাব্যস্ত করবে। কেননা, মনিবও স্বামীই। হযরত আলী (রা.) তাদের এ উত্তরে অসন্তুষ্ট হলেন এবং স্বস্থান হতে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলে উঠলেন- لَيْسَ بِزَوْجٍ - 'মনিব কিছুতেই স্বামী নয়।'

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيْلِ الخ : যদি কেউ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার শর্তে বিবাহ করে; যেমন বলে যে- تَزَوَّجْتُكِ عَلٰى اَنْ اُحَلِّلَكِ - 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম তোমাকে তোমার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার প্রয়োজনে', তাহলে উক্ত বিবাহ মাকরূহ হবে। মাকরূহ হওয়ার দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, "হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত"। হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র এটিই। কেননা, হালাল করার ইচ্ছাকে অন্তরে পোষণ করে মুখে প্রকাশ না করে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্য যদি কেউ তাকে বিবাহ করে তবে সে কিছুতেই লা'নতের যোগ্য হবে না। হ্যাঁ তবে হালাল করার শর্তে কেউ যদি বিবাহ করে উক্ত নারীর সাথে সহবাস করার পর তাকে তালাক প্রদান করে, তবে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। দলিল এই যে, বিশুদ্ধ বিবাহের মাঝে সহবাস পাওয়া গিয়েছে। আর হালাল হওয়ার জন্য এটাই শর্ত।

বাকি থেকে গেল হালাল করার শর্তে বিবাহ করলে তা শুদ্ধ হবে কিনা ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে, আমাদের নিকট তা শুদ্ধ হবে। কেননা, শর্তে ফাসিদের কারণে বিবাহ ফাসিদ হয় না। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হালাল করার শর্তে বিবাহ করলে তা ফাসেদ হবে। কেননা, এটা نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ তথা সাময়িক বিবাহের সমতুল্য। যেমন সে বলল যে- تَزَوَّجْتُكِ اِلٰى وَقْتِ كَذَا - 'আমি তোমাকে অমুক সময় পর্যন্ত বিবাহ করলাম।' আর نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ তথা সাময়িক বিবাহ ফাসেদ এজন্যই হালাল করার শর্তে বিবাহ করা ফাসেদ হবে। আর যেহেতু এ বিবাহ ফাসেদ, তাই এ ব্যক্তি প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারীও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, হালালকারী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ বিবাহ হওয়া শর্ত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর এক বর্ণনানুসারে হালাল করার শর্তে বিবাহ করলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, শর্তে ফাসিদ দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না। কিন্তু এ মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কেননা, শরিয়ত যে জিনিস বিলম্বিত করেছিল সে তা ত্বরিৎ অর্জন করার চেষ্টা করেছে। কেননা, বিবাহ সারা জীবনের জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে। সে ভিত্তিতে উচিত তো এটাই ছিল যে, দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর এ মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। কিন্তু সে হালাল করার শর্তারোপ করে হালাল হওয়াকে দ্রুত অর্জন করতে চেয়েছে। কাজেই তার উদ্দেশ্যকে বিরত রেখে প্রথম স্বামীকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন- যার কাছ থেকে মিরাস পাবে তাকে যদি কোনো ওয়ারিশ হত্যা করে ফেলে, তবে উক্ত ওয়ারিশকে তার মিরাস হতে বঞ্চিত করা হবে। কেননা, শরিয়ত যে জিনিসকে বিলম্বিত করেছিল সে তাকে তাড়াহুড়া করে পেতে চেয়েছে।

'রওজাতুল জনদুবস্তী' নামক কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হালাল করার শর্তে বিবাহও শুদ্ধ হবে এবং উক্ত শর্তারোপও শুদ্ধ হবে। এমন কি দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে ফেলার পর বিচারক তাকে তালাক প্রদানের জন্য বাধ্য করতে পারবেন। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় অথবা কাজির নির্দেশে তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। ইমাম জহীর উদ্দিন (র.) বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উক্ত বর্ণনা উক্ত কিতাব ছাড়া অন্যকোনো কিতাবে নেই, বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং উক্ত বর্ণনানুসারে ফয়সালাও করা যাবে না।

وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ أُخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَادَتْ بِثَلْثِ تَطْلِيْقَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مَا دُوْنَ الثَّلْثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلْثَ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلْثِ لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصِّ فَيَكُوْنُ مُنْهِيًا وَلَا إِنْهَاءَ لِلْحُرْمَةِ قَبْلَ الثُّبُوْتِ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ سَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ .

অনুবাদ : স্বাধীনা স্ত্রীকে যদি এক তালাক অথবা দুই তালাক প্রদান করা হয় এবং তার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, এরপর সে [তালাকের মাধ্যমে] প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসে, তাহলে সে নতুন তিন তালাকের অধিকারসহ ফিরে আসবে এবং দ্বিতীয় স্বামী পূর্ববর্তী তিন তালাককে যেমন বিলুপ্ত করে, তেমনি তিনের কম তালাককেও বিলুপ্ত করে দেয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তিনের কম তালাককেই বিলুপ্ত করবেন। কেননা, নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্বামী হচ্ছে হারাম হওয়ার সীমা; সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী হবে হুরমতকে বিলুপ্তকারী। আর সাব্যস্ত হওয়ার আগে হুরমতের বিলুপ্তির প্রশ্নই আসে না। শায়খাইনের দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ এখানে দ্বিতীয় স্বামীকে হালালকারী বলা হয়েছে। সুতরাং সে হালাল সাব্যস্তকারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনা স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক প্রদান করে এবং সে মহিলার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে অন্য আরেক স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী তাকে সহবাসের পর তালাক প্রদান করে, অতঃপর উক্ত মহিলা ইদ্দত পূর্ণ করে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসলে তিন তালাকের অধিকার সহ ফিরে আসবে। অর্থাৎ, প্রথম স্বামী নতুন করে তিন তালাকের মালিক হবে। আর দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাকের কম এক অথবা দুই তালাককে ঠিক সেভাবেই বিলুপ্ত করে দেবে, যেভাবে সে তিন তালাককে বিলুপ্ত করে দেয়। এটা হলো শায়খাইনের অভিমত।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হলো, দ্বিতীয় স্বামী তিনের কম তথা এক বা দুই তালাককে বিলুপ্ত করতে পারে না; বরং প্রথম স্বামী অবশিষ্ট এক অথবা দুই তালাকেরই মালিক থাকবে। অর্থাৎ, প্রথম স্বামী পূর্বে এক তালাক দিয়ে থাকলে দুই তালাকের আরো পূর্বে দুই তালাক দিয়ে থাকলে এক তালাকের মালিক থাকবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমতও এটিই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -এর মাঝে فَلَا تَحِلُّ لَهُ -এর উদ্দেশ্য হলো চিরস্থায়ী হুরমত। আর উক্ত হুরমতের শেষ সীমানা হলো দ্বিতীয় স্বামীর সাথে 'নিকাহ' করা। কেননা, حَتَّى এ শব্দটিকে সীমানা বর্ণনার জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যে জিনিসের সীমানা বর্ণনা করা হয় সে জিনিসের পরিধি বর্ণিত সীমা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই উক্ত হুরমতের বিলুপ্ত সাধনকারী হবে। আর হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে তা বিলুপ্ত করার প্রশ্নই আসে না। কাজেই তিন তালাকের চেয়ে কমের সুরতে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ অবস্থায় হুরমত সাব্যস্তই হয়নি। আর যেহেতু হুরমত সাব্যস্তই হয়নি, তাই দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস তার জন্য শেষ সীমা হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাকের কমকে বিলুপ্ত করে না। আর যেহেতু দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাকের কমকে বিলুপ্ত করে না সেহেতু প্রথম স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিন তালাকের মালিক হবে না; বরং প্রথমবার যে কম তালাক প্রদান করেছিল তার অবশিষ্টগুলোর মালিক হবে।

শায়খাইনের দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর বাণী– لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ উক্ত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجِ الثَّانِيْ -এর অধীনে বর্ণনা করেছেন। কাজেই হালালকারীর দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীই উদ্দেশ্য হবে। যেন রাসূল ﷺ দ্বিতীয় স্বামীকে হালালকারী নামে নামকরণ করেছেন। আর হালালকারীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হালাল সাব্যস্তকারী।

প্রশ্ন থেকে গেল যে, দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা যে হিল্লত সাব্যস্ত হবে তা কি পূর্ববর্তী হিল্লত না নতুন হিল্লত?

উত্তরে বলতে হয়, পূর্ববর্তী হিল্লত হতে পারে না। কেননা, এতে করে অর্জিত জিনিস পুনরায় অর্জনের প্রশ্ন দেখা দেবে। কাজেই নতুন হিল্লতই নির্দিষ্ট হলো। আর এটাও জরুরি বিষয় যে, নতুন হিল্লত পূর্ববর্তী হিল্লত -এর বিপরীত হবে। পূর্ববর্তী হিল্লত ছিল অসম্পূর্ণ, তাই নতুন হিল্লত হবে পরিপূর্ণ। আর পরিপূর্ণ হিল্লত তিন তালাকের দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য নতুন করে তিন তালাকের অধিকার সাব্যস্ত করবে। চাই প্রথম স্বামী তিন তালাক প্রদান করুক বা তার চেয়ে কম– দুটোই সমান।

وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَقَالَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْتُ وَ دَخَلَ بِيَ الزَّوْجُ وَطَلَّقَنِي وَانْقَضَتْ عِدَّتِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذٰلِكَ جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ لِأَنَّهُ مُعَامَلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِينِيٌّ لِتَعَلُّقِ الْحِلِّ بِهِ وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِمَا مَقْبُولٌ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ وَاخْتَلَفُوْا فِي أَدْنٰى هٰذِهِ الْمُدَّةِ وَسَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

অনুবাদ : আর স্বামী যদি তাকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর স্ত্রী বলে যে, আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে এবং আমি বিবাহ করেছি, আর দ্বিতীয় স্বামী আমার সাথে সহবাস করে আমাকে তালাক প্রদান করেছে, অতঃপর আমার ইদ্দতও শেষ হয়েছে। আর অতিক্রান্ত সময় এর সম্ভাবনাও রাখে, তাহলে স্বামী তার দাবিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে– যদি বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা হয়। কেননা, বিবাহের বিষয়টি হয় দুনিয়াবি মুআমালা, কিংবা তা একটি দীনি বিষয়। যেহেতু তার সাথে সম্ভোগ হালাল হওয়ার বিষয় রয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রেই একজনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া মহিলার দাবি অস্বাভাবিকও নয়। কেননা, অতিক্রান্ত সময় তার সম্ভাবনা রাখে। সম্ভাব্যতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইদ্দত অধ্যায়ে আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَقَالَتْ قَدِ انْقَضَتْ الخ : যদি কেউ তার স্বাধীনা স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী বলে যে, আমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। এরপর সে আমার সাথে সহবাস করার পর আমাকে তালাক প্রদান করেছে। অতঃপর আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে। আর অবস্থা হলো এই যে, উক্ত মহিলা যে সময়ের কথা বলে সে সময়ের মাঝে উল্লিখিত সকল কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তাহলে প্রথম স্বামী ইচ্ছে করলে তার বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে, যদি তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়।

এর দলিল এই যে, বিবাহ হয়তো একটি দুনিয়াবি মুআমালা অথবা দীনি বিষয়। দুনিয়াবি মুআমালা তো এজন্য যে, রমণীর সম্ভোগ-অঙ্গের বিনিময়ে মাল ধার্য করা হয়ে থাকে। আর দীনি বিষয় তো এজন্য যে, তার সাথে সম্ভোগ হালাল হওয়ার বিষয়টি জড়িত। আর উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই একজন মুসলমানের কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। দীনি বিষয়ে একজন মুসলমানের কথা তো এজন্যই গ্রহণ করা হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ ধরনের ক্ষেত্রে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের কথাই গ্রহণ করতেন। সংখ্যার বিষয়টি বিবেচ্য হতো না।

আর দুনিয়াবি মুআমালা হলো দুই প্রকার– এক প্রকার হলো যার মাঝে إِلْزَام তথা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ নেই। যেমন– ওয়াকালাত। এ ধরনের মুআমালার মাঝে একজনের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হোক বা ফাসিক হোক, নাবালেগ হোক বা বালেগ হোক, মুসলমান হোক বা অমুসলিম হোক, গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক, পুরুষ হোক বা নারী হোক। এ ক্ষেত্রে সংখ্যা এবং ন্যায়পরায়ণতা কোনোটিই শর্ত নয়। মুআমালার অপর প্রকার হলো, যার মাঝে إِلْزَام তথা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ বিদ্যমান। যেমন– বান্দার হকসমূহ। এ ক্ষেত্রে সংখ্যা, ন্যায়পরায়ণতা এবং শাহাদাতের শব্দ সবকিছুই শর্ত।

মোটকথা, উল্লিখিত মাসআলায় একজন নারীর কথা অগ্রহণযোগ্য হবে না, যদি সময় এগুলোর সম্ভাবনা রাখে এবং মহিলা সত্যবাদী হওয়ার ধারণা প্রবল হয়।

এখন বাকি থেকে গেল এ কথা যে, উল্লিখিত সবকটি বিষয় তথা প্রথম স্বামী কর্তৃক তালাক, ইদ্দত পালন, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, সহবাস হওয়া এবং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক ও ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া ইত্যাদি সর্বনিম্ন কতদিন সময়ের মাঝে সম্পাদিত হতে পারে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইদ্দত অধ্যায়ে এর আলোচনা করার অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, গ্রন্থকার ইদ্দত অধ্যায়ে তার এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেননি। হতে পারে, তিনি তাঁর উক্ত অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু হিদায়ার ভাষ্যকারগণ উক্ত মতবিরোধ আলোচনা করেছেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট প্রথম ও দ্বিতীয় স্বামীর প্রত্যেকের তালাকের ইদ্দতের সর্বনিম্ন সময় হলো ষাট দিন, আর সাহেবাইনের নিকট উনচল্লিশ দিন করে। সাহেবাইনের মতের ব্যাখ্যা হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে তুহরের একেবারে শেষ অংশে তালাক প্রদান করল। তাহলে মহিলার ইদ্দত দুই তুহর তিন হায়েজ হবে। আর তুহরের সর্বনিম্ন সময় হলো পনের দিন, আর হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন। সুতরাং দুই তুহরে ত্রিশ দিন আর তিন হায়েজে নয় দিন, সর্বমোট উনচল্লিশ দিন হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বর্ণনানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তুহরের শুরুতে তালাক প্রদান করবে। এতে করে মহিলার ইদ্দত তিন তুহর ও তিন হায়েজ হবে। তুহরের সর্বনিম্ন সময় পনের দিন আর হায়েজের মধ্যবর্তী সময় হলো পাঁচদিন। সে মতে তিন তুহরে হয় পঁয়তাল্লিশ দিন এবং তিন হায়েজে হয় পনের দিন, সর্বমোট ষাট দিন হলো।

আর ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর বর্ণনানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতের ব্যাখ্যা হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে তুহরের শেষে তালাক প্রদান করবে। এতে করে মহিলার ইদ্দত দুই তুহর তিন হায়েজ হবে। তুহরের সর্বনিম্ন সময় পনের দিন, আর হায়েজের সর্বোচ্চ সময় দশদিন। সে মতে দুই তুহরে ত্রিশ দিন এবং তিন হায়েজে ত্রিশ, মোট ষাট দিন হলো। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

بَابُ الْإِيْلَاءِ

وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (الْاٰيَة) .

পরিচ্ছেদ : ঈলা

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না কিংবা বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে চার মাস পর্যন্ত মিলিত হব না, তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ অর্থাৎ, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে তাদের জন্য হুকুম হলো, চার মাস অপেক্ষা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'ঈলা'-এর সংজ্ঞা ও হুকুম : ঈলা -এর আভিধানিক অর্থ হলো– কসম করা, শপথ করা। শরিয়তের পরিভাষায় ঈলা বলা হয়– مَنْعُ النَّفْسِ عَنْ قُرْبَانِ الْمَنْكُوْحَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا - 'নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সাথে চার মাস বা ততোধিক সময় সহবাসে লিপ্ত না হওয়ার কসম খাওয়া-কে।'

'ঈলা' সংঘটিত হওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট শর্ত হলো, ঈলাকারী তালাকের যোগ্য হওয়া। আর সাহেবাইন (র.) -এর নিকট শর্ত হলো, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হওয়া।

'ঈলা' -এর রুকন হলো– وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - 'আল্লাহর শপথ আমি তোমার সাথে চার মাস [বা ততোধিক সময়] সহবাসে লিপ্ত হব না।' এ কথা বলা।

'ঈলা' -এর হুকুম হলো, চার মাসের মাঝে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর ঈলার সময়কালে সহবাস না করলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

فَتْحُ الْقَدِيْرِ -এর লেখক বর্ণনা করেছেন, স্ত্রী চার কারণে হারাম হয়। যথা– ১. তালাকের দ্বারা, ২. ঈলার দ্বারা, ৩. জিহারের দ্বারা, ৪. লি'আনের দ্বারা।

এগুলোর মধ্যে তালাককে সর্বপ্রথম উল্লেখ করার কারণ হলো, হারাম হওয়ার পদ্ধতিগুলোর মাঝে তালাকই হলো মূল। অতঃপর ঈলাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বৈধতার ক্ষেত্রে ঈলা তালাকের নিকটবর্তী। কেননা, ঈলা কসমকেই বলা হয়। কিন্তু তার মাঝে স্ত্রীকে তার সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার কারণে তাতে এক ধরনের জুলুমও রয়েছে, বিধায় তাকে তালাকের পর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ وَاللّٰهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে উল্লিখিত মাসআলা এবং তার দলিল সুস্পষ্ট। তবে উল্লেখ করার বিষয় হলো, ঈলার দুটি সুরত রয়েছে। একটি হলো স্বামীর কথা– وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَبَدًا - 'আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমার সাথে মিলিত হব না।' উল্লিখিত সুরতে উক্ত ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় সুরত হলো, স্বামীর কথা– وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - 'আল্লাহর কসম, আমি চার মাস পর্যন্ত তোমার সাথে মিলিত হব না।' এ সুরতে আহনাফের নিকট ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর নিকট উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ না সে চার মাসের অধিক সময় মিলিত না হওয়ার কসম করবে। কেননা, তাঁদের নিকট চার মাসের পরও 'ঈলা' হতে ফিরে আসতে পারে। কাজেই তা চার মাস হতে কিছু সময় অতিরিক্ত হওয়া অপরিহার্য। ইমাম মালেক (র.) -এর নিকট সে অতিরিক্ত সময় কমপক্ষে একদিন হতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট এক মুহূর্ত হলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁদের এ অভিমত বাহ্যত কুরআনের বিপরীত হওয়ার কারণে বর্জিত হবে।

فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِثَ فِي يَمِيْنِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوْجَبُ الْحِنْثِ وَسَقَطَ الْإِيْلَاءُ لِأَنَّ الْيَمِيْنَ تَرْتَفِعُ بِالْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) تَبِيْنُ بِتَفْرِيْقِ الْقَاضِيْ لِأَنَّهُ مَانِعُ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَنُوْبُ الْقَاضِيْ مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مَضِيِّ هٰذِهِ الْمُدَّةِ وَهُوَ الْمَأْثُوْرُ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَكَفٰى بِهِمْ قُدْوَةً وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَاجِيْلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ـ

অনুবাদ : যদি সে এ চার মাসের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, কসম ভঙ্গ হওয়ার অনিবার্য হুকুম হলো কাফ্ফারা [ওয়াজিব হওয়া]। তবে ঈলার দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কেননা, কসম ভঙ্গের দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। আর যদি সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, এমন কি চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর পক্ষ হতে তার উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাজির বিচ্ছেদের রায় ঘোষণার মাধ্যমে তার উপর তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত হকের ব্যাপারে স্বামী বাধা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিচ্ছেদের ব্যাপারে কাজি তার স্থলবর্তী হবেন। যেমন– কর্তিত লিঙ্গ ও নপুংসকের ক্ষেত্রের হুকুম। আমাদের দলিল হলো, সহবাসের অধিকার ক্ষুণ্ন করার দ্বারা স্বামী তার উপর অবিচার করেছে। সুতরাং এ সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহের নিয়ামত বিলুপ্তির মাধ্যমে শরিয়ত তাকে [বিচ্ছেদের] শাস্তি দিয়েছে। [কাজেই কাজির বিচ্ছেদের রায় ঘোষণার প্রয়োজন নেই]। হযরত ওসমান (রা.), আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে এ মতটি বর্ণিত আছে। আর অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁরাই যথেষ্ট। তাছাড়া জাহিলি যুগে এটা [তাৎক্ষণিক] তালাকরূপে গণ্য হতো। শরিয়ত শুধু নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বিলম্বিত করার হুকুম দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ الخ : স্বামী যদি 'ঈলা' -এর সময়সীমা তথা চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সে কসম ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে বটে, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো, কসম ভঙ্গ করার অপরিহার্য হুকুম হচ্ছে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়া। শরিয়তের দৃষ্টিতে 'ঈলা' হলো কসম। আর সে ব্যক্তি উক্ত কসম ভঙ্গ করেছে, বিধায় তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

এ আয়াত। কেননা, উক্ত আয়াত হতে বুঝা যায় যে, যদি ঈলার সময়ের মাঝে সে সহবাস করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তার কৃতকার্যের কারণে তাকে কাফফারা প্রদান করতে হয় না। এজন্য সে ব্যক্তির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের পক্ষ হতে উক্ত বক্তব্যের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ক্ষমার ঘোষণা আখিরাতের জন্য প্রযোজ্য। আর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় দুনিয়াতে। কাজেই আখিরাতে ক্ষমার ঘোষণা দুনিয়াতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাছাড়া এটা হলো ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর প্রাথমিক অভিমত। তাঁর নতুন অভিমত আমাদের মাযহাবেরই অনুরূপ। ইমাম মালেক (রা.) এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর অভিমতও তা-ই।

মোটকথা, ঈলার সময়সীমার মাঝে সহবাস করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়, কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় এবং 'ঈলা' বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'ঈলা' বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, চার মাস অতিবাহিত হলেও তালাক পতিত হবে না। কেননা, কসম ভঙ্গ করার দ্বারা ইয়ামীন বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর ঈলার অপর নামই হলো কসম। সুতরাং ইয়ামীন অবশিষ্ট না থাকলে ঈলাও অবশিষ্ট থাকে না। আর স্বামী যদি ঈলার সময়সীমার মাঝে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম না হয় এমন কি ঈলার সময় তথা চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে ওলামায়ে আহনাফের অভিমত অনুসারে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (র.) -এর মতানুসারে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধুমাত্র ঈলার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার দ্বারাই তালাক পতিত হবে না; বরং সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা তালাক দেওয়া দুটির কোনটি সে করে, তার অপেক্ষা করা হবে। যদি সে কোনো কিছু করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মহিলাও কাজির দরবারে বিচ্ছেদপ্রার্থী হয়, তাহলে কাজি বিচ্ছেদের রায় প্রদান করবেন। আর এতে এক তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে।

মাবসূতে আছে, কাজির এ রায় এক তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কাজির এ ব্যাপারে এ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে এক তালাকে রাজ'ঈ, অথবা এক তালাকে বায়েন, অথবা দুই বা তিন তালাক পতিত করতে পারেন। অথবা বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটিয়ে দিতে পারেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, কাজি উক্ত মহিলাকে এক তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করবে। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমত।

জাহিরীদের মাযহাব হলো, ঈলার সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর কাজি মহিলাকে তালাক প্রদান করবে না; বরং স্বামীকে প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করে অথবা জেলখানায় অন্তরীণ করে তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণে অথবা তালাক প্রদানে বাধ্য করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর প্রাথমিক মত এটিই।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَانِعٌ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, স্বামী চার মাসের অধিক সময় স্ত্রী সহবাস না করার কসম করে স্ত্রীকে তার সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এহেন আচরণ স্ত্রীকে কষ্টে নিপতিত করার নিমিত্তেই। স্ত্রীকে এহেন কষ্টে নিপতিত করে স্বামী স্ত্রীকে উত্তমভাবে নিজের কাছে রাখা হতে বিরত থেকেছে, বিধায় বিচারক স্ত্রীকে উত্তমভাবে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। আর কাজির এ বিচ্ছেদই এক তালাকে বায়েনরূপে সাব্যস্ত হবে। যেমন– স্বামীর লিঙ্গ কর্তিত হলে অথবা নপুংসক হলে কাজি স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকেন।

قَوْلُهُ أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا الخ : আমাদের দলিল হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করে তার উপর জুলুম করেছে। তাই শরিয়ত তার উক্ত জুলুমের প্রতিকার এভাবে করেছে যে, ঈলার সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহের নিয়ামতের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, যাতে স্ত্রী উক্ত জুলুম হতে মুক্তি পায়। প্রকাশ থাকে যে, তালাকে রাজ'ঈ দ্বারা মহিলা উক্ত জুলুম হতে মুক্তি পাবে না। কেননা, স্বামী তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবে। তাই এটা তালাকে বায়েন হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের মাযহাব তথা ঈলার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারাই এক তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার বিষয়টি হযরত ওসমান (রা.), আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। আর অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উক্ত মহান ব্যক্তিবর্গই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের অপর আকলী দলিল হলো, জাহিলিয়া যুগে 'ঈলা' তাৎক্ষণিকভাবে তালাকে বায়েন হিসেবে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ 'ঈলা' করার পর থেকে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে আর কখনোই সহবাস করতে পারত না। অতঃপর শরিয়তে ইসলাম তার হুকুমকে ঈলার সময়কাল পর্যন্ত বিলম্বিত করেছে। কাজেই বিলম্বিত হওয়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন তাতে হবে না। সুতরাং জাহিলিয়া যুগে ঈলার দ্বারা যেমন তালাকে বায়েন পতিত হতো, ঠিক তেমনি বর্তমানেও তালাকে বায়েন-ই পতিত হবে। অনুরূপভাবে জাহিলিয়া যুগে তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার জন্য যেমন কাজির বিচ্ছেদ ঘোষণার প্রয়োজন হতো না, তেমনি বর্তমানেও কাজির বিচ্ছেদ ঘোষণার উপর বিষয়টি নির্ভরশীল হবে না।

فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُوَقَّتَةً بِهِ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ فَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ وَلَمْ يُوْجَدِ الْحِنْثُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مَنْعُ الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيْنُوْنَةِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيْلَاءُ فَإِنْ وَطِيَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيْقَةٌ أُخْرَى لِأَنَّ الْيَمِيْنَ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَبِالتَّزَوُّجِ ثَبَتَ حَقُّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ وَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاءُ هٰذَا الْإِيْلَاءِ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا عَادَ الْإِيْلَاءُ وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى إِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا لِمَا بَيَّنَّاهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ أٰخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذٰلِكَ الْإِيْلَاءِ طَلَاقٌ لِتَقَيُّدِهِ بِطَلَاقِ هٰذَا الْمِلْكِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيْزِ الْخِلَافِيَّةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنْثِ فَإِنْ وَطِيَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ لِوُجُوْدِ الْحِنْثِ .

অনুবাদ : যদি চার মাসের কসম করে থাকে, তাহলে ইয়ামীন শেষ হয়ে যাবে। কেননা, তা ছিল চার মাসের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর যদি চিরজীবনের জন্য কসম করে থাকে, তাহলে ইয়ামীন অব্যাহত থাকবে। কেননা, ইয়ামীনটি এখানে নিঃশর্ত, আর ইয়ামীন ভঙ্গের কোনো কর্মও পাওয়া যায়নি, যাতে তা দ্বারা ইয়ামীন প্রত্যাহৃত হতে পারে। অবশ্য পুনরায় বিবাহের পূর্বে নতুন তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, বিচ্ছেদের পর সহবাস-অধিকার ক্ষুণ্ন করা পাওয়া যায়নি। আর যদি স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে, তাহলে বিদ্যমান 'ঈলা' ফিরে আসবে। সুতরাং সে যদি [নির্ধারিত সময়ে] তার সাথে সহবাস করে [তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে]। অন্যথায় চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরেকটি তালাক পতিত হবে। কেননা, সময়ের বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার কারণে ইয়ামীন অব্যাহত রয়েছে এবং [পুনরায়] বিবাহের কারণে স্ত্রীর সহবাস-অধিকারও স্থাপিত হবে। সুতরাং স্বামীর পক্ষ হতে অবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর বিবাহের শুরু থেকে এই ঈলার সূচনা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যদি তৃতীয়বার তাকে বিবাহ করে, তাহলে ঈলা পুনরায় ক্রিয়াশীল হবে এবং যদি সহবাস না করে, তাহলে চার মাস পর আরেকটি তালাক পতিত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যদি অন্য স্বামীর সাথে বিবাহের পর সে তাকে পুনরায় বিবাহ করে, তাহলে উক্ত ঈলা দ্বারা আর কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা, এটা বর্তমান স্বামী-স্বত্বের তালাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই হচ্ছে [ইয়ামীনের পর] তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রদানের বিরোধপূর্ণ মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। পূর্বে এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তবে ইয়ামীন বহাল থাকবে– সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে এবং [কসম] ভঙ্গকারী না পাওয়া যাওয়ার কারণে। এখন যদি সে সহবাস করে, তাহলে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। কসম ভঙ্গ হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি চার মাস তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না-করার কসম করে এবং সহবাস ছাড়াই চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং তার কসম শেষ হয়ে যাবে। কেননা, এ সুরতে তার কসম চার মাস সময়ের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং তা অতিবাহিত হওয়ার কারণে ইয়ামীনও শেষ হয়ে যাবে।

আর যদি সে সারা জীবন স্ত্রী সহবাস না করার কসম করে। যেমন বলে যে– وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَبَدًا - 'আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই তোমার সাথে সহবাস করব না।' অতঃপর সহবাস ছাড়াই চার মাস অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে, কিন্তু তার ইয়ামীন অব্যাহত থাকবে; শেষ হবে না।

দলিল হলো, এ সুরতে কসম কোনো সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না। এজন্য তার ইয়ামীন চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। আর স্বামী থেকে ইয়ামীন ভঙ্গকারী কোনো কর্ম তথা সহবাস পাওয়া যায়নি। যাতে তার কারণে ইয়ামীন প্রত্যাহৃত হতে পারে।

তবে পুনরায় বিবাহের পূর্বে যদি আরো চার মাস অতিক্রান্ত হয়, তাহলে অধিকাংশ মাশায়েখে কেরামের মতানুসারে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা, তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার পর মহিলার সহবাসের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়নি। এজন্য যে, তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার পর উক্ত মহিলার সহবাসের অধিকারই আর অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে এক্ষেত্রে স্বামী জালিম হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। আর স্বামী যদি জালিম সাব্যস্ত না হয়, তাহলে বিবাহের নিয়ামত বিলুপ্তির মাধ্যমে তাকে শাস্তিও প্রদান করা হবে না।

ফকীহ আবূ সাহল এবং মুহীত গ্রন্থকারের অভিমত হলো, যদি মহিলার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার আগে আগে আরো চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় তালাক এবং আরো চার মাস অতিক্রান্ত হলে তৃতীয় তালাকও পতিত হবে। কেননা, তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'ঈলা' হলো পুনঃপুন সংঘটিত শর্তের ন্যায়। যেন স্বামী তাকে বলেছিল–

كُلَّمَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ أَقْرَبْكِ فِيْهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ.

"যখনই এমন কোনো চার মাস অতিবাহিত হবে, যাতে আমি তোমার সাথে সহবাস করব না, তাহলে তোমার উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।"

আর স্বামী যদি উক্ত পুনঃপুন সংঘটিত শর্তকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করত, তাহলে হুকুম তা-ই হতো, যা আমরা বর্ণনা করলাম। কাজেই ঈলার ক্ষেত্রেও হুকুম তা-ই হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيْلَاءُ الخ : আর যদি তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উক্ত স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে, তাহলে ঈলাও পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং সে যদি ঈলার সময়কালে স্ত্রীসহবাস করে, তাহলে তার কসম ভেঙ্গে যাবে, তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। আর যদি সহবাস না করে, তাহলে চার মাস অতিবাহিত হতেই দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। কেননা, সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ না হওয়ার কারণে তার ইয়ামীন এখনো বাকি রয়েছে। আর পুনরায় বিবাহ করার কারণে মহিলার সহবাসের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে স্বামী জুলুমকারী সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই পুনরায় তালাকে বায়েনের দ্বারা তার সে জুলুমের প্রতিকার করা হবে। তবে স্মর্তব্য যে, দ্বিতীয় ঈলার সময়কালের সূচনা দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় হতে শুরু হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ যদি ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত হয়, তাহলে ঈলার সময়ের সূচনা হবে তালাক পতিত হওয়ার সময় হতে। অতঃপর পুনরায় যদি সে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে 'ঈলা' পুনরায় ফিরে আসবে এবং চার মাসের মাঝে তার সাথে সহবাস না করলে তৃতীয় তালাক পতিত হবে। এ ক্ষেত্রেও দলিল তা-ই, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ اٰخَرَ لَمْ يَقَعْ الخ : গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, তিন তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার কারণে উক্ত মহিলা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পর সে যদি অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করার পর তালাক প্রদান করে অথবা মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত মহিলা তার পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে উক্ত ঈলার কারণে কোনো তালাক পতিত হবে না। কেননা, এই 'ঈলা' শুধুমাত্র প্রথম মালিকানার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এটি একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা। بَابُ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقِ -এর অধীনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম যুফার (র.) -এর নিকট নতুন মালিকানার অধীনে পূর্বের শর্ত ফিরে আসবে। আর আমাদের নিকট বাতিল হয়ে যাবে।

মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করে এই বলে যে, আল্লাহর কসম আমি তোমার সাথে আর সহবাস করব না, অতঃপর সে তাকে নতুনভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে আমাদের নিকট উক্ত 'ঈলা' বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর নিকট 'ঈলা' বাতিল হবে না।

আমাদের দলিল হলো, 'ঈলা' বিলম্বিত তালাকের নাম, যা বর্তমান মালিকানাধীন তিন তালাকের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত মহিলাকে নতুনভাবে তিন তালাক প্রদান করার কারণে যেহেতু আর কোনো তালাক বাকি থাকেনি, সেহেতু ঈলাও বাকি থাকবে না। অনুরূপভাবে যদি উক্ত ঈলার দ্বারা তার উপর তিন তালাকে বায়েন পতিত হয়ে থাকে, অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং উক্ত স্বামী সহবাস করার পর তাকে তালাক প্রদান করে এবং ইদ্দত শেষে সে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে আমাদের নিকট তার 'ঈলা' বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) -এর নিকট ঈলা বাতিল হবে না, তবে কসম আমাদের নিকটও বাকি থাকবে। কেননা, ইয়ামীন কোনো সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না। আর সহবাস না করার কারণে কসম ভঙ্গকারীও পাওয়া যায়নি। অতঃপর সে যদি উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা, সে কসম ভঙ্গ করেছে।

فَإِنْ حَلَفَ عَلٰى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنْ قِرْبَانِهَا فِيْ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ بِلَا مَانِعٍ وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الطَّلَاقِ فِيْهِ .

অনুবাদ : যদি চার মাসের কম সময়ের কসম করে, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - 'চার মাসের কমে কোনো 'ঈলা' নেই।' তাছাড়া মেয়াদের অধিকাংশ সময় সহবাস থেকে বিরত থাকা কোনো বাধাদানকারী ছাড়া হচ্ছে। আর এ ধরনের বিরত থাকার দ্বারা তালাকের হুকুম সাব্যস্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلٰى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি চার মাসের কম সময় স্ত্রীসহবাস না করার কসম করে, তাহলে সে ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। যেমন স্বামী বলল- وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرًا -'আল্লাহর কসম, আমি এক মাস তোমার সাথে সহবাস করব না।' অথবা, وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ -'আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দুই মাস সহবাস করব না।' অথবা وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ - 'আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে তিন মাস সহবাস করব না', তাহলে উল্লিখিত হুকুম হবে।

হযরত ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, স্বামী এ অবস্থাতেও ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। যদি সে চার মাস তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তাহলে তার স্ত্রীর উপর তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) শুরু জীবনে হযরত ইবনে আবী লায়লা (র.) -এর অনুরূপ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু যখন তাঁর নিকট হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ফতোয়া- لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর উক্ত মত হতে ফিরে আসেন।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ ফতোয়া প্রকাশ্য নস তথা আল্লাহ তা'আলার কথা- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ -এর বিপরীত। কেননা, উক্ত আয়াতে 'ঈলা' মুতলাক। আর تَرَبُّصُ তথা অপেক্ষা করা চার মাসের সাথে শর্তযুক্ত। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো- যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করে, চাই তার সময় যত কমই হোক না কেন? যেমন- একদিন বা তার চেয়ে কম হলেও তাকে চার মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই ঈলাকে চার মাসের সাথে শর্তযুক্ত করা নস -এর উপর অতিরিক্ততার শামিল। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ফতোয়ার দ্বারা নস-এর উপর অতিরিক্ত করা জায়েজ হবে না। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) আপন কথা হতে ফিরে আসলেন কিভাবে?

উত্তর: এর উত্তরে বলা হবে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ফতোয়ায় নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর শরিয়তের কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্ণয় করায় কিয়াসের কোনো দখল নেই। কাজেই বলতে হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ হতে শুনেই বলে থাকবেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কোনো সাহাবী হতে মতানৈক্যও বর্ণিত নেই। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উক্ত ফতোয়াকে আয়াতের তাফসীর হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। এটাকে শর্ত বা সীমাবদ্ধকরণের অর্থে ব্যবহার করা হবে না। তখন আয়াতের উহ্যরূপ হবে এমন- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - অর্থাৎ "যারা তাদের স্ত্রীর সাথে চার মাসের 'ঈলা' করে তাদের চার মাস অপেক্ষা করতে হবে।" আর আয়াতের দ্বিতীয় أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ প্রথম أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ -এর প্রমাণ বহন করার কারণে তাকে উহ্য রাখা হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তির দাবিও এই যে, যে ব্যক্তি চার মাসের কম তথা একমাস, দুই মাস অথবা তিন মাসের জন্য স্ত্রী সহবাস না করার কসম করল, তাকে কসমকৃত সময়ের চেয়ে বেশি সময় সহবাস হতে বিরত রাখা কোনোরূপ নিষিদ্ধকারী তথা কসম ছাড়াই হবে। কেননা, সে তো পরবর্তী সময় স্ত্রীসহবাস না করার কসম করেনি। সুতরাং চার মাসের কম সময়ের কসম করলে তার দ্বারা চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তালাক পতিত হবে না।

وَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هٰذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَهُوَ مُوْلٍ لِاَنَّهٗ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَجَمْعِهٖ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِاَنَّ الثَّانِيَ اِيْجَابٌ مُبْتَدَأٌ وَقَدْ صَارَ مَمْنُوْعًا بَعْدَ الْاُوْلٰى شَهْرَيْنِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اِلَّا يَوْمًا مَكَثَ فِيْهِ فَلَمْ تَتَكَامَلْ مُدَّةُ الْمَنْعِ .

অনুবাদ : যদি কেউ বলে, আল্লাহর কসম, দু'মাস এবং এ দু'মাসের পর আরো দু'মাস তোমার সাথে মিলিত হব না, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে একত্র করার হরফের মাধ্যমে উভয় সময়কে একত্র করে ফেলেছে। সুতরাং [এটা] এক বাক্যে একত্রিত করার [চার মাস উল্লেখের] সমার্থক হবে। আর যদি একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বলে, আল্লাহর কসম, প্রথম দু'মাসের পর আরো দু'মাস তোমার সাথে মিলিত হব না, তাহলে 'ঈলা' সাব্যস্ত হবে না। কেননা, দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে নতুন ইয়ামীন-এর সূচনা। অথচ প্রথম বক্তব্যের পর সে দু'মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে। [আর প্রথম দু'মাসের সাথে সম্পৃক্ত] দ্বিতীয় বক্তব্যের পর চার মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলো। তবে [যেদিন সে মাঝখানে অপেক্ষা করেছে সেদিন বাদ গেল। ফলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ [চার মাস] পূর্ণ হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দু'মাস সহবাস করব না এবং উক্ত দু'মাসের সাথে আরো দু'মাস সহবাস করব না, তাহলে এ ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে ব্যক্তি প্রথম দু'মাসকে এবং দ্বিতীয় দু'মাসকে একত্রকরণের অক্ষর [وَاوْ] দ্বারা একত্র করে ফেলেছে। সুতরাং সে যেন পুরো বিষয়টাকে এক বাক্যে একত্র করে এভাবে বলেছে যে– وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ অর্থাৎ, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে চার মাস সহবাস করব না।' কাজেই এটি একটি ইয়ামীনের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং উক্ত সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। অন্যথায় স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ الخ : আর যদি স্বামী "আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দু'মাস সহবাস করব না" এ কথা বলার একদিন গত হওয়ার পর পুনরায় বলে যে, "আল্লাহর কসম, প্রথম দু'মাসের পর আরো দু'মাস আমি তোমার সাথে সহবাস করব না", তাহলে এ ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর অভিমতও এটিই।

উল্লিখিত মাসআলাদ্বয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যদি مَعْطُوْف -এর মাঝে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ না থাকে এবং حَرْفِ نَفِيْ -ও উল্লেখ না থাকে, আর مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মাঝে বিলম্বও না করা হয়, তাহলে مَعْطُوْف -এর হুকুম مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর হুকুমের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। যেমন প্রথমোক্ত মাসআলাতে হয়েছে। আর যদি উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের কোনো একটিও না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় কথাটি এক নব সূচনা হবে; পূর্ববর্তী কথার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে দ্বিতীয় মাসআলায় উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, দ্বিতীয় মাসআলায় উক্ত তিন বিষয়ের কোনোটিই পাওয়া যায়নি। সুতরাং প্রথম কসমের পর সে দু'মাসের জন্য সহবাস হতে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলো। আর দ্বিতীয় কসমের পর প্রথম কসমের দৃষ্টিতে একদিন কম চার মাসের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হলো। সুতরাং দুই কসম মিলেও নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ [চার মাস] পূর্ণ হয়নি। এজন্যই এ ব্যক্তি ঈলাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। তবে তার উক্ত কথা ভিন্ন ভিন্ন দুটি কসমে পরিণত হবে এবং উক্ত সময়ের মাঝে একবার সহবাস করলে তার উপর দুটি কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে।

وَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ سَنَةً اِلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) وَهُوَ يَصْرِفُ الْاِسْتِثْنَاءَ اِلٰى اٰخِرِهَا اِعْتِبَارًا بِالْاِجَارَةِ فَتَمَّتْ مُدَّةُ الْمَنْعِ وَلَنَا اَنَّ الْمُوْلِىَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقِرْبَانُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اِلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَيُمْكِنُهُ هٰهُنَا لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى يَوْمٌ مُنَكَّرٌ بِخِلَافِ الْاِجَارَةِ لِاَنَّ الصَّرْفَ اِلَى الْاٰخِرِ لِتَصْحِيْحِهَا فَاِنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَ التَّنْكِيْرِ وَلَا كَذٰلِكَ الْيَمِيْنُ .

অনুবাদ : আর যদি বলে, আল্লাহর কসম, আমি একদিন ছাড়া এক বছর তোমার সাথে মিলিত হব না, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। তবে ইমাম যুফার (র.) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। ব্যতিক্রম দিনটিকে তিনি বছরের শেষে যুক্ত করেন এবং ইজারার উপর সেটিকে কিয়াস করেন। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের দলিল হলো, ঈলাকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার পক্ষে কাফ্ফারা প্রদান করা ছাড়া চার মাসের মাঝে স্ত্রী সহবাস করা সম্ভব নয়। অথচ এখানে তা সম্ভব। কেননা, অনির্ধারিত একটি দিনকে এখানে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ইজারার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এখানে উক্ত ব্যতিক্রম দিনকে বছরের শেষে যুক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজারাকে বিশুদ্ধতা ও বৈধতা দান করা। কেননা, অনির্ধারিত অবস্থায় ইজারা বৈধ হয় না। পক্ষান্তরে ইয়ামীনের অবস্থা তা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ سَنَةً الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি একদিন ছাড়া এক বছর তোমার সাথে সহবাস করব না"; তাহলে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও এটিই। ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো, ইসতিছনা তথা اِلَّا يَوْمًا দ্বারা সাব্যস্ত করা ব্যতিক্রমী দিনটিকে বছরের শেষে যুক্ত করা হবে; যেমন ইজারার মাঝে এ ধরনের ব্যতিক্রম দিনকে বছরের শেষে যুক্ত করা হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি তার ঘরকে এক বছরের জন্য ইজারা প্রদান করে, আর একদিন তা থেকে ইসতিছনা করে, তাহলে ইসতিছনাকৃত উক্ত ব্যতিক্রম দিবসকে বছরের শেষে যুক্ত করা হবে। আর ইজারার মেয়াদ বছরের শেষ একদিন ছাড়া এক বছর হবে। এজন্যই তো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ السَّنَةَ اِلَّا نُقْصَانَ يَوْمٍ বলে, তাহলে সর্বসম্মত মতানুসারে ইসতিছনাকৃত উক্ত দিনকে বছরের শেষে যুক্ত করা হবে। ঠিক অনুরূপভাবে اِلَّا يَوْمًا -কেও বছরের শেষে যুক্ত করা হবে। তখন স্বামীর কথার এ অর্থ হবে যে, আমি তোমার সাথে বছরের শেষ দিন ছাড়া এক বছর মিলিত হব না। আর এ অবস্থায় যেহেতু ঈলার মেয়াদ তথা চার মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় পূর্ণ হয়ে যায়, তাই উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলিল এই যে, ঈলাকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া ছাড়া চার মাস স্ত্রী সহবাস করতে পারে না। আর ঐ ব্যক্তি যে وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ سَنَةً اِلَّا يَوْمًا বলল, সে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া ছাড়া একদিন স্ত্রীসহবাস করতে পারে। কেননা, اِلَّا يَوْمًا -এর একদিন অনির্দিষ্ট। বছরের প্রতিটি দিনের জন্যই তা প্রযোজ্য হতে পারে। কাজেই বক্তার বক্তব্যকে সঠিক অর্থে ব্যবহার করার স্বার্থেই ইসতিছনাকৃত উক্ত দিনকে বছরের শেষের দিন হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْاِجَارَةِ الخ : এখান থেকে ইমাম যুফার (র.) -এর কিয়াসের জবাব প্রদান করা হয়েছে। জবাবের সারকথা হলো, ইজারার মাঝে ইসতিছনাকৃত একদিনকে বছরের শেষে যুক্ত করা ইজারাকে বিশুদ্ধতা ও বৈধতা দান করার স্বার্থেই প্রয়োজন। কেননা, সময় নির্দিষ্ট না করে ইজারা বৈধ হয় না। পক্ষান্তরে ইয়ামীনের অবস্থা এরূপ নয়। কেননা, ইয়ামীন অনির্দিষ্টভাবেও বৈধ হয়ে যায়। কাজেই উল্লিখিত মাসআলা দু'টির মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান বিধায় একটিকে আরেকটির উপর কিয়াস করা বৈধ হবে না।

وَلَوْ قَرِبَهَا فِىْ يَوْمٍ وَالْبَاقِىْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ اَوْ اَكْثَرُ صَارَ مُوْلِيًا لِسُقُوْطِ الْاِسْتِثْنَاءِ وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ لَا اَدْخُلُ الْكُوْفَةَ وَامْرَأَتُهُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِاَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقِرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْاِخْرَاجِ مِنَ الْكُوْفَةِ قَالَ وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ اَوْ بِصَوْمٍ اَوْ بِصَدَقَةٍ اَوْ عِتْقٍ اَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِتَحَقُّقِ الْمَنْعِ بِالْيَمِيْنِ وَهُوَ ذِكْرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ وَهٰذِهِ الْاَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَصُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِتْقِ اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا عِتْقَ عَبْدِهِ وَفِيْهِ خِلَافُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فَاِنَّهُ يَقُوْلُ يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ ثُمَّ الْقِرْبَانُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَىْءٌ وَهُمَا يَقُوْلَانِ الْبَيْعُ مَوْهُوْمٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيْهِ وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ اَنْ يُعَلِّقَ بِقِرْبَانِهَا طَلَاقَهَا اَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا وَكُلُّ ذٰلِكَ مَانِعٌ ـ

অনুবাদ : আর যদি [বছরের] একদিন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, অতঃপর চার মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইসতিছনা রহিত হয়ে গেছে। যদি সে বলে অথচ সে বসরায় অবস্থান করছে– আল্লাহর কসম, আমি কুফায় প্রবেশ করব না। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী কুফায় রয়েছে, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কাফ্ফারা অপরিহার্য করা ছাড়াই সে তার স্ত্রীকে কুফা হতে বের করে এনে সহবাস করতে পারে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি [সহবাসের বিষয়টিকে] হজ কিংবা রোজা কিংবা সদকা কিংবা গোলাম আজাদ করা অথবা তালাক প্রদানের সাথে সম্পর্কিত করে কসম খায়, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, শর্ত ও পরিণতি উল্লেখের মাধ্যমে ইয়ামীন হওয়ায় সহবাস থেকে বাধাদানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। আর এই পরিণতিগুলো কষ্টকর হওয়ার কারণে বাধাদানকারী বিবেচিত হবে। [গোলাম] আজাদ করার সাথে কসমকে সম্পর্কিত করার সুরত এই যে, সে বলে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তার পক্ষে গোলাম বিক্রি করে অতঃপর সহবাস করা সম্ভব। তখন তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলাম বিক্রির বিষয়টি তো অনিশ্চিত। সুতরাং এ অনিশ্চিত সম্ভাবনা ঈলার ক্ষেত্রে এটার বাধাদানকারী হওয়াকে রহিত করবে না। তালাকের কসমকে সম্পর্কিত করার অর্থ স্ত্রীর নিজের কিংবা তার সতীনের তালাকের সাথে সহবাস সম্পর্কিত করা। এ দুটোই বাধাদানকারীরূপে বিবেচিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَرِبَهَا فِىْ يَوْمٍ وَالْبَاقِىْ الخ : আর যদি وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ سَنَةً اِلَّا يَوْمًا এ কসম করার পর সে ব্যক্তি একদিন স্ত্রীসহবাস করে ফেলে এরপরও বছরের চার মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, যে ইসতিছনার কারণে ঈলাকারী সাব্যস্ত না হওয়ার কথা ছিল তা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ঈলা প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি বসরায় অবস্থান করে আর তার স্ত্রী কুফায় বসবাস করে, অতঃপর সে ব্যক্তি বলে যে, "আল্লাহর কসম, আমি কুফায় প্রবেশ করব না", তাহলে সে ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। এর দলিল হলো, পূর্বেই আমাদের এ বক্তব্য অতিবাহিত হয়েছে যে– ঈলাকারী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে কাফফারা ওয়াজিব করা ছাড়া চার

মাস তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না। আর এ ব্যক্তি কাফফারা ওয়াজিব করা ছাড়াই তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে। এর সুরত হলো, সে তার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে তার স্ত্রীকে কুফা হতে বের করে এনে তার সাথে সহবাস করতে পারে। এ সুরতে ঈলা সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ الخ : ইতঃপূর্বে ঈলার মাঝে আল্লাহর নামে কসম করার বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে। এখান থেকে غَيْرُ اللّٰهِ -এর নামে কসম করার বিবরণ শুরু হলো। অর্থাৎ, শর্ত-জাযা উল্লেখপূর্বক কসম করার সুরতগুলোর বিবরণ শুরু হলো। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি স্বামী সহবাসের বিষয়টিকে হজের সাথে সম্পর্কিত করে এভাবে কসম খায় যে, "যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তাহলে আমার উপর হজ ওয়াজিব হবে। অথবা রোজার সাথে সম্পর্কিত করে বলে যে, "আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে আমার উপর এক বছরের রোজা ওয়াজিব হবে।" অথবা সদকার সাথে সম্পর্কিত করে বলে যে, "আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে এক হাজার টাকা সদকা করা আমার উপর ওয়াজিব হবে।" অথবা গোলাম আজাদ করার সাথে সম্পর্কিত করে বলে যে, "আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে আমার উপর একটি গোলাম আজাদ করা ওয়াজিব হবে।" অথবা তালাকের সাথে সম্পর্কিত করে বলে, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে তুমি অথবা তোমার অমুক সতীন তালাক হয়ে যাবে।" উল্লিখিত সকল সুরতে উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, শর্ত এবং জাযা উল্লেখ করার কারণে সহবাস হতে বিরত থাকা অপরিহার্য হয়েছে। আর উল্লিখিত জাযাগুলো তথা হজ, রোজা ইত্যাদি সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, এই পরিণতিগুলোর মাঝে কষ্ট বিদ্যমান। আর এজন্যই যখনই সে শর্তের মাঝে লিপ্ত হবে তখন তার পরিণতিও অপরিহার্যরূপে সাব্যস্ত হবে। আর উক্ত পরিণতিগুলো বাস্তবায়িত করার মাঝে অনেক কষ্ট নিহিত রয়েছে। এজন্যই এ পরিণতিগুলো শর্তের অস্তিত্বের জন্য বাধাদানকারী হবে। সুতরাং উল্লিখিত সকল সুরতে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকা সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস হতে বিরত থাকার নামই হলো ঈলা। তাই উক্ত সুরতগুলোতে ঈলাও সাব্যস্ত হবে। স্বামী যদি চার মাস তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে, তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قَوْلُهُ وَصُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِتْقِ اَنْ يُعَلِّقَ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, গোলাম আজাদ করার সাথে কসমকে সম্পর্কিত করার সুরত হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে যে, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। অবশ্য এ সুরতে ঈলা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি কসমকে গোলাম আজাদ করার সাথে সম্পর্কিত করা হয় তাহলে তা ঈলা হবে না। কেননা, যদি উক্ত কসমকারী প্রথমে নিজের গোলাম বিক্রি করে ফেলে অতঃপর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে সে ব্যক্তির উপর গোলাম আজাদ করা অথবা কাফফারা প্রদান করা –এর কোনোটিই ওয়াজিব হবে না। আর যখন কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না তখন তা ঈলাও হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলাম বিক্রি করা একটি অনিশ্চিত বিষয়। সে ব্যক্তি তার গোলাম বিক্রি করতেও পারে অথবা নাও করতে পারে। কাজেই সম্ভাবনাময় এই অনিশ্চিত বিষয়টি ঈলার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী হতে পারে না। কেননা, সে গোলাম বিক্রি না করলে তা স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রী সহবাসে বাধাদানকারীর উপস্থিতির নামই হলো ঈলা।

قَوْلُهُ وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ اَنْ يُعَلِّقَ الخ : আর কসমকে তালাকের সাথে সম্পর্কিত করার সুরত হলো, সে তার স্ত্রীকে বলবে যে, "আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি, তাহলে তুমি তালাক" অথবা বলবে যে, "আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তাহলে তোমার সতীন তালাক।" উল্লিখিত দুটি কথার উভয়টিই সহবাসের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী। কেননা, সে ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়ার ভয়ে সহবাস হতে বিরত থাকবে। আর এটাই হলো ঈলা। সুতরাং যদি সে ব্যক্তি চার মাসের মধ্যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে কসম অনুসারে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। আর যদি সহবাসবিহীন চার মাস অতিবাহিত হয়, তাহলে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

وَإِنْ اٰلٰى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُوْلِيًا وَإِنْ اٰلٰى مِنَ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ فِى الْأُوْلٰى دُوْنَ الثَّانِيَةِ وَمَحَلُّ الْإِيْلَاءِ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِّ فَلَوْ اِنْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ سَقَطَ الْإِيْلَاءُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ .

অনুবাদ : রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে 'ঈলা' করলে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে 'ঈলা' করলে ঈলাকারী হবে না। কেননা, রাজ'ঈ তালাকের সুরতে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে; বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে নয়, আর নস ও আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আমাদের স্ত্রীরাই হলো ঈলার ক্ষেত্র। আর যদি ঈলার ইদ্দত বা মেয়াদ তালাকে রাজ'ঈর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে ঈলার ক্ষেত্র না থাকার কারণে 'ঈলা' রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ اٰلٰى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে 'ঈলা' করে, তাহলে আইম্মায়ে আরবা'আ এবং জমহূর ওলামায়ে কেরামের নিকট সে ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। আর যদি বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে 'ঈলা' করে, তাহলে সর্বসম্মত মতানুসারে সে ব্যক্তি ঈলাকারী হবে না।

দলিল এই যে, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার সাথে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে বায়েন তালাকপ্রাপ্তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না।

আর আমাদের স্ত্রীগণই হলো ঈলার ক্ষেত্র। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ "যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করে।" তালাকে বায়েন প্রদান করার পর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না। এজন্যই বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ঈলার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় না। তদুপরি যদি সে বায়েন তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস করে ফেলে, তাহলে কসমের কারণে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা ঈলার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা, তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ কারণেই আমাদের মাযহাব মতে, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস করাও বৈধ। হ্যাঁ, তবে ঈলার মেয়াদ তথা চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে 'ঈলা' রহিত হয়ে যাবে। কেননা, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঈলার ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে না।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে 'ঈলা' বৈধ না হওয়া উচিত। কেননা, 'ঈলা' হলো স্ত্রীকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করে তার প্রতি জুলুম করার শাস্তি। আর রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার সহবাসের কোনো অধিকার নেই। এজন্য রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা তার স্বামীর নিকট সহবাসের আবদার জানাবার অধিকার রাখে না। আর স্বামীর জন্য মোস্তাহাব হলো সহবাস না করে কথার মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া। কাজেই স্বামী এক্ষেত্রে জালিম সাব্যস্ত হবে না। আর তার উপর জুলুমের শাস্তি তথা ঈলাও সাব্যস্ত হবে না।

উত্তর: এর উত্তর হলো, মানসূস আলাইহির ক্ষেত্রে হুবহু নসটাই ধর্তব্য হয়ে থাকে; নস -এর অর্থ নয়। আর রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ নস -এর কারণেই আমাদের স্ত্রীদের অন্তর্গত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- بُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ - "তাদের স্বামীরাই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার।" এ আয়াত রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর بَعْلٌ -এর অর্থ হলো স্বামী। কাজেই রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা তার স্ত্রী হবে। সুতরাং যে হুকুম স্বামীর স্ত্রীর উপর আবর্তিত হয়, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রেও সে হুকুমই বর্তাবে। কেননা, لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ এ আয়াতের ভিত্তিতে রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তাগণও স্বামীর স্ত্রীই বটে।

وَلَوْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ وَاَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا وَلَا مُظَاهِرًا لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْ مَخْرَجِهٖ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيْحًا بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ لِتَحَقُّقِ الْحِنْثِ اِذِ الْيَمِيْنُ مُنْعَقِدَةٌ فِيْ حَقِّهٖ ـ وَمُدَّةُ اِيْلَاءِ الْاَمَةِ شَهْرَانِ لِاَنَّ هٰذِهٖ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ اَجَلًا لِلْبَيْنُوْنَةِ فَتَتَنَصَّفُ بِالرِّقِّ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ ـ

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রমণীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। অথবা তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল, তাহলে সে ঈলাকারী বা যিহারকারী হবে না। কেননা, ক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকার কারণে উচ্চারণকালেই বক্তব্যটি বাতিল হয়েছে। সুতরাং পরবর্তীতে [ক্ষেত্র বিদ্যমান হলেও] তা বিশুদ্ধরূপে পরিবর্তিত হবে না। এ অবস্থায় যদি সে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে ইয়ামীন ভঙ্গ হওয়ার কারণে। কেননা, ইয়ামীনকে সংঘটিত বিবেচনা করা হয়। দাসীর ঈলার মুদ্দত বা মেয়াদ হলো দু'মাস। কেননা, এটা হলো বিবাহ বিচ্ছেদের নির্ধারিত মেয়াদ। সুতরাং দাসত্বের কারণে তা অর্ধেক হয়ে যাবে। যেমন– ইদ্দতের মেয়াদের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ وَاللّٰهِ الخ : যদি কেউ কোনো বেগানা রমণীকে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না" অথবা বলে, "তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো।" অতঃপর সে ব্যক্তি উক্ত বেগানা রমণীকে বিবাহ করল, তাহলে সে ঈলাকারীও হবে না এবং যিহারকারীও হবে না।

কেননা, সে নারী 'ঈলা' অথবা যিহারের ক্ষেত্র না হওয়ার কারণে সে যে কথা বলেছে, তা উচ্চারণকালেই বাতিল সাব্যস্ত হবে। কারণ, ঈলা বা যিহারের ক্ষেত্র হলো আমাদের স্ত্রীগণ। কাজেই এটা মৃত জন্তু বেচাকেনার মতোই হলো। আর তার কথা "আমি তোমার সাথে মিলিত হব না।" অথবা "তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো" বাতিল সাব্যস্ত হবে। আর এটাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে কথা উচ্চারণকালেই বাতিল সাব্যস্ত হয়, তা পরবর্তীতে আর বিশুদ্ধরূপে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি উক্ত রমণীর সাথে সহবাস করে, তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, সহবাস করার দ্বারা সে ইয়ামীন ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে; আর ইয়ামীন ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। আর সে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এজন্য যে, কসম ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে ইয়ামীনকে সংঘটিত বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত কথা দুটির প্রথমটির ক্ষেত্রে তথা "আমি তোমার সাথে মিলিত হব না" এ সুরতেই কেবল সহবাসের পর কাফফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে বেগানা মহিলাকে "তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো" এ কথা বলার পর বিবাহ করে সহবাস করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, তার প্রথম কথাটি হলো ইয়ামীন; দ্বিতীয়টি নয়।

قَوْلُهٗ وَمُدَّةُ اِيْلَاءِ الْاَمَةِ شَهْرَانِ الخ : যদি কারো স্ত্রী দাসী হয়, তাহলে তার ঈলার মেয়াদ হবে দু'মাস– স্বামী চাই গোলাম হোক অথবা আজাদ হোক। হযরত ওমর (রা.) হতে এমনটিই বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম মালেক (র.) -এর মশহুর মাযহাব হলো, গোলামের স্ত্রীর ঈলার মেয়াদ হলো দু'মাস– তার স্ত্রী আজাদ হোক বা দাসী হোক। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মত হলো, স্বামী আজাদ হোক বা গোলাম হোক অনুরূপভাবে স্ত্রী আজাদ হোক বা দাসী হোক সকলের ঈলার মুদ্দত বা মেয়াদ চার মাস।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর দলিল হলো, ঈলার সময়সীমা জালিমের জুলুম চিহ্নিত করার জন্য হয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, গোলাম-আজাদ সকলেই সমান, বিধায় সকলের ঈলার মেয়াদ একই তথা চার মাস হবে। কেননা, সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে দাসী ও আজাদ উভয়ের স্বামীই সমান অপরাধী।

আমাদের দলিল হলো, ঈলার মেয়াদ তথা চার মাস সময়কে বায়েনা তালাকপ্রাপ্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং দাসত্বের কারণে ঈলার মেয়াদ অর্ধেক বাতিল হবে এবং অর্ধেক থেকে যাবে। যেমন– দাসীর তালাক ও ইদ্দতের সময়সীমা আজাদ নারীর তালাক ও ইদ্দতের সময়সীমার অর্ধেক হয়ে থাকে।

وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى مَرِيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتْ مَرِيْضَةً أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فِيْ مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَفَيْئُهُ أَنْ يَقُوْلَ بِلِسَانِهِ فِئْتُ إِلَيْهَا فِيْ مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَإِنْ قَالَ ذٰلِكَ سَقَطَ الْإِيْلَاءُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا فَيْءَ إِلَّا بِالْجِمَاعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَيْئًا لَكَانَ حِنْثًا وَلَنَا أَنَّهُ آذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَيَكُوْنُ إِرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِاللِّسَانِ وَإِذَا ارْتَفَعَ الظُّلْمُ لَا يُجَازِى بِالطَّلَاقِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذٰلِكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيْئُهُ بِالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْخَلَفِ.

অনুবাদ : যদি ঈলাকারী সহবাস করতে সক্ষম নয় এমন অসুস্থ হয় কিংবা স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় কিংবা যোনিদ্বারে প্রতিবন্ধকতা থাকে কিংবা সহবাস সম্ভব নয় এমন অল্পবয়স্কা হয় কিংবা উভয়ের মাঝে এতটা দূরত্ব থাকে যে, ঈলার মেয়াদের মাঝে সেখানে পৌছা সম্ভব নয়, তাহলে তার জন্য ঈলা প্রত্যাহার করার পন্থা হলো, ঈলা -এর মেয়াদের মাঝে সে মুখে এ কথা বলবে যে, আমি আমার স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। এ কথা বলার দ্বারা 'ঈলা' রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সহবাস ছাড়া 'ঈলা' প্রত্যাহারের কোনো পথ নেই। ইমাম ত্বাহাবী (র.)-ও এ মত গ্রহণ করেছেন। কেননা, এটা প্রত্যাহার করা যদি সাব্যস্ত হয়, তাহলে حِنْث বা 'ঈলা' ভঙ্গ করাও সাব্যস্ত হবে আমাদের দলিল হলো, সহবাস থেকে বাধাদানকারী বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সে তাকে কষ্ট দিয়েছে; সুতরাং [প্রত্যাহারের] মৌখিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করাই হবে তার দায়িত্ব। যখন জুলুম দূর হয়ে গেল তখন তালাক সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে তাকে তালাকের দ্বারা বদলা দেওয়া যায় না। অতঃপর মেয়াদের মধ্যেই যদি সে সহবাস করতে সক্ষম হয়, তাহলে মৌখিক প্রত্যাহারের গ্রহণযোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। তখন সহবাসই হবে 'ঈলা' প্রত্যাহারের একমাত্র পথ। কেননা, সে বিকল্প পন্থা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই প্রত্যাহারের মূল পন্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى مَرِيْضًا لَا يَقْدِرُ الخ : যদি ঈলাকারী এমন অসুস্থ হয়, যাতে সে সহবাস করতে অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা স্ত্রী এমন অসুস্থ হয় যে, তার সাথে সহবাস করা কিছুতেই সম্ভব নয়, কিংবা স্ত্রীর যোনিদ্বারে এমন প্রতিবন্ধকতা থাকে যে, তাতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো সম্ভব নয়, কিংবা স্ত্রী এত অল্পবয়স্কা হয় যে, তার সাথে সহবাস করা যায় না, কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এতটুকু দূরত্ব বিদ্যমান থাকে যে, স্বামী চার মাস সফর করেও স্ত্রীর নিকট পৌছতে পারে না। তাহলে উল্লিখিত সকল সুরতে ইচ্ছে করলে স্বামী মৌখিক তার 'ঈলা' প্রত্যাহার করতে পারবে। সুতরাং স্বামী যদি ঈলার মেয়াদের মাঝে- فِئْتُ إِلَيْهَا - 'আমি তার দিকে ফিরে গেলাম' মুখে এ কথা বলে, তাহলে তার 'ঈলা' প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا فَيْءَ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার ঈলা প্রত্যাহারের একমাত্র পথ হলো সহবাস মৌখিক 'ঈলা' প্রত্যাহার করা বৈধ নয়। হানাফী ইমামদের মাঝে ইমাম ত্বাহাবী (র.)-ও উক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন।

হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়ার মাঝে এ মাসআলার ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করা হয়েছে যে, ঈলাকারী অসুস্থ হলে তার তিন সুরত যথা-

১. কোনো ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় 'ঈলা' করেছিল এবং 'ঈলা' করার পরেও সে এতটুকু সময় সুস্থ ছিল যে, ইচ্ছে করলে সে ঐ সময়ে স্ত্রীসহবাস করতে পারত। অতঃপর সে অসুস্থ হয়েছে, তাহলে আমাদের নিকট সে ব্যক্তি কেবল সহবাসের দ্বারা 'ঈলা' প্রত্যাহার করতে পারবে; মৌকিকভাবে নয়। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সুরতেও সে মৌখিকভাবে 'ঈলা' করতে পারবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল এই যে, ঈলার ক্ষেত্রে তার শেষ সময়টিই ধর্তব্য। আর উক্ত ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার দরুন শেষ সময়ে সে স্ত্রীসহবাস করতে অক্ষম হয়েছে। কাজেই তাকে মৌখিক 'ঈলা' প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তির নিকট প্রথম ওয়াক্তে অজুর পানি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সে অজু করেনি; অতঃপর শেষ সময় তার অজুর পানি শেষ হয়ে গেলে সে তায়াম্মুম করতে পারে, ঠিক অনুরূপ শেষ সময়ে সহবাস করতে অক্ষম হলে মৌখিকভাবে সে 'ঈলা' প্রত্যাহার করতে পারবে।

আমাদের দলিল এই যে, সে ব্যক্তি সহবাস করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সহবাস না করে স্ত্রীকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করে তার প্রতি জুলুম সুনিশ্চিত করেছে। সুতরাং তার ঈলা প্রত্যাহার করার অধিকার তখনই প্রমাণিত হবে যখন সে তার স্ত্রীসহবাসের অধিকার আদায় করবে। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সে ব্যক্তি কেবল সহবাসের মাধ্যমেই ঈলা প্রত্যাহার করতে পারে; মৌখিকভাবে নয়।

২. কোনো ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় ঈলা করেছিল এবং অসুস্থ অবস্থাতেই তার চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের মাযহাব মতে সে ব্যক্তি মৌখিক ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে। সে ব্যক্তি যদি فِئْتُ إِلَيْهَا বা رَجَعْتُ إِلَيْهَا বা رَاجَعْتُهَا বা اِرْتَجَعْتُهَا অথবা اَبْطَلْتُ اِيْلَائَهَا এ ধরনের বাক্য দ্বারা 'ঈলা' প্রত্যাহার করে, তবে তার 'ঈলা' বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সহবাস ছাড়া 'ঈলা' প্রত্যাহারের কোনো পথ নেই। কাজেই সে ব্যক্তি মৌখিক 'ঈলা' প্রত্যাহার করতে পারবে না। ইমাম ত্বাহাবী (র.) -এর অভিমতও এটিই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল এই যে, যদি মৌখিক 'ঈলা' প্রত্যাহারের দ্বারা প্রত্যাহার বিবেচিত হতো, তাহলে এর দ্বারা কসমও ভেঙ্গে যেত। কেননা, 'ঈলা' প্রত্যাহারের দ্বারা দুটি জিনিস অপরিহার্য হয়। একটি হলো কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া, আর অপরটি হলো বিচ্ছেদ রহিত হওয়া। আর এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত যে, মৌখিভাবে ঈলা প্রত্যাহার করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না; সুতরাং অপর হুকুমটির ক্ষেত্রেও মৌখিকভাবে 'ঈলা' প্রত্যাহারের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে না, কাজেই প্রমাণ হলো যে, সহবাস ছাড়া ঈলা প্রত্যাহারের কোনো পথ নেই।

আমাদের দলিল এই যে, 'ঈলা' করার সময় স্বামী অসুস্থ থাকার কারণে সহবাস করতে যেহেতু সক্ষম ছিল না সেহেতু মহিলাকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করে ক্ষতি করাও তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, অসুস্থতার দরুন সে সময় তার স্ত্রী সহবাসের অধিকারই ছিল। তবে "আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে চার মাস মিলিত হব না।" মুখে এ কথা বলে স্ত্রীকে দুশ্চিন্তায় নিপতিত করেছিল। যেন স্বামী তার উপর মৌখিক অত্যাচার করেছিল। কাজেই মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করাই যথেষ্ট হবে। আর মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমেই যেহেতু তার জুলুম রহিত হয়ে গেল, তাই স্বামীর তালাক পতিতকরণের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হবে না। অর্থাৎ, মৌখিক প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না।

প্রশ্ন: বাকি থাকল এ প্রশ্ন যে, মৌখিক প্রত্যাহার হিসেবে বিবেচিত হলে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা হয় না কেন?

উত্তর: তার উত্তর এই যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় কসম ভঙ্গ করার দ্বারা, কিন্তু মৌখিক প্রত্যাহারের দ্বারা কসম ভঙ্গ হয় না, বিধায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

৩. কোনো ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় 'ঈলা' করেছিল, অতঃপর ঈলার মেয়াদের মাঝেই সে সহবাস করতে সক্ষম হয়ে গেল, তাহলে সহবাসের মাধ্যমেই তাকে 'ঈলা' প্রত্যাহার করতে হবে। অসুস্থ অবস্থায় সে মৌখিক প্রত্যাহার করুক আর নাই করুক। যদি অসুস্থ অবস্থায় মৌখিক প্রত্যাহার না করে থাকে, তাহলে সহবাসের মাধ্যমে প্রত্যাহার করার বিষয়টিতো সুস্পষ্ট। আর অসুস্থ অবস্থায় মৌখিক প্রত্যাহার করে থাকলে সুস্থ হওয়ার পর তার পূর্ব প্রত্যাহার বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। দলিল এই যে, বিকল্প পন্থা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই প্রত্যাহারের মূলপন্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। যেমন– তায়াম্মুমকারী নামাজরত অবস্থায় পানি পেয়ে গেলে তার এ নামাজ বাতিল সাব্যস্ত হয় এবং অজু করে নামাজ পড়া তার উপর ওয়াজিব হয়। এ মাসআলাটিও অনুরূপ।

وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ الْكِذْبَ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّهُ نَوٰى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ وَقِيْلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَمِيْنٌ ظَاهِرًا وَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا اَنْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَيْسَ بِظِهَارٍ لِإِنْعِدَامِ التَّشْبِيْهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكْنُ فِيْهِ وَلَهُمَا اَنَّهُ اَطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَفِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةٍ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدُ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ التَّحْرِيْمَ اَوْ لَمْ اُرِدْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِيْنٌ يَصِيْرُ بِهِ مُوْلِيًا لِأَنَّ الْاَصْلَ فِيْ تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِيْنٌ عِنْدَنَا وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْاَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَمِنَ الْمَشَائِخِ مَنْ يَصْرِفُ لَفْظَةَ التَّحْرِيْمِ إِلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, তাহলে তাকে তার নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি বলে যে, আমি মিথ্যা বলার নিয়ত করেছি, তাহলে সে যেমন বলেছে তেমনই ধরে নেওয়া হবে। কেননা, সে তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থই নিয়ত করেছে। কোনো কোনো মতে, আদালতের বিচারের প্রশ্ন এলে তার ব্যাখ্যা সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে না। কেননা, এটা ইয়ামীন হয়েছে [কারণ, হারাম শব্দ ইয়ামীনের জন্য ব্যবহার হয়]। আর সে যদি বলে, আমি তালাকের নিয়ত করেছি, তবে এটি দ্বারা একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। অবশ্য তিনের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। "অস্পষ্টবাচক শব্দের তালাক" অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি। আর যদি বলে, আমি যিহারের নিয়ত করেছি, তাহলে এটা দ্বারা যিহার-ই হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মাহরাম স্ত্রীলোক [যেমন– মা] -এর সাথে তুলনা না করার কারণে এটা যিহার হতে পারে না। কেননা, এটা হলো যিহার -এর রুকন। শায়খাইনের বক্তব্য হলো, হারাম হওয়ার বিষয়টিকে সে সাধারণভাবে ব্যবহার করেছে। আর [হুরমতের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে যিহার হলো একটি প্রকার। কেননা,] যিহার -এর মাঝে একপ্রকার হুরমত রয়েছে, আর সাধারণ নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাও রয়েছে। আর যদি সে বলে যে, আমি "হারাম" সাব্যস্ত করার নিয়ত করেছি কিংবা কোনো নিয়ত করিনি, তাহলে এটা ইয়ামীন হবে এবং সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, আমাদের মতে, হালালকে হারাম করাই মূলত ইয়ামীন ইয়ামীন অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ তা আলোচনা করব। কোনো কোনো মাশায়েখ অবশ্য সাধারণ প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে হুরমতবাচক শব্দকে নিয়ত না করা সত্ত্বেও তালাকের অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। সঠিক বিষয় আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ الخ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি আমার জন্য হারাম', তাহলে তাকে তার উক্ত কথার নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা, তার এ কথা বেশ কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সম্ভাবনাময় অর্থগুলোর কোনোটিই অপরটি হতে প্রবল নয়। তাই একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য বক্তার নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সুতরাং সে যদি বলে যে, আমি আমার উক্ত কথার দ্বারা মিথ্যা বলার নিয়ত করেছি, তাহলে সে যেমন বলেছে তেমনই ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ, তার উক্ত কথার দ্বারা তালাক, ঈলা এবং যিহার –এর কোনোটিই হবে না।

দলিল হলো, সে ব্যক্তি তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থই নিয়ত করেছে। কেননা, উক্ত মহিলা তার জন্য হালাল ছিল। অতঃপর তার কথা "তুমি আমার জন্য হারাম" এমন এক সংবাদ, যা বাস্তব বিরোধী। কাজেই এটি মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। আর বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যেহেতু শরিয়তের নিকট গ্রহণযোগ্য, তাই উল্লিখিত বক্তব্যের ক্ষেত্রে তার নিয়ত যথার্থ বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: উল্লিখিত দলিলের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মিথ্যা যদি أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ -এর প্রকৃত অর্থ হয়, তাহলে নিয়ত ছাড়াই তা গ্রহণীয় হওয়া উচিত ছিল। কেননা, শব্দ বা বাক্যের প্রকৃত অর্থ কোনোরূপ নিয়তের মুখাপেক্ষী হয় না।

উত্তর: এর উত্তর হলো, মিথ্যা হলো পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রথম প্রকৃত অর্থ, আর ইয়ামীন হলো দ্বিতীয় প্রকৃত অর্থ। আর বাক্যের একাধিক সম্ভাবনাময়ী প্রকৃত অর্থের কোনো একটি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন হয়।

ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখী (র.) বলেন, আদালতে বিচারের প্রশ্ন এলে বিচারক তার মিথ্যার নিয়তকে গ্রহণ করবেন না। কেননা, أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ তার এ কথা বাহ্যত ইয়ামীন হয়েছে। কারণ, حَرَامٌ শব্দটি ইয়ামীনের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া এটা হলো হালাল বস্তুকে হারাম বস্তু করা। আর হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা যে ইয়ামীন, তা নস দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ -

'হে নবী, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন তা আপনি আপনার উপর হারাম করছেন কেন? আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন? আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের প্রতি কসমসমূহ খুলে ফেলারও দায়িত্ব আরোপ করেছেন।' উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হালাল বস্তু হারাম সাব্যস্ত করাকে কসম সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার নামই হলো কসম। মোটকথা, أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ এ বাক্যের মাঝে কসমের অর্থ হলো বাস্তবমুখী। মিথ্যার অর্থ হলো বাস্তবতার বেলায়। আর আদালতে বিচারের প্রশ্নে বাস্তব বিরোধী অর্থ কাজির নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। কাজেই বিচারক তার বক্তব্যে মিথ্যা অর্থের নিয়তকে গ্রহণ করবেন না। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন যে, এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং এর উপরই ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ الخ : আর সে ব্যক্তি যদি أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ তার এ কথার দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তবে সংখ্যার নিয়ত না করে অথবা এক বা দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এ তিন সুরতেই তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা, أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ এটা ইঙ্গিতবাচক বাক্য। আর 'ইঙ্গিতবাচক শব্দের অধ্যায়ে' এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

আর সে ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি আমার উক্ত বক্তব্য দ্বারা যিহার -এর অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছি, তাহলে শায়খাইনের নিকট এটা যিহার হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট তা যিহার হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, যিহার বলা হয় হালাল কোনো নারীকে মাহরাম কোনো স্ত্রীলোক [যেমন– মা] -এর সাথে তুলনা করাকে। আর এ তুলনা করাটাই হলো যিহার

-এর রুকন। এখানে যেহেতু تَشْبِيْه তথা তুলনাকরণের কোনো অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি, তাই এটা যিহার হবে না। শায়খাইনের দলিল হলো, বক্তা اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ এ বাক্যের মাঝে حَرَامٌ শব্দটিকে শর্তহীনভাবে ব্যবহার করেছে। আর হুরমত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে– তালাকের মাধ্যমে হুরমত, যিহারের মাধ্যমে হুরমত ইত্যাদি। মোটকথা, হুরমতের বিভিন্ন প্রকারের মাঝে যিহারও এক প্রকারের হুরমত। শর্তহীন সাধারণ হুরমতের সম্ভাবনাময় একটি প্রকার। আর মূলনীতি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার বক্তব্যের সম্ভাবনাময় কয়েকটি অর্থের কোনো একটির নিয়ত করে, তাহলে তার সে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয়। তাই এক্ষেত্রেও তার যিহার-এর নিয়ত গ্রহণ করা হবে।

আর যদি সে বলে যে, আমি আমার উক্ত বক্তব্যের দ্বারা আমার স্ত্রীকে হারাম করার নিয়ত করেছি, অথবা কোনো নিয়তই করিনি, তাহলে এটি ইয়ামীন সাব্যস্ত হবে এবং এ কারণে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সে যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীসহবাস করে ফেলে, তাহলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি সহবাস ছাড়াই চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে ঈলার কারণে তার স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পতিত হবে।

স্ত্রীকে হারাম সাব্যস্ত করার নিয়ত করলে তা কসম হওয়ার দলিল হলো, আমাদের নিকট তালাককে হারাম সাব্যস্ত করার নামই হলো কসম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ.

আর যদি সে কোনো নিয়তই না করে, তাহলে তা ইয়ামীন হওয়ার কারণ হলো, ইয়ামীনের দ্বারা একেবারে নিম্ন পর্যায়ের হুরমত প্রমাণিত হয়। কেননা, ঈলার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বেই সহবাস করা বৈধ। পক্ষান্তরে যিহার এমন নয়। আর ঈলার মাঝে তাৎক্ষণিক হুরমত প্রমাণিত হয় না; বরং চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর প্রমাণিত হয়। অপর পক্ষে যিহার -এর মাঝে তাৎক্ষণিক হুরমত প্রমাণিত হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে তালাকের হুরমতের তুলনায় ঈলার হুরমত নিম্ন পর্যায়ের। কেননা, উক্ত বক্তব্য দ্বারা যদি তালাক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বায়েন তালাক পতিত হবে এবং সহবাস করা হারাম হবে। পক্ষান্তরে ঈলার কারণে সহবাস হারাম হয় না। সুতরাং যেহেতু ইয়ামীনের হুরমত নিম্ন পর্যায়ের, তাই এটাই নির্ধারিত হবে সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে। ইনশাআল্লাহ 'আইমান' অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অবশ্য কোনো কোনো মাশায়েখ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ এ বাক্যের মাঝে হুরমতবাচক শব্দকে নিয়ত না করা সত্ত্বেও সাধারণ প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে তালাকের অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। কেননা, বর্তমানকালে اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ এ বাক্যের দ্বারা মানুষ তালাকের অর্থই গ্রহণ করে থাকে। ফকীহ আবুল লাইছ (র.)-ও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সঠিক বিষয় আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

بَابُ الْخُلْعِ

وَاِنْ تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ تَفْتَدِىَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهٖ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتّٰى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ بَائِنٌ اِلَّا اَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ اَغْنٰى عَنِ النِّيَّةِ هٰهُنَا وَلِاَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ اِلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَ ذٰلِكَ بِالْبَيْنُوْنَةِ ـ

পরিচ্ছেদ : খোলা

অনুবাদ : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যদি ফাটল ধরে আর উভয়ে এমন আশঙ্কা করে যে, [একে অপরের হক আদায়ের ক্ষেত্রে] আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তারা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর আত্মমুক্তি অর্জনে কোনো বাধা নেই। এ অর্থের বিনিময়ে স্বামী-স্ত্রীকে খোলা' করে দেবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ - 'বন্ধন মুক্তির জন্য স্ত্রী যে অর্থ স্বামীকে প্রদান করবে, তাতে [প্রদানে ও গ্রহণে] তাদের কোনো গুনাহ নেই।' স্বামী যখন এটা করবে তখন খোলা' -এর মাধ্যমে একটি বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত অর্থ আদায় করা স্ত্রীর জিম্মায় লাযিম হবে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন- اَلْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ 'খোলা' হলো একটি বায়েন তালাক।' তাছাড়া এজন্য যে, খোলা' শব্দে তালাকের সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। এ কারণেই শব্দটি অস্পষ্টবাচক তালাক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অস্পষ্টবাচক শব্দের দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয়। অবশ্য এখানে অর্থের উল্লেখ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দিয়েছে। তাছাড়া আত্ম-অধিকার নিষ্কণ্টক করার জন্যই স্ত্রী অর্থ প্রদান করছে। আর তা বায়েন তালাকের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ যাবৎ দাম্পত্য বিচ্ছেদের সে সব পন্থা আলোচিত হয়েছে, যা পুরুষ কর্তৃক অবলম্বিত হবে। এখন এমন কিছু পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে বিচ্ছেদের দাবি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে। এ বিচ্ছেদকে 'খোলা' নামে অভিহিত করা হয়। তালাক এবং খোলার মধ্যে পার্থক্য হলো, তালাক হয় বিনিময়বিহীন। পক্ষান্তরে খোলার মধ্যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু বিনিময় দিতে হয়- চাই সেটা মহরের দাবি মাফ করে হোক বা নগদ অর্থ প্রদানপূর্বক হোক। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিবাদের আশঙ্কা করলে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তারা রক্ষা করতে পারবে না মনে করলে, স্ত্রী অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে খোলা' [আত্মমুক্তি] অর্জন করতে পারে।

খোলা'র সংজ্ঞা ও শর্তাবলি : اَلْخُلْعُ শব্দটি خَ বর্ণে পেশ এবং যবর উভয়ভাবে পড়া যায়। এটা نَزْعٌ -এর মাসদার, অর্থ- পৃথক করা, খোলা। যেমন বলা হয়- خَلَعْتُ النَّعْلَ - 'আমি জুতা খুলে ফেলেছি।' আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - "আপনি আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন।" তবে خَلْعٌ শব্দটি যখন যবর যোগে পাঠ করা হয়, তখন প্রকৃতই তার অর্থ হয় পৃথককরণ। আর যখন পেশ যোগে পঠিত হয় তখন তা রূপকভাবে পৃথকরণের অর্থ প্রকাশ করে। শরিয়তের পরিভাষায় خُلْعٌ হলো- اَخْذُ مَالِ الْمَرْاَةِ بِاِزَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ 'খোলা' শব্দ প্রয়োগ করে স্বামী-স্বত্ব ত্যাগের বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা।' তানবীরুল আবছারে প্রদত্ত এর সংজ্ঞাটি এ রকম- اِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلٰى قَبُوْلِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ اَوْ بِمَا فِىْ مَعْنَاهُ

খোলা' শুদ্ধ হওয়ার জন্য সকল শর্ত প্রযোজ্য, যা তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন– সজ্ঞান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ইত্যাদি। এর হুকুম হলো, তা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হবে। এর অবস্থা হলো, স্বামীর দিক থেকে বিবেচনা করলে তা ইয়ামীন (يَمِيْن) যা বলার পর স্বামী আর প্রত্যাহার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রীর দিক বিবেচনায় তা হলো مُعَاوَضَةٌ বা বিনিময়ে লেনদের চুক্তি।

'খোলা' কখন করা বাঞ্ছনীয় : কুরআন-হাদীসে খোলা'র অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো নারী যদি দাম্পত্য জীবনে বিপদ ও কষ্টে নিপতিত হয় এবং স্বামীর সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্তি লাভের আর কোনো উপায় না থাকে তখন সে কিছু বিনিময় প্রদানপূর্বক স্বীয় মুক্তির ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু যে সকল শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি কোনো নারী সে সকল শর্তের তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র নতুন স্বাদের নেশায় স্বামীকে চরিত্র ও আইনগতভাবে এতে বাধ্য করে, তাহলে সে শক্ত গুনাহগার হবে। কেননা, এর বিরূপ প্রভাব যেমন সমাজের উপর পড়বে তেমিন পরকালেও এ প্রবৃত্তি পূজার শাস্তি ভোগ করতে হবে। সাম্প্রতিককালে আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের মাঝে যে বিষয়টি মহামারী রূপ ধারণ করেছে; তা হলো, তারা আপন স্বামীদের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় কখনো বা ভিত্তিহীন অভিযোগ উথাপন করে নিজেদের নিষ্কৃতি নয়; বরং নিত্যনতুন স্বাদের মোহে বিচ্ছেদের পথ সুগম করতে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য আচরণ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

'যে নারী ভীষণ কষ্ট বা বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তালাক প্রার্থনা করল, তাঁর জন্য বেহেশের খুশবুও হারাম।' -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

কুরআনুল কারীম স্বল্প কথায় খোলা'র নিয়ম ও শর্তাবলি বলে দিয়েছে এভাবে–

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ . تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا . (بَقَرَة)

অর্থাৎ, তোমরা আপন স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে বিন্দুমাত্র ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য হালাল হবে না। কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ পালন করতে না পারে। সুতরাং যখন তোমরা আশঙ্কা করবে যে, উভয়ে দাম্পত্যের নিয়মনীতিগুলো রক্ষা করতে পারবে না, তখন নিজেকে মুক্ত করার জন্য স্ত্রী যা কিছু প্রদান করবে তাতে (প্রদান ও গ্রহণে) তাদের কোনো গোনাহ নেই। এ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে কেউ অতিক্রম করো না। -[বাকারা : ২২৯]

قَوْلُهُ وَإِنْ تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا الخ : মাসআলাটি হলো এ রকম– স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে যদি ঝগড়া করতে থাকে এবং তারা এই ধারণা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ, পরস্পরের হক তারা আদায় করতে পারবে না, তবে স্ত্রী আত্মমুক্তি অর্জন করতে স্বামীকে অর্থ দিতে কোনো বাধা নেই। স্বামী এ অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে খোলা' করে দেবে। এর বৈধতার দলিল আল্লাহ তা'আলার এই বাণী– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ অর্থাৎ, বৈবাহিক বন্ধন-মুক্তির জন্য স্ত্রী স্বামীকে অর্থ দিলে তাতে [প্রদানে ও গ্রহণে] তাদের কোনো গুনাহ নেই। স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ অর্থ প্রদান মূলত স্বামীর [বৈবাহিক] বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই হয়ে থাকে। কেননা, স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীর কাছে বন্দিতুল্য। নবী করীম ﷺ মহিলাদেরকে أَسَارَى [বন্দিনী] বলেও সম্বোধন করেছেন। বলেছেন– اِتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ - "স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, তারা তোমাদের হাতে বন্দিনী।"

আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) বর্ণনা করেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا আয়াতটি হযরত সাবেত (রা.) ও তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটিই ছিল ইসলামে প্রথম খোলা'। এ হাদীসটি খোলা'র অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা আইনী (র.) সাবেত (রা.) -এর তিনটি নাম উল্লেখ করেন। যথা– ১. হাবিবা, ২. জামিলা, ৩. হামিলা।

খোলা'র বৈধতার বিষয়ে ইমাম মাযানী (র.) ব্যতীত কোনো ইমামের দ্বিমত নেই। তবে আসহাবে জাওয়াহের দুটি শর্তের সাথে খোলা'র অনুমতি দেয়। প্রথমত, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অনীহা-অবজ্ঞা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, সে যদি স্বামীর প্রতি তার সকল হক আদায় করতে না পারার আশঙ্কা করে।

খোলা'র বৈধতার ব্যাপারে কারো কারো মতামত এই যে, খোলা' কেবল রাষ্ট্র-প্রধানের অনুমতিসাপেক্ষে বৈধ হবে। আর কারো মত এই যে, খোলা' কেবল তখনই বৈধ হবে যখন স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করবে না বলে জানায় এবং এও বলে যে, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে অপবিত্রতার গোসল করতে প্রস্তুত নই। কেউ কেউ বলেন, খোলা' তখনই বৈধ হবে যখন স্ত্রীর অবাধ্যতা ও উন্নাসিকতা প্রকাশো হতে থাকে।

যখন স্বামী-স্ত্রী এ কাজটি করে ফেলবে। অর্থাৎ, স্ত্রী খোলা' বাবদ অর্থ স্বামীকে দিয়ে দেবে এবং স্বামী খোলা' করে দেবে তখন এর মাধ্যমে স্ত্রীর উপর একটি বায়েন তালাক পতিত হবে।

'খোলা' সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এক অভিমত এমন পাওয়া যায় যে, খোলা' হলো বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তালাক নয়। এ মতপার্থক্যের ফলাফল সেক্ষেত্রে বুঝা যাবে, যখন কেউ স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী তার সাথে খোলা' করবে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে তখন স্ত্রী তার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের হারাম সাব্যস্ত হবে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, ঐ পর্যায়ের হারাম সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে [তালাকের] এ বিষয়টি পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে বলেছেন– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ - "তালাক দু'বার।" অতঃপর فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ বলে খোলা'র বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। সবশেষে উল্লেখ করেছেন– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, 'এরপর যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে স্ত্রী তার জন্য আর হালাল থাকবে না– অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া।' আর আহনাফের দাবি অনুযায়ী খোলা'কে যদি তালাক মেনে নেওয়া হয়, তবে তালাক চারটি হবে। অথচ শরিয়ত কর্তৃক তিনটি তালাক নির্ধারিত। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, খোলা' শরিয়তের দৃষ্টিতে তালাক নয়। তার দ্বিতীয় দলিল হলো, বিবাহ বেচাকেনার মতোই একটি [আকদ] চুক্তি। আর সকল চুক্তিই ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগ থাকে। তাইতো 'কুফু' [সমপর্যায়ের] না হলে, দাসী স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হলে কিংবা নাবালিকা সাবালিকা হওয়ার পর [এ সকল অবস্থায়] আপনারা আহনাফের মতেও স্ত্রী বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগ পায়। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে। আর চুক্তি ভেঙ্গে দিতে অপর পক্ষের সম্মতি প্রয়োজন এবং পারস্পরিক সম্মতি খোলা'র ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; তালাকে নয়। কারণ, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে বুঝা যায়, খোলা হলো বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া; তালাক নয়।

আহনাফের দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اَلْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ - 'খোলা' একটি বায়েন তালাক।'

দ্বিতীয় দলিল [যা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর যৌক্তিক দলিল খণ্ডনকারী] এই যে, বিবাহ [প্রস্তাব ও সম্মতির মাধ্যমে] পূর্ণ ও সংঘটিত হবার পর ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। 'কুফুর' ক্ষেত্রে অসমতা, স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার এবং প্রাপ্তবয়স্কতার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের কারণে বিবাহ ভঙ্গ মূলত বিবাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে; পরে নয়। তাই এ তিনটির কোনো একটির কারণে বিবাহ ভেঙ্গে গেলে বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা বলা হবে; বিবাহ ছিন্ন হয়েছে বলা হবে না। পক্ষান্তরে খোলা' হয়ে থাকে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর। আর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যেহেতু ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, তাই খোলা' বিবাহ ভঙ্গ নয়; বরং বিবাহ বিচ্ছেদ। স্মর্তব্য যে, বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মুহূর্তেও খোলা' হতে পারে।

বাকি রইল ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দাবি যে, খোলা'কে তালাক মেনে নিলে শরিয়তে তালাকের সংখ্যা হবে চারটি। এর জবাব এই যে, পবিত্র কুরআনে দুই তালাকের কথা উল্লেখ করার পর বলা হলো, এরপর স্বামী তৃতীয় তালাক স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে দিক বা বিনিময় ছাড়াই দিক, সর্বাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর জন্য চূড়ান্ত নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে। অর্থের বিনিময়ে তালাককে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ বলে এবং বিনিময় ছাড়া তালাককে فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এ যেন একই জিনিসকে দু'ভাবে ব্যক্ত করা। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, তোমার এ কলমটি আমাকে দিয়ে দাও। বন্ধু তাকে কলমটি অর্থের বিনিময়ে দিক বা বিনিময় ছাড়া দিক, সর্বাবস্থায়ে কলম একটিই হয়। তদ্রূপ এক্ষেত্রেও তালাককে দু'ভাবে প্রয়োগ করা হলো।

'খোলা' শব্দের দ্বারা বায়েন তালাক হওয়ার পক্ষে 'হিদায়া' গ্রন্থকার আরো দুটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, 'খোলা' শব্দে তালাকের সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। এ কারণেই শব্দটি অস্পষ্টবাচক তালাক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অস্পষ্টবাচক শব্দের দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয়।

প্রশ্ন: এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, 'খোলা' শব্দটি যদি অস্পষ্টবাচক তালাক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে নিয়তের প্রয়োজন হয় না কেন?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে অর্থের উল্লেখ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী অর্থ প্রদানের দায়িত্ব তখনই গ্রহণ করবে যখন সে আত্ম-অধিকার পুরোপুরি অর্জন করবে। আর তা বায়েন তালাকের মাধ্যমেই অর্জিত হয়; রাজ'ঈ তালাকের মাধ্যমে নয়। তাই আমরা বলেছি যে, 'খোলা' তালাকে বায়েন বটে; তালাকে রাজ'ঈ নয়।

অন্যায় আচরণ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা স্বামীর জন্য মাকরূহ।

وَاِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهٖ يَكْرَهُ لَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اِلٰى اَنْ قَالَ فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا وَلِاَنَّهٗ اَوْحَشَهَا بِالْاِسْتِبْدَالِ فَلَا يُزِيْدُ فِيْ وَحْشَتِهَا بِاَخْذِ الْمَالِ وَاِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْهَا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهَا وَفِيْ رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ طَ اَلْفَضْلُ اَيْضًا لِاِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْأً وَ وَجْهُ الْاُخْرٰى قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ اِمْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَقَدْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْهَا وَلَوْ اَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَخَذَ وَالنُّشُوْزُ مِنْهُ لِاَنَّ الْمُقْتَضٰى مَا تَلَوْنَاهُ شَيْئَانِ الْجَوَازُ حُكْمًا وَالْاِبَاحَةُ وَقَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِيْ حَقِّ الْاِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ فَبَقِيَ مَعْمُوْلًا فِي الْبَاقِيْ .

অনুবাদ : অন্যায় আচরণ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা স্বামীর জন্য মাকরূহ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اِلٰى اَنْ قَالَ فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا – 'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও .... তাদের নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করো না।' তাছাড়া এ কারণে যে, পরিবর্তন দ্বারাই স্ত্রীকে সে উত্যক্ত করেছে, সুতরাং অর্থ গ্রহণ দ্বারা তার উত্যক্ততা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে অন্যায় আচরণ স্ত্রীর পক্ষ থেকে হলে প্রদত্ত [মহর] পরিমাণের অধিক অর্থ গ্রহণ করা স্বামীর জন্য আমরা মাকরূহ মনে করি। জামিউস সাগীরের বর্ণনা মতে, অতিরিক্ত গ্রহণও বৈধ। এর দলিল পরিচ্ছেদের শুরুতে আমরা যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তার নিঃশর্ততা। অপর মতটির দলিল সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস -এর স্ত্রী প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا [তবে অতিরিক্ত পরিমাণ যা, তা গ্রহণ করবে না]। অথচ এ ক্ষেত্রে অন্যায় ছিল স্ত্রীর পক্ষ থেকে। মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করলে আদালতের বিচারে তা বৈধ। তদ্রূপ অন্যায় স্বামীর পক্ষ থেকে হলেও একই কথা। কেননা, আমাদের পেশকৃত আয়াতের দাবি দুটি– আইনগত বৈধতা ও মুবাহ হওয়া। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আয়াতের উপর আমল পরিহার করা হয়েছে বিপরীত হাদীস থাকার কারণে। সুতরাং অবশিষ্ট ক্ষেত্রেই শুধু আয়াতটি কার্যকর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهٖ الخ : স্ত্রীর অন্যায় আচরণ বলতে স্বামীর অবাধ্যতা, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশকে বুঝায়। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, সীমালঙ্ঘন উভয় পক্ষ থেকেই হতে পারে। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অনিচ্ছা বা অনাসক্তি প্রদর্শন।

আলোচ্য মাসআলাটি হলো এ রকম, অন্যায় আচরণ কিংবা অনীহা প্রদর্শন যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে খোলা' সূত্রে স্ত্রী থেকে কিছু নেওয়া মাকরূহ। দলিল আল্লাহ তা'আলার এ আয়াত– وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ (اِلٰى اَنْ قَالَ) بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?' 'কিনতার' অর্থ গরুর চামড়া তর্তি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য। কারো কারো মতে, সত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আবার কেউ কেউ বলেন, এক হাজার দুইশত ওকিয়া। [এক ওকিয়া চল্লিশ দিরহাম সমপরিমাণ]। আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন, কিনতার অঢেল সম্পদকে বলে। যাই হোক, আয়াতে কারীমায় স্ত্রী থেকে বিনিময় নেওয়া মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাই তার থেকে বিনিময় নেওয়া মাকরূহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি বিনিময় গ্রহণ করে, তবে তা বৈধ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا বলে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে তা نَهْيٌ لِغَيْرِهٖ [পারিপার্শ্বিক কারণে নিষিদ্ধ] বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। যদ্দারা বস্তুর বৈধতা বিলুপ্ত হয় না। যেমন– জুমার দিন আজানের সময় বেচাকেনা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৈধ হিসেবে বিবেচ্য।

দ্বিতীয় দলিল হলো, স্বামী তাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে উত্যক্ত করেছে। সুতরাং অর্থ গ্রহণের দ্বারা তার উত্যক্ততা বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْهَا كَرِهْنَا الخ : অন্যায় আচরণ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্বামীর জন্য প্রদত্ত মহর পরিমাণ অর্থ স্ত্রীর পক্ষ থেকে নেওয়া বৈধ; মাকরূহ নয়। কিন্তু প্রদত্ত মহর থেকে পরিমাণে বেশি অর্থ নেওয়া মাবসূত -এর বর্ণনা মতে মাকরূহ এবং জামিউস সাগীর -এর বর্ণনা মতে মাকরূহ ছাড়াই বৈধ।

মাকরূহ না হওয়ার দলিল ঐ আয়াত যা শুরুতে আমরা তেলাওয়াত করেছি। আয়াতটির নিঃশর্ততা কমবেশি কিংবা বিনিময় ছাড়া 'খোলা' সর্বপ্রকারকেই শামিল করে। অপর মতটির [প্রদত্ত মহর থেকে পরিমাণে বেশি নেওয়া মাকরূহ] দলিল সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস -এর স্ত্রী প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ যা বলেছেন– اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا [যা অতিরিক্ত পরিমাণ তা গ্রহণ করবে না]। এ হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করীম ﷺ অতিরিক্ত নিতে বারণ করেছেন। রাসূল ﷺ -এর নিষেধ বিষয়টি মুবাহ হওয়ার পরিপন্থি। অতএব, তা মাকরূহ হবে। মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করলে আদালতের বিচারে তা বৈধ।

قَوْلُهٗ وَلَوْ اَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِى الْقَضَاءِ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, অন্যায় আচরণ যদি মহিলার পক্ষ থেকে হয় তখন প্রদত্ত মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করা আদালতের বিচারে বৈধ। তেমনিভাবে অন্যায় আচরণ স্বামীর পক্ষ থেকে হলেও আদালতের বিচারে প্রদত্ত মহরের অতিরিক্ত গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ।

দলিল এ আয়াত– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ এ আয়াতের অর্থে দুটি দিক আছে। প্রথমত, আদালতের বিচারে বৈধতা। দ্বিতীয়ত, মুবাহ অর্থাৎ হালাল হওয়া। حِلٌّ [হালাল] এবং جَوَازٌ [বৈধতা] এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, মুবাহ হলো মাকরূহ -এর বিপরীত। আর জায়েজ হারাম -এর বিপরীত, যা মুবাহ তা অবশ্যই জায়েজ হবে। কিন্তু যা জায়েজ তা মুবাহ হওয়া জরুরি নয় [মাকরূহও হতে পারে]। যেমন– জুমার দিন আজানের সময় বেচাকেনা বৈধ, কিন্তু মুবাহ নয়; বরং মাকরূহ। বুঝা গেল, জায়েজ হওয়া এবং মাকরূহ হওয়া একই সাথে হতে পারে। অতএব, আয়াত এবং হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন এভাবে হবে যে, আয়াতে [প্রদত্ত মহরের] অতিরিক্ত পরিমাণ নেওয়া আদালতের বিচারে বৈধ বলা হয়েছে এবং হাদীসে اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا বলে অতিরিক্ত পরিমাণ না নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মাকরূহ হওয়ার কারণে।

وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُّ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيقًا وَقَدْ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا وَالْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِوَلَايَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ فَتَمْلِكُ هِيَ الْآخَرَ وَهُوَ النَّفْسُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ -

অনুবাদ : আর যদি স্বামী অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর এ অর্থ লাযিম হবে। কেননা, স্বামী নিঃশর্ত ও শর্তযুক্ত উভয় প্রকার তালাক প্রদানের একক অধিকারী। এখানে তালাককে সে স্ত্রীর আর্থিক দায় গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর স্ত্রীর যেহেতু 'আত্ম-অধিকার' রয়েছে, সেহেতু আর্থিক দায় গ্রহণের ক্ষমতা তার রয়েছে। আর বিবাহ-স্বত্ব মাল না হলেও তার বিনিময় গ্রহণ বৈধ। যেমন কিসাস [এর বেলায়]। আর প্রদত্ত তালাকটি বায়েন হবে। এর কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। তাছাড়া বিষয়টি হচ্ছে 'আত্ম-অধিকারের বিনিময়ে অর্থ প্রদান। স্বামী দুটি বিনিময়ের একটি বুঝে পেয়েছে। সুতরাং স্ত্রী অপর বিনিময়টির অবশ্যই অধিকারী হবে, যাতে বিনিময়ের সমতা নিশ্চিত হয়। আর সেই অপর বিনিময়টি হচ্ছে তার 'আত্ম-অধিকার'।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, স্বামী অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক দিল। যেমন বলল– أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ অথবা أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ [তুমি এক হাজার দিরহাম এর বিনিময়ে তালাক]। আর স্ত্রী এ শর্তযুক্ত তালাক গ্রহণ করল, তবে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর সে অর্থ লাযিম হবে। দলিল হলো, এটি একটি বিনিময়-চুক্তি। আর বিনিময়-চুক্তির বৈধতা নির্ভর করে উভয় পক্ষের প্রদান ও গ্রহণের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা ও স্থানের উপযুক্ততার উপর। এখানে এর সবকটিই বিদ্যমান। স্বামীর যোগ্য হওয়া এভাবে প্রমাণিত যে, সে নিঃশর্ত কিংবা শর্তযুক্ত উভয় প্রকার তালাক প্রদানের একক অধিকারী। আর এখানে সে তালাককে স্ত্রীর আর্থিক দায় গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। অতএব, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর আর্থিক দায়গ্রহণ শর্ত হবে। স্ত্রী যদি শর্ত কবুল করে, তবে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর সে অর্থ লাযিম হবে। আর স্ত্রীর যোগ্য হওয়া এভাবে প্রমাণিত হবে যে, তার আর্থিক দায় গ্রহণের অধিকার রয়েছে। কারণ, তার আত্ম-অধিকার আছে। মহলের উপযুক্ততা বিদ্যমান এজন্য যে, বিবাহ-স্বত্ব মাল না হলেও তার বিনিময় নেওয়া বৈধ। যেমন– কিসাস [মাল না হওয়া সত্ত্বেও] এর বিনিময় গ্রহণ বৈধ। বিষয় দুটির মাঝে মিল [যোগসূত্র] হলো, উভয় ক্ষেত্রেই প্রদান ও দায় গ্রহণ উপযুক্ত ব্যক্তি থেকে পাওয়া যায়।

আর অর্থের বিনিময়ে যে তালাক হয় তা বায়েনই হয়। এর এক দলিল যা উপরে উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ, স্ত্রী অর্থের দায় তখনই বহন করবে যখন সে আত্ম-অধিকার পুরোপুরি লাভ করবে। আর তা বায়েন তালাকের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় দলিল, বিষয়টি হচ্ছে আত্ম-অধিকার লাভের বিনিময়ে অর্থ প্রদান। আর স্বামী দুটি বিনিময়ের একটি বুঝে পেয়েছে, সুতরাং স্ত্রী অপর বিনিময়টির অধিকারী অবশ্যই হবে। যাতে বিনিময়ে সমতা নিশ্চিত হয়। সে তা লাভ করবে স্বামীর বায়েন তালাক দেওয়ার মাধ্যমে; রাজ'ঈ তালাকের মাধ্যমে নয়। কেননা, তালাকে রাজ'ঈ দিলে স্বামীর অধিকার সম্পূর্ণ বাতিল হয় না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, অর্থের বিনিময়ে তালাকে বায়েন হবে।

قَالَ وَاِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِى الْخَلْعِ مِثْلَ اَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلٰى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ اَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَئَ لِلزَّوْجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ وَاِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِى الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا فَوُقُوْعُ الطَّلَاقِ فِى الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ بِالْقَبُوْلِ وَافْتِرَاقُهُمَا فِى الْحُكْمِ لِاَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِى الْاَوَّلِ لَفْظُ الْخَلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ وَفِى الثَّانِىْ الصَّرِيْحُ وَهُوَ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَاِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجِ شَئٌ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا حَتّٰى تَصِيْرَ غَارَّةً لَهُ وَلِاَنَّهُ لَا وَجْهَ اِلٰى اِيْجَابِ الْمُسَمّٰى لِلْاِسْلَامِ وَلَا اِلٰى اِيْجَابِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الْاِلْتِزَامِ بِخِلَافِ مَا اِذَا خَالَعَ عَلٰى خَلٍّ بِعَيْنِهِ فَظَهَرَ اَنَّهُ خَمْرٌ لِاَنَّهَا سَمَّتْ مَالًا فَصَارَ مَغْرُوْرًا وَبِخِلَافِ مَا اِذَا كَاتَبَ اَوْ اَعْتَقَ عَلٰى خَمْرٍ حَيْثُ تَجِبُ قِيْمَةُ الْعَبْدِ لِاَنَّ مِلْكَ الْمَوْلٰى فِيْهِ مُتَقَوِّمٌ وَمَا رَضِىَ بِزَوَالِهِ مَجَّانًا اَمَّا مِلْكُ الْبُضْعِ فِىْ حَالَةِ الْخُرُوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عَلٰى مَا نَذْكُرُ وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ لِاَنَّ الْبُضْعَ فِىْ حَالَةِ الدُّخُوْلِ مُتَقَوِّمٌ وَالْفِقْهُ اَنَّهُ شَرِيْفٌ فَلَمْ يُشْرَعْ تَمَلُّكُهُ اِلَّا بِعِوَضٍ اِظْهَارًا لِشَرَفِهِ فَاَمَّا الْاِسْقَاطُ فَنَفْسُهُ شَرِيْفٌ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى اِيْجَابِ الْمَالِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খোলা'র ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত বিনিময়টি যদি বাতিল সাব্যস্ত হয়; যেমন– কোনো মুসলমান মদ বা শূকর কিংবা মৃত পশুর বিনিময়ে খোলা' করল, তাহলে স্বামী কিছুই পাবে না এবং বিচ্ছেদটি 'বায়েন তালাক' বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত বিনিময়টি বাতিল সাব্যস্ত হলে তালাকটি রাজ'ঈ বলে গণ্য হবে। উভয় ক্ষেত্রে তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, স্ত্রীর সম্মতি সহকারে বিচ্ছেদকে শর্তযুক্ত করা। পক্ষান্তরে হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, বিনিময়টি বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রথম ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শব্দটি হচ্ছে খোলা'। আর তা হচ্ছে তালাকের অস্পষ্ট শব্দ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শব্দ হচ্ছে তালাকের স্পষ্ট শব্দ। আর স্পষ্ট তলাক শব্দের পরিণতি হচ্ছে রাজ'ঈ তালাক। স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর উপর কোনো বিনিময় সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রী তো স্বামীর কাছে মুসলমানের জন্য মূল্য আছে এমন কোনো মালের উল্লেখ করেনি, যাতে স্বামীর কাছে সে প্রতারণাকারী গণ্য হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের [নিষেধাজ্ঞার] কারণে উল্লেখকৃত বস্তু সাব্যস্ত করার কোনো উপায় নেই। আর অন্য কিছু সাব্যস্ত করারও কোনো উপায় নেই। কেননা, স্ত্রী সেটার দায় গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে যদি নির্ধারতি কোনো সিরকার পাত্রের বিনিময়ে খোলা' করে, পরে দেখা গেল যে তা মদ, তাহলে হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা, স্ত্রী [মূল্যবান] মালের উল্লেখ করার কারণে স্বামী প্রতারিত্র হয়েছে। মদের বিনিময়ে কিতাবাত-চুক্তি করার কিংবা দাস আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, সেখানে দাসের মূল্য সাব্যস্ত হবে। কেননা, দাসের উপর মনিবের মালিকানা হচ্ছে মূল্যওয়ালা। আর মনিব বিনিময় ছাড়া মালিকানা পরিত্যাগে সম্মত হয়নি। পক্ষান্তরে বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা মূল্যসম্পন্ন নয়। এর কারণ এখনই আমরা উল্লেখ করব। আর মদ মোহরানার ভিত্তিতে বিবাহের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, দাম্পত্য-বন্ধনের সূচনাকালে সম্ভোগ-অঙ্গ মূল্যসম্পন্নরূপে বিবেচিত। এর রহস্য এই যে, [শরিয়তের দৃষ্টিতে] সম্ভোগ-অঙ্গ অতি মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং মর্যাদা প্রকাশের জন্য বিনিময় ছাড়া এর মালিকানা লাভ শরিয়তসম্মত নয়। পক্ষান্তরে সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা পরিত্যাগের বিষয়টি স্থানীয়ভাবেই মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং [মর্যাদা প্রকাশের জন্য] মাল ধার্য করার প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, 'খোলার' ক্ষেত্রে উল্লেখকৃত বিনিময়টি যদি বাতিল সাব্যস্ত হয়। যেমন– কোনো মুসলমান মদ, শূকর কিংবা মৃত পশুর বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খোলা' করল, তাহলে সে স্ত্রী থেকে কিছুই পাবে না এবং স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পতিত হবে।

সহবাসকৃত স্ত্রীকে যদি মালের বিনিময়ে তালাক দেয়, আর এটি তৃতীয় তালাক না হয় এবং বিনিময়টি [ইসলামের নিষেধাজ্ঞার কারণে বাতিল সাব্যস্ত হয়, তবে স্ত্রীর উপর তালাকে রাজ'ঈ পতিত হবে এবং স্বামীর অনুকূলে স্ত্রীর উপর কোনো কিছু সাব্যস্ত হবে না।

উভয় ক্ষেত্রে তালাক সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে– স্বামী তালাককে স্ত্রীর সম্মতির সাথে শর্তযুক্ত করেছে এবং স্ত্রী সম্মতি প্রকাশ করেছে। তবে হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে বায়েন তালাক পতিত হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে।

হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, যখন বিনিময় বাতিল সাব্যস্ত হলো তখন প্রথম ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল শব্দটি হচ্ছে 'খোলা'। আর তা হচ্ছে তালাকের অস্পষ্ট শব্দ। যদ্দারা বিচ্ছেদ 'বায়েন তালাক' বলে গণ্য হবে। কেবল ঐ তিনটি শব্দ ছাড়া যেগুলোর আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। আর 'খোলা' শব্দটি ঐ তিনটি শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিনিময় বাতিল হওয়ার পর ক্রিয়াশীল শব্দটি হচ্ছে– أَنْتِ طَالِقٌ যা তালাকের স্পষ্ট শব্দ। আর স্পষ্ট তালাক শব্দের দ্বারা রাজ'ঈ তালাক পতিত হয়। তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে। তবে স্ত্রীর উপর কোনো বিনিময় সাব্যস্ত হবে না এর কারণ, সে মূল্য আছে এমন কোনো মালের উল্লেখ করেনি, যাতে সে প্রতারণাকারী সাব্যস্ত হবে। অতএব, তার উপর কোনো বিনিময় সাব্যস্ত হবে না। [বিনিময় সাব্যস্ত না হওয়ার] আরো এক কারণ এই যে, বিনিময় সাব্যস্ত করার পন্থা দুটি হয়ে থাকে। যথা– ১. আক্দের সময় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সাব্যস্ত করা। ২. উল্লেখ করা হয়নি এমন কিছু সাব্যস্ত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুটিই অসম্ভব। প্রথমটি অসম্ভব এজন্য যে, মুসলমান মদ, শূকর ইত্যাদি আদান-প্রদান করতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি এজন্য অসম্ভব যে, স্ত্রী তার দায় গ্রহণ করেনি।

পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত কোনো সিরকার পাত্রের বিনিময়ে খোলা' করে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, তা মদ, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, মহরে মিছিল সমপরিমাণ অর্থ স্ত্রী স্বামীকে দেবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, সে ঐ মটকার সমপরিমাপের সিরকা স্বামীকে দেবে। [মহরের পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করা হয়েছে]। কারণ, খোলা' করার সময় স্ত্রী [মুসলমানের কাছে মূল্যবান] মালের উল্লেখ করেছে। পরবর্তীতে তা পাওয়া যায়নি। অতএব, সে প্রতারণাকারী সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তার উপর জরিমানা লাযিম হয়েছে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ الخ : মদের বিনিময়ে কিতাবত-চুক্তি করা কিংবা দাস আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে দাসের উপর নিজের মূল্য সাব্যস্ত হবে। দলিল হলো, দাসের উপর মনিবের মালিকানা হচ্ছে মূল্যওয়ালা। তাইতো যদি কেউ দাস চুরি করে [হারিয়ে ফেললে] তাকে দাসের মূল্য জরিমানা দিতে হয়। সারকথা, দাস মনিবের কাছে মূল্যওয়ালা মাল। আর মনিব নিজ মালিকানার বস্তু বিনামূল্যে নষ্ট করতে রাজি হবে না। অপর দিকে দাস কিতাবত-চুক্তির বিনিময় [মদ] পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। মুসলমানের কাছে তা মূল্যহীন হওয়ার কারণে। তাই সে নিজের মূল্য পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ الخ : মদের মোহরানার বিষয়টি 'খোলা'র সময় মদকে বিনিময় ধার্য করার বিষয়টি থেকে ভিন্ন। 'খোলা'র ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর কিছুই ধার্য হয় না, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় মহরে মিছিল সাব্যস্ত হয়। মাসআলা দুটির হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, দাম্পত্য-বন্ধনের সূচনাকালে সম্ভোগ-অঙ্গ মূল্যসম্পন্নরূপে বিবেচিত। এর রহস্য এই যে, [শরিয়তের দৃষ্টিতে] সম্ভোগ-অঙ্গ অতি মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং মর্যাদা প্রকাশের জন্য বিনিময় ছাড়া এর মালিকানা লাভ শরিয়তসম্মত নয়। পক্ষান্তরে সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা পরিত্যাগের বিষয়টি স্থানীয়ভাবেই মর্যাদাপূর্ণ। সুতরাং [মর্যাদা প্রকাশের জন্য] মাল ধার্য করার প্রয়োজন নেই।

قَالَ وَمَا جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ مَهْرًا جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ بَدَلاً فِى الْخُلْعِ لِاَنَّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا لِلْمُتَقَوِّمِ اَوْلٰى اَنْ يَصْلُحَ لِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ فَاِنْ قَالَتْ لَهٗ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ وَاِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَيْءٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا لِاَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ اِلَّا بِعِوَضٍ وَلَا وَجْهَ اِلٰى اِيْجَابِ الْمُسَمّٰى وَقِيْمَتِهٖ لِلْجَهَالَةِ وَلَا اِلٰى قِيْمَةِ الْبُضْعِ اَعْنِىْ مَهْرَ الْمِثْلِ لِاَنَّهٗ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوْجِ فَتَعَيَّنَ اِيْجَابُ مَا قَامَ بِهٖ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ. وَلَوْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ دَرَاهِمَ اَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ لِاَنَّهَا سَمَّتِ الْجَمْعَ وَاَقَلُّهٗ ثَلٰثَةٌ وَكَلِمَةُ مِنْ هٰهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التَّبْعِيْضِ لِاَنَّ الْكَلَامَ يَخْتَلُّ بِدُوْنِهٖ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রে যা মহররূপে বৈধ, খোলা'র ক্ষেত্রেও তা বিনিময়রূপে বৈধ। কেননা, যেটা মূল্যসম্পন্ন জিনিসের [সম্ভোগ-অঙ্গের] বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেটা মূল্যহীন জিনিসের [সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা পরিত্যাগের] বিনিময় আরো স্বাভাবিকভাবেই হতে পারবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, আমার হাতে যা আছে তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা' কর। তখন স্বামী তার সাথে খোলা' করল, কিন্তু দেখা গেল, তার হাতে কিছুই নেই, তাহলে স্ত্রীর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে কোনো মাল উল্লেখ করে স্বামীকে প্রতারণা করেনি। আর যদি বলে, আমার হাতে যে মাল আছে, তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা' কর। অতঃপর সে তার সাথে খোলা' করল। কিন্তু দেখা গেল যে, তার হাতে কিছু নেই। তাহলে তার মোহরানা স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা, সে যখন 'মাল' উল্লেখ করেছে তখন বুঝা গেল যে, কোনো বিনিময় ছাড়া মালিকানা পরিত্যাগে স্বামী সম্মত নয়। অথচ উল্লেখকৃত বস্তু কিংবা তার মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য তথা মহরে মিছিল সাব্যস্ত করাও সঙ্গত নয়। কেননা, বিচ্ছেদকালে তা মূল্যসম্পন্ন নয়। সুতরাং স্বামীর ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার জন্য [সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানা লাভের জন্য] যে পরিমাণ অর্থ স্বামীর ব্যয় হয়েছে, সেটা ওয়াজিব করাই নির্ধারিত হবে। আর যদি বলে আমার হাতে যে দিরহামসমূহ রয়েছে, তার বিনিময়ে আমাকে সাথে খোলা' কর, আর সে তাই করলো। কিন্তু দেখা গেলো যে, তার হাতে কিছু নেই। তখন স্ত্রীর উপর তিন দিরহাম আদায় করা লাযিম হবে। কেননা সে বহুবচনের শব্দ উল্লেখ করেছে। আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা [আরবীতে] হলো তিন আরবী ব্যবহার [مِنْ دَرَاهِمَ এর] مِنْ অব্যয়টি এখানে বর্ণনার জন্য এসেছে, বিভাজনের জন্য নয়। কেননা এ অব্যয় ব্যতীত বাক্য ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَا جَازَ اَنْ يَكُوْنَ مَهْرًا الخ : উক্ত ইবারতে হিদায়া প্রণেতা (র.) একটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে জিনিস বিবাহের ক্ষেত্রে মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে, ইমামগণের ঐকমত্যে ঐ বস্তু খোলা'র ক্ষেত্রেও বিনিময় হতে পারবে। এর দলিল এই যে, বিবাহের সময় সম্ভোগ-অঙ্গ মূল্যসম্পন্নরূপে বিবেচিত। কিন্তু খোলা'র সময় তা মূল্যসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত নয়। অতএব, যে বস্তু মূল্যসম্পন্ন সম্ভোগ-অঙ্গের বিনিময় হতে পারে তা মূল্যহীন সম্ভোগ-অঙ্গের বিনিময় আরো স্বাভাবিকভাবেই হতে পারবে। তবে এর বিপরীতটি জরুরী নয়। অর্থাৎ, যে জিনিস খোলা'র ক্ষেত্রে বিনিময় হতে পারে তা বিবাহের সময়ও মহর হতে পারা আবশ্যকীয় নয়। কেননা, কতক জিনিস এমন আছে যেগুলো খোলা'র ক্ষেত্রে বিনিময় হতে পারে, কিন্তু মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যেমন– এক থেকে নয় দিরহাম পর্যন্ত খোলা'র বিনিময় হতে পারে, কিন্তু মহর হতে পারবে না। তেমনিভাবে যদি বলে, বকরির পেটে যা আছে এর বিনিময়ে খোলা' করলাম, তবেও খোলা' হবে। কিন্তু এভাবে মহর ধার্য করা যাবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ الخ : প্রথম ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব না হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কেননা, স্ত্রী "হাতে যা আছে" এ কথায় কোনো মাল এর উল্লেখ করেনি। তাই তাকে প্রতারণাকারী সাব্যস্ত করা যাবে না। অতএব, স্ত্রী কোনো মালের দায় গ্রহণ করেনি বিধায় তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ الخ : পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে– خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ স্ত্রীর এ কথার উপর স্বামী তার সাথে খোলা' করল পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে, তার হাতে কিছুই নেই তখন স্ত্রীর উপর মহর পরিমাণ টাকা স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়া লাযিম হবে। কেননা, স্ত্রী 'মাল' উল্লেখ করার পর স্বামী তার সাথে খোলা করেছে অতএব, বুঝা গেল যে, কোনো বিনিময় ছাড়া স্বামী বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে রাজি নয়।

খোলা'র বিনিময় চার ধরনের হতে পারে। যথা– ১. খোলা'র সময় যা উল্লেখ করা হলো। ২. উল্লেখকৃত বস্তুর মূল্য। ৩. সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য অর্থাৎ, মহরে মিছিল ৪. ঐ পরিমাণ মহর যা স্ত্রী তার স্বামী থেকে আদায় করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম তিনটির কোনো একটি সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, খোলা'র সময় যা উল্লেখ করা হলো কিংবা তার মূল্য উভয়টাই মাজহুল [অজানা] থাকার কারণে সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। আর সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য অর্থাৎ, মহরে মিছিল সাব্যস্ত করা এজন্য সম্ভব নয় যে, বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ-অঙ্গ মূল্যসম্পদ নয়। তাই চতুর্থটি অর্থাৎ, স্ত্রী মহর হিসেবে স্বামী থেকে যা আদায় করেছে তা সাব্যস্ত হবে– স্বামীর ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার জন্য।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ دَرَاهِمَ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, স্ত্রী তার স্বামীকে বলল– خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ دَرَاهِمَ اَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ [আমার হাতে যে দিরহামসমূহ রয়েছে, সেগুলোর বিনিময়ে আমার সাথে খোলা' কর] স্বামী তা-ই করল। পরবর্তীতে দেখা গেল, তার হাতে কিছু নেই। তখন স্ত্রীর উপর তিন দিরহাম আদায় করা লাযিম।

দলিল এই যে, স্ত্রী دَرَاهِمَ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে। আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা আরবিতে তিন। আর "مِنْ دَرَاهِمَ" এর مِنْ অব্যয়টি এখানে বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে; বিভাজন বুঝানোর উদ্দেশ্যে নয়। যেমন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ -এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ব্যাকরণবিদদের নীতি [এই যে, যে বাক্যে] مِنْ অব্যয়টি ছাড়া বাক্য শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাক্যে مِنْ ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে তা বিভাজনের অর্থ দেবে। আর যে বাক্যে مِنْ অব্যয়টি ছাড়া বাক্য শুদ্ধ হবে না সেখানে مِنْ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানেও স্ত্রী যদি خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ دَرَاهِمَ বলত [مِنْ ছাড়া] তবে বাক্যটি ত্রুটিযুক্ত থেকে যেত। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, مِنْ অব্যয়টি এখানে বর্ণনার জন্য এসেছে বিভাজনের জন্য নয়। তাই বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হিসেবে তিন দিরহাম আদায় করা স্ত্রীর উপর লাযিম হবে।

وَاِنِ اخْتَلَعَتْ عَلٰى عَبْدٍ لَهَا اٰبِقٍ عَلٰى اَنَّهَا بَرِيْئَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ وَعَلَيْهَا تَسْلِيْمُ عَيْنِهِ اِنْ قَدَرَتْ وَتَسْلِيْمُ قِيْمَتِهِ اِنْ عَجَزَتْ لِاَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ فَيَقْتَضِىْ سَلَامَةَ الْعِوَضِ وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبْطُلُ اِلَّا اَنَّ الْخُلْعَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ وَعَلٰى هٰذَا النِّكَاحُ . وَاِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْاَلْفِ لِاَنَّهَا لَمَّا طَلَبَتِ الثَّلٰثَ بِاَلْفٍ فَقَدْ طَلَبَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِثُلُثِ الْاَلْفِ وَهٰذَا لِاَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ تَصْحَبُ الْاَعْوَاضَ وَالْعِوَضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوَّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لِوُجُوْبِ الْمَالِ .

অনুবাদ : যদি স্ত্রী তার কোনো পলাতক গোলামের বিনিময়ে খোলা' গ্রহণ করে এই শর্তে যে, স্ত্রী ঐ গোলামের জামানত থেকে মুক্ত, তাহলে স্ত্রী জামানতমুক্ত হবে না; বরং সক্ষম হলে স্বয়ং গোলামকে অর্পণ করতে হবে। আর অক্ষম হলে তার মূল্য প্রদান করবে। কেননা, এটা হচ্ছে বিনিময়-চুক্তি। সুতরাং তা বিনিময়টির অর্পণ দাবি করে। আর বিনিময়ের ব্যাপারে দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত হলো ফাসেদ শর্ত। সুতরাং তা বাতিল হবে। তবে খোলা ফাসেদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। বিবাহের ব্যাপারের হুকুমও অনুরূপ। আর যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে, আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান কর। তখন স্বামী যদি তাকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে স্ত্রীকে এক হাজারের তিন ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে। কেননা, এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাবি করার অর্থ হলো, প্রতিটি তালাক এক হাজারের তিন ভাগের এক ভাগের বিনিময়ে দাবি করা। কারণ, [বিনিময়বোধক] 'بَاءٌ' অব্যয়' বদলে প্রদত্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়। আর এ বদল যে বস্তুর বিনিময়ে প্রদত্ত, তার অনুপাতে বিভাজ্য হয়। আর অর্থের বিনিময়ে হওয়ার কারণে এটা বায়েন তালাক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اخْتَلَعَتْ عَلٰى عَبْدٍ لَهَا اٰبِقٍ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে নিজ পলাতক গোলামের বিনিময়ে খোলা' গ্রহণ করল এই শর্তে যে, সে ঐ গোলামের জামানত থেকে মুক্ত। অর্থাৎ এভাবে বলল যে, গোলামটি খুঁজে বের করা এবং স্বামীর হাতে অর্পণ করতে আমার উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি গোলাম আমার হস্তগত হয়, তবে তা তোমাকে অর্পণ করা হবে। আর যদি গোলাম পাওয়া না যায়, তবে অন্য কিছু আমার উপর ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী এমন শর্ত করার পরও জামানতমুক্ত হবে না; বরং গোলাম পাওয়া গেলে স্বয়ং গোলামকে স্বামীর হাতে অর্পণ করতে হবে। আর অক্ষম হলে গোলামের মূল্য স্বামীকে প্রদান করতে হবে।

এর দলিল এই যে, খোলা' একটি বিনিময়-চুক্তি, যা বিনিময়টির অর্পণ দাবি করে। তাই স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্পণের দায়মুক্ত থাকার শর্ত হলো ফাসেদ শর্ত। কেননা, এ শর্ত বিনিময়-চুক্তি যা দাবি করে তার পরিপন্থি। সুতরাং তা বাতিল হবে। আর খোলা' যেহেতু শর্তে ফাসিদের দ্বারা বাতিল হয় না, তাই এ ক্ষেত্রেও হবে না।

খোলা'র চুক্তি যখন ঠিক রইল এবং জামানতমুক্ত হওয়ার শর্ত বাতিল হলো অতএব, উল্লেখকৃত গোলাম স্বামীকে অর্পণ করা স্ত্রীর উপর লাযিম হবে। আর যদি তা অর্পণ করতে অক্ষম হয়, তবে তার মূল্য ওয়াজিব হবে।

বিবাহের ব্যাপারের হুকুমেও অনুরূপ ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, স্বামী যদি তার পলাতক গোলামকে মহর সাব্যস্ত করে বিবাহ করে এবং গোলামকে অর্পণের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করে, তাহলে দায়িত্বমুক্ত হবে না; বরং সম্ভব হলে গোলাম নয়তো তার মূল্য অর্পণ করতে হবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ الخ : মাসআলাটি এমন যে, স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান কর। স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করল, তবে স্ত্রীর উপর একটি বায়েন তালাক পতিত হবে। আর স্ত্রীর উপর এক হাজারের তিন ভাগের এক ভাগ লাযিম হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও তা-ই বলেন।

দলিল এই যে, স্ত্রী যখন এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক চাইল, তবে সে যেন প্রতিটি তালাক এক হাজারের তিন ভাগের এক ভাগের বিনিময়ে চাইল। কারণ, بَاءٌ অব্যয়টি বদলে প্রদত্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়। আর এ বদল যে বস্তুর বিনিময়ে প্রদত্ত, তার অনুপাতে বিভাজ্য হয়। তাই এক হাজার তিন তালাকের উপর বিভক্ত হবে। আর এটি বায়েন তালাক এজন্য হবে যে, এটি অর্থের বিনিময়ে তালাক। আর অর্থের বিনিময়ে বায়েন তালাকই হয়ে থাকে।

وَاِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَئَ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقَالَا هِىَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِثُلُثِ الْاَلْفِ لِاَنَّ كَلِمَةَ عَلٰى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِى الْمُعَاوَضَاتِ حَتّٰى اَنَّ قَوْلَهُمْ اِحْمِلْ هٰذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ اَوْ عَلٰى دِرْهَمٍ سَوَاءٌ وَلَهُ اَنَّ كَلِمَةَ عَلٰى لِلشَّرْطِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَمَنْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَنْ تَدْخُلِىْ الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَهٰذَا لِاَنَّهُ لِلُّزُوْمِ حَقِيْقَةً وَاسْتُعِيْرَ لِلشَّرْطِ لِاَنَّهُ يُلَازِمُ الْجَزَاءَ وَاِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ فَالْمَشْرُوْطُ لَا يَتَوَزَّعُ عَلٰى اَجْزَاءِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبَاءِ لِاَنَّهُ لِلْعِوَضِ عَلٰى مَا مَرَّ وَاِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ كَانَ مُبْتَدَأً فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

অনুবাদ : আর যদি স্ত্রী বলে, এক হাজারের শর্তে আমাকে তিন তালাক প্রদান কর তখন স্বামী যদি তাকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, স্ত্রীর উপর কোনো কিছুই লাযিম হবে না এবং স্বামী রাজ'আতের অধিকারী হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, এক হাজারের তিন ভাগের এক ভাগের বিনিময়ে তার উপর বায়েন তালাক পতিত হবে। কেননা, লেনদেনের ব্যাপারে [শর্তবোধক] অব্যয় عَلٰى [বিনিময়বোধক] بَاءٌ অব্যয়ের স্থলবর্তী। তাইতো লোকদের এ উক্তি– "তুমি এ খাদ্য-বোঝা এক দিরহামের বিনিময়ে অথবা [বলে] এক দিরহামের শর্তে বহন কর" উভয়টি সমান হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো عَلٰى অব্যয়টি শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا এমনি কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ এখানে শর্তের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। আর তা এজন্য যে, عَلٰى অব্যয়টি প্রকৃতপক্ষে লাযিম হওয়ার জন্য। আর তা শর্তের অর্থে গৃহীত হয়। কেননা, শর্তের সাথে جَزَاءٌ লাযিম হয়ে থাকে আর যখন এ অব্যয়টি শর্তের জন্য সাব্যস্ত সুতরাং শর্তের অংশবিশেষের উপর শর্তযুক্ত বিষয় বিভাজ্য হবে না। بَاءٌ অব্যয়ের হুকুম এর বিপরীত। কেননা, তা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যখন মাল ওয়াজিব হলো না তখন তালাকটি স্বতন্ত্র তালাক হবে। এজন্য স্বামী রাজ'আতের অধিকারী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ الخ : মাসআলাটি এ রকম যে, যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে– طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ [এক হাজারের শর্তে আমাকে তিন তালাক প্রদান কর], আর স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্ত্রীর উপর এক রাজ'ঈ তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর কোনো কিছুই লাযিম হবে না। ইমাম আহমদ (র.)-ও এ কথা বলেন। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে তার উপর বায়েন তালাক হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এরও এই অভিমত।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মালের বিনিময়ে তালাক স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিনিময়-চুক্তি। আর সকল বিনিময়ের [লেনদেন] ব্যাপারে শর্তবোধক অব্যয় عَلٰى বিনিময়বোধক بَاءْ অব্যয়ের স্থলবর্তী। অর্থাৎ, লেনদেনের চুক্তিতে আরবিতে عَلٰى ও بَاءْ অব্যয় দুটির একই হুকুম। অতএব, স্ত্রী طَلِّقْنِيْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ [আমাকে হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাও] বললে স্বামী যদি এক তালাক দেয়, সে ক্ষেত্রে যেমনিভাবে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে একটি বায়েন তালাক পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে طَلِّقْنِيْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ [আমাকে এক হাজারের শর্তে তিন তালাক দাও] বললে স্বামী এক তালাক দিলে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে একটি বায়েন তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, এখানে عَلٰى অব্যয়টি শর্তের অর্থে ব্যবহৃত। তিনি বলেন, عَلٰى মূলত কোনো কিছুর উপর বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ [যায়েদ ছাদের উপর]। যে ক্ষেত্রে উপরের অর্থ নেওয়া অসম্ভব হয়, সেখানে লাযিম হওয়ার অর্থ হবে। আর যেখানে লাযিম হওয়ার অর্থও অসম্ভব হয় সেখানে শর্তের জন্য গৃহীত হয়। কেননা, শর্ত ও লাযিমের মাঝে মিল আছে। তা এভাবে যে, যেমনিভাবে লাযিম ও মালযূম [যার জন্য লাযিম] -এর মাঝে আবশ্যকীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তেমনিভাবে শর্ত ও جَزَاءْ -এর মাঝে আবশ্যকীয়তার সম্পর্ক আছে। কেননা, শর্তের সাথে جَزَاءْ লাযিম হয়ে থাকে। তাছাড়া কারো মতে عَلٰى অব্যয়টি শর্তের অর্থে حَقِيْقَتْ [প্রকৃত] যেমন হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন- لِلشَّرْطِ اِنَّ كَلِمَةَ عَلٰى [عَلٰى অব্যয়টি শর্তের জন্য] عِنَايَةْ প্রণেতার মতে, 'শর্ত' عَلٰى অব্যয়ের রূপক অর্থ। মোদ্দাকথা, এখানে عَلٰى অব্যয়টি শর্তের জন্য ব্যবহৃত- প্রকৃত অর্থে হোক বা রূপক অর্থে হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا -এর মধ্যে عَدَمُ اِشْرَاكْ [আল্লাহর সাথে শরিক না করা] بَيْعَتْ [বাইআত] -এর শর্ত এবং اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَنْ تَدْخُلِيْ الدَّارَ -এর মধ্যে ঘরে প্রবেশ তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত। অতএব, عَلٰى اَلْفٍ -এর মধ্যে عَلٰى অব্যয়টি শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণিত হলো। আর শর্তের অংশবিশেষের উপর শর্তযুক্ত বিষয় বিভাজ্য হয় না। এর কারণ, শর্তযুক্ত বিষয় পাওয়া যায় শর্ত পাওয়া গেলে। এমন নয় যে, শর্তের অংশবিশেষ পাওয়া গেলেই শর্তযুক্ত বিষয়েরও অংশবিশেষ পাওয়া যাবে। অথচ بَاءْ অব্যয়টি এর বিপরীত। এটি ব্যবহৃত হয় বিনিময়ের অর্থে এবং বদলে প্রদত্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়। আর এ বদল যে বস্তুর বিনিময়ে প্রদত্ত, তার অনুপাতে বিভাজ্য হয়।

উল্লিখিত মাসআলায় অর্থাৎ, স্ত্রীর দাবি طَلِّقْنِيْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ -এর জবাবে স্বামীর এক তালাক দেওয়ার কারণে যখন স্ত্রীর উপর কিছুই ওয়াজিব হলো না, তখন স্বামীর প্রদত্ত তালাকটিও ঐ তালাক গণ্য হবে না, যেটি স্ত্রী দাবি করেছিল; বরং তা স্বতন্ত্র তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর স্বামী স্পষ্ট তালাক শব্দ ব্যবহার করেছে, বিধায় একটি রাজ'ঈ তালাক পতিত হবে।

وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِاَنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِالْبَيْنُوْنَةِ اِلَّا لِيَسْلَمَ الْاَلْفُ كُلُّهَا بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِيْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ لِاَنَّهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْبَيْنُوْنَةِ بِاَلْفٍ كَانَتْ بِبَعْضِهَا اَرْضٰى وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ وَعَلَيْهَا الْاَلْفُ وَهُوَ كَقَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ بِاَلْفٍ وَلَابُدَّ مِنَ الْقَبُوْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِاَنَّ مَعْنٰى قَوْلِهٖ بِاَلْفٍ بِعِوَضِ اَلْفٍ يَجِبُ لِيْ عَلَيْكِ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى شَرْطِ اَلْفٍ يَكُوْنُ لِيْ عَلَيْكِ وَالْعِوَضُ لَا يَجِبُ بِدُوْنِ قَبُوْلِهٖ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُوْدِهٖ وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لِمَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : আর যদি স্বামী বলে, এক হাজারের বিনিময়ে কিংবা এক হাজারের শর্তে নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর। আর স্ত্রী এক তালাক প্রদান করে, তাহলে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, স্বামী তার জন্য পূর্ণ এক হাজার নিশ্চিত হওয়া ছাড়া বিচ্ছেদের ব্যাপারে সম্মত নয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রার্থনা করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে যখন এক হাজারের বিনিময়ে বিচ্ছেদ গ্রহণে সম্মত হয়েছে, তখন তার অংশবিশেষের বিনিময়ে অধিকতর সম্মত হবে। স্বামী যদি বলে, তুমি এক হাজারের শর্তে তালাক, আর স্ত্রী তা গ্রহণ করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর এক হাজার আদায় করা লাযিম হবে। এটা 'তুমি এক হাজারের বিনিময়ে তালাক' এই বক্তব্যের সমার্থক। উভয় বক্তব্যের ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্মতি প্রকাশ আবশ্যক। কেননা, প্রথমত, সম্মতি ছাড়া বিনিময় বাধ্যতামূলক হয় না। দ্বিতীয়ত, এক হাজারের দায়িত্ব গ্রহণ হচ্ছে শর্ত। আর শর্তের অস্তিত্ব ছাড়া সর্তায়িত বিষয় সাব্যস্ত হয় না। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে এটা বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا الخ : উল্লিখিত মাসআলাটি এমন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– طَلِّقِيْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ [তুমি নিজেকে এক হাজারের বিনিময়ে কিংবা এক হাজারের শর্তে তিন তালাক প্রদান কর], তখন স্ত্রী নিজেকে এক তালাক দিল, তাহলে কোনো তালাক সাব্যস্ত হবে না। এর দলিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় বায়েন তালাক দিতে সম্মত হয়েছে যখন সে স্ত্রী থেকে এক হাজার টাকা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। এটাই একথা প্রমাণ করে যে, সে এক হাজারের কমে তার অধিকার হস্তচ্যুত করতে রাজি নয়। এর বিপরীত স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে– طَلِّقْنِيْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ [আমাকে হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক দাও], আর স্বামী তাকে এক তালাক দেয়, তবে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এক বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে যখন এক হাজারের বিনিময়ে বায়েন তালাক গ্রহণে সম্মত হয়েছে, তখন সে এর অংশবিশেষের বিনিময়ে অধিকতর সম্মত হবে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ الخ : বলা হচ্ছে যে, স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ এটি اَنْتِ طَالِقٌ بِاَلْفٍ -এর সমার্থক। অর্থাৎ, তালাক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্মতি প্রকাশ আবশ্যক। অতএব, স্ত্রী যদি মজলিসে প্রস্তাব কবুল করে, তবে একটি বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে। মাসআলা দুটি একই রকম এভাবে যে, بِاَلْفٍ -এর অর্থ হচ্ছে, ঐ এক হাজারের বিনিময়ে তুমি তালাক, যা তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া শর্ত। মোদ্দাকথা, পূর্বের বক্তব্য بِاَلْفٍ -এর মধ্যে এক হাজার হলো তালাকের বিনিময়, আর শেষোক্ত বক্তব্য عَلٰى اَلْفٍ -এর মধ্যে এক হাজার হলো তালাকের শর্ত। যে জিনিসকে কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তা শর্তের অস্তিত্ব ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। অতএব, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজ দায়িত্বে এক হাজার গ্রহণ করলে তালাক সাব্যস্ত হবে। তবে হ্যাঁ, প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উভয় মাসআলায় বায়েন তালাক সাব্যস্ত হবে। এর দলিল অধ্যায়ের শুরু অংশে উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ اَلْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ [খোলা' হলো বায়েন তালাক] এই হাদীস।

আর عَقْلِيْ [যুক্তি-নির্ভর] দলিল হলো, স্ত্রী তখনই অর্থ প্রদানে সম্মত হবে যখন তাকে আত্ম-অধিকার পুরোপুরি দেওয়া হবে, যা বায়েন তালাকের মাধ্যমে হয়; রাজ'ঈ তালাকের মাধ্যমে নয়।

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ اَلْفٌ فَقَبِلَتْ اَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ اَلْفٌ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَكَذَا اِذَا لَمْ يَقْبَلَا وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْاَلْفُ اِذَا قَبِلَ وَاِذَا لَمْ يَقْبَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ لَهُمَا اَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ يَسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَاِنَّ قَوْلَهُمْ اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْهَمٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِدِرْهَمٍ وَلَهُ اَنَّهُ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبْلَهُ اِلَّا بِدَلَالَةٍ اِذِ الْاَصْلُ فِيْهَا الْاِسْتِقْلَالُ وَلَا دَلَالَةَ لِاَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتَاقَ يَنْفَكَّانِ عَنِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ لِاَنَّهُمَا لَا يُوْجَدَانِ دُوْنَهُ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক [আর] তোমার উপর এক হাজার। আর সে সম্মত হলো। কিংবা মনিব তার গোলামকে বলল, তুমি আজাদ [আর] তোমার উপর এক হাজার। আর গোলাম এ প্রস্তাব কবুল করল, তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তাদের উভয়ের উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ তারা সম্মত না হলেও একই হুকুম হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয়ের প্রত্যেকের উপর উল্লিখিত এক হাজার আদায় করা লাযিম হবে, যদি তারা সম্মত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা সম্মত না হলে তালাক ও আজাদী সাব্যস্ত হবে না। সাহেবাইনের দলিল এই যে, এ ধরনের বাক্য বিনিময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– এ বোঝাটা বহন করে নাও, তোমার জন্য এক দিরহাম– এ কথাটি এক দিরহামের বিনিময়ের সমতুল্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, [তুমি এক হাজার দিবে কিংবা তোমাকে এক হাজার দিতে হবে] এ ধরনের বাক্যগুলো পূর্ণাঙ্গ বাক্য। সুতরাং উপযুক্ত কারণ ছাড়া এটা পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে না। কেননা, স্বতন্ত্রই হলো এ বাক্যের মৌলিক প্রকৃতি। আর এখানে [সম্পৃক্তির] উপযুক্ত কোনো কারণ নেই। কেননা, 'অর্থ ও বিনিময়' -এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও তালাক এবং আজাদ হয়ে থাকে। বিক্রি ও ভাড়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিনিময় ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ الخ : উল্লিখিত মাসআলাটি এ রকম যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ اَلْفٌ [তোমাকে তালাক [আর] তোমার উপর এক হাজার]। আর স্ত্রী সম্মত হলো। কিংবা মনিব তার গোলামকে বলল– اَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَيْكَ اَلْفٌ [তুমি আজাদ [আর] তোমার উপর এক হাজার]। তখন গোলাম সম্মত হলো। তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্ত্রী কিংবা গোলাম উভয়ের কারো উপর কোনো কিছু ওয়াজিবও হবে না। একই হুকুম তারা হাজার টাকা দিতে সম্মত না হলেও। এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের মত হলো, [স্ত্রী এবং গোলাম] যদি সম্মত হয়, তবে উভয়ের প্রত্যেকের উপর উল্লিখিত এক হাজার আদায় করা লাযিম হবে। আর যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তালাকও হবে না আজাদও হবে না।

সারকথা, এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমত, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, স্ত্রী এবং গোলাম যদি বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবুও তারা এমনিতেই [বিনিময় ছাড়া] তালাক এবং আজাদ হয়ে যাবে। দায়িত্ব গ্রহণ করা ধর্তব্য হবে না। সাহেবাইনের মতে, স্ত্রী এবং গোলামের উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী এবং গোলাম বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও তাদের উপর তালাক ও আজাদী সাব্যস্ত হবে এবং সাহেবাইনের মতে, তারা বিনিময় প্রদানে সম্মত না হলে তালাকও হবে না, আজাদও হবে না।

সাহেবাইনের দলিল হলো, عَلَيْكَ اَلْفٌ কথাটি বিনিময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব, اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْهَمٌ [তুমি এ বোঝাটা বহন করে নাও, তোমার জন্য এক দিরহাম] এবং اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ بِدِرْهَمٍ [এ বোঝাটা তুমি এক দিরহামের বিনিময়ে বহন কর] বাক্য দু'টি সমার্থবোধক। অতএব, খোলা' যেহেতু বিনিময় চুক্তি, তাই وَعَلَيْكَ اَلْفٌ -এর "وَاوْ" অব্যয়টি "بَاءْ" [বিনিময়] অব্যয়ের স্থলবর্তী হবে। যেন স্বামী তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ بِاَلْفٍ বলল, যার হুকুম হলো, স্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করলে তালাক পতিত হয় এবং স্ত্রীর উপর বিনিময় ওয়াজিব হয়। আর যদি স্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে তালাক পতিত হয় না এবং স্ত্রীর উপরও বিনিময় লাযিম হয় না। আলোচ্য মাসআলায়ও একই হুকুম।

সাহেবাইনের দলিলের এ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে যে, স্বামীর উক্তি وَعَلَيْكَ اَلْفٌ -এর "وَاوْ" অব্যয়টি পূর্ববর্তী বাক্যের "حَالْ" [অবস্থা] বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন স্বামী বলল– اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ حَالٍ يَجِبُ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفٌ [তুমি ঐ অবস্থায় তালাক যখন তুমি আমাকে এক হাজার দেবে] ব্যাকরণবিদদের মতে حَالْ [অবস্থা বর্ণনার শব্দ] শর্ত -এর স্থলবর্তী হয়। তাই اَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ اَلْفٌ -এর অর্থ হবে اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى شَرْطِ اَلْفٍ [তুমি এক হাজারের শর্তে তালাক]। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাল শর্ত করতে স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন। তাই স্ত্রী সম্মত হলে তালাক সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর মাল ওয়াজিব হবে; তা না হলে নয়। [অর্থাৎ, তালাকও সাব্যস্ত হবে না এবং স্ত্রীর উপর মালও ওয়াজিব হবে না]।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, আরবিতে عَلَيْكَ اَلْفٌ বাক্যটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে পূর্ণ বাক্য। তাই উপযুক্ত কারণ ছাড়া এটা পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কেননা, স্বতন্ত্রই হলো পূর্ণাঙ্গ বাক্যের মৌলিক প্রকৃতি। আর এখানে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে তার সম্পৃক্তির উপযুক্ত কোনো কারণ নেই। কেননা, 'অর্থ ও বিনিময়' -এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও তালাক ও আজাদ হয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়; বরং এ দুটি ক্ষেত্রে ভদ্রজনেরা বিনিময় গ্রহণ করেন না। এটাই তাদের রীতি।

বিক্রয় ও ভাড়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, এ দুটি কেবলই বিনিময়-চুক্তি। এ আলোচনার দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, اَنْتِ طَالِقٌ বাক্যটির সাথে عَلَيْكَ اَلْفٌ -এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى اَنِّىْ بِالْخِيَارِ اَوْ عَلٰى اَنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَقَبِلَتْ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ اِذَا كَانَ لِلزَّوْجِ وَهُوَ جَائِزٌ اِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَاِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِى الثَّلٰثِ بَطَلَ وَاِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتْ وَلَزِمَهَا الْاَلْفُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِى الْوَجْهَيْنِ وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا اَلْفُ دِرْهَمٍ لِاَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْاِنْعِقَادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنَ الْاِنْعِقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِاَنَّهٗ فِىْ جَانِبِهٖ يَمِيْنٌ وَمِنْ جَانِبِهَا شَرْطُهَا وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْخُلْعَ فِىْ جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتّٰى يَصِحَّ رُجُوْعُهَا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ اِشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيْهِ اَمَّا فِىْ جَانِبِهٖ يَمِيْنٌ حَتّٰى لَا يَصِحَّ رُجُوْعُهٗ وَيَتَوَقَّفُ عَلٰى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَلَا خِيَارَ فِى الْاَيْمَانِ وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِى الْعِتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِى الطَّلَاقِ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি এক হাজারের শর্তে তালাক, তবে শর্ত এই যে, আমার তিনদিনের এখতিয়ার রয়েছে, কিংবা [বলল] তোমার তিনদিনের এখতিয়ার রয়েছে। আর স্ত্রী তা গ্রহণ করল, তবে স্বামীর এখতিয়ার হলে তা বাতিল হবে। [এবং তালাক সাব্যস্ত হবে] পক্ষান্তরে স্ত্রীর এখতিয়ার হলে তা বৈধ হবে। অতঃপর স্ত্রী যদি তিন দিনের মধ্যে এখতিয়ার প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এখতিয়ার প্রত্যাখ্যান না করে তবে তালাক হয়ে যাবে এবং উল্লিখিত এক হাজার তার উপর লাযিম হবে। এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, [এখতিয়ার যে পক্ষেরই হোক] উভয় অবস্থায় এখতিয়ার বাতিল হবে এবং তালাক সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর উপর এক হাজার দিরহাম লাযিম হবে। কেননা, [শরিয়তের পক্ষ হতে] এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সংঘটিত হওয়ার পর তা রহিত করার জন্য; সংঘটন রোধ করার জন্য নয়। আর এখানে স্বামীর প্রস্তাব এবং স্ত্রীর গ্রহণ এ কার্যদ্বয় উভয় পক্ষ হতেই রহিতযোগ্য নয়। কেননা, স্বামীর পক্ষ থেকে এ হচ্ছে ইয়ামীন। পক্ষান্তরে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ হচ্ছে উক্ত ইয়ামীনের শর্ত। [আর ইয়ামীন ও শর্ত কোনোটাই রহিত হওয়ার যোগ্য নয়]। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলা' হচ্ছে বিক্রয় সমতুল্য। এমন কি স্ত্রীর জন্য তার প্রস্তাব থেকে [স্বামীর গ্রহণের পূর্বে] ফিরে পাওয়া সহীহ রয়েছে। আর তা মজলিসের পরে বহাল থাকে না। সুতরাং 'খোলা'-এর ক্ষেত্রে এখতিয়ার শর্তারোপ বৈধ হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর দিক থেকে এটা হচ্ছে ইয়ামীন। এ কারণেই তা থেকে তার সরে যাওয়া বৈধ নয় এবং মজলিসের পরেও তা বহাল থাকবে। আর ইয়ামীন জাতীয় বক্তব্যে এখতিয়ার থাকে না। আর মুক্তির ক্ষেত্রে দাসের অবস্থা তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ الخ : মাসআলা : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল- اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى اَنِّىْ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ, 'তুমি এক হাজারের শর্তে তালাক, তবে শর্ত এই যে, আমার তিনদিনের এখতিয়ার রয়েছে।' অথবা স্বামী বলল- اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى اَنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ, 'তোমাকে এক হাজারের শর্তে তালাক, তবে শর্ত এই যে, তোমার তিনদিনের এখতিয়ার রয়েছে।' এ কথা শুনে স্ত্রী তা গ্রহণ করে ফেলল, তাহলে স্বামীর এখতিয়ার শর্তের অবস্থায় তা বাতিল হয়ে যাবে। আর এখতিয়ারের শর্ত যদি স্ত্রীর জন্য হয়, তাহলে তা বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী তিনদিনের ভিতরই তালাক গ্রহণ করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তাহলে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। আর পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণ করে অথবা তিনদিনের ভিতর এখতিয়ারকে প্রত্যাখ্যান না করে থাকে, তাহলে তিনদিনের সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার দ্বারা স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যাবে। এসব বিস্তারিত বিধান হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী। কিন্তু সাহেবাইন (র.) বলেন, এ উভয় অবস্থায় এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে- চাই তা স্বামীর জন্য হোক বা স্ত্রীর জন্য। আর তালাক পতিত হবে ও স্ত্রীর উপর এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মাযহাবও তা-ই।

সাহেবাইনের দলিল : তাঁরা বলেন, এখতিয়ারের বিষয়টি মৌলিকভাবে কোনো বস্তু সংঘটিত হওয়ার পর রহিতকরণের জন্য শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; সংঘটিত হওয়াকে রোধ করার জন্য নয়। আর আলোচ্য মাসআলায় সংঘটিত হওয়ার পর রহিত করা সম্ভব নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের প্রস্তাব আর অপর জনের গ্রহণ উভয় পক্ষ থেকে রহিত হওয়া সম্ভব নয়। স্বামীর পক্ষ থেকে রহিতকরণের সম্ভাবনা না থাকার কারণ হলো, খোলা হচ্ছে স্বামীর পক্ষে কসম -এর পর্যায়ে। কারণ, স্বামী শর্ত ও তার প্রতিউত্তরের কথা উল্লেখ করেছে। আর কসম রহিতকরণকে গ্রহণ করে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, স্বামীর পক্ষ থেকে খোলা'টা রহিত হতে পারে না। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে রহিতকরণের সম্ভাবনা না থাকার কারণ হলো, স্ত্রী গ্রহণ করা ইয়ামীনের জন্য শর্ত। আর কসম ও ইয়ামীন যেমন রহিত হতে পারে না, তার শর্তও রহিত হতে পারে না।

মোটকথা, এখতিয়ারকে শরিয়ত অনুমোদন করেছে রহিত করার জন্য। আর খোলা' রহিত হতে পারে না, সুতরাং উভয় অবস্থায় এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, খোলা' হলো স্ত্রীর পক্ষে বিক্রির মতো। কেননা, সে তার স্বামীকে বিনিময় হিসেবে সম্পদের মালিক বানিয়েছে। তাইতো খোলা'র বিষয়কে স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয় এবং ঐ মজলিসের বাইরে তার হুকুমটি বিলম্বিত হয় না। যেমন বেচাকেনার মাঝে প্রত্যাখ্যান করা বিশুদ্ধ এবং মজলিসের বাইরেও বিষয়ের বিধান বিলম্বিত হয় না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, খোলা' স্ত্রীর পক্ষে বিক্রির সমতুল্য। সুতরাং বেচাকেনার মাঝে যেমন এখতিয়ারের শর্তারোপ করা যায় তেমনিভাবে খোলার মাঝেও স্ত্রীর পক্ষে এখতিয়ারের শর্তারোপ করা বিধানসম্মত হবে। কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে খোলা' হলো কসমের মতো। তাই খোলা'র পর স্বামী ইচ্ছা করলেই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আর তার ক্ষেত্রে খোলা'র বিষয় মজলিসের বাইরেও বিলম্বিত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, স্বামীর ক্ষেত্রে খোলা' হলো কসম-ইয়ামীনের মতো। আর কসমের মাঝে শরয়ী দৃষ্টিতে এখতিয়ার থাকে না, বিধায় খোলা'র মাঝে স্বামীর এখতিয়ার থাকবে না।

قَوْلُهُ وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِى الْعِتَاقِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আজাদকরণের ক্ষেত্রে দাসের বিষয়টিও তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতো। অর্থাৎ, মনিব যদি তার দাসকে বলে- اَنْتَ حُرٌّ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى اَنِّىْ بِالْخِيَارِ اَوْ عَلٰى اَنَّكَ بِالْخِيَارِ - 'তুমি এক হাজারের শর্তে আজাদ এই শর্তে যে, আমার অথবা তোমার তিনদিনের এখতিয়ার আছে', আর দাস তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত অনুসারে দাসের জন্য এখতিয়ারের অবস্থায় তা সঠিক হবে। আর মনিবের জন্য এখতিয়ার হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের নিকট উভয় অবস্থায় বাতিল হয়ে যাবে।

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ عَلَى اَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِيْ فَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ اَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِيْنٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْاِقْرَارُ بِهِ لَا يَكُوْنُ اِقْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَّتِهِ بِدُوْنِهِ اَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُّ اِلَّا بِالْقَبُوْلِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ اِقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُّ اِلَّا بِهِ فَاِنْكَارُهُ الْقَبُوْلَ رُجُوْعٌ مِنْهُ .

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, গতকাল তোমাকে এক হাজার দিরহামের শর্তে তালাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রহণ করনি। তখন স্ত্রী বলল, আমি কবুল করেছিলাম, তাহলে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কাউকে বলে, গতকাল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই গোলামটি তোমার নিকট বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রহণ করনি, কিন্তু ক্রেতা বলল, আমি গ্রহণ করেছি, তখন ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। [তালাক ও বিক্রয়ের মাঝে] পার্থক্যের কারণ এই যে, অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদান স্বামীর দিক থেকে ইয়ামীনরূপে বিবেচ্য। সুতরাং পূর্ববর্তী ইয়ামীন স্বীকার করার অর্থ শর্ত বিদ্যমান হওয়ার স্বীকৃতি নয়। কেননা, শর্তের বিদ্যমানতা ছাড়া ইয়ামীন সম্পন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ গ্রহণ ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং বিক্রয় স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, এ জিনিস স্বীকার করে নেওয়া, যা ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং [তুমি গ্রহণ করনি বলে] অপর পক্ষের গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, বিক্রয়ের স্বীকৃতি থেকে সরে আসা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ الخ : **মাসআলা :** স্বামী তার স্ত্রীকে বলল যে, আমি গতকাল তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করনি। আর স্ত্রী বলে যে, আমি গ্রহণ করেছিলাম, তাহলে এ অবস্থায় শপথসহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল যে, গতকাল আমি আমার দাসকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করনি। আর ক্রেতা বলে যে, আমি গ্রহণ করেছিলাম, তাহলে এমতাবস্থায় ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الطَّلَاقَ الخ : উপরিউক্ত দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, সম্পদের বিনিময়ে তালাকটি হলো স্বামীর ক্ষেত্রে কসমের স্তরে। কেননা, স্বামী তালাককে স্ত্রীর সম্পদ গ্রহণের উপর শর্তারোপ করেছে। আর শর্তারোপ করার নামই হলো কসম। আর যে ব্যক্তি কসম করে তার করার দ্বারাই তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে কসমের স্বীকার করাটা শর্ত পাওয়া অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষে সম্পদ কবুল করার স্বীকার করাকে বুঝায় না। কেননা, শর্ত ছাড়াও কসম বিশুদ্ধ হয়ে যায়, বিধায় স্বামীর এ কথা যে, "তুমি তা গ্রহণ করনি" নিজ কথা প্রত্যাখ্যান করাকে বুঝায় না। সুতরাং উক্ত মাসআলায় স্ত্রী তার কথার উপর প্রমাণ পেশ করবে নতুবা স্বামীর কথাই ইয়ামীন-সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে বিক্রির বিষয়টি এমন নয়। কেননা, ক্রেতার গ্রহণ ব্যতীত বিক্রিই অস্তিত্বে আসে না। সুতরাং বিক্রেতা যখন বিক্রি সংঘটিত হওয়ার কথা স্বীকার করল তখন বাহ্যত এমন কথারও স্বীকার করেছে, যা ব্যতীত বিক্রি পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ, ক্রেতার তা গ্রহণ করা। পুনরায় বিক্রেতার বলা যে, "তুমি গ্রহণ করনি" নিজ কথাকে প্রত্যাহার করার নামান্তর, বিধায় বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ كِلَاهُمَا يَسْقُطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَسْقُطُ فِيْهِمَا اِلَّا مَا سَمَّيَاهُ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رح) مَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فِي الْمُبَارَأَةِ لِمُحَمَّدٍ (رح) اَنَّ هٰذِهِ مُعَاوَضَةٌ وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبَرُ الْمَشْرُوْطُ لَا غَيْرُهُ وَلِاَبِيْ يُوْسُفَ (رض) اِنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاِنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوْقِ النِّكَاحِ لِدَلَالَةِ الْغَرَضِ اَمَّا الْخُلْعُ فَمُقْتَضَاهُ الْاِنْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِيْ نَقْضِ النِّكَاحِ وَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَى انْقِطَاعِ الْاَحْكَامِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْخُلْعَ يُنْبِئُ عَنِ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلْعُ النَّعْلِ وَخَلْعُ الْعَمَلِ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَأَةِ فَيُعْمَلُ بِاِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ وَاَحْكَامِهِ وَحُقُوْقِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুবারাত [পরস্পরকে দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান] 'খোলা' -এর সমতুল্য। দুটোই স্বামী-স্ত্রীর একের অপরের বিবাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রাপ্য হক রহিত করে দেয়। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে যে সকল হকের উল্লেখ করবে, শুধু সেগুলোই রহিত হবে। 'খোলা'-এর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সমর্থক। আর দায়দায়িত্ব মুক্তি ঘোষণার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সমর্থক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, খোলা' ও দায়দায়িত্ব মুক্তি দুটোই হচ্ছে পারস্পরিক বিনিময়। আর এ ক্ষেত্রে শুধু নির্ধারিত শর্তগুলোই বিবেচ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল এই যে, পরস্পর দায়মুক্তির শব্দ مُفَاعَلَةٌ -এর مَصْدَرٌ হিসেবে উভয় পক্ষ হতে দায়মুক্তি দাবি করে। আর দায়মুক্তির বিষয়টি আলোচ্য ক্ষেত্রে নিঃশর্ত হলেও উদ্দেশ্যগত প্রমাণের বিচারে আমরা বিবাহ সংশ্লিষ্ট হক দ্বারা দায়মুক্তির বিষয়টিকে আবদ্ধ করেছি। পক্ষান্তরে, 'খোলা'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রত্যাহার। আর তা বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যায়। এতে বিবাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধান রহিত করার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, 'খোলা' শব্দটি [মূলগতভাবে] 'বিচ্ছিন্নকরণ'-এর অর্থ প্রকাশ করে। এই মূলগত অর্থসূত্রেই বলা হয় خَلْعُ النَّعْلِ [জুতা খুলল অর্থাৎ, পা থেকে বিচ্ছিন্ন করল] এবং خَلْعُ الْعَمَلِ [চাকরি থেকে বরখাস্ত করল]। আর যেহেতু মুবারাআর ন্যায় খোলা'ও শর্তমুক্তরূপে উচ্চারিত হয়েছে, সেহেতু উভয়টি শর্তমুক্ত অবস্থায় বিবাহ, তৎসংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ ও হকসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُبَارَاةُ كَالْخُلْعِ كِلَاهُمَا الخ : মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে অন্যকে দায়মুক্ত করে দেওয়াটা খোলা'র ন্যায়। অর্থাৎ মুবারাআত এবং খোলা' এমন বিষয় যা স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক দায়বদ্ধতাকে ছিন্ন করে দেয়। যেমন- মহর এবং বিগত দিনের খোরপোশ। তবে খোলা' ও মুবারাআতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দতকালীন খোরপোশ এবং বাসস্থানের খরচের বিষয়টি রহিত হয় না। কিন্তু স্ত্রী যদি ইদ্দতকালীন খোরপোশের বিনিময়েই খোলা' করে, তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে; বাসস্থান খরচ রহিত হবে না। কারণ, বাসস্থান খরচ হলো শরিয়তের হক। আর শরিয়ত কর্তৃক অধিকার কারো রহিতকরণ দ্বারা রহিত হয় না। এ বিস্তারিত আলোচনা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত অনুসারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খোলা' ও মুবারাআতের দ্বারা ঐ সমস্ত দায়বদ্ধতাই রহিত হবে যা স্বামী-স্ত্রী উল্লেখ করবে। আর যা তারা বলবে না, তা রহিত হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত খোলা'র ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ন্যায়, আর মুবারাআতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমতের ন্যায়। ইমামদের মতের ভিন্নতার ফলাফল ফুটে উঠবে এই দৃষ্টান্তের মাঝে। যেমন- স্ত্রীর মহর ধার্য করা হয়েছে এক হাজার দিরহাম। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমপূর্বেই স্ত্রী তার মহর থেকে একশত দিরহামের বিনিময়ে খোলা' করে ফেলল। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর থেকে অবশিষ্ট দিরহামের কোনো অংকই ফেরত চাইতে পারবে না। কেননা, খোলা' করার কারণে মহর রহিত হয়ে গেছে। আর সাহেবাইনের মতে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে বাকি চারশত দিরহাম গ্রহণ করতে পারবে। যাতে করে সঙ্গমপূর্ব তালাকের কারণে স্ত্রী অর্ধেক মহর উসুলকারী হয়ে যায়। বাকি দুজন যত দিরহামের কথা উল্লেখ করেছে শুধু ততটুকু রহিত হবে অর্থাৎ একশত দিরহাম। আর স্ত্রী যদি এক হাজার দিরহামই গ্রহণ করে ফেলে অতঃপর স্ত্রী একশত দিরহামের উপর খোলা' করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, একশত দিরহাম ব্যতীত আর কিছুই স্বামী ফেরত নিতে পারবে না। আর সাহেবাইনের মতে, স্বামী আরো চারশত দিরহাম স্ত্রী থেকে ফেরত নেবে। যাতে করে অর্ধেক পরিমাণ মহর স্বামীর নিকট চলে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, খোলা' এবং মুবারাআত উভয়টি হলো বিনিময়যোগ্য লেনদেন। আর এ ধরনের লেনদেনে তা-ই আবশ্যক হয়, যা উল্লেখ করা হয়। সুতরাং খোলা' এবং মুবারাআতে তা-ই রহিত হবে, যা স্বামী-স্ত্রী উল্লেখ করবে। যা উল্লেখ করা হয়নি, তা রহিত হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, মুবারাআত শব্দটি بَرَاءَةٌ থেকে নির্গত, যা مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার হিসেবে উভয় পক্ষ হতে দায়মুক্তি দাবি করে। সুতরাং মুবারাআতও স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকে দায়মুক্তিকে বুঝাবে। আর بَرَاءَةٌ শব্দটি ব্যাপক। তাই তা প্রত্যেক বিষয়ের দায়মুক্তিকেই বুঝাবে- চাই তা বিবাহের সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্যের সাথে সম্পর্কিত হোক। কিন্তু আমরা বিধানের ক্ষেত্রে বৈবাহিক বিষয়কেই বুঝিয়েছি তাদের উদ্দেশ্য মোতাবেক। আর তা হচ্ছে, পরস্পর ঝগড়া বন্ধ করা, যা বিবাহের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিবাহের দ্বারা যেসব দায়বদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে সে সব রহিত হয়ে যাবে। আর 'খোলা' -এর ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হলেই তার অর্থ প্রযোজ্য হয়ে যায়; অন্যান্য দায়মুক্তির প্রয়োজন হয় না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, 'খোলা' -এর অর্থ হলো পৃথক করা, আলাদা করা। এ মূলগত অর্থ সূত্রেই বলা হয়- خَلَعَ النَّعْلَ [জুতা খুলল অর্থাৎ পা থেকে ছিন্ন করল], خَلَعَ الْعَمَلَ [চাকরি থেকে বরখাস্ত করল]। আর যেহেতু মুবারাআর ন্যায় খোলা'ও শর্তমুক্তরূপে উচ্চারিত হয়েছে, সেহেতু উভয়টি শর্তমুক্ত অবস্থায় বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এবং হকসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। স্বামী-স্ত্রী তা উল্লেখ করুক বা না করুক।

وَمَنْ خَلَعَ اِبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا لِاَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهَا فِيْهِ اِذِ الْبُضْعُ فِيْ حَالَةِ الْخُرُوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِاَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ الدُّخُوْلِ وَلِهٰذَا يُعْتَبَرُ خُلْعُ الْمَرِيْضَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَنِكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَاِذَا لَمْ يَجُزْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَالَهَا ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيْ رِوَايَةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ لِاَنَّهُ تَعْلِيْقٌ بِشَرْطِ قَبُوْلِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِيْقِ بِسَائِرِ الشُّرُوْطِ .

অনুবাদ : কেউ যদি আপন নাবালিকা কন্যার পক্ষ হতে কন্যার অর্থের বিনিময়ে খোলা' সম্পন্ন করে, তবে তা কন্যার উপর কার্যকর হবে না। কেননা, খোলা'করণে কন্যার কোনো কল্যাণ নেই। কারণ, বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ-অঙ্গ 'মূল্যবান বস্তু' হিসেবে গণ্য নয়। অথচ প্রদত্ত বিনিময়টি হচ্ছে মূল্যবান বস্তু। বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিবাহের অধিকারে প্রবেশের সময় সম্ভোগ-অঙ্গ হচ্ছে মূল্যসম্পন্ন। এ কারণেই স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যায় খোলা' সম্পন্ন করলে সেটা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে মৃত্যুশয্যায় পুরুষ মহরে মিছিলের উপর বিবাহ করলে সেটা তার সমগ্র সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে। যাই হোক, খোলা যখন কার্যকর হলো না তখন মহর রহিত হবে না এবং স্বামী [খোলা' বাবদ উল্লেখকৃত] স্ত্রীর মালের হকদার হবে না। এক বর্ণনা মতে, তালাক পতিত হবে, আরেক বর্ণনা মতে, তালাক পতিত হবে না। তবে প্রথম মতটি বিশুদ্ধ। কেননা, এটা হচ্ছে পিতার সম্মতির শর্তে শর্তায়িত বাধ্য। সুতরাং তা অন্যান্য শর্তে শর্তায়িত বাক্যের পর্যায়ে বিবেচিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ خَلَعَ اِبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ الخ : মাসআলা : পিতা যদি আপন নাবালিকা কন্যার পক্ষ হতে কন্যার অর্থের বিনিময়ে খোলা' সম্পন্ন করে, তবে তা কন্যার উপর কার্যকর হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) বলেন, উক্ত খোলা' কার্যকর হবে। কার্যকর না হওয়ার দলিল হলো, পিতার অধিকার হচ্ছে কল্যাণ ও দয়াসুলভ। আর উক্ত খোলা'-এর মাঝে কন্যার কোনো কল্যাণ নেই। কারণ, বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ-অঙ্গ 'মূল্যবান বস্তু' হিসেবে গণ্য নয়। অথচ প্রদত্ত বিনিময়টি হচ্ছে মূল্যবান বস্তু। আর অমূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে মূল্যবান বস্তু প্রদান করাতে কল্যাণের কোনো দিক নেই।

পক্ষান্তরে বিবাহের বিষয়টি ভিন্ন। তাই কোনো ব্যক্তি যদি নিজ নাবালক ছেলেকে মহরে মিছিলের বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন করায়, তাহলে তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, বিবাহের অধিকারে প্রবেশের সময় সম্ভোগ-অঙ্গ হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং মূল্যবান বস্তুর [সম্ভোগ-অঙ্গ] বিনিময়ে মূল্যবান বস্তু [মহরে মিছিল] প্রদান করা অকল্যাণকর নয়। এই ব্যবধানের কারণেই কোনো

স্ত্রীলোক মৃত্যুশয্যায় খোলা' সম্পন্ন করলে সেটা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, বিচ্ছেদের সময় সম্ভোগ-অঙ্গ মূল্যবান নয়। তা সত্ত্বেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীলোক যা ধার্য করবে তা অনুদান হিসেবে গণ্য করা হবে। [আর এ অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারাই অনুদান করা যায়; এর বেশি দিয়ে নয়]।

পক্ষান্তরে কোনো পুরুষলোক যদি মৃত্যুশয্যায় মহরে মিছিলের বিনিময়ে বিবাহ করে, সেটা তার সমগ্র সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ, তার পরিত্যক্ত সম্পদ যদি মহরে মিছিলের বরাবর হয় তবে পুরাটাই মহর হিসেবে স্ত্রী পেয়ে যাবে। কেননা, তা মূল্যবান বস্তুর বিনিময়েই যাচ্ছে।

মোটকথা, পিতা কর্তৃক সম্পাদিত খোলা' কার্যকর হবে না, বিধায় কন্যার মহরও রহিত হবে না। এখন কথা হলো, এই নাবালিকার উপর তালাক পতিত হবে কিনা? এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, তালাক পতিত হয়ে যাবে, আর অপর বর্ণনা মতে, তালাক পতিত হবে না। বর্ণনার ভিন্নতার কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর কথা لَمْ يَجُزْ টি। কেননা, এর অর্থ কার্যকর না হওয়াটি তালাকের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে, আবার সম্পদ আবশ্যক হওয়ার সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো, তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর কার্যকর না হওয়ার অর্থ হলো, তার বিনিময় কার্যকর না হওয়া।

এর প্রমাণ হলো, স্বামীর তালাক প্রদান করাটা স্ত্রীর পিতার গ্রহণ করার উপর শর্তযুক্ত। সুতরাং তাকে অন্য বস্তুর সাথে শর্তযুক্ত করার উপর কিয়াস করা হবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলল– যদি খালিদ ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে তুমি তালাক। সুতরাং এ হিসেবে খালিদ প্রবেশ করলেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এমনিভাবে এখানেও স্বামী তালাক পতিত হওয়াকে স্ত্রীর পিতার গ্রহণের উপর শর্তারোপ করেছে। অর্থাৎ, তোমার পিতা গ্রহণ করলে তোমার উপর তালাক। আর পিতাও তা গ্রহণ করেছে, বিধায় তালাক পতিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, 'খোলা' ইয়ামীনের মতো। আর ইয়ামীনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চলে না। এমতাবস্থায় নাবালিকার পিতার পক্ষ থেকে যদি খোলা' সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে প্রতিনিধি কর্তৃক তা সম্পাদিত হয়, আর তা সঠিক নয়। সুতরাং তালাক পতিত হবে না। তবে উক্ত দলিলের উত্তর এই যে, পিতার পক্ষ থেকে ইয়ামীনের শর্ত পাওয়া গেছে; মূল ইয়ামীন পাওয়া যায়নি। আর ইয়ামীনের শর্ত যে-কোনো ব্যক্তি থেকে হতে পারে।

وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ صَحِيحٌ فَعَلَى الْأَبِ أَوْلَى وَلَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ . وَإِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْغَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ . وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَلَمْ يَضْمَنِ الْأَبُ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ قَبِلَتْ طُلِّقَتْ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ .

অনুবাদ : আর যদি পিতা কন্যার পক্ষে এক হাজারের শর্তে খোলা' করে এই শর্তে যে, পিতা উল্লিখিত অর্থ নিজে আদায় করবে, তাহলে খোলা' সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত এক হাজার পরিশোধ করার দায় পিতার উপর বর্তাবে। কেননা, খোলা'র বিনিময় অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ধার্য করা বৈধ রয়েছে। সুতরাং পিতার উপর ধার্য করা অধিকতর বৈধ হবে। আর স্ত্রীর মহর রহিত হবে না। কেননা, মহর পিতার কর্তৃত্বাধীন নয়। আর যদি স্বামী এক হাজার দিরহামের শর্ত নাবালিকা স্ত্রীর উপর আরোপ করে, আর যদি সে গ্রহণ করার [আইনগত] যোগ্যতার অধিকারিণী হয়, তাহলে সেটা তার গ্রহণ করার উপর নির্ভরশীল হবে। যদি সে গ্রহণ করে, তাহলে তালাক সাব্যস্ত হবে। কেননা, শর্ত অস্তিত্ব লাভ করেছে। তবে অর্থ আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, নাবালিকা [শরিয়তের দৃষ্টিতে] অর্থদণ্ড গ্রহণের যোগ্য নয়। আর যদি পিতা তার পক্ষ থেকে উক্ত দায় গ্রহণ করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তদ্রূপ যদি স্বামী তার স্ত্রীর মহরের অর্থের বিনিময়ে তার সাথে খোলা' করে, আর পিতা মোহরানার দায় গ্রহণ না করে, তাহলে উক্ত নাবালিকা স্ত্রীর গ্রহণের উপর তা নির্ভরশীল হবে। যদি সে গ্রহণ করে, তাহলে তালাক পতিত হবে, কিন্তু মোহরানা রহিত হবে না। আর যদি পিতা তার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, তাহলে এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত দুটি বর্ণনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ الخ : মাসআলা : পিতা যদি তার নাবালিকা কন্যার স্বামীর সাথে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খোলা' করে এই শর্তে যে, সে তা পরিশোধ করবে। তাহলে এ অবস্থায় খোলা' কার্যকর হবে এবং পিতার উপর এক হাজার আবশ্যক হবে। এর প্রমাণ হলো, অপরিচিত ব্যক্তির উপর খোলা'র বিনিময়কে শর্তারোপ বৈধ রয়েছে সুতরাং পিতার উপর শর্তারোপ করাটা স্বাভাবিকভাবেই বৈধ হবে।

ইনায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, পিতা তার শিশু সন্তানের সম্পদে লেনদেন করতে পারে। বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া, আমানত রাখা ইত্যাদি কাজ করতে পারে। অথচ অপরিচিত ব্যক্তির জন্য উক্ত কাজগুলো করা বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও অপরিচিত ব্যক্তি যখন নিজের উপর খোলা'র বিনিময় পরিশোধ আবশ্যক করতে পারে, তাহলে পিতা তো স্বাভাবিকভাবেই তা আবশ্যক করতে পারবে। তাছাড়া খোলা'র মাঝে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় অপরিচিত ব্যক্তির দয়া অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সে নিজের উপর খোলা'র বিনিময়কে আবশ্যক করে নিতে পারে, তাহলে পরিপূর্ণ দয়ার পাত্র পিতা তো তা স্বাভাবিকভাবেই পারবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, নাবালিকার মহর রহিত হবে না। যদিও স্বাভাবিকভাবে খোলা' মহরকে রহিত করে দেয়। কারণ, মহর পিতার অধীনের আওতাধীন নয়। কেননা, মহর রহিতকরণে কন্যার কোনো কল্যাণ থাকে না। অথচ পিতাকে অভিভাবক বানানোই হয়েছে কল্যাণ কামনার জন্য।

قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি 'খোলা' -এর বিনিময় এক হাজার দিরহাম তার নাবালিকা স্ত্রীর উপর শর্তারোপ করে, তাহলে খোলা' কার্যকর হতে স্ত্রীর সম্মতি লাগবে। তবে স্ত্রীও এমন হতে হবে যে, আইনগত খোলা' কবুল করতে সক্ষম অর্থাৎ, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্না হয়। অর্থাৎ, সে বিবাহের মর্ম বুঝে, খোলা'র দ্বারা বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, এর বিনিময়ে সম্পদ, টাকা-পয়সা স্বামীকে দিতে হবে ইত্যাদি সব বুঝে। ইত্যাকার শর্তসাপেক্ষে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রস্তাবকে গ্রহণ করে, তাহলে তালাক পতিত হবে। কেননা, শর্ত পাওয়া গেছে। তবে স্ত্রীর উপর উক্ত খোলার বিনিময় আবশ্যক হবে না। কেননা, নাবালিকা নিজের উপর কোনো জরিমানাকে লাযিম করার আইনগত ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি তার পিতা উক্ত প্রস্তাবকে কবুল করে নেয়, তাহলে তা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় কবুল করা বিশুদ্ধ। আর অপর বর্ণনা মোতাবেক কবুল করা সহীহ নয়।

প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, উক্ত কবুল করাটা নাবালিকার জন্য উপকার বৈ কিছু নয়। কেননা, মালের বিনিময় ছাড়াই স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা যেন উপঢৌকন গ্রহণ করার মতো হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় বর্ণনার যুক্তি হলো, পিতার গ্রহণ করাটা ইয়ামীনের শর্তের ন্যায়। আর তাতে প্রতিনিধিত্ব চলে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার নাবালিকা স্ত্রীকে মহরের বিনিময়ে খোলা' করার প্রস্তাব দেয়, আর পিতা মোহরানার দায় গ্রহণ না করে থাকে, তাহলেও ঐ স্ত্রীর গ্রহণের উপর তা নির্ভরশীল হবে। যদি সে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তালাক পতিত হবে। কারণ, শর্ত পাওয়া গেছে। আর নাবালিকা যেহেতু অর্থদণ্ড গ্রহণের যোগ্যতা রাখে না, তাই মহর রহিত হবে না। আর নাবালিকার পক্ষ থেকে যদি পিতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে. এক বর্ণনা মতে বিশুদ্ধ হবে, আর অপর বর্ণনা মতে বিশুদ্ধ হবে না। দুটির কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاِنْ ضَمِنَ الْاَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ اَلْفُ دِرْهَمٍ طَلُقَتْ لِوُجُوْدِ قَبُوْلِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اِسْتِحْسَانًا وَفِى الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْاَلْفُ وَاَصْلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ اِذَا اخْتَلَعَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ عَلٰى اَلْفٍ وَمَهْرُهَا اَلْفٌ فَفِى الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُ مِائَةٍ زَائِدَةٍ وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ لَا شَئَ عَلَيْهَا لِاَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةً حَاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا .

অনুবাদ : আর যদি পিতা মোহরানার অর্থ আদায়ে দায় গ্রহণ করে আর [উদাহরণস্বরূপ] তার পরিমাণ হলো এক হাজার দিরহাম, তাহলে তালাক পতিত হবে। কেননা, পিতার পক্ষ হতে গ্রহণ পাওয়া গেছে, আর সেটাই ছিল শর্ত। আর পিতার উপর পাঁচশত দিরহাম সাব্যস্ত হবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দৃষ্টিতে এক হাজার লাযিম হয়। আলোচ্য মাসআলার মূল উৎস হচ্ছে, সাবালিকা স্ত্রী সহবাস-পূর্ব অবস্থায় এক হাজার দিরহামের শর্তে খোলা' করেছে। আর তার মোহরানা ছিল এক হাজার। এ অবস্থায় সাধারণ কিয়াসের দাবি মতে, স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত পাঁচশ দিরহাম অবশ্য ধার্য হবে। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর কোনো কিছু লাযিম হবে না। কেননা, [মোহরানা বিনিময়ে সাব্যস্ত] খোলা' দ্বারা সাধারণত ঐ পরিমাণ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা স্ত্রীর অনুকূলে লাযিম হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ ضَمِنَ الْاَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ اَلْفُ دِرْهَمٍ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার নাবালিকা স্ত্রীকে তার মহর পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে খোলা' করার প্রস্তাব দেয়, আর তার পিতা মহরানার দায় বহনকারী হয়, আর মহর হলো এক হাজার দিরহাম। তাহলে নাবালিকার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা, পিতার কবুল করা শর্ত ছিল, আর এখানে তা পাওয়া গেছে। নাবালিকার পিতার উপর পাঁচশত দিরহাম লাযিম হবে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে। তার প্রমাণ হলো, উক্ত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, নাবালিকা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়নি, আর মহর হলো এক হাজার দিরহাম এবং খোলা'কে মহরের দিকেই সম্পর্কিত করা হয়েছে, আর তা হলো বিবাহের কারণে যা তার জন্য আবশ্যক হয়েছে। আর মাসআলা হলো সঙ্গম-পূর্ব তালাক দ্বারা অর্ধেক মহর আবশ্যক হয়, আর এ মাসআলায় তার পরিমাণ হলো পাঁচশত দিরহাম। তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে খোলা' করেছে, সুতরাং তার পিতার উপর পাঁচশত দিরহামই আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَاَصْلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ اِذَا اخْتَلَعَتْ الخ : এ মাসআলার মূলভিত্তি হলো, সাবালিকা স্ত্রীর বিষয়। অর্থাৎ, সাবালিকা স্ত্রী যদি সঙ্গমের পূর্বে তার স্বামীর সাথে এক হাজারের বিনিময়ে খোলা' করে আর তার মহরও এক হাজার দিরহামই হয়, এমতাবস্থায় স্ত্রী মহর গ্রহণ করার পূর্বেই উক্ত খোলা' হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো স্বামীকে পাঁচশত দিরহাম হস্তান্তর করা। কেননা, সঙ্গম-পূর্ব তালাকের কারণে স্বামীর দায়িত্ব থেকে পাঁচশত দিরহাম রহিত হয়ে গেছে, অথচ স্ত্রী নিজের উপর এক হাজার আবশ্যক করে নিয়েছে। সেই এক হাজার থেকে অর্ধেক মহর হিসেবে পাঁচশত দিরহাম আদায় হয়েছে, আর বাকি পাঁচশত নগদ তার স্বামীকে দিতে হবে, তাহলেই স্বামী তার ওয়াদাকৃত এক হাজার দিরহাম পাচ্ছে বলে বিবেচিত হবে। এটি হলো যুক্তির কথা।

قَوْلُهُ وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ لَا شَئَ عَلَيْهَا الخ : কিন্তু ইস্তিহসান বলে, স্ত্রীর উপর নগদ দিরহাম দেওয়া আবশ্যক হবে না। কেননা, খোলা' করার সময় মহরের বিনিময়ে স্বামী রাজি হওয়ার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো দায়বদ্ধপূর্ণ মহর থেকে সে মুক্ত হওয়া। আর উক্ত অবস্থায় তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এ কারণে স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত কিছু আবশ্যক হবে না।

بَابُ الظِّهَارِ

وَاِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا وَلَا مَسُّهَا وَلَا تَقْبِيْلُهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ اِلٰى اَنْ قَالَ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا وَالظِّهَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرْعُ اَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ اِلٰى تَحْرِيْمٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيْلٍ لِلنِّكَاحِ وَهٰذَا لِاَنَّهُ جِنَايَةٌ لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعُهَا بِالْكَفَّارَةِ ثُمَّ الْوَطْىُ اِذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِيْهِ كَيْلَا يَقَعَ فِيْهِ كَمَا فِي الْاِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ لِاَنَّهُ يَكْثُرُ وُجُوْدُهُمَا فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِيْ يُفْضِيْ اِلَى الْحَرَجِ وَلَا كَذٰلِكَ الظِّهَارُ وَالْاِحْرَامُ.

যিহার পরিচ্ছেদ

অনুবাদ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, তাহলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে সহবাস, তাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা হালাল হবে না, যতক্ষণ যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا - "যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, অতঃপর যা বলেছে তা সংশোধন করতে চায়, তাহলে পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করা কর্তব্য।" [সূরা মুজাদালা : ২৮ পারা] জাহেলিয়াতের যুগে যিহার তালাকরূপে প্রচলিত ছিল। শরিয়ত এর মূল বিষয়টিকে বহাল রেখেছে, তবে এর হুকুম বিবাহ বিলুপ্ত সাব্যস্ত না করে কাফ্ফারার সময়সীমা পর্যন্ত হারাম হওয়া দ্বারা পরিবর্তন করেছে। এর কারণ এই যে, এটি একটি অপরাধ। কেননা, তা ধিকৃত ও মিথ্যা বক্তব্য। সুতরাং এর শাস্তিরূপে সাময়িক হুরমত [হারাম হওয়া] সাব্যস্তকরণ এবং কাফ্ফারার মাধ্যমে তার মোচন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতঃপর সঙ্গম যখন হারাম হবে তখন সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়গুলোসহ হারাম হওয়াই স্বাভাবিক, যাতে সঙ্গমে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। যেমন হুকুম ইহ্রামের ক্ষেত্রে। ঋতুস্রাব ও রোজার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ দুটি সচরাচর ঘটে থাকে। সুতরাং সঙ্গমের অনুষঙ্গগুলোও যদি হারাম করা হয়, তাহলে তা কষ্টকর বিষয়ে পরিণত হবে। আর যিহার ও ইহ্রাম এমন নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে তালাকের দ্বারা বিবাহ যেমন ছিন্ন হয়ে যেত, অনুরূপভাবে যিহার দ্বারাও বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন মনে করা হতো এবং স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যেত। ইসলাম এসে যিহারের মূলকে স্বীকৃতি দিয়ে তার হুকুম পরিবর্তন করে দিয়েছে। সুতরাং ঘোষণা দিয়েছে যে, যিহার দ্বারা বিবাহ-বন্ধন নষ্ট হবে না, তবে

কাফ্ফারা আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকবে। কারণ, যিহার করে ব্যক্তি মিথ্যার দাবি করে অপরাধের শিকার হয়েছে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا - 'তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে।' [সূরা মুজাদালা : আয়াত নং ৩] এ কারণে অবশ্যই গুনাহগার হবে। যেহেতু যিহার একটি মিথ্যা ও অসঙ্গত কাজ, তাই তার শাস্তিস্বরূপ স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফ্ফারা না দেবে। কাফ্ফারা আদায়ের দ্বারা উক্ত অপরাধ মোচন হয়ে যায়। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী- إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - 'নিশ্চয় সৎকর্ম পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়। -[সূরা হূদ] এবং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- اِتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا - 'মন্দের পরে সৎকাজ করবে, যাতে মন্দটা মিটে যায়।' - [আল-হাদীস]

উল্লেখ্য যে, যিহারের দ্বারা وَصْل [স্ত্রীসঙ্গম] হারাম হওয়ার সাথে সাথে دَوَاعِيْ وَصْل [সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়] তথা স্ত্রীকে স্পর্শ করা এবং চুম্বন করাও হারাম করা হয়েছে, যেন ব্যক্তির এর মাধ্যমে সঙ্গমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। যেমনটি হারাম করা হয়েছে ইহ্‌রামের অবস্থায়। তবে ঋতুস্রাব ও রোজা অবস্থায় যদিও وَصْل [সঙ্গম] হারাম করেছে, কিন্তু دَوَاعِيْ وَصْل [সঙ্গমোদ্দীপক কাজগুলো] হারাম করা হয়নি। কারণ, বারংবার তার উপস্থিতির কারণে ব্যক্তির জন্য কষ্টকর বস্তুতে পরিণত হবে, যা শরিয়ত সমর্থন করে না।

যিহারের সংজ্ঞা : ظِهَارٌ [যিহার] শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ- স্বামী আপন স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ [তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়], আরো অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এটি ظَهْر থেকে উদগত, যার অর্থ পিঠ। হুরমত প্রকাশের এ হলো একটি সূক্ষ্ম ইস্‌তি'আরাহ (اِسْتِعَارَة)। কেননা সওয়ারীর পিঠ হয় আরোহণ ক্ষেত্র, আর সহবাসকালে স্ত্রীও সওয়ারী [বাহন] হয়। অতএব রূপকার্থে মায়ের পিঠকে বাহন ধরে হারামের দিক থেকে তার সংগে স্ত্রীকে তুলনা করা হয়েছে। ফিকহের পরিভাষায় যিহার হলো-

تَشْبِيْهُ الْمَنْكُوْحَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّابِيْدِ اِتِّفَاقًا بِنَسَبٍ اَوْ رِضَاعٍ اَوْ صِهْرِيَّةٍ .

অর্থাৎ, যে সকল মহিলা বংশ, দুধপান কিংবা দাম্পত্য সম্বন্ধসূত্রে সর্বসম্মতভাবে চিরস্থায়ীরূপে হারাম, তাদের কারো সাথে আপন স্ত্রীকে তুলনা করা। -[নিহায়া, ইনায়া]।

শর্ত ও রুকন : ظِهَارٌ [যিহার] -এর শর্ত হলো, যিহারকারী ব্যক্তি বিবেকবান, সাবালক ও মুসলমান হওয়া এবং মহিলা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আর যিহারের রুকন হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, অথবা এ জাতীয় অন্যকোনো শব্দ দ্বারা তুলনা করা। আর যিহারের সবব [কারণ] হলো অবাধ্যতা। কেননা, যিহারের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খাওলা বিনতে ছা'লাবা-এর ব্যাপারে, আর সে ছিল স্বামীর অবাধ্য মহিলা।

হুকুম : যিহারের হুকুম হলো, বৈবাহিক বন্ধন অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সঙ্গম ও সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়সমূহ হারাম হওয়া- কাফ্ফারা আদায় করার সময়সীমা পর্যন্ত। দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে অতঃপর যা বলেছে তা সংশোধন করতে চায়, তাহলে পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করা কর্তব্য। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত।" -[সূরা মুজাদালা : ২৮ পারা] উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, যিহারের পর যদি স্বামী স্ত্রীর নিকট ফিরে যেতে চায় তাহলে প্রথমে গোলাম বা বাঁদি আজাদ করবে। এরপর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা ও তার সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়সমূহ হালাল হবে।

فَإِنْ وَطِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرَ الْكَفَّارَةِ الْاُوْلٰى وَلَا يُعَاوِدُ حَتّٰى يُكَفِّرَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِيْ وَاقَعَ فِيْ ظِهَارِهٖ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَلَا تَعُدْ حَتّٰى تُكَفِّرَ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ اٰخَرُ وَاجِبًا لَبَيَّنَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَهٰذَا اللَّفْظُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا ظِهَارًا لِاَنَّهٗ صَرِيْحٌ فِيْهِ وَلَوْ نَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهٗ مَنْسُوْخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْاِتْيَانِ بِهٖ. وَاِذَا قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ اُمِّيْ اَوْ كَفَخِذِهَا اَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ لِاَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ اِلَّا تَشْبِيْهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهٰذَا الْمَعْنٰى يَتَحَقَّقُ فِيْ عُضْوٍ لَا يَجُوْزُ النَّظَرُ اِلَيْهِ.

অনুবাদ : যদি কাফফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে, তাহলে ইস্তিগফার করবে। তবে প্রাথমিক ওয়াজিব কাফফারা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর লাযিম হবে না। অবশ্য কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত পুনরায় সহবাস করবে না। কেননা, যে সাহাবী যিহার করার পর কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করেছিলেন, তাকে রাসূল ﷺ বলেছিলেন- اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَلَا تَعُدْ حَتّٰى تُكَفِّرَ - "তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে পুনরায় তা করবে না।" বলাবাহুল্য যে, অন্য কিছু ওয়াজিব হলে অবশ্যই নবী করীম ﷺ তা বয়ান করতেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ বাক্যটির অর্থ যিহার ছাড়া অন্য কিছু হবে না। কারণ, এটি যিহারের স্পষ্ট শব্দ। আর ব্যক্তি যদি এটা দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য করে থাকে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ বাক্যটা দ্বারা তালাক হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়েছে। সুতরাং এটি প্রয়োগ করে, তালাকের অর্থ গ্রহণের এখতিয়ার হবে না। আর যদি বলে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের উদরতুল্য কিংবা তার উরুদেশতুল্য কিংবা তার লজ্জাস্থানতুল্য, তাহলে সে যিহারকারী হবে। কেননা, যিহার অর্থই হলো হালাল স্ত্রীকে হারাম স্ত্রীলোকের সাথে তুলনা করা। আর এ তুলনা বাস্তবায়িত হয় এমন অঙ্গের সাথে [তুলনা করলে] যার দিকে নজর করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنْ وَطِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ الخ : কোনো ব্যক্তি যিহার করে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হলো। উক্ত মাসআলায় ইমামগণ ইখতিলাফ করেন। জমহুর ফুকাহা তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেক (র.) -এর মতে, প্রথম কাফ্ফারা ছাড়া অন্য কাফ্ফারা লাযিম হবে না। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতে, দুই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম হাসান বসরী এবং নাখ'ঈ (র.) -এর মতে, তিন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। জমহুরের দলিল হলো নিম্নবর্ণিত হাদীস–

اِنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِىْ ثُمَّ اَبْصَرْتُ خَلْخَالَهَا فِىْ لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَلَا تَعُدْ حَتّٰى تُكَفِّرَ . (اَلْحَدِيْثُ)

"হযরত সালামা ইবনে সাখার বায়াযী (রা.) রাসূল ﷺ -কে বললেন যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি, অতঃপর চাঁদনি রাতে তার পায়ের নুপূর দেখে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। এমনটি আর করবে না– কাফ্ফারা দেওয়া ছাড়া।" –[আল-হাদীস]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ তার উপর শুধু ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এর সাথে অন্য কিছু ওয়াজিব হতো, তাহলে নবীজী ﷺ অবশ্যই তা বয়ান করতেন। উক্ত হাদীসটি সুনানের চার কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজার বর্ণনা নিম্নরূপ– فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ "অতঃপর রাসূল ﷺ হাসি দিয়ে বললেন, এমনটি আর করবে না– কাফ্ফারা দেওয়া ছাড়া।"

قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন– اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো] উক্ত বাক্য দ্বারা শুধু যিহারই হবে। এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করা যাবে না। কেননা, এ বাক্য দ্বারা তালাক রহিত হয়েছে। কারণ, তালাকের জন্য শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত বাক্যই গ্রহণযোগ্য; বান্দার ইচ্ছানুরূপ বাক্য ব্যবহারের অনুমতি নেই।

قَوْلُهُ وَاِذَا قَالَ اَنْتِ عَلَىَّ كَبَطْنِ اُمِّىْ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ عَلَىَّ كَبَطْنِ اُمِّىْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের উদরতুল্য।' কিংবা বলে– اَنْتِ عَلَىَّ كَفَخِذِ اُمِّىْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের উরুদেশতুল্য।' কিংবা বলে– اَنْتِ عَلَىَّ كَفَرْجِ اُمِّىْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের লজ্জাস্থানতুল্য।' উল্লিখিত সব সুরতেই ঐ ব্যক্তি যিহারকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, যিহার বলতেই বুঝায়, নিজ স্ত্রীকে [যে ব্যক্তির জন্য হালাল] চিরস্থায়ী হারাম এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করা। আর এটা উল্লিখিত অঙ্গের সাথে তুলনা করার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। কেননা, এসব অঙ্গের প্রতি নজর করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে যেসব অঙ্গের প্রতি নজর জায়েজ; যেমন– হাত, পা, চুল ও নখ ইত্যাদি, এসব অঙ্গের সাথে তুলনা করা যিহার হিসেবে গণ্য হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (রা.) এবং ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে যে– اَنْتِ عَلَىَّ كَيَدِ اُمِّىْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের হস্ততুল্য' অথবা বলে– اَنْتِ عَلَىَّ كَرِجْلِ اُمِّىْ -"তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পায়ের সমতুল্য।" অথবা اَنْتِ كَعُنُقِ اُمِّىْ "তুমি আমার মায়ের কাঁধতুল্য।" তাহলে উক্ত ব্যক্তিও যিহারকারী হবে। তবে দন্ত, ক্যাশ কিংবা নখের সাথে তুলনা করার দ্বারা এ ইমামগণের মতেও যিহারকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

وَكَذَا إِنْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّأْبِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلُ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّهُنَّ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُؤَبَّدِ كَالْأُمِّ وَكَذٰلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُثُكِ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدّٰى كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ .

অনুবাদ : তদ্রূপ যিহার হবে যদি স্ত্রীকে সে আপন কোনো মাহরাম স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করে, যার [সতরসমূহের] দিকে তাকানো স্থায়ীভাবেই তার জন্য জায়েজ নেই। যেমন– তার বোন কিংবা ফুফু কিংবা দুধ-মা। কেননা, স্থায়ী হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এরা সকলে মায়ের মতোই। অনুরূপ যিহার সাব্যস্ত হবে যদি স্ত্রীকে সে বলে যে, তোমার মাথা আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো। কিংবা তোমার লজ্জাস্থান কিংবা তোমার মুখমণ্ডল কিংবা তোমার গর্দান [অথবা বলে] তোমার অধিকাংশ কিংবা তোমার এক-তৃতীয়াংশ [আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো]। কেননা, লোক প্রচলন হিসেবে এ সকল অঙ্গ দ্বারা সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়ে থাকে এবং উল্লেখযোগ্য অংশে হুকুম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। [হুরমতের হুকুম প্রথমে অনির্ধারিত অংশে সাব্যস্ত হবে] অতঃপর অনিবার্যভাবে সমগ্র দেহে তা বিস্তার লাভ করবে। যেমন তালাক প্রসঙ্গে আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ الخ : মাসআলা হলো এই যে, যদি স্বামী আপন স্ত্রীকে এমন কোনো মাহরামের সঙ্গে তুলনা করে যাদের প্রতি কামভাব দৃষ্টিতে তাকানো চিরদিনের জন্য হারাম; যেমন– বোন, ফুফু ইত্যাদি, তাহলে সে যিহারকারী হবে। দলিল হলো– এসব মাহ্রাম হুরমত [হারাম হওয়া]-এর দৃষ্টিতে মায়ের মতোই। তাই যিহারের ক্ষেত্রে মায়ের হুকুম এবং তাদের হুকুম একই হবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীর কোনো নির্দিষ্ট অথবা বিশেষ অঙ্গকে মায়ের পৃষ্ঠদেশের সাথে তুলনা করে, তাহলেও যিহারকারী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন বলল– তোমার মাথা আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। অথবা তোমার فَرْجٌ [লজ্জাস্থান] কিংবা তোমার গর্দান, কিংবা তোমার অর্ধাংশ কিংবা তোমার এক তৃতীয়াংশ আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো। এসব অবস্থায় যিহার সাব্যস্ত হবে। দলিল : এসব অঙ্গ দ্বারা সম্পূর্ণ অঙ্গ বুঝানোর প্রচলন রয়েছে। অতএব এসব অঙ্গবিশেষ উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অঙ্গ উল্লেখ করার নামান্তর। তাই যিহার প্রমাণিত হবে এবং প্রথমে অঙ্গবিশেষে পরবর্তীতে পুরো দেহেই তার হুকুম সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ اُمِّيْ اَوْ كَاُمِّيْ يَرْجِعُ اِلَى نِيَّتِهِ لِيَنْكَشِفَ حُكْمُهُ فَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِاَنَّ التَّكْرِيْمَ بِالتَّشْبِيْهِ فَاشٍ فِي الْكَلَامِ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ لِاَنَّهُ تَشْبِيْهٌ بِجَمِيْعِهَا وَفِيْهِ تَشْبِيْهٌ بِالْعَضْوِ لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ اِلَى النِّيَّةِ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لِاَنَّهُ تَشْبِيْهٌ بِالْاُمِّ فِي الْحُرْمَةِ فَكَاَنَّهُ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاِحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكَرَامَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يَكُوْنُ ظِهَارًا لِاَنَّ التَّشْبِيْهَ بِعَضْوٍ مِنْهَا لَمَّا كَانَ ظِهَارًا فَالتَّشْبِيْهُ بِجَمِيْعِهَا اَوْلٰى وَاِنْ عَنٰى بِهِ التَّحْرِيْمَ لَا غَيْرُ فَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ اِيْلَاءٌ لِيَكُوْنَ الثَّابِتُ بِهِ اَدْنَى الْحُرْمَتَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ظِهَارٌ لِاَنَّ كَافَ التَّشْبِيْهِ تَخْتَصُّ بِهِ .

অনুবাদ : আর যদি বলে, আমার জন্য তুমি আমার মাতাতুল্য অথবা আমার মায়ের মতো, তাহলে তার নিয়তের দিকে ফিরে যেতে হবে, যাতে বক্তব্যটির হুকুম পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি সে বলে যে, আমি সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, তাহলে সে যেমন বলেছে তা-ই হবে। কেননা, কথাবার্তার ক্ষেত্রে তুলনার মাধ্যমে মর্যাদা প্রকাশ করার প্রচলন রয়েছে। আর যদি বলে যে, আমি যিহার উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে তা যিহার হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা, মায়ের পূর্ণ দেহের সঙ্গে তুলনার মধ্যে তার একটি অঙ্গের সাথে তুলনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু তা স্পষ্ট নয়, তাই নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি বলে, আমি তালাক উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে তা বায়েন তালাক হবে কেননা, এখানে হুরমতের ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে তুলনা রয়েছে। সুতরাং যেন সে, "তুমি আমার জন্য হারাম" বলেছে এবং তালাকের নিয়ত করেছে। আর যদি তার কোনো নিয়তই না থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। কেননা, তুলনাটিকে মর্যাদার অর্থে গ্রহণের সম্ভাব্যতা রয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এতে যিহার হবে। কেননা, মায়ের একটি অঙ্গের সাথে তুলনা করা যদি যিহার হয়, তাহলে পূর্ণ মায়ের সঙ্গে তুলনা করা আরো উত্তমভাবে যিহার হবে। আর যদি বলে যে, শুধু হারাম সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য করেছি; অন্য কিছু নয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, তা ঈলা হবে। যাতে বক্তব্যটির দ্বারা দুটো হুরমতের নিম্নতরটি সাব্যস্ত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তা যিহার হবে। কেননা, তুলনাবাচক كَافْ [কাফ] অব্যয় যিহারের জন্যই নির্ধারিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ اُمِّيْ الخ : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণিত মাসআলার সুরত হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল- اَنْتِ عَلَيَّ كَاُمِّيْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো।' অথবা বলল- اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ اُمِّيْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মাতাতুল্য।' এখানে ফকীহগণ বলেন, তার নিয়ত সম্পর্কে জানতে হবে। সে যে নিয়তের কথা বর্ণনা করবে তা-ই

সংঘটিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এমনই বলেন। কেননা, এ ধরনের তুলনার মধ্যে একাধিক বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব তার নিয়তের দ্বারাই কোনো একটাকে সাব্যস্ত করা যাবে। সে যদি বলে, আমি এ দিয়ে মর্যাদার তুলনা উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে এটাই সাব্যস্ত হবে। কেননা, কথাবার্তার ক্ষেত্রে তুলনার মাধ্যমে মর্যাদা প্রকাশের বহুল প্রচলন রয়েছে। অতএব তার উপর কোনো কিছুই লাযিম হবে না। আর যদি সে বলে যে, আমি যিহার উদ্দেশ্য নিয়েছি, তাহলে যিহারই গণ্য হবে। দলিল হলো, সে তার বাক্য أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّيْ [তুমি আমার জন্য আমার মাতাতুল্য] দ্বারা তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ মায়ের সাথে তুলনা করেছে, আর যেহেতু এক অঙ্গের সাথে তুলনার দ্বারা যিহার হয়, অতএব পূর্ণ মায়ের সাথে তুলনা দ্বারা আরো উত্তমভাবে যিহার হবে। তবে যেহেতু অঙ্গের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, তাই তার নিয়তের বিবরণ প্রয়োজন।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ الخ : আর যদি ব্যক্তি বলে, আমি এর দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে বায়েন তালাক পতিত হবে। দলিল হলো তার কথা أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّيْ [তুমি আমার জন্য আমার মাতাতুল্য] দ্বারা হুরমতের ক্ষেত্রে তার মায়ের সাথে তুলনা করেছে। অতএব তার উক্ত বাক্যটি أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ বাক্যের মতোই। আর তালাকের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ বাক্যটি তালাকের ক্ষেত্রে কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত। আর কিনায়া দ্বারা বায়েন তালাক সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে এতে নিয়তের প্রয়োজন। আর যদি ব্যক্তি কোনো নিয়তই না করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমামগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত অবস্থায় তার কথা لَغْوٌ তথা নিরর্থক হিসেবে গণ্য হবে। **প্রমাণ :** তার কথাটি مُجْمَلٌ [ব্যাখ্যার যোগ্য]। অতএব বক্তার বর্ণনার দ্বারাই তার কথার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে, তার পক্ষ হতে বর্ণনা ব্যতীত কোনো উদ্দেশ্যকে নির্ণয় করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উক্ত অবস্থায় তার বক্তব্য যিহারে গণ্য হবে। ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। **তাঁদের দলিল :** মাতার এক অঙ্গের সাথে তুলনা করলে যদি যিহার হয়, তাহলে পূর্ণ মায়ের সাথে তুলনা করা অবস্থায় যিহার হওয়ার বিষয়টি আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। আর ব্যক্তি যদি أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّيْ বাক্য দ্বারা স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, তাহলেও এক্ষেত্রে ইমামদের মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত হলো, উক্ত সূরতে 'ঈলা' সাব্যস্ত হবে।

দলিল : إِيْلَاءٌ [ঈলা]-এর হুরমত যিহারের হুরমতের তুলনায় আসান ও লঘুতর। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে–

১. সববের দিক থেকে যিহার তুলনায় শক্ত। কেননা, যিহার শুধু যিহার হওয়া হিসেবেই কবীরা গুনাহ পক্ষান্তরে 'ঈলা' এর বিপরীত। কেননা, তার হুরমত অন্য কারণে হয়ে থাকে।

২. যিহারের হুকুম ঈলার হুকুমের তুলনায় কঠিন। কেননা, যিহারের ক্ষেত্রে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর, কিংবা ষাটটি রোজা রাখার বিধান রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ৯১]

৩. তাছাড়া ঈলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হুরমত দূর করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু যিহারের মধ্যে কাফফারা আদায়ের পূর্বে হুরমত দূর করার অবকাশ নেই।

৪. ঈলার হুরমত তৎক্ষণাৎ সাব্যস্ত হয় না; বরং চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সাব্যস্ত হয়। আর যিহারের হুরমত সাথে সাথেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। –[ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড, ৯১ পৃ.]

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তা যিহার হবে। **দলিল :** ব্যক্তি যখন বলে– أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّيْ أَوْ كَأُمِّيْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মাতার সমতুল্য।' উক্ত বাক্যে كَافُ تَشْبِيْه [তুলনাবোধক অব্যয় বিদ্যমান রয়েছে] যা বিশেষত যিহারের মধ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। –[ফাতহুল কাদীর : পৃ. ৯১]

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّيْ وَنَوٰى ظِهَارًا اَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلٰى مَا نَوٰى لِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيْهِ وَالطَّلَاقَ لِمَكَانِ التَّحْرِيْمِ وَالتَّشْبِيْهُ تَاكِيْدٌ لَهٗ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهٗ نِيَّةٌ فَعَلٰى قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اِيْلَاءٌ وَعَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رح) ظِهَارٌ وَالْوَجْهَانِ بَيَّنَّاهُمَا وَاِنْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمِّيْ وَنَوٰى بِهٖ طَلَاقًا اَوْ اِيْلَاءً لَمْ يَكُنْ اِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا هُوَ عَلٰى مَا نَوٰى لِاَنَّ التَّحْرِيْمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذٰلِكَ عَلٰى مَا بَيَّنَّا غَيْرَ اَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اِذَا نَوَى الطَّلَاقَ لَا يَكُوْنُ ظِهَارًا وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) يَكُوْنَانِ جَمِيْعًا وَقَدْ عُرِفَ فِيْ مَوْضِعِهٖ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهٗ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهٗ ثُمَّ هُوَ مُحْكَمٌ فَيُرَدُّ التَّحْرِيْمُ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ : আর যদি বলে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো হারাম, আর এ কথা দ্বারা যিহার কিংবা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত অনুসারেই হুকুম হবে। কেননা, এখানে দুটো দিকের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, তুলনা বিদ্যমান থাকায় যিহারের এবং হারাম বিদ্যমান থাকায় তালাকের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন তুলনাটা হারামের অধিকতর জোরদারকারী হবে। আর যদি তার কোনো নিয়ত না থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, তা ঈলা হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তা যিহার হবে। আর উভয় মতামতের কারণ আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় হারাম। আর এ কথা দ্বারা তালাক কিংবা ঈলা -এর নিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, যিহার ছাড়া অন্য কিছু হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যা নিয়ত করেছে তা-ই হবে। কেননা, [এইমাত্র] আমরা বর্ণনা করেছি যে, হারাম শব্দটি উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, যখন তালাকের নিয়ত করবে তখন যিহার সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, তালাক ও যিহার দুটোই হবে। যথাস্থানে [মাবসূত কিতাবে] বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এটি যিহারের স্পষ্ট অর্থ দানকারী শব্দ। সুতরাং এখানে অন্য অর্থের সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া এটি হচ্ছে দ্ব্যর্থতামুক্ত শব্দ [مُحْكَم]। সুতরাং হারাম শব্দটি যিহারের অর্থেই গ্রহণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যদি বলে– اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمِّيْ - তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো হারাম।' এবং এর দ্বারা তালাক কিংবা ঈলার নিয়ত করল, উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতামত হলো– ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এর দ্বারা শুধু যিহার হবে। ইমাম আহমদ (র.)-ও উক্ত মত পোষণ করেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হলো, সে যা নিয়ত করে তা-ই সংঘটিত হবে। যিহারের নিয়ত করলে যিহার আর তালাকের নিয়ত করলে তালাক হবে, আর ঈলার নিয়ত করলে তা-ই হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল : وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ أَيَّ لَفْظِ كَظَهْرِ أُمِّيْ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ مُحْكَمٌ فِيْهِ وَلَفْظُ حَرَامٍ مُحْتَمَلٌ فَيُرَدُّ إِلَيْهِ إِذَا قُرِنَ مَعَهُ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ ٤/٩٢)

অর্থ : [উক্ত মাসআলায়] كَظَهْرِ أُمِّيْ শব্দটি যিহারের জন্য স্পষ্ট অর্থ দানকারী শব্দ ও مُحْكَمْ [দ্ব্যর্থতামুক্ত] [এতে নিয়তের প্রয়োজন নেই]। আর حَرَامٌ [হারাম] শব্দটি مُحْتَمَلٌ যা কয়েকটি বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে। আর যেহেতু مُحْتَمَلٌ তথা حَرَامٌ [হারাম] শব্দ مُحْكَمٌ -এর সাথে এসেছে, তাই নীতি অনুসারে তা দ্বারা মুহকামের অর্থ তথা হারাম দ্বারা যিহারের অর্থই গ্রহণ করা হবে। -[ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড, ৯২ পৃ.]

সাহেবাইনের দলিল : প্রকাশ্য যে, বর্ণিত মাসআলায় أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ [তুমি আমার উপর হারাম] বাক্যটি مُحْتَمَلٌ যাতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির নিয়তের মাধ্যমে। অতএব, সে যদি তালাক কিংবা ঈলার নিয়ত করে, তাহলে তা-ই পতিত হবে। আর পরের বাক্য كَظَهْرِ أُمِّيْ [আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়] পূর্বেরটির জন্য تَاكِيْد [মজবুতকারী] হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাসআলায় সাহেবাইনের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। যদি ব্যক্তি তালাকের নিয়ত করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে শুধু তালাকই সংঘটিত হবে; যিহার হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট তালাক এবং যিহার উভয়টাই পতিত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল : স্বামী যখন তার স্ত্রীকে أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ বাক্য উল্লেখ করেছে এবং এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে, তাই বায়েন তালাক পতিত হয়েছে। এরপরে আর كَظَهْرِ أُمِّيْ দ্বারা যিহার হবে না। কেননা, বায়েনের পরে যিহার বিশুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : তালাক পতিত হবে তার নিয়তের মাধ্যমে, তবে كَظَهْرِ أُمِّيْ বাক্যে যেহেতু যিহারের অর্থে স্পষ্ট, তাই সে যিহারকারীও গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বাক্যকে অন্য অর্থে ব্যবহার সহীহ হবে না।

قَالَ وَلَا يَكُوْنُ الظِّهَارُ اِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ حَتّٰى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ اَمَتِهٖ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى مِنْ نِسَائِهِمْ وَلِاَنَّ الْحِلَّ فِى الْاَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تَلْحَقُ بِالْمَنْكُوْحَةِ وَلِاَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُوْلٌ عَنِ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقَ فِى الْمَمْلُوْكَةِ فَاِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِغَيْرِ اَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَجَازَتِ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ لِاَنَّهٗ صَادِقٌ فِى التَّشْبِيْهِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوْقِهٖ حَتّٰى يَتَوَقَّفَ بِخِلَافِ اِعْتَاقِ الْمُشْتَرِىْ مِنَ الْغَاصِبِ لِاَنَّهٗ مِنْ حُقُوْقِ الْمِلْكِ . وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهٖ اَنْتُنَّ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيْعًا لِاَنَّهٗ اَضَافَ الظِّهَارَ اِلَيْهِنَّ فَصَارَ كَمَا اِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ لِاَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ فِىْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَالْكَفَّارَةُ لِاِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا بِخِلَافِ الْاِيْلَاءِ مِنْهُنَّ لِاَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْاِسْمِ وَلَمْ يَتَعَدَّدْ ذِكْرُ الْاِسْمِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামিউস সাগীর কিতাবে] বলেছেন, আর স্ত্রী ব্যতীত কারো প্রতি যিহার হয় না। সুতরাং কেউ যদি দাসীর সাথে যিহার করে, তবে সে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, [যিহার সম্পর্কিত আয়াতে] আল্লাহ তা'আলা مِنْ نِسَائِهِمْ [তাদের স্ত্রীদের সাথে] বলেছেন। তাছাড়া দাসীর ক্ষেত্রে সম্ভোগ-বৈধতা হচ্ছে মালিকানা-স্বত্বের অনুগত। সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। তাছাড়া যিহার হচ্ছে তালাকের পরিবর্তে ব্যবহৃত। আর দাসীর ক্ষেত্রে তালাকের কোনো অবকাশ নেই। কোনো স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া যদি কেউ তাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার সাথে যিহার করে আর স্ত্রীলোকটি বিবাহ অনুমোদন করে, তাহলে উক্ত যিহার বাতিল হবে। কেননা, যিহার প্রয়োগের সময় এই তুলনার বিষয়ে সে সত্যবাদী। সুতরাং এটা নিন্দনীয় ও মিথ্যা ভাষণ ছিল না। আর যিহার বিবাহের অধিকার-সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, যার জন্য [বিবাহের সাথে] যিহারও ঝুলন্ত থাকবে। পক্ষান্তরে জবরদখলকারীর নিকট থেকে গোলাম খরিদকারীর গোলাম আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মুক্তিদান হচ্ছে মালিকানার অন্যতম অধিকারভুক্ত বিষয়। আর যদি কেউ তার সকল স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা সকলে আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ সমতুল্য, তাহলে সে সকলের ক্ষেত্রে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, যিহারকে সে সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং তা সকলের সঙ্গে তালাক সম্পৃক্ত করার ন্যায় হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রীর বিপরীতে তার উপর একটি কাফ্ফারা সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হবে। আর কাফ্ফারা হচ্ছে হুরমত বিলুপ্তির কাম্য। সুতরাং হুরমতের [ক্ষেত্র] একাধিক হওয়ার কারণে কাফ্ফারাও একাধিক হবে। পক্ষান্তরে সকল স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঈলা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেখানে কাফ্ফারার উদ্দেশ্য হচ্ছে [আল্লাহর] নামের হুরমত রক্ষা করা, আর নাম উচ্চারণ একাধিকবার হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا يَكُوْنُ الظِّهَارُ اِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের মাঝে দুটি মাসআলার অবতারণা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : জামিউস সাগীরের মাঝে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, যিহার শুধু স্ত্রীর সাথে হবে; অন্যকোনো মহিলার সাথে হবে না। অতএব, কেউ যদি তার দাসীর সাথে যিহার করে, তাহলে সে যিহারকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রথম দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ الخ [যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে] উক্ত আয়াতে نِسَاء শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা প্রায়োগিক দিক থেকে শুধু বিবাহিতা স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও অভিধানে সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। কিন্তু আহলে তাফসীরগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, উক্ত আয়াতের মাঝে نِسَاء শব্দ দ্বারা শুধু বিবাহিত স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল : দাসীর ক্ষেত্রে বৈধতার বিষয়টি মালিকানা-স্বত্বের অনুগত। অতএব তাকে বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

তৃতীয় দলিল : জাহেলিয়াতের যুগে যিহার তালাকরূপে গণ্য ছিল। অতঃপর পরবর্তীতে বর্তমান যিহারের হুকুম তথা কাফফারা আদায়ের সময়সীমা পর্যন্ত হুরমত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, যিহার এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গেই করা যাবে, যাদের সঙ্গে তালাকের বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। আর যেহেতু দাসীর ক্ষেত্রে তালাকের কোনো অবকাশ নেই, তাই যিহারও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا الخ : **দ্বিতীয় মাসআলা :** কোনো স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া যদি কেউ তাকে বিবাহ করে অতঃপর তার সাথে যিহার করে তারপর স্ত্রীলোকটি বিবাহ অনুমোদন করে, তাহলে উক্ত বিবাহ বাতিল হবে। তার দলিল নিম্নরূপ– উল্লেখ্য যে, যিহারকে শরিয়তে مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا [অসত্য ও অসঙ্গত] বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, যিহারের ক্ষেত্রে মিথ্যার দাবি করা হয়। আর উক্ত মাসআলায় বর্ণিত সুরতে ব্যক্তি যখন তুলনা করল তখন সে সত্যবাদী। কেননা, মহিলা অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তার জন্য হারামই ছিল। অতএব এখানে যিহারের মূল বিষয়টিই পাওয়া যায়নি। তা হলো– "হালাল স্ত্রীকে চিরস্থায়ী হারাম, এমন মহিলার সাথে তুলনা করা" তাই তার যিহার বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তুলনার সময় উক্ত মহিলা তার স্ত্রী হিসেবেই ছিল না। তবে এ বিষয়টিকে জবরদখলকারীর নিকট থেকে ক্রয় করে গোলাম আজাদ করার বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা, মুক্তিদান হচ্ছে মালিকানার অন্যতম অধিকারভুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে যিহার বিবাহের অধিকারভুক্ত বিষয় নয়; বরং শরিয়তে যিহার করাকে مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا [অসত্য ও অসঙ্গত] বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, গোলাম মুক্তি দেওয়া যেহেতু মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। আর মালিকানা প্রমাণিত হবে মূল মালিকের অনুমতিসাপেক্ষে। তাই মুক্তিদানের বিষয়টিও মালিকানা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে। কিন্তু যিহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। তাই যিহার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের মাসআলার রূপ হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি তার একাধিক স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল– أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ [তোমরা সকলে আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের সমতুল্য]। এখানে ব্যক্তি প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে সকল স্ত্রীর প্রতি যিহারকে সম্পর্কিত করেছে। তাই সকলের ক্ষেত্রেই যিহার সাব্যস্ত হবে। যেমনটি তালাকের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। তবে উক্ত মাসআলায় কাফফারার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী এবং শাফেয়ী ইমামগণের মাযহাব হলো, প্রত্যেক স্ত্রীর পরিবর্তে একেকটি কাফফারা ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে।

দলিল : প্রকাশ থাকে যে, মূলত হুরমতকে বিলুপ্ত করার জন্যই কাফফারার প্রবর্তন হয়েছে। আর হুরমত যেহেতু সকলের সঙ্গেই সাব্যস্ত হয়েছে, তাই তার প্রতিকারও একাধিকই হতে হবে। অতএব, যার সাথেই প্রথমে সঙ্গম করার ইচ্ছে করে তার কারণেই স্বামীর উপর প্রথম কাফফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সকল স্ত্রীর সঙ্গে 'ঈলা' করার কাফফারার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম হবে এবং সে ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে একটিই কাফফারা লাযিম হবে। কেননা, সেখানে কাফফারার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামের হুরমত রক্ষা করা। আর সকল স্ত্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম যেহেতু একবারই উল্লেখ করেছে, তাই সকলের পক্ষ থেকে এক কাফফারা আদায় করাই যথেষ্ট হবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মাযহাব হলো, সকল স্ত্রীর পরিবর্তে একটি কাফফারাই যথেষ্ট হবে। আলাদা আলাদা কাফফারা লাযিম হবে না।

দলিল : তাঁরা যিহারের কাফফারাকে তুলনা করেছেন ঈলার কাফফারার উপর। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি তার একাধিক স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে– وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ -'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের কারো নিকট যাব না।' যদি ঈলার সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যায় এবং কারো সাথে সঙ্গম না হয়, তাহলে সকলের ক্ষেত্রে তালাক সাব্যস্ত হবে। আর যদি ঈলার সময়সীমার মাঝে সকলের সাথে সঙ্গম হয়, তাহলে তার উপর শুধু এক কাফফারা লাযিম হবে। অতএব যিহারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে।

فَصْلٌ فِى الْكَفَّارَةِ

قَالَ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ الْكَفَّارَةَ عَلَى هٰذَا التَّرْتِيْبِ قَالَ وَكُلُّ ذٰلِكَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَهٰذَا فِى الْاِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاهِرٌ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ وَكَذَا فِى الْاِطْعَامِ لِاَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ مُنْهِيَةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَابُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِهَا عَلَى الْوَطْىِ لِيَكُوْنَ الْوَطْىُ حَلَالًا .

অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে

অনুবাদ : যিহারের কাফফারা হচ্ছে একটি গোলাম আজাদ করা। গোলাম না পেলে দুমাস ধারাবাহিক সিয়াম পালন করা, আর তাও করতে সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকিনকে আহার দান করা। কেননা, এ প্রসঙ্গ সংবলিত আয়াতে কাফফারার এই পর্যায়ক্রমই বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এসবই স্ত্রী স্পর্শের পূর্বে হতে হবে। মুক্তিদান ও সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তো বিষয়টি আয়াতেই সুস্পষ্ট আছে। আহার দানের ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে। কেননা, যিহারের কারণে কাফফারা হচ্ছে হুরমত অবসানকারী। সুতরাং সেটাকে সহবাসের উপর অগ্রবর্তী করা অপরিহার্য, যাতে সহবাস হালাল হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى الْكَفَّارَةِ : اَلْكَفَّارَةُ শব্দটি مُبَالَغَةٌ -এর শব্দ, যা كَفَّارٌ -এর মুয়ান্নাছ (مُؤَنَّثٌ)। এটি تَكْفِيْرٌ থেকে উৎসারিত। অর্থ– মোচন করা। কিছু কিছু পাপ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সদকা কিংবা রোজার মাধ্যমে মোচন হয়, বিধায় এ মোচনকারী আমলকে كَفَّارَةٌ নামে অভিহিত করা হয়।

ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ (র.) যিহারের হুকুম তথা সহবাস ও সহবাস উদ্দীপক অন্যান্য কর্ম হারাম হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন এখন তিনি উক্ত হুরমত অবসানের শরয়ী উপায় তথা কাফফারার বিষয় আলোচনা করবেন।

قَوْلُهُ قَالَ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ الخ : উল্লেখ্য যে, যিহারের কাফফারার বিবরণ দিতে গিয়ে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [প্রথমে] একজন গোলাম আজাদ করবে। যদি গোলাম আজাদ করতে অক্ষম হয়, তাহলে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখবে যদি এতেও অক্ষম হয়, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। এর দলিল হলো, যিহার প্রসঙ্গ সংবলিত আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ . (اَلْاٰيَةُ)

"তবে একে অপরের স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। তোমরা

যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরের স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধিক্রমে দুই মাস রোজা রাখতে হবে। যে এতেও অসামর্থ্য হয় সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খানা খাওয়াবে। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।" প্রকাশ্য যে, উক্ত আয়াতের মাঝে কাফ্ফারা আদায়ের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন, যা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, প্রথমে গোলাম আজাদ করার বিধান, এটা না পেলে দুই মাস রোজা রাখবে। এতেও যদি ব্যক্তি অক্ষম হয়, তাহলে ষাটজন অভাবগ্রস্ত লোককে খানা খাওয়াবে। উক্ত আয়াতের মাঝে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। প্রথম দুটি বিধানের ক্ষেত্রে তো আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا [উভয়ে স্পর্শ করার পূর্বে] অতএব তৃতীয়টির ক্ষেত্রেও খানা খাওয়ানোর পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা জায়েজ হবে না। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেন–

يَجِبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْمَسِيْسِ كَاَخَوَيْهِ وَالنَّصُّ لَا يَجِبُ بِلَفْظِهِ ذٰلِكَ فِيْهِ فَعَلَّلَهُ وَالْحَقَهُ بِهِمَا وَحَاصِلُهُ عَقْلِيَّةٌ : اَنَّ الْكَفَّارَةَ مَنْهِيَّةٌ بِالتَّنْصِيْصِ عَلٰى اِيْجَادِهِمَا قَبْلَ التَّمَاسِ وَهٰذَا كَفَّارَةٌ مِثْلُهُمَا فَيَجِبُ كَوْنُهُ قَبْلَ التَّمَاسِ الخ .
(فَتْحُ الْقَدِيْرُ ٤/٩٥)

অর্থাৎ, "যদিও আয়াতে [তৃতীয়টার ক্ষেত্রে] পরিষ্কারভাবে তা উল্লেখ নেই। তারপরেও স্পর্শের পূর্বেই খাওয়ার বিধান প্রয়োগ হবে। কেননা, কাফ্ফারার ক্ষেত্রে প্রথম দুটির মতই তৃতীয়টি। আর প্রথম দুটির ক্ষেত্রে যেহেতু مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا-এর কয়েদ রয়েছে এখানেও তা-ই হবে।

দ্বিতীয় দলিল : পূর্বোল্লিখিত রেওয়ায়েতও এর দলিল হতে পারে, যা রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে কাফ্ফারা আদায় না করে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হয়েছিল। তা হলো اِعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ - 'তুমি কাফ্ফারা আদায় করা পর্যন্ত তার [স্ত্রীর] থেকে বিরত থাকবে।' এখানে কোনো নির্দিষ্ট কাফ্ফারার কথা উল্লেখ নেই। অতএব খানা খাওয়ানোও হতে পারে। তাছাড়া কাফ্ফারার বিধান তো হলো হুরমত অবসান করার জন্য। সুতরাং সেটা সহবাসের পূর্বে হওয়াই কাম্য, যাতে পরে সহবাস হালাল হয়ে যায়।

قَالَ وَتَجْزِئُ فِى الْعِتْقِ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ لِاَنَّ اِسْمَ الرَّقَبَةِ يُطْلَقُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ اِذْ هِىَ عِبَارَةٌ عَنِ الذَّاتِ الْمَرْقُوْقِ الْمَمْلُوْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالشَّافِعِىُّ (رح) يُخَالِفُنَا فِى الْكَافِرَةِ وَيَقُوْلُ اَلْكَفَّارَةُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا يَجُوْزُ صَرْفُهٗ اِلٰى عَدُوِّ اللّٰهِ كَالزَّكٰوةِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَلْمَنْصُوْصُ عَلَيْهِ اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَ وَقَصْدُهٗ مِنَ الْاِعْتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهٖ اِلٰى سُوْءِ اِخْتِيَارِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে কাফের ও মুসলিম, নারী ও পুরুষ এবং সাবালক ও নাবালক যে-কোনো গোলাম যথেষ্ট হবে। কেননা, আয়াতে বিদ্যমান رَقَبَةٌ [গর্দান] শব্দটি উল্লিখিত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কেননা, رَقَبَةٌ অর্থ– মালিকানাধীন সত্তা, যা সর্বদিক থেকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) কাফের দাস-দাসীর ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, কাফ্‌ফারা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হক। সুতরাং এটাকে আল্লাহর শত্রুর অভিমুখী করা যায় না। যেমন– জাকাতের হুকুম। আমাদের দলিল এই যে, আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে গোলাম আজাদ করা। আর এখানে তা সাব্যস্ত হয়েছে। আর মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে আজাদ করার অর্থ হলো [গোলামকে স্বাধীনভাবে] আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ দান। কিন্তু তারপরেও নাফরমানীর সাথে সম্পৃক্ত থাকা, সে নিজে মন্দ পথ বেছে নিয়েছে বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَتَجْزِئُ فِى الْعِتْقِ الرَّقَبَةُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যিহারের কাফ্‌ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের গোলাম আদায় যথেষ্ট হবে। গোলাম যদি কাফেরও হয়, অথবা নারী-পুরুষ যাই হোক, তার কাফ্‌ফারা আদায় সহীহ হবে।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ এখানে একটি গোলাম আজাদ করার কথা বলেছেন। আর رَقَبَةٌ শব্দটি ঐ সকল দাস-দাসীকেই বুঝায়, যারা সর্বদিক থেকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ কারণেই কিতাবত-চুক্তিবদ্ধ গোলাম যে এখনো কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি, তাকে কাফ্‌ফারা হিসেবে আজাদ করা বৈধ। কিন্তু মুদাব্বার গোলাম [মালিকের মৃত্যুসাপেক্ষে মুক্তির চুক্তিপ্রাপ্ত] -কে কাফ্‌ফারা হিসেবে আজাদ করা সহীহ হবে না। কেননা, তার দাসত্ব সার্বিক নয়; বরং মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : প্রকাশ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) কাফের গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, যিহারের কাফ্‌ফারা কোনো কাফের গোলাম দিয়ে আদায় করা জায়েজ হবে না। দলিল : কাফ্‌ফারা হলো আল্লাহর হক; যেমন জাকাত আল্লাহর হক। আর জাকাত যেমন কোনো কাফেরকে আদায় করা জায়েজ নেই অনুরূপ যিহারের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রেও কোনো কাফের গোলাম আজাদ করা বৈধ হবে না।

আহনাফের যুক্তি : মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে কাফের গোলাম আজাদ করার অর্থ হলো, বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু এরপরেও যদি সে নাফরমানির সঙ্গেই তথা কাফেরই থাকে, তাহলে সেটা তার দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এটা মুক্তিদাতার পক্ষ হতে কোনো ত্রুটির বিষয় নয়, তাই তার আজাদ করা সহীহ হবে।

وَلَا تَجْزِى الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ اَوِ الرِّجْلَيْنِ لِاَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَهِىَ الْبَصَرُ اَوِ الْبَطْشُ اَوِ الْمَشْىُ وَهُوَ الْمَانِعُ اَمَّا اِذَا اخْتَلَّتِ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ حَتّٰى يَجُوْزَ الْعَوْرَاءُ وَمَقْطُوْعَةُ اِحْدَى الْيَدَيْنِ وَاِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِاَنَّهُ مَا فَاتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلْ اِخْتَلَّتْ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتَا مَقْطُوْعَتَيْنِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ لِفَوَاتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْىِ اِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَذِّرٌ وَيَجُوْزُ الْاَصَمُّ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَّا يَجُوْزَ وَهُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ لِاَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ اِلَّا اَنَّا اِسْتَحْسَنَّا الْجَوَازَ لِاَنَّ اَصْلَ الْمَنْفَعَةِ بَاقٍ فَاِنَّهُ اِذَا صِيْحَ عَلَيْهِ لِيَسْمَعُ حَتّٰى لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَسْمَعُ اَصْلًا بِاَنْ وُلِدَ اَصَمَّ وَهُوَ الْاَخْرَسُ لَا يَجْزِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ مَقْطُوْعُ اِبْهَامَىِ الْيَدَيْنِ لِاَنَّ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوْتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ ـ

অনুবাদ : অন্ধ এবং হাত-কাটা বা পা-কাটা দাস আজাদ করা যথেষ্ট হবে না। কেননা, এখানে অন্ধের উপকারিতা অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, ধরার শক্তি, চলার শক্তি পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। আর এটিই হলো কাফফারার প্রতিবন্ধকতা। পক্ষান্তরে যদি উপকারিতায় শুধু ত্রুটি আসে, তবে তা কাফ্ফারার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং এক চক্ষুবিশিষ্ট, এক হাত ও এক পা বিপরীত দিক থেকে কাটা গোলাম আজাদ করা বৈধ হবে। কেননা, এ অবস্থায় পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট হয়নি; বরং ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। তবে এক পার্শ্বের হাত ও পা কর্তিত গোলাম আজাদ করা জায়েজ হবে না। কেননা, এখানে হাঁটার পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট হয়েছে। কারণ, এ অবস্থায় হাঁটা দুঃসাধ্য। বধির গোলাম আজাদ করা জায়েজ হবে। অবশ্য কিয়াসের দাবি হলো, জায়েজ না হওয়া এবং এটা نَوَادِرْ গ্রন্থের বর্ণনা। কেননা, এখানেও উপকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। তবে আমরা সূক্ষ্ম কিয়াস মোতাবেক বৈধতার রায় দিয়েছি। কেননা, মূল উপকারিতা এখনো বহাল রয়েছে। এ কারণে তার কানের নিকটে চিৎকার করলে সে শুনতে পায়। তবে যদি জন্মবধির হয় আর সে একেবারেই কোনো শব্দ শুনতে না পায়, তাহলে তাকে আজাদ করা যথেষ্ট হবে না। যার উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তিত, তাকে আজাদ করা জায়েজ হবে না। কেননা, বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারাই ধরার শক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ দুটো বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা উপকারিতার একটি প্রকার পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجْزِى الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوْعَةُ الخ : ত্রুটিপূর্ণ গোলাম আজাদ প্রসঙ্গে : ইনায়া গ্রন্থকার (র.) এ ব্যাপারে একটি মূলনীতির বর্ণনা দিয়েছেন। তা হলো, গোলাম আজাদ বৈধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত। যথা- ১. গোলাম পূর্ণভাবে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। ২. মুক্তিদাতার মালিকানাধীন থাকা। ৩. কাফফারার উদ্দেশ্যে আজাদ করা। ৪. গোলামের পূর্ণ

উপকারিতা বাকি থাকা। ৫. আজাদ করা বিনিময় ব্যতীত হওয়া। এ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকলে গোলাম আজাদ করা বৈধ হবে। আর যদি এগুলোর কোনো একটি অনুপস্থিত হয়, তাহলে সেই গোলাম আজাদ করা জায়েজ হবে না। অতএব, মুদাব্বার গোলাম, যাকে মালিকের মৃত্যুসাপেক্ষে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাকে কাফফারা হিসেবে আজাদ করা জায়েজ হবে না। কেননা, তার দাসত্ব সার্বিকভাবে পাওয়া যায়নি; বরং মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব, কেউ যদি নিয়ত ছাড়া কিংবা আজাদ করার পরে কাফফারার নিয়ত করে, তাহলে জায়েজ হবে না। আর যদি এমন গোলাম আজাদ করে, যার সম্পূর্ণ উপকারিতা অবশিষ্ট নেই; যেমন– উভয় হাত-পা কর্তিত কিংবা অন্ধ, এমন গোলামকে আজাদ করা জায়েজ হবে না। আর যদি সম্পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট না হয়ে তাতে আশঙ্কাজনক ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে এ জাতীয় গোলাম আজাদ করা কাফফারার প্রতিবন্ধক হবে না। সুতরাং কেউ যদি এক হাত এক পা বিপরীত দিক থেকে কর্তিত হয় কিংবা এক চোখবিশিষ্ট গোলাম আজাদ করে, তাহলে তার কাফফারা আদায় সহীহ হবে। কেননা, উক্ত গোলামের সম্পূর্ণ উপকারিতা বিনষ্ট হয়নি; বরং মূল উপকারিতা তার এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এক চোখবিশিষ্ট গোলাম আজাদের বিপক্ষে মত পেশ করে বলেন, ত্রুটি যদি এমন হয় যে, তা বিদূরিত করার আশা পোষণ করা যায় না। এমন ত্রুটি কাফফারার প্রতিবন্ধক হবে আর যদি ত্রুটি এমন না হয়, তাহলে কাফফারার প্রতিবন্ধক হবে না।

উল্লেখ্য, বধির দাস-দাসীর ব্যাপারে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন যে, نَوَادِرُ [নাওয়াদির] গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী বধির গোলাম আজাদ করা জায়েজ না হওয়ার কথা– কিয়াস ও যুক্তিরও দাবি এটাই। কেননা, এখানেও উপকারিতা বিনষ্ট হয়েছে তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মোতাবেক আমরা বৈধ হওয়ার কথা বলেছি। কেননা, তার মূল উপকারিতা এখানেও পাওয়া যায়। এ কারণেই তার নিকট সজোরে চিৎকার করলে সে শুনতে পায়। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ জন্মবধির হওয়ার কারণে একেবারেই শুনতে না পায়, তাহলে তার দ্বারা কাফফারা আদায় করা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ مَقْطُوْعُ إِبْهَامَى الْيَدَيْنِ الخ : **অঙ্গত্রুটির মূলনীতি** : উল্লেখ্য যে, পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লিখিত ইবারতে মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, আমরা পূর্বেই গোলামের অঙ্গত্রুটির ব্যাপারে বলেছি যে, কোনো অঙ্গের সম্পূর্ণ উপকারিতা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এমন গোলাম দ্বারা কাফফারা আদায় সহীহ হবে না। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, যার উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটা হয়, তার ধরার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ার দরুন তার দ্বারা কাফফারা আদায় জায়েজ হবে না।

وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ لِأَنَّ الْاِنْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ وَالَّذِيْ يُجَنُّ وَيُفِيْقُ يُجْزِيْهِ لِأَنَّ الْاِخْتِلَالَ غَيْرُ مَانِعٍ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ الرِّقُّ فِيْهِمَا نَاقِصًا وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ أَدّٰى بَعْضَ الْمَالِ لِأَنَّ إِعْتَاقَهُ يَكُونُ بِبَدَلٍ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) يُجْزِيْهِ لِقِيَامِ الرِّقِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهٰذَا تُقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْاِنْفِسَاخَ بِخِلَافِ أُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّدْبِيْرِ لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْاِنْفِسَاخَ .

অনুবাদ : যে পাগল জ্ঞান রাখে না তাকে আজাদ করা জায়েজ হবে না। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ বিবেক ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং সে সকল উপকারিতা-রহিত ব্যক্তি হয়ে গেল। যে ব্যক্তি কখনো পাগল এবং কখনো সুস্থ হয়, তাকে আজাদ করা যথেষ্ট হবে। কেননা, এরূপ ত্রুটি প্রতিবন্ধক নয়। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদকে আজাদ করা জায়েজ নয়। কেননা, একদিক থেকে তারা মুক্তির হকদার হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের মাঝে দাসত্ব-গুণের দুর্বলতা রয়েছে। তদ্রূপ যে মুকাতাব ধার্য অর্থের অংশবিশেষ আদায় করেছে, তাকে আজাদ করা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তার 'মুক্তিদান' হবে বিনিময় গ্রহণসহ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বদিক থেকে দাসত্ব-গুণটি যেহেতু বিদ্যমান, সেহেতু তাকে আজাদ করা গ্রহণযোগ্য হবে। দাসত্ব-গুণটি সার্বিকভাবে বিদ্যমান বলেই কিতাবত-চুক্তি গোলামের পক্ষ হতে প্রত্যাহারযোগ্য। আর উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের হুকুমটি এর বিপরীত। কারণ, এ দুটি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُوْنُ الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ الخ : অনুরূপভাবে যার বিবেকবুদ্ধি একেবারেই বিনষ্ট– কখনো সুস্থ হয় না, এমন গোলাম দ্বারাও কাফফারা আদায় করা যাবে না এবং উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার গোলাম দ্বারাও কাফফারা যথেষ্ট হবে না। কেননা, সে তো সার্বিকভাবে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। অথচ কুরআনে কারীমের মাঝে সার্বিক গোলামের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ أَدّٰى الخ : অনুরূপভাবে ঐ মুকাতাব গোলাম যে ধার্য অর্থের কিছু অংশ মালিককে আদায় করেছে, এমন গোলামের আজাদ জায়েজ হবে না। এর দলিল হলো, মুকাতাবকে আজাদ করা [যে কিছু অংশ আদায় করেছে] বিনিময় সহ হয়ে যাবে। আর প্রকাশ্য যে, বিনিময় ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়, অথচ গোলাম আজাদ করা হলো একটি ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। জাহিরী রেওয়ায়েতের উক্ত মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং হাসান বসরী (র.) -এর এক অভিমত হলো, অংশবিশেষ আদায়কারী মুকাতাব আজাদ করা কাফফারার জন্য যথেষ্ট হবে। দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ - 'একটি দিরহাম বাকি থাকলে মুকাতাব গোলামই থাকবে।' তাছাড়া মুকাতাব তো সর্বদিক থেকে গোলামিতেই রয়েছে। এ কারণেই তো কিতাবাত-চুক্তি রহিত করার অধিকার গোলামের পক্ষ থেকে বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বারের বিষয় এর ব্যতিক্রম, যে কারণে তাদের আজাদ বৈধ হবে না।

فَإِنْ اَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) لَهُ اَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ فَاَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ وَلَنَا اَنَّ الرِّقَّ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالْكِتَابَةُ لَا يُنَافِيْهِ فَاِنَّهُ فَكُّ الْحَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْاِذْنِ فِي التِّجَارَةِ اِلَّا اَنَّهُ بِعِوَضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانِبِهِ وَلَوْ كَانَ مَانِعًا يَنْفَسِخُ بِمُقْتَضَى الْاِعْتَاقِ اِذْ هُوَ يَحْتَمِلُهُ اِلَّا اَنَّهُ يَسْلَمُ لَهُ الْاَكْسَابُ وَالْاَوْلَادُ لِاَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمَحَلِّ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ اَوْ لِاَنَّ الْفَسْخَ ضَرُوْرِيٌّ لَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْوَلَدِ وَ الْكَسْبِ . وَاِنِ اشْتَرٰى اَبَاهُ اَوْ اِبْنَهُ يَنْوِيْ بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجُوْزُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ تَاْتِيْكَ فِيْ كِتَابِ الْاَيْمَانِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

অনুবাদ : আর যদি এমন মুকাতাবকে আজাদ করে, যে কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি, তাহলে তা জায়েজ হবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল এই যে, কিতাবাত-চুক্তির দিক থেকে সে মুক্তির হকদার হয়ে গেছে। সুতরাং সে মুদাববারের সদৃশ হয়ে গেল। আমাদের দলিল এই যে, মুকাতাব গোলামের দাসত্ব-গুণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। তাছাড়া নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ - 'একটি দিরহাম পরিশোধ করা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে।' আর কিতাবাত-চুক্তি দাসত্ব পরিপন্থি নয়। কেননা, কিতাবাত অর্থ হলো– স্বকীয় কার্যক্ষমতার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যেমন গোলামকে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অবশ্য কিতাবাত-ক্ষেত্রে এটা হয় বিনিময়ের মাধ্যমে, তাই মনিবের দিক থেকে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। আর যদি ধরেও নেই যে, কিতাবাত-চুক্তি দাসত্ব-গুণের প্রতিবন্ধক, তাহলে যেহেতু এটি প্রত্যাহারযোগ্য, সেহেতু মুক্তিদানের অনিবার্য দাবিরূপে প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। তবে তার উপার্জন ও সন্তান-সন্ততি তারই অনুকূলে সংরক্ষিত থাকবে। কেননা, ক্ষেত্রটিতে মুক্তি সাব্যস্ত হচ্ছে কিতাবাতের দিক থেকে। কিংবা বলা যায় যে, কিতাবাত-চুক্তির প্রত্যাহার হচ্ছে অনিবার্য প্রয়োজনজনিত। সুতরাং সন্তান ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর যদি কাফফারা বাবদ আজাদ করার নিয়তে আপন পিতা বা পুত্রকে খরিদ করে, তাহলে কাফফারা হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কসমের কাফফারা সম্পর্কেও একই পার্থক্য রয়েছে। ইয়ামীন অধ্যায়ে এই মাসআলা ইনশাআল্লাহ আলোচিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ اَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا الخ : **মুকাতাব গোলাম আজাদ করা প্রসঙ্গে :** প্রকাশ থাকে যে, এমন মুকাতাব গোলাম যে এখনো কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি, তাকে কাফ্ফারার জন্য আজাদ করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী ইমামগণ বলেন, এমন গোলাম আজাদ করা বৈধ হবে। **দলিল :** রাসূল ﷺ বলেন– اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ - 'এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সে গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে।' তাহলে যে একেবারেই কোনো অংশ আদায় করেনি, সেতো আরো অধিক যুক্তিতে গোলামির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় দলিল : কিতাবাত-চুক্তির পূর্বে তো মুকাতাব অবশ্যই গোলাম ছিল। সুতরাং এ দাসত্ব এখনো বহাল থাকবে। কেননা, কোনো গুণ তার বিপরীত গুণের উপস্থিতি ছাড়া বিলুপ্ত হয় না। আর কিতাবাত-চুক্তি তো দাসত্বের বিপরীত নয়। কেননা, কিতাবাত অর্থ হলো, দাসত্বের কারণে স্বকীয় কার্যক্ষমতার প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। আর প্রতিবন্ধকতা দূর করা দাসত্বের বিপরীত গুণ নয়। যেমন ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত দাস-দাসত্বের আবদ্ধ থেকে মুক্ত হয় না, মুকাতাবও তার ন্যায়। তবে পার্থক্য হলো, মুকাতাব বিনিময়ের আলোকে প্রতিবন্ধকতা দূর করে। আর ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কোনো বিনিময় ছাড়াই প্রতিবন্ধকতা দূর করে। উক্ত পার্থক্যের কারণে ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের ন্যায় মনিব তাকে কিতাবাত-চুক্তি থেকে রহিত করতে পারে না। আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, কিতাবাত-চুক্তি দাসত্ব-গুণের প্রতিবন্ধক, তারপরেও যেহেতু এখানে প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা মুক্তিদানের অনিবার্য দাবিরূপে প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। অতএব, তাকে আজাদ করা সাবেক গোলামকে আজাদ করারই নামান্তর। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মুকাতাব গোলাম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা যাবে না। **তাঁর দলিল :** মুদাব্বার যেমন তাদবীরের কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত -এর উপযুক্ত হয়েছে, যার কারণে তার আজাদ করা যথেষ্ট হয় না। অনুরূপ মুকাতাব গোলামও কিতাবাত-চুক্তির কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত-এর উপযুক্ত হয়েছে। অতএব, কোনোটির হুকুমের মাঝে ব্যবধান হবে না। গ্রন্থকারের বাক্য– اِلَّا اَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ الْاَكْسَابُ الخ দ্বারা একটি উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে চান।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, কাফ্ফারার মাঝে যেহেতু মুকাতাব গোলাম আজাদ করা সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে তার সন্তান ও উপার্জনও তো [কিতাবাত-চুক্তিকালে] মনিবের জন্যই হওয়া প্রয়োজন। যেমন– ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের উপার্জিত সম্পদের মালিক মনিবই থাকে। **উত্তর :** প্রথম কথা হলো, মুকাতাবের মুক্তি সাব্যস্তের বিষয়টি তার কিতাবাত-চুক্তির দিক থেকে। অতএব তার উপার্জন ও সন্তান তার সংরক্ষণেই থাকবে এবং এতে মালিকের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। তাছাড়া তার কিতাবাত-চুক্তির প্রত্যাহার হচ্ছে অনিবার্য কারণজনিত বিষয়। অতএব, সেটা প্রয়োজনের খাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তা হচ্ছে কাফ্ফারার ক্ষেত্রে তার আজাদ করা সহীহ হওয়া। বাকি সন্তান ও তার উপার্জনের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে না।

قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرٰى اَبَاهُ اَوْ اِبْنَهُ الخ - **পিতা-পুত্রের আজাদ প্রসঙ্গে :** প্রকাশ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উপর যিহারের কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো। এখন সে কাফ্ফারার নিয়তে যদি তার পিতা কিংবা পুত্রকে ক্রয় করে, তাহলে তার কাফ্ফারা আদায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে, তা সহীহ হবে না। গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইয়ামীন অধ্যায়ে করব ইনশাআল্লাহ তাই প্রসঙ্গ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করলাম না।

فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيْمَةَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِاَنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهٖ بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا لِاَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِى نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُوْنُ إِعْتَاقًا بِعِوَضٍ وَلِاَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ نَصِيْبَ صَاحِبِهٖ يَنْتَقِصُ عَلٰى مِلْكِهٖ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَمِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَّارَةَ ـ

অনুবাদ : যদি সচ্ছল ব্যক্তি শরিকানা গোলামের অর্ধেক আজাদ করে, আর বাকি অর্ধেকের মূল্য [শরিকদারকে] দিয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তা জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের মতে, জায়েজ হবে। কেননা, অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে শরিকদারের অংশেরও সে মালিক হয়ে যায়। সুতরাং সে পুরো গোলামকেই কাফ্ফারা বাবদ আদায়কারী হলো। এমন অবস্থায় যে, গোলামটি তারই মালিকানাভুক্ত। পক্ষান্তরে মুক্তিদানকারী অসচ্ছল হলে কাফ্ফারা হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তখন গোলামের অবশ্য কর্তব্য হবে শরিকদারের হিসাবের ব্যাপারে উপার্জন ও শ্রমে আত্মনিয়োগ করা। এমতাবস্থায় বিনিময়ভিত্তিক মুক্তিদান হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, শরিকদারের হিসাব তার মালিকানায় থাকা অবস্থাতেই ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, অতঃপর অর্থ পরিশোধের ও জামানতের মাধ্যমে মালিকানায় তার দিকে হস্তান্তরিত হয়। আর এরূপ হওয়া কাফ্ফারার জন্য প্রতিবন্ধক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ الخ - **অংশীদার গোলাম আজাদ করা প্রসঙ্গে :** কেউ যদি অংশীদারের ভিত্তিতে গোলামের মালিক হয় এবং তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। সে যদি তার অংশ আজাদ করে, তাহলে তার কাফ্ফারা সহীহ হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ব্যক্তি সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল যাই হোক, তার অর্ধেক আদায় করা সহীহ হবে না। কেননা, সে তো পূর্ণ গোলাম আজাদ করেনি; বরং তার অংশ আজাদ করেছে, যাকে পুরা গোলাম বলা যায় না– বাকি অংশের মাঝে দাসত্ব-গুণের ত্রুটি সাব্যস্ত হয়েছে। এরপর তার বাকি অংশ যখন সে বিনিময় দিয়ে আজাদ করবে, তখন সে ত্রুটিপূর্ণ গোলামের মালিক হলো। এ ক্ষেত্রেও পুরা গোলাম আজাদ করা হলো না। অতএব কোনো অবস্থাতেই তার আজাদ পূর্ণ হয় না, আর এমন গোলাম আজাদ করা কাফ্ফারার প্রতিবন্ধক। তাই তার কাফ্ফারা আদায় সহীহ হবে না।

আর সাহেবাইনের মত হলো, মুক্তিদানকারী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে তার অংশ আজাদ করা সহীহ হবে। কেননা, সে বাকি অর্ধেক অংশীদার থেকে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে [ضَمَانٌ] যিমান দিতে পারবে। **দলিল :** ব্যক্তি যখন তার অংশ আজাদ করল তখন পূর্ণ গোলামই আজাদ হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে মুক্তিদান অংশীদারীত্বকে গ্রহণ করে না। তবে শরিকদারের অংশের যিমান সে আদায় করে দেবে, তাহলে পুরো গোলাম তার অধীনে থাকা অবস্থায়ই আজাদ হলো। সুতরাং তার কাফ্ফারা আদায় সহীহ হবে। তবে যদি ব্যক্তি অসচ্ছল হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার অংশ আদায় সহীহ হবে না। কেননা, সে সুরতে শরিকদারের অংশ আদায় করার জন্য গোলামের উপর سَعْى [শ্রম ও উপার্জন] করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তখন আজাদ গ্রহণ অর্থের বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। অথচ অর্থের বিনিময়ে আজাদ করা কাফ্ফারার প্রতিবন্ধক বিষয়, যা জায়েজ নেই।

وَاِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهٖ عَنْ كَفَّارَتِهٖ ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهٗ عَنْهَا جَازَ لِاَنَّهٗ اَعْتَقَهٗ بِكَلَامَيْنِ وَالنُّقْصَانُ مُتَمَكِّنٌ عَلٰى مُلْكِهٖ بِسَبَبِ الْاِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ وَمِثْلُهٗ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَنْ اَضْجَعَ شَاةً لِلْاُضْحِيَّةِ فَاَصَابَ السِّكِّيْنُ عَيْنَهَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِاَنَّ النُّقْصَانَ تَمَكَّنَ عَلٰى مِلْكِ الشَّرِيْكِ وَهٰذَا عَلٰى اَصْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا الْاِعْتَاقُ لَا يَتَجَزّٰى فَاِعْتَاقُ النِّصْفِ اِعْتَاقُ الْكُلِّ فَلَا يَكُوْنُ اِعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ وَاِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهٖ عَنْ كَفَّارَتِهٖ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِيْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهٗ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ الْاِعْتَاقَ يَتَجَزّٰى عِنْدَهٗ وَشَرْطُ الْاِعْتَاقِ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنَّصِّ وَاِعْتَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَهٗ وَعِنْدَهُمَا اِعْتَاقُ النِّصْفِ اِعْتَاقُ الْكُلِّ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ .

অনুবাদ : আর যদি নিজের গোলামকে কাফফারা বাবদ প্রথমে অর্ধেক আজাদ করে, অতঃপর বাকি অর্ধেক কাফফারা বাবদই আজাদ করে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, দুটি পৃথক বাক্য উচ্চারণ করে সে যেন তাকে আজাদ করেছে, আর ত্রুটি তার নিজের মালিকানাতেই সাব্যস্ত হয়েছে এবং কাফ্ফারা বাবদ আজাদ করার কারণেই হয়েছে। আর এ ধরনের ত্রুটি [কাফ্ফারার জন্য] প্রতিবন্ধক নয়। যেমন– কোরবানীর জন্য বকরি শোয়াল আর তখন চোখে ছুরি লেগে গেল। পূর্ববর্তী সুরতটি ভিন্ন। কেননা, সেখানে ত্রুটি শরিকদারের মালিকানায় সাব্যস্ত হয়েছে। এ হুকুম হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মূলনীতি অনুযায়ী। আর সাহেবাইনের মতে, মুক্তিদান আংশিকতাকে গ্রহণ করে না। সুতরাং অর্ধেক আজাদ করার অর্থ পূর্ণ গোলামকেই আজাদ করা। তাই দুই বাক্যে আজাদ করা হবে না। আর যদি কাফ্ফারা বাবদ আপন গোলামের অর্ধেক আজাদ করে, তারপর যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর অবশিষ্ট অংশ আজাদ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তা জায়েজ হবে না। কেননা, তাঁর মতে মুক্তিদান আংশিকতাকে গ্রহণ করে। অথচ 'মিলনের' পূর্বে মুক্তিদানের কথা স্পষ্ট প্রমাণিত। কিন্তু এখানে অর্ধেক গোলামের মুক্তি সম্পন্ন হয়েছে মিলনের পরে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, অংশবিশেষ মুক্তিদানের অর্থ পূর্ণ গোলামকেই মুক্তিদান, সেহেতু পূর্ণ গোলামের মুক্তি সহবাসের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ الخ - গোলাম আজাদ করার আরেকটি মূলনীতি : প্রকাশ থাকে যে, গোলাম মুক্তিদানের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মূলনীতি হলো, মুক্তিদান আংশিকতাকে গ্রহণ করে। অতএব শরিকদার ব্যতীতই নিজের অংশ আদায় করতে পারবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, মুক্তিদান আংশিকতাকে গ্রহণ করে না; বরং অর্ধেক আজাদ করার অর্থ হলো, পূর্ণ গোলাম আজাদ করা। যেমন ফাতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে–

لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوْزُ بِنَاءً عَلَى تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ وَعَدَمِهِ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ فَإِعْتَاقُ الصِّفَةِ إِعْتَاقُ كُلِّهِ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ ٤ (١٠٠)

لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ .

সাহেবাইনের নিকট মুক্তিদান আংশিকতাকে গ্রহণ করে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, আংশিকতাকে গ্রহণ করে।
–[ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড, ১০০ পৃ.]

উক্ত মূলনীতির আলোকে কিতাবে বর্ণিত মাসআলায় মতানৈক্য হয়েছে। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, মুক্তিদান تَجَزِّى [আংশিকতা] -কে গ্রহণ করে অতএব প্রথম বাক্যে অর্ধেক এবং দ্বিতীয় বাক্যে বাকি অর্ধেক আজাদ হবে। তবে যেহেতু একই মালিকানায় তসররুফ হয়েছে সেহেতু এটা মুক্তিদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বের সুরত এর ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ, সেখানে মালিকানা ভিন্ন হওয়ার কারণে আংশিক গোলামই আজাদ হবে। পূর্ণ গোলাম আজাদ না হওয়ায় কাফফারার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। আর সাহেবাইনের নিকট যেহেতু মুক্তিদান تَجَزِّى [আংশিকতা] -কে গ্রহণ করে না, তাই প্রথম বাক্যেই পূর্ণ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে; পৃথক বাক্যে নয়। আর যদি ব্যক্তি প্রথম অর্ধেক আজাদ করার পরে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলেও সাহেবাইনের নিকট তা জায়েজ হবে। কেননা, প্রথমেই তো পূর্ণ গোলাম আজাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আযম (র.)-এর মতে, তা জায়েজ হবে না। কেননা, এখানে অর্ধেক আজাদ পাওয়া গেছে স্পর্শের পূর্বেই।

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَمَّا التَّتَابُعُ فَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنِ الظِّهَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبَهُ اللّٰهُ وَالصَّوْمُ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا مِنْ خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا إِسْتَانَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رحـ) لَا يَسْتَانِفُ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ إِذْ لَا يُفْسِدُ بِهِ الصَّوْمَ وَهُوَ الشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا فَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَفِيمَا قُلْتُمْ تَاخِيرُ الْكُلِّ عَنْهُ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّرْطَ فِي الصَّوْمِ أَنْ يَّكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَأَنْ يَّكُونَ خَالِيًا عَنْهُ ضَرُورَةً بِالنَّصِّ وَهٰذَا الشَّرْطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَانِفُ وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ إِسْتَانَفَ لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً ـ

অনুবাদ : যিহারকারী যদি আজাদ করার মতো গোলাম না পায়, তাহলে তার কাফফারা হলো লাগাতার দুমাস সিয়াম পালন। তন্মধ্যে রমজান মাস, দুই ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরীক থাকতে পারবে না। লাগাতার শর্ত এ কারণে যে, তা 'নস' দ্বারা প্রমাণিত। আর রমজান মাস তো যিহারের সিয়াম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা, তাতে আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াজিব করেছেন, তা বাতিল করা হয়, আর এ সকল দিনে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ। সুতরাং এই [দিনের] সিয়াম পূর্ণ ওয়াজিবের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আর যদি এ দুই মাসের রাত্রে স্বেচ্ছায় কিংবা দিনে ভুলবশত যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে না। কেননা, এ সহবাস ধারাবাহিকতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কারণ, এর দ্বারা তো সিয়াম ফাসেদ হচ্ছে না। আর ধারাবাহিকতাই হচ্ছে কাফফারার সিয়ামের শর্ত। আর সহবাসের উপর সিয়ামকে অগ্রবর্তী করা যদিও শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তাতে সিয়ামের অন্তত কিছু অংশকে সহবাসের উপর অগ্রবর্তী করা হয়। পক্ষান্তরে আপনাদের গৃহীত মতে তো সমগ্র সিয়ামকে সহবাসের পশ্চাদ্বর্তী করা হয়। তরফাইনের দলিল এই যে, কাফফারার সিয়াম ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সিয়ামগুলো সহবাসের পূর্বে হওয়া এবং সহবাস থেকে মুক্ত হওয়া। এই দ্বিতীয় শর্তটি হলো আয়াতের অনিবার্য দাবি। আর মধ্যবর্তী সহবাস দ্বারা উক্ত শর্তটি বিলুপ্ত হচ্ছে। সুতরাং সিয়াম নতুনভাবে পালন করতে হবে। আর যদি কোনো ওজরের কারণে কিংবা বিনা ওজরে ঐ দুই মাসের একদিনও সিয়াম পালন না করে, তাহলে নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে। কেননা, সাধারণত সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : যিহারকারী ব্যক্তি যদি গোলাম আজাদে অক্ষম হয়। [অর্থের অভাবে কিংবা না পাওয়ার কারণে], তাহলে যিহারকারী লাগাতারভাবে দু মাস রোজা রাখবে। যে দু মাসের মাঝে রমজান হবে না। কেননা, রমজানে যিহারের রোজা রাখলে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশ বাতিল করা লাযিম আসে। তাই রমজানে যেই রোজাই রাখা হোক না কেন তা রমজানের রোজা হিসেবেই গণ্য হবে এবং দুই ঈদের দিন ও ঈদুল আযহার পরে তিনদিন না হতে হবে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– أَنْ لَا تَصُومُوا هٰذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ 'এ [নিষিদ্ধ] দিনগুলোতে তোমরা রোজা রাখবে না। কেননা, এসব হলো পানাহার এবং স্ত্রীসহবাসের দিন।' অতএব বুঝা গেল যে, এই নিষিদ্ধ দিনে কোনো প্রকারের রোজা রাখা যাবে না। আর ধারাবাহিক হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যেহেতু এটা স্পষ্ট কুরআনের নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا 'আর যারা গোলাম আজাদে অসমর্থ হবে তারা ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা রাখবে।' উল্লেখ্য যে, যদি চাঁদের মাস হিসেবে রোজা রাখে, তাহলে মাস হিসেবে রোজা রাখবে ২৯ শা হোক বা ৩০ শা হোক। আর যদি মাসের মধ্যখানে শুরু করে, তাহলে ৬০ দিন রোজা রাখবে। এ ক্ষেত্রে যদি ৫৯ টি রোজা রেখে ভঙ্গ করে, তাহলে আবার নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ جَامَعَ الَّتِيْ ظَاهَرَ مِنْهَا الخ : **দ্বিতীয় মাসআলা :** রোজা দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায়কারী ব্যক্তি যদি রোজা রাখার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রাত্রে ইচ্ছাকৃত বা দিনে ভুলবশত যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে উক্ত রোজা দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় সহীহ হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ আছে। তরফাইন (র.)-এর অভিমত হলো, আবার নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে। ইমাম মালেক (র.) ও তা-ই বলেন। তাঁদের **দলিল :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا "[উভয়ে] সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তা পালন করবে।" উক্ত আয়াতের দুটি দাবি– ১. সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে রোজা রাখা এবং ২. রোজা রাখা অবস্থায় সঙ্গমমুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটিকে লাযিম করে। এখন যদি রোজার মধ্যবর্তী সময়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত শর্ত বাতিল হওয়া লাযিম হয়ে যায়। শর্ত যখন বাতিল হবে তার দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ও [مَشْرُوْطٌ] বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তার কাফ্‌ফারা সহীহ হবে না; নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত : নতুনভাবে রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। **দলিল :** রাত্রে ইচ্ছাকৃত এবং দিনে ভুলে সহবাস করলে যেহেতু রোজা ভঙ্গ হয় না, অতএব ধারাবাহিতার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হবে না। আর যদি যিহারকৃত মহিলা ভিন্ন অন্যের সাথে দিনের বেলায় স্বেচ্ছায় সহবাস করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে নতুনভাবে রোজা আরম্ভ করতে হবে। কেননা, সে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, যার দ্বারা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি অন্যের সাথে দিনে ভুলবশত কিংবা রাত্রে সহবাস করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে না। অনুরূপভাবে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে যদি দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করে, তাহলেও সবার ঐকমত্যে নতুন রোজা শুরু করতে হবে।

وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمَ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيرُ مَالِكًا بِتَمْلِيكِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةَ ذٰلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بْنِ صَخْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَيُعْتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ ذٰلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّكٰوةِ.

অনুবাদ : গোলাম যদি যিহার করে, তাহলে তার কাফ্ফারা সিয়াম ছাড়া অন্য কিছু জায়েজ নয়। কেননা, কোনো সম্পদের উপর তার মালিকানা নেই। সুতরাং সে মাল দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার যোগ্য হতে পারে না। আর যদি গোলামের পক্ষ থেকে তার মনিব কোনো গোলাম আজাদ করে দেয় কিংবা মিসকিনকে খানা খাওয়ায়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা, সে মালিক হওয়ার যোগ্যই নয়। সুতরাং মনিব তাকে কোনো মালের মালিক বানালেও সে মালিক হবে না। যিহারকারী যদি রোজা রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا – 'আর যে [রোজা রাখতে] সক্ষম হলো না, তার কর্তব্য হলো ষাটজন মিসকিনকে আহার দান করা।' প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব কিংবা তার [সমপরিমাণ] মূল্য প্রদান করবে। কেননা, আওস ইবনে সামিত ও সাহ্ল ইবনে সাখর সম্পর্কিত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' গম। তাছাড়া আসল বিচার্য হলো প্রত্যেক মিসকিনের একদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়া। সুতরাং এটাকে সাদাকাতুল ফিত্‌র -এর উপর কিয়াস করা হবে। আর মূল্য পরিশোধের বৈধতার বিষয়টি হলো আমাদের মাযহাব। জাকাত অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزْ فِي الْكَفَّارَةِ الخ - **গোলামের কাফ্ফারা সম্পর্কে :** কোনো গোলাম যদি তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে, তাহলে তার কাফ্ফারা আদায় করার ব্যবস্থা হলো একমাত্র সিয়াম সাধনা; অন্য কিছু নয়। কেননা, বাকি দুই ব্যবস্থার [গোলাম আজাদ এবং মিসকিনকে খানা খাওয়ানো] সঙ্গে মালের সম্পর্ক রয়েছে। আর গোলাম সে নিজেই হলো অন্যের মাল। তার মধ্যে মালের মালিক হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। অতএব সে গোলাম আজাদ করার কোনো অবকাশ নেই। আর তার মনিব যদি তার পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করে দেয় কিংবা মিসকিনকে খানা খাওয়ায়, তাহলেও তার কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা, তার মাঝে মালিক হওয়ার গুণ বিলুপ্ত। সুতরাং কেউ মালিক বানালেও সে মালিক হবে না। তবে মনিব তাকে যিহারের কাফ্ফারা আদায়ের রোজা রাখার ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, যিহারের কাফ্ফারার সাথে স্ত্রীর হক সম্পর্কিত রয়েছে। যেমন ফাতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে–

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ عَبْدَهُ مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لِأَنَّهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الزَّوْجَةِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ ٤/١٠٣)

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ الخ : যিহারকারী যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। **দলিল :** ইরশাদ হচ্ছে– فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا [যে এতে [রোজা রাখতে] সক্ষম নয় তার কর্তব্য হলো ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো]।

খানার পরিমাণ : কাফফারা যদি গম বা গমের আটা বা গমের ছাতু দ্বারা আদায় করে, তবে আধা সা' অর্থাৎ এক কেজি সাড়ে সাতশত গ্রাম আদায় করতে হবে। অথবা বাজারদর এর সমমূল্য দিয়ে দেবে। তবে মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো এমন বস্তু দ্বারা মূল্য আদায় করবে, যার দ্বারা আদায় করার কথা নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যেমন – আধা সা' গমের মূল্য যদি এক কেজি চাউলের সমপরিমাণ হয়, তাহলে চাউল দ্বারা আদায় করা বৈধ। আর যদি 'নস' দ্বারা বর্ণিত এমন জিনিস দ্বারা তার মূল্য আদায় করে এবং তা ঐ জিনিসের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কম হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। অতএব আধা সা' উত্তম খেজুর যদি এক সা' গমের সমমূল্য হয়, তাহলেও আধা সা' খেজুর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় বৈধ হবে না। কেননা, খেজুরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ নস দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর যদি খেজুর বা 'যব' বা যবের আটা দ্বারা আদায় করে, তাহলে এক সা' অর্থাৎ তিন কেজি চারশ গ্রাম আদায় করতে হবে। –[আলমগীরী : ১ম খণ্ড]

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আউস ইবনে সামিত এবং সাহ্ল ইবনে সাখ্র -এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাই নিম্নে আউস ইবনে সামিত -এর ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

খাওলা বিনতে ছা'লাবা বলেন, আমি আউস ইবনে সামিতের বিবাহ-বন্ধনে ছিলাম। সে তার বার্ধক্যের দরুন কিছুটা মন্দ স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। একদা কোনো এক বিষয়ে আমি তার প্রতিবাদ করলাম। সে আমাকে বলল– أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ - 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়।' অতএব সে বের হয়ে তার সাথিদের মাঝে গিয়ে বসল। এরপর আমার নিকট ফিরে এসে আমাকে তার কাম পূর্ণ করার কথা বলল। আমি বললাম, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না– আমি যা বলেছি তার সমাধান আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে আসা পর্যন্ত অতঃপর সে আমার উপর পড়ে গেল। তখন আমি তাকে প্রতিহত করতে লাগলাম একজন মহিলার বৃদ্ধকে প্রতিহত করার ন্যায়। তখন আমি বের হয়ে প্রতিবেশীদের নিকট চলে গেলাম এবং কাপড় পরিধান করে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, [দেখ] সে বৃদ্ধ লোক, তোমারই স্বামী, তোমারই চাচাতো ভাই। তুমি তার সঙ্গে সদাচরণ কর। তখন আমি তার মন্দ স্বভাবের অভিযোগ আল্লাহর দরবারে করলাম। তখন রাসূল ﷺ -এর উপর এমন ছাপ দেখলাম, যা ওহী অবতরণকালে হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত অবস্থার পরিবর্তন হলে রাসূল ﷺ বললেন, তোমার এবং তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিত বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর রাসূল ﷺ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا তেলাওয়াত করে বললেন, তোমার স্বামীকে একটি গোলাম আজাদ করার নির্দেশ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সে এতে সক্ষম নয়। অতঃপর বললেন! তাহলে লাগাতার দুইমাস রোজা রাখতে বল। আমি বললাম, সে একেবারে বৃদ্ধ, রোজা রাখতে অক্ষম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে বল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তার নিকট তো কিছুই নেই। [এ কথা শুনে] রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আমি তাকে এক فَرَقٌ [ফারাক] দিয়ে সাহায্য করব।

হাদীসে فَرَقٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। ফারাক হলো সে কালে প্রচলিত একটি পরিমাপের নাম। আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে– اَلْفَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا - ফারাক হলো ষাট সা' -এর একটি ওজন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে– ফারাক হলো ত্রিশ সা' ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অপর এক বর্ণনায় পনের সা' ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন পাত্রকে ফারাক বলে। ইমাম আবূ দাউদ এ সব বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, শেষোক্ত মতটি অধিক শুদ্ধ। তাছাড়া যুক্তির দাবিও তা-ই, কেননা, যদি এক 'ফারাক সমান ষাট সা' হতো তাহলে দুই ফারাক খাদ্য প্রদানের প্রয়োজন হতো না; এক ফারাকেই যথেষ্ট হতো। অথচ হাদীসে দুই ফারাকের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল : ষাটজন মিসকিনের পূর্ণ একদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করার বিষয়টি যুক্তিযুক্তও বটে। কেননা, তাকে সাদাকাতুল ফিত্‌রের উপর কিয়াস করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হলো, যিহারের মাঝে সংখ্যা এবং পরিমাণ উভয়টাই ঠিক রাখতে হবে পক্ষান্তরে সাদাকাতুল ফিত্‌রের মাঝে শুধু পরিমাণ ঠিক রাখার প্রয়োজন হয়; সংখ্যা ঠিক রাখার প্রয়োজন নেই। তাই যিহারের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে ত্রিশ মিসকিনকে ষাটজনের খাবার দেওয়া যাবে না।

গ্রন্থকার (র.) আরো বলেন যে, মূল্য পরিশোধ করার বিধান শুধু হানাফী মাযহাব মতে, যা কিতাবুয যাকাত [যাকাত অধ্যায়]-এ আমরা বিস্তারিত বলেছি।

فَإِنْ أَعْطَى مَنًّا مِنْ بُرٍّ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ جَازَ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ إِذِ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَاهُ لِأَنَّهُ اِسْتِقْرَاضٌ مَعْنًى وَالْفَقِيْرُ قَابِضٌ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيْكُهُ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيْلًا كَانَ مَا أَكَلُوْا أَوْ كَثِيْرًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يُجْزِيْهِ إِلَّا التَّمْلِيْكُ اِعْتِبَارًا بِالزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَهٰذَا لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ فَلَا يَنُوْبُ مَنَابَهُ الْإِبَاحَةُ وَلَنَا أَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الطَّعْمِ وَفِي الْإِبَاحَةِ ذٰلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِيْكِ أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الزَّكٰوةِ الْإِيْتَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَدَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيْكِ حَقِيْقَةً.

অনুবাদ : আর যদি [কেউ] সা'-এর এক চতুর্থাংশ গম এবং তার অর্ধ সা' খেজুর বা যব দেয়, তবে জায়েজ হবে। কেননা, এতে উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে এবং এগুলোর মৌলিক শ্রেণী এক ও অভিন্ন। যদি অন্য কাউকে তার যিহারের কাফফারা বাবৎ তার পক্ষ থেকে আহার দান করতে বলে, আর সে তা করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তা জায়েজ হবে। কেননা, গুণগতভাবে এটা হচ্ছে ঋণ গ্রহণ। আর দরিদ্র ব্যক্তিটি হচ্ছে প্রথমে আদেশদাতার পক্ষ থেকে গ্রহণকারী, অতঃপর নিজের জন্য হস্তগতকারী। সুতরাং আদেশদাতার পক্ষ থেকে মালিকানা গ্রহণ অতঃপর দরিদ্রকে মালিকানা দান সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তাদের সকাল-বিকাল খাবার খাইয়ে দেয়, তাহলে জায়েজ হবে। অল্প আহার করুক কিংবা বেশি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মালিক বানিয়ে দেওয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। তিনি জাকাত ও সাদাকাতুল ফিত্‌রের উপর কিয়াস করেন। আর তা এজন্য যে, মালিকানা প্রদান হচ্ছে অধিকতর প্রয়োজন নিবারক। সুতরাং إِبَاحَةٌ [শুধু খাওয়ানোর অনুমতি প্রদান] তার স্থলবর্তী হতে পারে না। আমাদের দলিল এই যে, আয়াতে বর্ণিত শব্দ হচ্ছে إِطْعَامٌ আর এর মূল অর্থ হচ্ছে আহার গ্রহণের সুযোগ প্রদান। আর إِبَاحَةٌ [বসে যত ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি প্রদান] -এর মধ্যে তা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন পাওয়া যাচ্ছে মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে জাকাতের ক্ষেত্রে [নস এর শব্দ] إِيْتَاءٌ [প্রদান] এবং সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে أَدَاءٌ ওয়াজিব। আর এ দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মালিক বানানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْطَى مَنًّا مِنْ بُرٍّ الخ : এক সা' -এর চার ভাগের এক ভাগ হলো এক مَنٌّ। বর্তমান হিসাবে ৮৭১.৩০ গ্রাম। ...দি কাফফারা আদায়কারী একজন মিসকিনকে দুই পদ মিলিয়ে এক নেসাব পরিমাণ খাবার দান করে। যেমন– গম প্রদান ... এক মন তথা এক সা' এর চার ভাগের এক ভাগ, আর যব বা খেজুর প্রদান করল অর্ধ সা', তাহলে তা জায়েজ হবে।

কেননা, এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো খাদ্য প্রদান। খাদ্য ও ক্ষুধা নিবারণের বিবেচনায় গম, যব ও খেজুর একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, একটিকে অপরটির সম্পূরক করা জায়েজ। পক্ষান্তরে ভিন্ন শ্রেণীর হলে দুরস্ত হবে না। যেমন ইয়ামীনের কাফফারা বাবত দশজন মিসকিনের পরিবর্তে পাঁচজনকে যদি আহার দান করে, আর পাঁচজনকে দেয় পোশাক এবং পোশাক খাবার অপেক্ষা সস্তা হয়, তাহলে যথেষ্ট হবে না। কারণ, পোশাকের উদ্দেশ্য ক্ষুধা নিবারণ নয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ الخ - **যিহারকারীর পক্ষ থেকে অন্য কেউ কাফ্ফারা আদায় করা প্রসঙ্গে :** যিহারকারী যদি অন্য কাউকে বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে খানা খাইয়ে দাও, আর নির্দেশিত ব্যক্তি তা পালন করে, তাহলে তা কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, যিহারকারী নিজের পক্ষ হতে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া মূলত এটা তার [নির্দেশিত] থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলো। আর ফকির ও দরিদ্র ব্যক্তিটির উক্ত নির্দেশিত ব্যক্তি হতে গ্রহণ করার অর্থ হলো, সে প্রথমে آمِرْ [নির্দেশদাতা]-এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করত পরে নিজের জন্য তা গ্রহণ করল। অতএব এ অর্থে تَمَلُّكْ [নিজের মালিকানা] সাব্যস্ত হওয়া এবং تَمْلِيْكْ [অন্যকে মালিক বানানো] অর্থ এখানে বিদ্যমান, তাই তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

খানা খাওয়ানো প্রসঙ্গে : যিহারকারী যদি ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা পেট পুরে খানা খাইয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, তা জায়েজ হবে। **দলিল :** আল্লাহর বাণী– فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا [ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো]-এর অর্থ হলো, তাদের খানা খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আর এ অর্থ খানার অনুমতি প্রদান করার মধ্যে অর্জন হচ্ছে। অতএব মালিক বানানো কিংবা খানার অনুমতি প্রদান উভয় সুরতেই নস -এর অর্থ আদায় হয়ে যায়। তবে জাকাত এবং সাদাকাতুল ফিতরের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, জাকাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– وَآتُوا الزَّكٰوةَ - 'তোমরা জাকাত প্রদান কর।' আর সাদাকাতুল ফিত্‌রের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– أَدُّوْا عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ - 'যাদের দায়িত্বভার তোমাদের উপর তাদের পক্ষ থেকে আদায় কর।' উক্ত দলিলদ্বয়ের মাঝে إِيْتَاءْ এবং أَدَاءْ শব্দদ্বয় স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, এসব ক্ষেত্রে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। কাফ্ফারার বিষয়টি এমন নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব হলো– সকাল-সন্ধ্যা শুধু খানা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে না; বরং কাফ্ফারার ক্ষেত্রেও تَمْلِيْكْ তথা মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

দলিল : মালিক বানানোর অর্থ হলো, মিসকিনকে তার প্রয়োজন মতো ব্যয় করার সুযোগ করে দেওয়া, যাতে সে তার একান্ত প্রয়োজনে তা ব্যয় করতে পারে, যা শুধু খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। অতএব, জাকাতের ও সাদাকাতুল ফিতরের ন্যায় কাফ্ফারার মাঝেও মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

وَلَوْ كَانَ فِيْمَنْ عَشَاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيْمٌ لَا يُجْزِيْهِ لِاَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيْ كَامِلًا وَلَابُدَّ مِنَ الْاِدَامِ فِيْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ لِيُمْكِنَهُ الْاِسْتِيْفَاءُ اِلَى الشَّبْعِ وَ فِيْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْاِدَامُ وَاِنْ اَعْطٰى مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِّيْنَ يَوْمًا اَجْزَاهُ وَاِنْ اَعْطَاهُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ اِلَّا عَنْ يَوْمِهِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ فَالدَّفْعُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ كَالدَّفْعِ اِلٰى غَيْرِهِ وَهٰذَا فِي الْاِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَاَمَّا التَّمْلِيْكُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفْعَاتٍ فَقَدْ قِيْلَ لَا يُجْزِيْهِ وَقَدْ قِيْلَ يُجْزِيْهِ لِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلَى التَّمْلِيْكِ تَتَجَدَّدُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا اِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِاَنَّ التَّفْرِيْقَ وَاجِبٌ بِالنَّصِّ .

অনুবাদ : আহার গ্রহণকারীদের মাঝে যদি দুধ ছাড়ার বয়সের শিশু থাকে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, সে পূর্ণ আহার খেতে পারে না। যবের রুটির ক্ষেত্রে সালন দেওয়াও জরুরি, যাতে তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারে। আর গমের রুটির ক্ষেত্রে সালন দেওয়াও জরুরি, যাতে তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারে। আর গমের রুটির ক্ষেত্রে সালন দেওয়া শর্ত নয়। যদি একজন মিসকিনকে ষাট দিন খাদ্য দান করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু একদিনে একজনকে ষাটজনের পরিমাণ দান করলে তা একদিনের অধিকের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাবগ্রস্তের অভাব মিটানো। আর প্রয়োজন প্রতিদিন নবায়িত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় দিন একই ব্যক্তিকে দান করা অন্য একজনকে দান করার মতো হবে। إِبَاحَةٌ [আহার গ্রহণের অনুমতি দান] -এর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। পক্ষান্তরে একজন মিসকিনকে একদিনে দফায় দফায় মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন, গ্রহণযোগ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন, গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, একই দিনের মালিকানা প্রদানের প্রয়োজন নবায়িত হতে পারে। পক্ষান্তরে একই দিনে [একই মিসকিনকে] এক দফায় একাধিক পরিমাণ প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আলাদাভাবে প্রদান 'নস' দ্বারা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيْمَنْ عَشَاهُمْ صَبِيٌّ الخ - **দুধের শিশুকে খানা খাওয়ানো প্রসঙ্গে :** যিহারের কাফফারার মাঝে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানোর বিধান রয়েছে। এখন কেউ যদি সন্ধ্যায় এমন ষাটজন লোককে খাওয়ায়, যাদের মাঝে দুধ ছাড়ার বয়সের বাচ্চাও রয়েছে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির কাফফারা আদায় হবে না। প্রমাণ : দুধের শিশু এখনো পূর্ণ খাবারে অভ্যস্ত নয়; বরং তার আহার দুধ ও অন্যান্য খাবারের সমন্বয়ে। অতএব, সে পূর্ণ খাবার খেতে সক্ষম নয়।

উল্লেখ্য যে, যবের রুটি খাওয়ানোর অবস্থায় তার সাথে তরকারির ঝোল দিতে হবে, যাতে তৃপ্তিসহ আহার করতে পারে। আর যদি আটার রুটি দিয়ে আহার দান করে, তাহলে তার সঙ্গে সালন দেওয়া জরুরি নয়। [কেননা, আটার রুটি তরকারি ছাড়াও তৃপ্তিসহ খাওয়া যায়]।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطٰى مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِّيْنَ الخ - **এক মিসকিনকে ষাট দিন আহার দান প্রসঙ্গে :** একই মিসকিনকে যদি ষাট দিন আহার দান করে, তাহলেও তার কাফফারা সহীহ হবে। আর যদি এক দিনেই তাকে ষাট দিনের আহার দান করে দেয়, তাহলে শুধু একদিনেরই কাফফারা আদায় হবে। বাকি উনষাট দিনের কাফফারা আবারো দৈনিক আদায় করতে হবে। **তার দলিল :** কাফফারার উদ্দেশ্যই হলো অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজন দূর করা। আর মানুষের প্রয়োজন তো দৈনিক নতুনভাবে দেখা দেয়। সুতরাং দ্বিতীয় দিন ঐ মিসকিনকে দেওয়া অন্য মিসকিনকে দেওয়া একই কথা। অতএব, এক মিসকিনকে ষাট দিন আহার দেওয়া ষাট মিসকিনকে আহার দেওয়ার নামান্তর। তবে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে, এক মিসকিনকে দেওয়ার দ্বারা তার কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ষাট মিসকিনের ব্যাপারে।
–[ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড, ১০৬ পৃ.]

قَوْلُهُ وَهٰذَا فِى الْاِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ الخ - **একই দিনে একজন মিসকিনকে ষাটবার আহার প্রদানের অনুমতি প্রসঙ্গে :** যদি একই দিনে একজন মিসকিনকে পরপর ষাট জনের হারে আহার দানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা জায়েজ হবে না। কেননা, ষাটজন মিসকিনকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছে। আর তা বাস্তবেও পাওয়া যায়নি এবং গুণগতভাবেও তা প্রমাণিত হয়নি। কেননা, এক মিসকিনের দৈনিক ষাটবার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

একজন মিসকিনকে সম্পূর্ণ আহারের মালিকানা প্রদান সম্পর্কে : যদি একজন মিসকিনকে একদিনে দফায় দফায় সম্পূর্ণ পরিমাণের মালিকানা প্রদান করে, তাহলে কেউ কেউ বলেন, জায়েজ হবে। **দলিল :** কোনো জিনিসের মালিক বানানোর প্রয়োজনীয়তা একই দিনে নবায়ন হতে পারে। কেননা, মানুষের প্রয়োজন বিভিন্নমুখি হয়ে থাকে। সুতরাং একই দিনে বিভিন্ন দফায় যদি প্রদান করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন বিভিন্ন দিনে একই জনকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

আর কেউ কেউ বলেন, উক্ত সুরত গ্রহণযোগ্য হবে না। অভাব দূর করাই হলো গ্রহণযোগ্য। আর একবার প্রদানের মাধ্যমে অভাব দূর হয়ে যায়। পরের বার অভাব ছাড়া প্রদান করা হবে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

এক দফায় প্রদান প্রসঙ্গে : যদি একই মিসকিনকে এক দফায় পূর্ণমান প্রদান করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। **দলিল :** কুরআনের নির্দেশ হলো– إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا [ষাটজনকে আলাদাভাবে আহার প্রদান করা] পাওয়া যাওয়া কর্তব্য। সুতরাং একবার যখন সে আহার গ্রহণ করল তখন সেদিনের প্রয়োজন তার পূর্ণ হয়ে গেল। পরবর্তী দিনের পূর্বে আর নতুনভাবে এই প্রয়োজন দেখা দেবে না। যেমন হাজী সাহেব যদি একবারে সাত কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে একবারের কঙ্করই আদায় হবে। –[ইনায়া]

وَاِنْ قَرُبَ الَّتِىْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ لَمْ يَسْتَاْنِفْ لِاَنَّهُ تَعَالٰى مَا شَرَطَ فِى الْاِطْعَامِ اَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ اِلَّا اَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْمَسِيْسِ قَبْلَهُ لِاَنَّهُ رُبَّمَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسِيْسِ وَالْمَنْعُ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوْعِيَّةَ فِىْ نَفْسِهٖ . وَاِذَا اَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمْ يَجْزِهٖ اِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يُجْزِيْهِ عَنْهُمَا وَاِنْ اَطْعَمَ ذٰلِكَ عَنْ اِفْطَارٍ وَظِهَارٍ اَجْزَاهُ عَنْهُمَا لَهُ اَنَّ بِالْمُؤَدّٰى وَفَاءٌ بِهِمَا وَالْمَصْرُوْفُ اِلَيْهِ مَحَلٌّ لَّهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوْ اِخْتَلَفَ السَّبَبُ اَوْ فَرَّقَ فِى الدَّفْعِ وَلَهُمَا اَنَّ النِّيَّةَ فِى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ وَفِى الْجِنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَاِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ وَالْمُؤَدّٰى يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ اَدْنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النُّقْصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا كَمَا اِذَا نَوٰى اَصْلَ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا اِذَا فَرَّقَ فِى الدَّفْعِ لِاَنَّهُ فِى الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِىْ حُكْمِ مِسْكِيْنٍ اٰخَرَ .

অনুবাদ : যদি আহার দানের মধ্যবর্তী অবস্থায় যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে নতুনভাবে আহার দান করতে হবে না। কেননা, আহার দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সহবাসের পূর্বে হওয়ার শর্ত আরোপ করেননি। তবে আহার দান সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে সহবাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, হতে পারে যে, সে ইতোমধ্যে গোলাম আজাদ করতে কিংবা সওম পালনে সক্ষম হয়ে যাবে। তখন গোলাম আজাদ ও সিয়াম পালন সহবাসের পরে হয়ে যাবে। আর অন্যকোনো কারণে নিষিদ্ধ হওয়া সত্তাগত বৈধতাকে বিলুপ্ত করে না। যদি দুটি যিহার বাবৎ ষাটজন মিসকিনকে আহার দান করে এবং প্রত্যেক মিসকিনকে এক সা' করে গম দান করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, দুটির মধ্যে শুধু একটি যিহারের জন্য তা যথেষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় যিহারের জন্য যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যিহারকারী ব্যক্তি যদি একটি রোজা ভঙ্গের কাফফারা এবং একটি যিহারের কাফফারা বাবৎ উক্ত পরিমাণ আহার দান করে, তাহলে [সর্বসম্মতিক্রমে] উভয় কাফফারা বাবৎ তা যথেষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, আদায়কৃত খাদ্যদ্রব্য পরিমাণের দিক থেকে দুটি যিহারের জন্য যথেষ্ট। আর যাদের মাঝে ব্যয় করা হয়েছে তারা দুটি যিহারের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুতরাং তা দু'টি যিহারের জন্য সাব্যস্ত হবে। যেমন যদি দুটি কাফফারার সূত্র ভিন্ন হয়, কিংবা দুই অর্ধ সা' আলাদা করে প্রদান করা হয় [তবে তা জায়েজ হবে]। শায়খাইনের দলিল এই যে, একই جنس [জিনস] -এর ক্ষেত্রে [পৃথকীকরণের] নিয়ত করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ভিন্ন জিনসের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য। আর নিয়ত যখন বাতিল হলো এবং আদায়কৃত পরিমাণও একটি কাফফারার জন্য পর্যাপ্ত। কেননা, অর্ধ সা' তো নিম্নতম পরিমাণ। সুতরাং এর চাইতে কম পরিমাণ নিষিদ্ধ হবে। [এর চেয়ে] অধিক পরিমাণ নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং আদায়কৃত পরিমাণ একটি কাফফারা সাব্যস্ত হবে। যেমন– যদি শুধু কাফফারার নিয়ত করে। পক্ষান্তরে দুই অর্ধ সা' আলাদাভাবে প্রদান করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, দ্বিতীয় দফা প্রদান অন্য মিসকিনকে প্রদানের হুকুমে গণ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ قَرُبَ الَّتِىْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِىْ خِلَالِ الخ - **খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী অবস্থায় সহবাস প্রসঙ্গে :** কেউ যদি কাফ্ফারা [যিহারের] আদায় করে খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে যদি সহবাস করে, তাহলে তার কাফ্ফারা নতুনভাবে করার প্রয়োজন নেই। তবে আহার প্রদানের পূর্বে সহবাস নিষিদ্ধ হলো গোলাম আজাদ কিংবা সওম পালনে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। **দলিল :** কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনায় খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে قَبْلَ التَّمَاسِّ [সহবাসের পূর্বে] হওয়ার শর্ত আরোপ করেননি। তাই যদি কেউ আহার দানের মধ্যবর্তী সময়ে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে তার কাফ্ফারা সহীহ হয়ে যাবে। তাছাড়া খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে যদি সে গোলাম আজাদ করতে কিংবা সিয়াম পালন করতে সক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তা পালন হবে সহবাসের পর। অথচ এসব কাফ্ফারার ক্ষেত্রে قَبْلَ التَّمَاسِّ সহবাসের পূর্বে হওয়া শর্ত। অতএব, কারণে খানার মধ্যবর্তী সময়েও সহবাস করতে পারবে না। যদিও কুরআনে এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর যেহেতু অন্যের বিষয়ের কারণে এ ক্ষেত্রে সহবাস নিষিদ্ধ হয়েছে, তাই যদি কেউ সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে খানা খাওয়ানো বাতিল হবে না। যেমন– কেউ আজানের সময় বেচাকেনা করল কিংবা মাকরূহ সময়ে নামাজ আদায় করল, তাহলে মূল বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ এখানেও খানা খাওয়ানো সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّيْنَ الخ - **দুই কাফ্ফারা একই সাথে আদায় প্রসঙ্গে :** যিহারকারী যদি দুই যিহারের কাফ্ফারা আদায় করার নিয়তে ষাটজন মিসকিনকে আহার দান করে এই মর্মে যে, প্রত্যেককে এক সা' করে গম প্রদান করে তাহলে এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমামগণের মতামত : শায়খাইন [ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম ইউসুফ (র.)] -এর অভিমত হলো, উক্ত সুরতে তার এক যিহারের কাফ্ফারা আদায় হবে। অন্য যিহারের কাফ্ফারা পুনরায় আদায় করতে হবে। **দলিল :** একই জিনসের মাঝে পৃথকীকরণের নিয়ত অর্থহীন। কেননা, নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের মাঝে পার্থক্য করা। আর এখানে তো অভিন্ন শ্রেণীর জিনিস। যেমন দেখুন– কারো যদি রমজানের কয়েকটি রোজা কাজা হয়ে থাকে, তাহলে শুধু কাজা রোজার নিয়ত করাই যথেষ্ট; নির্ধারিত দিনের রোজার নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি রমজানের কয়েকটি রোজা কাজা হয়ে থাকে তাহলে শুধু কাজা রোজার নিয়ত করাই যথেষ্ট। নির্ধারিত দিনের রোজার নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি রমজানের কাজা এবং মানতের রোজা হয়, তাহলে রমজান অথবা মানত দুটির কোনটি রাখা হচ্ছে, তা নিয়তের মাধ্যমে পৃথক করতে হবে।

কেননা, দুটি সওম ভিন্ন শ্রেণীর। সুতরাং উক্ত সুরতে তার নিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, তার আদায়কৃত পরিমাণ এক কাফ্ফারার জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে। কারণ, কাফ্ফারার ক্ষেত্রে অর্ধ সা' হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অর্ধ সা'-এর কম আদায় সহীহ হবে না; বেশি আদায় সহীহ হবে। অতএব বর্ণিত মাসআলায় তার নিয়ত বাতিল হয়ে আদায়কৃত পরিমাণ এক কাফ্ফারার পক্ষ হতে আদায় সাব্যস্ত হবে। যেমনটি শুধু কাফ্ফারার নিয়ত করার দ্বারা হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : বর্ণিত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হলো এই যে, উভয় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। **দলিল :** কেননা, সে যে পরিমাণ [এক সা'] গম আদায় করেছে সেটা ভিন্নভাবে আদায় করলে দুই কাফ্ফারার পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ। আর যাদের মাঝে সে ব্যয় করল তারাও দুটি কাফ্ফারা গ্রহণের যথাযোগ্য ক্ষেত্র ও পাত্র। কেননা, এক কাফ্ফারা গ্রহণ করে তো মিসকিন 'মাসরাফ' [কাফ্ফারার উপযুক্ততা] হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না। অতএব, তার উভয় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যেমন– ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কাফ্ফারার ক্ষেত্রে সহীহ হয়ে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে আদায় করার দ্বারাও সহীহ হয়। তদ্রূপ এখানেও সহীহ হবে। কেননা, একই মিসকিনকে প্রথমে অর্ধ সা' দিয়ে পুনরায় অর্ধ সা' সেই মিসকিনকে দেওয়া অন্য মিসকিনকে দেওয়ার হুকুমে সাব্যস্ত হবে।

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا ظِهَارٍ فَاَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِىْ عَنْ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا وَكَذَا اِذَا صَامَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا جَازَ لِاَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ فَلَا حَاجَةَ اِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَاِنْ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً اَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَهُ اَنْ يَّجْعَلَ ذٰلِكَ عَنْ اَيِّهِمَا شَاءَ وَاِنْ اَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يُجْزِيْهِ عَنْ اَحَدِهِمَا فِى الْفَصْلَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَهُ اَنْ يَّجْعَلَ ذٰلِكَ عَنْ اَحَدِهِمَا فِى الْفَصْلَيْنِ لِاَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اِتِّحَادِ الْمَقْصُوْدِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ (رح) اَنَّهُ اَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّجْعَلَ عَنْ اَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا اَعْتَقَ عَنْهُمَا لِخُرُوْجِ الْاَمْرِ مِنْ يَدِهِ وَلَنَا اَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِيْنِ فِى الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيْدٍ فَتَلْغُوْ وَفِى الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيْدٌ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فِى الْحُكْمِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ هٰهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ نَظِيْرُ الْاَوَّلِ اِذَا صَامَ يَوْمًا فِىْ قَضَاءِ رَمَضَانَ عَنْ يَوْمَيْنِ يُجْزِيْهِ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ فَاِنَّهُ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ التَّمْيِيْزِ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : কারো উপর দুটি যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হলো, আর সে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটির নিয়ত না করে দুটি গোলাম আজাদ করল, তাহলে দুটি কাফফারাই আদায় হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি চার মাস সওম পালন করে কিংবা একশ-বিশজন মিসকিনকে আহার দান করে, তবে তা জায়েজ। কেননা, এখানে জিনস অভিন্ন। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে নিয়তের প্রয়োজন নেই। আর যদি উভয় কাফফারার জন্য একটি গোলাম আজাদ করে কিংবা দু মাস রোজা রাখে তবে তার এটাকে দুটির যে-কোনো একটির জন্য নির্ধারণ করার অধিকার আছে। আর যদি যিহারের এবং হত্যার কাফফারা বাবৎ [একটি গোলাম] আজাদ করে, তাহলে দুটি কাফফারার কোনোটিই আদায় হবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় সুরতেই দুটি কাফফারার কোনোটি আদায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় সুরতেই দুটি কাফফারার যে-কোনোটির জন্য সে এটাকে নির্ধারণ করতে পারে। কেননা, [পাপ মোচনের] উদ্দেশ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে সকল কাফফারা অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইমাম যুফারের (র.) দলিল এই যে, প্রতিটি যিহার বাবৎ সে অর্ধেক গোলাম আজাদ করেছে। সুতরাং দুটির পক্ষ থেকে আজাদ করার পর যে-কোনো একটির জন্য নির্ধারণ করার অধিকার আর থাকতে পারে না। কেননা, বিষয়টি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আমাদের দলিল এই যে, অভিন্ন জিনসের ক্ষেত্রে নির্ধারণের নিয়ত করা অর্থহীন। সুতরাং তা বাতিল হবে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন জিনসের ক্ষেত্রে তা অর্থবহ। আর এখানে হুকুম তথা কাফফারার ক্ষেত্রে কিসাসের ভিন্নতা কারণের ভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। প্রথমটির উদাহরণ এই যে, রমজানের দু'দিনের কাজার নিয়তে একদিন সিয়াম পালন করল, তাহলে তা একদিনের কাজার জন্য যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয়টির [শ্রেণী ভিন্নতার] উদাহরণ এই যে, যদি কাজা রোজা এবং মানতের রোজা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে [কোনটি আদায় করা হচ্ছে] তা নিয়তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা জরুরি। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا ظِهَارٍ الخ - **দুই যিহারের কাফফারা একসঙ্গে আদায় করা প্রসঙ্গে :** কারো উপর যদি দুই যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে, আর একসঙ্গে সে তার কাফফারা আদায় করে। অর্থাৎ, দুটি গোলাম আজাদ করে কিংবা চার মাস রোজা রাখে কিংবা একশত বিশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ায়, তাহলে তার উভয় কাফফারা আদায় হয়ে যাবে, যদিও নির্দিষ্টভাবে কোনো একটির নিয়ত না করে। কেননা, একই জিনসের ক্ষেত্রে নিয়ত দ্বারা পার্থক্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً الخ : আর যদি দুই যিহারের এক কাফফারা আদায় করে অর্থাৎ একজন গোলাম আজাদ করল কিংবা দুই মাস রোজা রাখল, তাহলে আমাদের [আহনাফের] এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো, ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকবে, সে যে-কোনো একটাকে নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারবে। আর যদি একটি যিহারের কাফফারা অপরটি হত্যার কাফফারা হয়ে থাকে, তাহলে আহনাফের মতানুযায়ী কোনোটিই আদায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, এ ক্ষেত্রেও তার এখতিয়ার বাকি থাকবে। সে যে-কোনো একটিকে নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারবে।

দলিল : তিনি বলেন, যেহেতু সকল কাফফারার উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো 'পাপ মোচন', এ প্রেক্ষিতে সকল কাফফারা একই শ্রেণীভুক্ত ও অভিন্ন জিনসের। আর এ কথা প্রমাণসিদ্ধ যে, একই শ্রেণীভুক্ত জিনিসের মাঝে নিয়ত ধর্তব্য নয়। নিয়ত করা এখানে নিরর্থক। অতএব শুধু কাফফারার নিয়ত করা অবস্থায় যেমন একটাকে নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করা যায় এখানেও তদ্রূপ অধিকার প্রয়োগ করা যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, উক্ত উভয় সুরতেই কোনো একটার থেকে তার কাফফারা আদায় হবে না। **দলিল :** কেননা, সে উভয় কাফফারার পক্ষ থেকে অর্ধেক গোলাম আজাদ করেছে, আর অর্ধেক গোলাম আজাদ করা কাফফারায় গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তার গোলাম আজাদ করা تَبَرُّعٌ তথা নফল হিসেবে গণ্য হবে। তাছাড়া উভয় কাফফারার পক্ষ থেকে যখন আজাদ করেছে তখন বিষয়টা তার হাতছাড়া হয়েছে। যেহেতু তার আয়ত্তে নেই, তাই এখন কোনো একটা নির্ধারণ করার সুযোগ থাকবে না।

قَوْلُهُ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الخ - **ভিন্ন জিনস প্রসঙ্গে :** উল্লেখ্য যে, কাফফারার ক্ষেত্রে জিনসের ভিন্নতা প্রকাশ পাবে سَبَبٌ -এর ভিন্নতার কারণে। সুতরাং হত্যার কাফফারা আর যিহারের কাফফারাকে ভিন্ন জিনসে গণ্য করা হবে, যদি সে ক্ষেত্রে হুকুমের কোনো তফাৎ না হয়। কেননা, দুটারই কাফফারা اِعْتَاقٌ [গোলাম আজাদ]-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এ প্রেক্ষিতে যখন ভিন্ন জিনসের প্রমাণিত হবে, তখন নিয়তেরও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে। অতএব, প্রথম সুরতেই কোনোটারই আজাদ হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে যে-কোনো একটার ক্ষেত্রে তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য। গ্রন্থকার জিনসের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, এক জিনসের উদাহরণ হলো যেমন– কেউ রমজানের দুই কাজা রোজার পক্ষ থেকে এক রোজা রাখল, ভিন্ন জিনসের উদাহরণ হলো যেমন– কারোর উপর একটি কাজা রোজা আর একটি মানতের রোজা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তার নিয়ত দ্বারা একটাকে নির্ধারণ করার সুযোগ আছে।

بَابُ اللِّعَانِ

قَالَ اِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَاءِ وَهُمَا مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا اَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَالَبَتْهُ بِمُوْجِبِ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالْاَصْلُ اَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْاَيْمَانِ مَقْرُوْنَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِيْ حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَاءِ فِيْ حَقِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَالْاِسْتِثْنَاءُ اِنَّمَا يَكُوْنُ مِنَ الْجِنْسِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ نَصَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْيَمِيْنِ فَقُلْنَا الرُّكْنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكَّدَةُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ قَرَنَ الرُّكْنَ فِيْ جَانِبِهِ بِاللَّعْنِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ .

পরিচ্ছেদ : লি'আন

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দেয়, আর তারা উভয়ে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হয় এবং স্ত্রীলোকটি এমন হয় যে, অপবাদকারীর উপর হদ্দ কায়েম হয়, কিংবা স্বামী [প্রসবের পর] স্ত্রীর সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে স্ত্রী যদি অপবাদের 'প্রতিবিধান' দাবি করে তবে স্বামীর উপর লি'আন প্রবর্তিত হবে। মূলত আমাদের মতে লি'আন হলো কসম দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং অভিসম্পাত শব্দযোগে উচ্চারিত সাক্ষীসমূহ। স্বামীর ক্ষেত্রে এটা হলো, অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের হদ্দের স্থলবর্তী। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ 'আর যারা আপন স্ত্রীগণকে [ব্যভিচারের অভিযোগে] অভিযুক্ত করে, অথচ তাদের কোনো সাক্ষী নেই, নিজেরা ব্যতীত। [এখানে নিজেদেরকে সাক্ষীদল থেকে 'ইসতিছনা' বা ব্যতিক্রম করা হয়েছে]। আর নিয়মানুযায়ী ইস্তিসনা হয়ে থাকে] সমশ্রেণী থেকে। আবার আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ - 'তখন তাদের কোনো একজনের সাক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য।' এ আয়াতে সাক্ষ্য ও কসমের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। তাই আমরা বলি যে, কসমের দ্বারা জোরদারকৃত সাক্ষ্যই হলো লি'আনের রুকন। অতঃপর রুকনের সাথে স্বামীর দিকে লা'নত বাক্য যুক্ত করা হয়েছে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, আর এটি হলো অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লি'আন [لِعَانٌ] প্রসঙ্গ : لِعَانٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো– বিতাড়ন ও দূরীকরণ। শরিয়তের পরিভাষায় লি'আন অর্থ স্বামীর পক্ষ হতে অপবাদ আরোপের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অভিসম্পাত ও গজব শব্দযোগে অনুষ্ঠিত কাজের বিনিময়। যেমন ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেন–

وَهُوَ مِنَ اللَّعْنِ وَهُوَ "الطَّرْدُ وَالْاِبْعَادُ" . وَفِى الْفِقْهِ : هُوَ اِسْمٌ لِمَا يَجْرِىْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ بِالْاَلْفَاظِ الْمَعْرُوْفَةِ . فَتْحُ الْقَدِيْرِ ٤/١١١ـ

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَا. الخ : লি'আন কখন প্রমাণিত হবে : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি ব্যভিচারিণী, কিংবা বলে, আমি তোমাকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেছি, অথবা বলে, হে ব্যভিচারিণী! অথবা স্বামী তার সন্তানের নসবকে অস্বীকার করে এবং স্ত্রী এমতাবস্থায় তার প্রতি বিধান তলব করে যে, তার অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগের উপযুক্ত, তাহলে উক্ত সুরতে জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে।

ইসলামের প্রথম যুগে লি'আনের অবস্থা : উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রথম যুগে স্ত্রীর উপর অপবাদের কারণে স্বামীর উপর حَدِّ قَذْفٍ [অপবাদের হদ্দ] প্রয়োগ করা হতো। যেমনটি অপর নারীর উপর অপবাদের কারণে হয়ে থাকে।

দলিল : আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না– এরা তো সত্যত্যাগী। –[সূরা নূর : আয়াত ৪] উক্ত আয়াতে ব্যাপকভাবে সকল সতী-সাধ্বী নারীর অপবাদের কথা বলা হয়েছে। **দ্বিতীয় দলিল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত–

قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا فِى الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ اَنْصَارِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلًا فَاِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُّمُوْهُ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ .

"তিনি [হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)] বলেন, একদা আমরা জুমার রাতে মসজিদে বসা ছিলাম, তখন একজন আনসারী সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কেমন মনে করেন যে, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে পায়, সে যদি তাকে হত্যা করে দেয়, তাহলে আপনারা তাকে [স্বামীকে] হত্যা করে দেন, আর যদি কিছু বলে তাহলে তাকে কষাঘাত করেন, আর যদি সে কিছুই না বলে তাহলে সে ক্রোধসহ চুপ থাকে। অতঃপর লোকটি বলল– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ [হে আল্লাহ তুমি [উক্ত বিষয়ে] ফায়সালা দান কর]!

অতঃপর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, স্বামীর অপবাদের কারণে তার উপর "হদ্দে কযফ" প্রয়োগ করা হতো।

আয়াতে লি'আন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . (الاٰيَة)

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত অবতীর্ণ হবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার [নিজের] স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" –[সূরা নূর : পারা-১৮]

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা شُهَدَاءُ [সাক্ষ্যপ্রদানকারীগণ] থেকে স্বামীকে আলাদা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীও সাক্ষ্যদাতাদের অর্ন্তভুক্ত। কেননা, اِسْتِثْنَاءُ -এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো مُسْتَثْنٰى এবং مُسْتَثْنٰى مِنْهُ একই جِنْس ও জাতের হওয়া আবশ্যক। অতএব স্বামী সাক্ষীদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাক্ষ্য হতে মুক্ত হওয়া নীতি বিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হবে। আর বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে لِعَانٌ [লি'আন]-কে شَهَادَتْ [সাক্ষ্য]-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তাই বুঝা যায় যে, لِعَانٌ এমন শাহাদাত [সাক্ষ্য প্রদান] -এর নাম যাকে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لِعَانٌ [লি'আন] হচ্ছে شَهَادَتْ [সাক্ষ্য প্রদান] শব্দ দ্বারা সুদৃঢ় শপথসমূহের নাম।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ আয়াতে কারীমে بِاللّٰهِ শব্দ স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, يَمِيْن [কসম]-এর অর্থে এবং شَهَادَةٌ [শাহাদাত] শব্দটিতে ইয়ামীনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং উক্ত আয়াতের মাঝে مُحْتَمَلْ -কে مُحْكَمْ -এর অর্থে গ্রহণ করা হবে।

আর হানাফী আলেমগণ বলেন, যেহেতু উক্ত আয়াতে شَهَادَتْ এবং يَمِيْن উভয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তাই আমরা বলি لِعَانٌ -এর رُكْن [রুকন] হলো এমন شَهَادَتْ যাকে শপথ দ্বারা মজবুত ও দৃঢ় করা হয়েছে।

وَفِي جَانِبِهَا بِالْغَضَبِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَاءِ إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيْهِ الشَّهَادَةُ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ هِيَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّهُ قَائِمٌ فِيْ حَقِّهِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْصَانِهَا وَيَجِبُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَفٰى وَلَدَهَا صَارَ قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا وَلَا يُعْتَبَرُ إِحْتِمَالُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْيِ مِنْ شُبْهَةٍ كَمَا إِذَا نَفٰى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيْهِ الْمَعْرُوْفِ وَهٰذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ الْفِرَاشُ الصَّحِيْحُ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْحِ قَذْفٌ حَتّٰى يَظْهَرَ الْمُلْحَقُ بِهِ وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوْقِ -

অনুবাদ : পক্ষান্তরে স্ত্রীর দিক থেকে [আল্লাহর] গজব বাক্য যুক্ত করা হয়েছে, আর এটি হলো জেনার হদ্দের স্থলবর্তী। এটি যখন সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলি যে, যেহেতু লি'আনের রুকনই হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদান সেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অদ্রূপ স্ত্রীকে এমন হতে হবে যার বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগকারীর উপর 'হদ্দ' কায়েম করা হয়। কেননা, স্বামীর ক্ষেত্রে লি'আন হচ্ছে অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী। সুতরাং স্ত্রী مُحْصَنَةٌ [সতী] হওয়া জরুরি। সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করার দ্বারাও লি'আন সাব্যস্ত হয়। কেননা, স্ত্রীর সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করার অর্থ স্পষ্টত তার উপর জেনার অপবাদ আনা। এ সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনা হবে না যে, [স্বামী হয়তো দাবি করেছে যে,] সন্তানটি সন্দেহমূলক সহবাসের কারণে অন্য কারো ঔরসে হয়েছে। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি সন্তানের স্বীকৃত পিতা থেকে ঔরসজাত হওয়া অস্বীকার করে, [তাকে অপবাদকারী গণ্য করা হয়], আর এর কারণ এই যে, বিশুদ্ধ শয্যাই হলো নসব সাবেতের মূল বিষয়। আর শরিয়তে ফাসেদ শয্যাকে বিশুদ্ধ শয্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধ শয্যা থেকে সন্তানের নসব ও পিতৃপরিচয় অস্বীকার করার অর্থই হলো ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। যতক্ষণ না ফাসেদ শয্যা হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। স্ত্রীর পক্ষ থেকে লি'আনের দাবি করার শর্ত এজন্য যে, এটি তার হক। সুতরাং তার পক্ষ থেকে হকের দাবি উত্থাপন জরুরি। যেমন অন্য সকল হকের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجِبُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, [অপকর্মের অপবাদের কারণে যেমন স্বামীর উপর হদ্দ প্রয়োগ হয় তেমনি] স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে তার [স্বামীর] ঔরসের বলে অস্বীকার করার দ্বারাও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, এ সুরতেও স্ত্রীর উপর অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমনটি হয়ে থাকে অচেনা ব্যক্তির ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কোনো সুরত গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মর্মে যে, وَطْئٌ بِالشُّبْهَةِ [সন্দেহের মাধ্যমে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া] দ্বারা সন্তানের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, সকলের ঐকমত্যে যদি কোনো অচেনা লোকও কারো সুপরিচিত পিতার নসবকে অস্বীকার করে, তাহলে সেও قَاذِفٌ [অপবাদদাতা] হিসেবে গণ্য হবে। অথচ এখানেও সন্দেহের সঙ্গমের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া নসবের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হলো– فِرَاشٌ صَحِيْحٌ সৎ-বিছানা। আর فِرَاشٌ فَاسِدٌ অসৎ-বিছানা তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব যতক্ষণ সুনিশ্চিতভাবে অসৎ-বিছানা প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ قَذْفٌ [অপবাদ] হিসেবেই গণ্য হবে।

স্ত্রীর لِعَانٌ তলব প্রসঙ্গে : গ্রন্থকার (র.) বলেন, লি'আন যেহেতু স্ত্রীর অধিকার, তাই অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এখানেও স্ত্রীর তা তলব করা আবশ্যক। কেননা, অপবাদের দ্বারা তার উপর যে কলঙ্ক অর্পিত হয়েছে لِعَانٌ তলবের মাধ্যমে সে তার উপর থেকে জেনার অপমানকর লজ্জাকে দূর করবে।

فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ وَلَوْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّصِّ إِلَّا أَنَّهُ يَبْتَدِأُ بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي فَإِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إِيفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيهِ ـ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اللِّعَانُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ فَيُصَارُ إِلَى الْمُوجَبِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (اَلْآيَة) وَاللِّعَانُ خَلْفٌ عَنْهُ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি লি'আন থেকে বিরত থাকে, তাহলে বিচারক তাকে আটক করবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লি'আন করবে অথবা নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নেবে। কেননা, এটা তার উপর ওয়াজিব একটি হক, যা সে পূর্ণ করতে সক্ষম। সুতরাং তাকে আটক করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে তার উপর ওয়াজিব বিষয়টি সম্পন্ন করে কিংবা নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, যাতে লি'আনের কারণ দূরীভূত হয়। স্বামী যদি লি'আন সম্পন্ন করে, তাহলে স্ত্রীর উপরও লি'আন ওয়াজিব হবে। প্রমাণ হলো ইতঃপূর্বে আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত। তবে স্বামীকে দিয়ে লি'আনের সূচনার কারণ এই যে, স্বামীই হচ্ছে বাদী। স্ত্রী যদি [লি'আন থেকে] বিরত থাকে, তাহলে বিচারক তাকে আটক করে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নেয়। কেননা, এ লি'আন হচ্ছে স্ত্রীর উপর স্বামীর ওয়াজিব হক। আর সে তা আদায় করতে সক্ষম। সুতরাং এই হক আদায়ের ব্যাপারে তাকে আটক করে রাখা হবে। স্বামী যদি দাস হয় কিংবা কাফের হয় কিংবা ইতঃপূর্বে অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত হয় আর সে আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। কেননা, তার দিক থেকে উদ্ভূত কারণে [অর্থাৎ, সে সাক্ষ্য প্রমাণের উপযুক্ত না হওয়ার কারণে] লি'আন দুষ্কর হয়েছে। সুতরাং অপবাদ আরোপের মূল অনিবার্য ফল সে দিকেই রুজু করা হবে। আর তা হলো নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হদ্দে কযফ– وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ (اَلْآيَة) - 'যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো।' আর লি'আন হলো তার স্থলবর্তী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ الخ : **লি'আন অস্বীকারকারীর বিধান– মাসআলা :** স্বামী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, বিচারক তাকে কয়েদ [আটক] করে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে লি'আন না করে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, স্বামী লি'আন অস্বীকার করলে তার উপর হদ্দ [দণ্ডবিধি] প্রয়োগ করা হবে। প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত মাসআলায় ইখতিলাফের মৌলিক কারণ হচ্ছে এই আমাদের নিকট অপবাদ [قَذْفٌ] -এর কারণে লি'আন ওয়াজিব হয়। আর তাদের নিকট হদ্দ ওয়াজিব হয়। হ্যাঁ যদি সে ব্যক্তি

নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। [যুক্তির আলোকে তার] প্রমাণ হলো, স্বামীর উপর লি'আন নামক হক ওয়াজিব এবং সে এই হক আদায় করতে সক্ষম, তাই উক্ত হক আদায় করা পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখা হবে। কিংবা সে নিজেকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করবে, যাতে লি'আনের কারণ দূর হয়ে যায়। লি'আনের কারণ হলো, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। কেননা, লি'আন ওয়াজিব তখনই হবে যখন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি জেনার অপবাদ দেবে এবং একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলবে। আর যদি স্বামী নিজেকেই মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, তাহলে তো আর পরস্পরের মিথ্যা বলা পাওয়া যায় না; বরং সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর কথাই মেনে নিল।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ الخ : আর যদি স্বামী লি'আন করে, তাহলে স্ত্রীর উপরও লি'আন করা ওয়াজিব। **দলিল :** উক্ত আয়াত যা আমরা ইতঃপূর্বে তেলাওয়াত করেছি তথা (الْآيَةَ) فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

লি'আন যার মাধ্যমে আরম্ভ : উল্লেখ্য যে, লি'আন প্রথমে স্বামীর কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্বামী হলো مُدَّعِىْ [বাদী] আর [لِعَانٌ] লি'আন হলো সাক্ষ্যের নাম। আর সাক্ষ্য বাদীর উপর ওয়াজিব হয়। তাই প্রথমে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ فَإِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ الخ : **মাসআলা :** স্ত্রী যদি লি'আন থেকে বিরত থাকে, তাহলে আমাদের মতে স্ত্রীকেও বিচারক আটক করে রাখবে– যতক্ষণ সে লি'আন না করে, কিংবা তার স্বামীকে সত্যায়ন করে। **দলিল :** [স্বামীর উপর যেমন লি'আন ওয়াজিব] স্ত্রীর উপরও লি'আন ওয়াজিব এবং সেও তা আদায় করতে সক্ষম। তাই এই হকের কারণে তাকে কয়েদ [আটক] করে রাখবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, স্ত্রী যদি লি'আন করা অস্বীকার করে, তাহলে তার উপর জেনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا الخ : **মাসআলা [লি'আনের ক্ষেত্রে] গোলাম, কাফের ও হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুকুম :** স্বামী যদি দাস হয় কিংবা কাফের হয় এই মর্মে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কাফের ছিল, স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছে, এবং স্বামীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বেই স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দিয়েছে। অথবা স্বামী যদি এমন হয়ে থাকে যে, ইতঃপূর্বে তাকে অপবাদ প্রমাণের কারণে তার উপর حَدّ قَذْف [হদ্দে কযফ] তথা আশি দোররা মারা হয়েছে। উক্ত তিন সুরতে স্বামী যদি তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপর লি'আন ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে সাক্ষ্যের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। অথচ লি'আনের জন্য সাক্ষ্যের উপযুক্ততা একান্ত প্রয়োজন। তাই লি'আন না হয়ে তার আসল مُوْجَبْ অর্থাৎ حَدّ قَذْف [হদ্দে কযফ] -এর দিকেই বিষয়টি রুজু হবে, যা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا .

"আর যারা সতী নারীদের প্রতি [জেনার] অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে। এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। –[সূরা নূর : আয়াত– ৪] উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে মূলত حَدّ قَذْف [হদ্দে কযফ-ই বিধান প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর আপন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে লি'আনের বিধান দেওয়া হয়েছে। অতএব কোনো কারণে যদি লি'আন প্রয়োগে অক্ষম হয়ে যায়– তাহলে তার মূল বিধান যা 'হদ্দে কযফ' তা-ই প্রয়োগ করা হবে।

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُوْدَةٌ فِيْ قَذْفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُوْنَةً أَوْ زَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ الْاِحْصَانِ فِيْ جَانِبِهَا وَامْتِنَاعِ اللِّعَانِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إِذَا صَدَّقَتْهُ وَالْاَصْلُ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ اَلْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَلَوْ كَانَا مَحْدُوْدَيْنِ فِيْ قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে স্বামী যদি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, আর স্ত্রী দাসী কিংবা কাফের কিংবা অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্তা হয়, কিংবা এমন স্ত্রীলোক হয়, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপনকারীর উপর হদ্দ কায়েম হয় না। যেমন নাবালিকা হওয়া কিংবা বিকৃতমস্তিষ্কা হলো কিংবা ব্যভিচারিণী হওয়া, তাহলে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং লি'আনও নয়। কেননা, স্ত্রীর দিক থেকে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নেই এবং সে মুহসিনও নয়। আর লি'আন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে স্ত্রীর দিক থেকে উদ্ভূত কারণে। সুতরাং হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যেমন– স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলে। এর দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী– أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ اَلْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ ـ [চার প্রকার স্ত্রীলোক এবং তাদের স্বামীদের মাঝে লি'আন প্রয়োগ হয় না। মুসলিমের বিবাহাধীন ইহুদি ও নাসরানী স্ত্রী। স্বাধীন লোকের বিবাহাধীন দাসী স্ত্রী, দাসের বিবাহাধীন স্বাধীন স্ত্রী]। আর যদি উভয়ে অপবাদ আরোপের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ الخ : **মাসআলা :** স্বামী যদি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হয়, আর তার স্ত্রী অন্য কারো দাসী, অথবা তার স্ত্রী কাফের, কিংবা সে এমন নারী যার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ হয়েছে। অথবা সে নাবালেগা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্কা [পাগলী] অথবা ব্যভিচারিণী হয়, যার দরুন তার উপর অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ হয় না, তাহলে এসব সুরতে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং লি'আনও ওয়াজিব হবে না।

লি'আন ও হদ্দ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ : সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা না থাকার [বিকৃত মস্তিষ্কা, কিংবা দাসী হওয়ার] কারণে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে না। আর [ব্যভিচারিণী হওয়ায়] মুহসিনা না হওয়ার কারণে তার স্বামীর উপর حَدُّ قَذْفٍ [হদ্দে কযফ] ওয়াজিব হবে না। কেননা, এর জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহসিনা হওয়া জরুরি। দলিল : আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ.... الخ - 'যারা মুহ্সিন [সতী-সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করে....]।

قَوْلُهُ وَامْتِنَاعُ اللِّعَانِ لِمَعْنًى الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, [উক্ত সুরতে] লি'আন রহিত হওয়ার কারণ হলো, মহিলার পক্ষ থেকে উদ্ভূত বিষয়। তাই স্বামীর উপর থেকে হদ্দ রহিত হবে। যেমনটি রহিত হয়ে যায় স্ত্রী স্বামীকে সত্য বলে স্বীকার করার সুরতে। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর হাদীসটিও মূল হিসেবে কার্যকর। তা হলো, চারজন নারী এমন রয়েছে যাদের মাঝে আর তাদের স্বামীদের মাঝে লি'আন সংঘটিত হয় না। যথা–

১. মুসলিম পুরুষের অধীনে কোনো ইহুদি নারী। ২. মুসলিম পুরুষের অধীনে কোনো নাসরানী নারী। ৩. আজাদ পুরুষের অধীনে কোনো দাসী নারী। ৪. দাসের অধীনে কোনো স্বাধীন নারী। উক্ত হাদীসটি হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা আবূ বকর রাজী (র.) 'মুখতাসারে ত্বাহাভীর' শরাতে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি একজন গ্রহণযোগ্য ইমাম। তাই তার সংকলিত উক্ত হাদীসের আলোকে দলিল পেশ করা যাবে। যদিও কোনো প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে তা উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَا مَحْدُوْدَيْنِ الخ : মাসআলা : গ্রন্থকার বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি مَحْدُوْدٌ فِي الْقَذْفِ [অপবাদের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত] হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর অপবাদের কারণে স্বামীর উপরে হদ্দে কযফ ওয়াজিব নয়।

وَصِفَةُ اللِّعَانِ اَنْ يَبْتَدِئَ الْقَاضِيْ بِالزَّوْجِ فَيَشْهَدُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اِنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ وَيَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ يُشِيْرُ اِلَيْهَا فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ تَقُوْلُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنَّهٗ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ وَتَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ وَالْاَصْلُ فِيْهِ مَا تَلَوْنَاهُ مِنَ النَّصِّ وَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهٗ يَاْتِيْ بِلَفْظَةِ الْمُوَاجَهَةِ يَقُوْلُ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ لِاَنَّهٗ اَقْطَعُ لِلْاِحْتِمَالِ وَجْهُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ اَنَّ لَفْظَةَ الْمُغَايَبَةِ اِذَا انْضَمَّتْ اِلَيْهَا الْاِشَارَةُ انْقَطَعَ الْاِحْتِمَالُ.

অনুবাদ : লি'আনের বিবরণ এই যে, বিচারক স্বামীকে দিয়ে শুরু করবে এবং চারবার তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, প্রতিবার স্বামী এ কথা বলবে– "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে আমি সত্যবাদী।" পঞ্চমবার বলবে, "তার বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে যদি সে [নিজে] মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত হোক।" প্রতিবারই সে স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বলবে। অতঃপর স্ত্রী চারবার সাক্ষ্য প্রদান করবে। প্রতিবার বলবে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সে আমার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে বলবে, "যদি আমার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তার [অর্থাৎ, আমার] উপর আল্লাহর গজব হোক।" এ বিষয়ে প্রমাণ হলো– ইতঃপূর্বে আমাদের তেলাওয়াতকৃত আয়াত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হযরত হাসান বর্ণনা করেছেন যে, সম্বোধনের সর্বনাম ব্যবহার করে এভাবে বলবে, "আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের যে অভিযোগ এনেছি।" কেননা, তা ভিন্ন সম্ভাবনার অধিক নিরসনকারী। কুদূরীতে উল্লিখিত বর্ণনার কারণ এই যে, তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহারের সঙ্গে যখন তার প্রতি ইঙ্গিত যুক্ত হয় তখন ভিন্ন সম্ভাবনার অবকাশ রহিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصِفَةُ اللِّعَانِ اَنْ يَبْتَدِئَ الْقَاضِيْ الخ : লি'আনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ : ইমাম কুদূরী (র.) উক্ত ইবারতে লি'আনের বিবরণ দিয়েছেন, যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ– মহিলা [স্ত্রী] যখন বিচারকের আদালতে কযফের মকদ্দমা পেশ করবে, তখন প্রথমে কাজি [বিচারক] তাকে মকদ্দমা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। যদি এতে মহিলা বিরত না হয়ে মকদ্দমার উপর জোর দাবি জানায়, আর স্বামী কযফের [অপবাদের] অস্বীকার করে দেয়, তখন মহিলার পক্ষে দুজন ন্যায়পরায়ণ [পুং] লোকের সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন, যাতে বিচারকের নিকট তার দাবি প্রমাণিত হয়। মহিলা যদি একজন পুরুষ আর দুজন মহিলাকে সাক্ষ্য

হিসেবে পেশ করে, তাহলে তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। [হ্যাঁ যদি] দুজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য পেশ করে, আর স্বামী একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য পেশ করে তার সত্যায়নে, তাহলে লি'আন রহিত হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী জেনার অপবাদের কথা স্বীকার করে, তাহলে বিচারক তার পক্ষে চারজন সাক্ষ্য প্রদানের তলব করবে। যদি জেনা প্রমাণিত হওয়ার শর্তসাপেক্ষে সে চারজন সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রীলোকের প্রতি লক্ষ্য করা হবে, সে মুহসিনা কিনা ? যদি মুহসিনা হয়ে থাকে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাত করা হবে, আর যদি মুহসিনা না হয়, তাহলে দোররা মারা হবে। আর যদি স্বামীর পক্ষে প্রমাণ না থাকে, তাহলে লি'আন ওয়াজিব হবে। এর বিবরণ এই যে, বিচারক স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উপস্থিত করে প্রথমে স্বামীর কাছ থেকে লি'আন তলব করবে, আর স্বামী চারবার সাক্ষ্য দেবে এবং প্রত্যেকবার বলবে যে, "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগের ব্যাপারে আমি সত্যবাদী।" আর পঞ্চমবার বলবে, "তার বিরুদ্ধে জেনার অভিযোগের ব্যাপারে যদি সে, [স্বামী নিজে] মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার [আমার] উপর আল্লাহর লা'নত হোক।" উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য প্রদানের সময় প্রতিবারে সে স্ত্রীর দিকে ইশারা করবে।

অতঃপর স্ত্রী অনুরূপভাবে চারবার সাক্ষ্য দেবে এবং প্রত্যেকবার এ কথা বলবে যে, "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে আমার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে [স্বামীর দিকে ইশারা করে বলবে] মিথ্যাবাদী।" পঞ্চমবার বলবে, "যদি আমার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে [স্বামী] সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার [অর্থাৎ আমার] উপর আল্লাহর গজব হোক।"

প্রণিধানযোগ্য যে, লি'আনের উক্ত বিবরণের উপর দলিল হলো আল্লাহর বাণী, যা ইতঃপূর্বে আমরা তেলাওয়াত করেছি। (اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ . اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হযরত হাসান (র.) বর্ণনা করেন যে, স্বামী সাক্ষ্য প্রদানের সময় তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার না করে সম্বোধনের সর্বনাম ব্যবহার করে এভাবে বলবে যে- فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهٖ مِنَ الزِّنَاءِ "আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের যে, অভিযোগ এনেছি।" দলিল : তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম অন্যের সম্ভাবনা রাখে, আর সম্বোধন সর্বনাম ভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার বন্ধ করে দেয়। আর আল্লামা কুদূরী (র.) যা বলেছেন তার অর্থ হলো, তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহারের সঙ্গে যখন ইঙ্গিত যুক্ত থাকবে তখনও ভিন্ন সম্ভাবনার সন্দেহ রহিত হয়ে যায়।

قَالَ وَإِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا لِاَنَّهُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بِالْحَدِيْثِ وَلَنَا اَنَّ ثُبُوْتَ الْحُرْمَةِ يُفَوِّتُ الْاِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوْفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ فَاِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِىْ مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظُّلْمِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ ذٰلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ اَمْسِكْهَا فَقَالَ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَهِىَ طَالِقٌ ثَلٰثًا قَالَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَتَكُوْنُ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) لِاَنَّ فِعْلَ الْقَاضِىْ اِنْتَسَبَ اِلَيْهِ كَمَا فِى الْعِنِّيْنِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন তারা লি'আন করবে তখন বিচ্ছেদ ঘটবে না যতক্ষণ না কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের রায় দেন। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ের লি'আন সম্পন্ন হওয়া দ্বারাই বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কেননা, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, লি'আন [উভয়ের মাঝে] স্থায়ী হুরমত সাব্যস্ত করে। আমাদের দলিল এই যে, হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সদাচারের সঙ্গে স্ত্রীকে কাছে রাখার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং স্বামীর কর্তব্য হলো উত্তম পন্থায় তাকে মুক্ত করে দেওয়া। এখন যদি সে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে কাজি অন্যায় রোধ করার উদ্দেশ্যে স্বামীর স্থলবর্তী হবেন [এবং বিচ্ছেদ কার্যকরী করবেন]। এর সমর্থন পাওয়া যায় নবী করীম ﷺ -এর সামনে লি'আনকারীর এ উক্তি দ্বারা– "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তার নামে মিথ্যা বলেছি।" তখন রাসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তাকে রেখে দাও"। সে বলল, "যদি তাকে রাখি, তাহলে সে তিন তালাক"। এ কথা সে লি'আনের পরে বলেছিল। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এ বিচ্ছেদ তালাকে বায়েন হবে। কেননা, কাজির কার্য স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে, যেমন পুরুষত্বহীন স্বামীর ব্যাপারে [কাজির ফয়সালা তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ الخ : মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী লি'আন করার পর শুধু লি'আন দ্বারাই তাদের পরস্পরের মাঝে تَفْرِيْق তথা বিচ্ছেদ ঘটবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু লি'আনের দ্বারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে– কাজির বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন নেই। দলিল : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا - 'লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো একত্র হতে পারবে না।' উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, লি'আন করলেই তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আমাদের মতে, শুধু লি'আন দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে না; বরং কাজি সাহেবের ফয়সালার মাধ্যমে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে। অতএব, কাজির ফয়সালার পূর্বে যদি তাদের একজন

মৃত্যুবরণ করে, তাহলে অপরজন তার ওয়ারিশ সাব্যস্ত হবে। কিংবা স্বামী যদি যিহার করে অথবা তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তা সাব্যস্ত হবে। **দলিল :** আমাদের দলিল হলো, লি'আনের কারণে হুরমত সাব্যস্ত হয়েছে, যার দরুন إِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوْفِ [সদাচার]-এর সঙ্গে স্ত্রীকে রাখার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব স্বামীর উপরে تَسْرِيْحٌ بِالْإِحْسَانِ [উত্তম পন্থায় তাকে মুক্ত করে দেওয়া] ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। এখন স্বামী যদি تَسْرِيْحٌ بِالْإِحْسَانِ থেকে বিরত থাকে, তাহলে কাজি সাহেব তার স্থলবর্তী হয়ে তাদের মাঝে উত্তম পন্থায় বিচ্ছেদ কার্য সম্পাদন করে দেবেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, কাজির তাফরীক [বিচ্ছেদ] প্রয়োজন।

সমর্থক দলিল : উয়াইমির আজলানী (রা.)-এর উক্তি দ্বারাও আমাদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়, যার ঘটনা নিম্নরূপ : উয়াইমির ও তাঁর স্ত্রীর মাঝে লি'আন সংঘটিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে উয়াইমির বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি আমার স্ত্রীর নামে যা বলেছি তা সব মিথ্যা বলেছি।" রাসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তাকে রেখে দাও। তিনি বললেন, যদি তাকে রাখি, তাহলে সে তিন তালাক।" এ কথা তিনি লি'আনের পরে বলেছিলেন অথচ রাসূল ﷺ তার কোনো প্রতিবাদ করেননি। বুঝা গেল যে, তার লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটেনি। অন্যথায় রাসূল ﷺ অবশ্যই তার প্রতিবাদ করে বলতেন যে, "এখন বলার কোনো ফায়দা নেই। কেননা, লি'আন দ্বারাই বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।" [যেহেতু রাসূল ﷺ এমনটি তাকে বলেননি] তাই বুঝা যায় যে, শুধু লি'আনের দ্বারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে না; বরং কাজির ফয়সালার প্রয়োজন রয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَكُوْنُ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, লি'আন দ্বারা যে বিচ্ছেদ ঘটে তা তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য হবে। **দলিল :** কাজির বিচ্ছেদের ফয়সালা স্বামীর দিকেই সম্পর্কিত হবে। যেমনটি হয়ে থাকে পুরুষত্বহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ এক বছর অপেক্ষার পর যখন কাযী উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের রায় দেবেন তখন তাদের মাঝে তালাকে বায়েন সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় দলিল : উক্ত বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর উপর থেকে নির্যাতন দূরীকরণ। আর এটা তালাক ব্যতীত সম্ভব নয়। তাছাড়া ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী থেকে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– اَللِّعَانُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ - 'লি'আন হলো তালাকে বায়েন'।

وَهُوَ خَاطِبٌ اِذَا اَكْذَبَ نَفْسَهٗ عِنْدَهُمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ تَحْرِيْمٌ مُؤَبَّدٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا نَصٌّ عَلَى التَّابِيْدِ وَلَهُمَا اَنَّ الْاِكْذَابَ رُجُوْعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوْعِ لَا حُكْمَ لَهَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ مَادَامَا مُتَلَاعِنَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَلَا حُكْمُهٗ بَعْدَ الْاِكْذَابِ فَيَجْتَمِعَانِ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি নিজের মিথ্যার স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তরফাইনের মতে সেও বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, লি'আন দ্বারা স্থায়ীভাবে হারাম হয়। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا - 'লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো একত্র হতে পারবে না।' এ হাদীস স্থায়ী হুরমতের ব্যাপারে পরিষ্কার দলিল। তরফাইনের দলিল এই যে, মিথ্যার স্বীকারোক্তির অর্থ হলো সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা। আর প্রত্যাহারের পর সাক্ষ্যের বিধানগত কোনো অস্তিত্ব থাকে না। আর [হাদীসের ব্যাপারে ব্যাখ্যা এই যে,] তারা লি'আনকারী থাকা অবস্থায় একত্র হতে পারবে না। আর এখানে মিথ্যার স্বীকারোক্তির পর লি'আন ও তার হুকুম বিদ্যমান থাকবে না। সুতরাং তারা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে একত্র হতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ خَاطِبٌ اِذَا اَكْذَبَ نَفْسَهٗ الخ : **বিচ্ছেদের পর পুনঃবিবাহ প্রসঙ্গে : মাসআলা :** লি'আনের পর কাজির রায়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হওয়ার পর যদি কোনো একজন নিজের দাবি প্রত্যাহার করে এবং অপরজনকে সত্যায়ন করে, তাহলে তার উপর 'হদ্দে কযফ' ওয়াজিব হবে। তবে এ স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের পর তাকে পুনরায় এ স্বামী বিবাহ করার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। তরফাইনের মতে, অন্যদের মতো এ স্বামীও তাকে আবার বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারে।
দলিল : স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী বলার অর্থই হলো সে তার দাবি প্রত্যাহার করল। আর প্রত্যাহারের পর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। আর হাদীসের বাণী– اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا -এর অর্থ হলো, উভয়ে লি'আনকারী অবস্থায় একত্র হতে পারবে না। আর দাবি প্রত্যাহারের পর তারা লি'আনকারী হিসেবে অবশিষ্ট থাকে না এবং লি'আনের হুকুমও বাকি থাকে না। কেননা, সে যখন নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে দাবি প্রত্যাহার করল তখন তার উপর 'হদ্দে কযফ' প্রয়োগ করা হবে। আর হদ্দের কারণে লি'আনের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে, তাই তারা আবার একত্র হতে পারবে। ইমাম ইউসুফ (র.) বলেন, লি'আনের দ্বারা حُرْمَتْ مُؤَبَّدَةٌ - [চিরদিনের জন্য স্থায়ী হারাম] সাবেত হবে। সুতরাং এই মহিলা তার জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হবে। ইমাম শাফেয়ী ও যুফার (র.)-ও উক্ত মত গ্রহণ করেছেন।

তাঁদের দলিল : হাদীসে রয়েছে– اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا সুতরাং এর দ্বারা স্থায়ী হুরমত সাবেত হবে।

وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَفِي الْقَاضِي نَسَبَهُ وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ وَصُوْرَةُ اللِّعَانِ اَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنِّىْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهٖ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ وَكَذَا فِيْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ . وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنٰى وَنَفْيِ الْوَلَدِ ذَكَرَ فِى اللِّعَانِ الْاَمْرَيْنِ ثُمَّ يَنْفِى الْقَاضِىْ نَسَبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِاُمِّهٖ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفٰى وَلَدَ اِمْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَاَلْحَقَهُ بِهَا وَلِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْ هٰذَا اللِّعَانِ نَفْيُ الْوَلَدِ فَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ مَقْصُوْدُهٗ فَيَتَضَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَّفْرِيْقِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّ الْقَاضِىَ يُفَرِّقُ وَيَقُوْلُ قَدْ اَلْزَمْتُهٗ اُمَّهٗ وَاَخْرَجْتُهٗ مِنْ نَسَبِ الْاَبِ لِاَنَّهٗ يَنْفَكُّ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهٖ .

অনুবাদ : আর যদি সন্তানের পরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে অপবাদ আরোপ হয়, তাহলে বিচারক [পিতার সাথে] সন্তানের বংশ-সম্পৃক্ততা নাকচ করে দেবেন এবং মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেবেন। এ ক্ষেত্রে লি'আনের সুরত এই হবে যে, বিচারক লোকটিকে এরূপ বলতে আদেশ করবেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সন্তানের পরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে বিষয়ে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।" স্ত্রীর পক্ষ থেকেও এরূপ [সন্তানের কথা উল্লেখসহ] বলা হবে। আর যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সন্তানকে অস্বীকার করে, তবে লি'আনের সময় উভয় বিষয়কে উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর কাজি সন্তানের পিতৃ-পরিচয় নাকচ করে তাকে আপন মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেবেন। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীর সন্তানের পরিচয়কে হিলাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এজন্য যে, এ লি'আনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান অস্বীকার করা, তাই স্বামীর অনুকূলে তার উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা হবে। সুতরাং কাজির পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের ঘোষণা সন্তানের পরিচয় নাকচ করাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিচ্ছেদ ঘোষণার সঙ্গে কাজি এ কথাও বলবে যে, তাকে পিতার বংশ-পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে মায়ের সঙ্গে জড়িত করে দিলাম। কেননা, লি'আন-সংশ্লিষ্ট বিচ্ছেদ থেকে সন্তানের পিতৃ-পরিচয় বাতিলের বিষয়টি [কখনো কখনো] পৃথকও হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানের বিষয়টি উল্লেখ জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ الخ : সন্তানের নসব অস্বীকার প্রসঙ্গে মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করে এই মর্মে যে, "তোমার গর্ভের সন্তান আমার থেকে নয়", তাহলে কাজি উক্ত ব্যক্তি থেকে লি'আন গ্রহণ করবে এভাবে যে, সে বলবে- اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اِنِّىْ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُكِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ - আমি

আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সন্তানের পরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি এতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।' আর মহিলা এভাবে বলবে, "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সন্তান অস্বীকারের মাধ্যমে আমার উপর যে অপবাদ আরোপ করেছ এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি মিথ্যাবাদী।" এভাবে লি'আন কার্য সম্পাদনের পর কাজি উক্ত সন্তানের বংশ-পরিচয় পিতা থেকে নাকচ করে দিয়ে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে দেবেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنٰى وَنَفَى الْوَلَدِ ذَكَرَ الخ : **মাসআলা** : স্বামী যদি স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ আরোপ করে এবং সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে, তাহলে লি'আনের মাঝে উভয় বিষয়কে উল্লেখ করবে। অতঃপর বিচারক সন্তানের পরিচয় স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে দেবে।

দলিল : আবূ দাউদ শরীফের ১ম খণ্ডে ৩০৭ পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে রাসূল ﷺ লি'আনের পরে হিলাল ইবনে উমাইয়ার وَهُوَ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - [যাদের তওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন তাদের একজন ছিলেন] স্ত্রীর সন্তানের পরিচয়কে হিলাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাজি সন্তানের পরিচয় পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে দেবেন।

যুক্তির আলোকে : লি'আন দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো সন্তানের বংশ-পরিচয় অস্বীকার করা। সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে تَفْرِيْق [বিচ্ছেদ] -এর ঘোষণা সন্তানের পরিচয় নাকচ করার অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং সন্তান বিচ্ছেদের বাক্য তিন্নভাবে কাজির উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বিচ্ছেদের ঘোষণার সাথে সাথে কাযী এ কথার ঘোষণাও করবেন যে, "তাকে পিতার বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার মায়ের সঙ্গে জুড়ে দিলাম।"

দলিল : লি'আনের দ্বারা বিচ্ছেদ (تَفْرِيْقٌ بِاللِّعَانِ) সন্তান অস্বীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা, লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছেদের জন্য সন্তানের পিতৃ-পরিচয় নাকচ হওয়া জরুরি নয়। যেমন- সন্তান যদি ইতোমধ্যে মারা যায়, তাহলে লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে, কিন্তু সন্তানের পিতৃ-পরিচয় নাকচ হবে না। সুতরাং কাজির পক্ষ থেকে সন্তানের বিচ্ছেদের কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করা আবশ্যক।

فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَاَكْذَبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِىْ لِاِقْرَارِهِ بِوُجُوْبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَحَلَّ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهٰذَا عِنْدَهُمَا لِاَنَّهُ لَمَّا حُدَّ لَمْ يَبْقَ اَهْلَ اللِّعَانِ فَارْتَفَعَ حُكْمُهُ الْمَنُوْطُ بِهِ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ وَكَذٰلِكَ اِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَكَذَا اِذَا زَنَتْ فَحُدَّتْ لِانْتِفَاءِ اَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ مِنْ جَانِبِهَا ـ

অনুবাদ : লি'আনের পর সাক্ষী যদি ফিরে আসে এবং নিজের মিথ্যাবাদিতা স্বীকার করে তাহলে কাজি তার উপর অপবাদের হদ কায়েম করবে। কেননা, সে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। তরফাইনের মতে এখন তার জন্য ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। কেননা, অপবাদের কারণে যখন তার উপর হদ্দ কায়েম করা হলো, তখন সে ভবিষ্যতের জন্য লি'আনের যোগ্য থাকল না। সুতরাং লি'আনের সাথে সম্পৃক্ত হারাম হওয়ার হুকুমও প্রত্যাহৃত হবে। একই হুকুম হবে যদি, অন্য কাউকে অপবাদ দানের অপরাধে হদ্দপ্রাপ্ত হয়। এর কারণ আমরা এইমাত্র বর্ণনা করেছি; তদ্রূপ যদি স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করে হদ্দপ্রাপ্ত হয়। কেননা, স্ত্রীর দিক থেকে লি'আনের যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَاَكْذَبَ الخ : **স্বামী অপবাদ অস্বীকার করা প্রসঙ্গে মাসআলা :** লি'আনের পরে যদি স্বামী তার বক্তব্য থেকে ফিরে আসে এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করে, তাহলে কাজি তার উপর 'হদ্দে কযফ' জারী করবে।

দলিল : সে নিজেই তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। অতএব তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

হদ্দ প্রয়োগের পর অভিযুক্ত মহিলার সাথে বিবাহ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হদ্দে কযফ (حَدُّ قَذْف) কায়েম করার পর ব্যক্তি ঐ মহিলাকে পুনর্বার বিবাহ করতে পারবে। সে মহিলা তার স্ত্রী হোক বা অন্য মহিলাই হোক। **দলিল :** স্বামীর উপর যখন 'হদ্দে কযফ' প্রয়োগ করা হলো– এখন তার মাঝে আর লি'আনের যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই। অতএব লি'আনের সাথে সম্পৃক্ত হুকুমও আর অবশিষ্ট থাকবে না; বরং স্থায়ী হুরমত রহিত হয়ে যাবে। তাই এখন ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قَذَفَ غَيْرَهَا الخ : মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী (خَلْوَةُ صَحِيْحَة) সঙ্গমের পূর্বে লি'আন করেছে অতঃপর মহিলার জেনার কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। তাই তার মাঝে আর লি'আনের যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং পূর্বের ন্যায় এখানেও লি'আন সংশ্লিষ্ট হুকুম তথা হুরমত রহিত হয়ে যাবে। তাই বিবাহ করা জায়েজ হবে।

وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَكَذَا لَا يُلَاعِنُ الزَّوْجُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَهٰذَا لِأَنَّهُ يَعْرِى عَنِ الشُّبْهَةِ وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِهَا .

অনুবাদ : যদি নাবালিকা কিংবা বিকৃতমস্তিষ্কা স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, তাহলে উভয়ের মাঝে লি'আন হবে না। কেননা, তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী যদি অন্য কোনো ব্যক্তি হতো, তাহলে তার উপর অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ হতো না। সুতরাং স্বামীর জন্যও লি'আন আবশ্যক হবে না। কেননা, লি'আন উক্ত হদ্দের স্থলবর্তী। তদ্রূপ লি'আন হবে না যদি স্বামী নাবালক কিংবা পাগল হয়। কেননা, এদের সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নেই। বোবা ব্যক্তির অপবাদ আরোপের সঙ্গে লি'আনের সম্পর্ক নেই। কেননা হদ্দে কযফের ন্যায় লি'আনের সম্পর্ক হচ্ছে স্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, অপবাদ সন্দেহমুক্ত নয়। আর সন্দেহের কারণে হদ্দ প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ الخ : নাবালকের অপবাদ প্রসঙ্গে : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কিংবা কোনো একজন যদি অপ্রাপ্তবয়সের হয় কিংবা কোনো একজন পাগল হয়, তাহলে উক্ত সুরতে স্বামীর অপবাদের কারণে লি'আনের তলব করা হবে না। তার দলিল হলো, লি'আনের শর্তাবলির মাঝে বর্ণিত হয়েছে যে, লি'আনকারী أَهْلُ شَهَادَةٍ [সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন] হতে হবে। আর পাগল ও নাবালকের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। তাই এ সুরতে লি'আন সাব্যস্ত হবে না। যেমনিভাবে অন্য অপবাদের ক্ষেত্রে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। তাছাড়া তারা এখনো তো শরিয়তের সম্বোধনের উপযুক্ত হয়নি।

قَوْلُهُ وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الخ : অনুরূপভাবে বাকশক্তিহীন [বোবা] ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ আরোপ করে, তাহলে তার দ্বারাও লি'আন হবে না।

দলিল : লি'আন সরীহ [স্পষ্ট] অপবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। যেমন– হদ্দে কযফ স্পষ্ট অপবাদের দ্বারা ওয়াজিব হয়। তাছাড়া বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিত দ্বারা জেনার অপবাদ প্রদানের মাঝে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই প্রসিদ্ধ মূলনীতি اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ [সন্দেহের দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়।] -এর কারণে এখানে লি'আন সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিত বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বলার স্থলবর্তী। তাই তার ইঙ্গিত দ্বারা লি'আন সাব্যস্ত হবে।

وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّى فَلَا لِعَانَ وَهٰذَا قَوْلُ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) وَ زُفَرَ (رحـ) لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِقِيَامِ الْحَمْلِ فَلَمْ يَصِرْ قَاذِفًا وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اَللِّعَانُ يَجِبُ بِنَفْيِ الْحَمْلِ إِذَا جَاءَتْ بِهٖ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِى الْأَصْلِ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهٗ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذْفُ قُلْنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِى الْحَالِ يَصِيْرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّى وَالْقَذْفُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُهٗ بِالشَّرْطِ .

অনুবাদ : স্বামী যদি বলে যে, তোমার গর্ভ আমার থেকে নয় তাহলে লি'আন লাযিম হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। কেননা, গর্ভ বিদ্যমান থাকা নিশ্চিত নয়। সুতরাং সে অপবাদ আরোপকারী হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, 'গর্ভ' অস্বীকার করলে যদি সে ছয় মাসের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে লি'আন ওয়াজিব হবে। এটা মাবসূতে যা বলা হয়েছে তার অর্থ। কেননা, এমতাবস্থায় অপবাদ আরোপের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। সুতরাং অপবাদ সাব্যস্ত হবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, তার উপরিউক্ত বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে যখন অপবাদ হলো না তখন তা শর্তের সাথে ঝুলন্ত বক্তব্যের ন্যায় হলো। সুতরাং যেন সে বলল, যদি তোমার গর্ভে সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তা আমার নয়। আর অপবাদ শর্তের সাথে যুক্ত করা সহীহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ الخ : হামল [গর্ভ] অস্বীকার করা প্রসঙ্গে : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তোমার গর্ভ আমার থেকে নয়, তাহলে এর দ্বারা লি'আন ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে আহনাফের মতামত নিম্নরূপ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, উক্ত সুরতে লি'আন ওয়াজিব হবে না এবং এর দ্বারা হদ্দও ওয়াজিব হবে না।

দলিল হলো, যখন সে হামল [গর্ভ] অস্বীকার করেছে ঐ মুহূর্তে তার গর্ভ বিদ্যমান হওয়াটা নিশ্চিত নয়। কেননা, পেটের মাঝে বায়ুপূর্ণ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যাকে স্বামী গর্ভ মনে করে জেনার অপবাদ দিয়েছে। তাই উক্ত সম্ভাবনার কারণে সে অপবাদকারী হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব এ কারণে লি'আনও ওয়াজিব হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অপবাদ আরোপের ছয় মাসের পূর্বেই যদি মহিলা সন্তান প্রসব করে, তাহলে গর্ভ অস্বীকার করার দ্বারা লি'আন ওয়াজিব হবে, যা مَبْسُوْط [মাবসূত]-এ উল্লেখ রয়েছে। **দলিল :** ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসবের কারণে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, অপবাদ আরোপের সময় গর্ভ উপস্থিত ছিল। আর সে উক্ত গর্ভ অস্বীকার করার কারণে তার উপর লি'আন ওয়াজিব।

আমরা বলি যে, গর্ভ অস্বীকার করার মুহূর্তে গর্ভ বিদ্যমানের বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না। কেননা, স্বামীর গর্ভ অস্বীকার করার দ্বারা মূলত উদ্দেশ্যও তা-ই ছিল। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন সে শর্তের সঙ্গে ঝুলন্ত রেখেছে এভাবে যে- إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّى [তুমি গর্ভবতী হলে সে গর্ভের সন্তান আমার নয়]। আর কযফ [قَذْف] -কে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা জায়েজ নেই। তাই এ সুরতে কযফ প্রমাণিত হবে না এবং লি'আনও হবে না।

فَانْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَهٰذَا الْحَبَلُ مِنَ الزِّنَاءِ تَلَاعَنَا لِوُجُوْدِ الْقَذْفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزِّنَاءَ صَرِيْحًا وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِىْ الْحَمْلَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَنْفِيْهِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَقَدْ قَذَفَهَا حَامِلاً وَلَنَا اَنَّ الْاَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِلاَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِتَمَكُّنِ الْاِحْتِمَالِ قَبْلَهُ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَنَّهُ عُرِفَ قِيَامُ الْحَبَلِ بِطَرِيْقِ الْوَحْيِ .

অনুবাদ : যদি স্ত্রীকে সে বলে, তুমি জেনা করেছ আর এ গর্ভ জেনা দ্বারা সঞ্চারিত, তাহলে উভয়কে লি'আন করতে হবে। কেননা, জেনা -এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকার কারণে অপবাদ পাওয়া গিয়েছে। তবে কাজি "গর্ভ-পরিচয়" নাকচ করবেন না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা নাকচ করবেন। কেননা, নবী ﷺ সন্তানটির পিতৃ-পরিচয় হিলাল ইবনে উমাইয়ার থেকে নাকচ করেছিলেন অথচ হিলাল তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় অপবাদ এনেছিলেন।

আমাদের দলিল এই যে, গর্ভস্থ সন্তান জন্মলাভের পরেই তার উপর বিধান প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা, জন্মলাভের পূর্বে বিষয়টি সম্ভাবনাগ্রস্ত। আর হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, নবী ﷺ ওহীর মাধ্যমে গর্ভের অস্তিত্বের কথা জেনেছিলেন।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَانْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَهٰذَا الْحَمْلُ الخ : **মাসআলা :** স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি জেনা করেছ এবং এই গর্ভ জেনার দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই লি'আন করবে।

দলিল : বর্ণিত সুরতে জেনা শব্দ পরিষ্কার উল্লেখ করেছে, এ কারণে قَذْفٌ [জেনার অপবাদ] আরোপ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাদের উভয়ের উপর লি'আন আবশ্যক।

তবে হানাফী মাযহাব মতে, কাজি গর্ভ-পরিচয় পিতা থেকে নাকচ করবেন না। **দলিল :** গর্ভের পরিচয় নাকচ করা সন্তানের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর সন্তানের বিধান প্রয়োগ হয় জন্মলাভের পর। তাই অপবাদকালে তথা গর্ভাবস্থায় যেহেতু বিষয়টি অনিশ্চিত তাই তার সঙ্গে নিশ্চিত বিধান প্রযোজ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব : কাজি লি'আনের পরেই গর্ভ-পরিচয় নাকচ করে দেবে। **দলিল :** পূর্ববর্ণিত হাদীস, যেখানে রাসূল ﷺ সন্তানটির পিতৃ-পরিচয় হিলাল ইবনে উমাইয়া থেকে নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ সেখানে গর্ভাবস্থায় অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। **আমাদের জবাব :** হাদীসের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কেননা, সেখানে রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে গর্ভের অস্তিত্বের কথা জেনেছিলেন। তাই হাদীসের বিষয়টিকে কিয়াস করা যাবে না।

وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَقْبَلُ التَّهْنِيَةَ وَتَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلَاعَنَ بِهِ وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ لَاعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَصِحُّ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّ النَّفْيَ يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ وَلَا يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّهُ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَلَهُ أَنَّهُ لَا مَعْنًى لِلتَّقْدِيْرِ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّأَمُّلِ وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيْهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَبُوْلُهُ التَّهْنِيَةَ أَوْ سُكُوْتُهُ عِنْدَ التَّهْنِيَةِ أَوْ ابْتِيَاعُهُ مَتَاعَ الْوِلَادَةِ أَوْ مُضِيُّ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَنِ النَّفْيِ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ قَدِمَ تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْنِ ـ

অনুবাদ : জন্মের পরপর কিংবা অভিনন্দন গ্রহণকালে কিংবা প্রসবের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খরিদের সময়কালে স্বামী যদি তার স্ত্রীর সন্তানের পিত-পরিচয় অস্বীকার করে, তাহলে তা সহীহ হবে এবং এ কারণে লি'আন করবে। পক্ষান্তরে যদি এ সময়কালের পরে অস্বীকার করে তাহলে লি'আন করতে হবে। কিন্তু সন্তানের পিতৃ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, নেফাসের মেয়াদকালে অস্বীকার সহীহ হবে। কেননা, [মূলনীতি এই যে,] অল্প সময়ের ভিতরে অস্বীকার করা শুদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরে তা শুদ্ধ নয়। সুতরাং নেফাসের মেয়াদকে উভয় মেয়াদের মাঝে পার্থক্যকারী সাব্যস্ত করেছি। কারণ, নেফাস হচ্ছে প্রসবের চিহ্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, সময়সীমা নির্ধারণের কোনো অর্থ নেই। কেননা, সময়টুকু হলো চিন্তাভাবনার অবকাশ প্রদানের জন্য। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবগত অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তাই আমরা এমন বিষয়কে বিবেচনায় এনেছি, যা সন্তানের পিতৃ-পরিচয় স্বীকার করা বুঝায়। আর তা হলো অভিনন্দন গ্রহণ করা কিংবা অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় নীরবতা অবলম্বন করা কিংবা প্রসবকালীন সরঞ্জাম খরিদ করা কিংবা সন্তান অস্বীকার থেকে বিরত অবস্থায় এতটুকু সময় পার হয়ে যাওয়া। আর যদি অনুপস্থিতির কারণে স্বামী সন্তানের জন্মের সংবাদ না জানে তাহলে তার আগমনের পর উল্লিখিত দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে সময় নির্ধারণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الخ : **সন্তান অস্বীকার করার সুরতসমূহ :** প্রকাশ থাকে যে, স্বামী স্ত্রীর গর্ভের সন্তান অস্বীকার করার কয়েকটি সুরত ইবারতের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে–

১. প্রসবের পরপরই স্বামী সন্তান অস্বীকার করে দিল।

২. অভিনন্দন গ্রহণ করার সময় স্বামী সন্তানকে অস্বীকার করল।

৩. প্রসবের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়ের সময় সন্তান অস্বীকার করল। উক্ত তিন সুরতে স্বামী থেকে পিতৃপরিচয় অস্বীকার করা সহীহ হবে এবং এ কারণে লি'আনও করতে হবে। আর যদি উক্ত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর অস্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে লি'আন ওয়াজিব হবে, কিন্তু সন্তানের পিতৃ-পরিচয় বহাল থাকবে।

তাঁর দলিল : কোনো সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। কেননা, সময় তো হলো চিন্তা-ভাবনার অবকাশ প্রদানের লক্ষ্যে। আর চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবগত অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই আমরা এমন বিষয়কেই বিবেচনায় রেখেছি, যা বাচ্চার পিতৃপরিচয় স্বীকার করা বুঝায়। আর সেটি হলো প্রসবের অভিনন্দন গ্রহণ কিংবা অভিনন্দন গ্রহণকালে নীরবতা অবলম্বন করা কিংবা প্রসবকালীন সরঞ্জামাদি ক্রয় করা কিংবা সন্তান অস্বীকার থেকে বিরত অবস্থায় এতটুকু সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, এসব বিষয় দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী বাচ্চা প্রসবে আনন্দিত এবং তাকে নিজের সন্তান মনে করে। অতএব এরপরে অস্বীকার করা সহীহ হবে না।

সাহেবাইন (র.) বলেন, নেফাসের সময়সীমার মাঝে যদি অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকার সহীহ হবে। **তাদের দলিল :** এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যে, অল্প সময়সীমার মাঝে সন্তান অস্বীকার করা সহীহ হবে, কিন্তু দীর্ঘ সময় পরে তা সহীহ নয়। আর অল্প সময় ও দীর্ঘ সময়ের মাঝে পার্থক্যকারী হলো নেফাস। কেননা, নেফাস হলো, প্রসবের চিহ্ন, সুতরাং চিহ্ন থাকা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় ধরা হবে।

[মাবসূত]-এ উল্লেখ আছে যে, নেফাসের সময়কাল [সন্তান] প্রসবের সময়েরই ন্যায়। কেননা, তখনো নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ الخ : **মাসআলা :** স্বামী যদি প্রসবের সময় উপস্থিত না থাকে এবং প্রসবের সংবাদও তার জানা নেই, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্বামী সফর থেকে ফিরে আসার পর সন্তান অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে সময়সীমা গ্রহণযোগ্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে তাদের বর্ণিত নীতিমালার আলোকে নেফাসের সময়সীমা পরিমাণ সময় ধর্তব্য হবে।

قَالَ وَاِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِيْ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَى الْاَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِيْ يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا لِاَنَّهُمَا تَوْاَمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ وَحُدَّ الزَّوْجُ لِاَنَّهُ اَكْذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَى الثَّانِيْ وَاِنِ اعْتَرَفَ بِالْاَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَاعَنَ لِاَنَّهُ قَاذِفٌ بِنَفْيِ الثَّانِيْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَالْاِقْرَارُ بِالْعِفَّةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اِنَّهَا عَفِيْفَةٌ ثُمَّ قَالَ هِيَ زَانِيَةٌ وَفِيْ ذٰلِكَ التَّلَاعُنُ كَذَا هٰذَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি একই গর্ভে দুটি সন্তান জন্মলাভ করে, আর [স্বামী] প্রথমটিকে অস্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে, তাহলে উভয়ের পিতৃ-পরিচয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, এর উভয়েই যমজ সন্তান একই বীর্য থেকে সৃষ্ট। আর স্বামীকে অপবাদের হদ্দ লাগানো হবে। কেননা, দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করার কারণে সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছে। আর যদি প্রথমটিকে স্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করে, তাহলে পূর্বোল্লিখিত কারণে উভয়ের পিতৃ-পরিচয় সাব্যস্ত হবে। তবে লি'আন করতে হবে। কেননা, দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করার কারণে সে অপবাদকারী হয়েছে আর সে তো প্রত্যাহার করেনি। আর এখানে সতীত্বের স্বীকৃতি অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে হয়েছে। সুতরাং যেন সে তার স্ত্রীকে প্রথমে সতী বলল, এরপর বলল "সে ব্যভিচারিণী" আর এ ক্ষেত্রে লি'আন সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এখানেও তা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِيْ بَطْنٍ الخ : একই গর্ভে দুই বাচ্চা প্রসব প্রসঙ্গে : স্ত্রী যদি একই গর্ভে তথা ছয় মাসের কম ব্যবধানে দুটি সন্তান প্রসব করে, আর তন্মধ্যে স্বামী প্রথমটিকে অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে, তাহলে ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী উভয় সন্তানের পিতৃ-পরিচয় উক্ত স্বামী থেকে প্রমাণিত হবে। কারণ, সে দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করার মাধ্যমে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করল। তাই তার উপর হদ্দে কযফ [অপবাদের শাস্তি] প্রয়োগ করা হবে এবং উভয় সন্তান একই বীর্যের দ্বারা সৃষ্ট যমজ সন্তান বলে প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় সুরত : আর যদি প্রথমটিকে স্বীকার করে এবং দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করে তাহলেও উভয় সন্তানের নসব তার থেকেই সাবেত হবে। দলিল প্রথম সুরতের ন্যায়। তবে এ সুরতে স্বামীর উপর হদ্দ প্রয়োগ না হয়ে লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা, এ সুরতে অপবাদের পর প্রত্যাহার পাওয়া যায়নি, তাই স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। তবে উভয় সন্তানের পিতৃ-পরিচয় তারই থেকে প্রমাণিত হবে। কেননা, সে প্রথমে সন্তান স্বীকার করার মাধ্যমে স্ত্রীকে সতী স্বীকার করেছে, অতঃপর অপবাদ আরোপ করেছে। আর এমন সুরতে লি'আন ওয়াজিব হয়, তাই এখানেও লি'আন ওয়াজিব হবে।

بَابُ الْعِنِّيْنِ وَغَيْرِهِ

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّيْنًا اَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً فَاِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَبِهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ هٰكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) وَلِاَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِمْتِنَاعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِضَةٍ وَيَحْتَمِلُ لِاٰفَةٍ اَصْلِيَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مُعَرِّفَةٍ لِذٰلِكَ وَقَدَّرْنَاهَا بِالسَّنَةِ لِاِشْتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُوْلِ الْاَرْبَعَةِ فَاِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا تَبَيَّنَ اَنَّ الْعَجْزَ بِاٰفَةٍ اَصْلِيَّةٍ فَفَاتَ الْاِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوْفِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ فَاِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِيْ مَنَابَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا لِاَنَّ التَّفْرِيْقَ حَقُّهَا .

পরিচ্ছেদ : পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

অনুবাদ : স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয় তাহলে বিচারক তাকে এক বছরের অবকাশ দেবেন। এ সময়ের ভিতরে যদি সে তার সাথে সহবাসে সক্ষম হয়, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের দাবি করে, তাহলে বিচারক উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন। হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে এমনটি বর্ণিত হয়েছে।' তাছাড়া এ কারণে যে, স্ত্রীর অনুকূলে সহবাস লাভের অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। আর সহবাস থেকে বিরত থাকাটা সাময়িক কোনো অসুস্থতার কারণে হতে পারে, আবার মৌলিকভাবে বিপদগ্রস্ত কারণেও হতে পারে। আর তা বুঝার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন এবং এ সময়কাল আমরা নির্ধারণ করেছি এক বছর। কেননা, এতে চারটি পরিবর্তনশীল মওসুম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি সে সহবাসে সক্ষম না হয়, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এ অক্ষমতা মৌলিক বিপদগ্রস্ততার কারণে, ফলত সদাচারের সাথে স্ত্রীকে রাখা সম্ভব হয়নি, সুতরাং উত্তম পন্থায় স্ত্রীকে মুক্ত করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর স্বামী যদি তা করা থেকে বিরত হয়, তাহলে কাজি তার স্থলবর্তী হয়ে উভয়কে পৃথক করে দেবেন। তবে স্ত্রীর বিচ্ছেদ দাবি করা শর্ত। কেননা, বিচ্ছেদ গ্রহণ হলো তার নিজের অধিকার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পুরুষত্বহীনতা (عِنِّيْن) প্রসঙ্গে : এ পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) এমন লোকদের আলোচনা করেছেন যারা বিবাহের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। عِنِّيْن [ইন্নীন] বলা হয় ঐ পুরুষকে যে মহিলাদের উপর সক্ষম হয় না। আল্লামা মুরগিনানী (র.) বলেন, عِنِّيْن ঐ ব্যক্তি যে পুরুষাঙ্গ থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের উপর অক্ষম। আর যদি কতক মহিলার উপর সক্ষম আর কতকের উপর সক্ষম না হয়, তাহলে যাদের উপর সক্ষম নয়, তাদের ক্ষেত্রে সে عِنِّيْن প্রমাণিত হবে।

হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আইনী"-তে উল্লেখ রয়েছে যে, عِنِّيْن চেনার উপায় হলো, বড় পাত্রে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এর ভিতরে তাকে বসিয়ে রাখা হবে। এতে যদি তার পুরুষাঙ্গ সংকুচিত হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এ লোক عِنِّيْن [পুরুষত্বহীন] নয়। আর যদি এতে তার পুরুষাঙ্গ সংকুচিত না হয় বরং পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, এ ব্যক্তি عِنِّيْن [পুরুষত্বহীন]।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّيْنًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً الخ : **মাসআলা :** স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয় আর তার স্ত্রী বিচ্ছেদ কামনা করে, তাহলে বিচারক স্বামীকে এক বছরের জন্য চিকিৎসার সুযোগ দেবে। আর গণনা করা হবে যখন থেকে স্ত্রী বিচার তলব করেছে তখন থেকে। এক বছরের মধ্যে যদি স্বামী সবল হয়ে মহিলাদের উপর সক্ষম হয়, আর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে তো আর সমস্যা নেই। আর যদি বছর অতিক্রমের পরও স্বামী অক্ষম রয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর তলব অনুযায়ী কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দেবেন। হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। যথা- মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَضٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْعِنِّيْنِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. অর্থাৎ "হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে এক বছরের সুযোগ দানের ফয়সালা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) "কিতাবুল আছার" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ إِمْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا فَلَمَّا انْقَضٰى حَوْلٌ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهَا تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً.

অর্থাৎ "এক মহিলা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী তার নিকট আসে না, সহবাস করে না। তখন হযরত ওমর (রা.) তার স্বামীকে এক বছরের সুযোগ দিলেন। কিন্তু এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তার স্বামী মহিলার নিকট আসতে সক্ষম হয়নি, তখন হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে এখতিয়ার দিলেন। মহিলা নিজেকেই গ্রহণ করল। তখন হযরত ওমর (রা.) তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং এ বিচ্ছেদকে তালাকে বায়েন সাব্যস্ত করলেন।"

হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে- يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে এক বছরের সুযোগ প্রদান করা হবে। এর মাঝে যদি সক্ষম হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, অন্যথায় উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবে।" (رواه ابن شيبة فى مصنفه)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত- قَالَ يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا - ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, পুরুষত্বহীনকে এক বছরের সুযোগ দানের পর যদি সহবাস করে তো ভালো, অন্যথায় উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দেবে।

যুক্তির আলোকে : স্ত্রীর অধিকারসমূহের একটি হলো তার সঙ্গে সহবাস করা। এখন স্বামী যদি তা হতে বিরত থাকে, তাহলে হতে পারে, এটা কোনো রোগের কারণে হয়েছে। যদি তা-ই হয় তাহলে এক বছর চিকিৎসা করার দ্বারা তা সুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা। অথবা এটা তার স্বভাবগত দুর্বলতার কারণেও হতে পারে, যার কারণে সে সহবাসে সক্ষম নয়। এ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝার জন্যই একটি সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন। এ কারণে আমরা এর জন্য এক বছর নির্ধারণ করেছি। কেননা, এতে চারটি মওসুম তথা- শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও বসন্তকাল রয়েছে, যাতে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে থাকে। সুতরাং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন সে স্ত্রী সহবাসে সক্ষম নয়, বুঝা যাবে যে এটা মূলত তার স্বভাবগত সমস্যা, যার চিকিৎসা হবে না। সুতরাং তার পক্ষে إِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوْفِ [সদাচরণ]-এর মাধ্যমে স্ত্রীকে রাখা সম্ভব হবে না, তাই تَسْرِيْحٌ بِالْإِحْسَانِ তথা উত্তম পন্থায় তাকে মুক্ত করে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। এখন স্বামী যদি উত্তম পন্থায় স্ত্রীকে মুক্ত না করে, তাহলে বিচারক স্বামীর স্থলবর্তী হয়ে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবেন, যাতে মহিলার উপর স্বামীর জুলুম না হতে পারে। কেননা, কাজির দায়িত্বই হলো মানুষের জুলুমকে দূরীভূত করা।

وَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِيْ أُضِيْفَ إِلٰى فِعْلِ الزَّوْجِ فَكَأَنَّهُ طَلَّقَهَا بِنَفْسِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) هُوَ فَسْخٌ لٰكِنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَةً لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَائِنَةً تَعُوْدُ مُعَلَّقَةً بِالْمُرَاجَعَةِ وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَا بِهَا فَإِنَّ خَلْوَةَ الْعِنِّيْنِ صَحِيْحَةٌ وَيَجِبُ الْعِدَّةُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ هٰذَا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا .

অনুবাদ : এ বিচ্ছেদ তালাকে বায়েনরূপে গণ্য হবে। কেননা, কাজির কার্য স্বামীর কার্যের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যেন স্বামী নিজেই তাকে তালাক দিয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ বিচ্ছেদ হলো, বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গ করা কিন্তু আমাদের মতে, বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গযোগ্য নয়। আর বায়েন হওয়ার কারণ এই যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রী হতে অবিচার রোধ করা। আর তা তালাকে বায়েন ছাড়া অর্জিত হবে না। কেননা, তালাকটি যদি বায়েন না হয় তাহলে তো স্বামী কর্তৃক রাজ'আতের মাধ্যমে সে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যাবে। যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়ে থাকে, তাহলে সে পূর্ণ মহর পাবে। কেননা, পুরুষত্বহীন স্বামীর নির্জনবাস গ্রহণযোগ্য। আর স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে, যার কারণ আমরা পূর্বে মহর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করে এসেছি। [এক বছরের অবকাশ প্রদান] এ বিধান হলো তখনই যখন স্বামী সহবাস না হওয়ার কথা স্বীকার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ الخ : পুরুষত্বহীন স্বামীর বিচ্ছেদ 'তালাকে বায়েন' গণ্য হওয়া প্রসঙ্গে : পুরুষত্বহীন ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে কাজির ফয়সালার মাধ্যমে তালাকে বায়েন পতিত হয়। ইমাম মালেক (র.)-ও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, পুরুষত্বহীন ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যকার বিচ্ছেদকে فَسْخُ نِكَاحٍ তথা বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গ করা বলা হবে।

দলিল : এ বিচ্ছেদটা মহিলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর মহিলার পক্ষ থেকে যে বিচ্ছেদ হয় তা দ্বারা বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গ করা হয়; তা তালাক হতে পারে না। কেননা, শরিয়ত মহিলাকে তালাক দেওয়ার এখতিয়ার প্রদান করেনি। **আমাদের দলিল :** কাজির বিচ্ছেদ-কার্য মূলত স্বামীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তাই কাজির বিচ্ছেদের মাধ্যমে যেন স্বামী নিজেই তালাক দিয়েছে। তাছাড়া বিবাহ-কার্য সম্পাদনের পর আর ভঙ্গ হওয়ার সুযোগ থাকে না, আকদ [চুক্তি] সম্পাদনের পূর্বে যা থাকে। আর কাজির বিচ্ছেদ-কার্য দ্বারা উদ্দেশ্য যেহেতু মহিলা থেকে জুলুম দূর করা। আর এ জাতীয় বিচ্ছেদ তালাকে বায়েন হয়ে থাকে। কেননা, যদি তালাকে বায়েন ধরা না হয় তাহলে তো স্বামী রাজ'আতের মাধ্যমে আবারো মহিলার উপর জুলুম করার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব মহিলার তখন ঝুলন্ত অবস্থা। কেননা, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য [সহবাস] নষ্ট হওয়ার দ্বারা তার স্বামী থেকেও না থাকার মতো। আর সে অন্যের কাছেও যেতে পারে না। কারণ, তার তো স্বামী আছে। অতএব মহিলা ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ الخ : আর যদি পুরুষত্বহীন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস করে থাকে, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহর প্রাপ্ত হবে। কেননা, পুরুষত্বহীন ব্যক্তির নির্জনবাস গ্রহণযোগ্য। আর স্ত্রী যেহেতু অঙ্গবিশিষ্ট লোকের নিকট নিজের যৌনাঙ্গ অর্পণ করেছে, তাই তার পূর্ণ মহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মতে অর্ধমহর ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যেহেতু এটা বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গ করা তাই স্বামীর উপর নফকা ও মহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে সকলের ঐকমত্যে এ মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব। কারণ, আমরা মহর পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, এতে গর্ভধারণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সতর্কতামূলক ইদ্দত ওয়াজিব করা হয়েছে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, [উল্লিখিত এ বিধান যে,] স্বামীকে এক বছরের সুযোগ প্রদান পরে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ফয়সালা, এটা তখন করা হবে যদি স্বামী সহবাস না হওয়ার কথা স্বীকার করে।

وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اِسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ وَالْأَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ أُجِّلَ سَنَةً لِظُهُوْرِ كِذْبِهِ وَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ فَإِنْ حَلَفَ لَا حَقَّ لَهَا وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَإِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ إِنْ طَلَبَتْ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّاجِيْلِ وَالْخَصِيُّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ لِأَنَّ وَطْيَهُ مَرْجُوٌّ.

অনুবাদ : পক্ষান্তরে স্বামী ও স্ত্রী যদি সহবাস হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী কথা বলে, তাহলে অকুমারীর ক্ষেত্রে কসমসহ স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে স্ত্রী বিচ্ছেদের অধিকার লাভের বিষয়টি অস্বীকার করছে। আর জন্মগতভাবে পুরুষত্বশক্তি অক্ষুণ্ন থাকাই হলো আসল অবস্থা। যদি সে কসম করে বলে যে, আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি, তাহলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ লাভের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে এক বছরের অবকাশ প্রদান করা হবে। আর যদি স্ত্রী কুমারী হয়, তাহলে অভিজ্ঞ নারীরা তার গুপ্তাঙ্গ দেখবে। দেখে যদি কুমারী বলে তাহলে এক বছরের অবকাশ প্রদান করা হবে। কেননা, তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি ঐ নারীরা বলে যে, সে "কুমারী" নয়, তাহলে স্বামী কসম করবে। যদি সে কসম করে, তাহলে স্ত্রীর [বিচ্ছেদ লাভের] অধিকার নেই। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে এক বছরের অবকাশ দেওয়া হবে। আর যদি স্বামীর পুরুষাঙ্গ কর্তিত হয়, তাহলে উভয়কে পৃথক করে দেওয়া হবে– যদি স্ত্রী এ দাবি করে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অবকাশ প্রদানের কোনো সার্থকতা নেই। আর খাসিকৃত ব্যক্তির বেলায় অবকাশ দেওয়া হবে। যেমন– পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া হয়। কেননা, তার পক্ষ থেকে সহবাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ الخ : **স্বামী-স্ত্রীর সহবাস সম্পর্কে দ্বিমত প্রসঙ্গে মাসআলা :** স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সহবাসের ব্যাপারে মতবিরোধ করে স্বামী সহবাস হওয়ার দাবি করে আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তাহলে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, স্ত্রী কুমারী কিনা? স্ত্রী যদি অকুমারী (ثَيِّبَة) হয়, তাহলে স্বামীর কথা কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে।

দলিল : এখানে মূলত স্বামী বিচ্ছেদ হওয়াকে অস্বীকারকারী, আর স্ত্রী বিচ্ছেদ অধিকারের দাবিদার। তাছাড়া যৌনাঙ্গ নিরাপদ থাকাটাই স্বাভাবিক কথা। আর স্বামীর সহবাসের কথা স্বীকার করা যৌনাঙ্গ নিরাপদ হওয়ার বিষয়কে আরো জোরদার করে। আর মহিলা সহবাস অস্বীকার করে স্বামীর যৌনাঙ্গ শুদ্ধতার কথা অস্বীকার করা হয়, যা সাধারণ বিষয়ের পরিপন্থি। আর সাধারণ বাহ্যিক বিষয়ের বিপরীত কথা বলার অর্থ হলো সে مُدَّعِيْ [দাবিদার]। আর বাহ্যিক বিষয়ের অনুকূলে কথা বলার কারণে

مُدَّعٰى عَلَيْهِ প্রমাণিত হয়েছে। অতএব اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ "দাবিদারের উপর কর্তব্য প্রমাণ পেশ করা, আর অস্বীকারকারীর উপর শপথ করা কর্তব্য।" তাই এখানেও স্বামীর কথা কসমসহ গ্রহণ করা হবে। কসম করার দ্বারা স্ত্রীর অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

আর যদি স্বামী কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে চিকিৎসার জন্য এক বছরের সুযোগ প্রদান করা হবে। আর যদি স্ত্রী কুমারী হয় তাহলে অন্যান্য অভিজ্ঞ নারীরা তার গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখবে, সে কুমারী রয়ে গেছে কিনা? পরীক্ষার পর মহিলারা যদি বলে যে, সে কুমারী, তাহলে তার স্বামীকে এক বছরের সুযোগ দান করা হবে। কারণ, এ সুরতে স্বামী মিথ্যাবাদী হওয়া প্রকাশ হয়েছে। আর নারীরা যদি পরীক্ষার পর তাকে অকুমারী বলে, তাহলে স্বামীর কসম নেওয়া হবে। কেননা, অন্য কোনো কারণে কুমারীত্ব দূর হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি স্বামী কসম করে, তাহলে স্ত্রীর আর অধিকার থাকবে না। আর কসম করতে অস্বীকার করলে তাকে এক বছরের সুযোগ প্রদান করা হবে।

কুমারী কিনা? তা চেনার উপায় : ইনায়া গ্রন্থকার বাকেরা আর ছায়্যেবা চেনার উপায় তিনটি উল্লেখ করেছেন–

১. মহিলার যৌনাঙ্গে মুরগীর ছোট ডিম প্রবেশ করানো হবে। যদি অনায়াসে ঢুকে পড়ে তাহলে মহিলা ছায়্যেবা অকুমারী। অন্যথায় বাকেরা কুমারী।

২. মহিলার জন্য দেয়ালে প্রস্রাব করা সম্ভব হলে কুমারী অন্যথায় অকুমারী।

৩. ডিম ভেঙ্গে মহিলার গুপ্তাঙ্গে ঢেলে দেওয়া হবে। যদি ভি ভর চলে যায় তাহলে বুঝা যাবে অকুমারী আর যদি ভিতরে না যায় তাহলে কুমারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا الخ **:** মাসআলা : স্বামী যদি مَقْطُوْعُ الذَّكَرِ [কর্তিত পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট] হয় আর স্ত্রী বিচ্ছেদ তলব করে, তাহলে বিচারক তাদের মাঝে সুযোগ প্রদান ব্যতীত বিচ্ছেদ করে দেবেন। কেননা, কর্তিত পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে সহবাসের আশা করা যায় না, তাই তাকে এক বছরের সুযোগ প্রদান নিরর্থক হবে।

আর খাসিকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে মাসআলা হলো, তাকে পুরুষত্বহীনের ন্যায় এক বছরের সুযোগ প্রদান করা হবে। কেননা, কখনো তার মাঝে সহবাসের শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَإِذَا أُجِّلَ الْعِنِّيْنُ سَنَةً وَقَالَ قَدْ جَامَعْتُهَا وَأَنْكَرَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتْ بِمُؤَيِّدٍ هِيَ الْبَكَارَةُ وَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ حُلِّفَ الزَّوْجُ فَإِنْ نَكَلَ خُيِّرَتْ لِتَأَيُّدِهَا بِالنُّكُوْلِ وَإِنْ حَلَفَ لَا تُخَيَّرُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

অনুবাদ : পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে এক বছরের অবকাশ প্রদানের পর যদি সে বলে যে, আমি তার সাথে সঙ্গম করেছি আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে, তাহলে অভিজ্ঞ নারীরা তার গুপ্তাঙ্গ দেখার পর যদি বলে যে, সে কুমারী, তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা, তাদের সাক্ষ্য একটি অনুকূল অবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে কুমারীত্ব। আর যদি স্ত্রীলোকেরা বলে যে, সে অকুমারী তাহলে স্বামীকে কসম করে বলতে হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা, অস্বীকারের কারণে স্ত্রীর দাবি সমর্থিত হয়েছে। আর যদি সে কসম করে বলে, তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। আর যদি মূলত অকুমারী হয়, তাহলে কসমসহ স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এর কারণ ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا أُجِّلَ الْعِنِّيْنُ سَنَةً الخ : মাসআলা : বিচারক পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে এক বছরের সুযোগ প্রদানের পর ইতোমধ্যে সে যদি বলে, "আমি সহবাস করেছি" আর মহিলা তার সহবাসের কথা অস্বীকার করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নারীরা এ স্ত্রীকে দুবার গুপ্তাঙ্গ পরীক্ষা করবে, স্বামীকে সুযোগ প্রদানের পূর্বে একবার এবং সুযোগের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে একবার। এখন শেষে দেখে যদি অভিজ্ঞ নারীগণ বলে যে, সে কুমারীই রয়ে গেছে, তাহলে কাজি উক্ত স্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদান করবেন। সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে কাজি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের ফয়সালা দেবেন। অন্যথায় তাকে নিয়েও থাকতে পারে কেননা, পুরুষের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রকাশ পেয়েছে মহিলাদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে। আর যদি মহিলারা দেখে বলে যে, সে অকুমারী হয়েছে, তাহলে স্বামী থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। যদি সে শপথ করে বলে যে, "আমি তার সঙ্গে সহবাস করেছি", তাহলে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

কেননা, এখানে মহিলাদের সাক্ষ্য এবং স্বামীর কসম উভয়ের দ্বারা স্ত্রীর এখতিয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি স্বামী কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা, তার অস্বীকারের দ্বারা স্ত্রীর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি মহিলা প্রথমেই অকুমারী হয়ে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে কসম সহকারে। এর দলিল আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

فَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ خِيَارٌ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا وَفِي التَّاجِيْلِ تُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيُحْتَسَبُ بِاَيَّامِ الْحَيْضِ وَبِشَهْرِ رَمَضَانَ لِوُجُوْدِ ذٰلِكَ فِي السَّنَةِ وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُوْا عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يُرَدُّ بِالْعُيُوْبِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُوْنُ وَالرَّتَقُ وَالْقَرَنُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْاِسْتِيْفَاءَ حِسًّا وَطَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ وَلَنَا اَنَّ فَوْتَ الْاِسْتِيْفَاءِ اَصْلًا بِالْمَوْتِ لَا يُوْجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلَالُهُ بِهٰذِهِ الْعُيُوْبِ اَوْلٰى وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِسْتِيْفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ.

অনুবাদ : যদি স্ত্রী ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বামীকে গ্রহণ করে, তাহলে পরবর্তীতে তার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা, সে স্বেচ্ছায় আপন অধিকার বাতিল করতে রাজি হয়েছে। অবকাশ প্রদানের ক্ষেত্রে চান্দ্র বছরের বিবেচনা করা হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। ঋতুস্রাবের দিনগুলো এবং রমজান মাস ঐ বছরের মধ্যেই গণ্য হবে। কেননা, এক বছরের মধ্যে ঐ দিনগুলোর বিদ্যমানতা অনিবার্য। পক্ষান্তরে স্বামী বা স্ত্রীর অসুস্থতার দিনগুলো বছরের মধ্যে গণ্য করা হবে না। কেননা, বছরকাল অসুস্থতা থেকে মুক্ত হতে পারে। স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো দোষ থাকে, তাহলে সে কারণে স্বামীর এখতিয়ার থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাঁচটি দোষের কারণে বিবাহ রদ করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে– কুষ্ঠরোগ, ধবল রোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, সঙ্গমপথ বন্ধ থাকা, যোনিপথে হাড় বের হয়ে থাকা। কেননা, এগুলো বাস্তবগত কিংবা রুচিগত প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভোগ-সুখ লাভে বাধা দান করে। আর রুচির দিকটা শরিয়ত কর্তৃক সমর্থিত। নবী ﷺ বলেছেন– فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ 'সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠরোগী থেকে তেমনি পলায়ন কর।' আমাদের দলিল এই যে, মৃত্যুর মাধ্যমে সম্ভোগ-সুখ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ-বন্ধন প্রত্যাহার সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এ সকল দোষের কারণে সম্ভোগ-সুখের ব্যাঘাত স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ-বন্ধন প্রত্যাহার সাব্যস্ত করবে না। এ দোষগুলো বিবাহ-বন্ধন প্রত্যাহারকে অনিবার্য না করার কারণ এই যে, সম্ভোগ-সুখ তো হচ্ছে বিবাহ দ্বারা লব্ধ সুফল আর স্বামীর প্রাপ্য হচ্ছে সম্ভোগের অধিকার। আর তা এখানে অর্জিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الخ : **মাসআলা :** স্বামী পুরুষত্বহীন হওয়া সত্ত্বেও যদি স্ত্রী উক্ত স্বামীকে গ্রহণ করে, তাহলে পরে আর এ স্বামী থেকে বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রীর থাকবে না। **দলিল :** সে নিজেই তার অধিকার নষ্ট করার জন্য রাজি হয়েছে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, স্বামীকে এক বছরের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে চান্দ্র মাস হিসেবে বছর গণনা করা হবে। অর্থাৎ, ৩৫৪ দিনের বছর। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে সূর্যের গণনার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩৬৫ দিন পূর্ণ করে আরো একদিনের এক-চতুর্থাংশ। -[আইনী শরহুল হিদায়া] আর মহিলার ক্ষেত্রে হায়েজ এবং রমজানের সময়ও উক্ত বছরের মাঝে গণনা করা হবে। কেননা, এক বছরের মধ্যে মহিলার জন্য এ বিষয় পাওয়া জরুরি। তবে স্বামী-স্ত্রী অসুস্থতার সময় সে বছরের মাঝে গণ্য করা হবে না। কেননা, অসুস্থতা ছাড়াও বছর পাওয়া সম্ভব।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ الخ - **স্ত্রীর আয়ের সম্পর্কে আলোচনা :** স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো দোষ পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য বিবাহ-বন্ধন রদ করার অধিকার থাকবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ আমাদের অন্যান্য ইমামদের মত হলো, স্বামীর এখতিয়ার থাকবে না। **দলিল :** স্বামী-স্ত্রীর কারোর মৃত্যুর দ্বারা সম্ভোগ-সুখ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও বিবাহ-বন্ধন রদ হয় না, সুতরাং এসব দোষের কারণে তাদের বিবাহ বন্ধন প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এখানে সম্পূর্ণ সম্ভোগ বিলুপ্ত হয় না; বরং সুখে ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া সম্ভোগ-সুখ তো হচ্ছে বিবাহ দ্বারা অর্জিত সুফল। আর সুফল কোনো কারণে হাতছাড়া হলে বিবাহ-বন্ধনকে প্রভাবিত করতে পারে না। আর স্বামীর প্রাপ্য হচ্ছে সম্ভোগের অধিকার লাভ। তা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব বিবাহ-বন্ধন প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো, স্ত্রীর মাঝে পাঁচ ধরনের দোষের কারণে স্বামীর জন্য বিবাহ রদ করার অধিকার থাকবে। তা হলো- কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, সঙ্গম পথ বন্ধ থাকা, যোনিপথে হাড় বের হয়ে থাকা।

দলিল : প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের দোষ حِسًّا وَطَبْعًا [রুচিতগত ও বাস্তবগততাবে] সম্ভোগ লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। কেননা, সঙ্গম পথ বন্ধ থাকা আর যোনিপথে হাড় বের হওয়ার বিষয় তো বাস্তবগত সমস্যা। আর কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ ও মস্তিষ্কবিকৃতির বিষয়টি রুচিগত বাধাদানকারী বিষয়। আর শরিয়ত রুচির বিষয়কেও সমর্থন করেছে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ 'কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন কর যেমন সিংহ থেকে পলায়ন করে থাক।' অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক লোক রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বায়'আতের ইচ্ছাপোষণ করেছে। রাসূল ﷺ রাস্তা থেকেই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন যে, তুমি চলে যাও, তোমার বা'য়আত করেছি। হযরত ওমর (রা.) এক কুষ্ঠরোগী নারীকে তওয়াফ করতে দেখে বললেন, তুমি তোমার ঘরে কেন বসে থাকলে না? তাহলে লোকজন তোমার দ্বারা কষ্ট পেত না। পরে সে আর তওয়াফে আসেনি। আর জনৈক কুষ্ঠরোগীর সাথে রাসূল ﷺ খানা খাওয়ার পর তার কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে যাওয়ার বর্ণনা, সেটা রাসূল ﷺ -এর মু'জিযার কারণে।

আমাদের পক্ষ থেকে জবাব হচ্ছে, উক্ত সুরতে স্বামীর অধিকার বিদ্যমান রয়েছে এবং এসব রোগ সত্ত্বেও সে তার সম্ভোগ-সুখ ভোগ করার সুরত রয়েছে। কুষ্ঠরোগী, শ্বেতরোগী এবং পাগল থেকে সম্ভোগ-সুখ হাসিল করার বিষয় তো স্পষ্ট। বাকি দুই সুরতেও স্বামী চিকিৎসার মাধ্যমে ছিদ্র করে নিজের সম্ভোগকার্য সম্পন্ন করতে পারে। -[ইনায়া, আইনী]

وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُوْنٌ اَوْ بَرَصٌ اَوْ جُذَامٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَهَا الْخِيَارُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا كَمَا فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ بِخِلَافِ جَانِبِهِ لِاَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بِالطَّلَاقِ وَلَهُمَا اَنَّ الْاَصْلَ عَدَمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ وَاِنَّمَا يَثْبُتُ فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ لِاَنَّهُمَا يُخِلَّانِ بِالْمَقْصُوْدِ الْمَشْرُوْعِ لَهُ النِّكَاحُ وَهٰذِهِ الْعُيُوْبُ غَيْرُ مُخِلَّةٍ بِهِ فَافْتَرَقَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : স্বামীর যদি মস্তিষ্কজনিত কিংবা ধবল রোগ কিংবা কুষ্ঠরোগ থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, স্ত্রীর বিবাহ প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার এখতিয়ার হাসিল হবে। যাতে তার ক্ষতিরোধ হয়। যেমন– লিঙ্গ কর্তিত ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে স্বামীর দিকটি ভিন্ন। কেননা, সে তালাকের মাধ্যমে ক্ষতি রোধ করতে সক্ষম। শায়খাইনের যুক্তি এই যে, এখতিয়ার না থাকাই হলো মূল অবস্থার দাবি। কেননা, এতে স্বামীর অধিকার বাতিল করা হয়। তবে লিঙ্গ কর্তিত ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে এখতিয়ার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, এ দুটি দোষ সেই উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করে, যে জন্য শরিয়ত বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সকল দোষ উক্ত উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে না। সুতরাং উভয় প্রকার দোষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُوْنٌ اَوْ بَرَصٌ الخ - **স্বামীর বিকৃতমস্তিষ্ক, কুষ্ঠ কিংবা শ্বেতরোগাক্রান্ত প্রসঙ্গে :** স্বামী যদি বিকৃতমস্তিষ্ক কিংবা কুষ্ঠরোগ কিংবা শ্বেতরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে শায়খাইন (র.) বলেন, স্ত্রীর জন্য বিবাহ প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে না। **দলিল :** বিবাহ প্রত্যাহারের এখতিয়ার না থাকাই মৌলিক অবস্থার দাবি। কেননা, এতে স্বামীর অধিকার খর্ব করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই স্ত্রীর জন্য এ অধিকার না থাকাই যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর পুরুষত্বহীনতা এবং লিঙ্গ কর্তিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানে বিবাহের মূল বিষয় যার জন্য বিবাহ বৈধ করা হলো অর্থাৎ সঙ্গম করাকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে দেয়। তাই এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার বাকি থাকবে। আর আমাদের বর্ণিত মাসআলায় বিষয়টি এমন নয়। কেননা, এখানে কোনো-না-কোনো সুরতে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব।

পক্ষান্তরে (مَيْئُسٌ عَلَيْهِ) কর্তিত লিঙ্গ এবং পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অতএব, উভয় সুরতের মধ্যে পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) الخ : আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মত হলো, স্ত্রীর জন্য বিবাহ প্রত্যাহারের এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে। **দলিল :** পুরুষত্বহীন ও কর্তিত লিঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রীর অধিকার হাসিল থাকে তেমনি এখানেও তার অধিকার অর্জিত হবে। কেননা, উভয় সুরতে স্ত্রী থেকে ক্ষতি রোধ করাই উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি এসব রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে স্বামীর জন্য বিবাহ প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে না। কেননা, সে তো তালাকের মাধ্যমে তার ক্ষতি রোধ করতে পারে।

بَابُ الْعِدَّةِ

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًّا اَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِيَ حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلٰثَةُ اَقْرَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَالْفُرْقَةُ اِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِيَ فِيْ مَعْنَى الطَّلَاقِ لَا اَلْعِدَّةُ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِيَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَهٰذَا يَتَحَقَّقُ فِيْهَا وَالْاَقْرَاءُ الْحَيْضُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْاَطْهَارُ وَاللَّفْظُ حَقِيْقَةٌ فِيْهِمَا اِذْ هُوَ مِنَ الْاَضْدَادِ كَذَا قَالَ اِبْنُ السِّكِّيْتِ وَلَا يَنْتَظِمُهُمَا جُمْلَةً لِلْاِشْتِرَاكِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ اَوْلٰى اِمَّا عَمَلًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِاَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاَطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوْقَعُ فِيْ طُهْرٍ لَمْ يَبْقَ جَمْعًا اَوْ لِاَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ اَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ فَيَلْتَحِقُ بَيَانًا بِهِ ـ

পরিচ্ছেদ : ইদ্দত

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন বা তালাক রাজ'ঈ দেয় কিংবা তালাক ছাড়া অন্য কোনো কারণে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, আর স্ত্রী যদি স্বাধীনা ও ঋতুমতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়েজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ - 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে।' আর তালাক ছাড়া অন্য মাধ্যমে বিচ্ছেদ তালাকেরই সমপর্যায়ের। কেননা, ইদ্দত অবশ্য পালনীয় হয়েছে, বিবাহের মাঝে উদ্ভূত বিচ্ছেদের পর গর্ভাশয় মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আর এ প্রয়োজন অন্যান্য বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। আমাদের মতে, আয়াতে উল্লিখিত قُرُوْءٌ শব্দের অর্থ হলো "হায়েজ"। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঋতুস্রাবমুক্ত তুহর। অবশ্য শব্দটি বিপরীত অর্থজ্ঞাপক এবং উভয় অর্থের ক্ষেত্রেই এটি হাকীকত বা মৌলিক। ইবনুস সুকায়াত একথা বলেছেন। আর একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের একই সাথে একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আর হায়েজের অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম; যাতে শব্দটির বহুবচনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। কেননা, শব্দটিকে যদি "তুহর" অর্থে গ্রহণ করা হয়, আর তালাক তুহরের সময়েই দেওয়া হয়ে থাকে, তখন বহুবচনের অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। কিংবা কারণ এই যে, হায়েজই হচ্ছে গর্ভাশয় মুক্ত থাকার পরিচায়ক। আর সেটাই হচ্ছে ইদ্দতের উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় দলিল নবী করীম ﷺ -এর এই বাণী– وَعِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ [দাসীর ইদ্দত হলো দুই হায়েজ]। সুতরাং এ হাদীস কুরআনে উল্লিখিত শব্দের ব্যাখ্যারূপে যুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ পর্যন্ত গ্রন্থকার (র.) বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া বা করার বিভিন্ন পদ্ধতি; যেমন– তালাক, খোলা, লি'আন ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। এখন তিনি বিচ্ছেদের ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া তথা ইদ্দত সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

عِدَّةٌ -এর সংজ্ঞা, কারণ ও শর্ত : عِدَّةٌ শব্দটি عَدَّ يَعُدُّ থেকে ইসমে মাসদার। আভিধানিক অর্থ হলো– মহিলা হায়েজের দিনসমূহ গণনা করা। শরিয়তের পরিভাষায়– هِيَ التَّرَبُّصُ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَدْخُوْلَ بِهَا بِزَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ অর্থাৎ, "মহিলা থেকে স্বামীর ভোগাধিকার নষ্ট হওয়ার পর মহিলা যে দিনগুলো অপেক্ষায় কাটায় সে দিনসমূহের নামই ইদ্দত।" তবে মহিলা সহবাসকৃত কিংবা নির্জনবাসী হওয়া জরুরি। অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। ইদ্দতের কারণ হলো, বিবাহ কিংবা বিবাহের সন্দেহ। আর ইদ্দতের শর্ত হলো, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া। ইদ্দতের রুকন হলো, ঐ সমস্ত হুরমত যা বিবাহ বিচ্ছেদ কালে প্রমাণিত হয়েছে। আর তার হুকুম হলো, বিবাহ জায়েজ না হওয়া।

ইদ্দতের প্রকারভেদ : মহিলাদের শ্রেণীভেদে ইদ্দত চার প্রকার–

১. তিন ঋতু– সহবাস হলে। ২. তিন মাস– স্ত্রী যদি নাবালিকা কিংবা বৃদ্ধা হয়। ৩. গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান না হওয়া পর্যন্ত। ৪. স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশদিন।

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন কিংবা রাজঈ তালাক দিয়ে দেয়। কিংবা অন্য কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, এমতাবস্থায় স্ত্রী ঋতুস্রাব-সম্পন্ন ও স্বাধীন, তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন ঋতু। **দলিল :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ 'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদেরকে আটকে রাখবে।' উক্ত আয়াত তালাকের ইদ্দতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। বাকি তালাকবিহীন বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কথা হলো– যেহেতু ইদ্দত পালন তালাকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত; কেননা, গর্ভধারণ হতে মুক্ত বুঝার জন্যই মূলত ইদ্দতের বিধান রাখা হয়েছে। অতএব তালাকবিহীন বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও যেহেতু এ বিষয় প্রযোজ্য, তাই সেখানেও তালাকের হুকুমের ন্যায় ইদ্দত পালন করা জরুরি হবে।

قَوْلُهُ وَالْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ الخ - قُرُوْءٌ শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, قُرُوْءٌ শব্দটি حَيْضٌ হায়েজ ও তুহর উভয়ের জন্যই হাকীকত বা মৌলিক। ইবনুস সুকায়ত এ কথাই বলেছেন। আর একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের একই সাথে একাধিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই এতে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে হায়েজ উদ্দেশ্য, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) তুহর উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : قُرُوْءٌ -কে হায়েজের অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম। কেননা, قُرُوْءٌ শব্দটি বহুবচন, আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিন। আর হায়েজের অর্থ গ্রহণ করলে যে তুহরে তালাক দেওয়া হবে তার তিনটি হায়েজ ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে এবং আয়াতের মাঝে বহুবচনের অর্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে "তুহর" উদ্দেশ্য নেওয়ার সুরতে তা ঠিক থাকে না। কেননা, স্রাবমুক্ত 'তুহর' বা পবিত্র অবস্থায় তালাক প্রদান করা হলো সুন্নত, আর যে তুহরে তালাক প্রদান করা হবে তাঁদের মতে সে তুহরটিও ইদ্দতের মাঝে গণ্য হবে। এতে করে ইদ্দত হচ্ছে দুই তুহর এবং এক তুহরের অংশবিশেষ। আর যদি সে তুহরকে ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা না হয়, তাহলে ইদ্দতে তিন তুহরের বেশি হয়ে যায়। কোনোভাবেই তিন ঠিক থাকে না।

দ্বিতীয় দলিল : ইদ্দত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভাশয় মুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আর এ উদ্দেশ্য হায়েজ দ্বারাই হাসিল হবে; তুহর দ্বারা নয়।

তৃতীয় দলিল : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ – এতে বাঁদির ইদ্দত দুই হায়েজের কথা স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অতএব, উক্ত হাদীসকে আয়াতের জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রহণ করা যায়।

টীকা : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) হানাফী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে قُرُوْءٌ শব্দের বহুবচন দ্বারা দলিল না দিয়ে ثَلٰثَةَ দ্বারা দলিল দিলে অধিকতর উত্তম হতো। কেননা, বহুবচন তিনের কমের উপরও প্রয়োগ হয় যেমন– اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। এখানে দুই মাস দশ দিনের উপর أَشْهُرٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَاِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ فَعِدَّتُهَا ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ (الْاٰيَةُ) وَكَذَا الَّتِيْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ بِاٰخِرِ الْاٰيَةِ وَاِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وَاِنْ كَانَتْ اَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَلِاَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْحَيْضَةُ لَا تَتَجَزّٰى فَكَمُلَتْ فَصَارَتْ حَيْضَتَيْنِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ عُمَرُ (رض) بِقَوْلِهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا وَاِنْ كَانَتْ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ لِاَنَّهُ مُتَجَزٍّ فَاَمْكَنَ تَنْصِيْفُهُ عَمَلًا بِالرِّقِّ.

অনুবাদ : আর যদি অল্পবয়স্কতা কিংবা বার্ধ্যকের কারণে সে ঋতুমতী না হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাস কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاللَّائِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ .... الخ - 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ, তাদের বিষয়ে যদি সন্দিহান হও, তাহলে তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।' তদ্রূপ যারা বয়স গণনা দ্বারা সাবালিকা হয়েছে, কিন্তু এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি [তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস]। আর এর প্রমাণ হলো উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশ। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে গর্ভ প্রসব হলো তার ইদ্দত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - 'আর যারা গর্ভবতী তাদের [ইদ্দতের] মেয়াদ হলো গর্ভ প্রসব করা।' আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি দাসী হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো দুই হায়েজ। কেননা, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "দাসীর তালাক হলো দুই তালাক আর তার ইদ্দত হলো দুই হায়েজ।" তাছাড়া এই যে, দাসত্ব হলো অর্ধেককারী, আর এক হায়েজ খণ্ডিত হয় না, কাজেই পূর্ণ ধরা হবে। অতঃপর তা দুই হায়েজ হয়ে যাবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন– لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا [যদি পারতাম তাহলে তার ইদ্দত এক হায়েজ এবং অর্ধ হায়েজ নির্ধারণ করে দিতাম]। আর যদি দাসী ঋতুমতী না হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে এক মাস ও অর্ধ মাস। কেননা, মাস খণ্ডন গ্রহণ করে। সুতরাং দাসত্বের ভিত্তিতে মাসের অর্ধেকীকরণ সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيْضُ الخ - **যে সকল নারী ঋতুস্রাববতী নয় তাদের ইদ্দত প্রসঙ্গে :** গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতের মাঝে যে সকল মহিলাদের হায়েজ আসে না তার কয়েকটি সুরত বর্ণনা করেছেন। স্বল্প বয়সের কারণে কিংবা অতিবৃদ্ধা হওয়ার দরুন, অথবা নারী বয়সের হিসেবে বালেগা হয়েছে অর্থাৎ সাহেবাইনের মতে পনের বছর আর ইমাম

আযমের মতে সতের বছর বয়সের হয়েছে, তবে এখনো তার হায়েজ আসে না। উক্ত তিন সুরতে মহিলার ইদ্দত তিন মাস গণনা করা হবে, যা মূলত তিন হায়েজের স্থলবর্তী হবে। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী– وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ - "তোমাদের যে সকল স্ত্রীদের আর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রক্ত:স্বলা হয়নি, তাদেরও আর গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" –[সূরা তালাক : পারা ২৮]

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন– لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْقُرُوْءِ قَالُوْا قَدْ عَلِمْنَا عِدَّةَ الَّتِيْ تَحِيْضُ فَالَّتِيْ لَا تَحِيْضُ لَا نَدْرِيْ مَا عِدَّتُهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْآيَةَ অর্থাৎ قروء -এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ঋতুমতী নারীদের ইদ্দত সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম, তবে যারা ঋতুমতী নয় তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর যদি মহিলা গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভপ্রসব হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দতকাল।

দলিল : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا الخ - **দাসী নারীর ইদ্দত প্রসঙ্গে :** তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি দাসী হয় এবং ঋতুমতী হয়, তাহলে তার ইদ্দতকাল হবে দুই হায়েজ।

প্রথম দলিল : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ - "দাসী নারীর তালাক হলো দুটি এবং তার ইদ্দতও দুই হায়েজ।" **দ্বিতীয় দলিল :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ - "তাদের [দাসীর] উপর স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তির বিধান।" উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দাসীদের উপর শাস্তি ও নিয়ামত অর্ধেক করেছেন। আর এক হায়েজ যেহেতু খণ্ডন গ্রহণ করে না, অতএব তাকে পূর্ণ ধরা হবে। তাই দুই হায়েজ হয়ে যায়। আর হযরত ওমর (রা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন– لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا - "আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি দাসীর ইদ্দত এক হায়েজ ও অর্ধ হায়েজ নির্ধারণ করে দিতাম।" কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই পূর্ণ হায়েজই ধরা হবে।

আর যদি তালাকপ্রাপ্তা দাসী ঋতুমতী না হয়, তাহলে যেহেতু মাস খণ্ডন গ্রহণ করে, তাই তার ইদ্দত হবে দাসত্বের বিধান হিসেবে অর্ধেক ধরে এক মাস ও অর্ধ মাস।

وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاتِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَ عِدَّةُ الْاَمَةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ اَيَّامٍ لِاَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ ۔ وَاِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ اَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْاٰيَةِ الَّتِي فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَقَالَ عُمَرُ (رضـ) لَوْ وَضَعَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرِهٖ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّ لَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ ۔

অনুবাদ : স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দত হলো, চার মাস দশদিন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন নিজেদের আবদ্ধ করে রাখবে।' আর দাসীর ইদ্দত হলো দুই মাস পাঁচদিন। কেননা, দাসত্ব হলো অর্ধেককারী। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভপ্রসব করা। কেননা, আল্লাহর বাণী– وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ব্যাপকরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, কেউ ইচ্ছা করলে এই দাবির স্বপক্ষে তার সাথে মুবাহালা করতে রাজি আছি যে, সংক্ষিপ্ততম সূরাতুন নিসা, যাতে وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ আয়াতটি রয়েছে, তা সূরাতুল বাকারার পরে নাজিল হয়েছে। আর হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, যদি মৃত স্বামী জানাজার খাটে শায়িত অবস্থায় স্ত্রী প্রসব করে, তাহলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং তার জন্য অন্যত্র বিবাহ করা হালাল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاتِ الخ : স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রীদের ইদ্দত প্রসঙ্গে : স্ত্রী যদি স্বাধীন হয় আর তার স্বামী মার যায় তাহলে তার ইদ্দত হবে চার মাস দশদিন। আর যদি স্ত্রী দাসী হয় তাহলে দুই মাস পাঁচদিন। **দলিল :** আল্লাহ তা'আল ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

উক্ত আয়াত স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট। আর দাসী নারীর ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীর অর্ধেক অর্থাৎ সে দুই মাস পাঁচদিন ইদ্দত পালন করবে। কেননা, দাসত্ব বিধান অর্ধেককারী।

টীকা :

مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا : স্বামীর মৃত্যুতে নারীদের ইদ্দতের ব্যাপারে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত হবে দুইটি। যথা– ১. ইদ্দতে তূলা– দীর্ঘ ইদ্দত, ২. ইদ্দতে কাসরা– সংক্ষিপ্ত ইদ্দত। দীর্ঘ ইদ্দত হলো এক বছর, আর এর উপর আমল করা হলো আযীমত। আর সংক্ষিপ্ত ইদ্দত হলো চার মাস দশদিন, আর এর উপর আমল করা হলো রুখসত। প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ -

"তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বাহির হয়ে যায় তবে বিধিমতো নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। -[সূরা বাকারা- ২৪০]

উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝা যায়, যাদের স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত এক বছর। তবে চার মাস দশদিনের পর যদি তারা বের হয়ে যায় এবং ইদ্দত শেষ করে দেয়, তবুও তাদের জন্য বৈধ হবে। আর অনেক আলেমের অভিমত হলো, ইসলামের প্রথম যুগে স্বামী মারা যাওয়ার কারণে স্ত্রীদের ইদ্দত এক বছর ছিল। পরবর্তীতে يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا। আয়াতের কারণে তা রহিত হয়ে গেছে এবং তাদের ইদ্দত চার মাস দশদিনই নির্ধারিত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا الخ - **স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী নারীর ইদ্দত প্রসঙ্গে :** স্বামীর মৃত্যুর পর নারী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে প্রসব করা পর্যন্ত। নারী দাসী হোক বা স্বাধীন হোক সকলের ক্ষেত্রে একই বিধান। দলিল হলো আল্লাহর তা'আলার বাণী- وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

উক্ত আয়াতে কারীমার মাঝে সকল গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তাদের ইদ্দত প্রসবকাল পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দলিল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا। সূরা বাকারার উক্ত আয়াত প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন সকল নারীর ইদ্দত ছিল চার মাস দশদিন। আর পরবর্তীতে সূরা তালাকের নিম্নবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ ব্যাপারে আমি মুবাহালা করতে প্রস্তুত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, চার মাস দশদিনের ইদ্দত রহিত হয়ে গর্ভবতী নারীর ইদ্দত পরে সাব্যস্ত হয়েছে প্রসবকাল দ্বারা।

হযরত ওমর (রা.) -এর বাণী- لَوْ وَضَعَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرَةٍ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّ لَهَا اَنْ يَتَزَوَّجَ - "মৃত স্বামীকে খাটে রাখা অবস্থায় যদি স্ত্রীর প্রসব হয়, তাহলেও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং উক্ত নারীর জন্য অন্যত্র বিবাহ করা বৈধ হবে।"

হযরত ওমর (রা.)-এর উক্ত বাণী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অভিমতকে আরো সুদৃঢ় করে।

وَاِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) ثَلٰثُ حِيَضٍ وَمَعْنَاهُ اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اَوْ ثَلٰثًا اَمَّا اِذَا كَانَ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاتِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّ النِّكَاحَ قَدْ اِنْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَلَزِمَتْهَا ثَلٰثُ حِيَضٍ وَاِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاتِ اِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِى الْوَفَاتِ اِلَّا اَنَّهُ بَقِىَ فِىْ حَقِّ الْاِرْثِ لَا فِىْ حَقِّ تَغَيُّرِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الرَّجْعِىِّ لِاَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَهُمَا اَنَّهُ لَمَّا بَقِىَ فِىْ حَقِّ الْاِرْثِ يُجْعَلُ بَاقِيًا فِىْ حَقِّ الْعِدَّةِ اِحْتِيَاطًا فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهٖ حَتّٰى وَرِثَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فَعِدَّتُهَا عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ وَقِيْلَ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ النِّكَاحَ حِيْنَئِذٍ مَا اعْتُبِرَ بَاقِيًا اِلٰى وَقْتِ الْمَوْتِ فِىْ حَقِّ الْاِرْثِ لِاَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْكَافِرِ .

অনুবাদ : মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যখন নারীদের অধিকারিণী হয়, তখন তার ইদ্দত হবে দুই মেয়াদের দীর্ঘতমটি। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। তবে এ মতভিন্নতা হবে যদি বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাক প্রদত্ত হয়। পক্ষান্তরে রাজ'ঈ তালাক প্রদত্ত হলে সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধব্যের ইদ্দত পালন করা তার উপর ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, মৃত্যুর পূর্বে তালাকের মাধ্যমেই বিবাহ কর্তিত হয়ে গেছে এবং তার উপর তিন হায়েজের ইদ্দত পালন আবশ্যক হয়ে গেছে। আর বৈধব্যের ইদ্দত সাব্যস্ত হয়ে থাকে যদি মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহের সমাপ্তি ঘটে। তবে মিরাসের অধিকার লাভের ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন ক্রিয়া বহাল রয়েছে, কিন্তু ইদ্দত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নয়। পক্ষান্তরে তালাকে রাজ'ঈর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিবাহ সর্বদিক থেকেই বহাল রয়েছে। তরফাইনের দলিল এই যে, মিরাসের অধিকার লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাহ বন্ধন বহাল রয়েছে সেহেতু সতর্কতাস্বরূপ ইদ্দতের ক্ষেত্রেও বহাল থাকবে। সুতরাং উভয় ইদ্দতের উপর একত্রে আমল করা হবে। মুরতাদ যদি ধর্মত্যাগের কারণে কতল হয় এবং স্ত্রী তার মিরাস লাভ করে, তাহলে তার ইদ্দতের ক্ষেত্রেও একই মতভিন্নতা হবে। অবশ্য কথিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইদ্দত তিন হায়েজ দ্বারা পালিত হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে মিরাসের অধিকার লাভের ব্যাপারেও মৃত্যু পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনকে বহাল গণ্য করা হবে না। কেননা, মুসলিম নারী কাফেরের মিরাস লাভ করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الْمَرَضِ الخ : **মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ স্বামীর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত প্রসঙ্গে মাসআলা :** মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ হয়ে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন কিংবা তিন তালাক প্রদান করে এবং মহিলার ইদ্দতকালেই তার স্বামী মারা যায় তাহলে উক্ত নারীর ইদ্দত প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভিন্নতা রয়েছে।

তরফাইনের অভিমত : উক্ত মহিলা اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ তথা দুই ইদ্দতের দীর্ঘতম মেয়াদটি ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ, তালাকের কারণে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। আর স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার ইদ্দত হবে চার মাস দশদিন। তাই যদি তিন হায়েজ অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু চার মাস দশদিন পূর্ণ না হয়, তাহলে চার মাস দশদিন পূর্ণ করবে। আর যদি চার মাস দশদিন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু طُهْرٌ مُمْتَدَّةٌ দীর্ঘ পবিত্রতার দরুন তিন হায়েজ শেষ না হয়, তাহলে তিন হায়েজ পূর্ণ করবে।

তরফাইনের দলিল : মিরাস লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে, তাই সতর্কতাস্বরূপ ইদ্দতের ক্ষেত্রেও বিবাহ-বন্ধনকে বহাল ধরা হবে। তাই উভয় ইদ্দত একত্র করা হবে। কেননা, উক্ত নারীর জন্য উভয় ইদ্দতই প্রযোজ্য। তালাকের কারণে তিন হায়েজ আর স্বামীর মৃত্যুর কারণে চার মাস দশদিন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : উক্ত নারীর ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। **দলিল :** ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বিবাহ-বন্ধন তো মৃত্যুর পূর্বে তালাকে বায়েনের দ্বারাই ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই তার ইদ্দত তিন হায়েজ দ্বারাই পালনীয় হবে। আর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশদিন তখন পালন করা আবশ্যক যখন মৃত্যুর কারণেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। বর্ণিত মাসআলায় তা নয়। তাই উক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েজ দ্বারাই ইদ্দত পালন করবে।

একটি প্রশ্নের উত্তর : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্ত মতের আলোকে সেই নারী মিরাস লাভের অধিকারীণী না হওয়া উচিত ছিল। অথচ তিনি তার মিরাস লাভের মত প্রকাশ করেছেন। তার উত্তরে বলা হয় যে, এখানে اِمْرَأَةُ الْفَارِّ -এর কথা বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম তার মিরাস লাভের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে মৃত্যুশয্যায় তিন তালাক বা এক তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায় তাহলে সে নারী মিরাসের অধিকার লাভ করবে। উক্ত ইজমায়ে সাহাবার কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মিরাস লাভের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা : আর যদি মৃত্যুশয্যায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করে, আর স্বামী মারা যায় তাহলে সকলের ঐকমত্যে মহিলার উপর মৃত্যুর ইদ্দত তথা চার মাস দশদিন পালন করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন, এই মর্মে যে, স্বামী ধর্মত্যাগের পর মারা গেলে কিংবা ধর্মত্যাগের দরুন নিহত হলে তার মুসলমান স্ত্রী মিরাস পাবে, তবে তার ইদ্দতও দুই ইদ্দতের দীর্ঘতম মেয়াদটিই পালনীয় হবে। এটাই তরফাইনের অভিমত। আর কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, এখানে সকলের মতে তিন হায়েজ দ্বারাই ইদ্দত পালন করা হবে। এ সুরতে মিরাস লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন ধর্মত্যাগী স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে না। কেননা, মুসলিম নারী কাফেরের মিরাস লাভ করে না।

فَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِيْ عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إِنْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِزَوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ أَوِ الْمَوْتِ ـ وَإِنْ كَانَتْ آئِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ إِنْتَقَضَ مَا مَضٰى مِنْ عِدَّتِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ وَمَعْنَاهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ هُوَ الصَّحِيْحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلَفًا وَهٰذَا لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلِيْفَةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسِ وَ ذٰلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعِجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِيْ حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِيْ ـ وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ ـ

অনুবাদ : দাসীকে যদি তালাকে রাজ'ঈ পরবর্তী ইদ্দত পালনকালে আজাদ করা হয়, তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন স্ত্রীলোকের ইদ্দতে পরিবর্তিত হবে। কেননা, সর্বদিক থেকে বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাকের ইদ্দত পালন করা অবস্থায় কিংবা বৈধব্যের ইদ্দত পালন অবস্থায় আজাদ হয়, তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন স্ত্রীলোকের ইদ্দতে পরিবর্তিত হবে না। কেননা, বিচ্ছেদের মাধ্যমে কিংবা মৃত্যুর মাধ্যমে বিবাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তালাকপ্রাপ্তা যদি ঋতুনিরাশ স্ত্রীলোক হয়, আর মাস হিসেবে ইদ্দত পালন শুরু করে কিন্তু পরবর্তীতে স্রাব দেখতে পায়, তাহলে যতটুকু ইদ্দত পার হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে নতুন করে, হায়েজ দ্বারা ইদ্দত শুরু করতে হবে। উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মর্ম এই যে, যদি পূর্ব অভ্যাসের অনুরূপ [স্বাভাবিক মাত্রায়] স্রাব দেখতে পায়। কেননা, পুনঃস্রাব ঋতুনিরাশ অবস্থাকে বাতিল করে দেয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। সুতরাং এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাসের ইদ্দত হায়েজের ইদ্দতের স্থলবর্তী হতে পারেনি। কেননা, স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো ঋতুনিরাশ সুনিশ্চিত হওয়া। আর তা হবে মৃত্যু পর্যন্ত এই ধাতুনিরাশের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে। যেমন– শায়খে ফানী। [জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের] ক্ষেত্রে ফিদিয়ার বিষয়টি। দুটি হায়েজ হওয়ার পর যদি ঋতুনৈরাশ্য ঘটে ,তাহলে [নতুন করে] মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। যেন মূল ও স্থলবর্তীর একত্র সমাবেশ না ঘটে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِيْ عِدَّتِهَا الخ : **বিবাহিত দাসীর ইদ্দত প্রসঙ্গে :** বিবাহিত দাসীকে যদি তার স্বামী তালাকে রাজ'ঈ প্রদান করে, আর উক্ত তালাকের ইদ্দতরত অবস্থায় তার মনিব তাকে আজাদ করে দিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে আজাদ নারীর ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। অর্থাৎ সে যদি ঋতুমতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। অন্যথায় তিন মাস পূর্ণ করবে।

দলিল : তালাকে রাজ'ঈর দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে বহাল থাকে। তাই এ অবস্থায় আজাদ করার অর্থ হলো, তাকে সম্পূর্ণ বিবাহিত অবস্থায় আজাদ করা হলো, তাই তার ইদ্দতও আজাদ মহিলার ন্যায় পালন হবে। আর যদি বিবাহিত দাসীকে বায়েন তালাক কিংবা তিন তালাকের ইদ্দত পালন অবস্থায় কিংবা বৈধব্যের ইদ্দত পালন অবস্থায় আজাদ করা হয়, তাহলে এসব সুরতে স্বাধীন নারীর ন্যায় ইদ্দত পালিত হবে না। কেননা, বায়েন কিংবা তিন তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর কারণেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব তার পূর্বের ইদ্দত বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ آئِسَةً فَاعْتَدَّتْ الخ : **ঋতুনিরাশ মহিলার ইদ্দত প্রসঙ্গে মাসআলা :** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক যদি হায়েজ হতে নিরাশ হয়ে মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালন আরম্ভ করার পর রক্ত দেখে তাহলে এ ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে। আবার নূতনভাবে হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন আরম্ভ করবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, রক্ত দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার পূর্ব অভ্যাসের অনুরূপ স্রাব দেখতে পায়, তাহলে তার হুকুম হলো নতুনভাবে স্রাব হিসেবে ইদ্দত পালন। আর অনুরূপ না হলে পূর্ব ইদ্দত বহাল থাকবে।

দলিল : পূর্ব অভ্যাসের অনুরূপ পুনঃস্রাব ঋতুনিরাশকে বাতিল করে দেয়। এ ক্ষেত্রে মাসের ইদ্দত তার স্থলবর্তী হতে পারে না। কারণ, মৃত্যু পর্যন্ত ঋতুনিরাশের ধারাবাহিকতা না হলে ঋতুনিরাশ সুনিশ্চিত হয় না। অথচ স্থলবর্তিতার জন্য নিশ্চিত হওয়া শর্ত। সুতরাং পুনরায় অভ্যাসের মতো ধাতু আসলে হায়েজের দ্বারাই ইদ্দত পালন হবে। কেননা, আসলের উপস্থিতিতে খলিফা ও স্থলাবর্তী-এর উপর নির্ভর করা হয় না। যেমন– শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে রোজার ফিদিয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পরে রোজা রাখতে সক্ষম হলে ফিদিয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যায় রোজা কাজা করা ওয়াজিব হয় এবং তায়াম্মুমের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পানির উপর সক্ষম হয় তাহলেও তায়াম্মুমের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপ উল্লিখিত মাসআলার মাঝেও।

قَوْلُهُ وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ الخ : **ইদ্দতের মধ্যবর্তী অবস্থায় হায়েজ বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে মাসআলা :** তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করছে, কিন্তু দুই হায়েজ হওয়ার পর সে ঋতুনিরাশ হয়ে গেছে। তাহলে এ অবস্থায় নতুনভাবে মাসের মাধ্যমে ইদ্দত পালন শুরু করবে। **দলিল :** কেননা, ইদ্দত হয়তো বা হায়েজ দ্বারা পূর্ণ করবে অথবা মাস দ্বারা। কিন্তু দুই হায়েজ আর এক মাস দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করা জায়েজ নেই। কেননা, এতে মূল এবং স্থলবর্তী একত্র করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, আর তা জায়েজ নেই।

وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ عِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِى الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ لِاَنَّهَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفُ وَاِذَا مَاتَ مَوْلَى اُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا اَوْ اَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلٰثُ حِيَضٍ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْاِسْتِبْرَاءَ وَلَنَا اَنَّهَا وَجَبَتْ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَاَشْبَهَ عِدَّةَ النِّكَاحِ ثُمَّ اِمَامُنَا فِيْهِ عُمَرُ (رض) فَاِنَّهُ قَالَ عِدَّةُ اُمِّ الْوَلَدِ ثَلٰثُ حِيَضٍ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ كَمَا فِى النِّكَاحِ .

অনুবাদ : নিকাহে ফাসিদ দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী আর সন্দেহমূলক সঙ্গমপীড়িতার জন্য বিচ্ছেদ ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রে ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। কেননা, এ দুজনের ইদ্দত হচ্ছে শুধুই গর্ভমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে; বিবাহের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে নয়। আর হায়েজই হচ্ছে গর্ভমুক্তির পরিচায়ক। উম্মে ওয়ালাদের মনিব যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা মনিব যদি তাকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার ইদ্দত হলো এক হায়েজ। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত সাব্যস্ত হয় মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং তা اِسْتِبْرَاءُ [গর্ভমুক্তির পরিচায়ক] -এর সদৃশ হবে। আমাদের দলিল এই যে, মনিবের শয্যাবাস বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এটা সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং তা বিবাহের ইদ্দতের সদৃশ হলো। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) হলেন আমাদের আদর্শ। তিনি বলেছেন, উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত হলো তিন হায়েজ। আর যদি তার ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে ইদ্দত হবে তিন মাস। যেমন– বিবাহের ইদ্দতের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا الخ - **নিকাহে ফাসিদের ইদ্দত প্রসঙ্গে মাসআলা :** কোনো নারীর সঙ্গে যদি নিকাহে ফাসিদ হয়, যেমন সাক্ষীবিহীন বিবাহ করল, কিংবা সন্দেহমূলকভাবে স্ত্রী মনে করে সহবাস করেছে অথচ সে তার স্ত্রী ছিল না, তাহলে সঙ্গমকারীর উপর মহর ওয়াজিব হবে এবং মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। সঙ্গমকারীর মৃত্যু এবং উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ উভয় অবস্থায়ই উক্ত বিধান প্রযোজ্য। মহিলা যদি ঋতুমতী ও আজাদী হয়, তাহলে তার ইদ্দত তিন হায়েজ, আর দাসী হলে দুই হায়েজ। আর যদি মহিলা ঋতুমতী না হয়ে স্বাধীন হয় তাহলে তার ইদ্দত তিন মাস, আর দাসী হলে দেড় মাস। **দলিল :** [নিকাহে ফাসিদ ও সন্দেহমূলক সঙ্গম] উক্ত উভয় সুরতে এ দুজনের ইদ্দত হচ্ছে শুধুই গর্ভমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে; বিবাহের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে নয়। কেননা, এ দুই সুরতে বিবাহের কোনো হক নেই। আর গর্ভমুক্তির এক মাস পরিচায়ক হলো হায়েজ। তাই ঋতুমতী নারীর ক্ষেত্রে হায়েজ অর অঋতুমতীর ক্ষেত্রে মাস দ্বারা তার ইদ্দত নির্ধারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَاتَ مَوْلَى اُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا الخ : **দ্বিতীয় মাসআলা :**

উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত প্রসঙ্গে : উম্মে ওয়ালাদের মনিব যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা তাকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দত নিয়ে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, উক্ত মহিলার ইদ্দত হবে হায়েজ।

তাঁদের দলিল : মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়। আর এটা اِسْتِبْرَاءُ [গর্ভমুক্তির পরিচায়ক] -এর সদৃশ হয়েছে। আর اِسْتِبْرَاءُ -এর জন্য এক হায়েজই যথেষ্ট, তাই এখানেও উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত এক হায়েজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, উক্ত উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত তিন হায়েজ।

আমাদের প্রথম দলিল হলো, মনিবের শয্যাবাস বিলুপ্তির কারণে যেহেতু তার ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এটা বিবাহের ইদ্দতের সদৃশ হলো। তাই বিবাহের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তিন হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করা হবে।

দ্বিতীয় দলিল : হযরত ওমর (রা.)-এর বাণী। তিনি বলেছেন– عِدَّةُ اُمِّ الْوَلَدِ ثَلٰثُ حِيَضٍ উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত হলো তিন হায়েজ আর যদি উম্মে ওয়ালাদের ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাস; যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيْرُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبَلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِثَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَهُمَا إِطْلَاقُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْلِ فِيْ أُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ لَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ فَرَاغِ الرَّحِمِ لِشَرْعِهَا بِالْأَشْهُرِ مَعَ وُجُوْدِ الْأَقْرَاءِ لٰكِنَّ لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ وَهٰذَا الْمَعْنٰى يَتَحَقَّقُ فِي الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ لِأَنَّهُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ بِالشُّهُوْرِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِحُدُوْثِ الْحَمْلِ وَفِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ كَمَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقَا وَلَا يَلْزَمُ إِمْرَأَةَ الْكَبِيْرِ إِذَا أَحْدَثَ لَهَا الْحَبَلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْهُ فَكَانَ كَالْقَائِمِ عِنْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ فَلَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعُلُوْقُ وَالنِّكَاحُ يُقَامُ مَقَامَهُ فِيْ مَوْضِعِ التَّصَوُّرِ .

অনুবাদ : নাবালক যদি গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ইদ্দত হবে গর্ভপ্রসব। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার ইদ্দত চার মাস দশদিন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই অভিমত। কেননা, এ গর্ভস্থ সন্তানের বংশ সম্পর্ক মৃতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং মৃত্যুর পর সঞ্চারিত গর্ভের অনুরূপ হলো। তরফাইনের দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হচ্ছে নিঃশর্ত [অর্থাৎ সঞ্চারিত গর্ভ স্বামীর ঔরসজাত হওয়ার শর্ত নেই]। তাছাড়া এজন্য যে, স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে প্রসবের সময়কাল দ্বারা নির্ধারিত। সে সময়কাল দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত। এ ইদ্দত গর্ভমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নয়। কেননা, ঋতুস্রাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়ত এ ইদ্দতকে মাসভিত্তিক অনুমোদন করেছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এটা শুধু বিবাহের হক আদায়ের জন্য, আর বিবাহের হক আদায় করার পর বিষয়টি নাবালক স্বামীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও সঞ্চারিত গর্ভ তার নাও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মৃত্যু পরবর্তী গর্ভ সঞ্চারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেখানে মাসভিত্তিক ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং নতুন গর্ভ সঞ্চারের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে ইদ্দত যখন সাব্যস্ত হয়েছে তখন গর্ভকাল দ্বারা নির্ধারিত অবস্থায়ই সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দুটো বিষয় পৃথক হয়ে গেল। সাবালক স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি এখানে আপত্তিযোগ্য নয়। কেননা, এই গর্ভস্থ সন্তানের বংশ সম্পৃক্ত হয় উক্ত স্বামীর সাথেই। সুতরাং হুকুমও বিধানগত ক্ষেত্রে সঞ্চারিত গর্ভ মৃত্যুর সময় বিদ্যমান ছিল বলে গণ্য হবে। উভয় অবস্থায় সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্কের বীর্য নেই। সুতরাং তার দ্বারা গর্ভ সঞ্চারের কল্পনা করা যায় না। আর বিবাহকে বীর্যের স্থলবর্তী গণ্য করা হয় কল্পনা সম্ভব স্থানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيْرُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ الخ - নাবালক স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দত প্রসঙ্গে :

মাসআলা : নাবালক বাচ্চা গর্ভবতী স্ত্রী রেখে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত প্রসঙ্গে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, তার ইদ্দত হবে গর্ভ প্রসব করা।

প্রথম দলিল : তরফাইন (র.) তাদের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে আল্লাহর বাণীকে পেশ করেন- وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হলো গর্ভপ্রসব]। উক্ত আয়াতের মাঝে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকারের শর্ত ছাড়াই সকল গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের ইদ্দত হবে গর্ভপ্রসবকাল পর্যন্ত। চাই তালাকের ইদ্দত হোক বা স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত হোক এবং স্বামীর ঔরসজাত গর্ভ হোক বা অন্যের ঔরসজাত হোক। কোনো এক প্রকারের সঙ্গে নির্ধারিত করা হয়নি। অতএব, আয়াতের মাঝে বিষয়টি ব্যাপক রয়েছে, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়টিতে শামিল রয়েছে। যদিও উক্ত সুরতে স্বামীর সঙ্গে বংশ সম্পৃক্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে ইদ্দতে ওফাত নির্ধারণ করা হয়েছে গর্ভ প্রসবকালকে- চাই উক্ত মেয়াদকাল দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিবাহের হক আদায় করা; গর্ভমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা নয়। কেননা, নারী ঋতুমতী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর মৃত্যুর কারণে মাসের দ্বারাই ইদ্দত পালনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ইদ্দতে ওফাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের হক আদায় করা; গর্ভমুক্তি নিশ্চিত করা নয়। আর বিবাহের হক আদায় নাবালকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যদিও গর্ভ তার থেকে সঞ্চারিত নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব : তিনি বলেন, নাবালক স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ মতই পোষণ করেন। **দলিল :** প্রকাশ থাকে যে, তাঁরা দলিল হিসেবে যুক্তি পেশ করেন এই মর্মে যে, যেহেতু নাবালকের সাথে বংশ সম্পৃক্ত হয় না, সুতরাং এটা اَلْحَادِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ মৃত্যু পরবর্তী অবস্থায় সঞ্চারিত গর্ভের ন্যায় হলো, আর মৃত্যু পরবর্তী গর্ভসঞ্চার অবস্থায় সকলের মতে ইদ্দতে ওফাত চার মাস দশদিন হয়ে থাকে। অতএব, এখানেও তা-ই হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ الخ - তরফাইনের পক্ষে জবাব : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে তরফাইন বলেন- اَلْقَائِمُ عِنْدَ الْمَوْتِ-কে اَلْحَادِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ-এর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা, উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, মৃত্যুর সময় গর্ভবতী না হওয়ার সুরতে প্রথম থেকেই তার ইদ্দত মাস দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে বিবাহের হক আদায় করা হয়। এখন যদি পরবর্তীতে গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহলে তার ইদ্দত আর পরিবর্তিত হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় প্রথম থেকেই তার ইদ্দত নির্ধারণ করা হয়েছে প্রসব দ্বারা। কেননা, গর্ভবতী নারীর ইদ্দত প্রসবের দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং উভয় সুরত ভিন্ন প্রকাশিত হলো। তবে বালেগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইদ্দত পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কেননা, সেখানে বুঝতে হবে যে, মৃত্যুর সময়ই গর্ভবতী ছিল। কেননা, সাবালকের ক্ষেত্রে বিবাহকেই সহবাসের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, সেখানে গর্ভ তার ঔরসজাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু নাবালকের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তার বীর্য না থাকার কারণে তার থেকে গর্ভধারণ কল্পনা করা যায় না। তাই গ্রন্থকার (র.) বলেন, لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ মৃত্যুর সময় গর্ভবতী হোক বা পরে হোক কোনো অবস্থাতেই নাবালকের সঙ্গে সন্তানের বংশ সম্পৃক্ত হবে না। لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ [নাবালকের বীর্য না থাকার কারণে]।

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ-এর অর্থ : রাসূল ﷺ -এর বাণী- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ [সন্তান শয্যার সঙ্গে] -এর মর্মার্থ হলো বিবাহ তখনই বীর্যের স্থলবর্তী গণ্য হবে যখন বীর্যের কল্পনা সম্ভব হবে। [আর এটা সম্ভব সাবালকের ক্ষেত্রে; নাবালকের ক্ষেত্রে নয়]।

وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِىْ وَقَعَ فِيْهَا الطَّلَاقُ لِاَنَّ الْعِدَّةَ مُقَدَّرَةٌ بِثَلٰثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا . وَاِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ اُخْرٰى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ وَيَكُوْنُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَاِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْاُوْلٰى وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَا تَتَدَاخَلَانِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الْعِبَادَةُ فَاِنَّهَا عِبَادَةُ كَفٍّ عَنِ التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوْجِ فَلَا تَتَدَاخَلَانِ كَالصَّوْمَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَنَا اَنَّ الْمَقْصُوْدَ اَلتَّعَرُّفُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمِ وَقَدْ حَصَلَ بِالْوَاحِدَةِ فَتَتَدَاخَلَانِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ اَلَا تَرٰى اَنَّهَا تَنْقَضِىْ بِدُوْنِ عِلْمِهَا وَمَعَ تَرْكِهَا الْكَفَّ .

অনুবাদ : স্বামী যদি স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে যে হায়েজটিতে তালাক সম্পন্ন হয়েছে সেটিকে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা হবে না। কেননা, ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েজ দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং তা থেকে কমানো যাবে না। ইদ্দতরত অবস্থায় যদি স্ত্রীলোকটি সন্দেহমূলক সঙ্গমপীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে তার উপর আরেকটি ইদ্দত অবশ্য সাব্যস্ত হবে এবং দুটি ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হয়ে যাবে এবং [পরবর্তীতে] যে ঋতুস্রাব দেখা যাবে, সেটা উভয় ইদ্দত থেকে গণ্য হবে। যখন প্রথম ইদ্দতটি শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু দ্বিতীয় ইদ্দতটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তখন দ্বিতীয় ইদ্দতটি পূর্ণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে। এটা হলো আমাদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দুই ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে না। কেননা, মূলত ইদ্দত হচ্ছে ইবাদত। অর্থাৎ গৃহ থেকে বের না হওয়া এবং বিবাহ পরিহার করার ইবাদত। সুতরাং তা পরস্পর প্রবিষ্ট হতে পারে না; যেমন একই দিনে দুটি রোজা হতে পারে না। আমাদের দলিল এই যে, ইদ্দতের উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভাশয়টি মুক্ত থাকার পরিচয় লাভ আর সেটা একটি ইদ্দত দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং পরস্পর প্রবিষ্ট হতে কোনো বাধা নেই। আর ইবাদতের বিষয়টি এখানে আনুষঙ্গিক। এজন্যই স্ত্রীলোকটির অজান্তেও ইদ্দত আদায় হয়ে যেতে পারে এবং গৃহত্যাগ ও বিবাহ থেকে সংযম ছাড়াও ইদ্দত সম্পন্ন হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ الخ - **হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রসঙ্গে মাসআলা :** কোনো লোক যদি তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে যে হায়েজে তালাক পতিত হলো সেটি ইদ্দতের মাঝে গণনা করা যাবে না।

দলিল : সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইদ্দতের ক্ষেত্রে পূর্ণ তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। অতএব, এ অসম্পূর্ণ হায়েজকে ইদ্দতে গণনা করা যাবে না। কেননা, এতে ইদ্দতের তিন হায়েজ পূর্ণ হয় না।

قَوْلُهُ وَاِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ الخ - **দুই ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে :** কোনো স্ত্রীলোকের উপর যদি দুই ইদ্দত ওয়াজিব হয়, তাহলে একটি আরেকটির মাঝে تَدَاخُلْ [প্রবিষ্ট] হবে কিনা? এ ব্যাপারে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ– যদি একই পুরুষ থেকে দুই ইদ্দত ওয়াজিব হয় যেমন স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিল অতঃপর হালাল মনে করে সে স্বামী ইদ্দতের মাঝে

তাকে আবার বিবাহ করে তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। অথবা হালাল মনে করে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করে অথবা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, এসব সুরতে সকলের ঐকমত্যে দুটি ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে। আর যদি দুই পুরুষ থেকে দুটি ইদ্দত ওয়াজিব হয় এবং ইদ্দত দুটি ভিন্ন জাতের হয়; যেমন বৈধব্যের ইদ্দতরত অবস্থায় তার সঙ্গে وَطْئ بِالشُّبْهَةِ -সন্দেহমূলকভাবে সঙ্গমপীড়িত হয়। এ সুরতের হুকুম সামনের মাসআলায় আসবে। আর যদি দুটি ইদ্দত একই জাতের হয় যেমন, তালাকপ্রাপ্তা তার ইদ্দতের মাঝে আরেক স্বামী বিবাহ করেছে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সঙ্গমপীড়িত হয়েছে। অতঃপর দুজনের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এ সুরতে আমাদের মতে, উভয় ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে এবং পরবর্তীতে যা কিছু ঋতুস্রাব দেখা যাবে, তা উভয় ইদ্দত থেকেই গণ্য করা হবে। এতে প্রথম ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় ইদ্দত পূর্ণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এর সুরত হলো, মহিলা এক হায়েজ দেখার পর দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গমপীড়িত হয়েছে। এখন দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গমের পর তার উপর তিন হায়েজ ওয়াজিব হবে এবং দুই হায়েজ চার হায়েজের স্থলবর্তী হবে– এভাবে যে, দুই হায়েজ প্রথম ইদ্দত হতে আর দুই হায়েজ দ্বিতীয় ইদ্দত হতে গণনা করা হবে। আর তৃতীয় হায়েজ শুধু দ্বিতীয় ইদ্দতে গণ্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম করার পূর্বে কোনো হায়েজ না দেখে, তাহলে তার উপর তিন হায়েজ ওয়াজিব এবং তিনটিই ছয় হায়েজের স্থলবর্তী হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ সুরতেও দুটি হায়েজ পরস্পর প্রবিষ্ট হবে না; বরং পূর্ণভাবে দুটি ইদ্দত পূর্ণ করা আবশ্যক। **তাঁর দলিল :** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যেহেতু ইদ্দত হলো ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তাই তা অন্যান্য ইবাদতের ন্যায়। যেমন একই দিনে দুই রোজা হয় না, অনুরূপ এখানেও একটি ইদ্দত আরেকটির মাঝে প্রবিষ্ট হবে না।

আহনাফের দলিল : ইদ্দতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গর্ভাশয়টি মুক্ত থাকার পরিচয় লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য একটি ইদ্দত দ্বারাই অর্জিত হয়। তাই উদ্দেশ্যগতভাবে একটি আরেকটির মাঝে প্রবিষ্ট হতে কোনো বাধা নেই।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর জবাবে] ইবাদতের বিষয়টি হলো আনুষঙ্গিক; মৌলিক নয়। এজন্যই তো অনেক সময় মহিলার অবগতি ছাড়াই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ ইবাদত নিয়ত ও অবগতি ছাড়া আদায় হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইদ্দতরত অবস্থায় মহিলা যদি ঘর থেকে বের হয়ে যায় কিংবা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ করে, তাহলে সকলের মতেই তাতে ইদ্দত বাতিল হবে না। এতে বুঝা যায়, এখানে ইবাদতের বিষয়টি মূল নয়।

ইনায়া গ্রন্থকারের জবাব : ঘর হতে বের হওয়া এবং বিবাহ করা হারামই হলো ইদ্দতের রুকন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ তিনি আরো বলেন– وَلَا يَخْرُجْنَ উক্ত দুটি আয়াতের মাঝে নিষেধমূলক শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যার দ্বারা স্পষ্ট হারাম প্রমাণিত হয়। স্পষ্ট বুঝা যায়, ইদ্দতের রুকন হলো হুরমত। আর একাধিক হুরমত একত্র হতে পারে। যেমন মুহরিমের জন্য হেরেমের শিকার হারাম। ইহরামের কারণে এবং হেরেমের কারণেও হারাম। কোনো লোক রোজা রাখা অবস্থায় শরাব পান না করার শপথ করল। এখানে রোজার কারণেও হারাম এবং শরাব হারাম হওয়ার কারণেও হারাম। পক্ষান্তরে রোজা [যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে] -এর রুকন হলো শুধু বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর]। আর দুই বিরত থাকা একসঙ্গে একত্র হতে পারে না। সুতরাং এ দুই বিষয়ের মাঝে তুলনা করা যথার্থ হয়নি।

وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ بِالشُّهُوْرِ وَتُحْتَسَبُ بِمَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ فِيْهَا تَحْقِيْقًا لِلتَّدَاخُلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِى الطَّلَاقِ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَفِى الْوَفَاةِ عَقِيْبَ الْوَفَاةِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ اَوِ الْوَفَاةِ حَتّٰى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِاَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ اَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاءُهَا مِنْ وَقْتِ وُجُوْدِ السَّبَبِ وَمَشَائِخُنَا يُفْتُوْنَ فِى الطَّلَاقِ اَنَّ اِبْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ۔

অনুবাদ : বৈধব্যের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি সন্দেহমূলক সঙ্গমপীড়িতা হয়ে পড়ে, তাহলে যথারীতি মাসভিত্তিক ইদ্দত পালন করে যাবে এবং ঐ মাসগুলোতে যে ঋতুস্রাব দেখা যাবে সেগুলোকে নতুন ইদ্দত হিসেবে গণ্য করা হবে। যাতে যতদূর সম্ভব উভয় ইদ্দতের মাঝে প্রবিষ্টতা সাব্যস্ত হয়। আর তালাকের ইদ্দত তালাকের পর থেকে এবং মৃত্যুর ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে আরম্ভ হবে। যদি তালাকের কিংবা স্বামীর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত না থাকে এবং এ অবস্থায় ইদ্দত পার হয়ে যায়, তাহলে তার ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, ইদ্দত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে তালাক কিংবা মৃত্যু। সুতরাং কারণ বিদ্যমান হওয়ার পর থেকেই ইদ্দত আরম্ভ বিবেচ্য হবে। আমাদের মাশায়েখগণ তালাকের ক্ষেত্রে ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, যখন তালাকের কথা স্বীকার করবে তখন থেকে ইদ্দত শুরু হবে, যাতে পরস্পর যোগসাজশের অভিযোগ বিদূরিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةٍ إِذَا وُطِئَتْ الخ : **বৈধব্যের ইদ্দত প্রসঙ্গে মাসআলা :** বৈধব্যের ইদ্দত পালন অবস্থায় যদি তার সঙ্গে সন্দেহমূলক সঙ্গমপীড়িতা হয়, তাহলে যথারীতি মাসভিত্তিক ইদ্দত পালন করবে এবং এ চার মাস দশদিনের মাঝে যে হায়েজের রক্ত দেখবে তা দ্বিতীয় ইদ্দতের মাঝে গণ্য হবে, যাতে যথাসাধ্য পারস্পরিক প্রবিষ্টতা সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِى الطَّلَاقِ الخ : **মাসআলা :** ইদ্দতের শুরু সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দত শুরু হবে তালাক দেওয়ার পর থেকে। আর মৃত্যুর কারণে মৃত্যুর পর থেকে ইদ্দত আরম্ভ হবে। সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার তালাক সম্পর্কে যদি স্ত্রীর অবগতির পূর্বে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ স্ত্রীর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তার অজ্ঞাতে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায়, তাহলে সকল ইমামের মতে স্ত্রীর অবগতির পর আবার ইদ্দত পুনঃপালন করা প্রয়োজন নেই; বরং তাঁর ইদ্দত আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর দলিল হলো, তালাক কিংবা মৃত্যুর কারণেই মূলত ইদ্দত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং কারণ বিদ্যমান হওয়ার সময় থেকেই ইদ্দত আরম্ভ বিবেচ্য হওয়া আবশ্যক। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার (র.) বলেন, তালাককে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করার মাঝে শিথিলতা রয়েছে। তিনি আরো বলেন- فَالْأَوْلٰى اَنْ يُقَالَ لِاَنَّ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ يَتِمُّ السَّبَبُ فَيَتَعَقَّبُهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ - 'তালাক এবং মৃত্যুর সময় কারণ পূর্ণ হয়। অতএব তার থেকেই কোনো ধরনের পার্থক্যবিহীন ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে।' -[ফাতহুল কাদীর খ. ৪, পৃ. ১৫৪]

قَوْلُهُ وَمَشَائِخُنَا يُفْتُوْنَ فِى الطَّلَاقِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমাদের বুখারা এবং সমরকন্দবাসী ওলামা-মাশায়েখদের তালাকের ক্ষেত্রে ফতোয়া হলো যে, যখন তালাকের কথা স্বীকার করবে তখন থেকেই ইদ্দত শুরু হবে। যেমন স্বামী যদি স্ত্রী হতে দীর্ঘদিন পৃথক থাকার পরে স্ত্রীকে স্বামী বলল, আমি তোমাকে এতদিন পূর্বে তালাক দিয়েছি, কিন্তু স্ত্রী তা জানে না। এখন স্ত্রী যদি তা স্বীকার করে মেনে নেয় এবং তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে যেদিন থেকে তালাক দিয়েছে, ইদ্দত সে দিন থেকে শুরু হবে। **দলিল :** যাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যোগসাজসের অভিযোগ না থাকে। অর্থাৎ, তারা উভয়ে তালাক প্রদান এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর একমত হয়েছে, যাতে স্বামী তার [স্ত্রীর] জন্য ঋণের কথা স্বীকার করতে পারে কিংবা অসিয়ত করতে পারে। সুতরাং এ তুহমত বিদূরিত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যখন থেকে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে তখন থেকেই ইদ্দত আরম্ভ হবে।

وَالْعِدَّةُ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفْرِيْقِ اَوْ عَزْمِ الْوَطْيِ عَلٰى تَرْكِ وَطْيِهَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) مِنْ اٰخِرِ الْوَطْيَاتِ لِاَنَّ الْوَطْيَ هُوَ السَّبَبُ الْمُوْجِبُ وَلَنَا اَنَّ كُلَّ وَطْيٍ وُجِدَ فِى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجْرِىْ مَجْرَى الْوَطْيَةِ الْوَاحِدَةِ لِاِسْتِنَادِ الْكُلِّ اِلٰى حُكْمِ عَقْدٍ وَاحِدٍ وَلِهٰذَا يَكْتَفِىْ فِى الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ اَوِ الْعَزْمِ لَا تَثْبُتُ الْعِدَّةُ مَعَ جَوَازِ وُجُوْدِ غَيْرِهٖ وَلِاَنَّ التَّمَكُّنَ عَلٰى وَجْهِهِ الشُّبْهَةِ اُقِيْمَ مَقَامَ حَقِيْقَةِ الْوَطْيِ لِخَفَائِهٖ وَمَسَاسُ الْحَاجَةِ اِلٰى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِىْ حَقِّ غَيْرِهٖ ـ وَاِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ اِنْقَضَتْ عِدَّتِىْ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ لِاَنَّهَا اَمِيْنَةٌ فِىْ ذٰلِكَ وَقَدْ اُتُّهِمَتْ بِالْكِذْبِ فَتَحْلِفُ كَالْمُوْدَعِ ـ

অনুবাদ : নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দত শুরু হবে বিচ্ছেদ ঘোষণার পর থেকে কিংবা সহবাসকারীর সহবাসের ইচ্ছা ত্যাগের ঘোষণার পর থেকে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শেষবার যখন সহবাস করেছে তখন থেকে ইদ্দত হবে। কেননা, সহবাসই হচ্ছে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ। আমাদের দলিল এই যে, আকদে ফাসিদ [অসঙ্গত বিবাহ-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে সমস্ত সহবাসকে একটি মাত্র সহবাসের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। কেননা, সমস্ত সহবাস একটি আকদের হুকুমকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ কারণেই সমস্ত সহবাসের জন্য একটি মাত্র মহর যথেষ্ট হচ্ছে। সুতরাং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা কিংবা সঙ্গম বর্জনের ঘোষণা করার পূর্বে ইদ্দত সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অন্য সহবাসে অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, [বৈধতার] সন্দেহের ভিত্তিতে লব্ধ সহবাস সক্ষমতাকে প্রকৃত সহবাসের স্থলবর্তী করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃত সহবাসের বিষয়টি গোপনীয় আর ইদ্দতের হুকুম জানার প্রয়োজনীয়তা অন্যের ক্ষেত্রে। ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীলোক যদি বলে, আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে আর স্বামী তার কথা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে কসমসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে হচ্ছে এ বিষয়ে আমানতদার আর সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাকে কসম করে বলতে হবে; যেমন ঐ ব্যক্তির বিষয়টি যার নিকট কোনো দ্রব্য আমানত রাখা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْعِدَّةُ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ الخ - **নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দত প্রসঙ্গে :** গ্রন্থকার (র.) বলেন, নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দত আরম্ভ হবে তখন থেকে, যখন কাজি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন, কিংবা যখন সহবাসকারী সহবাস পরিত্যাগের ইচ্ছা ঘোষণা করে তখন থেকে তার ইদ্দত শুরু হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, শেষবার যখন সহবাস করেছে তখন থেকে ইদ্দত আরম্ভ হবে। **দলিল :** তিনি দলিল হিসেবে বলেন যে, সহবাসই যেহেতু ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তাই শেষ সহবাস থেকেই ইদ্দত শুরু হবে। কেননা, সহবাস না হলে মহিলার উপর এ ক্ষেত্রে ইদ্দত ওয়াজিব

া না। আমাদের দলিল, সহবাস ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ বটে, কিন্তু আকদে ফাসিদের মাঝে যত সহবাস হয়েছে ্গুলোকে এক সহবাসের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। এ কারণেই তো সমস্ত সহবাসের জন্য একই মহর ওয়াজিব হয়। আর শেষ সহবাস যার উপর ইদ্দতের অস্তিত্ব লাভ হয় সেটা কাজির বিচ্ছেদের দ্বারা প্রমাণিত হবে, কিংবা সহবাসকারীর সহবাস ত্যাগের ইচ্ছার পরে। এর পূর্বে ইদ্দত সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অন্যের সহবাস অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

ায় দলিল : প্রকৃত সহবাসের বিষয়টি গোপনীয়। যার কারণ স্পষ্ট। অর্থাৎ, সন্দেহের ভিত্তিতে লব্ধ সহবাস-সক্ষমতা মান রয়েছে। আর প্রত্যেক গোপনীয় বিষয় যার কারণ স্পষ্ট থাকে, তাকে প্রকৃত বিষয়ের স্থলবর্তী করা হয়। তাই এখানে াসের সক্ষমতাকে প্রকৃত সহবাসের স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং সহবাসে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত শেষ সহবাস প্রমাণিত হবে কেননা, প্রত্যেক সহবাসের পরই সহবাস সক্ষমতা অবশিষ্ট থাকার ভিত্তিতে অন্য সহবাসের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমরা ছি যে, উভয়ের মাঝে কাজির বিচ্ছেদ ঘটানো কিংবা সহবাস বর্জনের প্রতিজ্ঞা এ ক্ষেত্রে আবশ্যক, যাতে সহবাস সক্ষমতা ত হয়ে শেষ সহবাস প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَمَسَاسُ الْحَاجَةِ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্য করেছেন। তা া, মূলত সহবাসের বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। কেননা, ইদ্দতের পরিচয় স্বামী-স্ত্রীর াজন। আর তাদের নিকট সহবাসের বিষয় কিছুই অস্পষ্ট নয়। তার জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অনেক সময় ইদ্দতের য় অন্যের জন্য জানারও প্রয়োজন পড়ে। যেমন কেউ যদি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তখন তার ইদ্দতের বিষয় জানার াজন দেখা দেয়। আর তার নিকট সহবাসের বিষয় অস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ اِنْقَضَتْ : মাসআলা : ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীলোক তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দাবি করল, আর ী তা প্রত্যাখ্যান করলে কসমসহ মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। দলিল হলো, ইদ্দতের সংবাদের ক্ষেত্রে মহিলা হলো ানতদারের ন্যায়। অতএব, আমানতদারের কথা যেমন কসমসহ গ্রহণ করা হয় এখানেও মহিলার কথাই গ্রহণ করা হবে।

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِيْ عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْاُوْلٰى لِاَنَّ هٰذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيْسِ فَلَا يُوْجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَلَا اِسْتِيْنَافَ الْعِدَّةِ وَاِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْاُوْلٰى اِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْاَوَّلِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حَالَ التَّزَوُّجِ الثَّانِيْ فَاِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ الثَّانِيْ ظَهَرَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ اِشْتَرٰى اُمَّ وَلَدٍ ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَلَهُمَا اَنَّهَا مَقْبُوْضَةٌ فِيْ يَدِهٖ حَقِيْقَةً بِالْوَطْيَةِ الْاُوْلٰى وَبَقِيَ اَثَرُهُ وَهُوَ الْعِدَّةُ فَاِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ وَهِيَ مَقْبُوْضَةٌ نَابَ ذٰلِكَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحِقُّ فِيْ هٰذَا النِّكَاحِ كَالْغَاصِبِ يَشْتَرِي الْمَغْصُوْبَ الَّذِيْ فِيْ يَدِهٖ يَصِيْرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَوَضَحَ بِهٰذَا اَنَّهُ طَلَاقٌ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا اَصْلًا لِاَنَّ الْاُوْلٰى قَدْ سَقَطَتْ بِالتَّزَوُّجِ فَلَا تَعُوْدُ وَالثَّانِيَةُ لَمْ تَجِبْ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا .

অনুবাদ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর ইদ্দতের ভিতরে তাকে বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে পুনঃতালাক প্রদান করে তাহলে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর আলাদা ইদ্দত অবশ্য পালনীয় হবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বামীর উপর অর্ধেক মহর সাব্যস্ত হবে। আর স্ত্রীর উপর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা হচ্ছে সহবাসবিহীন তালাক। সুতরাং তা পূর্ণ মহর এবং নতুন ইদ্দত ওয়াজিব করবে না। আর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করার আবশ্যকতা হচ্ছে প্রথম তালাকটির কারণে। তবে বিবাহ বিদ্যমান অবস্থায় তা প্রকাশ পায়নি। যখন দ্বিতীয় তালাক দ্বারা তা বিলুপ্ত হলো তখন প্রথম তালাকের বিধান পুনঃপ্রকাশ পায়নি। যেমন অন্য কারো উম্মে ওয়ালাদকে খরিদ করল, তারপর তাকে আজাদ করে দিল। শায়খাইনের দলিল এই যে, প্রথম সহবাসের কারণে প্রকৃতই সে স্বামীর অধিকারে রয়েছে এবং প্রথম সহবাসের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ইদ্দত। সুতরাং আপন অধিকারে থাকা অবস্থায় যখন নতুন বিবাহ সম্পন্ন হলো তখন প্রথম সহবাস দ্বারা লব্ধ অধিকার এই বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য অধিকারের স্থলবর্তী হবে। যেমন জবরদখলকারী দখলকৃত দ্রব্যটি খরিদ করল। এখন শুধু বিক্রয়-চুক্তি হওয়া দ্বারাই বিক্রীত বস্তুর দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রদত্ত তালাকটি সহবাস পরবর্তী তালাকরূপেই সাব্যস্ত। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এখন তার উপর কোনো ইদ্দত নেই। কেননা, প্রথমটি তো দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা প্রত্যাবর্তন করবে না। আর সহবাস না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ইদ্দতও সাব্যস্ত হবে না। তাঁর বক্তব্যের জবাব সেটাই যা ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا الخ - তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা নারীকে পুনঃবিবাহ প্রসঙ্গে মাসআলা : স্বামী স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে স্ত্রীর ইদ্দত পালন অবস্থায় তাকে উক্ত স্বামী পুনঃবিবাহ করল এবং পরে সহবাস কিংবা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বে আবার তালাক দিয়ে দিল। উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

শায়খাইন (র.)-এর মাযহাব : দ্বিতীয় বিবাহ এবং তালাকের কারণে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে এবং স্ত্রীলোকটির উপর নতুনভাবে আলাদা ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। **দলিল :** শায়খাইন (র.) বলেন, প্রথম সহবাসের কারণে প্রকৃতই সে স্বামীর অধিকারে রয়েছে। কেননা, প্রথম সহবাসের চিহ্ন এখনো বাকি রয়েছে। তা হলো ইদ্দত। সুতরাং আপন অধিকারে থাকা অবস্থায় নতুন বিবাহ সম্পন্ন হলো। অতএব প্রথম সহবাস দ্বারা অর্জিত অধিকার দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য অধিকারের স্থলবর্তী হবে। সুতরাং দ্বিতীয় তালাক দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা কৃত সহবাসের পরই সাব্যস্ত হলো।

সমর্থক দলিল : যেমন গাছেব [জবরদখলকারী] দখলকৃত দ্রব্যটি প্রকৃত মালিক হতে খরিদ চুক্তি সম্পন্ন করল। অথচ মাল দখলকারীর নিকট– এ ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেন, শুধু বিক্রয়-চুক্তির দ্বারাই বিক্রীত বস্তুর দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে যেমন ছিনতাইকালে লব্ধ দখল বিক্রয়-চুক্তি দ্বারা প্রাপ্য দখলের স্থলবর্তী হয়েছে। অনুরূপ আমাদের বর্ণিত মাসআলায় প্রথম সহবাস দ্বারা লব্ধ অধিকার দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য অধিকারের স্থলবর্তী হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বামীর উপর এ সুরতে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। আর স্ত্রীলোকটির উপর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব। **দলিল :** তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিবাহের পর যে তালাক পতিত হয়েছে তা সহবাস এবং নির্জনবাসের পূর্বেই হয়েছে। অথচ সহবাসের পূর্বে কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করার সুরতে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয় না এবং মহিলার উপর ইদ্দত পূর্ণ করাও আবশ্যক হয় না। তথাপি এখানে ইদ্দত পূর্ণ করার বিষয়টি এজন্য বলা হয়েছে, যেহেতু প্রথম তালাকের কারণে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তা প্রকাশ পায়নি। অতঃপর সহবাস ব্যতীত যখন তাকে তালাক দিয়ে দিল, তাই দ্বিতীয় বিবাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন প্রথম তালাকের বিধান পুনঃপ্রকাশ পাবে এবং মহিলার উপর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, স্বামীর উপর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। আর মহিলার উপর কোনো ইদ্দতই ওয়াজিব হবে না। প্রথম ইদ্দতও নয় এবং দ্বিতীয় ইদ্দতও নয়। **দলিল :** দ্বিতীয় বিবাহের দরুন প্রথম ইদ্দত রহিত হয়ে গেছে। তাই সে ইদ্দত আবার ফিরে আসবে না। কেননা, নিয়ম হলো– اَلسَّاقِطُ لَا يَعُوْدُ [রহিত বস্তু ফিরে আসে না]। আর দ্বিতীয় ইদ্দত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়ার দ্বারা ইদ্দত ওয়াজিব হয় না।

وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً فَإِنْ تَزَوَّجَتْ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا وَهٰذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا عَلَيْهَا وَعَلَى الذِّمِّيَّةِ الْعِدَّةُ أَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَالْإِخْتِلَافُ فِيْهَا نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِيْ نِكَاحِهِمْ مَحَارِمَهُمْ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فِيْمَا إِذَا كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمُهَاجِرُ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ أُخَرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَّبْلِيْغِ وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيْهَا حَقُّ بَنِيْ أٰدَمَ وَالْحَرْبِيُّ مُلْحَقٌ بِالْجَمَادِ حَتّٰى كَانَ مَحَلًّا لِتَمَلُّكٍ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا لِأَنَّ فِيْ بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَّسَبِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ يَجُوْزُ نِكَاحُهَا وَلَا يَطَأُهَا كَالْحُبْلٰى مِنَ الزِّنَاءِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

অনুবাদ : জিম্মি পুরুষ যদি জিম্মি নারীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার উপর কোনো ইদ্দত নেই। তদ্রূপ দারুল হরবের কোনো নারী যদি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে এবং বিবাহ করে, তাহলে তা বৈধ হবে, যদি না সে গর্ভবতী হয়। এসব ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তার উপর এবং জিম্মি নারীর উপর ইদ্দত আবশ্যক হবে। জিম্মি নারীর ইদ্দতের ব্যাপারে যে মতবিরোধ তা জিম্মিদের বারবার মাহরাম বিবাহ করা সম্পর্কিত মতবিরোধের সদৃশ। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ ফয়সালা ঐ ক্ষেত্রে, যখন তাদের ধর্মমতে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন আবশ্যকীয় না হয়ে থাকে। আর হিজরত করে আসা নারীর ক্ষেত্রে সাহেবাইনের বক্তব্যের দলিল এই যে, অন্য কোনো কারণে যদি বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়, তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়। সুতরাং বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাতেও ইদ্দত ওয়াজিব হবে পক্ষান্তরে স্ত্রীকে দারুল হরবে রেখে স্বামীর দারুল ইসলাম চলে আসার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, শরিয়তের বিধান তার কাছে পৌঁছেনি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল আল্লাহর বাণী– لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ - 'তাদেরকে বিবাহ করাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।' তাছাড়া এজন্য যে, যেখানেই ইদ্দত সাব্যস্ত হয় সেখানেই মানুষের হক রক্ষার বিষয়টি জড়িত থাকে। আর কাফের তো জড়বস্তুর সমতুল্য। তাই সে অন্য মানুষের মালিকানার ক্ষেত্র হয়ে থাকে। তবে গর্ভবতীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সাব্যস্ত নসবের সন্তান তার গর্ভে রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তাকে বিবাহ করা তো জায়েজ হবে, তবে স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না; যেমন– ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতীর ক্ষেত্রে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ الخ - **জিম্মি এবং হরবী মহিলার ইদ্দত প্রসঙ্গে :** জিম্মি পুরুষ যদি তার জিম্মি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে কিংবা হরবী মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে তার ইদ্দতের ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উক্ত সুরতে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং মহিলা যদি অন্যত্র বিবাহ করে, তাহলে তা বৈধ হবে। তবে গর্ভবতী হওয়ার সুরতে বিবাহ জায়েজ হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয় সুরতে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, উক্ত সুরতে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার বিষয় এবং ইমামগণের মতবিরোধের বিষয়টি মাহরামের বিবাহ সম্পর্কিত মতবিরোধের ন্যায়। আর বিবাহ অধ্যায়ে আমরা তা বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তি ঐ সময় প্রযোজ্য যখন জিম্মি মনে করে যে, তার উপর ইদ্দত পালন আবশ্যক নয়।

দারুল ইসলামে চলে আসা মহিলা প্রসঙ্গে : সাহেবাইন (র.) বলেন, তালাক কিংবা মৃত্যুর কারণে যখন বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয় তখন সকলের মতেই সেখানে নারীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং تَبَايُنِ دَارَيْن [দারুল হরব এবং দারুল ইসলামের ভিন্নতা] -এর কারণে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হলে এ ক্ষেত্রেও মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি পুরুষ হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে। আর মহিলা দারুল হরবে অবস্থান করে, তাহলে মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। কেননা, শরিয়তের হুকুম তার নিকট দারুল হরবে পৌছায়নি। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ .

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদি তোমরা জানতে পার যে তারা মু'মিন, তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেররা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদের বিবাহ করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই– যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর।' –[সূরা মুমতাহিনা– ১০] উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের মাঝে মুহাজির নারীদেরকে বিবাহ করার নিঃশর্ত বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ইদ্দত পালনের শর্তারোপের অর্থ হবে আয়াতের মাঝে অতিরিক্ত সংযোজন, যা বৈধ নয়।
যৌক্তিক দলিল : প্রকাশ থাকে যে, যেখানেই ইদ্দত সাব্যস্ত হয় সেখানে মানুষের হক রক্ষার বিষয়টি জড়িত হয়। এজন্যই স্বামীর পানি [বীর্য] রক্ষা করার জন্য মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। আর কাফের তো জড়বস্তু সমতুল্য, তাই তো দাসত্বের মাধ্যমে সে অন্যের মালিকানার ক্ষেত্র হয়ে থাকে। তাকে বাজারে প্রাণীর ন্যায় বিক্রি করা হয়। তাই তার বীর্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। অতএব তার স্ত্রীর উপর ইদ্দতও ওয়াজিব হবে না। তবে যদি হরবী ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহলে প্রসব পর্যন্ত তার সঙ্গে বিবাহ বৈধ নেই। কেননা, তার গর্ভের বাচ্চার নসব সাব্যস্ত রয়েছে এবং ফরাশ [শয্যা] বিদ্যমান আছে। অতএব অন্যত্র বিবাহের দ্বারা যাতে দুই ফরাশ একত্র না হয়ে যায়, যা শরিয়তে বৈধ নয়।
ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত [গর্ভবতী] নারীকে বিবাহ করা জায়েজ, তবে তার সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ নেই।
গ্রন্থকার (র.) বলেন, প্রথম মতই অধিক উত্তম। কেননা, এ সুরতকে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী নারীর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা, ব্যভিচারের সুরতে নসবই সাব্যস্ত নেই। পক্ষান্তরে বর্ণিত মাসআলায় নসব সাব্যস্ত আছে, তাই উভয় সুরতকে একত্র করা যাবে না।

فَصْلٌ قَالَ وَعَلَى الْمَبْتُوْتَةِ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْحِدَادُ اَمَّا الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجِهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَاَمَّا الْمَبْتُوْتَةُ فَمَذْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا حِدَادَ عَلَيْهَا لِاَنَّهُ وَجَبَ اِظْهَارًا لِلتَّاَسُّفِ عَلٰى فَوْتِ زَوْجٍ وَفٰى بِعَهْدِهَا اِلٰى مَمَاتِهِ وَقَدْ اَوْحَشَهَا بِالْاِبَانَةِ فَلَا تَاَسُّفَ بِفَوْتِهِ وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الْمُعْتَدَّةَ اَنْ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ اَلْحِنَّاءُ طِيْبٌ وَلِاَنَّهُ يَجِبُ اِظْهَارًا لِلتَّاَسُّفِ عَلٰى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِىْ هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةُ مُؤْنِهَا وَالْاِبَانَةُ اَقْطَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ حَتّٰى كَانَ لَهَا اَنْ تَغْسِلَهُ مَيِّتًا قَبْلَ الْاِبَانَةِ لَا بَعْدَهَا ـ

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং সদ্য বিধবা স্ত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা ও মুসলিম হয়, তাহলে ইদ্দতকালে শোক পালন করা তার উপর ওয়াজিব। বিধবার ক্ষেত্রে প্রমাণ হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী- 'আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রয়েছে এমন কোনো নারীর জন্য কোনো মৃত ব্যক্তির স্মরণে তিনদিনের অধিক শোক প্রকাশ বৈধ নয়। তবে তার স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক করবে।' আর বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে এটা হলো আমাদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার জন্য কোনো শোক নেই। কেননা, শোক প্রকাশ ওয়াজিব হয়েছে ঐ স্বামীর বিয়োগের উপর দুঃখ প্রকাশ করার জন্য যে স্বামী তার মৃত্যু পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। অথচ এ স্বামী তাকে বায়েন তালাকের মাধ্যমে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সুতরাং তাকে হারানোর জন্য কোনো শোক হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো বর্ণিত এই হাদীস যে, নবী করীম ﷺ ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীলোককে মেহেদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, মেহেদি হলো একটি খোশবু। তাছাড়া এজন্য যে, যে বিবাহ ছিল স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষার ও ভরণপোষণের মাধ্যম সেই নিয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার উপর দুঃখ প্রকাশের জন্য ইদ্দতকালীন শোক প্রকাশ ওয়াজিব হবে। আর তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদন এ নিয়ামতকে মৃত্যুর চেয়েও অধিক কর্তনকারী। এ কারণেই স্ত্রী তার স্বামীকে বিচ্ছেদের পূর্বে গোসল দান করতে পারে। কিন্তু [তালাক দ্বারা] বিচ্ছেদের পর গোসল দিতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনুচ্ছেদ : ইদ্দত পালনকারিণী নারীর করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে :

قَوْلُهُ قَالَ وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا الخ : **মাসআলা :** তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা নারী, যার সঙ্গে রাজ'আতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, সে যদি বালেগা এবং মুসলমান হয়, তাহলে তার জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন, তার উপর শোক পালন ওয়াজিব নয়। প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, শোক প্রকাশ ওয়াজিব হয়েছে স্বামীর বিচ্ছেদের কারণে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য। আর তা তো এমন স্বামীর ক্ষেত্রেই হতে পারে যে মৃত্যু পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। অথচ এ স্বামী বায়েন তালাকের মাধ্যমে তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সুতরাং তাকে হারানোর জন্য কোনো শোক হতে পারে না।

আহনাফের দলিল : হযরত উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইদ্দতপালনকারিণী স্ত্রীলোককে মেহেদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ ইদ্দত পালনকারিণীর কোনো প্রকার নির্ধারণ করেননি। এতে বুঝা যায় যে, সকল প্রকারের ইদ্দত পালনকারিণীর ক্ষেত্রে একই বিধান– চাই স্বামী মৃত্যুর কারণে হোক কিংবা বায়েন তালাক-এর কারণে হোক। অনুরূপ অর্থে ইমাম ত্বাহাবী (র.) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা হলো–

اَلْمُطَلَّقَةُ وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُلَاعِنَةُ لَا يَخْتَضِبْنَ وَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ الخ .

অর্থাৎ 'তালাকপ্রাপ্তা নারী, খোলা গ্রহণকারিণী নারী, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং যার সঙ্গে লি'আন করা হয়েছে এ সকল নারী খিজাব লাগাবে না, খোশবু ব্যবহার করবে না, রং করা কাপড় পরিধান করবে না এবং নিজেদের ঘর হতে বের হবে না।' উক্ত হাদীস আহনাফের প্রমাণকে শক্তিশালী করে।

আহনাফের যৌক্তিক দলিল : مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا [যার স্বামী মৃত্যুবরণ করে] জন্য ইদ্দত পালন করার ব্যাপারে হাদীস স্পষ্ট। সুতরাং তার সঙ্গে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্যও উক্ত বিধান সাব্যস্ত হবে। কেননা, বিবাহতো ছিল স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ ও সম্ভ্রম রক্ষার মাধ্যম। আর এ নিয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার উপর দুঃখ প্রকাশের জন্যই মূলত ইদ্দতকালীন শোক প্রকাশ ওয়াজিব। আর তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদন মৃত্যুর চেয়েও অধিক কর্তনকারী। এ কারণেই তো স্বামীর মৃত্যুর পরেও বিবাহের হুকুম বাকি থাকে। এ কারণেই মৃত স্বামীকে তার স্ত্রী বিচ্ছেদনের পূর্বে গোসল দিতে পারে, কিন্তু তালাক দ্বারা বিচ্ছেদের পর মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারে না। সুতরাং উভয় সুরতের হুকুম একই হবে।

وَالْحِدَادُ وَيُقَالُ الْاِحْدَادُ وَهُمَا لُغَتَانِ اَنْ تَتْرُكَ الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ وَالْكُحْلَ وَالدُّهْنَ الْمُطَيَّبَ وَغَيْرَ الْمُطَيَّبِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَالْمَعْنٰى فِيْهِ وَجْهَانِ اَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِظْهَارِ التَّاَسُّفِ وَالثَّانِىْ اَنَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ دَوَاعِى الرَّغْبَةِ فِيْهَا وَهِىَ مَمْنُوْعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ فَتَجْتَنِبُهَا كَيْلَا تَصِيْرَ ذَرِيْعَةً اِلَى الْوُقُوْعِ فِى الْمُحَرَّمِ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَاْذَنْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِى الْاِكْتِحَالِ وَالدُّهْنُ لَا يَعْرِىْ وَعَنْ نَوْعِ طِيْبٍ فِيْهِ زِيْنَةُ الشَّعْرِ وَلِهٰذَا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ عَنْهُ قَالَ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِاَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً وَالْمُرَادُ الدَّوَاءُ لَا الزِّيْنَةُ وَلَوْ اِعْتَادَتِ الدُّهْنَ فَخَافَتْ وَجَعًا فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ اَمْرًا ظَاهِرًا يُبَاحُ لَهَا لِاَنَّ الْغَالِبَ كَالْوَاقِعِ وَكَذَا لُبْسُ الْحَرِيْرِ اِذَا احْتَاجَتْ اِلَيْهِ لِعُذْرٍ لَا بَاْسَ بِهِ وَلَا تَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بِزَعْفَرَانٍ لِاَنَّهُ يَفُوْحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيْبِ.

অনুবাদ : আর حِدَاد [শোক প্রকাশ] আরবিতে একে إِحْدَاد বলা হয়। এ দুটি পরিভাষা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এটি দ্বারা খোশবু ব্যবহার, সাজসজ্জা গ্রহণ, সুরমা ব্যবহার, সুগন্ধি তেল ও সাধারণ তেল ব্যবহার বর্জন করা, তবে ওজরের কারণে হলে তা ভিন্ন কথা। জামিউস সাগীর কিতাবে ওজর চিহ্নিত করে বলা হয়েছে– "তবে ব্যথা-বেদনার জন্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হলো ভিন্ন কথা।" এগুলোর ব্যবহার বর্জন আবশ্যকীয় হওয়ার কারণ দুটি– একটি হলো শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এগুলো স্ত্রীলোকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী, আর ইদ্দতকালে সে বিবাহ থেকে নিষেধপ্রাপ্ত। সুতরাং সে এগুলো পরিহার করে চলবে, যাতে হারাম বিবাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম না হয়ে দাঁড়ায়। আর বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইদ্দত পালনকারীকে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেননি, আর যে-কোনো তেল কোনো প্রকার সুগন্ধ থেকে মুক্ত নয় তাছাড়া এতে চুলের সজ্জা হয়, এ কারণেই ইহরামের অবস্থায় তেল ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়। ইমাম কুদূরী (র.) ওজরের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম করেছেন। কেননা, তাতে প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ঔষধ ব্যবহার উদ্দেশ্য, সজ্জা উদ্দেশ্য নয়। যদি সে স্ত্রীলোক তেল ব্যবহারে এত অভ্যস্ত হয়ে থাকে যে, তা ব্যবহার না করলে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা হয়। আর এ অবস্থা প্রবল হয়, তাহলে তার জন্য তা ব্যবহার বৈধ হবে। কেননা, যার সম্ভাবনা প্রবল তা বাস্তবতুল্য তদ্রূপ কোনো ওজরের কারণে প্রয়োজন হলে রেশমি পোশাক পরা যায়। তাতে কোনো দোষ নেই। আর মেহেদি দ্বারা রঞ্জিত করবে না। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর কুসুম বা জাফরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না। কেননা, তা থেকে সুবাস ছড়ায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحِدَادُ وَيُقَالُ الْإِحْدَادُ هُمَا لُغَتَانِ الخ : حِدَادْ -এর অর্থ : حِدَادْ অর্থ– শোক প্রকাশ। শব্দটি আরবিতে بَاب نَصَرَ থেকে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো بَاب إِفْعَالْ থেকে إِحْدَادْ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। উভয় বাবে শোক প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

حِدَادْ -এর পারিভাষিক অর্থ : খোশবু ব্যবহার, সাজসজ্জা বর্জন, সুরমা ব্যবহার, সুগন্ধি ও সাধারণ তেল ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বর্জন ও পরিহার করার নাম হলো শোক প্রকাশ।

শোক প্রকাশের কারণসমূহ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, শোক প্রকাশের কারণ দুটি। যথা– ১. প্রথম কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, বিবাহের মতো নিয়ামতের বিলুপ্তির কারণে তার উপর দুঃখ প্রকাশ করা। ২. দ্বিতীয় কারণ হলো এ সকল বস্তু স্ত্রীলোকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে, যা বিবাহের প্রতি ধাবিত হবে। অথচ ইদ্দতকালীন অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ। তাই মহিলা একান্তভাবে এসব বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবে, যাতে এর কারণে কোনো ধরনের হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

হাদীসের আলোকে সুরমা ব্যবহার :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَ إِبْنَتِيْ تُوُفِّيَ وَقَدْ إِشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلٰثًا ـ (اَلْحَدِيْثُ) .

অর্থাৎ 'হযরত উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ -এর নিকট একজন মহিলা উপস্থিত হয়ে বলল, আমার কন্যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। আর ইদ্দতকালীন অবস্থায় তার চোখ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। এখন তার চোখে সুরমা ব্যবহার করাব কি? তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দুবার কিংবা তিনবার তাকে নিষেধ করে বললেন, তা ব্যবহার করা যাবে না।'

উক্ত হাদীসে সুরমা ব্যবহার স্পষ্ট নিষিদ্ধ বুঝা যায়। অন্যান্য সুগন্ধি এবং সাজসজ্জাও ইদ্দত পালনকারীর জন্য নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ الخ : তেল ও সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রসঙ্গে : প্রকাশ থাকে যে, ইমাম কুদূরী (র.) ও জামিউস সাগীরের বর্ণনায় إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ বলে ওজরের বিষয়টি ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, ওজরের সময় প্রয়োজন রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে ঔষধ হিসেবেই ব্যবহৃত হবে; সাজ-সজ্জা হিসেবে নয়। আর যদি মহিলা তেল ব্যবহারে এত বেশি অভ্যস্ত যে, তার তেল ব্যবহার না করলে মাথাব্যথা বাড়ার তীব্র আশঙ্কা হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবের সমতুল্য গণ্য করে। তাকে তেল ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে ওজরের কারণে রেশমি কাপড় পরার অনুমতিও দেওয়া হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا تَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মেহেদির রং-ও ব্যবহার করবে না। এর দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুবাস ছড়ায় এমন কোনো কিছুই ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন– জাফরান ও কুসুম। হাদীসে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীলোক কোনো রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না, খিজাব লাগাবে না এবং সুরমাও ব্যবহার করবে না।

قَالَ وَلَا حِدَادَ عَلٰى كَافِرَةٍ لِاَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوْقِ الشَّرْعِ وَلَا عَلٰى صَغِيْرَةٍ لِاَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوْعٌ عَنْهَا وَعَلَى الْاَمَةِ الْاِحْدَادُ لِاَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْمَا لَيْسَ فِيْهِ اِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلٰى بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنَ الْخُرُوْجِ لِاَنَّ فِيْهِ اِبْطَالُ حَقِّهٖ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهٖ ـ قَالَ وَلَيْسَ فِىْ عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِىْ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اِحْدَادٌ لِاَنَّهَا مَا فَاتَهَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ لِتَظْهَرَ التَّاَسُّفُ وَالْاِبَاحَةُ اَصْلٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অমুসলিম নারীর জন্য শোকের বিধান নেই। কেননা, শরিয়তের হকসমূহ আদায় করার ব্যাপারে সে সম্বোধন-পাত্রী নয়। আর অপ্রাপ্তবয়স্কার জন্যও শোকের বিধান নেই। কেননা, তার সম্পর্কে শরিয়তের বিধান মুলতবি রাখা হয়েছে। দাসীর জন্য শোক পালন আবশ্যক। কেননা, সে আল্লাহর ঐ সকল হক আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট, যাতে মালিকের হক নষ্ট করা হয় না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাতে মনিবের হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক অগ্রবর্তী। কারণ সে মুখাপেক্ষী। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত এবং নিকাহে ফাসিদের ইদ্দতে শোক প্রকাশ নেই। কেননা, উভয়ের কেউ বিবাহের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়নি, যার উপর সে শোক প্রকাশ করবে। আর অনুমতি থাকাই হলো আসল বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا حِدَادَ عَلٰى كَافِرَةٍ الخ - **যাদের জন্য শোক প্রকাশ ওয়াজিব নয় :** প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ঐ সকল নারীর বিবরণ দিয়েছেন যাদের জন্য শোক প্রকাশ করা জরুরি নয়। যেমন – অমুসলিম নারী। তার উপর শোক প্রকাশ জরুরি নয়। কেননা, সে তো শরিয়তের বিধিবিধানের (مُكَلَّفْ) সম্বোধন-পাত্রী নয়। আর শোক তো হলো শরিয়তের বিধান, আল্লাহর হক। আর অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীর জন্যও শোক নেই। কেননা, তার থেকেও বিধি-বিধান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আর দাসী, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, তার উপর শোক প্রকাশ ওয়াজিব হবে। কেননা, সে শরিয়তের বিধানের উপযুক্ত। তবে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে, যাতে তার মনিবের হক নষ্ট না হয়। অতএব, ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয়টি শোকের বিধান থেকে ব্যতিক্রম হবে এবং তার জন্য এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হবে। কেননা, ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ করলে তার মনিবের খেদমতে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের উপর বান্দার হককে অগ্রগণ্য করা হবে। কেননা, বান্দা তো মুখাপেক্ষী, তার খেদমতের প্রয়োজন পড়ে।

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَيْسَ فِىْ عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ الخ - **উম্মে ওয়ালাদের শোক পালন সম্পর্কে :** উম্মে ওয়ালাদের মনিব যদি তাকে আজাদ করে কিংবা মনিব মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর শোক প্রকাশের বিধান শরিয়তে নেই। অনুরূপভাবে নিকাহে ফাসিদের বিচ্ছেদের ইদ্দতকালেও শোক নেই। কেননা, শোক তো হয়ে থাকে বিবাহের নিয়ামত বিলুপ্তির উপর দুঃখ প্রকাশের উদ্দেশ্যে, আর এখানে তো সেটা নয়। তাই শোক না হওয়াই তার আসল বা মূল বিষয়। তাই তার জন্য সাজসজ্জা গ্রহণের অনুমতি থাকবে।

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْخِطْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَعْرُوْفًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلسِّرُّ النِّكَاحُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) اَلتَّعْرِيْضُ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (رض) فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوْفِ إِنِّيْ فِيْكِ الرَّاغِبُ وَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ نَجْتَمِعَ .

অনুবাদ : ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীলোককে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব সঙ্গত নয়। অবশ্য পরোক্ষ প্রস্তাবে কোনো দোষ নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ইদ্দত পালন অবস্থায় স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দান সম্পর্কে ইঙ্গিত করাতে কিংবা অন্তরে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের আলোচনা করবে, কিন্তু তাদের সাথে গোপন বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া-নেওয়া করবে না। তবে সুসঙ্গত কোনো কথা বলতে পার।' আয়াতে سِرًّا শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো বিবাহ। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইঙ্গিত করার অর্থ এ ধরনের কথা বলা যে, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা রাখি। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেছেন, সুসঙ্গত কথা এই যে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আমরা একত্র হতে চাই, [ইত্যাদি]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ الخ - ইদ্দতরত অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে :

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইদ্দত পালনকারী নারীকে ইদ্দতকালে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। দলিল : আল্লাহর বাণী– وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهٗ - "এবং নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।"

তবে পরোক্ষভাবে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যায়। দলিল আল্লাহর বাণী– وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ . (الاية) - "এবং স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে কিংবা অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোনো পাপ নেই।" কেননা, আয়াতে উল্লেখিত سِرًّا শব্দের ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বিবাহের কথা বলেছেন।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, تَعْرِيْض -এর অর্থ হলো, যেকোনোভাবে বিবাহের কথা জানানো। হযরত সাঈদ জুবায়ের (র.) قَوْل مَعْرُوْف -এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী। আমরা দুজন একত্রে মিলিত হতে চাই। মূলকথা ইশারা-ইঙ্গিতে সবকিছু বলবে, তবে স্পষ্ট বিবাহের কথা বলবে না।

وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْخُرُوْجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَ بَعْضَ اللَّيْلِ وَلَا تَبِيْتُ فِيْ غَيْرِ مَنْزِلِهَا اَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ قِيْلَ اَلْفَاحِشَةُ نَفْسُ الْخُرُوْجِ وَقِيْلَ اَلزِّنَاءُ وَيَخْرُجْنَ لِاِقَامَةِ الْحَدِّ وَاَمَّا الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِاَنَّهٗ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَيَحْتَاجُ اِلَى الْخُرُوْجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ وَقَدْ يَمْتَدُّ اِلٰى اَنْ يَهْجُمَ اللَّيْلُ وَلَا كَذٰلِكَ الْمُطَلَّقَةُ لِاَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتّٰى لَوْ اِخْتَلَعَتْ عَلٰى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا قِيْلَ اَنَّهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَقِيْلَ لَا تَخْرُجُ لِاَنَّهَا اَسْقَطَتْ حَقَّهَا فَلَا يَبْطُلُ بِهٖ حَقٌّ عَلَيْهَا .

অনুবাদ : তালাকে রাজ'ঈ এবং তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা নারীগণ রাত্রে কিংবা দিনে কখনো তাদের [ইদ্দতপালন] গৃহ থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই। আর যার স্বামী বিয়োগ ঘটেছে, তার পক্ষে দিনে এবং রাতের কিছু অংশে বের হওয়া জায়েজ আছে। তবে নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করবে না। তালাকপ্রাপ্তার সম্পর্কে উক্ত বিধানের প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। তবে যদি স্পষ্ট লজ্জাহীনতার কোনো কাজে লিপ্ত হয় [তাহলে অন্য কথা]।" কোনো কোনো মতে ঘর থেকে বের হওয়াই লজ্জাহীনতার কাজ। অন্য মতে, সেটা হচ্ছে জেনা। তবে তাদের উপর হদ্দ কায়েম করার প্রয়োজনে তাদের বের করা যাবে। বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বের হওয়ার অনুমতির কারণ এই যে, তার তো খরচ পাওনা নেই। সুতরাং জীবিকার সন্ধানে তাকে দিনে বের হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর কাজ দীর্ঘায়িত হয়ে রাত এসে যেতে পারে। তালাকপ্রাপ্তার বিষয়টি তেমন নয়। কেননা, তার খরচ স্বামীর সম্পদ থেকেই তার উপর ব্যবহৃত হবে। সুতরাং যদি ইদ্দতকালীন খরচের বিনিময়ে খোলা' করে তাহলে কারো কারো মতে, দিনে বের হতে পারবে, কারো মতে বের হতে পারবে না। কেননা, সে স্বেচ্ছায় নিজের হক বাতিল করেছে। সুতরাং সে কারণে তার উপর সাব্যস্ত হক বাতিল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الخ - ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ঘর থেকে বের হওয়া প্রসঙ্গে :

মাসআলা : তালাকে রাজ'ঈ কিংবা তালাকে বায়নপ্রাপ্তা নারী দিনে রাতে কখনো আপন গৃহ থেকে বের হতে পারবে না। তবে যদি বের হতে কখনো একান্ত বাধ্য হয়; যেমন- ঘর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা কিংবা ঘরের মালিক বের হতে বাধ্য করে কিংবা জানমালের আশঙ্কা থাকে তাহলে বের হওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই। তালাকপ্রাপ্তার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ হলো- وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের প্রভু এবং [তালাকপ্রাপ্তা] নারীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না। [কেননা, তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে স্বামীর উপর বাসস্থান দেওয়া ওয়াজিব] এবং তারা নিজেরাও বের হবে না। তবে যদি স্পষ্ট কোনো লজ্জাহীন কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।" যেমন- ব্যভিচারে লিপ্ত হলো কিংবা চুরি করল, তাহলে শাস্তির জন্য তাদেরকে ঘর থেকে বের করা যাবে। আর বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। তার দলিল হলো- বিধবার তো কোনো খরচ পাওনা নেই, তাই জীবিকার সন্ধানে তার বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর অনেক সময় জীবিকা নির্বাহের কাজ দীর্ঘ হয়ে রাত হয়ে যেতে পারে, তাই তার জন্য রাত্রের কিছু অংশ বাহিরে থাকার অনুমতি শরিয়ত প্রদান করেছে, কিন্তু তালাকপ্রাপ্তার বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তার ব্যয়ভার স্বামীর উপর ওয়াজিব। উল্লিখিত ইবারতের শেষে গ্রন্থকার (র.) বলেন, কোনো মহিলা যদি ইদ্দতকালীন নফকার বিনিময়ে খোলা' করে, তাহলে কোনো কোনো ফকীহ বলেন, তার জন্যও জীবিকার প্রয়োজনে দিনে বের হওয়ার অনুমতি থাকবে আবার কেউ অনুমতি দেননি। তাদের দলিল : মহিলা নিজেই যেহেতু তার অধিকার বঞ্চিত করেছে অতএব, শরিয়তের হক তার কারণে বাতিল হবে না, আর তা হলো বের না হওয়া।

وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِيْ يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنٰى حَالَ وُقُوْعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْتُ الَّذِيْ تَسْكُنُهُ وَلِهٰذَا لَوْ زَارَتْ أَهْلَهَا وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُوْدَ إِلٰى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّتِيْ قُتِلَ زَوْجُهَا أُسْكُنِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَجَلَهُ . وَإِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيْهَا فَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمْ إِنْتَقَلَتْ لِأَنَّ هٰذَا إِنْتِقَالٌ بِعُذْرٍ وَالْعِبَادَاتُ تُؤَثِّرُ فِيْهَا الْأَعْذَارُ وَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَتْ عَلٰى مَتَاعِهَا أَوْ خَافَتْ سُقُوْطَ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتْ فِيْهَا بِأَجْرٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيْهِ .

অনুবাদ : স্বামীর মৃত্যুর সময় এবং বিচ্ছেদ ঘটার সময় বসবাসের জন্য যে ঘর তার দিকে সম্পৃক্ত ছিল, সে ঘরে ইদ্দত পালন করা তার জন্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন, وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ "তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না।" আর তার দিকে সম্পৃক্ত ঘর সেটাই, যে ঘরে সে বসবাস করত। এ কারণেই যদি সে আপন পরিবার-পরিজনের কাছে বেড়াতে যায় আর তখন স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার কর্তব্য হলো বসবাসের ঘরে ফিরে আসা এবং সেখানে ইদ্দত পালন করা। স্বামী নিহত হয়েছিল এমন স্ত্রীলোককে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, 'ইদ্দতের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার গৃহেই বাস কর।' যদি মৃত স্বামীর বাড়িতে তার প্রাপ্য হিস্সা তার বসবাসের জন্য যথেষ্ট না হয়, আর অন্যান্য ওয়ারিশগণ তাকে তাদের হিস্সা থেকে বের করে দেয়, তাহলে স্থান পরিবর্তন করতে পারবে। কেননা, এ স্থান পরিবর্তন হচ্ছে ওজরের কারণে। আর ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে ওজর কার্যকরী হয়ে থাকে। এটা সেই অবস্থার মতো হলো, যখন স্ত্রীলোকটি নিজের সামানপত্র নষ্ট হওয়া কিংবা বাড়ি ধসে পড়ার আশঙ্কা করে, কিংবা ভাড়া বাড়িতে ছিল– এখন ভাড়া পরিশোধের সামর্থ্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الخ - **ইদ্দতকালীন অবস্থানের ঘর প্রসঙ্গে :** বিধবা স্ত্রী স্বামী মৃত্যুর সময় যে ঘরে অবস্থান করেছে, আর তালাকপ্রাপ্তা নারী বিচ্ছেদের সময় যে ঘরে অবস্থান করেছে সে ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ "নারীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না।" উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা ঘরকে নারীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, আর তাদের ঘর সেটাই, যেখানে তারা অবস্থান করছিল। অবস্থান মালিকানা সূত্রে কিংবা ভাড়া ও ধার করা সূত্রে যাই হোক না কেন– তাতে কোনো ব্যবধান নেই। এ কারণেই তো স্ত্রীলোক যদি আপন পরিবারের সাক্ষাতে যায়, আর এমন অবস্থায় স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার ঘরে ফিরে এসে সেখানে ইদ্দত পালন করা তার জন্য জরুরি– যেখানে সে আগে থাকত।

দ্বিতীয় দলিল : এক মহিলার স্বামী নিহত হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার বসবাসের ঘরেই অবস্থান করে ইদ্দত পালন কর– ইদ্দতের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। এতে বুঝা যায়, তার অবস্থানকৃত ঘরেই তার ইদ্দত পালন করা জরুরি।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ الخ : **মাসআলা :** বিধবা স্ত্রীলোকের তার স্বামী থেকে প্রাপ্ত অংশ যদি তার বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত না হয় এবং বাকি ওয়ারিশগণ তাদের অংশ মহিলাকে প্রদানে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সেটাকে মহিলার ওজর ধরা হবে। সুতরাং ওজরের জন্য বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অনুরূপ এখানেও তাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে।

ثُمَّ اِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ اَوْ ثَلٰثٍ لَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا بَأْسَ لِاَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْحُرْمَةِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فَاسِقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِيْنَئِذٍ تَخْرُجُ لِاَنَّهُ عُذْرٌ وَلَا تَخْرُجُ عَمَّا اِنْتَقَلَتْ اِلَيْهِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَخْرُجَ هُوَ وَيَتْرُكَهَا . وَاِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا اِمْرَأَةً ثِقَةً تَقْدِرُ عَلَى الْحَيْلُوْلَةِ فَحَسَنٌ وَاِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخْرُجْ وَالْاَوْلٰى خُرُوْجُهُ وَاِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا اِلٰى مَكَّةَ فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فِىْ غَيْرِ مِصْرٍ فَاِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ رَجَعَتْ اِلٰى مِصْرِهَا لِاَنَّهُ لَيْسَ بِابْتِدَاءِ الْخُرُوْجِ مَعْنًى بَلْ هُوَ بِنَاءٌ .

অনুবাদ : আর যদি তালাকে বায়েন কিংবা তিন তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে উভয়ের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। অতঃপর [এক ঘরে বসবাস করায়] কোনো দোষ নেই। কেননা, স্বামী তো স্বীকার করে যে, এই স্ত্রী তার জন্য হারাম। তবে যদি লোকটি ফাসেক হয় এবং তার পক্ষ থেকে স্ত্রীলোকটির প্রতি আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে অন্যত্র চলে যাবে। অবশ্য সর্বোত্তম হলো, স্ত্রীকে থাকতে দিয়ে স্বামী নিজে বের হয়ে যাওয়া। আর উভয়ে যদি নিজেদের মাঝে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য স্ত্রীলোককে এনে রাখে, যে উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হওয়ার সামর্থ্য রাখে, তবে তা উত্তম। আর যদি বাড়ির পরিসর উভয়ের জন্য অকুলান হয়, তাহলে স্ত্রী অন্যত্র চলে যাবে। অবশ্য স্বামীর চলে যাওয়াই উত্তম। আর যদি এমন হয় যে, স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে মক্কার পথে বের হয়, আর সে তাকে নগরের বাইরে কোনো স্থানে তিন তালাক দিল কিংবা মৃত্যুবরণ করল, এ অবস্থায় যদি তার ও তার বসবাসের শহরের মাঝে তিন দিনের কম দূরত্ব হয়, তাহলে নিজের শহরে ফিরে আসবে। কেননা, এটা মূলত নতুন বের হওয়া নয়; বরং পরবর্তী বের হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ الخ - ইদ্দতকালে স্বামী-স্ত্রীর পর্দার বিধান : মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি তিন তালাক কিংবা বায়েন তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে ইদ্দতকালে স্ত্রী ও স্বামীর মাঝে পর্দা করা একান্ত জরুরি। পর্দার বিধান ঠিক রাখার পর এক ঘরে বসবাস করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এ সুরতে সে হুরমতকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তার পক্ষে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা সম্ভব। পক্ষান্তরে স্বামী যদি ফাসেক হয় যে, হারাম থেকে বাঁচার সম্ভাবনা কম; সে ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির অন্যত্র চলে যাওয়াই ভালো। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঘর যদি সংকীর্ণ হয়, তাহলে ইদ্দতকালীন সময়ে পুরুষ লোক মহিলাকে ঘরে রেখে সে নিজে বের হয়ে যাওয়া উত্তম। কেননা, স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন জরুরি।

قَوْلُهُ وَاِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا اِمْرَأَةً ثِقَةً الخ : উক্ত ইবারতের প্রথম মাসআলাটি স্পষ্ট। দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো, স্বামী-স্ত্রীর সফর অবস্থায় তালাক কিংবা মৃত্যুবরণ সম্পর্কে। মাসআলা : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি কোনো দূর এলাকায় সফর করে, আর নগরের বাইরে স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে, অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখা আবশ্যক যে, ঘটনাস্থল থেকে স্বামীর বাড়ির দূরত্ব তিনের কম কিনা? যদি কম হয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর বাড়িতে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। আর এ বের হওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা, এটাকে তো নতুন বের হওয়া বলা যায় না।

وَاِنْ كَانَتْ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ تْ رَجَعَتْ وَاِنْ شَاءَ تْ مَضَتْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا وَلِيٌّ
اَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ اِذَا كَانَ اِلَى الْمَقْصَدِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَيْضًا لِاَنَّ الْمَكْثَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ
اَخْوَفُ عَلَيْهَا مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَّا اَنَّ الرُّجُوْعَ اَوْلٰى لِيَكُوْنَ الْاِعْتِدَادُ فِىْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ .
قَالَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ طَلَّقَهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِىْ مِصْرٍ فَاِنَّهَا لَا تَخْرُجُ حَتّٰى تَعْتَدَّ
ثُمَّ تَخْرُجُ اِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح)
وَمُحَمَّدٌ (رح) اِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ قَبْلَ اَنْ تَعْتَدَّ لَهُمَا
اَنَّ نَفْسَ الْخُرُوْجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِاَذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحْشَةِ الْوَحْدَةِ وَهٰذَا عُذْرٌ وَاِنَّمَا الْحُرْمَةُ
لِلسَّفَرِ وَقَدْ اِرْتَفَعَتْ بِالْمَحْرَمِ وَلَهٗ اَنَّ الْعِدَّةَ اَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوْجِ مِنْ عَدَمِ الْمَحْرَمِ فَاِنَّ
لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلٰى مَا دُوْنَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ ذٰلِكَ فَلَمَّا حَرُمَ
عَلَيْهَا الْخُرُوْجُ اِلَى السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فَفِى الْعِدَّةِ اَوْلٰى .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে তিনদিনের দূরত্ব হলে নিজের শহরে ফিরেও আসতে পারে, আবার গন্তব্যস্থলের দিকেও যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে– তার সাথে কোনো অভিভাবক থাকুক কিংবা না থাকুক। অর্থাৎ, গন্তব্যস্থল যদি তিনদিনের দূরত্বে হয়। কেননা, উক্ত স্থানে থাকা তার জন্য বের হওয়ার চেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক। তবে শহরে ফিরে আসাই উত্তম, যাতে স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তবে যদি কোনো নগরীতে অবস্থানকালে স্বামী তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মারা যায় [এবং তার সাথে কোনো মাহরাম থাকে] তাহলে ঐ নগরীতে ইদ্দত শেষ না করে বের হবে না; ইদ্দতের পর বের হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি তার সাথে কোনো মাহরাম থাকে, তাহলে ইদ্দতের পূর্বে উক্ত শহর থেকে বের হওয়ায় কোনো দোষ নেই। সাহেবাইনের দলিল এই যে, নগর ত্যাগের বিষয়টি মূলত বৈধ, যাতে নিঃসঙ্গতা ও প্রবাসের কষ্ট দূর হয়। আর এটা ওজর হিসেবে গণ্য। আর নিষেধাজ্ঞা ছিল সফরের কারণে। আর তা মাহরামের উপস্থিতির কারণে বিদূরিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মাহরামের অনুপস্থিতির চেয়ে ইদ্দতের বিষয়টি বুঝানোর ব্যাপারে নিষিদ্ধতা অধিক গুরুতর। কেননা, সাধারণ স্ত্রীলোক সফরের কম দূরত্বে মাহরাম ছাড়া বের হতে পারে, কিন্তু ইদ্দতরত স্ত্রীলোক তা পারে না। সুতরাং মাহরাম ছাড়া সফরে বের হওয়া যদি তার হারাম হয়ে থাকে, তাহলে ইদ্দত অবস্থায় হারাম হওয়া তো আরো স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ الخ : মাসআলা : ঘটনাস্থল থেকে স্বামীর বাড়ির দূরত্ব যদি তিনদিন হয় এবং সফরের লক্ষ্যস্থলও তিনদিনের দূরত্বে হয়, তখন স্ত্রীলোকটির এখতিয়ার আছে– সে ইচ্ছা করলে তার ভ্রমণ গন্তব্যের সফর অব্যাহত রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসতে পারে। তবে স্বামীর বাড়িতে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করাই উত্তম।

قَوْلُهُ قَالَ اَنْ يَكُوْنَ طَلَّقَهَا اَوْ مَاتَ الخ - বিচ্ছেদ ও তালাক নগরীতে হলে তার বিধান : মাসআলা : পূর্বের আলোচনা থেকে ব্যতিক্রম করে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সফররত অবস্থায় যদি কোনো শহরে অবস্থানকালে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যে স্ত্রীলোকটি ঐ শহরেই অবস্থান করবে এবং ইদ্দত পালন করবে– ইদ্দত শেষ করে বের হবে– যদি তার সঙ্গে কোনো মাহরাম লোক থাকে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি তার সঙ্গে মাহরাম থাকে, তাহলে ইদ্দত পূর্ণ করার পূর্বে সে উক্ত শহর ত্যাগ করতে পারবে। তাদের দলিল হলো, প্রবাসের কষ্ট ও একাকীত্বের অস্থিরতা দূর করার জন্যই মূলত সফর বৈধ করা হয়েছে। তাইতো সফরের কম দূরত্বে বের হওয়ার অনুমতি সকলের মতেই রয়েছে। সুতরাং এ কষ্টকে ওজর হিসেবে গণ্য করা হবে। আর ওজরের কারণে সকলের নিকট বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং তার জন্য বের হওয়ার অনুমতি থাকবে। আর সফরের বেশি দূরত্বে যাওয়ার বিষয়টি মাহরামের কারণে বৈধ হয়েছে। কেননা, নিষেধাজ্ঞা সফরের কারণে ছিল। আর মাহরাম দ্বারা তা দূর হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই মর্মে যে, মাহরাম ছাড়া সফর করার নিষেধাজ্ঞা যেমন শরিয়তে রয়েছে, তেমনি ইদ্দতের মাঝে সফরের নিষেধাজ্ঞা আরো গুরুতর। কেননা, সফরের কম দূরত্বে মহিলা মাহরাম ছাড়াই বের হতে পারে, কিন্তু ইদ্দতরত অবস্থায় বের হওয়ার অনুমতি নেই। সুতরাং সফরের দূরত্বে মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া যেমন বের হওয়া হারাম অনুরূপভাবে ইদ্দতকালে বের হওয়া হারাম হওয়াই স্বাভাবিক বিষয়।

بَابُ ثُبُوْتِ النَّسَبِ

وَمَنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ اِبْنُهُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ أَمَّا النَّسَبُ فَلِأَنَّهَا فِرَاشُهُ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْعُلُوْقُ قَبْلَهُ فِيْ حَالَةِ النِّكَاحِ وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْزَالُ النِّكَاحَ وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ فِيْ إِثْبَاتِهِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكْمًا فَتَأَكَّدَ الْمَهْرُ بِهِ۔

পরিচ্ছেদ : নসব প্রমাণ প্রসঙ্গে

অনুবাদ : কেউ যদি বলে, অমুক স্ত্রীলোকটিকে যদি আমি বিবাহ করি তাহলে সে তালাক। অতঃপর সে তাকে বিবাহ করল এবং বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের মাথায় স্ত্রীলোকটি একটি সন্তান প্রসব করল, তাহলে এ সন্তান ঐ পুরুষের হবে এবং তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। নসব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে তার শয্যা-[সঙ্গিনী]। কেননা, বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করার অর্থ হলো, তালাকের মুহূর্ত থেকে ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব করা। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, তালাকের পূর্বে বিবাহ অবস্থায় গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আর এটায় সম্ভাব্যতা [সঙ্গম ও তাতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাব্যতা] এভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, স্ত্রীলোকটির সাথে মিলনরত অবস্থায় [পর্দার আড়ালে সাক্ষীর উপস্থিতিতে] তাকে বিবাহ করল এবং বিবাহ ও বীর্যস্খলন একই সময়ে হলো। আর [বিষয়টি কষ্ট কল্পিত হলেও] নসব প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই বিধেয়। আর মহর ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, ঐ স্বামীর সাথে যখন নসব সাব্যস্ত হলো, তখন হুকমান [শরয়ী আইনত] তাকে সহবাসকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এর [সহবাস] দ্বারা মহর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের পরিচ্ছেদের সাথে এ পরিচ্ছেদের সম্পর্ক : পূর্বের পরিচ্ছেদটি ছিল بَابُ الْعِدَّةِ আর তাতে حَامِلَة এবং ইদ্দতের আলোচনা এসেছে, সুতরাং এ পরিচ্ছেদে حَمْل -এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ثُبُوْتِ نَسَبْ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً الخ : সুরতে মাসআলা এই যে, নোমান সালমাকে লক্ষ্য করে বলল, যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তুমি তালাক, অতঃপর নোমান সালমাকে বিয়ে করল। এবং বিয়ের সময় থেকে ছয় মাসের মাথায় সালমার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। এখন এ সন্তানের নসব নোমানের সাথে সাব্যস্ত হবে এবং সালমা পূর্ণ মহরের অধিকারী হবে। আর যদি ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে অথবা পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে নোমানের সাথে এ নসব সাব্যস্ত হবে না এবং

তার উপর পূর্ণ মহরও ওয়াজিব হবে না। কেননা, গর্ভপাতের সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস। তাই ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরের সুরতে গর্ভসঞ্চার তালাক পতিত হওয়ার পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর পূর্বের সুরতে নিশ্চিত বিবাহের পূর্বে হয়েছে বিধায় এ সন্তানের নসব নোমানের সাথে সাব্যস্ত হবে না এবং সঙ্গমের পূর্বে তালাক পতিত হয়েছে বিধায় পূর্ণ মহরও তার উপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু বিবাহের সময় থেকে নিয়ে ছয় মাসের মাথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুরতে গর্ভসঞ্চার বিবাহের পরে ও তালাকের পূর্বে হওয়া সম্ভব। তা এভাবে যে, বিবাহের সময় থেকে নিয়ে ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করার অর্থই হলো তালাকের সময় থেকে ছয় মাসের কমে বাচ্চা হয়েছে। সুতরাং গর্ভসঞ্চার তালাকের পূর্বে বিবাহ অবস্থিত থাকা অবস্থায় হয়েছে বিধায় সন্তানের নসব নোমানের সাথে সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন : নসব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শুধু فِرَاشْ [বৈধ স্ত্রী] হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং إِمْكَانْ دُخُوْلْ [মিলনের সম্ভাবনা] আবশ্যক এবং এজন্যই নাবালকের সাথে তার স্ত্রীর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয় না, অথচ তার স্ত্রী তার জন্য فِرَاشْ [বৈধ স্ত্রী]। আর বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পর পর তালাক পতিত হতে যে সামান্য সময় লাগে তাতে তো إِمْكَانْ دُخُوْلْ [মিলনের সম্ভাবনা] সাব্যস্ত হতে পারে না?

উত্তর : এমতাবস্থায়ও إِمْكَانْ دُخُوْلْ [মিলনের সম্ভাবনা] সাব্যস্ত রয়েছে। তা এভাবে যে, স্বামী-স্ত্রী [নাজায়েজ] মিলনরত অবস্থায় পরস্পর ইজাব ও কবুল করল এবং এ ইজাব-কবুলের সময়ই বীর্যস্খলন হলো ও তাতে গর্ভসঞ্চার হলো। আর পর্দার আড়াল থেকে সাক্ষীদ্বয় তাদের ইজাব ও কবুল শুনছিল। অথবা স্বামী-স্ত্রী মিলনরত অবস্থায় তাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত উকিলদ্বয় সাক্ষীদের সামনে বিবাহের ইজাব-কবুল করল এবং তখনই বীর্যস্খলন হলো ও গর্ভগঞ্চার হলো। সুতরাং মিলনের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হলো।

আর নসব সাব্যস্ত করাই সতর্কতা। তাই উল্লিখিত সুরতগুলো কষ্ট ও কল্পিত হলেও নসব সাব্যস্ত করাই বিধেয়। সুতরাং সালমার ভূমিষ্ঠ হওয়া উক্ত সন্তানের নসব নোমানের সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যখন নসব সাব্যস্ত হলো তখন حُكْمًا [আইনত] যেন সালমার সাথে নোমানের মিলন হলো তাই নোমানের সালমাকে পূর্ণ মহর দিতে হবে।

قَالَ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوْقِ فِيْ حَالَةِ الْعِدَّةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا تَكُوْنُ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُوْدِ الْعُلُوْقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوْقَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا بِالشَّكِّ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ كَانَتْ رَجْعَةً لِأَنَّ الْعُلُوْقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَاءِ مِنْهَا فَيَصِيْرُ بِالْوَطْيِ مُرَاجِعًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি দুই বছর বা তদূর্ধ্ব সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, যতক্ষণ না স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়। কেননা, ইদ্দতের সময় [সহবাস বৈধ হওয়ার কারণে] গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে, যেহেতু মহিলা প্রলম্বিত তুহরের অধিকারী হওয়াও জায়েজ। আর যদি [তালাকের সময় থেকে] দুই বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে [প্রসব দ্বারা] ইদ্দত শেষ হওয়ার কারণে সে স্বামী থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, বিবাহের অবস্থায় কিংবা ইদ্দতের সময় গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তবে এর দ্বারা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ গর্ভসঞ্চার তালাকের পূর্বে এবং পরে দুটোই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে রাজ'আতকারী সাব্যস্ত হবে না। আর যদি দুই বছরের বেশি সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে এটা দ্বারা রাজ'আত সাব্যস্ত হবে। কেননা, এখানে গর্ভসঞ্চার তালাকের পরে হয়েছে, আর স্ত্রীর প্রতি জেনার অভিযোগ না থাকার কারণে দৃশ্যত স্বামী দ্বারাই গর্ভসঞ্চার হয়েছে। সুতরাং সহবাস দ্বারা স্বামী রাজ'আতকারী সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ الخ : সূরতে মাসআলা এই যে, লোকমান তার স্ত্রী সালেহাকে রাজ'ঈ তালাক দিল। সালেহা ইদ্দতরত আছে– এখনও সে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়নি এ অবস্থায় দুই বছর বা তদূর্ধ্ব সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সালেহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, এখন এ সন্তানের নসব লোকমানের সাথে সাব্যস্ত হবে এবং তার সালেহাকে ফিরিয়ে নেওয়াও প্রমাণিত হবে।

দলিল : তুহর প্রলম্বিত হওয়ার যেহেতু কোনো চূড়ান্ত সময়সীমা নেই, তাই হতে পারে– সালেহার ইদ্দতের সময়কালের তুহরগুলোও দীর্ঘ ছিল যদ্দরুন তার ইদ্দত দীর্ঘ হয়েছে এবং এ সময় স্বামীর সাথে মিল হয়ে গর্ভসঞ্চার হয়েছে – যেহেতু তালাকে রাজ'ঈর ইদ্দতের মাঝে স্বামীর সহবাস বৈধ। তাই এ সন্তানের নসব লোকমানের সাথে সাব্যস্ত হবে এবং সালেহাকে ফিরিয়ে নেওয়াও প্রমাণিত হবে। এমন কি সালেহা ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া ছাড়া বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি তার সন্তান হয়, তাহলেও এ সন্তানের নসব লোকমানের সাথে সাব্যস্ত হবে এবং রাজ'আতও প্রমাণিত হবে। কেননা, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো দুই বছর। তাই তালাকের সময় হতে দুই বছর পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে নিঃসন্দেহে তার গর্ভসঞ্চার তালাকের পর হয়েছে। অন্যদিকে মহিলা যেহেতু জেনার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়, তাই দৃশ্যতই তার গর্ভসঞ্চার স্বামীর মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং সন্তানের নসব লোকমানের সাথে প্রমাণিত হবে এবং সালেহাকে ফিরিয়ে নেওয়াও সাব্যস্ত হবে।

আর যদি তালাকের সময় থেকে নিয়ে দুই বছরের কমে সালেহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে বটে, কিন্তু রাজ'আত প্রমাণিত হবে না; বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার কারণে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। কেননা, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো ছয় মাস, তাই উক্ত সুরতে মিলন ও গর্ভসঞ্চার তালাকের পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই নসব সাব্যস্ত হতে কোনো বাধা নেই। সুতরাং লোকমানের সাথে উক্ত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, কিন্তু রাজ'আত প্রমাণিত হবে না। কেননা, মিলন ও গর্ভসঞ্চার যেমনিভাবে তালাকের পর ইদ্দতরত অবস্থায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে তেমনি তালাকের পূর্বে বিবাহ অবস্থায় হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, বিধায় রাজ'আত প্রমাণিত হওয়া ও না হওয়ার মাঝে সন্দেহ এসে পড়ল। আর সন্দেহের দ্বারা রাজ'আত প্রমাণিত হয় না। সুতরাং লোকমানের রাজ'আত করা প্রমাণিত হবে না; বরং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা সালেহার ইদ্দত শেষ হয়ে লোকমান থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা হয়ে যাবে।

আর যদি সালেহা ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়– তার হুকুম সামনের মতনে আলোচিত হবে।

وَالْمَبْتُوْتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ فَلَا يُتَيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعُلُوْقِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ اِحْتِيَاطًا وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ لِأَنَّ وَطْيَهَا حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ لِأَنَّهُ اِلْتَزَمَهُ وَلَهُ وَجْهٌ بِأَنْ وَطِيَهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ.

অনুবাদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি দুই বছরের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, তালাকের সময় সন্তান বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং গর্ভসঞ্চারের পূর্বে শয্যাবৈধতা বিলুপ্ত হওয়া নিশ্চিত নয়। সুতরাং সতর্কতা হিসেবে নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি বিচ্ছেদের সময় থেকে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তাহলে নসব সাবেত হবে না। কেননা, এখানে গর্ভসঞ্চার তালাকের পরে হয়েছে [বলেই স্পষ্ট]। সুতরাং এ গর্ভ স্বামী দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তার সাথে সহবাস করা তো হারাম। কিন্তু যদি তা স্বামী দাবি করে, তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে নিজে নসবের দায় গ্রহণ করেছে এবং তার গ্রহণযোগ্য কারণও রয়েছে– এভাবে যে, ইদ্দতের সময়কালে সন্দেহবশত ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[পূর্বে রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানের নসব সাবেত হওয়া আলোচিত হয়েছে, এখন মুসান্নিফ (র.) বায়েন ও তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানের নসব সাবেত হওয়া নিয়ে আলোচনা করছেন–]

قَوْلُهُ وَالْمَبْتُوْتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا الخ : মাসআলা : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা বা তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তালাকের সময় হতে নিয়ে দু'বছরের কম সময়কালে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার সন্তানের নসব স্বামী থেকে সাবেত হবে। **দলিল:** কেননা, সন্তান গর্ভে থাকার সর্বোচ্চ সময়কাল হলো দু'বছর। তাই উল্লিখিত সুরতে তালাকের পূর্বে গর্ভসঞ্চার হওয়া এবং তালাকের সময় সন্তান বিদ্যমান থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে তালাকের পর গর্ভসঞ্চার হওয়া নিশ্চিত নয়, তাই গর্ভসঞ্চারের পূর্বে স্ত্রী স্বামীর জন্য বৈধ শয্যা হওয়া বিলুপ্ত হওয়াও নিশ্চিত নয়। সুতরাং সতর্কতা হিসেবে বায়েন ও তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর এ সন্তানের নসব তার স্বামী থেকে সাবেত হবে। [মাসআলা] আর যদি তালাকের সময় হতে নিয়ে দু'বছর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে যেহেতু তালাকের পর গর্ভসঞ্চার হওয়া নিশ্চিত। কেননা, গর্ভ দু'বছরের বেশি বিলম্বিত হয় না। অন্যদিকে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে স্বামীর মিলন বৈধ নয়। সুতরাং এ সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি স্বামী এ সন্তানের নসবের দাবি করে যে, এ সন্তান আমার ঔরসের, তাহলে স্বামী থেকে তার নসব সাবেত হবে, যদিও দুই বছরের পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কেননা, সে নিজে সন্তানের নসবের দায়ভার গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এর গ্রহণযোগ্য সুরতও রয়েছে যে, সে ইদ্দতের সময়কালে সন্দেহবশত তার সাথে সহবাস করে ফেলেছে। সুতরাং এ সন্তানের নসবের দাবি করলে তার থেকে নসব সাবেত হবে; অন্যথায় সাবেত হবে না।

فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوْتَةُ صَغِيْرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتّٰى تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلٰى سَنَتَيْنِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا وَلَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأَشْبَهَتِ الْكَبِيْرَةَ وَلَهُمَا أَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةً مُعَيَّنَةً وَهُوَ الْأَشْهُرُ فَمُضِيُّهَا يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِالْإِنْقِضَاءِ وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَارِهَا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ وَالْإِقْرَارُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَكَذٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَثْبُتُ إِلٰى سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ شَهْرًا لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِيًا فِيْ أٰخِرِ الْعِدَّةِ وَهِيَ الثَّلٰثَةُ الْأَشْهُرُ ثُمَّ تَأْتِيْ بِهِ لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهُوَ سَنَتَانِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فِي الْعِدَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَفِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ بِإِقْرَارِهَا يُحْكَمُ بِبُلُوْغِهَا.

অনুবাদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি সহবাস সম্ভব অল্পবয়স্কা হয় আর সে [তালাকের সময় থেকে] নয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার নসব সাব্যস্ত হবে না। তবে নয় মাসের কম সময়ে হলে সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, [তালাকের সময় থেকে] দুই বছরের ভিতরে প্রসব হলে [সন্তানের পিতৃ-পরিচয় স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে এমন ইদ্দতওয়ালী, যার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকারও করেনি। সুতরাং সে বয়স্কা স্ত্রীর সদৃশ হলো। তরফাইনের দলিল এই যে, [অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে] তার ইদ্দত শেষ হওয়ার একটি দিক নির্ধারিত রয়েছে আর তা হলো [তিন] মাস গণনা। সুতরাং ঐ [তিন] মাসগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শরিয়ত তার ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দেবে। আর প্রমাণের ক্ষেত্রে শরিয়তের সিদ্ধান্ত তার স্বীকারোক্তির চেয়ে অধিকতর প্রবল। কেননা, শরিয়তের হুকুম বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, পক্ষান্তরে [স্ত্রীলোকের] স্বীকারোক্তি এর সম্ভাবনা রাখে। এ অল্পবয়স্কা যদি রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলেও তরফাইনের নিকট একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে [তালাকের সময় থেকে] সাতাশ মাস পর্যন্ত প্রসব হলে নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, তাকে ইদ্দতের শেষ প্রান্তে– আর তা হলো তিন মাস সহবাসকারী ধরা হবে। অতঃপর এই মেয়ে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদে অর্থাৎ দুই বছরে সন্তান প্রসব করল। আর যদি এ অল্পবয়স্কা ইদ্দতের সময়ে গর্ভবতী হওয়ার দাবি করে, তাহলে তার ও বয়স্কা স্ত্রীর ক্ষেত্রে অভিন্ন হুকুম হবে। কেননা, তার স্বীকারোক্তির কারণে তার প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوْتَةُ صَغِيْرَةً الخ : **মাসআলা :** সহবাসযোগ্য নাবালেগা তথা মুরাহিকা [বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী] স্ত্রী যদি বায়েন তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হওয়ার সময়সীমা নিয়ে হানাফী ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* তরফাইনের মতে, তালাকের সময় হতে নয় মাসের কমে সন্তান প্রসব হলে সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে, আর নয় মাসে প্রসব হলে তার নসব স্বামীর সাথে সাবেত হবে না।

* ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তালাকের সময় থেকে নিয়ে দুই বছরের ভিতরে সন্তান প্রসব হলে তার পিতৃ-পরিচয় স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : আমাদের আলোচিত স্ত্রী যেহেতু مُرَاهِقَةٌ مَدْخُوْلٌ بِهَا [বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী সহবাসকৃতা] আর مُرَاهِقَةٌ مَدْخُوْلٌ بِهَا -এর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণাও দেয়নি সুতরাং সে প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর মতোই তালাকের পূর্বে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তালাকের পর গর্ভসঞ্চার হওয়ার নিশ্চিত কোনো দলিল শুনেই যেহেতু সে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়নি, সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর ন্যায় তার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় ও তার স্বামীর সাথে সতর্কতা হিসেবে দুই বছর পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে।

তরফাইনের দলিল ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব : আল্লাহ তা'আলার বাণী অর্থাৎ, যে সকল মহিলার ঋতুস্রাব হয় না তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস– আর مُرَاهِقَةٌ [বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী] মহিলারও ঋতুস্রাব হয় না, তাই তার ইদ্দত শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত [তিন মাস]। সুতরাং মহিলা কর্তৃক ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা না হলেও তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শরিয়ত তার ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। আর মহিলা কর্তৃক ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণার তুলনায় শরিয়ত কর্তৃক ইদ্দত শেষ হওয়া বেশি কার্যকরী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা, মহিলার ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি বিপরীত হতে পারে; যেমন– তার স্বীকারোক্তির ছয় মাসের কমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার স্বীকারোক্তি কার্যকারী নয়; বরং তার বিপরীত হুকুম দেওয়া হয়। সুতরাং মহিলা ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা না দিলেও তার ইদ্দত তালাকের সময় হতে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারপর থেকে ছয় মাসের ভিতরে বা কমে আর তালাকের পর থেকে নয় মাসের কমে সন্তান হলে তার পিতৃ-পরিচয় স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে, আর নয় মাস পূর্ণ হয়ে ভূমিষ্ঠ হলে তার নসব স্বামীর সাথে সাবেত হবে না। আর যদি বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী স্ত্রী রাজ'ঈ তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তাহলেও তরফাইনের মতে, নয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করলে নসব সাব্যস্ত হবে, আর নয় মাসে বা তদূর্ধ্ব সময়ে প্রসব করলে তার নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না।

* ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, সাতাশ মাস পর্যন্ত সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, যেহেতু রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস বৈধ, তাই ইদ্দত [তিন মাস] -এর শেষ পর্যন্ত সহবাসের সুযোগ আছে এবং গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা দুই বছর তথা চব্বিশ মাস। সুতরাং ইদ্দতের তিন মাস ও গর্ভধারণের চব্বিশ মাস, মোট সাতাশ মাস পর্যন্ত সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাবেত হবে। সাতাশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না।

مُرَاهِقَةٌ তথা বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী স্ত্রী যদি ইদ্দতরত অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ার দাবি করে; তাহলে সে তার এ দাবির কারণে বালেগ বলে গণ্য হবে। কেননা, সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং তখন তার ও বালেগার হুকুম অভিন্ন– যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে দুই বছর পর্যন্ত নসব সাবেত হবে। আর রাজ'ঈ তালাকের ক্ষেত্রে সাতাশ মাস পর্যন্ত সন্তানের নসব প্রমাণিত হবে; এর পরে স্বামীর সাথে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না।

وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ السَّنَتَيْنِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) إِذَا جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِاَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشُّهُوْرِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اَقَرَّتْ بِالْاِنْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَّا فِي الصَّغِيْرَةِ إِلَّا اَنَّا نَقُوْلُ لِاِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ اُخْرٰى وَهُوَ وَضْعُ الْحَمْلِ بِخِلَافِ الصَّغِيْرَةِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْهَا عَدَمُ الْحَمْلِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَفِيْهِ شَكٌّ .

وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ لِاَنَّهُ ظَهَرَ كِذْبُهَا بِيَقِيْنٍ فَبَطَلَ الْاِقْرَارُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ لِاَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِ الْاِقْرَارِ لِاِحْتِمَالِ الْحُدُوْثِ بَعْدَهُ وَهٰذَا اللَّفْظُ بِاِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ .

অনুবাদ : যে স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ হয়েছে, সে যদি মৃত্যুর সময় থেকে দু'বছরের ভিতরে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার নসব সাবেত হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, মৃত্যুর ইদ্দত [চার মাস দশদিন] শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের মাথায় যদি সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার নসব সাবেত হবে না। কেননা, তার ইদ্দত [শেষ হওয়া] -এর দিক নির্ধারিত থাকার কারণে শরিয়ত মাস দ্বারা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সুতরাং সে নিজে ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি করার মতোই হলো; যেমন– অল্পবয়স্কা স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমরা বর্ণনা করেছি। তবে আমরা বলব, তার ইদ্দত শেষ হওয়ার জন্য অন্য একটি দিকও রয়েছে; আর তা হলো গর্ভপ্রসব। পক্ষান্তরে অল্পবয়স্কার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার ক্ষেত্রে গর্ভ না থাকাই আসল, যেহেতু বালেগা হওয়ার পূর্বে সে গর্ভসঞ্চারের পাত্রী নয়। আর বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। আর যদি ইদ্দতওয়ালী মহিলা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি করে অতঃপর ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানের নসব সাবেত হবে। কেননা, সুনিশ্চিতভাবে তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ছয় মাসের পর প্রসব করে, তাহলে নসব সাবেত হবে না। কেননা, তার স্বীকারোক্তির অসারতা আমাদের নিকট নিশ্চিত নয়। কারণ, ইদ্দতের পরে, গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ শব্দটি [مُعْتَدَّةٌ - ইদ্দতওয়ালী] ব্যাপক হওয়ার কারণে যে-কোনো ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا الخ : মাসআলা : যে স্ত্রীর স্বামী ইন্তেকাল করেছে, সে যদি مُرَاهِقَة [বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী] হয়, তাহলে তার সন্তানের নসব মৃত স্বামী থেকে সাবেত হতে হলে, তরফাইনের মতে, ইদ্দত তথা চার মাস দশদিন শেষ হওয়ার পরে ছয় মাসের কমে মোট দশ মাস দশদিনের কমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে হবে। এরপর ভূমিষ্ঠ হলে তার নসব মৃত ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে দুই বছরের কমে ভূমিষ্ঠ হলে তার নসব মৃত ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় হবে না। উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মুরাহিকার আলোচনায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মাসআলা : যে স্ত্রীর স্বামী ইন্তেকাল করেছে সে যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয়, মুরাহিকা না হয়, তাহলে তার সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে– যদি মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে দুই বছরের কমে ভূমিষ্ঠ হয়।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মৃত্যুর ইদ্দত তথা চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ছয় মাসের ভিতরে মৃত্যুর সময় হতে মোট দশ মাস দশদিনের ভিতরে জন্মলাভ করলে শিশুর পিতৃ-পরিচয় মৃত ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল : ইমাম যুফার (র.) বলেন, স্বামীর মৃত্যুর সময় যেহেতু তার হামল [গর্ভ] প্রকাশ পায়নি, তাই অল্পবয়স্কার ন্যায়ই তার ইদ্দত পালনের পন্থা নির্ধারিত তথা চার মাস দশদিন। তাই চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে [মহিলা নিজে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার মতোই] শরিয়ত তার ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের কমে বাচ্চা প্রসব হলে যেহেতু এর গর্ভসঞ্চার নিশ্চিত ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হয়েছে, তাই এর নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যেহেতু এর গর্ভসঞ্চার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হওয়া নিশ্চিত নয়; বরং ইদ্দত শেষ হয়ে মহিলা স্বামীর জন্য ফেরাশে সহীহ হওয়া দূরীভূত হওয়ার পর গর্ভসঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই এর নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল খণ্ডন : ইমাম যুফার (র.) দলিল হিসেবে বলেছেন যে, অল্পবয়স্কার মতো যে স্ত্রীর স্বামী ইন্তেকাল করেছে, তার ইদ্দত পালনের দিকও নির্ধারিত। আমরা তার উত্তরে বলি যে, স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালনের দিক অল্পবয়স্কা স্ত্রীর ইদ্দতের দিকের মতো নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ শুধু চার মাস দশদিনই নয়; বরং তার ইদ্দত পালনের আরেকটি দিকও আছে তা হলো গর্ভ খালাশ অর্থাৎ, মৃত্যুবরণকারী স্বামীর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ খালাশ হওয়া। পক্ষান্তরে অল্পবয়স্কা নারী বালেগা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভবতী হওয়া অসম্ভব। আর তার বালেগা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত, আর নাবালেগা হওয়াটা পূর্ব থেকে সাব্যস্ত বিষয়। তাই সন্দেহের দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় দূরীভূত হবে না বিধায় অল্পবয়স্কার স্ত্রী গর্ভবতী না হওয়াই আসল ও মূল। সুতরাং মাস দ্বারা ইদ্দত পালন তার জন্য নির্ধারিত; বালেগার জন্য নয়। সুতরাং স্বামী মৃত্যুবরণকারী স্ত্রীকে অল্পবয়স্কার সাথে কিয়াস করা, قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ [অসঙ্গতিপূর্ণ কিয়াস] যা বর্জনীয়। সুতরাং মৃত স্বামী স্ত্রীর যেহেতু গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে [যদিও গর্ভ প্রকাশিত না হয়] ও মাস দ্বারা ইদ্দত পালন তার জন্য একমাত্র মাধ্যম নয়, তাই তার ইদ্দত চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে শরিয়ত তা শেষ হওয়ার হুকুম দেয়নি।

قَوْلُهُ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ الخ : সুরতে মাসআলা এই যে, কোনো ইদ্দতওয়ালী মহিলা এই দাবি করল যে, আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে। অতঃপর তার এ স্বীকারোক্তির সময় থেকে নিয়ে ছয় মাসের কমে তার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো– এখন তার এ সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

দলিল : কেননা, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি থেকে নিয়ে ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে নিশ্চিত যে, স্বীকারোক্তির সময় মহিলা গর্ভবতী ইদ্দতওয়ালী ছিল। আর গর্ভবতীর ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস। সুতরাং মহিলা যে দাবি করল আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তার এ দাবি নিশ্চিত অসার ও মিথ্যা। সুতরাং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হবে এবং সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

* আর ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারোক্তির ছয় মাস পর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে এ সন্তানের পিতৃ-পরিচয় তার স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ সুরতে সম্ভাবনা আছে যে, মহিলার স্বীকারোক্তির পর গর্ভসঞ্চার হয়েছে, তাই তার স্বীকারোক্তির অসারতা নিশ্চিত নয়। সুতরাং এ সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا اللَّفْظُ بِإِطْلَاقِهِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মতনপ্রণেতা যে ইদ্দতওয়ালীর স্বীকারোক্তির কথা বলেছেন, তা ব্যাপক হওয়ার কারণে সকল প্রকার ইদ্দতওয়ালীর ক্ষেত্রে এ বিধানটি প্রযোজ্য। চাই ইদ্দতওয়ালী রাজঈ তালাকের হোক বা বায়েন ও তিন তালাকের হোক কিংবা স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতওয়ালী হোক।

وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ حَبْلٌ ظَاهِرٌ أَوْ اِعْتَرَفَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٌ (رح) يَثْبُتُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُوَ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَعْيِيْنِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِيْ حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِيْ بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالْمُنْقَضِيْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِ النَّسَبِ اِبْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهَرَ الْحَبْلُ أَوْ صَدَرَ الْاِعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعَيُّنُ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا .

অনুবাদ : আর ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীলোক যদি কোনো সন্তান প্রসব করে, তাহলে দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা তার প্রসবের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সন্তানের নসব সাবেত হবে না। তবে সেখানে [ইদ্দত অবস্থায়] যদি গর্ভ দৃশ্যমান হয়ে থাকে কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, তাহলে সাক্ষ্য ছাড়াই নসব সাবেত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সকল ক্ষেত্রেই একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে শয্যাবাসের বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। আর তা-ই আবশ্যকরূপে নসব সাব্যস্তকারী। এখন প্রয়োজন শুধু এটা নির্ধারণ করা যে, এ সন্তান তার গর্ভজাত, আর তা একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেমন বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, স্ত্রীলোকটির প্রসবের স্বীকারোক্তির দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, আর যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা হুজ্জত [প্রমাণ] হতে পারে না। সুতরাং নতুনভাবে নসব প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে পূর্ণ প্রমাণের শর্ত আরোপিত হবে। পক্ষান্তরে যদি গর্ভ দৃশ্যমান হয় কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায় তা ভিন্ন। কেননা, এখানে প্রসবের পূর্বেই নসব প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর সন্তানের নির্ধারণটি একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা সাবেত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসব প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ হুজ্জত জরুরি :

قَوْلُهُ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا الخ : ইদ্দতরত স্ত্রী যদি কোনো সন্তান প্রসব করে আর তার গর্ভে যে সন্তান ছিল এ বিষয়টি পূর্ব থেকে দৃশ্যমান থাকে কিংবা এ ব্যাপারে স্বামীর স্বীকৃতি থাকে, তাহলে উভয় সুরতে কারো সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াই প্রসূত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি ইদ্দতরত স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পর স্বামী তার প্রসবের বিষয়টি অস্বীকার করে, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট নসব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনুকূলে দুইজন পুরুষ কিংবা

একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রদান করা। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান নারীর সাক্ষ্যে নসব সাব্যস্ত হবে; বিনা সাক্ষ্যে নসব সাব্যস্ত হবে না– চাই পূর্ব থেকে গর্ভ দৃশ্যমান থাকুক বা না থাকুক এবং স্বামী গর্ভের বিদ্যমানতা স্বীকার করে থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও তা-ই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট চারজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য প্রদান শর্ত। ইমাম মালেক ও ইবনে আবী লাইলা (র.) বলেন, দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যক্রমে নসব সাব্যস্ত হবে।

দলিল : সাহবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে [কিছু কিছু বিবেচনায়] স্ত্রী এখনো তার স্বামীর শয্যা রয়ে গেছে। আর শয্যারূপে বহাল থাকাই নসব সাব্যস্তকারী। সুতরাং পৃথকভাবে নসব সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, এখন প্রয়োজন হলো, সন্তানটি যে উক্ত মহিলার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, শুধু তা প্রমাণ করা। আর এ জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যেমন বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মাত্র একজন নারীর সাক্ষ্যে সন্তান প্রসবের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যায়, তদ্রূপ ইদ্দতে থাকাবস্থায়ও একজন নারীর সাক্ষ্যক্রমে তা সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলিল এই যে, একথা আমিও স্বীকার করি যে, ইদ্দতে থাকাবস্থায় فِرَاشٌ তথা শয্যা বহাল থাকে। কিন্তু চলতি মাসআলায় ইদ্দত বহাল নেই। যখন স্ত্রীলোকটি গর্ভ প্রসবের কথা স্বীকার করেছে, তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। আর যে বিষয় গত হয়ে গেছে, তা হুজ্জত বা প্রমাণ হতে পারে না। হুজ্জত তো হয় সেটা যা বিদ্যমান। সুতরাং শয্যাধিকারকে নসবের অনুকূলে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানোর সুযোগ নেই। তাই নসব সাব্যস্ত করার জন্য নতুনভাবে প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যেহেতু নতুনভাবে হুজ্জত পেশ করতে হবে সেহেতু পূর্ণাঙ্গ হুজ্জত জরুরি। আর দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য প্রদানই হলো পূর্ণাঙ্গ হুজ্জত। হবে হ্যাঁ, যদি পূর্ব থেকে গর্ভ দৃশ্যমান থাকে কিংবা স্বামী গর্ভ বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করে নিয়ে থাকে তাহলে পূর্ণাঙ্গ হুজ্জতের প্রয়োজন হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে নসব তো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই সাব্যস্ত হয়ে আছে। এখন প্রয়োজন শুধু সন্তানটি যে উক্ত স্ত্রী প্রসব করেছে তা প্রমাণ করা। আর তা একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুসারে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো ইমাম আযম (র.) নসব সাব্যস্তের জন্য পুরুষের সাক্ষ্য শর্ত রেখেছেন। অথচ পরনারীর দিকে তাকানো যেখানে পুরুষের জন্য হারাম সেখানে তার প্রসবের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা তো আরো জঘন্য হারাম হবে। সুতরাং এ ধরনের শর্তারোপ কিরূপে সঙ্গত হয়? এর উত্তর এই যে, সাক্ষ্যের জন্য এখানে দেখার প্রয়োজন হবে না; বরং না দেখেও সাক্ষ্য প্রদান সম্ভব। তা এভাবে যে, স্ত্রীলোকটি সাক্ষীদের সম্মুখে একটি কক্ষে প্রবেশ করবে, আর সাক্ষীদের এ কথা জানা আছে যে, এ কক্ষে উক্ত স্ত্রীলোক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন একটি সন্তান নিয়ে বের হয়ে আসবে, তখন সাক্ষীগণ এর ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে। –[আইনী]

فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَهٰذَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ أَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ قَالُوْا إِذَا كَانُوْا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ وَلِهٰذَا قِيلَ تُشْتَرَطُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ لَا تُشْتَرَطُ لِأَنَّ الثُّبُوْتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبَعٌ لِلثُّبُوْتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا لَا يُرَاعٰى فِيهِ الشَّرَائِطُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْعُلُوْقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি সে স্বামী বিয়োগের ইদ্দতরত হয় এবং ওয়ারিশগণ সন্তান প্রসবের সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে তিন ইমামের সকলের মতে কেউ জন্মের সাক্ষ্য প্রদান না করলেও সন্তান মৃত ব্যক্তিরই সন্তানরূপে গণ্য হবে। উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে এ হুকুমটি তো স্পষ্ট। কেননা, এটা একান্ত তাদেরই হক। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের সত্যায়ন গ্রহণ করা হবে। অবশ্য নসব সম্পর্কে প্রশ্ন হলো– তা অন্যের ব্যাপারে সাবেত হবে কিনা? ফকীহগণ বলেছেন, সত্যায়নকারীরা যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়, তাহলে প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে অন্যদের জন্যও তার নসব সাবেত হবে। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সাক্ষ্য শব্দটি ব্যবহার করা শর্ত। আবার কেউ বলেছেন, তা শর্ত নয়। কেননা, অন্যদের ক্ষেত্রে নসব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকারকারীদের স্বীকৃতি দ্বারা তাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হওয়ার অনুগামী। আর যা অনুগামী হিসেবে সাব্যস্ত হয় তার জন্য যাবতীয় শর্তের বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। কোনো পুরুষ যদি কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করে আর সে বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানের নসব তার সাথে সাবেত হবে না। কেননা, [নিশ্চিতরূপেই] এ গর্তসঞ্চার বিবাহের পূর্বকার। সুতরাং তা স্বামীর পক্ষ থেকে হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ الخ : মাসআলা : কোনো স্ত্রীলোক যদি স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দতরত থাকে, অতঃপর দুই বছরের কম সময়ে বাচ্চা প্রসব করে এবং তার ওয়ারিশগণ সন্তান প্রসবের সত্যায়ন করে, তবে সে ক্ষেত্রে প্রসবের সাক্ষী না থাকলেও মৃত ব্যক্তি থেকেই উক্ত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ওয়ারিশদের স্বীকৃতি দ্বারা সন্তান সাবেত হওয়ার বিষয়টি উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধান। অতএব এ সন্তান অন্যান্য মিরাস-শরিকদের সঙ্গে সমান অংশীদার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ الخ : **নসব সাবেত হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে মাসআলা :** কোনো স্ত্রীলোক যদি বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করে, তাহলে উক্ত সন্তানের নসব বর্তমান স্বামীর সাথে সাবেত হবে না। আর যদি ছয় মাস কিংবা এর চেয়ে বেশি সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করে, তাহলে বর্তমান স্বামীর সাথেই নসব সাবেত হবে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

দলিল : শয্যাবৈধতা বিদ্যমান রয়েছে এবং সময়কালও পরিপূর্ণ হয়েছে। আর যদি স্বামী প্রসবের বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে একজন ধাত্রী মহিলার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সন্তানের নসব সাবেত হয়ে যাবে। আর স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে অপবাদ বিদ্যমান পাওয়া গেছে, যা লি'আনকে ওয়াজিব করে।

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ اِعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْمُدَّةُ تَامَّةٌ فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ حَتّٰى لَوْ نَفَاهُ الزَّوْجُ يُلَاعِنُ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ وَاللِّعَانُ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَذْفِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَتِهِ وُجُوْدُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُوْنِهِ فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ مُنْذُ أَرْبَعَةٍ وَقَالَتْ هِيَ مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَهُوَ ابْنُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ ظَاهِرًا مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِسْتِحْلَافَ وَهُوَ عَلَى الْاِخْتِلَافِ .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যদি ছয় মাসের মাথায় কিংবা তার পরে প্রসব করে, তাহলে স্বামী স্বীকার করুক কিংবা নীরব থাকুক, সন্তানের নসব তার সাথে সাবেত হবে। কেননা, শয্যাবৈধতা বিদ্যমান রয়েছে, আর সময়কালও পূর্ণ হয়েছে। আর যদি স্বামী প্রসবের বিষয়টি অস্বীকার করে, তাহলে প্রসবের স্বপক্ষে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা নসব সাবেত হবে। এমন কি স্বামী যদি সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর লি'আন প্রযোজ্য হবে। কেননা, বিদ্যমান শয্যাবৈধতা দ্বারা নসব সাবেত হয়। আর লি'আন তো ওয়াজিব হয় অপবাদ আরোপের কারণে। আর অপবাদ আরোপের জন্য সন্তানের উপস্থিতি অনিবার্য নয়। কেননা, সন্তান ছাড়াও ব্যভিচারের অপবাদ সাব্যস্ত হতে পারে। সন্তান প্রসবের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ হয়। অর্থাৎ, স্বামী বলে মাত্র চার মাস যাবৎ আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, আর স্ত্রী বলে ছয় মাস হয়ে গেছে, তাহলে স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সন্তান স্বামীরই হবে। কেননা, বাহ্যিক অবস্থা স্ত্রীর অনুকূলে সাক্ষী। কারণ, বাহ্যত এটাই সত্য যে, স্ত্রীলোকটি জেনার মাধ্যমে নয়; বরং বিবাহের মাধ্যমেই সন্তান জন্ম দিয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে কসম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি; এটি মতপার্থক্যপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ الخ : মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের পর সন্তান প্রসব করল এবং তাদের মাঝে বিবাহের সময়কাল নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে জেনার অপবাদ থেকে মুক্ত করে সন্তানের নসব বর্তমান স্বামীর সাথে যুক্ত করা হবে।

দলিল : উক্ত মাসআলার মাঝে স্ত্রী হলো مُدَّعٰى عَلَيْه আর স্বামী হলো مُدَّعِيْ কেননা, বাহ্যত বিষয় স্ত্রীর অনুকূলে সাক্ষী। আর হাদীসে আছে– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ – এ হাদীসের আলোকে যেহেতু স্বামীর নিকট কোনো প্রমাণ নেই, তাই স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

وَإِنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتْ إِمْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تُطَلَّقْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح) تُطَلَّقُ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّةٌ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهَا لَمَّا قُبِلَتْ فِي الْوِلَادَةِ تُقْبَلُ فِيْمَا يَبْتَنِيْ عَلَيْهَا وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهَا إِدَّعَتِ الْحِنْثَ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ وَهٰذَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ ضَرُوْرِيَّةٌ فِيْ حَقِّ الْوِلَادَةِ فَلَا تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْهَا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তাহলে তোমার প্রতি তালাক ; অতঃপর একজন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য দান করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালাক হবে না, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তালাক হয়ে যাবে। কেননা, সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। রাসূল ﷺ বলেছেন– شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ "যে সকল বিষয় পুরুষরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য বৈধ।" তাছাড়া সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে যখন ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তখন তার উপর ভিত্তিকৃত হুকুমের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা হলো তালাক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, স্ত্রী মূলত ইয়ামীন ভঙ্গ হওয়ার দাবি করেছে, সুতরাং তা পূর্ণ প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। এটা এ কারণে যে, স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে তো অনিবার্য। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তালাক সন্তান প্রসব থেকে পৃথকও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا الخ : সূরতে মাসআলা এই যে, এক লোক তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর একজন ধাত্রী মহিলা সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য দিল, আর স্বামী প্রসব অস্বীকার করছে, এমতাবস্থায় তার গর্ভ বাহ্যত প্রকাশ্য ছিল না, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালাক হবে না, আর সাহেবাইনের মতে তালাক হয়ে যাবে। তাঁরা দলিল হিসেবে হাদীস পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ ...الخ "যে সকল বিষয়ে পুরুষ দৃষ্টি দিতে পারে না, সেসব বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।" অতএব মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা নসব সাবেত হয়ে যায় সুতরাং তালাকও সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : উক্ত মাসআলায় স্ত্রী মূলত তালাকের দাবি করে স্বামীর ইয়ামীন ভঙ্গ হওয়ার দাবি করেছে। আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এখানে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা যাবে না, আর একজন মহিলার সাক্ষ্য দানের দ্বারা নসব সাবেত হওয়ার বিষয়টি হলো অনিবার্য কারণে, যা নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত থাকে। অতএব এর উপর অনুমান করে তালাক সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ তাছাড়া সন্তান প্রসবের সঙ্গে তালাকের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কেননা, তালাক সন্তান প্রসব থেকে পৃথক হতে পারে।

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ طُلِّقَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَاهَا الْحِنْثَ وَشَهَادَتُهَا حُجَّةٌ فِيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبَلِ إِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمِنَةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ قَالَ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ (رض) اَلْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ وَأَقَلُّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ثُمَّ قَالَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُقَدِّرُ الْأَكْثَرَ بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْهُ سَمَاعًا إِذِ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ .

অনুবাদ : স্বামী যদি গর্ভসঞ্চারের স্বীকার করে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই তালাক হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে ধাত্রীর সাক্ষ্য প্রদান শর্ত। কেননা, ইয়ামীন ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত স্ত্রীর দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ অপরিহার্য। আর প্রথমোক্ত মাসআলায় আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্য মোতাবেক এ ক্ষেত্রে ধাত্রীর সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, গর্ভসঞ্চারের বিষয় স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হলো তার চূড়ান্ত পরিণতি তথা প্রসবের বিষয়টিও স্বীকার করে নেওয়া। তাছাড়া দ্বিতীয় দলিল এই যে, স্বামী এ কথা স্বীকার করেছে যে, স্ত্রী আমানত ধারণকারিণী। সুতরাং আমানত ফেরত দানের ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণ করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল হলো দুই বছর। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, গর্ভে সন্তান দুই বছরের অধিক এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করতে পারে না, যদিও ঘূর্ণিত চরকির ছায়ার সমপরিমাণ সময়ও হয়।" আর তার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا [সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং তাকে স্তন্য ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশমাস] তার পরে বলা হয়েছে- وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [তাদের স্তন্য ছাড়ানো হবে দু'বছরে] সুতরাং গর্ভধারণের সময়কাল অবশিষ্ট থাকছে ছয় মাস। ইমাম শাফেয়ী (র.) গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণ করেছেন চার বছর। তার বিপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। আর এটাই স্বাভাবিক যে, হযরত আয়েশা (রা.) [নবী ﷺ -এর নিকট থেকে] শুনে তা বলেছেন। কেননা, বুদ্ধি-বিচার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং তালাককে সন্তান প্রসবের সাথে সম্পৃক্ত করে। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই প্রসবের দাবি করার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তালাক পতিত হওয়ার জন্য ধাত্রী নারীর সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভসঞ্চারের স্বীকারোক্তির অর্থ হলো সে বাচ্চার প্রসবকেও স্বীকার করল। অতএব, স্বীকারোক্তি পাওয়ার পর আর সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। **দ্বিতীয় দলিল :** স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের স্বীকার করার অর্থ হলো এ কথার দাবি করা যে, তার স্ত্রী আমানতদার। তার পেটে আমার বাচ্চা وَدِيْعَتْ বা আমানত রয়েছে। আর আমানত ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমানতদারের কথাই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এখানে সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

সাহেবাইনের দলিল : উক্ত মাসআলার মাঝে স্ত্রী তার বক্তব্য দ্বারা এ কথার দাবি করতে চায় যে, স্বামী তার ইয়ামীনের মাঝে حَانِثْ [ইয়ামীন ভঙ্গকারী]। আর এটা প্রমাণ করার জন্য একজন ধাত্রীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। যেমন পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানেও আমরা এক মহিলার সাক্ষ্যকে "অনিবার্য শর্ত" বলে দাবি করেছি।

قَوْلُهُ قَالَ وَاَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ الخ - **গর্ভধারণের সময়কাল :** গর্ভধারণের সময়কাল নিয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য পাওয়া যায়। আমাদের আহনাফের মতে, তার সর্বোচ্চ মেয়াদকাল হলো দুই বছর। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা– اَلْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِى الْبَطْنِ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ - "সন্তান গর্ভে দুই বছরের অধিক সময়ে এক মুহূর্তও অবস্থান করতে পারে না, যদিও ঘূর্ণিত চরকির ছায়ার সমপরিমাণ সময়ও হয়।" আর উক্ত বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট থেকে শুনে বয়ান করাই স্বাভাবিক। কেননা, বিবেক-বুদ্ধি এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। অতএব গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দুই বছরই প্রমাণিত হলো।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর অভিমত হলো, এর সর্বোচ্চ মেয়াদকাল চার বছর। তাঁদের **দলিল :** কিছু ঘটনা ও বিবরণ, যেমন মুহাম্মদ ইবনে আজলান মায়ের পেটে চার বছর অবস্থান করেছেন। আরো অনেকের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে তারা চার বছরের মেয়াদকাল নির্ধারণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَاَقَلُّهُ سِتَّةُ اَشْهُرٍ الخ : আর গর্ভধারণের সর্বনিম্নকাল হলো ছয় মাস। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত। **দলিল :** কুরআনে কারীমের আয়াত– وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا "সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্য ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশ মাস।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ বলে স্তন্য ছাড়ানোর সময়কে আলাদা করেছেন। এতে বুঝা যায়, ত্রিশ মাস থেকে দুই বছর বাদ দিলে আর অবশিষ্ট ছয় মাস হলো গর্ভে ধারণের সময়।

وَمَنْ تَزَوَّجَ اَمَةً فَطَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمِ اِشْتَرَاهَا لَزِمَهُ وَاِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ لِاَنَّهُ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ فَاِنَّ الْعُلُوْقَ سَابِقٌ عَلَى الشِّرَاءِ وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ وَلَدُ الْمَمْلُوْكَةِ لِاَنَّهُ يُضَافُ الْحَادِثُ اِلٰى اَقْرَبِ وَقْتِهِ فَلَابُدَّ مِنْ دَعْوَةٍ وَهٰذَا اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا اَوْ خُلْعًا اَوْ رَجْعِيًّا اَمَّا اِذَا كَانَ اِثْنَتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ اِلٰى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِاَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيْظَةً فَلَا يُضَافُ الْعُلُوْقُ اِلَّا اِلٰى مَا قَبْلَهُ لِاَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالشِّرَاءِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি দাসীকে বিবাহ করে [সহবাসের পর] তাকে তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে খরিদ করে, এখন এ দাসী যদি খরিদ করার দিন থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে সন্তানের পিতৃ-পরিচয় তার সাথে অবশ্য সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না। কেননা, প্রথম সুরতে সে হচ্ছে ইদ্দতওয়ালীর সন্তান, আর গর্ভসঞ্চার ক্রয় থেকে অগ্রবর্তী। আর দ্বিতীয় সুরতের কারণ এই যে, [সে স্ত্রীর নয়] বরং দাসীর সন্তান। কেননা, গর্ভসঞ্চারকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। আর এখানে নিকটতম সময় হচ্ছে দাসী হওয়ার সময়। সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন জরুরি। এ সিদ্ধান্ত ঐ সময়ের জন্য যখন একটি বায়েন তালাক হয় কিংবা খোলা' হয় কিংবা তালাকে রাজ'ঈ হয়। পক্ষান্তরে যদি দুই তালাক হয়, তাহলে তালাকের সময় থেকে দু'বছর পর্যন্ত প্রসব হলে নসব সাবেত হবে। কেননা, দুই তালাকের মাধ্যমে দাসী তার জন্য চূড়ান্তভাবে হারাম হয়েছে। সুতরাং গর্ভসঞ্চারকে অনিবার্যভাবেই তালাকের পূর্ববর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, এ খরিদ করার দ্বারা দাসী তার জন্য হালাল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ اَمَةً فَطَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি কারো দাসীকে বিবাহ করে সহবাসের পর তালাক প্রদান করল, পরে মালিক থেকে উক্ত দাসীকে ক্রয় করে নিল, এখন ক্রয়ের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করলে নসবের দাবি করা ছাড়াই তার থেকে নসব সাবেত হয়ে যাবে। আর যদি ছয় মাসের বেশি সময়ে সন্তান প্রসব করে, তাহলে দাবির ভিত্তিতে নসব সাবেত হবে। দলিল : প্রথম সুরতে যেহেতু ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব হয়েছে অতএব বুঝা যায় যে, এ সন্তান ক্রয়ের পূর্বে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আর তা হলো ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীর। সুতরাং কোনো প্রকার দাবি ছাড়াই তার নসব সাবেত হবে। কেননা, ইদ্দতরত অবস্থায় স্ত্রী বিধানগত দিক থেকে স্বামীর বৈধ শয্যারূপে পরিগণিত। আর দ্বিতীয় সুরতে যেহেতু ছয় মাসের অধিক সময়ে সন্তান প্রসব হয়েছে, তাই এটা ক্রয়ের পরের নুতফা [বীর্য] হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, গর্ভসঞ্চারকে নিকটতম সময়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়। আর দাসী হওয়ার বিষয়টি এখানে নিকটতম। অতএব, এখানে মনিবের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন ছাড়া নসব সাবেত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ সিদ্ধান্ত তখনই কার্যকরী হবে যখন একটি বায়েন তালাক, খোলা' কিংবা রাজ'ঈ তালাক হবে। পক্ষান্তরে যদি দুই তালাক হয়, তাহলে যেহেতু দাসী তার জন্য চূড়ান্তভাবে হারাম হয়ে গেছে, যা ক্রয়ের দ্বারা হালাল হবে না। অতএব, এ সুরতে যদি তালাকের সময় থেকে দুই বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তার থেকে নসব সাবেত হবে। কেননা, ক্রয়ের দ্বারা গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা নেই। কারণ, তা তো তালাকের দ্বারা হারাম হয়ে গেছে।

وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ اِمْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعَيُّنِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ ذٰلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ اِبْنِي ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْغُلَامِ وَقَالَتْ أَنَا اِمْرَأَتُهُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَهُوَ اِبْنُهُ يَرِثَانِهِ وَفِي النَّوَادِرِ جَعَلَ هٰذَا جَوَابَ الْإِسْتِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْمِيرَاثُ لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَبِالْوَطْيِ عَنْ شُبْهَةٍ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِقْرَارًا بِالنِّكَاحِ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَبِكَوْنِهَا أُمَّ الْغُلَامِ وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ لِذٰلِكَ وَضْعًا وَعَادَةً وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتِ الْوَرَثَةُ أَنْتِ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّ ظُهُورَ الْحُرِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْعِ الرِّقِّ لَا فِي إِسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ.

অনুবাদ : কেউ যদি তার দাসীকে বলে, তোমার গর্ভে কোনো সন্তান থাকলে তা আমার। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য প্রদান করল, তাহলে এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কেননা, এখন প্রয়োজন শুধু সন্তান নির্ধারণ করা, আর তা সর্বসম্মতিক্রমেই ধাত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কেউ যদি কোনো বালক সম্পর্কে বলে যে, এ আমার পুত্র, অতঃপর সে মারা যায়, অতঃপর বালকের মা এসে বলল, আমি তার স্ত্রী, তাহলে স্ত্রীলোকটি তার স্ত্রী এবং বালকটি তার ছেলে হিসেবে গণ্য হবে এবং মাতা-পুত্র উভয়েই তার ওয়ারিস হবে। نَوَادِرْ গ্রন্থে রয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এটাকে সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত বলেছেন; সাধারণ কিয়াসের দাবি মতে স্ত্রীলোকটি মিরাস পাবে না। কেননা, নসব যেমন শুদ্ধ বিবাহ দ্বারা সাবেত হয় তেমনি ফাসেদ বিবাহ দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ সন্দেহমূলক সহবাস এবং মালিকানা সূত্রের সহবাস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং লোকটির উক্ত বক্তব্য বিবাহের স্বীকারোক্তি নয়। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, আলোচ্য মাসআলাটি ঐ ক্ষেত্রে যেখানে বালকের মাতা স্বাধীন নারীরূপে এবং বালকটির মাতারূপে সুপরিচিত। আর শরিয়তের নির্ধারণ হিসেবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে শুদ্ধ বিবাহই সন্তান গ্রহণের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যদি স্ত্রীলোকটি স্বাধীন নারী হিসেবে পরিচিত না হয়, আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা বলে যে, "তুমি তো উম্মে ওয়ালাদ", তাহলে সে মিরাস পাবে না। কেননা, দারুল ইসলামের বিবেচনায় স্বাধীনতা প্রকাশ্য হওয়াকে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে শুধু দাসত্ব আরোপ রোধ করার জন্য; মিরাসের হক সাব্যস্ত করার জন্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি আপন বাঁদিকে বলে তোমার গর্ভে যদি কোনো সন্তান থাকে তাহলে সেটা আমার ঔরসজাত। অতঃপর এক পর্যায়ে দাসী তার একটি সন্তান নিয়েছে বলে দাবি করল এবং একজন স্ত্রীলোক অর্থাৎ ধাত্রী তার সন্তান জন্মের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করল, তাহলে দাসীটি তার মনিবের উম্মে-ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। এ মতের

অনুকূলে দলিল এই যে, দাসীর গর্ভের সন্তান মনিবের ঔরষজাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মনিবের তা দাবি করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, মনিব যদি এ কথা দাবি করে যে, সন্তানটি আমার– তাতেই তার সাথে সন্তানের নসব সম্পর্কিত হয়ে যায়। এখন শুধু দরকার সন্তান জন্ম নিয়েছে কিনা? তা প্রমাণ করা। আর এটা সকলের মতেই ধাত্রীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হতে পারে। সুতরাং যখন ধাত্রী মহিলা সন্তান জন্মলাভের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন মনিবের সাথে এর নসব সম্পর্কিত হবে এবং দাসীটি তার উম্মে-ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে।

তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মনিবের দাবিমূলক উক্তি هُوَ مِنِّيْ বলার সময় থেকে ছয় মাসের কমে সে সন্তান জন্ম নেবে। যদি পূর্ণ ছয় মাস কিংবা তার অধিক সময়ে সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ اِبْنِيْ ثُمَّ مَاتَ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর نَوَادِرْ -এর বর্ণনা : তিনি বলেন, উল্লিখিত মাসআলা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত হিসেবে হয়েছে; অন্যথায় সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী স্ত্রীলোকটি তার মিরাস পাওয়ার কথা নয়।

দলিল : নসব সাবেত হওয়ার সুরত অনেকগুলো হতে পারে। শুদ্ধ বিবাহ যেমন নসব সাবেত করে ফাসেদ বিবাহ দ্বারাও সাবেত হয়ে থাকে। সন্দেহমূলক সহবাস দ্বারাও সাবেত হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত মাসআলায় কোনো ব্যক্তির সন্তানের দাবি করার দ্বারা বিবাহের দাবিকে লাযিম করে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের বিবরণ : বর্ণিত মাসআলায় তখনই মিরাস সাব্যস্ত হবে যখন স্ত্রীলোক স্বাধীন হওয়া এবং উক্ত ছেলের মাতা হওয়ার বিষয়টি লোক সমাজে পরিচিত থাকবে। আর শরিয়তের দৃষ্টিকোণ এবং সাধারণ অবস্থা হিসেবেও শুদ্ধ বিবাহকেই সন্তান গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব সন্তান সাবেতের অন্যান্য সম্ভাব্য সুরতসমূহের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে, তাই উক্ত মহিলা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার সম্পদের মিরাস পাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِاَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتِ الْوَرَثَةُ الخ : উল্লেখ্য যে, দারুল ইসলামের মাঝে স্বাধীনতা প্রকাশ্য হওয়ার বিষয়টি দাসত্ব আরোপ থেকে বাঁচার জন্য; মিরাস সাব্যস্ত করার জন্য নয়। সুতরাং সন্তানের মা হিসেবে স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি পরিচিত না থাকলে ওয়ারিশদের দাবিকে উপেক্ষা করা যাবে না।

بَابُ حِضَانَةِ الْوَلَدِ وَمَنْ اَحَقُّ بِهٖ

وَاِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْاُمُّ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِبْنِىْ هٰذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهٗ وِعَاءً وَحُجْرِىْ لَهٗ حِوًى وَثَدْيِىْ لَهٗ سِقَاءً وَ زَعَمَ اَبُوْهُ اَنَّهٗ يَنْزِعُهٗ مِنِّىْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِىْ وَلِاَنَّ الْاُمَّ اَشْفَقُ وَاَقْدَرُ عَلَى الْحِضَانَةِ فَكَانَ الدَّفْعُ اِلَيْهَا اَنْظَرَ وَاِلَيْهِ اَشَارَ الصِّدِّيْقُ (رض) رِيْقُهَا خَيْرٌ لَهٗ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ امْرَاَتِهٖ وَالصَّحَابَةُ حَاضِرُوْنَ مُتَوَافِرُوْنَ ـ

পরিচ্ছেদ : সন্তান প্রতিপালন এবং কে এর অধিক হকদার

অনুবাদ : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে মা অধিক হকদার। কেননা, বর্ণিত আছে যে, [তালাকপ্রাপ্তা] জনৈকা স্ত্রীলোক বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমার এ পুত্রের জন্য আমার উদর ছিল আধার এবং আমার কোল ছিল তার জন্য আশ্রয়স্থল এবং আমার স্তন ছিল তার জন্য পানপাত্র, অথচ তার বাপ বলছে যে, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবে। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন– اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِىْ -'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তার ব্যাপারে তুমি অধিক হকদার।' তাছাড়া মা হলো অধিক স্নেহময়ী এবং প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক সক্ষম। সুতরাং তার হাতে সমর্পণ করা অধিক কল্যাণজনক। এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছিলেন– رِيْقُهَا خَيْرٌ لَهٗ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ - 'হে ওমর, তোমার কাছে মধুর-শহদের চেয়ে মায়ের মুখের থুথু তার জন্য অধিক ভালো।' হযরত ওমর (রা.) ও তাঁর স্ত্রীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটেছিল তখন বহু সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার (র.) নবজাতকের পিতৃ-পরিচয় সাব্যস্ত হওয়ার বিধানাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পিতৃ-পরিচয় সাব্যস্ত হওয়ার পরই তার প্রতিপালনের প্রশ্ন সম্মুখে আসে। তাই তিনি সংলগ্ন এ পরিচ্ছেদে প্রতিপালনের বিধানসমূহ বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ وَاِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الخ - **সন্তান প্রতিপালনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে :** স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি কখনো বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে তার মা অধিক হকদার।

দলিল : হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে আরজ করলেন– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِبْنِىْ هٰذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهٗ وِعَاءً وَحُجْرِىْ لَهٗ حِوًى وَثَدْيِىْ لَهٗ سِقَاءً وَ زَعَمَ اَبُوْهُ اَنَّهٗ يَنْزِعُهٗ مِنِّىْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِىْ ـ

'হে আল্লাহর রাসূল, আমার এ পুত্রের জন্য আমার উদর ছিল আধার..... ।'

দ্বিতীয় দলিল : পিতার তুলনায় মা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকে এবং সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে অধিক সক্ষম হয়ে থাকে। কেননা, সন্তান প্রকৃতপক্ষে মায়ের অংশ হয়ে থাকে। এ কারণেই তো কাঁচি দিয়ে সন্তানকে মা হতে আলাদা করা হয়। সুতরাং সন্তানকে মায়ের হাতে সমর্পণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে বলেছিলেন– 'হে ওমর! তোমার কাছের শহদ-মধুর চেয়ে তার মায়ের মুখের থুথু তার জন্য অনেক ভালো।' উল্লিখিত মন্তব্য সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে করেছিলেন যখন হযরত ওমর তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। কোনো সাহাবী তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। এতে বুঝা যায়, সন্তান প্রতিপালনে মা অধিক হকদার।

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَسَتْ تَعْجِزُ عَنِ الْحِضَانَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِ وَإِنْ بَعُدَتْ لِأَنَّ هٰذِهِ الْوِلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْأُمِّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْأَخَوَاتِ لِأَنَّهَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَلِهٰذَا تَحْرُزُ مِيرَاثَهُنَّ السُّدُسَ وَلِأَنَّهَا أَوْفَرُ شَفَقَةً لِلْوِلَادِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ وَلِهٰذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ وَفِي رِوَايَةٍ اَلْخَالَةُ أَوْلَى مِنَ الْأُخْتِ لِأَبٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْخَالَةُ وَالِدَةٌ وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ أَنَّهَا كَانَتْ خَالَتَهُ .

অনুবাদ : আর সন্তানের খরচ পিতার দায়িত্বে থাকবে। যেমন আমরা পরবর্তীতেও এ সম্পর্কে উল্লেখ করব। আর প্রতিপালনের বিষয়ে মাতাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, হয়তো কোনো কারণে সে প্রতিপালনে অক্ষম থাকতে পারে। মা যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে দাদির তুলনায় নানি অধিক হকদার, যদিও নানী অধঃস্তন স্তরের হয়। কেননা, এ প্রতিপালন অধিকার মাতৃত্বের দিক থেকে লাভ হয়। যদি নানি না থাকে, তাহলে দাদি বোনদের চেয়ে অধিক হকদার। কেননা, দাদিও মাতৃত্বের শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই তারা ছয় ভাগের এক ভাগ মিরাস লাভ করে। তাছাড়া জন্মদান সম্পর্কের কারণে তিনি অধিকতর স্নেহ-মমতার অধিকারিণী হবেন। দাদি যদি না থাকেন, তাহলে বোনেরা ফুফু ও খালাদের চেয়ে বেশি হকদার। কেননা, তারা একই মা-বাবার সন্তান। এ কারণেই মিরাসে তাদের অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কোনো বর্ণনা মতে আপন খালা সৎ বোনের চেয়ে বেশি হকদার। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খালা হচ্ছে মাতা সদৃশ। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ [হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতামাতাকে সিংহাসনে আসীন করলেন] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর খালা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ الخ - সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর :

মাসআলা : সন্তানের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব পিতার উপর– এ সম্পর্কে সংলগ্ন পরবর্তী بَابُ النَّفَقَاتِ-এ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আর সন্তান প্রতিপালনে মা অধিক হকদার, যদি মা তার তলব করেন। তবে মা যদি প্রতিপালন অস্বীকার করেন, তাহলে মাকে তার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কেননা, কোনো কারণে মা তা হতে অক্ষম থাকতে পারেন। তবে মা ছাড়া অন্যকোনো মাহরাম আত্মীয় না থাকলে সে ক্ষেত্রে মাকে বাধ্য করা যাবে; অন্যথায় সন্তানের অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَأُمُّ الْأُمِّ الخ : আর মার অনুপস্থিতিতে নানি সন্তানের প্রতিপালনে অধিক হকদার। নানি না থাকলে পরনানি। কেননা, সন্তান প্রতিপালনে স্নেহ-মমতার বিষয়টি অধিক কার্যকর। আর মায়ের দিকেই বিষয়টি অধিক উপযুক্ত। নানি কিংবা পরনানীর অনুপস্থিতিতে দাদি অধিক হকদার।

وَتَقَدَّمَ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلٰى مِنَ الْعَمَّاتِ تَرْجِيْحًا لِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَيَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلْنَا الْأَخَوَاتِ مَعْنَاهُ تَرْجِيْحُ ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ ثُمَّ قَرَابَةُ الْأُمِّ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذٰلِكَ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هٰؤُلَاءِ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيْهِ نَزْرًا وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا فَلَا نَظَرَ قَالَ إِلَّا الْجَدَّةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدُّ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ أَبِيْهِ فَيَنْظُرُ لَهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظَرًا إِلَى الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ وَمَنْ سَقَطَ حَقُّهَا بِالتَّزَوُّجِ يَعُوْدُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ .

অনুবাদ : বাপ-শরীক ও মা-শরীক বোনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা, এরূপ বোন অধিক স্নেহময়ী হবে। এরপর মা-শরীক বোন এরপর বাপ-শরীক বোন হকদার হবে। কেননা, এ হক লাভ হয় মাতৃত্বের দিক থেকে। অতঃপর মাতৃত্বের আত্মীয়কে অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে খালারা ফুফুদের চেয়ে বেশি হকদার হবে এবং বোনদেরকে যেভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে তাদেরকে সেভাবে করা হবে। অর্থাৎ, দুই দিকের আত্মীয়তার অধিকারিণীকে অতঃপর মায়ের দিকের আত্মীয়তার অধিকারিণীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অতঃপর ফুফুদের সেভাবেই শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে। আর এ স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে যে কেউ বিবাহ করবে, তার প্রতিপালন-অধিকার রহিত হয়ে যাবে। প্রমাণ হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, সৎপিতা অপরিচিত ও অনাত্মীয় হলে সে তো খরচ করবে অল্প, আর তার দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ম। সুতরাং কল্যাণের আশা নেই। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে শিশুটির দাদা যদি [নতুন] নানীর স্বামী হয়, তাহলে নানীর অধিকার বহাল থাকবে। কেননা, স্নেহময়ীতায় দাদা শিশুটির বাবার স্থলবর্তী হবে। সুতরাং তার ভালো-মন্দের দিকে নজর রাখবে। একই হুকুম হবে, যদি কোনো শিশুর মাহরামের সাথে ঐ স্ত্রীলোকটির বিবাহ হয়। কেননা, নিকটাত্মীয়তার কারণে স্নেহ বিদ্যমান থাকবে। বিবাহের কারণে যে স্ত্রীলোকের প্রতিপালন-অধিকার রহিত হয়েছে। বিবাহ-সম্পর্ক রহিত হলে সে অধিকার সে ফিরে পাবে। কেননা, প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ الخ : **মাসআলা :** সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে দুই সম্পর্কবিশিষ্ট নারীরা অগ্রাধিকার পাবে এবং মাতৃত্বের আত্মীয় পিতৃত্বের আত্মীয়ের তুলনায় অধিক হকদার হবে। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে ফুফুরাও হকদার হবে। প্রথমে পিতার মা-শরীক ও বাপ-শরীক বোন অতঃপর মা-শরীক বোন অতঃপর বাপ-শরীক বোন পর্যায়ক্রমে অধিকারপ্রাপ্ত হবে।

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هٰؤُلَاءِ الخ : **মাসআলা :** যে সকল নারীর সন্তান প্রতিপালনের অধিকার সাব্যস্ত হয় তাদের কেউ যদি বিবাহ করে, তাহলে তার উক্ত অধিকার রহিত হয়ে যাবে। তবে যদি একান্ত কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হয় তাহলে তার অধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ سَقَطَ حَقُّهَا بِالتَّزَوُّجِ الخ : **মাসআলা :** বিবাহের কারণে যাদের অধিকার বিনষ্ট হয় বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন হলে তারা তাদের পূর্বাধিকার আবার ফিরে পাবে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন- أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِيْ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَقْرَبِ وَقَدْ عُرِفَ التَّرْتِيبُ فِي مَوْضِعِهِ غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى عَصَبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَابْنِ الْعَمِّ تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ.

অনুবাদ : শিশুটির নিকটাত্মীয় কোনো স্ত্রীলোক যদি না থাকে, আর পুরুষেরা তার প্রতিপালকত্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাহলে তাদের মধ্যে আসাবা হিসেবে যে নিকটতম, সে-ই হবে অধিকতর হকদার। কেননা, অভিভাবকত্ব নিকটতম আত্মীয়ের জন্যই সংরক্ষিত, আর 'আসাবাদের পর্যায়ক্রম যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে। তবে বালিকা শিশুকে গাইরে-মাহরাম আসাবার হাতে অর্পণ করা হবে না। যেমন– আজাদকারী মনিব এবং চাচাত ভাই– ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পুরুষের মধ্যে যারা হকদার :

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ إِمْرَأَةٌ الخ : শিশুটিকে প্রতিপালনের জন্য তার নিকটাত্মীয় কোনো স্ত্রীলোক যদি না থাকে, তাহলে আত্মীয় পুরুষগণ সে দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু যদি তারা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সে-ই হবে অধিকতর হকদার যে আসাবা হিসেবে শিশুর নিকটতম। কেননা, অভিভাবক হওয়ার অধিকার নিকটতম আত্মীয়ের জন্যই সংরক্ষিত। আর আসাবাগণের তারতীব বা পর্যায়ক্রম উত্তরাধিকার বণ্টন অধ্যায়ে এবং নিকাহের অভিভাবক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আসাবাগণের পর্যায়ক্রমিক স্তরবিন্যাস : পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ কিংবা তদূর্ধ্ব কেউ থাকলে তিনি, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, সহোদর ভাইয়ের পুত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, সহোদর চাচা [অর্থাৎ, পিতার সহোদর ভাই] বৈমাত্রেয় চাচা [অর্থাৎ, পিতার বৈমাত্রেয় ভাই], সহোদর চাচাতো ভাই, বৈমাত্রেয় চাচাতো ভাই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ক্রমিকের প্রথম ব্যক্তির বর্তমানে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তার বর্তমানে তৃতীয় ব্যক্তি, তার বর্তমানে চতুর্থ ব্যক্তি এবং এভাবে প্রত্যেক পরবর্তী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি থাকতে লালন-পালনের অধিকার লাভ করবে না। উল্লেখ্য যে, শিশুটি যদি বালিকা হয় তাহলে চাচাতো ভাই তার প্রতিপালকের হকদার হবে না। সুতরাং তাকে তার হাতে অর্পণ করা হবে না। কেননা তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ সে তার গাইরে-মাহরাম। যেহেতু মুক্তিদাতা মনিব সর্বশেষ আসাবা তাই বালক শিশুর কোন অভিভাবক না থাকলে তাকে উক্ত মুক্তিদানকারী মনিবের প্রতিপালনে দেওয়া হবে। কিন্তু শিশু বালিকা হলে তাকে তার নিকট প্রদান করা হবে না। কেননা, সে তার মাহরাম নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

১. শিশুর যদি আসাবা শ্রেণীর কোনো অভিভাবক না থাকে তাহলে তাকে তার মা-শরীক [বৈপিত্রেয়] ভাইয়ের প্রতিপালনে অর্পণ করা হবে।

২. কোনো শিশুর যদি একই স্তরের একাধিক ভাই বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রতিপালনের ব্যাপারে সে-ই অধিক হকদার হবে, যার মধ্যে সততা ও তাকওয়ার গুণ সবচেয়ে বেশি। যদি এ দিক থেকেও সকলে সমান হয়, তাহলে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সর্বাধিক হকদার বলে বিবেচিত হবেন।

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ اَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتّٰى يَاْكُلَ وَحْدَهٗ وَيَشْرَبَ وَحْدَهٗ وَيَلْبَسَ وَحْدَهٗ وَيَسْتَنْجِىَ وَحْدَهٗ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَسْتَغْنِىَ فَيَاْكُلَ وَحْدَهٗ وَيَشْرَبَ وَحْدَهٗ وَيَلْبَسَ وَحْدَهٗ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ لِاَنَّ تَمَامَ الْاِسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْاِسْتِنْجَاءِ وَ وَجْهُهٗ اَنَّهٗ اِذَا اسْتَغْنٰى يَحْتَاجُ اِلَى التَّاَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِاٰدَابِ الرِّجَالِ وَاَخْلَاقِهِمْ وَالْاَبُ اَقْدَرُ عَلَى التَّادِيْبِ وَالتَّثْقِيْفِ وَالْخَصَّافُ (رح) قَدَّرَ الْاِسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِيْنَ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ ـ

অনুবাদ : মা ও নানী বালক শিশুর লালন-পালনে হকদার থাকবে, যে পর্যন্ত সে পানাহার, পোশাক পরিধান, ইস্তিঞ্জা একা একা করতে সক্ষম না হয়। জামিউস সাগীর কিতাবের ভাষ্য হলো, যে পর্যন্ত সে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত না হয় অর্থাৎ, একা একা পানাহার করতে এবং পোশাক পরিধান করতে সক্ষম হয়। উভয় ভাষ্যের মর্মার্থ একই। কেননা, নির্ভরশীলতা থেকে পূর্ণ মুক্ত হওয়া একা ইস্তিঞ্জা করতে সক্ষমতার মাধ্যমেই হবে। এই সীমা নির্ধারণের কারণ এই যে, এ সকল কাজকর্মে অন্যের উপর নির্ভরশীতা থেকে যখন সে মুক্ত হবে তখন পুরুষোচিত আখলাক ও আচার-আচরণ শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে। আর আদব-কায়দা ও শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যাপারে পিতাই অধিক সক্ষম। আর হযরত আবূ বকর খাস্সাফ (র.) সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার বয়স নির্ধারণ করেছেন সাত বছর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاُمُّ وَالْجَدَّةُ اَحَقُّ بِالْغُلَامِ الخ : মাসআলা : বাচ্চার লালন-পালনের ব্যাপারে তার মা ও নানী অধিক হকদার। এ হক শিশুর একা একা পানাহার করা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন এবং ইস্তিঞ্জা করার সময়কাল পর্যন্ত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, শিশু পানাহার এবং পোশাক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মা এবং নানী লালন-পালনের অধিকার রাখে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম কুদূরী (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনার ভাবার্থ একই। কেননা, ইমাম কুদূরী ইস্তিঞ্জার কথা বলেছেন, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) (اِسْتِغْنَاء) শিশুর অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এটা তখনই পূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে যখন শিশু ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে কাপড় খুলে তা পরিধান করতে পারবে। অতএব, উভয় বর্ণনার মর্মার্থ একই দাঁড়াল। আর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা এজন্যই উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল কাজ-কর্মে অন্যের নির্ভরশীলতা থেকে যখন মুক্ত হবে তখন পুরুষোচিত আখলাক-চরিত্র ও আচার-আচরণ শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে। আর আদব দানের ক্ষেত্রে পিতাই হলো অধিক সক্ষম।

قَوْلُهٗ وَالْخَصَّافُ (رح) قَدَّرَ الْاِسْتِغْنَاءَ الخ : আর ইমাম আবূ বকর খাস্সাফ (র.) সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার বয়স নির্ধারণ করেছেন সাত বছরের মাধ্যমে। ইমাম মালেক (র.) বাচ্চার সাবালক হওয়া পর্যন্ত মায়ের লালন-পালনের অধিকার নির্ধারণ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো- শিশুকে সাত বছর বয়সে এখতিয়ার দেওয়া হবে- সে মা-বাবা থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ اَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتّٰى تَحِيْضَ لِاَنَّ بَعْدَ الْاِسْتِغْنَاءِ تَحْتَاجُ اِلٰى مَعْرِفَةِ اٰدَابِ النِّسَاءِ وَالْمَرْاَةُ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْدَرُ وَبَعْدَ الْبُلُوْغِ تَحْتَاجُ اِلَى التَّحْصِيْنِ وَالْحِفْظِ وَالْاَبُ فِيْهِ اَقْوٰى وَاَهْدٰى وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهَا تُدْفَعُ اِلَى الْاَبِ اِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ اِلَى الصِّيَانَةِ وَمَنْ سِوَى الْاُمِّ وَالْجَدَّةِ اَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهٰى وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى تَسْتَغْنِىَ لِاَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلٰى اِسْتِخْدَامِهَا وَلِهٰذَا لَا تُوَاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُوْدُ بِخِلَافِ الْاُمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ شَرْعًا .

অনুবাদ : আর বালিকার ক্ষেত্রে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত মা ও নানী লালন-পালনের হকদার থাকবে। কেননা, নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার পরও প্রয়োজন হলো নারীসুলভ আদব-কায়দা ও শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করা। আর এ বিষয়ে স্ত্রীলোকই অধিক সক্ষম। আর বালেগ হওয়ার পর প্রয়োজন হলো তার নিরাপত্তা বিধান ও তার বিবাহ দান। আর এ বিষয়ে পিতা অধিক সক্ষম ও অধিক বিচক্ষণ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বালিকা যখন কামাকর্ষণের বয়সে উপনীত হবে তখনই তাকে পিতার হাতে সোপর্দ করতে হবে। কেননা, তখনই নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন। মা ও নানী ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোক কামাকর্ষণের বয়স পর্যন্ত বালিকার ব্যাপারে অধিক হকদার। পক্ষান্তরে জামিউস সাগীর কিতাবের ভাষ্য মতে এর। সীমা হলো আত্মনির্ভরশীলতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, তাতে তাদের সেবা কাজে ব্যবহারের অধিকার তাদের নেই। এ কারণেই তারা তাকে অন্যত্র পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করতে পারে না। ফলে [শিক্ষাদানের] উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। মা ও নানীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, শরিয়তের বিধান মতে বালিকাকে তারা কাজে ও সেবায় নিয়োজিত করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ اَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتّٰى تَحِيْضَ الخ - **বালিকাদের প্রতিপালন সম্পর্কে :** উল্লিখিত ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে ঋতুস্রাব বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তার মা ও নানী অধিক হকদার। তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, কন্যা-সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে স্বনির্ভর হওয়ার পরেও নারীসুলভ আচরণ ও আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন। যেমন- সেলাই কাজ, পাকানোর কাজ, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি বিষয়। আর এসব বিষয়ে নারীরাই অধিক সক্ষম, তাই ঋতুস্রাব বয়স পর্যন্ত মা ও নানীর নিকট থাকাই অধিক শ্রেয়। আর বালেগ হওয়ার পর কন্যা-সন্তানের যেহেতু বিবাহ-শাদির প্রয়োজন, যাতে সে পাপাচার থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাই বালেগ হওয়ার পর তাকে পিতার হাতে সোপর্দ করা হবে। কেননা, পিতা এসব বিষয়ে অধিক বিচক্ষণ ও সক্ষম।

আর ফকীহ হিশাম (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, বালিকা যখন কামাকর্ষণের বয়সে উপনীত হয়, তখন তাকে পিতার হাতে সোপর্দ করা হবে। কেননা, তখনই নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন। তবে কামাকর্ষণের বয়স নিয়ে ফকীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, এগারো বছর। ফকীহ আবুল লাইছ বলেন, নয় বছর। এ ব্যাপারে আরো অন্যান্য মতও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ سِوَى الْاُمِّ وَالْجَدَّةِ اَحَقُّ الخ : মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন- মা, নানী ও দাদী ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোকেরও অধিকার রয়েছে বালিকাদের কামাকর্ষণের বয়স পর্যন্ত লালন-পালনের। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবের মধ্যে কেবল পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার বয়স পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, বালিকার জন্য যদিও নারীসুলভ আদব শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন, তথাপি তাদের দ্বারা সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর মা, নানী ও দাদি ছাড়া অন্যের জন্য তাদের সেবা কাজে ব্যবহার করার অধিকার নেই। তাইতো তারা তাকে অন্যত্র পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং কামাকর্ষণের বয়সে উপনীত হওয়ার পরে যদি মা, নানী ও দাদি ছাড়া অন্যের নিকট অর্পণ করা হয়, তাহলে আদব শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর মা, নানী ও দাদীর জন্য তাদের দ্বারা খেদমত নেওয়া যেহেতু জায়েজ আছে, তাই তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে।

قَالَ وَالْاَمَةُ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَاُمُّ الْوَلَدِ اِذَا اُعْتِقَتْ كَالْحُرَّةِ فِىْ حَقِّ الْوَلَدِ لِاَنَّهُمَا حُرَّتَانِ اَوَانَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ وَلَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِى الْوَلَدِ لِعِجْزِهِمَا عَنِ الْحِضَانَةِ بِالْاِشْتِغَالِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلٰى وَالذِّمِّيَّةُ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْاَدْيَانَ اَوْ يُخَافُ اَنْ يَاْلَفَ الْكُفْرَ لِلنَّظْرِ قَبْلَ ذٰلِكَ وَاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بَعْدَهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিব যখন তার দাসীকে আজাদ করে দেবে এবং উম্মে ওয়ালাদ যখন আজাদ হয়ে যাবে, তখন শিশুর প্রতিপালনের হকদার হওয়ার ব্যাপারে তারা স্বাধীন স্ত্রীলোকদের মতো হবে। কেননা, হকদার সাব্যস্ত হওয়ার সময় তারা স্বাধীন। কিন্তু মুক্তিলাভের পূর্বে সন্তানের প্রতিপালনে তাদের কোনো অধিকার নেই। কেননা, মনিবের সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুর প্রতিপালনে তারা অক্ষম। আর জিম্মি নারী তার মুসলিম সন্তানের প্রতিপালনের অধিক হকদার যতদিন সে ধর্ম-পার্থক্য বুঝার আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন না হয় কিংবা সে কুফরির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার আশঙ্কা না হয়। কেননা, এর পূর্বে মায়ের কাছে রাখাতেই কল্যাণ এবং এর পরে ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَالْاَمَةُ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا الخ : মাসআলা : মনিব তার দাসীকে যদি আজাদ করে দেয় কিংবা উম্মে ওয়ালাদ আজাদ হয়ে যায়, তাহলে তারাও স্বাধীন নারীর মতো শিশুদের লালন-পালনের ব্যাপারে অধিকার রাখে।

দলিল : প্রতিপালনের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার সময় তারা স্বাধীন ছিল, তাই তারা অন্যান্যের মতো তাদের সন্তানের লালন-পালনে অধিক হকদার। তবে আজাদ হওয়ার পূর্বে শিশুদের লালনপালনের ব্যাপারে তাদের কোনো অধিকার নেই। কেননা, তখন তো মনিবের সেবায় ব্যস্ত থাকবে, সন্তানের লালন-পালনে সময় ব্যয় করা সম্ভব হবে না।

قَوْلُهٗ وَالذِّمِّيَّةُ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ الخ - জিম্মি নারীর অধিকার প্রসঙ্গে মাসআলা : কোনো মুসলমান পুরুষ যদি জিম্মি কোনো কিতাবী নারীকে বিবাহ করার পর তার থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে এ সন্তান লালন-পালন করার ক্ষেত্রে জিম্মি নারী অধিক হকদার। যতদিন বাচ্চার মধ্যে ধর্ম-পার্থক্য করার বুদ্ধি না হয় কিংবা কুফরির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার আশঙ্কা না হয়।

দলিল : আকল-বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চার জন্য তার মায়ের প্রতিপালন অধিক কল্যাণকর। আর আকল হওয়ার পর বাচ্চা خَيْرُ الْاَبَوَيْنِ [খাইরুল আবওয়াইন] হিসেবে বাপের ধর্মানুযায়ী মুসলমান হবে।

وَلَا خِيَارَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَهُمَا الْخِيَارُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيَّرَ وَلَنَا أَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ لِتَخْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّعْبِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ (رضـ) لَمْ يُخَيِّرُوْا وَأَمَّا الْحَدِيْثُ فَقُلْنَا قَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اَهْدِهِ فَوُفِّقَ لِاخْتِيَارِهِ الْأَنْظَرَ بِدُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بَالِغًا ـ

অনুবাদ : মা-বাবার কোনো একজনকে পছন্দ করার এখতিয়ার বালক-বালিকার নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাদের সে অধিকার রয়েছে। কেননা, নবী করীম ﷺ এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। আমাদের দলিল এই যে, সে তার বুদ্ধির ত্রুটি ও স্বল্পতার কারণে তাকেই গ্রহণ করবে যার কাছে আরাম রয়েছে, যাতে তাকে খেলাধুলার জন্য অবাধে ছেড়ে দেয়। এভাবে তার কল্যাণ সাধিত হবে না। আর এটা সহীহরূপে প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম শিশুকে এখতিয়ার প্রদান করেননি। আর হাদীস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, নবী ﷺ বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর! ফলে নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার বরকতে অধিকতর কল্যাণের দিকটি গ্রহণ করার তৌফিক তার হয়েছিল কিংবা এ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, যখন সন্তান সাবালক হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الخ - **শিশুর মা-বাবাকে গ্রহণ প্রসঙ্গে মাসআলা :** বালক-বালিকার জন্য মা-বাবার কোনো একজনকে গ্রহণ করার অধিকার আছে কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাদের এখতিয়ারের ভিত্তিতে শিশুকে সোপর্দ করা যাবে না।

দলিল : কারণ, বাচ্চা তার বুদ্ধির ত্রুটি ও স্বল্প আকলের কারণে তাকেই গ্রহণ করবে যার নিকট সে আরাম পায়, যে তাকে খেলাধুলার জন্য অবাধে ছেড়ে দেবে। অথচ এর দ্বারা বাচ্চার ভবিষ্যৎ অকল্যাণকর হয়ে যাবে। এজন্য বাচ্চার লালন-পালনের ক্ষেত্রে বাচ্চার এখতিয়ারকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। তাছাড়া এ কথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত যে, সাহাবীগণ বাচ্চাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : তিনি বলেন, মা-বাবার কোনো একজনকে এখতিয়ার করার অধিকার বাচ্চার রয়েছে যাকে সে এখতিয়ার করবে তার নিকট তাকে সোপর্দ করা হবে।

দলিল : হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

رَافِعُ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِبْنَتِيْ وَهِيَ فَطِيْمٌ وَقَالَ رَافِعُ إِبْنَتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُقْعُدْ نَاحِيَةً قَالَ لَهَا أُقْعُدِيْ نَاحِيَةً فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ أُدْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا ـ

"হযরত রাফে ইবনে সিনান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর তার স্ত্রী ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের একজন কন্যাসন্তান ছিল। স্ত্রীলোক রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে তার সন্তান দুগ্ধপায়ী হিসেবে সে তার নিকট রাখার আবেদন করে আর হযরত রাফেও তার নিকট রাখার আবেদন করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে দুইপাশে বসিয়ে সন্তানকে তাদের মাঝে বসালেন, অতঃপর তারা সন্তানকে ডাকলে সে মার দিকে ধাবিত হলে– আল্লাহর রাসূল তার জন্য দোয়া করলেন اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا। অতঃপর সে পিতার দিকে ধাবিত হলো এবং পিতা তাকে গ্রহণ করলেন।" উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ সন্তানকে এখতিয়ার দিয়েছেন।

فَصْلٌ وَاِذَا اَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ اَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذٰلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاِضْرَارِ بِالْاَبِ اِلَّا اَنْ تَخْرُجَ بِهٖ اِلٰى وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيْهِ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَ الْمَقَامَ فِيْهِ عُرْفًا وَشَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَاَهَّلَ بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَلِهٰذَا يَصِيْرُ الْحَرْبِيُّ بِهٖ ذِمِّيًّا وَاِنْ اَرَادَتِ الْخُرُوْجَ اِلٰى مِصْرٍ غَيْرِ وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ التَّزَوُّجُ فِيْهِ اَشَارَ فِى الْكِتَابِ اِلٰى اَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذٰلِكَ وَهٰذِهٖ رِوَايَةُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذَكَرَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَنَّ لَهَا ذٰلِكَ لِاَنَّ الْعَقْدَ مَتٰى وُجِدَ فِىْ مَكَانٍ يُوْجِبُ اَحْكَامَهُ فِيْهِ كَمَا يُوْجِبُ الْبَيْعُ التَّسْلِيْمَ فِىْ مَكَانِهٖ وَفِىْ جُمْلَةِ ذٰلِكَ حَقُّ اِمْسَاكِ الْاَوْلَادِ وَجْهُ الْاَوَّلِ اَنَّ التَّزَوُّجَ فِىْ دَارِ الْغُرْبَةِ لَيْسَ اِلْتِزَامًا لِلْمُكْثِ فِيْهِ عُرْفًا وَهٰذَا اَصَحُّ وَالْحَاصِلُ اَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْاَمْرَيْنِ جَمِيْعًا اَلْوَطَنِ وَ وُجُوْدِ النِّكَاحِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ تَفَاوُتٌ اَمَّا اِذَا تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِلْوَلَدِ اَنْ يُطَالِعَ وَلَدَهُ وَيَبِيْتُ فِىْ بَيْتِهٖ فَلَا بَأْسَ بِهٖ وَكَذَا الْجَوَابُ فِى الْقَرْيَتَيْنِ وَلَوْ اِنْتَقَلَتْ مِنْ قَرْيَةِ الْمِصْرِ اِلَى الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهٖ لِاَنَّ فِيْهِ نَظَرُ الصَّغِيْرِ حَيْثُ يَتَخَلَّقُ بِاَخْلَاقِ اَهْلِ الْمِصْرِ وَلَيْسَ فِيْهِ ضَرَرٌ بِالْاَبِ وَفِىْ عَكْسِهٖ ضَرَرٌ بِالصَّغِيْرِ لِتَخَلُّقِهٖ بِاَخْلَاقِ اَهْلِ السَّوَادِ فَلَيْسَ لَهَا ذٰلِكَ ـ

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে নিয়ে শহর থেকে অন্যত্র যেতে চায়, তাহলে তার এ অধিকার নেই। কেননা, এতে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবে যদি সে তাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চায়, আর স্বামী তাকে সেখানেই বিবাহ করেছিল [তাহলে অনুমতি রয়েছে]। কেননা, শরিয়তের বিধান ও রেওয়াজ অনুযায়ী সে সেখানে বসবাসকে নিজের উপর আরোপ করে নিয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنْ تَاَهَّلَ بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْهُمْ - 'কেউ যদি কোনো শহরে বিবাহ করে, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।' এ কারণেই দারুল হরবের কোনো পুরুষ বা নারী দারুল ইসলামে বিবাহ করলে জিম্মি হয়ে যায়। আর যদি স্ত্রী নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো শহরে নিতে চায়, আর সেখানেই তাদের বিবাহ হয়েছিল, কুদূরীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ অধিকার তার নেই। এটা হলো মাবসূতের তালাক অধ্যায়ের বর্ণনা। আর জামিউস সাগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, তার এ অধিকার হবে। কেননা, যখন কোনো স্থানে তার আকদে নিকাহ হয়, তখন তার বিধানসমূহ সেখানেই কার্যকর হবে। যেমন– বিক্রয়ের ব্যাপারে বিক্রয়-স্থানে বিক্রীত-দ্রব্য অর্পণ করা ওয়াজিব হয়। আর আকদে নিকাহের বিধানসমূহের অন্যতম হলো "সন্তানকে কাছে রাখার অধিকার"। প্রথম বর্ণনার কারণ এই যে, প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী প্রবাসে বিবাহ অনুষ্ঠানের অর্থ সেখানে বসবাসের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ নয়। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। মোটকথা, স্বদেশ ও বিবাহ অনুষ্ঠান দুটো বিষয় এক স্থানে হওয়া আবশ্যক। এ সকল বিধান হলো ঐ সময় যখন উভয় শহরের মাঝে বেশি দূরত্ব হয় [যাতে দিনে এসে দিনে ফিরে যাওয়া তার জন্য কষ্টকর]। পক্ষান্তরে যদি এতটা কাছাকাছি হয় যাতে পিতার পক্ষে সন্তানকে এসে দেখেশুনে নিজের বাড়িতে রাত্রীযাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে নিয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই। দুই গ্রামের ক্ষেত্রেও এরূপ হুকুম। আর যদি শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শহরে চলে যেতে চায় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। কেননা, এতে শিশুর কল্যাণ রয়েছে এই হিসেবে যে, সে শহরের আদব-কায়দায় গড়ে উঠবে। আর পিতারও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এর বিপরীত অবস্থায় শিশুর ক্ষতি রয়েছে। কেননা, তখন সে গ্রাম্য চরিত্রে গড়ে উঠবে। সুতরাং মায়ের জন্য সে অধিকার নেই।

بَابُ النَّفَقَةِ

قَالَ اَلنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ اَوْ كَافِرَةً اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا اِلٰى مَنْزِلِهٖ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَالْاَصْلُ فِىْ ذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِاَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الْاِحْتِبَاسِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوْسًا بِحَقٍّ مَقْصُوْدٍ لِغَيْرِهٖ كَانَتْ نَفَقَتُهٗ عَلَيْهِ اَصْلُهُ الْقَاضِىْ وَالْعَامِلُ فِى الصَّدَقَاتِ وَهٰذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيْهَا فَتَسْتَوِىْ فِيْهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ .

পরিচ্ছেদ : ভরণপোষণ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ আবশ্যক– স্ত্রী মুসলমান হোক কিংবা কাফের। স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীগৃহে সমর্পণ করবে তখন স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে। এ বিষয়ে প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ অর্থাৎ 'সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।' আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ 'পিতার কর্তব্য হলো স্ত্রীদের খোরপোশ সদাচারের সঙ্গে প্রদান করা।' আর বিদায় হজে রাসূল ﷺ বলেছেন– وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সদাচারের সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা। তাছাড়া এজন্য যে, ভরণপোষণ হচ্ছে আবদ্ধ থাকার প্রাপ্য। আর যে-কোনো ব্যক্তি অন্য কারো উদ্দিষ্ট হক আদায় করার জন্য আবদ্ধ থাকবে, তার ভরণপোষণ ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে। এর আসল হলো কাজি ও জাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তি। [এরা মুসলমানদের সেবায় আবদ্ধ থাকার কারণে তাদের জীবিকা বায়তুল মাল হতে আদায় করা হয়ে থাকে]। উল্লিখিত প্রমাণগুলোতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম স্ত্রী এ বিষয়ে সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ অধ্যায়ের পূর্বে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) শিশু বাচ্চার লালন-পালন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন আলোচনা করছেন ভরণপোষণ এবং যাদের উপর তা আবশ্যক সে সম্পর্কে।

* نَفَقَةٌ শব্দটি আভিধানিকভাবে اِنْفَاقٌ অর্থাৎ খরচ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর পরিভাষায় (نَفَقَةٌ) নাফকা বলা হয়– [দুররে মুখতারের ভাষ্য মতে] هِىَ شَرْعًا اَلطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنٰى وَعُرْفًا هِىَ الطَّعَامُ – 'শরিয়তের বিধানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টিকে নাফকা বলে। আর প্রচলিত প্রথায় নাফকা বলতে শুধুমাত্র খাদ্যকে বুঝানো হয়।'

* কোনো ব্যক্তির উপর অন্যের ভরণপোষণ কয়েকটি কারণে আবশ্যক হয়ে থাকে। তা হচ্ছে– ১. বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়া, ২. বংশীয় সম্পর্ক হওয়া, ৩. দাসত্বের সম্পর্ক হওয়া। এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ قَالَ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلٰى زَوْجِهَا الخ : স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীর গৃহে সমর্পণ করে দেবে তখন স্বামীর উপর আবশ্যক হবে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা – স্ত্রী চাই মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম।

স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার দলিল : আল্লাহ তা'আলার বাণী– لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ আলোচ্য আয়াতে খরচ করার বিষয়কে নির্দেশমূলক (أَمْر) বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর [أَمْر] নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় বিধায় আলোচ্য আয়াত দ্বারা ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়াটা প্রমাণিত।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ এ আয়াতে عَلٰى শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আর তা আবশ্যকমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিধায় এর দ্বারাও ওয়াজিব হওয়াটা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের দীর্ঘ ভাষণে বলেছেন– فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

'মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। তাদের গোপনীয় অঙ্গকে আল্লাহর বিধানমতো বৈধ করেছ। তোমাদের জন্য তাদের উপর আবশ্যক হলো– তারা যেন অন্যের দ্বারা তোমাদের শয্যাকে অপবিত্র না করে। যদি তারা এমনটি করে তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার কর। তাদের জন্য তোমাদের উপর আবশ্যক হলো সদাচারের সঙ্গে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'হিন্দ বিনতে উতবা রাসূল ﷺ -এর নিকট এই মর্মে অভিযোগ করলেন যে, [আমার স্বামী] আবূ সুফিয়ান এক কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নাফকা প্রদান করে না। তবে তাঁর অজান্তে যদি তাঁর সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সদাচারের সঙ্গে তোমার প্রয়োজন মোতাবেক নিয়ে নাও।' তাছাড়া নাফকা ওয়াজিব হওয়াটা ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত।

যৌক্তিক প্রমাণ : ভরণপোষণ আবশ্যক হয় কাউকে আবদ্ধ করার কারণে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্য কাউকে আবদ্ধ করে রাখে তাহলে আটক ব্যক্তির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর স্ত্রী যেহেতু স্বামীর কল্যাণে আবদ্ধ থাকে বিধায় স্বামীর উপর স্ত্রীর নাফকা ওয়াজিব হবে। এর যৌক্তিক সূত্র হলো কাজি এবং জাকাত উসূলকারী ব্যক্তি। অর্থাৎ, এ দু'শ্রেণীর লোক জনগণের কল্যাণে নিজেদের সময় আবদ্ধ রাখার কারণে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সাধারণ মুসলমানদের ফাণ্ড অর্থাৎ, বায়তুল মালের পক্ষ থেকে দেওয়া আবশ্যক। ঠিক অনুরূপ বিধান সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত মুফতি, ওয়াকফ ও অসিয়তের সম্পত্তি সংরক্ষণকারী এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত মুসলিম সৈনিকের। আর স্ত্রীও স্বামীর স্বার্থ তথা যৌনচাহিদা পূরণ করা, তার সংসার গোছানো, সন্তানদের লালন-পালনসহ অনেক কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত থাকে তাই স্বামীর উপর নাফকা দেওয়া আবশ্যক– চাই স্ত্রী মুসলমান হোক অথবা আহলে কিতাবী।

قَوْلُهٗ اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا اِلٰى مَنْزِلِهٖ الخ : অর্থাৎ স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীর গৃহে সমর্পণ করবে তখনই স্বামীর উপর নাফকা দেওয়া আবশ্যক হবে, এ কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। জাহিরুর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তটি আবশ্যকীয় নয়; বরং যখন আকদ তথা সঠিকভাবে বিবাহ সম্পাদন হয়ে থাকে, তখন থেকেই নাফকা দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে– যদিও স্বামীর ঘরে যাওয়া না হোক। আর বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় আর স্ত্রী নিজ অধিকার আদায়ের জন্য যেতে অস্বীকার করে– যেমন বলল, আমার মহর দেওয়ার পূর্বে নিজেকে সমর্পণ করব না, তাহলেও স্ত্রীকে নাফকা দিতে হবে। কেননা, তার দাবি ন্যায্য। হ্যাঁ, যদি অন্যায়ভাবে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হবে। আর অবাধ্য স্ত্রী নাফকা পায় না, বিধায় এ সুরতে নাফকা পাবে না।

কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, স্বামীর ঘরে নিজকে অর্পণ করার পূর্বে স্ত্রী নাফকা পাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। তবে এর উপর ফতোয়া নয়। তবে এ ব্যাপারে শায়খ আবূ নাসর (র.)-এর অভিমতটিই হলো অধিক দৃঢ়। তা হলো, নাফকা ওয়াজিব হওয়ার জন্য মহিলার নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পণ করা আবশ্যক– এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে উল্লিখিত মতবিরোধের সমাধানের পথ হলো, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে না যায়, আর স্ত্রীও স্বামীকে বারণ না করে, তাহলে নাফকা ওয়াজিব হবে। কেননা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো রকমের আপত্তি ছিল না। এখানে স্বামী নিজেই নিজ অধিকার গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে, বিধায় স্ত্রীকে নাফকা দেওয়া আবশ্যক। –[ফাতহুল কাদীর]

وَتُعْتَبَرُ فِى ذٰلِكَ حَالُهُمَا جَمِيْعًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ وَهٰذَا اِخْتِيَارُ الْخَصَّافِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَتَفْسِيْرُهُ اَنَّهُمَا اِذَا كَانَا مُوْسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ وَاِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْاِعْسَارِ وَاِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوْسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُوْنَ نَفَقَةِ الْمُوْسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (رحـ) يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىْ (رحـ) لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَجْهُ الْاَوَّلِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِهِنْدٍ اِمْرَأَةِ اَبِىْ سُفْيَانَ خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ اِعْتَبَرَ حَالَهَا وَهُوَ الْفِقْهُ.

অনুবাদ : আর এ বিষয়ে [স্বামী-স্ত্রী] উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। অধম বান্দা [হিদায়া গ্রন্থকার (র.)] বলেন, এটা ইমাম খাস্সাফ (র.)-এর গৃহীত অভিমত। আর এটার উপরই ফতোয়া। এর ব্যাখ্যা এই যে, উভয়ে যদি সচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতাপূর্ণ ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে অসচ্ছল হলে অসচ্ছলতা অনুপাতে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী অসচ্ছল হয় এবং স্বামী সচ্ছল, তাহলে তার খোরপোশ হবে সচ্ছল নারীদের চেয়ে নিম্নমানের এবং অসচ্ছল নারীদের চেয়ে উঁচুমানের। আর ইমাম কারখী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ [সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে]। প্রথম মতামতের কারণ হলো, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর আদেশ- خُذِىْ مِنْ مَّالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, 'তুমি তোমার স্বামীর সম্পদ থেকে সদাচারের সাথে ঐ পরিমাণ গ্রহণ কর, যা তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়।' এ হাদীসে রাসূল ﷺ স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করেছেন। এই হলো ফিকহী যুক্তির চাহিদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَتُعْتَبَرُ فِىْ ذٰلِكَ حَالُهُمَا جَمِيْعًا الخ - **খোরপোশের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা :** ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খোরপোশের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম খাস্সাফ (র.)-এর গ্রহণযোগ্য অভিমতও এটাই এবং ফতোয়াও এরই উপর। ইমাম খাস্সাফ (র.)-এর অভিমতের বিশ্লেষণ এই যে, উল্লিখিত বিষয়টির সাধারণত সম্ভাব্য চারটি সুরত হতে পারে। যথা-

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়জন সচ্ছল হবে,

২. তারা উভয়জন অসচ্ছল হবে,

৩. স্বামী সচ্ছল আর স্ত্রী অসচ্ছল,

৪. এর বিপরীত অর্থাৎ স্বামী অসচ্ছল আর স্ত্রী সচ্ছল।

প্রথম সুরতে স্বামীর উপর সচ্ছলতার খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় সুরতে অসচ্ছলতার খোরপোশ দিতে হবে। আর তৃতীয় ও চতুর্থ সুরতে মধ্যম ধরনের খোরপোশ দেওয়া স্বামীর উপর আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, সচ্ছল মহিলাদের থেকে পরিমাণে কিছু কম আর অসচ্ছল মহিলাদের পরিমাণ থেকে কিছু বেশি দেবে।

পক্ষান্তরে ইমাম কারখী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় স্বামীর অবস্থা হিসেবে খোরপোশ ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও এটাই। হানাফী মাযহাবের জাহিরী রেওয়ায়েতও এটাই। অনেক মাশায়েখ এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও এটা বলেছেন। বাদায়েউস্ সানায়ে' এবং তুহফা নামক গ্রন্থে এ অভিমতকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। -[আল-বাহার] তবে মতনগুলোতে প্রথম মতটিই উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) বলেছেন, উল্লিখিত চার সুরতের মধ্যে মৌলিকভাবে পরের দুই সুরতেই দ্বিমত রয়েছে। প্রথম দুই সুরতে কোনো দ্বিমত নেই।

-[ফাতওয়ায়ে শামী : খ. ৫; পৃ. ২৮৪]

ইমাম কারখী (র.)-এর পক্ষের দলিল : আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ উক্ত আয়াতে উভয় অবস্থায় স্বামীর অবস্থার কথাই বলা হয়েছে এবং তার অবস্থা হিসেবে খরচ করার নির্দেশই এতে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম খাস্সাফ (র.)-এর পক্ষের দলিল : বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ اِمْرَأَةَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَ وَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ. অর্থাৎ, 'হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা রাসূল ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। সে এতটুকু পরিমাণ খোরপোশ আমাদেরকে প্রদান করে না যা আমার ও আমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। তবে যদি তার অজান্তে নিয়ে নিই। রাসূল ﷺ বললেন, সদাচারের সাথে তুমি এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করে নাও, যা তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়।'

এ ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ খোরপোশের ক্ষেত্রে মহিলার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আর যুক্তির কথাও এটা যে, মহিলার প্রয়োজন পরিমাণ ওয়াজিব হবে। কেননা, নাফকা প্রয়োজন নিবারণের জন্য ওয়াজিব হয়। যে মহিলা গরিব হয় তার জন্য ধনী মহিলার খোরপোশের পরিমাণের দরকার নেই। সুতরাং বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করার কোনো অর্থ নেই। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ধনী ছিলেন এমতাবস্থায় যদি স্বামীর অবস্থাই লক্ষণীয় হতো, তাহলে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বেশি পরিমাণ গ্রহণ করতে বলতেন, কিন্তু তা বলেননি। তবে কুরআন শরীফের বক্তব্য لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ -এর উত্তর হলো, আমরা কুরআনের উক্ত নির্দেশ মোতাবেক বলি যে, স্বামী তার সামর্থ্যানুযায়ী খোরপোশ নগদ আদায় করে দেবে, আর অবশিষ্ট পরিমাণ তার নামে ঋণ হিসেবে বাকি থাকবে। যখন তার অবস্থা পরিবর্তন হবে তখন ঐ বাকি পরিমাণ পরিশোধ করে দেবে। উদাহরণত গরিব হিসেবে স্ত্রীর মধ্যম পর্যায়ের নাফকা দাঁড়ায় দৈনিক ত্রিশ টাকা, কিন্তু স্বামী দিতে পারছে দৈনিক বিশ টাকা করে। তাহলে আমরা বলব যে, এখন বিশটাকাই আদায় করে দাও, আর বাকি দশ টাকা করে যে পরিমাণ থেকে যাবে তা পরবর্তীতে স্বামী আদায় করে দেবে।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত আবূ সুফিয়ানের স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন- خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নাফকার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন- সচ্ছল ব্যক্তির উপর দুই মুদ্দ অসচ্ছল ব্যক্তির উপর এক মুদ্দ আর মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর দেড় মুদ্দ ধার্য হবে।

আমরা বলি, পরিমাণ নির্ধারণ করাটা যথাযথ নয়। কেননা, নাফকা ওয়াজিব হয় প্রয়োজন নিবারণের জন্য। আর প্রয়োজন ব্যক্তি হিসেবে কম-বেশি হয়। যুবতী ও বৃদ্ধা হওয়ার ব্যবধান, এলাকা ও যুগের ব্যবধান দ্বারা পরিমাণও কম-বেশি হয়ে থাকবে বিধায় নির্ধারণ না করাই যথাযথ।

তবে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কাজির জন্য বৈধ আছে যে, তিনি নাফকার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন।

-[ফাতওয়ায়ে শামী : খ. ৫; পৃ. ২৯৭]

فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ وَالْفَقِيْرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ الْمُوْسِرَاتِ فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ وَأَمَّا النَّصُّ فَنَحْنُ نَقُوْلُ بِمُوْجَبِهِ أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْبَاقِيْ دَيْنٌ فِيْ ذِمَّتِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ بِالْمَعْرُوْفِ اَلْوَسْطُ وَهُوَ الْوَاجِبُ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيْرِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح) أَنَّهُ عَلَى الْمُوْسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفُ مُدٍّ لِأَنَّ مَا وَجَبَ كِفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِيْ نَفْسِهِ .

অনুবাদ : কেননা, খোরপোশ প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়াজিব হয়। আর সচ্ছল নারীদের জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট সে পরিমাণ দরিদ্র স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে না। সুতরাং অতিরিক্ত ধার্য করার কোনো কারণ নেই। আর উল্লিখিত আয়াতের দাবিতে আমরা বলব যে, স্বামীকে তার সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করতে বলা হবে এবং সামর্থ্যের অবশিষ্ট পরিমাণ তার দায়দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে। আর আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত بِالْمَعْرُوْفِ [সদাচারের সঙ্গে] -এর অর্থ হলো মধ্যম পন্থা। আর তা-ই হলো ওয়াজিব। আর এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পরিমাণ নির্ধারিত করে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সচ্ছল ব্যক্তির উপর দুই মুদ্দ [অর্ধ সা' বা পৌনে দুই সের] এবং অসচ্ছল ব্যক্তির উপর এক মুদ্দ এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উপর দেড় মুদ্দ ধার্য হবে কেননা, যা পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়, তা মূলত শরিয়ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয় না।

وَاِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتّٰى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِاَنَّهٗ مَنْعٌ بِحَقٍّ فَكَانَ فَوْتُ الْاِحْتِبَاسِ بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهٖ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتٍ . وَاِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتّٰى تَعُوْدَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ لِاَنَّ فَوْتَ الْاِحْتِبَاسِ مِنْهَا وَاِذَا عَادَتْ جَاءَ الْاِحْتِبَاسُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ مَا اِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ التَّمْكِيْنِ فِىْ بَيْتِ الزَّوْجِ لِاَنَّ الْاِحْتِبَاسَ قَائِمٌ وَالزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْىِ كُرْهًا .

অনুবাদ : আর স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে মহরানা আদায় না করা পর্যন্ত নিজেকে সমর্পণ করা হতে বিরত থাকে, তাহলে সে খোরপোশ পাবে। কেননা, নিজেকে এই বিরত রাখা একটি হক আদায় করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে। সুতরাং আবদ্ধতা অবিদ্যমান বলে ধরা হবে না। আর স্ত্রী যদি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তাহলে গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খোরপোশে তার পাওনা নেই। কেননা, আবদ্ধ থাকা তার দিক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আর যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আবদ্ধ থাকাও বিদ্যমান হবে এবং খোরপোশও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় সহবাসের সুযোগ দানে বিরত থাকার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আবদ্ধ থাকা বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বামী বলপ্রয়োগপূর্বক সহবাস করতে সক্ষম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا الخ : মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট নিজেকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে নগদ মহর আদায় না করার কারণে, তাহলে এ অবস্থায়ও স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়া আবশ্যক। কেননা, স্ত্রী শরিয়ত কর্তৃক প্রাপ্য অধিকারের কারণে সমর্পণ থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে স্বামী নিজ প্রাপ্যকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। সে স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করে দিলেই নিজ প্রাপ্য পেয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا الخ : মাসআলা : মৌলিকভাবে স্বামীর উপর খোরপোশ ওয়াজিব হয় স্ত্রীকে নিজ আওতায় আবদ্ধ রাখার কারণে। সুতরাং যে অবস্থায় অন্যায়মূলকভাবে স্ত্রী স্বামীর আবদ্ধতা থেকে বের হয়ে যাবে, সে অবস্থায় স্বামীর উপর নাফকা ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, স্বামীর অবাধ্যতা প্রদর্শনের পর আবার যদি তার বাধ্যগত হয়ে যায়, তাহলে আবার নাফকার অধিকারী হয়ে যাবে। এমনিভাবে নগদ মহর আদায় করার পরও যদি সর্বপ্রথম স্বামীর নিকট নিজেকে অর্পণ করা হতে বিরত থাকে, তাহলেও স্ত্রী খোরপোশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তবে যদি স্ত্রী স্বামীর ঘরেই অবস্থানরত থাকে, কিন্তু স্বামীকে সে সহবাস করতে বারণ করে, তাহলে এ অবস্থায়ও ঐ স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে স্বামীর আওতায় আবদ্ধ রাখা পাওয়া গেছে। সুতরাং নাফকা রহিত হবে না। তাছাড়া স্বামী বলপ্রয়োগপূর্বকও সহবাস করতে সক্ষম।

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ اِمْتِنَاعَ الْاِسْتِمْتَاعِ لِمَعْنًى فِيهَا وَالْاِحْتِبَاسُ الْمُوجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلَنَا أَنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنِ الْمِلْكِ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ .

অনুবাদ : আর স্ত্রী যদি অল্পবয়স্কা হয়, যাকে সম্ভোগ করা যায় না, তাহলে তার জন্য খোরপোশ নেই। কেননা, সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা তার মাঝে অবস্থানগত কারণে হয়েছে। আর খোরপোশ আবশ্যককারী আবদ্ধতা হচ্ছে তা, যা বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম হয়। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে অসুস্থ স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। একটু পরে আমরা তা বর্ণনা করব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অল্পবয়স্কার জন্য খোরপোশ সাব্যস্ত হবে। কেননা, তাঁর মতে খোরপোশ হচ্ছে স্বামীর অধিকার লাভের বিনিময়। যেমন দাসীর ক্ষেত্রে তার দেহগত মালিকানার বিনিময়। আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বামী-স্বত্ব লাভের বিনিময় হচ্ছে মহরানা। আর একটি বিনিময়কৃত বস্তুর বিপরীত দুটি বিনিময় একত্র হতে পারে না। সুতরাং অল্পবয়স্কার জন্য মহরানা ওয়াজিব হবে; খোরপোশ নয়। আর যদি স্বামী সহবাসে সক্ষম নয় এমন অল্পবয়স্ক হয়, আর স্ত্রী বয়স্কা হয় তাহলে স্বামীর সম্পদ থেকে সে খোরপোশ লাভ করবে। কেননা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে সমর্পণ সম্পন্ন হয়েছে। অক্ষমতা দেখা দিয়েছে স্বামীর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে লিঙ্গকর্তিত এবং পুরুষত্বহীন স্বামীর ন্যায় হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا الخ : মাসআলা : স্ত্রী যদি এত অল্পবয়স্কা হয়, যাকে সম্ভোগ করা যায় না, যার সাথে সহবাস করা যায় না, তাহলে তার নাফকা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। এমতাবস্থায় চাই সে স্বামীর ঘরে থাক বা নিজ বাড়িতে থাক, যখন সহবাস করার যোগ্য হবে তখন নাফকা পাবে। জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই।

যখীরা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আলোচ্য মাসআলায় সম্ভোগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস, আর হাকিম (র.)-ও এ কথাই বলেছেন। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যায় তার বয়সের ব্যাপারেও একাধিক অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তার সর্বনিম্ন বয়স হলো সাত বৎসর। আর আল্লামা আত্তাবী (র.) বলেছেন যে, আমাদের মাশায়েখদের মতে, নয় বৎসর; কিন্তু সিদ্ধান্তমূলক কথা হলো, এর জন্য বয়স নির্ধারণ না করা। কেননা, শরীরের অবকাঠামো হিসেবে তা কমবেশ হয়ে থাকে।

অল্পবয়স্কা স্ত্রী নাফকা না পাওয়ার কারণ হলো, স্বামী সম্ভোগ করতে না পারাটা এমন কারণে হয়েছে, যা স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, অল্পবয়স্কা নিজেকে স্বামীর নিকট অর্পণ না করা। সুতরাং সে যেন অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল। আর এমন আবদ্ধতা দ্বারাই স্বামীর উপর খোরপোশ ওয়াজিব হয় যা বিবাহের উদ্দেশ্য তথা সহবাস বা সম্ভোগ উপার্জনের মাধ্যম হয়। আর এ ক্ষেত্রে সে ধরনের আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি, বিধায় অল্পবয়স্কা স্ত্রী খোরপোশ পাবে না। তবে অসুস্থ স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন, যার আলোচনা সামনে আসছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, অল্পবয়স্কা স্ত্রী খোরপোশ পাবে, যদিও সে দোলনায় থাকে। তাঁর দলিল হলো, নাফকা হচ্ছে স্বামীর অধিকার লাভের বিনিময়। আর বিবাহের দ্বারা স্বামী স্ত্রীর অধিকার লাভ করেছে বিধায় তার বিনিময় হিসেবে খোরপোশ দিতে হবে। যেমনটি দিতে হয় অধিকার লাভকৃত বাঁদির ক্ষেত্রে। তাছাড়া নাফকা ওয়াজিব হয় স্ত্রীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে, আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছোট-বড় সব সমান।

আমাদের প্রমাণ হচ্ছে, অধিকার লাভের বিনিময় হলো মহর। কেননা, বিনিময় বলতে ঐ বস্তুকেই বুঝায় যা সম্পর্ক সংঘটিত হওয়ার সময় উল্লেখ হয়। আর সেটা মহর হয়ে থাকে; নাফকা নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীর অধিকার লাভের বিনিময় হলো মহর। এমতাবস্থায় নাফকা বিনিময় হতে পারে না। কেননা, এক বস্তুর বিনিময় দুটি হতে পারে না, বিধায় অল্পবয়স্কা স্ত্রী নাফকা পাবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি অল্প বয়সের হয়, যে সহবাস করতে সক্ষম নয় আর স্ত্রী সাবালিকা হয় তাহলে স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর নাফকা প্রদান করা হবে। কেননা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিজেকে অর্পণ করা পাওয়া গেছে, আর অক্ষমতাটা স্বামীর পক্ষ থেকে এসেছে, সুতরাং যেভাবে খোজা ও পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির উপর তার স্ত্রীর নাফকা ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে অল্প বয়সের এই স্বামীর সম্পদের উপর নাফকা ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়জন অল্পবয়সের হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে নাফকা-খোরপোশ ওয়াজিব হবে না।

তাছাড়া স্বামীর উপর স্ত্রীর নাফকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে যেসব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে সহবাসের যোগ্য হওয়ার বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ الخ এ আয়াতে স্বামীকে জনক বলে উল্লেখ করার দ্বারাই বুঝা যায় স্ত্রী জননী হবে, আর জননী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সহবাসের যোগ্যতা থাকা। সুতরাং আয়াত দ্বারাও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, অল্পবয়স্কা স্ত্রী– যে সম্ভোগ করার ন্যায় নয় সে নাফকা পাবে না।

যখীরা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আলোচ্য মাসআলায় অল্পবয়স্কা স্ত্রী নাফকা না পাওয়ার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, অল্পবয়স্কা যদি এমন হয় যে, যৌন চাহিদা পূরণ ছাড়া অন্যান্য সম্ভোগ করা যায়, তাহলে ঐ স্ত্রী নাফকা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। –[ফাতহুল কাদীর, ফাতওয়ায়ে শামী]

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا الخ : মাসআলা : স্বামীর মাঝে সমস্যা থাকার কারণে যদি সহবাস না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোশ পাবে, বিধায় স্বামী যদি অল্প বয়সের কারণে সহবাস করতে অক্ষম হয়, তাহলেও স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। ঠিক এমনিভাবে স্বামী যদি লিঙ্গকর্তিত কিংবা পুরুষত্বহীন হওয়ার কারণে সহবাস সম্ভব না হয়, তাহলেও স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে সহবাসের প্রতিবন্ধকতার কিছু নেই।

وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتْ عَاجِزَةً فَلَيْسَ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ كَرْهًا فَذَهَبَ بِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّ لَهَا النَّفَقَةُ وَالْفَتْوٰى عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيرًا وَكَذَا إِذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّ لَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذْرٌ وَلٰكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُوْنَ السَّفَرِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَّةُ عَلَيْهِ وَلَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ لِقِيَامِهِ عَلَيْهَا وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُوْنَ السَّفَرِ وَلَا تَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : কোনো ঋণের কারণে স্ত্রী যদি বন্দী হয়, তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে না। কেননা, ঋণ আদায়ে গড়িমসির কারণে [স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণের] আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা তার দিক থেকে এসেছে। আর যদি ঋণ আদায়ে গড়িমসি তার পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে; বরং অক্ষমতার কারণে তা আদায় করতে পারেনি, তবুও স্বামীর দিক থেকেও তা হয়নি। একইভাবে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না, যদি কেউ স্ত্রীকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে। তবে ফতোয়া হলো প্রথম মতামতের উপর। কেননা, স্বামীর নিকট আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা স্বামীর পক্ষ থেকে নয়, যাতে আইনগতভাবে তা বিদ্যমান গণ্য করা যেতে পারে। তদ্রূপ [খোরপোশ প্রাপ্য হবে না] যদি স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো মাহরামের সাথে হজে যায়। কেননা, আবদ্ধতার অবিদ্যমানতা স্ত্রীর দিক থেকে হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে। কেননা, ফরজ ইবাদত আদায় করা একটি ওজর। তবে গৃহবাসের পরিমাণ খোরপোশ ওয়াজিব হবে; সফরের পরিমাণ নয়। কেননা, স্বামীর নিকট তার এ-ই প্রাপ্য। আর যদি স্বামী তার সাথে সফর করে, তাহলে অবশ্য সর্ব সম্মতিক্রমেই খোরপোশ ওয়াজিব হবে। কেননা, স্বামী তার সঙ্গে থাকার কারণে আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে গৃহবাসের পরিমাণ খরচ ওয়াজিব হবে; সফরের খরচ নয়। আর যাতায়াত ভাড়া ওয়াজিব হবে না। এর কারণ আমরা আগেই বলেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ الخ : মাসআলা : ঋণের কারণে যদি স্ত্রীকে বন্দী করে ফেলা হয়, তাহলে সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, স্বামীর আওতায় আবদ্ধ থাকা পাওয়া যায়নি, যার উপর ভিত্তি করেই সে খোরপোশ পেয়ে থাকে। সে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করার কারণে তাকে বন্দী করা হয়েছে, তাহলে যেন সে স্বামীর নিকট নিজেকে অর্পণই

করেনি। আর যে স্ত্রী যথাযথ কারণ ছাড়া নিজকে স্বামীর নিকট অর্পণ না করে সে অবাধ্য বলে গণ্য হয়। আর অবাধ্য স্ত্রীর খোরপোশ যেহেতু সাবেত হয়ে যায় বিধায়, এ স্ত্রীও খোরপোশ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

আর স্বামীর অধীনে আবদ্ধতা অবিদ্যমান হওয়া যদি স্ত্রীর কারণে না হয়– তা এভাবে যে, স্ত্রী ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম আর এমতাবস্থায় সে বন্দী হয়ে যায়, তাহলেও খোরপোশ পাবে না। কেননা, এ অপরাধ যেমন স্ত্রীর নয় তেমনিভাবে স্বামীরও নয়। তদ্রূপ স্ত্রীকে যদি কেউ বলপ্রয়োগে অপহরণ করে নিয়ে যায়, তাহলেও স্ত্রী খোরপোশ পাবে না। জাহিরে রিওয়ায়েত এটাই। কিন্তু নাওয়াদেরের বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, অপহৃত স্ত্রী তার স্বামী থেকে খোরপোশ পাবে। কেননা, এখানে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফতোয়া প্রথম মতামতের উপরই। অর্থাৎ খোরপোশ পাবে না। কেননা, আবদ্ধতা অবিদ্যমান হওয়া যেমন স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়নি, অনুরূপ স্বামীর পক্ষ থেকেও হয়নি। যদি তার পক্ষ থেকে হতো তাহলে বলা যেত যে, বাস্তবে আবদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও আবদ্ধতা আছে বলেই গণ্য করা হবে। মোটকথা, স্বামীর ঘরে আবদ্ধ না থাকা যদি স্বামীর কোনো কারণে হয়, তাহলে স্বামীর উপর খোরপোশ ওয়াজিব হবে না– চাই সেটা স্ত্রীর কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক। সুতরাং আলোচ্য অবস্থায় খোরপোশ পাবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ الخ : মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামী ব্যতীত অন্যকোনো মাহরামের সাথে হজ করার জন্য রওয়ানা হয়, তাহলে সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, এ অবস্থায় আবদ্ধতা অবিদ্যমান হওয়া স্ত্রীর কারণে হয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ অবস্থায় স্ত্রী খোরপোশ পাবে। কেননা, ফরজ হজ আদায় করা একটি ওজর। সুতরাং এ কারণে সে খোরপোশ থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে এ অবস্থায় স্বামীর উপর গৃহবাস পরিমাণ খোরপোশ ওয়াজিব হবে; সফরের পরিমাণ নয়। কেননা, আয়াত এবং হাদীসের বর্ণনার আলোকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, স্বামীর উপর গৃহে বসবাসের খোরপোশ ওয়াজিব হবে; এর অতিরিক্ত খোরপোশ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। আর সফরের অবস্থায় সব জিনিসের দামই বেশি হয়ে থাকে, সুতরাং সেই বেশি পরিমাণটা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। আর স্ত্রীর সাথে যদি স্বামীও সফর করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী খোরপোশ পাবে। কেননা, স্বামী সাথে থাকার কারণে আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে এ অবস্থায়ও গৃহে বসবাসের খোরপোশ পাবে; সফরের খোরপোশ পাবে না এবং ভাড়াও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না।

وَاِنْ مَرِضَتْ فِيْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا اِذَا كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ لِفَوَاتِ الْاِحْتِبَاسِ لِلْاِسْتِمْتَاعِ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ الْاِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَاِنَّهُ يَسْتَانِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ وَالْمَانِعُ بِعَارِضٍ مَا شِبْهُ الْحَيْضِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهَا اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِتَحَقُّقِ التَّسْلِيْمِ وَلَوْ مَرِضَتْ ثُمَّ سَلَّمَتْ لَا تَجِبُ لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ لَمْ يَصِحَّ قَالُوْا هٰذَا حَسَنٌ وَفِيْ لَفْظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ ـ

অনুবাদ : স্ত্রী যদি স্বামীর গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে। কিয়াসের দাবি এই যে, সহবাসে প্রতিবন্ধক কোনো অসুস্থতা হলে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। কেননা, সম্ভোগের জন্য আবদ্ধতা অবিদ্যমান হয়েছে। কিন্তু ইস্তিহসানের দাবি হলো, এ অবস্থায়ও আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, স্বামী তার সংস্পর্শে শান্তি লাভ করছে আর তাকে স্পর্শ করছে এবং স্ত্রী তার ঘরের হেফাজত করছে। আর প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে একটি আরোপিত বিষয়। সুতরাং তা হায়েজের সদৃশ হলো। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী নিজেকে স্বামীর অধিকারে অর্পণ করার পর যদি অসুস্থ হয়, তাহলে খোরপোশ ওয়াজিব হবে। কেননা, সমর্পণ সাব্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে অসুস্থতার পর সমর্পণ করলে খোরপোশ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সমর্পণ বিশুদ্ধ হয়নি। ফকীহগণ বলেছেন, এ মতই উত্তম। আার ইমাম কুদূরীর ব্যবহৃত স্বামীগৃহে অসুস্থ হওয়া শব্দে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ مَرِضَتْ فِيْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ الخ : মাসআলা : স্ত্রী যদি স্বামীর গৃহে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে এ অবস্থায়ও সে খোরপোশ প্রাপ্য হবে। অসুস্থতার কারণে সে সহবাসের যোগ্য থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যুক্তির দাবি হলো, যদি অসুস্থতার কারণে সহবাসের যোগ্য না থাকে, তাহলে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। কেননা, সহবাসের জন্য স্ত্রীকে স্বামীর নিকট আবদ্ধ রাখার বিষয়টি পাওয়া যায় না। আর খোরপোশ আবশ্যক হওয়া যেহেতু ঐ আবদ্ধতার কারণেই হয়ে থাকে বিধায় খোরপোশ পাবে না।

আর ইস্তিহসানের দাবি হলো, এ অবস্থায়ও খোরপোশ প্রাপ্য হবে। কেননা, আবদ্ধতা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। এ অবস্থায় সহবাস করতে না পারলেও পাশে থাকার আনন্দ, স্পর্শ করার প্রশান্তি উপভোগ করতে পারছে এবং তার উপস্থিতি দ্বারা স্বামীর ঘর সংরক্ষিত হচ্ছে, সুতরাং খোরপোশ প্রাপ্য হবে। তবে সহবাস করতে না পারায় এটা সাময়িক এবং আরোপিত বিষয়। যেমন হায়েজের ব্যাপারে হয়ে থাকে। হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য হয়।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهَا اِذَا سَلَّمَتْ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি স্ত্রী নিজেকে স্বামীর গৃহে অর্পণ করার পর অসুস্থ হয় তাহলে খোরপোশ পাবে, অন্যথায় পাবে না। আমাদের মাশায়েখে কেরাম ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ ব্যাপারটি পছন্দ করেছেন এবং ইমাম কুদূরীর কথার মাঝেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

তবে এখানে বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে দেখার দাবিদার। তা হচ্ছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্ত ব্যাখ্যা এবং যারা এটা পছন্দ করেছেন সবাই এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরে নিজেকে সমর্পণ করে তাহলে খোরপোশ পাবে; অন্যথায় পাবে না। অথচ আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, এ কথাটি হানাফী মাযহাবের জাহিরে রিওয়ায়েতও নয় আবার ফতোয়াও এর উপর নয়; বরং জাহিরে রিওয়ায়েত হলো, বিবাহ-কার্য বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর স্ত্রী থেকে যদি অন্যায়মূলক অবাধ্যতা পাওয়া না যায়, তাহলেই সে খোরপোশ প্রাপ্য হবে; স্বামীর ঘরে সমর্পণ করা জরুরি নয়। সুতরাং গ্রহণযোগ্য কথা হলো, অসুস্থ অবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য হবে, যদি তার দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য তথা আনন্দ উপভোগ করা, প্রশান্তি লাভ করা ইত্যাদি পূরণ হয়। ইমাম শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানী (র.) বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, স্ত্রীর অসুস্থ হওয়ার কারণে যদি তার থেকে স্বামী কোনো ধরনের উপভোগ হাসেল করতে না পারে, তাহলে স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য হবে না, আর যদি কোনো এক ধরনের উপভোগ হাসিল করতে পারে, তাহলে খোরপোশ প্রাপ্য হবে। অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে খোলাসা এবং আল-জামিউল কাবীর নামক গ্রন্থে। -[ফাতহুল কাদীর : খ. ৪; পৃ. ১৯৯]

قَالَ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا وَالْمُرَادُ بِهٰذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ وَلِهٰذَا ذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا وَ وَجْهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا مِنْ تَمَامِهَا إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বামী যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার উপর স্ত্রীর খরচ এবং তার চাকরের খরচ ধার্য করা হবে। এখানে অবশ্য চাকরের খরচ বর্ণনাই উদ্দেশ্য। এ কারণে কোনো কোনো ভাষ্যে শুধু এতটুকু আছে যে, স্বামী সচ্ছল হলে স্ত্রীর চাকরের খরচ তাকে দিতে হবে। কারণ এই যে, স্ত্রীর পর্যাপ্ত খরচ প্রদান করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য, আর এর দ্বারাই পর্যাপ্ততার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেননা, একজন চাকর থাকা স্ত্রীর জন্য জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ الخ : মাসআলা : স্বামী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে তার উপর স্ত্রী এবং স্ত্রীর চাকরের খরচ দেওয়া আবশ্যক। এ মাসআলায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো চাকরের খরচ দেওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা। কেননা, স্ত্রীর খরচ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো নুসখায় শুধু চাকরের বিষয়টিই উল্লেখ রয়েছে; স্ত্রীর খরচের বিষয়টি এ মাসআলায় উল্লেখ নেই।

চাকরের খরচ দেওয়া স্বামীর উপর আবশ্যক হওয়ার কারণ এই যে, মৌলিকভাবে স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর উপর আবশ্যক হলো, স্ত্রীর প্রয়োজনসাপেক্ষ বিষয়াদির ব্যবস্থা করা। আর স্ত্রীর সমূহ প্রয়োজনের মাঝে চাকর থাকাও একটি প্রয়োজন বিধায়, চাকরের খরচ দেওয়াও স্বামীর উপর আবশ্যক হবে– চাকর দাস হোক বা দাসী হোক।

প্রশ্ন : কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি কোনো চাকর না থাকে, তাহলে স্ত্রীকে ঘরের কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য করা যাবে কিনা?

উত্তর : এর উত্তর হলো, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কাজ করতে রাজি না হয় বরং অস্বীকার করে তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো নিজেকে স্বামীর উপভোগের জন্য সমর্পণ করা। অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু চাকরের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ চাকর যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে খোরপোশ পাবে না।

আলোচ্য মাসআলায় চাকরের খরচের সাথে স্ত্রীর খোরপোশের বিষয়কে পুনরায় উল্লেখ করার মাঝে এ একটি ফায়দাও পরিলক্ষিত হয় যে, ইতঃপূর্বে স্ত্রীর খোরপোশ আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তা না দেয় তাহলে কাজি নির্দিষ্ট হারের খোরপোশ ধার্য করে দেবেন কিনা? তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। গ্রন্থকার (র.) এখানে সেই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলে দিলেন যে, কাজি বা বিচারক নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোশ স্ত্রী এবং চাকরের জন্য ধার্য করে দিবেন। পরিমাণ ধার্য করার ক্ষেত্রে বিচারককে লক্ষ্য রাখতে হবে স্বামীর অবস্থার প্রতি। অর্থাৎ, স্বামী যদি খেটে খাওয়া লোক হয়, তাহলে দৈনিক পরিমাণ টাকা ধার্য করে দেবেন। স্বামী প্রত্যেক দিন বিকাল বেলায়ই পরের দিনের খরচ দিয়ে দেবে। কেননা, এক মাসের খরচ একসাথে দেওয়া ঐ স্বামীর জন্য সম্ভব নয়। আর স্বামী যদি ব্যবসায়ী হয়, তাহলে মাস হিসেবে ধার্য করে দেবেন। কৃষক হলে মৌসুম হিসেবে বাৎসরিক খরচ ধার্য করবেন, আর স্বামী যদি সপ্তাহ হিসেবে চাকরিরত হয়, তাহলে সপ্তাহ হিসেবে খোরপোশ ধার্য করবেন। –[ফাতহুল কাদীর]

وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) تُفْرَضُ لِخَادِمَيْنِ لِاَنَّهَا تَحْتَاجُ اِلٰى اَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَاِلَى الْاٰخَرِ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ وَلَهُمَا اَنَّ الْوَاحِدَ يَقُوْمُ بِالْاَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَى اِثْنَيْنِ وَلِاَنَّهُ لَوْ تَوَلّٰى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهٖ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا اِذَا قَامَ الْوَاحِدُ مَقَامَ نَفْسِهٖ وَقَالُوْا اِنَّ الزَّوْجَ الْمُوْسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ اِمْرَأَتِهٖ وَهُوَ اَدْنَى الْكِفَايَةِ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ اِذَا كَانَ مُوْسِرًا اِشَارَةٌ اَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ اِعْسَارِهٖ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ الْاَصَحُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ (رحـ) لِاَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ اَدْنَى الْكِفَايَةِ وَهِىَ قَدْ تَكْتَفِىْ بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا ۔

অনুবাদ : অবশ্য একজনের অধিক চাকরের খরচ ধার্য করা হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দুজন চাকরের খরচ ধার্য করা হবে। কেননা, ঘরের ভিতরের কাজ-কর্মের জন্য একজন এবং বাইরের কাজ-কর্মের জন্য আরেকজন প্রয়োজন। আর তরফাইনের বক্তব্য হলো, একজন উভয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুতরাং দুজনের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, চাকরের খরচ প্রদানের পরিবর্তে স্বামী নিজে যদি তার প্রয়োজন সেরে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে। সুতরাং একজনকেই তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়াও যথেষ্ট হবে। ফকীহগণ বলেছেন যে, সচ্ছল স্বামীর উপর চাকরের খরচ ঐ পরিমাণ আবশ্যক হবে, যা অসচ্ছল ব্যক্তির উপর স্ত্রীর খোরপোশ হিসেবে আবশ্যক হয়। আর সেটা হলো নিম্নতম পর্যাপ্ত পরিমাণ। কুদূরীতে উল্লিখিত 'যদি সচ্ছল হয়' বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্বামীর অসচ্ছলতার সময় চাকরের খরচ তার উপর ওয়াজিব হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান (র.)-এর বর্ণনা। আর এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতামত থেকে ভিন্ন। কেননা, অসচ্ছল স্বামীর উপর ওয়াজিব পর্যাপ্ততার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর কখনো স্ত্রী তার কাজ-কর্মের ব্যাপারে নিজেই যথেষ্ট হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ الخ - **স্ত্রীর এক চাকরের খরচ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব :** সন্তানের সংখ্যা অনেক বিধায় তাদের সেবা করা ও ঘরের কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেওয়া যদি স্ত্রীর জন্য সম্ভব না হয় তাহলে এ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে চাকরের ব্যবস্থা করা এবং চাকরের খরচ বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। আর যদি এমনটি না হয় তবে স্বামী সচ্ছল হলে সে অবস্থায় কতজন চাকরের খরচ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় সচ্ছল স্বামীর উপর একজন চাকরের খরচ প্রদান করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দুজন চাকরের খরচ প্রদান করা ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রমাণ হলো, স্ত্রীর দুজন চাকর প্রয়োজন : একজন তার ঘরের কাজ-কর্ম সম্পাদন করবে, আর অপরজন ঘরের বাইরের কাজ আঞ্জাম দেবে বিধায়, দুই চাকরের খরচ স্বামীর উপর ধার্য করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে আরেকটি অভিমত এমন রয়েছে যে, যদি স্ত্রী অনেক সম্পদশালী হয়, যার সাথে পিতার বাড়ি থেকে অনেক চাকর এসেছে খেদমতের জন্য, তাহলে সব চাকরের খরচ বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম (র.) এমন একটি মত বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তাহাবী (র.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

তরফাইনের দলিল : এক চাকরই ঘরের ভিতর ও বাহিরের কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। সুতরাং দুই চাকরের কোনো প্রয়োজন নেই। আরেকটি প্রমাণ হলো– যদি স্বামী নিজেই স্ত্রীর প্রয়োজন সেরে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে যথেষ্ট হয়ে যায়, চাকরের আর প্রয়োজন হয় না। অনুরূপ স্বামী নিজের পরিবর্তে একজন চাকর ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে তাই যথেষ্ট হবে।

চাকরের খরচের পরিমাণের ব্যাপারে মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, সচ্ছল স্বামী তার স্ত্রীর চাকরের খরচ এতটুকু পরিমাণ প্রদান করবে যতটুকু অসচ্ছল স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ, নিম্নতম পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদান করবে।

قَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) إِذَا كَانَ مُوْسِرًا "যদি স্বামী সচ্ছল হয়"-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি স্বামী অসচ্ছল হয়, তাহলে স্বামীর উপর চাকরের নাফকা-খোরপোশ দেওয়া আবশ্যক হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা।

আর এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, স্বামী যদি অসচ্ছল হয় আর এমতাবস্থায় তার স্ত্রীর চাকর থাকে, তাহলে চাকরের খরচ প্রদান করতে হবে, আর যদি স্ত্রীর চাকর না থাকে, তাহলে খরচ দিতে হবে না।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনার প্রমাণ এই যে, অসচ্ছল ব্যক্তির উপর নিম্নমানের খরচ ওয়াজিব হয়। আর স্ত্রী নিজেই নিজের কাজকর্ম করে নেয়। সুতরাং চাকরের খরচ স্বামীর উপর ধার্য করা হবে না।

তবে এসব আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, শুধু স্বামীর অবস্থার উপর মাসআলা বলা হচ্ছে, অথচ পূর্বে বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা হবে। সেই হিসেবে অসচ্ছল স্বামীর উপর স্ত্রীর খরচ প্রদান করা আবশ্যক, আর চাকরের খরচ ঋণ হিসেবে বাকি থাকবে, সচ্ছলতা ফিরে আসলে তা আদায় করে দেওয়া হবে। আর চাকর না থাকলে খরচের বিষয়টি আসবে না। কেননা, চাকর না থাকায় বুঝা যাচ্ছে যে, চাকরের প্রয়োজন নেই। তাহলে এ বিষয়টি কাজি এবং বিচারকের ন্যায় হয়ে গেল। অর্থাৎ, যদি বিচারকের চাকর থাকে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে তাঁর চাকরের খরচ প্রদান করা হবে। আর চাকর না থাকলে খরচ প্রদান করা হবে না। -[ফাতহুল কাদীর]

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য মাসআলায় সচ্ছলতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর এতটুকু সম্পদ থাকা যার দ্বারা সদকা গ্রহণ করাটা হারাম হয়ে যায়। এতটুকু হওয়া জরুরি নয় যার দ্বারা তার উপর জাকাত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায়।

স্ত্রী এবং চাকরের খোরপোশের মাঝে ব্যবধান আছে। তবে এ ব্যবধান রুটি বা ভাতের মাঝে হবে না; বরং সালন ও তরকারির মাঝে ব্যবধান হবে।

وَمَنْ اَعْسَرَ بِنَفَقَةِ اِمْرَأَتِهٖ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ لَهَا اِسْتَدِيْنِىْ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُفَرَّقُ لِاَنَّهٗ عَجَزَ عَنِ الْاِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوْفِ فَيَنُوْبُ الْقَاضِىْ مَنَابَهٗ فِى التَّفْرِيْقِ كَمَا فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ بَلْ اَوْلٰى لِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلَى النَّفَقَةِ اَقْوٰى وَلَنَا اَنَّ حَقَّهٗ يَبْطُلُ وَحَقُّهَا يَتَاَخَّرُ وَالْاَوَّلُ اَقْوٰى فِى الضَّرَرِ وَهٰذَا لِاَنَّ النَّفَقَةَ تَصِيْرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِىْ فَتَسْتَوْفِىْ فِى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَفَوْتُ الْمَالِ وَهُوَ تَابِعٌ فِى النِّكَاحِ لَا يُلْحَقُ بِمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَهُوَ التَّنَاسُلُ وَفَائِدَةُ الْاَمْرِ بِالْاِسْتِدَانَةِ مَعَ الْفَرْضِ اَنْ يُمْكِنَهَا اِحَالَةُ الْغَرِيْمِ عَلَى الزَّوْجِ فَاَمَّا اِذَا كَانَتِ الْاِسْتِدَانَةُ بِغَيْرِ اَمْرِ الْقَاضِىْ كَانَتِ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ ـ

অনুবাদ : কেউ তার স্ত্রীর খোরপোশ চালাতে অসমর্থ হয়ে পড়লে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করা হবে না; বরং [কাজি - বিচারকের পক্ষ হতে] স্ত্রীকে বলা হবে, তার নামে ঋণ করে চালাতে থাক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করা হবে। কেননা, স্বামী সদাচারের সাথে তাকে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সুতরাং কাজি বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্বামীর স্থলবর্তী হবেন, যেমন কর্তিতলিঙ্গ ও পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; বরং এ ক্ষেত্রে তা আরো জরুরি। কেননা, খোরপোশের প্রয়োজন অধিক জরুরি। আমাদের দলিল হলো, বিচ্ছেদ দ্বারা স্বামীর হক বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর হক বিলম্বিত হবে। আর ক্ষতির দিক থেকে প্রথমটি অধিক গুরুতর। এটা এজন্য যে, খোরপোশ তো কাজির নির্ধারণের কারণে [স্বামীর জিম্মায়] ফরজ হয়ে থাকবে। সুতরাং পরবর্তীতে তা পরিশোধ করা যেতে পারে। আর অর্থ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে যা বিবাহের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বিষয় বিবাহের মূল উদ্দেশ্য বংশ বিস্তারে [অক্ষমতার] সাথে যুক্ত করা যাবে না। আর কাজির পক্ষ থেকে নির্ধারণের পর ঋণ করার আদেশ দানের সার্থকতা এই যে, পাওনাদারকে স্বামীর হাওয়ালা করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহণ যদি কাজির নির্দেশ ছাড়া হয়, তাহলে তাগাদার অধিকার স্ত্রীর কাছে হবে, স্বামীর কাছে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ اَعْسَرَ بِنَفَقَةِ اِمْرَأَتِهٖ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا الخ - **স্বামী যদি স্ত্রীর খোরপোশ দিতে অক্ষম হয়ে যায় :** স্বামী যদি উপস্থিত থাকা অবস্থায় স্ত্রীর খোরপোশ দিতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় কাজির করণীয় কি, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম যুহরী (র.), আতা ইবন ইয়াসির (র.), হাসান বসরী (র.), সুফিয়ান ছাওরী (র.), ইবনে আবী লায়লা (র.), ইবনে শুবরমা (র.) এবং হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, খোরপোশ দিতে অক্ষম হলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে না; বরং কাজি স্ত্রীকে বলবে যে, স্বামীর নামে ঋণ করে চলতে থাক। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পণ্য এ শর্তে ক্রয় করবে যে, এর মূল্য তার স্বামী পরিশোধ করবে অথবা স্বামী সচ্ছল হলে তার মূল্য পরিশোধ করা হবে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বন্ধনকে ছিন্ন করে দেওয়া হবে। ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। এমনিভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর কাপড় এবং বাসস্থান দিতে না পারে তাহলেও বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে এবং এ বিচ্ছেদকে ফসখে নিকাহ বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) উক্ত বিচ্ছেদকে তালাক বলে গণ্য করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খোরপোশ দিতে না পারার কারণে স্বামী সদাচরণ করতে অক্ষম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হলো تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ - 'সদয়ভাবে ছেড়ে দেওয়া।' আর স্বামী যেহেতু ছেড়ে দেয়নি বিধায় কাজি সদয়ভাবে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছেদ করে দেবেন; যেমন করা হয় কর্তিতলিঙ্গ অথবা পুরুষত্বহীন স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছেদ না করলে। অর্থাৎ কাজি বিচ্ছেদ করে দেন। খোরপোশ না দিতে পারলে বিচ্ছেদ করে দেওয়াটা ঐ তুলনায় আরো বেশি যুক্তিসম্মত। কেননা, সঙ্গম করার থেকেও বেশি প্রয়োজন হলো খোরপোশের। দীর্ঘদিন খোরপোশ না থাকলে মারা যাবে; সঙ্গম না হলে মারা যাবে না। মোটকথা ইমাম শাফেয়ী (র.) খোরপোশ দিতে অক্ষম হওয়াকে তুলনা করেছেন কর্তিতলিঙ্গ বা পুরুষত্বহীন স্বামীর সাথে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসও দলিল। তা হলো–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُوْلُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِيْ أَوْ طَلِّقْنِيْ :

হযরত রাসূল ﷺ বলেন, মহিলা তার স্বামীকে বলবে– হয় আমাকে খোরপোশ দাও, অথবা তালাক দাও।"

আর হযরত আবুয যানাদ বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর খোরপোশ দিতে অক্ষম হয়, তাহলে কি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে? তখন হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলেন, হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি সুন্নত? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আর স্বাভাবিকভাবে সুন্নত বলতে যেহেতু রাসূলের সুন্নতকেই বুঝায় বিধায় এখানে তা-ই হবে। এর উত্তরে সর্বোচ্চ এ কথা বলা যায় যে, এটা তার মারাসিলের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) মারাসিলকে হুজ্জত মনে করেন।

* আমাদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ উক্ত আয়াত এভাবে দলিল হচ্ছে যে, খোরপোশটা প্রকারান্তরে স্বামীর জন্য ঋণের মতো; অথচ স্বামী হয়েছে অসচ্ছল। আর কুরআনের বিধান হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়ে যায়, তাহলে ঋণদাতা তাকে সুযোগ দেবে। সুতরাং বুঝা গেল, স্বামী অসচ্ছল হলে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে না, বরং স্ত্রী তাকে সুযোগ দেবে। আর যৌক্তিক প্রমাণ হলো, যদি বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাহলে স্বামীর হক পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর বিচ্ছেদ না করলে স্ত্রীর হক বিলম্বিত হয়। কেননা, যখন কাজি খোরপোশ ধার্য করে দিয়েছেন তাই এটা স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। স্ত্রী ভবিষ্যতে তা উসূল করে নেবে। এমতাবস্থায় স্বামীর হকের দিকেই লক্ষ্য করা হবে। কেননা, স্ত্রীর তুলনায় তার ক্ষতি বেশি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াকে কর্তিতলিঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতার সাথে তুলনা করেছেন– তার উত্তর হলো এই যে, অসচ্ছল স্বামীর খোরপোশ দিতে না পারাকে কর্তিতলিঙ্গ বা পুরুষত্বহীন স্বামীর সাথে তুলনা করাটা ঠিক নয়। এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান রয়েছে, যা কিয়াসের পরিপন্থি। কেননা, যে ব্যক্তি খোরপোশ দিতে অক্ষম সে শুধু সম্পদ দিতে অক্ষম হলো যা বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক বিষয় নয়; বরং প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর যে ব্যক্তি সঙ্গম করতে অক্ষম সে বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য বংশ-বৃদ্ধি করতেই অক্ষম। সুতরাং মৌলিক বিষয়ে অক্ষম হওয়ার কারণে কাজি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ায় আবশ্যক হয় না যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অক্ষম হলেও বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

বাকি এ বিষয়টা জেনে রাখতে হবে যে, কাজি কর্তৃক অনুমতি পাওয়ার পর স্বামীর নামে স্ত্রী ঋণ করলেই স্বামী তা আদায় করতে আইনগত বাধ্য থাকবে; স্ত্রীর নিকট ঐ ঋণ পরিশোধ করতে চাপ দেওয়া যাবে না। আর কাজির অনুমতি ছাড়াই যদি স্ত্রী ঋণ করে চলতে থাকে, তাহলে স্বামী আইনগত ঐ ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে না।

وَإِذَا قَضَى الْقَاضِيْ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوسِرِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَمَا قَضَى بِهِ تَقْدِيْرٌ لِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبْ فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُهُ لَهَا الْمُطَابَقَةُ بِتَمَامِ حَقِّهَا وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذٰلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْقَاضِيْ فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجَ عَلٰى مِقْدَارِ نَفَقَتِهَا فَيُقْضٰى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضٰى لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَلَيْسَتْ بِعِوَضٍ عِنْدَنَا عَلٰى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَسْتَحْكِمُ الْوُجُوْبُ فِيْهَا إِلَّا بِقَضَاءٍ كَالْهِبَةِ لَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا بِمُؤَكِّدٍ وَهُوَ الْقَبْضُ وَالصُّلْحُ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلٰى نَفْسِهِ أَقْوٰى مِنْ وِلَايَةِ الْقَاضِيْ بِخِلَافِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ.

অনুবাদ : কাজি যদি স্ত্রীর জন্য অসচ্ছল অবস্থার খোরপোশ নির্ধারণ করে দেয় অতঃপর স্বামী সচ্ছল হয়ে যায়, আর স্ত্রী দাবি উত্থাপন করে তাহলে কাজি সচ্ছল ব্যক্তির অনুপাতে খোরপোশ পূর্ণ করে দিবেন। কেননা, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা হিসেবে খোরপোশের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর ইতঃপূর্বে যে ফয়সালা করা হয়েছিল, তা ছিল এমন খোরপোশ নির্ধারণ, যা বর্তমানের জন্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং স্বামীর অবস্থা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সে আপন হক পূর্ণ করার দাবি জানাতে পারে। আর যদি কিছুকাল এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, এর মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়নি এবং এরপর স্ত্রী তা দাবি করে, তাহলে কোনো কিছু তার প্রাপ্য হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কাজি স্ত্রীর জন্য খোরপোশ নির্ধারণ করে থাকেন। কিংবা যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে খোরপোশের একটি পরিমাণের সম্পর্কে সমঝোতা করে থাকে তবে কাজি স্ত্রীকে বিগত সময়ের খোরপোশ আদায়ের নির্দেশ দিবেন। কেননা, আমাদের মতে খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্য দান, বিনিময় নয়। যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং আদালতের ফয়সালা ব্যতীত তা ওয়াজিব হওয়া দৃঢ় হবে না। যেমন– হেবা সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছাড়া মালিকানা সাবেত করে না। আর তা হলো কব্জা হাসিল হওয়া আর সমঝোতা আদালতের ফয়সালার সমতুল্য। কেননা, স্বামীর নিজের উপর নিজের অধিকার কাজির অভিভাবকত্বের চেয়ে শক্তিশালী। মহরানার বিষয়টি ভিন্ন। [সেটা সর্বাবস্থায় অবশ্য আদায়যোগ্য]। কেননা, সেটা হচ্ছে [সম্ভোগ-অঙ্গের] বিনিময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِيْ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ الخ **-স্বামীর অবস্থা সচ্ছল হলে খোরপোশের পরিমাণও পরিবর্তন হবে :** অবস্থার উপর ভিত্তি করে যদি কাজি স্বামীর উপর অসচ্ছলতার খোরপোশ ধার্য করে দেয় অতঃপর স্বামীর অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে সচ্ছল হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী কাজির নিকট সচ্ছলতার খোরপোশের দাবি করে, তাহলে কাজি সচ্ছলতার খোরপোশের ফয়সালা করে দেবেন

এর প্রমাণ এই যে, মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে, আর পূর্ণ জীবনের খোরপোশ একবারই ওয়াজিব হয় না; বরং ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হতে থাকে। সুতরাং অবস্থা হিসেবে তা পরিবর্তন হতে থাকবে।

প্রশ্ন : তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এতে করে তো কাজির পূর্ব ফয়সালা বাতিল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উত্তর : তার উত্তর হলো, কাজি যে ফয়সালা করেছেন তা এখানে ওয়াজিব হয়নি। কেননা, প্রত্যেক দিনের খোরপোশ ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হয়। আর যে বস্তু ওয়াজিব হয়নি তার পরিমাণও ওয়াজিব হয় না। কেননা, তা যে কারণে ওয়াজিব হয় তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং কাজির নির্ধারিত পরিমাণ যখন আবশ্যকই হয়নি বিধায় তাঁর ফয়সালা দৃঢ় ও মজবুত না হওয়া অবস্থায় ঐ ফয়সালা পরিবর্তন হওয়াকে বাতিল বলা হয় না। মোটকথা, স্বামীর অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার কারণে স্ত্রী অধিক পরিমাণ খোরপোশ তলব করার দাবি রাখবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ الخ - বিগত সময়ের খোরপোশ পাওয়ার বিষয় : যদি কিছুকাল এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে খোরপোশ প্রদান করেনি। এখন স্ত্রী যদি বিগত খরচাদি স্বামীর নিকট চায়, তাহলে আমাদের মতে বিগত সময়ের খরচ দেওয়া স্বামীর উপর আবশ্যক নয়। কেননা, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামীর উপর তা ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। যেহেতু ঋণ হিসেবে স্বামীর উপর তা আবশ্যক হয়নি বিধায় কাজি অতীত দিনগুলোর খরচ স্বামীর উপর ধার্য করবেন না। তবে দুই অবস্থায় অতীত দিনগুলোর খরচ ধার্য করে দেবেন। তা হচ্ছে– ১. পূর্বেই কাজি স্বামীর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোশ ধার্য করে দিয়েছিলেন। ২. পূর্বে স্বামী-স্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিমাণ ধার্য করেছিল। এ দুই অবস্থায় যদি কিছুদিন খোরপোশ না দিয়ে থাকে আর স্ত্রী কাজির নিকট ঐ বিগত খরচ কামনা করে, তাহলে কাজি তা স্বামীর উপর চাপিয়ে দেবেন।

দলিল হলো এই যে, খোরপোশ প্রদান করা হলো স্বামীর পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলক দান; তা কোনো কিছুর বিনিময় নয়। সুতরাং খোরপোশের হুকুমটি দৃঢ় হবে না, তবে যদি কাজি ধার্য করে দেয় তাহলে দৃঢ় হবে। যেমন হাদিয়া ও উপঢৌকনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিকানা দৃঢ় হয় তা গ্রহণ ও হস্তগত হওয়ার দ্বারা। এমনিভাবে খোরপোশের বিধানটিও কাজির ফয়সালার দ্বারা দৃঢ় হয়। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী চুক্তির মাধ্যমে ধার্য করার দ্বারাও তা দৃঢ় হয়ে যায়। কেননা, কাজি স্বামীর উপর যতটুকু কর্তৃত্ব রাখে স্বামী নিজে নিজের উপর আরো বেশি কর্তৃত্ব রাখে, বিধায় কাজি ধার্য করার দ্বারা যদি আবশ্যক ও দৃঢ় হয়, তাহলে স্বামী ধার্য করার দ্বারাও দৃঢ় হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ الخ : মহরের বিষয়টি খোরপোশ থেকে ভিন্ন। কেননা, মহর আবশ্যক হওয়ার জন্য কাজির ফয়সালার প্রয়োজন হয় না। তার ফয়সালা করা ছাড়াই স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ হলো, মহর স্বামীর পক্ষ থেকে সৌজন্য দান নয়; বরং তা হলো বিশেষ এক অঙ্গের বিনিময়।

وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِىَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَى شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَكَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) تَصِيرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عِنْدَهُ فَصَارَ كَسَائِرِ الدُّيُوْنِ وَجَوَابُهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : খোরপোশ সম্পর্কে স্বামীর প্রতি আদালতের ফয়সালার পর যদি স্বামী মারা যায় এবং কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ হুকুম হলো স্ত্রী যদি মারা যায়। কেননা, খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্য দান। আর সৌজন্য বস্তু মৃত্যুর কারণে রহিত হয়ে যায়। কেননা, হস্তগত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু হলে হেবা বাতিল হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আদালতের ফয়সালার পূর্বেও উক্ত খোরপোশ ঋণ হিসেবে থেকে যাবে এবং মৃত্যুর কারণে তা রহিত হবে না। কেননা, তাঁর মতে এটা হচ্ছে বিনিময়। সুতরাং এটা অন্য সকল ঋণের মতো হবে। এর উত্তর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِىَ عَلَيْهِ الخ - খোরপোশ ধার্য করার পর স্বামী মারা গেলে : স্বামীর উপর যদি খোরপোশ ধার্য করে দেওয়া হয়, কিন্তু স্বামী তা না দিলে তার নামে ঋণ করার নির্দেশ কাজি না দেওয়া অবস্থায় যদি কয়েক মাস খোরপোশ না দিয়ে স্বামী মারা যায়, তাহলে বিগত দিনের খরচের আবশ্যকতা স্বামী থেকে রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহলেও স্বামীর উপর বিগত দিনগুলোর খোরপোশ দেওয়া রহিত হয়ে যাবে।

দলিল হলো এই যে, খোরপোশ হলো সৌজন্যমূলক দান। আর এ ধরনের দান মৃত্যুর দ্বারা রহিত হয়ে যায়। যেমনটি হয়ে থাকে হেবার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি খালিদকে কোনো বস্তু হেবা করল এমতাবস্থায় খালিদ ঐ বস্তুটি গ্রহণ করার আগেই ঐ ব্যক্তি যদি মারা যায় অথবা খালেদ মারা যায় তাহলে ঐ হেবাটি বাতিল হয়ে যায়। এখানেও কাজি খোরপোশ ধার্য করে দেওয়ার পর স্ত্রী তা গ্রহণ করার আগেই স্বামী মারা গেল বা স্ত্রী মারা গেল, তাহলে ঐ খোরপোশ-খরচ রহিত হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাজির ফয়সালা ছাড়াই স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয়ে যায়। যেহেতু ঋণ হিসেবে আবশ্যক হচ্ছে বিধায় স্বামী মারা যাওয়ার দ্বারা তা রহিত হবে না, যেমন অন্যান্য ঋণ রহিত হয় না; বরং স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে স্ত্রী তার খোরপোশ গ্রহণ করবে। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট খোরপোশ হলো স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের বিনিময়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমরা পূর্বেই উক্ত কথার উত্তর দিয়ে এসেছি যে, মহর হলো বিশেষ অঙ্গের বিনিময় আর একটি বস্তুর বিনিময় দুই বস্তু হতে পারে না, সুতরাং বিশেষ বিনিময় হিসেবে খোরপোশকে সাব্যস্ত করা যাবে না।

স্ত্রী খোরপোশ মাফ করে দিতে পারে কিনা : স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে, আপনার উপর যে পরিমাণ খোরপোশ আমাকে দেওয়া ওয়াজিব, তা আমি মাফ করে দিলাম, তাহলে এর দ্বারা তা রহিত হবে কিনা, এ ব্যাপারে মাসআলা হলো, যদি ইতঃপূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোরপোশ ধার্য করা না থাকে, তাহলে তা রহিত হবে না। কেননা, এ অবস্থায় ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে রহিত করা হচ্ছে, আর এটা সহীহ নয়। তবে যদি কাজি মাস হিসেবে খোরপোশ ধার্য করে দিয়ে থাকেন, তাহলে স্ত্রীর কথার দ্বারা শুধু প্রথম মাসের খরচটি রহিত হবে। এমনিভাবে যদি স্ত্রী বলে যে, আমি এক বৎসরের খরচ মাফ করে দিলাম, তাহলে দেখতে হবে যে, কাজি বাৎসরিক হিসেবে খোরপোশ ধার্য করেছে কিনা? যদি তা করে থাকে, তাহলে স্ত্রীর উক্ত কথার দ্বারা শুধু প্রথম বৎসরের খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কাজি ধার্য না করে থাকেন, তাহলে স্ত্রীর উক্ত কথার দ্বারা তা রহিত হবে না।

-[ফাতহুল কাদীর]

وَإِنْ اَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ اَىْ عَجَّلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهَا بِشَىْءٍ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَضٰى وَمَا بَقِىَ لِلزَّوْجِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اَلْكِسْوَةُ لِاَنَّهَا اِسْتَعْجَلَتْ عِوَضًا عَمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ بِالْاِحْتِبَاسِ وَقَدْ بَطَلَ الْاِسْتِحْقَاقُ بِالْمَوْتِ فَيَبْطُلُ الْعِوَضُ بِقَدْرِهِ كَرِزْقِ الْقَاضِىْ وَعَطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ وَلَهُمَا اَنَّهُ صِلَةٌ وَقَدْ اِتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَا رُجُوْعَ فِى الصِّلَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِاِنْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا فِى الْهِبَةِ وَلِهٰذَا لَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍ لَا يُسْتَرَدُّ شَىْءٌ مِنْهَا بِالْاِجْمَاعِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهَا اِذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الشَّهْرِ اَوْ مَا دُوْنَهُ لَا يُسْتَرْجَعُ مِنْهَا بِشَىْءٍ لِاَنَّهُ يَسِيْرٌ فَصَارَ فِىْ حُكْمِ الْحَالِ .

অনুবাদ : আর যদি স্বামী এক বছরের খোরপোশ অগ্রীম প্রদান করে থাকে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে স্ত্রীর নিকট হতে কিছুই ফেরত নেওয়া যাবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার জন্য বিগত সময়ের খোরপোশ হিসাব করা হবে, আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা স্বামীর প্রাপ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই অভিমত। আর পোশাকের ব্যাপারেও এ মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা, আবদ্ধতার কারণে স্বামীর নিকট যে বিনিময় স্ত্রীর প্রাপ্য হয় স্ত্রী তা আগাম নিয়ে নিয়েছেন। আর মৃত্যুর দ্বারা আবদ্ধ থাকার বিষয়টি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বিনিময়ও সেই পরিমাণ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– কাজি ও মুজাহিদদের অগ্রিম গৃহীত ভাতা। শায়খাইনের দলিল এই যে, এ হচ্ছে সৌজন্য দান এবং তার সাথে কব্জ যুক্ত হয়েছে, আর সৌজন্য দান মৃত্যুর পর ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, তার লেনদেন শেষ হয়ে গেছে; যেমন হেবার ক্ষেত্রে হয়। এ কারণেই স্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবেনষ্ট করা ছাড়া নিজে নিজে যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই কোনো কিছু তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি স্ত্রী এক মাসের কিংবা তার কম সময়ের খোরপোশ কব্জ করে থাকে, তাহলে কোনো কিছু ফেরত নেওয়া হবে না। কেননা, এটা অতি অল্প সময়, সুতরাং বর্তমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ الخ - স্ত্রীকে দেওয়া অতিরিক্ত খোরপোশ ফেরত নেওয়া সম্পর্কে : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে অগ্রীম এক বৎসরের খোরপোশ দিয়ে দেয়। অতঃপর ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি স্বামী মারা যায় অথবা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলা থেকে অথবা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অতিরিক্ত অগ্রীম পয়সা ফেরত নেওয়া হবে না। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উক্ত মত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অগ্রীম দেওয়ার পর স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় যতদিন অতিবাহিত হয়েছে হিসাব করে ততদিনের খরচ রেখে বাকি টাকা ফেরত দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও এ ধরনের মতামত পেশ করেছেন। তদ্রূপ দ্বিমত রয়েছে স্ত্রীকে দেওয়া পোশাকের ক্ষেত্রেও।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : স্ত্রী স্বামীর অধীনে নিজেকে আবদ্ধ রাখার কারণে স্বামী থেকে খোরপোশ প্রাপ্য হয়। কিন্তু স্বামী/স্ত্রী মারা গেলে আবদ্ধ রাখা বা থাকার বিষয়টা বিদ্যমান থাকে না, বিধায় যার বিনিময়ে টাকা দিয়েছিল তা বাতিল হওয়ার কারণে অতিরিক্ত টাকা প্রাপ্য হওয়াটাও বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– বিচারক বায়তুল মাল থেকে অগ্রীম বেতন গ্রহণ করার পর সময় পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে বাকি দিনগুলোর বেতন হিসাব করে কাজির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়। এমনিভাবে মুজাহিদের ব্যাপারে যে বিধান রয়েছে যে, অগ্রীম বেতন নেওয়ার পর সময় পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে হিসাব করে বাকি টাকা ফেরত নেওয়া হয়।

শায়খাইনের দলিল হলো : তাঁদের দলিল হচ্ছে খোরপোশটা হলো স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে সৌজন্যমূলক দান। আর সেই দানটা স্ত্রীর হস্তগতও হয়ে গেছে, বিধায় এটা পরিপূর্ণ স্ত্রীর মালিকানায় চলে এসেছে। আর এ ধরনের বিষয় হওয়ার পর মারা গেলে তা ফেরত নেওয়ার বিধান নেই, বিধায় আলোচ্য মাসআলায়ও ফেরত দিতে হবে না, যেমনটি হেবা-উপঢৌকনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ কারণেই অগ্রীম টাকা যদি স্ত্রীর অনিচ্ছায় তার হাত থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা তার জরিমানা দিতে হয় না। এটা সর্বসম্মতিক্রমে ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে আরেকটি বর্ণনা এ ধরনের পাওয়া যায় যে, যদি স্ত্রী অগ্রীম এক মাস বা তার থেকে কম দিনের খোরপোশ গ্রহণ করে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় স্বামী মরে গেলে কোনো কিছু ফেরত দেওয়া হবে না। কেননা, এটা সামান্য সময়ের বিষয়। তাই বর্তমান খোরপোশের অন্তর্ভুক্ত করে আর ফেরত দিতে হবে না।

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيْهَا وَمَعْنَاهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلٰى لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِىْ ذِمَّتِهِ لِوُجُوْدِ سَبَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوْبُهُ فِىْ حَقِّ الْمَوْلٰى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ فِى الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَلَهُ اَنْ يَفْتَدِىَ لِأَنَّ حَقَّهَا فِى النَّفَقَةِ لَا فِىْ عَيْنِ الرَّقَبَةِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَتْ وَكَذَا إِذَا قُتِلَ فِى الصَّحِيْحِ لِأَنَّهُ صِلَةٌ .

অনুবাদ : দাস যদি কোনো স্বাধীন নারীকে বিবাহ করে, তাহলে তার খোরপোশ ঋণ হিসেবে দাসের জিম্মায় থাকবে এবং ঐ খোরপোশ পরিশোধের জন্য [প্রয়োজনে] তাকে বিক্রি করা যাবে। এ বক্তব্যের অর্থ হলো, যদি মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে থাকে। কেননা, খোরপোশ হচ্ছে তার জিম্মায় ঋণ হিসেবে ওয়াজিব। কেননা, তা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ অর্থাৎ, আকদ বিদ্যমান রয়েছে, আর মনিবের দায়িত্বেও ওয়াজিব হওয়া স্পষ্ট রয়েছে। সুতরাং এ ঋণ তার দাস-সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত দানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ঋণ। আর মনিব চাইলে নিজের থেকে গোলামের মূল্য আদায় করতে পারে। কেননা, স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে খোরপোশের উপর, দাস-সত্তার উপর নয়। আর যদি দাস মারা যায়, তাহলে [পিছনের] খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিশুদ্ধ মতে, নিহত হলেও রহিত হবে। কেননা, এটা হচ্ছে সৌজন্য মূলক দান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا الخ - দাসের স্ত্রীর খোরপোশ সম্পর্কে : দাস যদি মনিবের অনুমতিক্রমে কোনো স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে ঐ স্ত্রীর খোরপোশ স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে থাকবে এবং এ ঋণ পরিশোধ করার জন্য দাসের মনিব দাসকে বিক্রি করে, ঐ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে। কেননা, খোরপোশ হলো ঋণ, যা দাসের উপর ওয়াজিব হয়েছে। খোরপোশ আবশ্যক হওয়ার কারণ– বিবাহ যেহেতু মনিবের অনুমতিক্রমে হয়েছে, বিধায় এ ঋণের সম্পর্ক দাসের দাসত্ব মূল্যের উপরই প্রকাশ পাবে। যেমন মনিব যদি কোনো দাসকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয় আর ঐ দাস ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে দাসকে বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব মনিবের উপর আরোপিত হয়। কেননা, সে অনুমতি দেওয়ার কারণেই দাস ঋণ করার সুযোগ পেয়েছে, বিধায় এটার সমাধান তাকেই দিতে হবে। তবে মনিবের এ অধিকার থাকবে যে, দাসটি বিক্রি না করে নিজ পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। কারণ, স্ত্রীর প্রাপ্য হলো খোরপোশ। দাসের সাথে তার কোনো কথা নেই। তাই মনিব যদি খোরপোশের খরচ দিয়ে দেয়, তাহলে দাসকে বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি স্ত্রীর খোরপোশ বাবদ মনিব দাসকে বিক্রি করে ফেলে, তাহলে যে ব্যক্তি ক্রয় করে নেবে এক পর্যায়ে তাকেও এ দাস বিক্রি করতে হবে। কেননা, নতুন করে তার স্ত্রীর খোরপোশ-খরচ তার উপর আরোপিত হয়েছে। সুতরাং বারবারই তাকে বিক্রি করা হবে।

অনুরূপ বিধান মূল্য পরিশোধ-চুক্তিতে আবদ্ধ দাস [মুকাতাব] এবং [মুদাব্বার] মনিব মারা গেলে দাস আজাদ হয়ে যাবে – এমন দাসের বিবাহের বিষয়। অর্থাৎ, তারা যদি তাদের মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে থাকে, তাহলে তাদের স্ত্রীর খোরপোশ তাদের উপরই ওয়াজিব হবে। তবে খোরপোশ ও মহরের জন্য তাদেরকে বিক্রি করা যাবে না; বরং তারা উপার্জন করে খোরপোশ ও মহরের ব্যবস্থাপনা করবে। কেননা, তাদেরকে অন্য মনিবের অধীনে হস্তান্তর করা যাবে না।

আর যে দাস মনিবের অনুমতিতে বিবাহ করার পর মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রীর খোরপোশ বাতিল হয়ে যাবে। মনিব থেকেও তা চাওয়া যাবে না। এমনিভাবে স্ত্রীর খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে, যদি দাস স্বামীকে হত্যা করে দেওয়া হয়। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, খোরপোশ হলো সৌজন্যমূলক দান। আর সৌজন্যমূলক দান মৃত্যুর দ্বারা রহিত হয়ে যায়, বিধায় এখানেও রহিত হয়ে যাবে।

وَاِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ اَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِاَنَّهُ تَحَقَّقَ الْاِحْتِبَاسُ وَاِنْ لَمْ يُبَوِّئْهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْاِحْتِبَاسِ وَالتَّبْوِيَةُ اَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ وَلَا يَسْتَخْدِمُهَا وَلَوِ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبْوِيَةِ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ لِاَنَّهُ فَاتَ الْاِحْتِبَاسُ وَالتَّبْوِيَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ خَدَمَتْهُ الْجَارِيَةُ اَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَا يَسْقُطُ النَّفَقَةُ لِاَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمْهَا لِيَكُوْنَ اِسْتِرْدَادًا وَالْمُدَبَّرَةُ وَاُمُّ الْوَلَدِ فِيْ هٰذَا كَالْاَمَةِ.

অনুবাদ : স্বাধীন ব্যক্তি যদি দাসী বিবাহ করে, আর তার মনিব তাকে স্বামীর সাথে গৃহে বাস করার সুযোগ দেয় তাহলে স্বামীর উপর খোরপোশ ওয়াজিব হবে। কেননা, আবদ্ধতা সাব্যস্ত হচ্ছে। আর যদি স্বামীর সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করে না দেয়, তাহলে খোরপোশ তার প্রাপ্য হবে না। কেননা, আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি। আর মনিবের পক্ষ থেকে বসবাসের সুযোগ দানের অর্থ হলো, মনিব তাকে নিজের সেবায় আর নিয়োজিত করবে না; বরং স্বামীর ঘরে স্বামীর সাথে থাকার অবাধ অনুমতি প্রদান করবে । অনুমতি প্রদানের পর পুনরায় যদি তাকে নিজ খেদমতে নিয়ে আসে, তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, আবদ্ধতা বিলুপ্ত হয়েছে। আর বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামীর সাথে বসবাসের সুযোগ প্রদান মনিবের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। মনিবের তলব ছাড়া দাসী নিজেই যদি মাঝে মধ্যে মনিবের সেবা করে, তাহলে খোরপোশ রহিত হবে না। কেননা, মনিব নিজে তো তাকে সেবায় নিযুক্ত করেনি, যাতে প্রত্যাহার সাব্যস্ত হতে পারে। আর মুদাব্বার দাসী এবং উম্মে ওয়ালাদ এ ক্ষেত্রে সাধারণ দাসীদের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ اَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا الخ - **অন্যের দাসী যদি স্বাধীন ব্যক্তির স্ত্রী হয় তাহলে তার খোরপোশ স্বামীর উপর আবশ্যক :** স্বাধীন কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের দাসীকে বিবাহ করে, আর মনিব তার দাসীকে স্বামীর সাথে রাতে থাকার অনুমতিও দিয়ে দেয় তাহলে ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর আবশ্যক হবে। কেননা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর নিকট আবদ্ধতার বিষয় পাওয়া গেছে। আর খোরপোশ ঐ আবদ্ধতার কারণেই হয়ে থাকে। কিন্তু মনিব দাসীকে যদি স্বামীর ঘরে রাতে থাকার অনুমতি না দেয়, তাহলে স্বামীর উপর খোরপোশ আবশ্যক হবে না। কেননা, এখানে আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি।

দাসীকে স্বামীর নিকট রাতে থাকতে দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাসী থেকে নিজস্ব কোনো কাজ না নেওয়া। তবে মনিব যদি প্রথমে দাসীকে স্বামীর নিকট থাকার অনুমতি দেওয়ার পর আবার নিজের খেদমতে নিয়ে নেয়, তাহলে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, যে 'আবদ্ধতার' কারণে খোরপোশ আবশ্যক হয়েছিল তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং স্বামীর উপর খোরপোশ আবশ্যক হবে না। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মনিব দাসী থেকে খেদমত কামনা ছাড়াই যদি দাসী কখনো কখনো নিজ পক্ষ থেকে মনিবের খেদমত করে, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে তার প্রাপ্য খোরপোশ [সাকেত] রহিত হবে না। এমনিভাবে মুদাব্বারা [যে দাসীকে মনিব বলে দিয়েছে যে, আমি মারা গেলে তুমি আজাদ] এবং উম্মে ওয়ালাদ [যে দাসী থেকে মনিবের সন্তান হয়েছে] ও তাদের স্বামী থেকে খোরপোশ পাবে আবদ্ধ থাকলে; অন্যথায় নয়।

فَصْلٌ وَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُسْكِنَهَا فِىْ دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِهٖ اِلَّا اَنْ تَخْتَارَ ذٰلِكَ لِاَنَّ السُّكْنٰى مِنْ كِفَايَتِهَا فَيَجِبُ لَهَا كَالنَّفَقَةِ وَقَدْ اَوْجَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَقْرُوْنًا بِالنَّفَقَةِ وَاِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهٗ اَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيْهِ لِاَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهٖ فَاِنَّهَا لَا تَاْمَنُ عَلٰى مَتَاعِهَا وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ اِلَّا اَنْ تَخْتَارَ لِاَنَّهَا رَضِيَتْ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا.

অনুচ্ছেদ : বাসস্থানের ব্যবস্থা

অনুবাদ : স্বামীর জিম্মায় হলো স্বতন্ত্র গৃহে স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, যেখানে স্বামীর কোনো আত্মীয়স্বজন থাকবে না। তবে স্ত্রী যদি [স্বেচ্ছায়] তা গ্রহণ করে নেয়। কেননা, বাসস্থান হলো তার পর্যাপ্ত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং খোরপোশের ন্যায় স্ত্রীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলাও খোরপোশের সাথে সংযুক্ত করে তা আবশ্যক করেছেন। যখন এটা তার অধিকার হিসেবে ওয়াজিব হলো তখন স্বামীর অধিকার নেই সেখানে অন্য কাউকে রাখা। কেননা, এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, সে নিজের সামানপত্রের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করবে না এবং সে স্বামীর সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস ও আনন্দ ভোগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তবে স্ত্রী যদি পছন্দ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, সে নিজেই তার হক ছাড় দিতে রাজি হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُسْكِنَهَا فِىْ دَارٍ مُفْرَدَةٍ الخ - **স্ত্রীর স্বতন্ত্র বাসস্থান সম্পর্কে :** স্ত্রীর খোরপোশের আলোচনার পর এখন বাসস্থান সংক্রান্ত বিধিবিধানের বর্ণনা শুরু করছেন। তা হলো, স্বামীর উপর আবশ্যক হচ্ছে, স্ত্রীকে স্বতন্ত্র গৃহে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। সেই ঘরে স্বামীর অন্য কোনো ব্যক্তি বসবাস করতে পারবে না। তবে যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য কেউ থাকাকে মেনে নেয়, তাহলে সেটা হতে পারবে। এর প্রমাণ হলো, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় বিষয়াদির মাঝে বাসস্থানও একটি প্রয়োজন। সুতরাং খোরপোশের ন্যায় এটাও স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণিত কেরাতে রয়েছে [কুরআনের আয়াত] اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُّجْدِكُمْ অর্থাৎ, '[স্ত্রীদের] তাদেরকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দাও যেখানে তোমরা থাক এবং তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা কর।' এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খোরপোশের সাথে বাসস্থানের বিষয়টিকেও আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, খোরপোশের সাথে বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর "খোরপোশের সাথে মিলিয়ে বাসস্থানের কথা বলা হয়েছে" এ কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, দুটি বস্তুর হুকুম এক হওয়ার জন্য বর্ণনায়ও দুটি এক জায়গায় উল্লেখ থাকা জরুরি বিষয় নয়। তাছাড়া খোরপোশ আবশ্যক এ কথা বুঝানোর জন্য اَسْكِنُوْهُنَّ "তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা কর।" এতটুকু বলাই যথেষ্ট।। কেননা, শব্দটা হলো নির্দেশমূলক। আর নির্দেশমূলক শব্দ ওয়াজিব বুঝায়।

মোটকথা, বাসস্থানের ব্যবস্থা পাওয়া যেহেতু স্ত্রীর বাধ্যতামূলক প্রাপ্য সুতরাং স্বামীর অধিকার নেই ঐ ঘরে অন্য কাউকে থাকার ব্যবস্থা করার। কেননা, এতে তার অসুবিধা হবে। প্রথমত তার সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে না। দ্বিতীয়ত অন্যের উপস্থিতির কারণে স্বামীর সাথে তৃপ্তিসহ আমোদ-প্রমোদ করতে পারবে না। তৃতীয় কারণ হলো, সহবাস করতে অন্তরায় হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় অন্যের বসবাস করাকে মেনে নেয়, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, সে নিজের অধিকার বিলুপ্ত করতে রাজি আছে, সুতরাং এখন আর থাকতে বাধা নেই।

وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِيْ بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلَقٌ كَفَاهَا لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ قَدْ حَصَلَ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُوْلِ مِلْكِهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَكَلَامِهَا فِيْ أَيِّ وَقْتٍ إِخْتَارُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ ضَرَرٌ وَقِيْلَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُوْلِ وَالْكَلَامِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَارِ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَتَطْوِيْلِ الْكَلَامِ وَقِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ وَفِيْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَحَارِمِ اَلتَّقْدِيْرُ بِسَنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : যদি স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত কোনো সন্তান থাকে, তাহলে স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীর সাথে সন্তানের থাকার ব্যবস্থা করার। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। যদি এক বাড়িতে আলাদা ঘরে স্ত্রীকে বসবাস করায় এবং সে ঘরের আলাদা তালা-চাবি থাকে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। স্ত্রীর মা-বাবা এবং তার অন্য স্বামীর ঔরসজাত সন্তানকে এবং তার আত্মীয়স্বজনকে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে কেননা, ঘরের মালিকানা তার। সুতরাং তার মালিকানায় প্রবেশে বাধাদানের অধিকার রয়েছে তবে তাদের পছন্দমতো সময়ে তার সাথে দেখা ও কথা বলা থেকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, এতে আত্মীয়তা ছিন্ন হয় যা হারাম] আর এতটুকুতে স্বামীর কোনো ক্ষতি নেই। আর কেউ কেউ বলেন, গৃহে প্রবেশ ও কথাবার্তায় বাধা দেবে না। তবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে বাধা দিতে পারে। কেননা, দীর্ঘ অবস্থান ও দীর্ঘ কথাবার্তাই অনিষ্টের কারণ আবার কেউ কেউ বলেন, প্রতি সপ্তাহে একবার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যেতে এবং পিতামাতাকে তার কাছে আসতে বাধা দেবে না। অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়দের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় হলো এক বছর। এটাই বিশুদ্ধ মত

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ الخ - **স্ত্রীর সাথে সৎ-সন্তানকে রাখা স্বামীর জন্য জায়েজ নেই :** যদি স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান থাকে, তাহলে ঐ সন্তানকে স্ত্রীর ঘরেই বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বামীর জন্য জায়েজ নেই; বরং তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দেবে। এর কারণ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, একই ঘরে অন্য কেউ থাকলে স্ত্রীর অসুবিধা হবে।

তালাবিশিষ্ট রুমের ব্যবস্থা করা : আর দ্বিতীয় মাসআলা হলো এই যে, যদি কোনো একটি ঘরে একাধিক রুম থাকে এবং প্রত্যেক রুমের আলাদা দরজা, তালার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে স্ত্রীকে এক রুমে ব্যবস্থা করে অন্যকে অন্য রুমে রাখা জায়েজ আছে। কেননা, এর দ্বারা স্ত্রীর কোনো অসুবিধা নেই

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ الخ - **স্বামীর দেওয়া ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করা সম্পর্কে :** স্ত্রীকে বসবাস করার জন্য যে ঘর বা রুম স্বামী ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সে ঘরে অন্য কাউকে প্রবেশ করা থেকে স্বামী বাধা দিতে পারবে। স্ত্রীর পিতামাতা, পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বা অন্য আত্মীয়দেরকে এ ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। কেননা, এ ঘরের স্বত্বাধিকার তো স্বামীর। সুতরাং তার নিজ জায়গায় অন্য কাউকে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে। তবে স্ত্রীর পিতামাতা যদি স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলতে চায়, সাক্ষাৎ করতে চায় তাহলে তা থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। কেননা, এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। কেননা, হযরত যুবাইর ইবনে মুত্‌য়িম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اِنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ অর্থাৎ 'হযরত যুবাইর ইবনে মুত্‌য়িম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।' তাছাড়া স্ত্রীর সাথে তার পিতামাতা দেখা করা, কথাবার্তা বলাতে স্বামীর কোনো ক্ষতি নেই।

তবে কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, কথাবার্তার ন্যায় তাদেরকে আসতেও বাধা দিতে পারবে না। তবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করাতে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে, বিধায় দীর্ঘ সময় থাকতে বাধা দিতে পারবে। কেননা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বলতে ফিতনা-ফাসাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর অধিকাংশ আলেম বলেন, সপ্তাহে একবার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে যেতে বা পিতামাতাকে এখানে আসতে বাধা দিতে পারবে না; বরং সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকবে। ফতোয়া এটার উপরই।

আর পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়দের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ করার অনুমতি আছে। চাই স্ত্রী তাদের নিকট গিয়ে সাক্ষাৎ করুক বা তারা স্ত্রীর নিকট আসুক। এটাই বিশুদ্ধ কথা। কোনো কোনো হযরত বলেন, মাসে একবার সাক্ষাৎ করতে পারবে। কিন্তু ইবনুল মুকাতিল (র.) বলেছেন, পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়-স্বজন মাসে একবার সাক্ষাৎ করতে পারবে, তাঁর এ কথার বিপরীত বর্ণনাকেই উপরে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রী পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সুযোগ ঐ সময় হবে, যদি পিতামাতা এখানে আসতে না পারে। যদি পিতামাতার আসার শক্তি থাকে, তাহলে স্ত্রী যাবে না। এটা সুন্দর একটি অভিমত। কেননা, স্বামীর সাথে বাহিরে যাওয়াটা অনেক সময় কষ্টসাধ্য বিষয়। –[ফাতহুল কাদীর : খ. ৪: পৃ. ২০৮]

وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِىْ يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِىْ فِىْ ذٰلِكَ الْمَالِ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَ وَالِدَيْهِ وكَذَا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِىْ ذٰلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ لِاَنَّهُ لَمَّا اَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَدِيْعَةِ فَقَدْ اَقَرَّ اَنَّ حَقَّ الْاَخْذِ لَهَا لِاَنَّ لَهَا اَنْ تَاْخُذَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَاِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُوْلٌ فِىْ حَقِّ نَفْسِهِ لَاسِيَّمَا هٰهُنَا فَاِنَّهُ لَوْ اَنْكَرَ اَحَدَ الْاَمْرَيْنِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ فِيْهِ لِاَنَّ الْمُوْدَعَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِىْ اِثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَرْأَةُ خَصْمٌ فِىْ اِثْبَاتِ حُقُوْقِ الْغَائِبِ فَاِذَا ثَبَتَ فِىْ حَقِّهِ تَعَدّٰى اِلَى الْغَائِبِ ـ

অনুবাদ : স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আর কোনো লোকের হাতে তার সম্পদ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ লোক সম্পদ থাকার কথা এবং উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করে, তাহলে কাজি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর, তার নাবালক সন্তানদের এবং পিতামাতার খোরপোশ ঐ সম্পদ থেকে নির্ধারণ করতে পারবে। তদ্রূপ লোকটি স্বীকার না করলেও কাজি যদি তা অবগত হন। [তাহলে নির্ধারণ করে দেবেন] কেননা, লোকটি যখন দাম্পত্য সম্পর্ক ও গচ্ছিত সম্পদের কথা স্বীকার করল তখন সে স্ত্রীর গ্রহণের অধিকারও স্বীকার করে নিল। কেননা, সে তো স্বামীর সম্পদ থেকে স্বামীর সম্মতি ছাড়াই নিজের হক উসুল করতে পারে। আর দখলদারের স্বীকারোক্তি তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। বিশেষত আলোচ্য ক্ষেত্রে। কেননা, লোকটি যদি দুটি বিষয়ের কোনো একটি অস্বীকার করে, তাহলে সে বিষয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্য পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, যার নিকট সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে, সে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর স্ত্রী-সম্পর্ক প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিপক্ষ নয়। তদ্রূপ স্ত্রীলোকটিও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির হক প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিপক্ষ নয়। সুতরাং যখন লোকটির ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হলো, তখন তা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিও বর্তাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِىْ يَدِ رَجُلٍ الخ - **স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলে স্ত্রীর খোরপোশ সম্পর্কে :** স্বামী যদি সফরে চলে যায় আর এমতাবস্থায় তার কিছু সম্পদ কোনো ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত থাকে; যেমন– হামেদ নামক ব্যক্তির নিকট কোনো লোকের কিছু সম্পদ গচ্ছিত আছে। আর হামেদ গচ্ছিত সম্পদ সম্পর্কেও স্বীকার করে এবং এ মহিলা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী, এটাও স্বীকার করে। তাহলে কাজি ঐ সম্পদ থেকে স্ত্রী, নাবালক সন্তান এবং পিতামাতার খোরপোশের ফয়সালা করে দেবেন। এমনিভাবে হামেদ যদি অস্বীকার করে, কিন্তু বিষয়টি কাজির জানা আছে, তাহলেও কাজি ঐ সম্পদ থেকে তাদের খোরপোশ ধার্য করে দেবেন।

প্রমাণ হলো এই যে, যখন হামেদ উল্লিখিত দুটি বিষয়টি স্বীকার করল, তাহলে যেন সে এ কথারও স্বীকারোক্তি দিল যে, স্ত্রী এই সম্পদ থেকে নেওয়ার অধিকার রাখে। কেননা, স্ত্রী নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ স্বামীর অনিচ্ছায় স্বামীর সম্পদ থেকে নেওয়ার অধিকার রাখে। এ কথার প্রমাণ হলো ঐ হাদীস, যেখানে হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দাকে রাসূল ﷺ বলেছিলেন– خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, 'তোমার প্রয়োজন এবং সন্তানের চাহিদা মোতাবেক যতটুকু প্রয়োজন তা স্বামীর সম্পদ থেকে নিয়ে নাও।'

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি কারো নিকট কিছু সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয়, আর সে যদি গচ্ছিতকারী ঋণদাতা সম্পর্কে জানে এবং গচ্ছিত রাখা সম্পর্কেও স্বীকার করে, তাহলে এমতাবস্থায় তো কাজির এ ফয়সালা দেওয়ার অধিকার নেই যে, যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে তাকে বলে দিবে যে, তুমি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে দাও। অথচ স্ত্রীর খোরপোশ দেওয়া আবশ্যকতার মতো ঋণ পরিশোধ করারও আবশ্যকতা রয়েছে, তাহলে এখানে কেন এ ফয়সালা দেবেন না?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো এই যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির ঐ সমস্ত ব্যাপারেই কাজি ফয়সালা করতে পারেন যা ঐ ব্যক্তির জন্য উপকারী। আর যা ঐ ব্যক্তির জন্য কল্যাণময় নয় এমন বিষয়ের ফয়সালা দিতে পারেন না। আর স্ত্রী, সন্তানাদি ও পিতামাতার খোরপোশের বিষয়ে ফয়সালা করাটা ঐ ব্যক্তির জন্যই উপকারী। তাদেরকে দেওয়া মানেই হলো ঐ ব্যক্তির অধীনে থাকা। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করলে আর আলাদা ঐ ব্যক্তির অধীনে থাকে না। এতটুকু ব্যবধানের কারণে কাজি খোরপোশের ফয়সালা করতে পারেন, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার ফয়সালা করতে পারেন না।

قَوْلُهُ وَاِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ : এর দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, যে ব্যক্তির হাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ গচ্ছিত আছে তার স্বীকারোক্তি সঠিক না হওয়া উচিত। কেননা, এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে স্বীকার করা হচ্ছে।

উত্তর : এর উত্তর হলো, যার নিকট সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে তার নিজের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে। কেননা, সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে তা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। কারণ, স্ত্রী না হওয়ার ব্যাপারে যদি অস্বীকার করত, তাহলে স্ত্রী তার কথার বিপরীত বিষয় প্রমাণিত করার জন্য প্রতিপক্ষ হতে পারত না। কেননা, এ ব্যক্তির সাথে গচ্ছিত রাখা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্ক নেই, বিধায় কিভাবে স্ত্রী ঐ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবে? মোটকথা, হতে পারবে না। আর স্ত্রী যদি গচ্ছিত বিষয় সম্পর্কে প্রতিপক্ষ হতে চায়, তাহলে তার কথার দ্বারা এটাও প্রমাণিত করতে পারবে না। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সে দাবিদার হতে পারবে না। মোটকথা, কোনো ব্যাপারেই স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, বিধায় ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে। যখন তার নিজ ব্যাপারে গচ্ছিত বিষয় প্রমাণিত হলো তখন অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তার নিকট যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তিরই স্বত্বাধিকারে।

এটা যেন এরূপ হলো যে, কোনো ব্যক্তি যদি রমজান মাসে চাঁদ দেখে, তাহলে তার ব্যাপারে সর্বপ্রথম রমজান প্রমাণিত হবে অতঃপর অন্যান্যদের দিকে বিষয়টি সংক্রমিত হবে।

তদ্রূপ বিধান হলো, যদি সম্পদ তার নিকট মুদারাবা হিসেবে থাকে। অর্থাৎ, সম্পদ গ্রহণকারী যদি স্বীকার করে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার নির্দিষ্ট মুদারাবা হিসেবে সম্পদ রেখেছে এবং ঐ মহিলা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রী। অথবা বিষয়টি কাজি জানে, তাহলে কাজি ঐ সম্পদ থেকে তাদের খোরপোশের ফায়সালা করে দেবেন।

অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তি এক লোক থেকে টাকা পাবে, আর সে এ ঋণের কথা এবং স্ত্রী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তাহলে কাজি খোরপোশের ফায়সালা করে দেবেন।

وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِيْ يَدِهِ مُضَارَبَةً وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ أَوْ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً مِنْ جِنْسِ حَقِّهَا أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ لَا تُفْرَضُ النَّفَقَةُ فِيْهِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيْعِ وَلَا يُبَاعُ مَالُ الْغَائِبِ بِالْإِتِّفَاقِ أَمَّا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَلِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ عَلَى الْحَاضِرِ وَكَذَا عَلَى الْغَائِبِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يُقْضٰى عَلَى الْحَاضِرِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ إِمْتِنَاعُهُ لَا يُقْضٰى عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِمْتِنَاعُهُ.

অনুবাদ : তদ্রূপ লোকটির হাতে ঐ সম্পদ যদি মুদারাবা ভিত্তিতে রক্ষিত থাকে। ঋণের ক্ষেত্রেও একই কথা। এ সকল হুক তখন হবে, যখন উল্লিখিত সম্পদ স্ত্রীর হক তথা খোরপোশের সমশ্রেণীভুক্ত হয়। অর্থাৎ, দিরহাম-দিনার কিংবা খাদ্যদ্রব্য [চাল, গম] কিংবা তার প্রাপ্য পোশাক জাতীয় কোনো বস্ত্র হয়। পক্ষান্তরে তার প্রাপ্য হকের ভিন্ন কিছু যদি হয়, [যেমন– বাড়ি, দাস বা সামানপত্র] তাহলে তাতে খোরপোশ নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা, তখন তা বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেবে। আর সর্বসম্মতিক্রমেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির মাল বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তির মাল যখন বিক্রি করা যায় না তখন একই কারণে অনুপস্থিত ব্যক্তির মালও বিক্রি করা যাবে না। সাহেবাইনের দলিল এই যে, উপস্থিত ব্যক্তির মাল যদিও বিক্রি করা যায়, কেননা প্রাপ্য হক আদায়ের ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি জানা যায়, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল বিক্রি করা যাবে না। কেননা, তার অস্বীকৃতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, এসব আলোচনা ঐ সময় যখন ঐ সম্পদগুলো মহিলার খোরপোশ বিষয় সমশ্রেণীভুক্ত হয়। যেমন– টাকা-পয়সা, চাল, গম অথবা শাক-সবজি ইত্যাদি অথবা পোশাক সংক্রান্ত বস্ত্র গচ্ছিত থাকে। তাহলে কাজি উক্ত ফয়সালা করবেন। আর যদি গচ্ছিত সম্পদ তার খোরপোশ বিষয় সমশ্রেণীভুক্ত না হয়, যেমন– দাস-দাসী বা বাড়ি অথবা অন্য সম্পদ থাকে, তাহলে কাজি তা থেকে খোরপোশের ফয়সালা করবেন না। কেননা, খোরপোশের জন্য ঐ সম্পদ বিক্রি করে দিতে হবে, আর সর্বসম্মতিক্রমে অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করা যায় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি উপস্থিত থাকত, তাহলে কাজি তার সম্পদ বিক্রি করতে পারত না। কেননা, কাজি কর্তৃক বিক্রয় সঠিক হওয়ার অর্থ হলো মালিককে নিজ সম্পদ বেচাকেনা থেকে বায়েন করা, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বিবেকসম্পন্ন বালেগ ব্যক্তিকে বেচাকেনা থেকে বারণ করা জায়েজ নেই। সুতরাং যখন উপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করা যায় না, তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ তো বিক্রি জায়েজ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আর সাহেবাইনের মতে, বিক্রি জায়েজ না হওয়ার কারণ এই যে, কাজি যদিও উপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করতে পারে, কেননা সে রাজি না থাকলে অস্বীকারের মাধ্যমে তা জানা যেত। যেহেতু অস্বীকার করেনি বিধায় কাজির বিক্রিও সঠিক হবে। কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে বিক্রির হুকুম করতে পারবে না। কেননা, তার অসম্মতি সম্পর্কে কাজির অবগতি নেই। তাছাড়া সে যে তার স্ত্রীর হক আদায় করেনি এটাও কাজি জানে না, সুতরাং বিক্রি জায়েজ হবে না।

قَالَ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيْلًا نَظَرًا لِلْغَائِبِ لِأَنَّهَا رُبَّمَا اِسْتَوْفَتِ النَّفَقَةَ اَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَرَّقَ بَيْنَ هٰذَا وَبَيْنَ الْمِيْرَاثِ اِذَا قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَةٍ حُضُوْرٍ بِالْبَيِّنَةِ وَلَمْ يَقُوْلُوْا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا اٰخَرَ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْكَفِيْلُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ هُنَاكَ الْمَكْفُوْلُ لَهُ مَجْهُوْلٌ وَهٰهُنَا مَعْلُوْمٌ وَهُوَ الزَّوْجُ وَيُحَلِّفُهَا بِاللّٰهِ مَا اَعْطَاهَا النَّفَقَةَ نَظَرًا لِلْغَائِبِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের দিক বিবেচনা করে কাজি স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন জামিন নির্ধারণ করবেন। কেননা, হতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে পূর্ণ খোরপোশ গ্রহণ করেছে, কিংবা স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, আর ইদ্দতও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) আলোচ্য মাসআলা এবং মিরাসের মাসআলার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্যের মাধ্যমে উপস্থিত ওয়ারিশদের মাঝে যদি মিরাস বণ্টন করা হয়ে যায়, আর তারা এ কথা না বলে যে, অন্য কোনো ওয়ারিশের কথা আমাদের জানা নেই, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোনো জামিন গ্রহণ করা হবে না। কেননা, মিরাসের মাসআলায় মাকফূল লাহু- [যার পক্ষ থেকে জামিন গ্রহণ করা হবে] অজ্ঞাত এবং এখানে তা জানা হয়েছে, আর সে হলো স্বামী। অবশ্য কাজি স্বামীর স্বার্থ বিবেচনা করে স্ত্রীকে এই মর্মে কসম করাবেন যে, আল্লাহর কসম সে তাকে খোরপোশ দিয়ে যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيْلًا نَظَرًا الخ - নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর খোরপোশের ফয়সালার পূর্বে জামিন গ্রহণ করবে : নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর খোরপোশের ফয়সালার পূর্বে কাজি স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন জামিন গ্রহণ করবেন। এ স্ত্রী যদি খোরপোশ প্রাপ্য না হয়, তাহলে এ ব্যক্তি স্বামীর সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জিম্মাদার হবে। ইমাম সারাখসী (র.) বলেন, মহিলার পক্ষ থেকে জামিন গ্রহণ করা ভালো। যদি তা না করা হয়, তাহলে তাও জায়েজ আছে। আর সাদরুশ শহীদ (র.) বলেন যে, অনুপস্থিত স্বামীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে একজন জামিন নির্ধারণ করা জায়েজ আছে। কিন্তু কাজি সর্বপ্রথম স্ত্রী থেকে এই মর্মে শপথ নিবেন যে, তার স্বামী তাকে খোরপোশ দিয়ে যায়নি। কেননা, হতে পারে, স্বামী তাকে খোরপোশ দিয়ে গেছে। কিন্তু কাজির নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট করে আবার খোরপোশ গ্রহণ করতে চাচ্ছে। সুতরাং কাজি ফয়সালার পূর্বে শপথ নেবেন এবং কাফিল নির্ধারণ করে নেবেন।

দলিল হলো এই যে, হতে পারে স্বামী তাকে একবার খোরপোশ অগ্রীম দিয়ে গেছে, অথবা স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে এবং ইদ্দতও শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং সে আর খোরপোশ প্রাপ্য নয়। অতএব স্বামীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই একজন জিম্মাদার গ্রহণ করে নিবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) খোরপোশের ব্যাপারে জিম্মাদার গ্রহণ করার কথা বলেছেন, কিন্তু মিরাসের ক্ষেত্রে জিম্মাদারের হুকুম দেননি। এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান করার কারণ হচ্ছে, মিরাসের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার উপস্থিত ওয়ারিশগণ যদি বলেন যে, আমরাই তার ওয়ারিশ, আর অতিরিক্ত এ কথা বলেননি যে, তার আর কোনো ওয়ারিশ নেই। এমতাবস্থায় কাজি তাদের মাঝে সব সম্পদ বণ্টন করে দেবেন এবং তাদের পক্ষ থেকে কোনো জামিনও গ্রহণ করবেন না। কেননা, মিরাসের ক্ষেত্রে মাকফূল লাহু [যার জন্য জামিন বানানো হবে] অজ্ঞাত। কিন্তু খোরপোশের ব্যাপারে সে অর্থাৎ স্বামী জ্ঞাত। সুতরাং এখানে কাফিল বানানো হবে।

قَالَ وَلَا يُقْضٰى بِنَفَقَةٍ فِىْ مَالِ غَائِبٍ اِلَّا لِهٰؤُلَاءِ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ هُوَ اَنَّ نَفَقَةَ هٰؤُلَاءِ وَاجِبَةٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِىْ وَلِهٰذَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَاْخُذُوْا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِىْ اِعَانَةً لَهُمْ اَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ اِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِاَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيْهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوْزُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِىْ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهٖ فَاَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ اَوْ لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَاَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفْرِضَ الْقَاضِىْ نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَيَاْمُرَهَا بِالْاِسْتِدَانَةِ لَا يَقْضِى الْقَاضِىْ بِذٰلِكَ لِاَنَّ فِىْ ذٰلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَقْضِىْ فِيْهِ لِاَنَّ فِيْهِ نَظَرًا لَهَا وَلَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْغَائِبِ فَاِنَّهٗ لَوْ حَضَرَ وَصَدَّقَهَا فَقَدْ اَخَذَتْ حَقَّهَا وَاِنْ جَحَدَ يُحَلَّفُ فَاِنْ نَكَلَ فَقَدْ صَدَّقَ وَاِنْ اَقَامَتْ بَيِّنَةً فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّهَا وَاِنْ عَجَزَتْ يَضْمَنُ الْكَفِيْلُ اَوِ الْمَرْاَةُ وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلٰى هٰذَا اَنَّهٗ يَقْضِىْ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَهُوَ مُجْتَهَدٌ فِيْهِ وَفِىْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ اَقَاوِيْلُ مَرْجُوْعٌ عَنْهَا فَلَمْ نَذْكُرْهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পদে উল্লিখিত লোকদের ছাড়া কাজি আর কারো খোরপোশের হুকুম দেবেন না। উল্লিখিত এ লোকদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, কাজির ফয়সালা করার পূর্ব থেকেই উল্লিখিত লোকদের খোরপোশ তার উপর ওয়াজিব ছিল। এজন্যই তো কাজির ফয়সালা ছাড়াও তাদের তা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কাজির ফয়সালা তাদের জন্য সহায়ক মাত্র। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাহরামদের খোরপোশ কাজির ফয়সালায় মাধ্যমে ওয়াজিব হয়। কেননা, বিষয়টি বিতর্কিত। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান বৈধ নয়। আর যদি কাজি দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে অবগত না হন, আর লোকটিও তা স্বীকার না করে, এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকটি দাম্পত্য সম্পর্কে স্বপক্ষে সাক্ষ্য পেশ করল কিংবা স্বামী কোনো মাল রেখে যায়নি, আর স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করল, যাতে কাজি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তার খোরপোশ নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে ঋণ গ্রহণের আদেশ দান করেন, তাহলে কাজি তার পক্ষে ফয়সালা দেবেন না। কেননা, এটা হচ্ছে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান। ইমাম যুফার (র.) বলেন, কাজি তার পক্ষে ফয়সালা দেবেন। কেননা, এতে স্ত্রীলোকটির স্বার্থ রক্ষা হয়। আবার অনুপস্থিত ব্যক্তিরও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, সে ফিরে এসে যদি স্ত্রীর সত্যতা স্বীকার করে তাহলে তো স্ত্রী তার প্রাপ্যই নিয়েছে। আর যদি স্ত্রীর দাবি স্বামী অস্বীকার করে, তাহলে স্বামীকে কসম করতে বলা হবে। যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে তো প্রকারান্তরে স্ত্রীর সত্যতা স্বীকার করে নিল। আর যদি স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে তার হক প্রমাণিত হয়ে গেল। আর সাক্ষ্য পেশ করতে ব্যর্থ হলে কাফিল কিংবা স্ত্রীলোকটি জামিন হবে। বর্তমানে এর উপরই বিচারকদের বিচার প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ, অনুপস্থিত ব্যক্তির উপরই বিচারকদের বিচার তথা অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর খোরপোশ ধার্য করে দেওয়া হবে– লোকদের প্রয়োজনের খাতিরে। আর বিষয়টিও বিতর্কিত এ মাসআলা সম্পর্কে আরো কিছু প্রত্যাহৃত মতামত রয়েছে। সেজন্য সেগুলো আমরা উল্লেখ করিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَقْضِى بِنَفَقَةٍ فِىْ مَالِ غَائِبٍ الخ - অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার আত্মীয়দের খোরপোশের ফয়সালা করা : কাজি অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কেবল উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজনের খোরপোশেরই ফয়সালা করতে পারেন। অর্থাৎ স্ত্রী, নাবালেগ সন্তান, পিতামাতা বা তাদের সম হুকুমে যারা রয়েছে; যেমন- বালেগ সন্তান কিন্তু অচল, অন্ধ অথবা কন্যা-সন্তান, এদের খোরপোশের ফয়সালা করতে পারবেন। আর যাদের খোরপোশের ফয়সালা করতে পারবেন না তারা হলেন- ভাই, চাচা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়। এ দুই শ্রেণীর আত্মীয়দের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম শ্রেণীর লোকদের খোরপোশ কাজির ফয়সালা ছাড়াই তার উপর ওয়াজিব ছিল, বিধায় কাজির ফয়সালা ছাড়াই তাদের জন্য জায়েজ ছিল নিজ প্রাপ্য উসুল করে নেওয়া। কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ যার নিকট গচ্ছিত আছে সে যেহেতু দেবে না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে কাজির ফয়সালা তাদের প্রাপ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের ব্যাপার হলো তারা মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে তাদের খোরপোশ ওয়াজিব হয় কাজির ফয়সালা দ্বারা। তাছাড়া এদের খোরপোশ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ খোরপোশ ওয়াজিব হবে না। যাই হোক, তাদের খোরপোশ যেহেতু কাজির ফয়সালা মোতাবেক ওয়াজিব হচ্ছে আর আমাদের মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা জায়েজ নেই, সুতরাং কাজি তাদের খোরপোশের ফয়সালা করবেন না।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِىْ بِذٰلِكَ الخ : এর দ্বারা এ মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যদি কাজি এই মহিলা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার বিষয়টি না জানেন এবং যার নিকট সম্পদ গচ্ছিত আছে সেও যদি স্বীকার না করে, আর ঐ মহিলা স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করে। অথবা যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে সে এই মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়, কিন্তু সম্পদ গচ্ছিত রাখার বিষয়টি স্বীকার না করেন, আর প্রমাণ পেশ করে কাজির আদালতে খোরপোশের দাবি করেন, তাহলে কাজি এ ধরনের খোরপোশের ফয়সালা দিতে পারেন না। কেননা, এ ফয়সালা দ্বারা قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ [অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা করা] আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এটা আমাদের নিকট জায়েজ নেই।

কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, কাজি এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করত জামিন নির্ধারণ করে খোরপোশের ফয়সালা করে দেবেন। আর স্বামীর যদি রেখে যাওয়া সম্পদ না থাকে, তাহলে ঋণ করার অনুমতি দিয়ে দিবেন। কেননা, এটা মহিলার জন্য সুবিধাজনক। আর এতে পুরুষেরও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, সে উপস্থিত হয়ে যদি স্ত্রীর কথাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তো বাস্তবতা প্রমাণিত হলো। আর যদি সত্যায়ন না করে তাহলে স্বামীর থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি স্বামী তাকে অস্বীকার করে তাহলেও স্ত্রীর কথাই প্রমাণিত হলো, এমনিভাবে স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করলেও তার কথা প্রমাণিত। আর যদি স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করতে না পারে আর স্বামীও কসম করে ফেলে, তাহলে যে পরিমাণ খোরপোশ উসুল করেছিল জামিনের মাধ্যমে তা ফেরত দেওয়া হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বর্তমান জমানায় কাজিগণ এ কথার উপরই ফয়সালা করেন। কেননা, এ ফয়সালাটা মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক। তাছাড়া এ মাসআলায় আরো অনেক মতামত রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

فَصْلٌ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى فِيْ عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوْتَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ـ

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সে তার ইদ্দতকালে খোরপোশ ও বাসস্থানের অধিকারী হয়। তালাক রাজ'ঈ হোক কিংবা বায়েন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বায়েন তালাকপ্রাপ্তার জন্য খোরপোশ নেই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয় [তাহলে সে পাবে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ الخ - **ইদ্দতরত অবস্থায় মহিলার খোরপোশ সংক্রান্ত :** কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে– চাই রাজ'ঈ তালাক প্রদান করুক বা বায়েন উভয় অবস্থায় ইদ্দতকালীন সময়ে ঐ স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে হবে। খোরপোশ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ যাকে এক তালাকে বায়েন অথবা তিন তালাক অথবা খোলা' করা হয়েছে সে স্ত্রী কোনো ধরনের খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে খোরপোশ দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। মোটকথা, রাজ'ঈ তালাকের ইদ্দতকালীন অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে খোরপোশ প্রাপ্য হবে।

প্রমাণ হলো এই যে, রাজ'ঈ তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিবাহের হুকুম বহাল থাকে, বিশেষ করে আমাদের নিকট। কেননা, আমাদের মাযহাব মোতাবেক ইদ্দতকালীন সময়ে রাজ'ঈপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েজ। তবে আলোচনা হলো তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা স্ত্রী নিয়ে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সে খোরপোশ প্রাপ্তা হবে না। তাঁর দলিল হলো, ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটি। হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেন, আমাকে আমার স্বামী তিন তালাক প্রদান করেছে। তখন রাসূল ﷺ আমার জন্য খোরপোশের ফয়সালা করেননি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, বায়েনপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকে না, আর তাঁর মতে খোরপোশ স্বত্বাধিকারের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর বায়েনপ্রাপ্তা স্ত্রী যেহেতু অধীনেই থাকে না বিধায় খোরপোশও পাবে না। এ কারণেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর সম্পদ থেকে খোরপোশ প্রাপ্য হয় না। তবে গর্ভবতী স্ত্রীর বিষয়টা ভিন্ন। কেননা, সে খোরপোশ পাওয়ার বিষয়টির কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ - 'তারা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তাদেরকে খোরপোশ প্রদান কর।'

আর আমাদের প্রমাণ হলো, খোরপোশ মৌলিকভাবে স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখার বিনিময়ে ওয়াজিব হয়ে থাকে। যে বিষয়টি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলোচনা করা হয়েছে। আর সন্তানের বিষয় লক্ষ্য করে তালাকের পরও ঐ আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, ইদ্দত পালন ওয়াজিব হয় সন্তানের হকের প্রতি লক্ষ্য করে। সুতরাং ইদ্দত অবস্থায় যেহেতু আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে বিধায় খোরপোশও ওয়াজিব হবে। তাছাড়া এ আবদ্ধতার উপর ভিত্তি করেই ইদ্দতকালে সর্বসম্মতিক্রমে বাসস্থান ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং গর্ভবতী এবং গর্ভ ছাড়া উভয় মহিলা একই রকম হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক পেশকৃত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদীসের উত্তর এই যে, হযরত ওমর (রা.) এ হাদীসকে রদ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব আর রাসূল ﷺ-এর হাদীস-সুন্নতকে একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দেব না। সে সঠিক বলেছে কিনা, যথাযথ স্মরণ রেখেছে কিনা? আমাদের জানা নেই। আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, যেই মহিলাকে তিন তালাক দেওয়া হবে তাকে খোরপোশ ও বাসস্থান প্রদান করা হবে– যে পর্যন্ত সে ইদ্দতে থাকবে।

এমনিভাবে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), উসামা ইবনে যায়েদ (রা.), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-ও ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে রদ করেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য "আমাদের রবের কিতাব" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– وَأَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ অর্থাৎ, 'তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানে রাখ।' আর রাসূলের সুন্নত বলতে এটিই উদ্দেশ্য যা তিনি তাঁর কথার শেষে বলে দিয়েছেন যে, আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি।

اَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلِاَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَائِمٌ لَاسِيَّمَا عِنْدَنَا فَاِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْىُ وَاَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِىَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ ثَلٰثًا فَلَمْ يَفْرُضْ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةَ وَلِاَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِىَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهٰذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لِاِنْعِدَامِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتْ حَامِلًا لِاَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ (اَلْاٰيَة) وَلَنَا اَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ اِحْتِبَاسٍ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَالْاِحْتِبَاسُ قَائِمٌ فِىْ حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُوْدٍ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَلَدُ اِذِ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَلِهٰذَا كَانَ لَهَا السُّكْنٰى بِالْاِجْمَاعِ وَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَحَدِيْثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ عُمَرُ (رض) فَاِنَّهُ قَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَاَةٍ لَا نَدْرِىْ صَدَقَتْ اَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُوْلُ لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلٰثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى مَا دَامَتْ فِى الْعِدَّةِ وَرَدَّهُ اَيْضًا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رض) وَاُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ (رض) .

অনুবাদ : রাজ'ঈ তালাকের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, এরপরও বিবাহ-বন্ধন বিদ্যমান থাকে। বিশেষত আমাদের মতে। কেননা, ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর জন্য সহবাস হালাল। বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদানের পর রাসূল ﷺ আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশ নির্ধারণ করেননি। তাছাড়া এজন্য যে, এ স্ত্রীর উপর স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান নেই। আর খোরপোশ স্বামী-স্বত্বের উপর ভিত্তি করেই সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তার জন্য খোরপোশও ওয়াজিব হয় না। কেননা, স্বামী-স্বত্ব বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে গর্ভবতী স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার ক্ষেত্রে খোরপোশ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি আমরা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে জেনেছি– وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ - 'যদি তারা গর্ভবতী হয়, তাহলে তাদের জন্য তোমরা খোরপোশ দাও।' আমাদের দলিল এই যে, আগেই আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, খোরপোশ হলো আবদ্ধ থাকার বিনিময়, আর এখানে বিবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য একটি বিষয় আদায় বাবদ আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হচ্ছে সন্তান। কেননা, সন্তানের বংশ-বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যই ইদ্দত ওয়াজিব। সুতরাং নাফকাও ওয়াজিব হবে। এ কারণেই তো সর্বসম্মতিক্রমে বাসস্থান তার প্রাপ্য হয়ে থাকে এবং বিষয়টি গর্ভবতীর সদৃশ হলো। আর ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদীস হযরত ওমর (রা.) রদ করে বলেছেন– لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَاَةٍ لَا نَدْرِىْ صَدَقَتْ اَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلٰثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى مَادَامَتْ فِى الْعِدَّةِ. [অর্থাৎ] 'আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নত একজন নারীর কথায় ত্যাগ করতে পারি না। জানি না সে নারী সত্য বলেছে না কি মিথ্যা বলেছে, স্মরণ রেখেছে না ভুলে গেছে। আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিন তালাকপ্রাপ্তার স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে, যতদিন সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।' হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, উসামা ইবনে যায়েদ, জাবির ও আয়েশা (রা.)-ও উক্ত বর্ণনা রদ করেছেন।

وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لِاَنَّ اِحْتِبَاسَهَا لَيْسَ لِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَاِنَّ التَّرَبُّصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا اَلَا تَرٰى اَنَّ مَعْنَى التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَيْسَ بِمُرَاعًى فِيْهِ حَتّٰى لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْحَيْضُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَلِاَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ اِيْجَابُهَا فِيْ مِلْكِ الْوَرَثَةِ.

অনুবাদ : যার স্বামী মারা গেল সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, তার আবদ্ধ থাকা স্বামীর হক রক্ষার জন্য নয়; বরং শরিয়তের হক হিসেবে। কেননা, এ অপেক্ষা করাটা তার পক্ষ থেকে ইবাদতরূপে গণ্য। দেখুন না, গর্ভাশয়ের মুক্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার দিকটি এখানে বিবেচ্য নয়। যে জন্য এখানে হায়েজ শর্ত নয়। সুতরাং স্বামীর উপর তার খোরপোশ ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, নাফকা ক্রমে ক্রমে ওয়াজিব হয়। অথচ মৃত্যুর পর [পরিত্যক্ত সম্পদে] স্বামীর মালিকানা নেই। সুতরাং ওয়ারিশগণের মালিকানায় তা ধার্য করার অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا الخ - **মৃত ব্যক্তির স্ত্রী খোরপোশ পাবে না :** যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে ইদ্দতকালীন অবস্থায় স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকেও একটি অভিমত এমনই রয়েছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি অভিমত হলো, স্বামী যদি অঢেল সম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে স্ত্রীর মিরাসের অংশ থেকেই তার খোরপোশের ব্যবস্থা করা হবে। আর যদি স্বল্প সম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে সমুদয় সম্পদ থেকে তার খোরপোশের ব্যবস্থা করা হবে।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বাসস্থান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনা হলো বাসস্থান ওয়াজিব হবে না। যেমনটি আহনাফও বলে। আরেকটি বর্ণনা হলো, তার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। আর ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমতও এ ধরনেরই।

মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যে খোরপোশ পাবে না তার দলিল হলো এই যে, স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসা থেকে বিরত থাকা এটা স্বামীর হকের কারণে নয়; বরং শরিয়তের হকের কারণে। এ কারণে মৃতের স্ত্রীর ইদ্দত হায়েজ বা তার পরিবর্তে তিন মাস দ্বারা ধার্য করা হয়নি; বরং তার ইদ্দত ধার্য করা হয়েছে চার মাস দশদিনকে। যদি কোনো মহিলার ক্ষেত্রে চার মাস দশদিনে এক হায়েজও অতিক্রান্ত না করে, তাহলেও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং এ ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামীর সম্পদ থেকে খোরপোশ দেওয়া আবশ্যক হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, খোরপোশ আবশ্যক হয় পর্যায়ক্রমে। আর মৃত্যুর পর সম্পদের মাঝে স্বামীর মালিকানা থাকে না; বরং ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়। আর ওয়ারিশদের সম্পদের মাঝে স্ত্রীর খোরপোশ ধার্য করা সম্ভব নয়, বিধায় সে খোরপোশ প্রাপ্য হবে না।

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ مِثْلُ الرِّدَّةِ وَتَقْبِيْلِ ابْنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حَابِسَةً نَفْسَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَارَتْ كَمَا إِذَا كَانَتْ نَاشِزَةً بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لِأَنَّهُ وُجِدَ التَّسْلِيْمُ فِيْ حَقِّ الْمَهْرِ بِالْوَطْيِ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَخِيَارِ الْبُلُوْغِ وَالتَّفْرِيْقِ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَ ذٰلِكَ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ كَمَا إِذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِإِسْتِيْفَاءِ الْمَهْرِ .

অনুবাদ : যেসব বিচ্ছেদ স্ত্রীর দিক থেকে নাফরমানির কারণে ঘটবে; যেমন– ধর্মত্যাগ, স্বামীর পুত্রকে 'চুম্বন' ইত্যাদি, সে ক্ষেত্রে নাফকা তার প্রাপ্য হবে না। কেননা, সে না-হকভাবে নিজেকে ইদ্দতে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং সে অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল। সহবাসের পর মহরানার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সমর্পণ পাওয়া গিয়েছে সহবাসের মাধ্যমে। অদ্রূপ নাফরমানি ছাড়া স্ত্রীর দিক থেকে উদ্ভূত অন্য কোনো কারণে সম্পর্ক বিচ্ছেদের বিষয়টিও ভিন্ন। যেমন স্বাধীনতাজনিত ইচ্ছাধিকার এবং বালিগ হওয়া-জনিত ইচ্ছাধিকার এবং কুফু না হওয়ার কারণে ঘোষিত বিচ্ছেদ। এ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ কারণে সে নিজেকে ইদ্দতে আবদ্ধ রেখেছে। আর এ জাতীয় আবদ্ধতার কারণে নাফকা [খোরপোশ] রহিত হয় না। যেমন যখন মহরানা উসুলের উদ্দেশ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ الخ - স্ত্রীর অন্যায়ে বিচ্ছেদের সময়ের খোরপোশ : স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো অন্যায়ের কারণে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়; যেমন– স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেল, অথবা কামভাব ও উত্তেজনার সাথে স্বামীর ছেলেকে চুম্বন করে, তাহলে ঐ স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য হবে না। কেননা, সে এখন যে নিজেকে আবদ্ধ রাখছে তা না-হকভাবে। সুতরাং সে ঐ স্ত্রীর মতো হয়ে গেল যে অন্যায়ভাবে স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গেছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) আলোচ্য আলোচনায় শুধু খোরপোশ নিয়ে আলোচনা করেছেন; বাসস্থানের কথা উল্লেখ করেননি। কারণ, সে বাসস্থান পাবে। কেননা, ইদ্দতরত মহিলার জন্য আবশ্যক হলো ঘরেই অবস্থান করা। সুতরাং মহিলার অন্যায়ের কারণে বাসস্থান রহিত হবে না।

মাবসূত নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, মুরতাদ মহিলা খোরপোশ থেকে বঞ্চিত হওয়াটা মূলত মুরতাদ হওয়ার কারণে নয়; বরং মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে বন্দী করে ফেলা হয় আর নিজ অন্যায়ে বন্দি মহিলা খোরপোশ পায় না, বিধায় সেও পাবে না। সুতরাং কোনো মুরতাদ মহিলাকে যদি বন্দী করা না হয় তাহলে সে খোরপোশ পাবে। কেননা, এখানে বন্দি করা পাওয়া যায়নি। –[আইনী, ইনায়া]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ الخ : মহরের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার মহর রহিত হবে না। কেননা, মহর ওয়াজিব হয় [মিলকে বুয'আ] সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানার বিনিময়ে আর এখানে স্বামী তার মালিক হয়েছে বিধায় মহর রহিত হবে না। এমনিভাবে স্ত্রীর অন্যায় ছাড়া যদি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলেও ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রী খোরপোশ পাবে। যেমন– স্ত্রী মনিবের পক্ষ থেকে স্বাধীন হওয়ার স্বেচ্ছাধিকার বলে অথবা বালেগা হওয়ার স্বেচ্ছাধিকার বলে অথবা কুফু না হওয়ার স্বেচ্ছাধিকার বলে বিবাহ ছিন্ন হয়ে গেল। এমনিভাবে লি'আন, ইলা, খোলা' ইত্যাদি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও ইদ্দতের সময়ে স্ত্রী খোরপোশ পাবে।

এর দলিল হলো এই যে, উল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রী শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার বলে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। এটা তার অন্যায় নয়। সুতরাং তার নাফকা রহিত হবে না। যেমনটি পূর্বে নগদ মহরের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَإِنْ مَكَّنَتْ اِبْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَعْنَاهُ مَكَّنَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ وَلَا عَمَلَ فِيْهَا لِلرِّدَّةِ وَالتَّمْكِيْنِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُحْبَسُ حَتّٰى تَتُوْبَ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوْسَةِ وَالْمُمَكِّنَةُ لَا تُحْبَسُ فَلِهٰذَا يَقَعُ الْفَرْقُ ـ

অনুবাদ : আর স্বামী যদি তাকে তিন তালাক দেয় অতঃপর আল্লাহ না করেন, সে ধর্মত্যাগ করে, তাহলে তার [ইদ্দতকালীন] নাফকা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামীর পুত্রকে সম্ভোগ-সুযোগ দান করে, তাহলে নাফকা তার প্রাপ্য হবে। অর্থাৎ, তালাকের পর যদি সম্ভোগ-সুযোগ দান করে। কেননা, তিন তালাকের দ্বারাই তো বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যায়। ধর্মত্যাগ বা সম্ভোগ-সুযোগ দানের কোনো ভূমিকা তাতে নেই। তবে ধর্মত্যাগিণীকে তওবা করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়। আর বন্দিনীর কোনো নাফকা নেই। পক্ষান্তরে সম্ভোগ-সুযোগ দানকারিণীকে বন্দী করা হয় না। এ কারণেই উভয়ের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ الخ - **ধর্মত্যাগিণী ও স্বামীর পুত্রকে সম্ভোগ-সুযোগ দানকারিণীর মাঝে পার্থক্য** স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় এরপর [আল্লাহ না করুন] সে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোশ পাবে না। আর তিন তালাক দেওয়ার পর সে যদি স্বামীর অন্য ঘরের ছেলেকে সম্ভোগ-সুযোগ দান করে তাহলে এ ইদ্দতকালীন তার নাফকা রহিত হবে না।

এ দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, উভয় অবস্থাতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তিন তালাকের দ্বারা। মুরতাদ হওয়া বা স্বামীর পুত্রকে সম্ভোগ-সুযোগ দেওয়া কোনোটিরই সম্পর্ক-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু মুরতাদ হওয়ার সুরতে স্ত্রীকে বন্দী করা হবে তাওবা পর্যন্ত। আর বন্দিনী কোনো খোরপোশ পায় না– সুতরাং এ কারণে ঐ স্ত্রী খোরপোশ পাবে না। কিন্তু যে মহিলা তার স্বামীর ছেলেকে সম্ভোগ-সুযোগ দিয়েছে তাকে এ কারণে বন্দী করা হয় না, তাই সে খোরপোশ পাবে।

فَصْلٌ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ .

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : নাবালক সন্তানদের খোরপোশ পিতার একক দায়িত্ব। এতে অন্য কেউ তার অংশীদার হবে না। যেমন স্ত্রীর খোরপোশের ক্ষেত্রে তার অংশীদার হয় না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ - 'যার জন্য সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, তার জিম্মায় রয়েছে সন্তানদের মাতাদের ভরণপোষণ।' এ আয়াতে مَوْلُودٌ لَهُ দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ الخ - সন্তানের খোরপোশ : স্ত্রীর খোরপোশের আলোচনার পর গ্রন্থকার এখন সন্তানের খোরপোশ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করছেন।

নাবালক সন্তানের খোরপোশ পিতার উপর ওয়াজিব। তার এই খরচের মাঝে পিতার সাথে অন্য কেউ শরিক নয়। যেমনটি স্ত্রীর খোরপোশের ক্ষেত্রে ছিল। এ বিধানটি হলো জাহিরে রেওয়ায়েত হিসেবে এবং এ ব্যাপারে চারও ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ অর্থাৎ 'এ মহিলাদের খোরপোশ যার জন্য সন্তান, তার উপর আবশ্যক হবে।' আর আয়াতে مَوْلُودٌ لَهُ দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াত দ্বারা এভাবে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীগণের খোরপোশ সন্তানের কারণেই পুরুষের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। সন্তানের কারণে, স্ত্রী খোরপোশ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আর সন্তানের খোরপোশের ক্ষেত্রে অন্য কেউ শরিক না হওয়ার প্রমাণ হলো, স্ত্রী এবং সন্তান অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করে না। অর্থাৎ, স্ত্রী একই সময় দুজনের স্ত্রী হতে পারে না, এমনিভাবে সন্তানও দুই পিতার সন্তান হতে পারে না। ঠিক সেভাবেই তাদের জন্য যে খোরপোশ ওয়াজিব হবে, তাও অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, সন্তানের খোরপোশ মিরাস হিসেবে দুই-তৃতীয়াংশ পিতার উপর আর এক-তৃতীয়াংশ মায়ের উপর ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, নাবালক সন্তান যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার খোরপোশ দিতে পিতাকে বাধ্য করা হবে। সন্তান চাই পুত্র-সন্তান হোক বা কন্যা-সন্তান হোক। আর সাবালক সন্তান যদি দরিদ্র হয় তাহলে কন্যা-সন্তানের খোরপোশের জন্য পিতাকে বাধ্য করা হবে; পুত্র-সন্তানের খোরপোশের জন্য নয়। তবে সাবালক পুত্র-সন্তান যদি প্রতিবন্ধী হয়, যেমন- অন্ধ বা লেংড়া, অবশ ইত্যাদি, তাহলে তার খোরপোশের জন্যও পিতাকে বাধ্য করা হবে।

وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَى الْأَبِ وَأُجْرَةُ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا عَسَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ فَلَا بِهَا مَعْنًى لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا بِإِلْزَامِهَا الْإِرْضَاعَ مَعَ كَرَاهَتِهَا وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانُ الْحُكْمِ وَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ يُوْجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ أَمَّا إِذَا كَانَ لَا تُوْجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلصَّبِيِّ عَنِ الضَّيَاعِ .

অনুবাদ : ছোট শিশুটি যদি দুগ্ধপোষ্য হয়, তাহলে তার মায়ের দায়িত্ব নয় তাকে দুগ্ধদান করা। কেননা, আমরা বর্ণনা করেছি যে, শিশুর প্রাপ্য প্রয়োজন পূর্ণ করা পিতার দায়িত্ব। আর স্তন্যদানের পারিশ্রমিক ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হতে পারে যে, তার শারীরিক কোনো ওজরের কারণে সে সন্তানকে স্তন্যদানে সক্ষম নয়। সুতরাং তাকে বাধ্য করার কোনো যুক্তি নেই। আর وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا - 'কোনো জননীকে তার সন্তান দ্বারা কষ্ট দেওয়া হবে না।' আয়াতটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, তার অর্থ হলো মাকে তার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে না। আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা হলো বিধানের বিবরণ। আর এটা তখনই কার্যকরী হবে যখন স্তন্যদানের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু স্তন্যদানের জন্য যদি কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে শিশুকে অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا فَلَيْسَ عَلَى الخ - শিশু সন্তানের স্তন্যদান সম্পর্কে : দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের মায়ের উপর ঐ সন্তানকে দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করা পিতার উপর ওয়াজিব। এতে অন্য কেউ শরিক হবে না। আর দুধ পানের বিনিময়টা খোরপোশেরই অন্তর্ভুক্ত। দুধ পান ছাড়া অন্য আহার গ্রহণকারী সন্তানের খোরপোশ যেমন পিতার উপর ওয়াজিব, ঠিক তেমনিভাবে এ সন্তানের জন্য দুধ পান করাতে পারে এমন মহিলাকে পয়সা দিয়ে ব্যবস্থা করাও পিতার উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয় দলিল হলো : অনেক সময় হতে পারে, কোনো ওজরের কারণে মা দুধ পান করাতে অক্ষম হয়ে যাবে। সুতরাং মাকে দুধ পানের উপর বাধ্য করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী- لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهٗ بِوَلَدِهٖ অর্থাৎ, 'সন্তানের জন্য কোনো মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, এমনিতাবে পিতাকেও সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।' এ আয়াতের তাফসীরে হযরত থানভী (র.) বলেন, সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতা পরস্পর কোনো বিতণ্ডা করবে না। অর্থাৎ, 'মা'-এর যদি কোনো সমস্যা না থাকে, ওজর না থাকে, তাহলে তার জন্য উচিত হলো সন্তানকে দুধ পান করানো। এটা শরিয়তের পক্ষ থেকে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব। তবে এটা আদালতগত আইনের কথা নয়। শরিয়তের উক্ত বিধান তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ সে স্ত্রী হিসেবে বা ইদ্দতরত থাকবে এবং এই সময়ে দুধ পান করানোর বিনিময় গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ নেই। আর তালাক দেওয়ার কারণে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যদি দুধ পান করায়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ আছে। সে যদি দুধ দানে অস্বীকার করে, তাহলে দুধ পান করানোর জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। তবে যদি বাচ্চা অন্যের দুধ গ্রহণ না করে, তাহলে মাকে দুধ পান করানোর জন্য বাধ্য করা হবে।

এমনিভাবে মা যদি বাচ্চাকে দুধ পান করাতে চায়, আর তার দুধের মাঝে কোনো জীবাণুও না থাকে, তাহলে পিতার জন্য জায়েজ নেই সন্তানকে দুধ পান থেকে বারণ করা। আর মায়ের দুধ যদি বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে বারণ করা পিতার জন্য জায়েজ আছে। পূর্বে যে সমস্ত সুরতে দুধ পান না করানোর ব্যাপারে মাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার মাঝে একটি শর্ত হলো ঐ সময় অন্যকোনো ধাত্রী পাওয়া সম্ভব হতে হবে।

قَالَ وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا أَمَّا اِسْتِيْجَارُ الْأَبِ فَلِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهَا إِذَا أَرَادَتْ ذٰلِكَ لِأَنَّ الْحِجْرَ لَهَا وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُزْ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ إِلَّا أَنَّهَا عُذِرَتْ لِاحْتِمَالِ عِجْزِهَا فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ ظَهَرَتْ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَهٰذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ رِوَايَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ وَكَذَا فِي الْمَبْتُوْتَةِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرٰى جَازَ اِسْتِيْجَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ وَجْهُ الْأُوْلٰى أَنَّهُ بَاقٍ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَلَوِ اسْتَاجَرَهَا مَنْكُوْحَتَهُ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ لِإِرْضَاعِ ابْنٍ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهَا وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَاجَرَهَا يَعْنِي لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا جَازَ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ وَصَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, পিতা এমন কোনো স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, যে শিশুকে মায়ের কাছে রেখে স্তন্যদান করবে। যেহেতু পারিশ্রমিক পরিশোধ করা পিতার দায়িত্ব, সেহেতু পিতাই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানকারিণী নিযুক্ত করবে। আর 'মায়ের কাছে রেখে' কথাটির অর্থ হলো, মা যদি এ দাবি জানায়। কেননা, লালন-পালন মায়ের অধিকার। যদি স্বয়ং স্ত্রীকে স্ত্রী থাকা অবস্থায় কিংবা ইদ্দতের অবস্থায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য নিযুক্ত করে, তাহলে তা জায়েজ নয়। কেননা, স্তন্যদান হচ্ছে শরিয়তের বিধান হিসেবে মায়ের দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ - 'মায়েরা তাদের সন্তানদের স্তন্যদান করবে।' তবে তার অক্ষমতার সম্ভাবনার কারণে তাকে অপারগ গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানে অগ্রসর হয়েছে তখন তার সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এ কার্যটি তার জন্য অবশ্য করণীয় হবে এবং সে জন্য স্বামীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ হবে না। রাজ'ঈ তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকারীর ব্যাপারে এ হুকুম সম্পর্কে একটি মাত্র রেওয়ায়েতই রয়েছে। কেননা, তার বিবাহ-বন্ধন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আর বায়েন তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ হুকুম এবং অন্য বর্ণনামতে তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা বৈধ। কেননা, বিবাহ-বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রথম বর্ণনাটির কারণ এই যে, কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন এখনও রয়েছে। [যেমন– ইদ্দত পালন, ভরণপোষণ ও বাসস্থানের প্রাপ্যতা, স্ত্রীকে স্বামীর জাকাত প্রদানের অবৈধতা ইত্যাদি। সুতরাং পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ হবে না]। স্ত্রী থাকা অবস্থায় কিংবা ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত তার সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা, এটা তার উপর সাব্যস্ত হক নয়। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে অর্থাৎ, নিজ গর্ভজাত সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা, বিবাহ-বন্ধন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সে অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَسْتَاجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ الخ - **স্তন্যদানকারিণী নিযুক্ত করা :** পিতার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য এমন এক স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যে সন্তানকে তার মায়ের কাছে রেখে দুধ পান করাবে। বিনিময় দান করা যেহেতু পিতার দায়িত্ব, সুতরাং দুধপানকারিণী সে-ই নিযুক্ত করবে। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, সন্তানকে তার মায়ের নিকট রেখে পান করানো। এটা এ জন্য যে, লালন-পালনের অধিকার মায়ের, এমতাবস্থায় যদি দুধ পান করানোর জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে মায়ের অধিকার খর্ব করা হবে। সুতরাং মা যদি তাঁর নিকট সন্তান রাখার দাবি জানায়, তাহলে তাঁর নিকট রেখেই দুধ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَاجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ الخ - **মাকে সন্তানের স্তন্যদানের বিনিময় দেওয়া জায়েজ নেই :** সন্তানের মা সন্তানের পিতার স্ত্রী থাকা অবস্থায় কিংবা তালাকের কারণে ইদ্দত পালন অবস্থায় যদি সন্তানকে দুধ পান করায়, তাহলে তার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, শরিয়তের বিধান মোতাবেক সন্তানকে স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ অর্থাৎ, 'মা তার সন্তানকে দুধ পান করাবে।' আয়াতে يُرْضِعْنَ শব্দটি নির্দেশমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের শব্দ নির্দেশ বুঝানোর জন্য আরো অনেক ব্যবহার রয়েছে। যেমন- يَتَرَبَّصْنَ কেননা, মা স্তন্যদানে অপারগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে তাকে মাজুর ধরা হয়েছে, কিন্তু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানে অগ্রসর হওয়ার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে অক্ষম নয়; বরং সক্ষম। সুতরাং সক্ষম অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে দুধ পান করানো এখন তার উপর ওয়াজিব, বিধায় এখন এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

উক্ত বিধানটি রাজ'ঈ তালাকের কারণে ইদ্দতরত স্ত্রীর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত। কেননা, রাজ'ঈ তালাকের পরও বিবাহ-বন্ধন বহাল থাকে, এমন কি এ অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করাও জায়েজ। তবে মা যদি বায়েন তালাকের ইদ্দতরত থাকে তাহলে সে ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। কেননা, কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন এখনও বহাল রয়েছে। যেমন- ইদ্দত পালন করা, সে ভরণপোষণ পাওয়া ইত্যাদি। আর অন্য বর্ণনা মতে, পারিশ্রমিক হিসেবে বিনিময় জায়েজ আছে। কেননা, বায়েন তালাকের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَاجَرَهَا مَنْكُوحَتَهُ الخ : দুধপানকারী সন্তান যেহেতু এ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নয়, তাই এ সন্তানকে দুধ পান করানোও এ স্ত্রীর উপর আবশ্যক নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই

قَوْلُهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَاجَرَهَا الخ : তালাকের ইদ্দত পালনের পর পূর্ব স্বামী যদি নিজ গর্ভজাত সন্তানকে স্তন্যদানের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে নিযুক্ত করে, তাহলে তা জায়েজ আছে। কেননা, ইদ্দত শেষ হওয়ার দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং এ স্ত্রী অন্যান্য মহিলাদের ন্যায় হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যান্য মহিলাদেরকে যেমন বিনিময় দেওয়া জায়েজ অনুরূপ তাকেও বিনিময় দেওয়া জায়েজ হবে।

فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَاجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ اَجْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ اَجْرٍ كَانَتْ هِيَ أَحَقُّ لِأَنَّهَا اَشْفَقُ فَكَانَ نَظَرًا لِلصَّبِيِّ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهَا وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ اَىْ بِإِلْزَامِهِ لَهَا اَكْثَرَ مِنْ اُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ـ

وَنَفَقَةُ الصَّغِيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيْهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِيْ دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِيْ دِيْنِهِ أَمَّا الْوَلَدُ فَلِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (الْآيَة) وَلِأَنَّهُ جُزْؤُهُ فَيَكُوْنُ فِيْ مَعْنَى نَفْسِهِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الْاِحْتِبَاسِ الثَّابِتِ بِهِ وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْكَافِرَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْاِحْتِبَاسُ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَفِيْ جَمِيْعِ مَا ذَكَرْنَا إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ وَإِذَا كَانَ فَالْأَصْلُ اَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ فِيْ مَالِ نَفْسِهِ صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا ـ

অনুবাদ : পিতা যদি বলে, একে আমি নিযুক্ত করব না। অতঃপর সে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে এল, তখন মা বাইরের স্ত্রীলোকটির সমান পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে স্তন্যদানে সম্মত হয়, তাহলে মা অধিক হকদার হবে। কেননা, মা অধিকতর মমতাময়ী। সুতরাং তার হাতে অর্পণ করাতেই শিশুর কল্যাণ রয়েছে। তবে যদি অন্য মহিলাদের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দাবি করে, তাহলে স্বামীকে তা প্রদানে বাধ্য করা যাবে না। উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর [আর্থিক] ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করা। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে- وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ - 'জননীকে তার সন্তান দ্বারা এবং যার জন্য সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, তাকে তার সন্তান দ্বারা কষ্ট দেওয়া যাবে না।' অর্থাৎ, সন্তানের মাকে ভিন্ন স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দানে পিতাকে বাধ্য করার দ্বারা। নাবালক সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার, যদিও সে পিতার বিপরীত ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তায়, যদিও স্ত্রী ধর্ম-বিশ্বাসে তার থেকে ভিন্ন হয়। সন্তানের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ [যার ঔরসজাত সন্তান, তাদের ভরণপোষণ তার জিম্মায়] আয়াতটি নিঃশর্ত। আর এজন্যও যে, সন্তান হলো পিতার দেহের অংশ। সুতরাং সন্তান পিতার সত্তারই নামান্তর হবে। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে বিবাহের বিশুদ্ধ আকদ। কেননা, ভরণপোষণ হচ্ছে বিবাহের মাধ্যমে বিদ্যমান আবদ্ধতার বিনিময়, আর মুসলিম ও কিতাবী নারীর মাঝে বিবাহের আকদ বিশুদ্ধ রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে আবদ্ধতা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। আমাদের উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে পিতার উপর ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে, যদি নাবালক সন্তানের নিজস্ব মাল না থাকে। আর যদি থাকে, তাহলে বড় হোক ছোট হোক, মানুষের ভরণপোষণ নিজস্ব মাল থেকে হওয়াই হলো আসল বিধান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ الخ - সমপারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে মা প্রাধান্য পাবে : স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সন্তানের দুধ পানের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে মা যদি অন্যান্য মহিলাদের সমপরিমাণই বিনিময় দাবি করে, তাহলে সে অবস্থায় তাঁকে নিযুক্ত না করে ঐ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অন্য মহিলা নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। এ ক্ষেত্রে মাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা, মা সন্তানের জন্য অধিক মমতাময়ী। সুতরাং তাঁর নিকট দেওয়াটাই সন্তানের জন্য কল্যাণকর। তবে অন্যান্য মহিলার তুলনায় মা যদি অধিক পারিশ্রমিক দাবি করে, তাহলে অধিক বিনিময় দিয়ে মার দ্বারা দুধপান করাতে পিতা বাধ্য নয়। কেননা, এতে পিতার আর্থিক ক্ষতি রয়েছে। কুরআন শরীফের ভাষায়– وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ অর্থাৎ, 'সন্তানের মাধ্যমে মাকে কষ্ট দেওয়া হবে না; বরং পিতাকেও তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া হবে না।' সুতরাং মা যদি বেশি বিনিময় চায়, তাহলে মা ছাড়া অন্য মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য নিযুক্ত করবে। আর সেই মহিলা এ বাচ্চাকে তার মায়ের নিকট রেখে দুধ পান করাবে।

قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ الخ - নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব : নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব– চাই পিতা-পুত্রের ধর্ম এক হোক বা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন– পিতা কাফের, কিন্তু নাবালক সন্তান মুসলমান হয়ে গেল অথবা পিতা মুসলমান, কিন্তু সন্তান মুরতাদ হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, নাবালক সন্তান যদি সঠিক বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণ করা বা মুরতাদ হওয়া গ্রহণযোগ্য। এমনিভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব– চাই তার ধর্ম ভিন্ন হোক।

নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ হলো কুরআন শরীফের আয়াত– وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ এ আয়াতটি স্ত্রীর নাফকা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য। আর সন্তানের নাফকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে আয়াতটি হলো গভীর অর্থমূলক [দালালাতুন নাস], যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর আয়াতটি যেহেতু নিঃশর্ত, তাই নিঃশর্তভাবেই সন্তানের ভরণপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব হবে– সন্তানের সাথে ধর্মের দিক দিয়ে এক হোক বা ভিন্ন।

আর দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সন্তান তার পিতার দেহের অংশ। সুতরাং সন্তান নিজ সত্তার মতো। আর আপন সত্তার ভরণপোষণ নিজের উপর আবশ্যক তেমনিভাবে সন্তানের ভরণপোষণও আবশ্যক হবে।

স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার দলিল : স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো বিবাহ-বন্ধন বিশুদ্ধ হওয়া। কেননা, বিশুদ্ধ বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর উপকারার্থে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আর এ আবদ্ধতার কারণেই সে ভরণপোষণ প্রাপ্য হবে। আর এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা বিশুদ্ধ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐ আহলে কিতাব স্ত্রী নাফকা প্রাপ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, আমরা পূর্বে নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব হওয়ার যে কথা বলে এসেছি তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাচ্চার যদি নিজস্ব কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে। আর সন্তানের যদি নিজস্ব কোনো সম্পদ থাকে, তাহলে সেই সম্পদ থেকে তার ভরণপোষণ ব্যবস্থা করা হবে। কেননা, নিজ সম্পদ থেকে ভরণপোষণ হওয়াই হলো আসল– চাই সে ছোট হোক বা বড়। তবে স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন।

জ্ঞাতব্য : ছোট সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকাটা অবাস্তব কোনো বিষয় নয়; বরং তা বাস্তবসম্মত। যেমন– সে অন্য কোনো আত্মীয় থেকে মিরাস হিসেবে পেল, অথবা তাকে কেউ উপঢৌকন দিয়েছে। সন্তানের যদি জমিন, কাপড় অথবা প্রাণী থাকে, তাহলে পিতা মুতাওয়াল্লী হয়ে তা বিক্রি করে সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

فَصْلٌ وَعَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُنْفِقَ عَلٰى اَبَوَيْهِ وَاَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ اِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ وَاِنْ خَالَفُوْهُ فِىْ دِيْنِهِمْ اَمَّا الْاَبَوَانِ فَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِى الْاَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ يَعِيْشَ فِىْ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَيَتْرُكُهُمَا يَمُوْتَانِ جُوْعًا وَاَمَّا الْاَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلِاَنَّهُمْ مِنَ الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ وَلِهٰذَا يَقُوْمُ الْجَدُّ مَقَامَ الْاَبِ عِنْدَ عَدَمِهٖ وَلِاَنَّهُمْ سَبَّبُوْا لِاِحْيَائِهٖ فَاسْتَوْجَبُوْا عَلَيْهِ الْاِحْيَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْاَبَوَيْنِ وَشُرِطَ الْفَقْرُ لِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ ذَا مَالٍ فَاِيْجَابُ نَفَقَتِهٖ فِىْ مَالِهٖ اَوْلٰى مِنْ اِيْجَابِهَا فِىْ مَالِ غَيْرِهٖ وَلَا يَمْنَعُ ذٰلِكَ بِاخْتِلَافِ الدِّيْنِ لِمَا تَلَوْنَا .

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : মানুষের কর্তব্য হলো তার দরিদ্র মা-বাবা ও দাদা-দাদির ভরণপোষণ করা, যদিও ধর্মমতে তারা তার থেকে ভিন্ন হয়। মা-বাবার ভরণপোষণের আবশ্যকতার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - 'দুনিয়াতে সদাচারের সঙ্গে তাদের সাহচর্য রক্ষা কর।' এ আয়াত নাজিল হয়েছে কাফের পিতামাতা সম্পর্কে। আর এটা কোনো সদাচার নয় যে, সন্তান আল্লাহর নিয়ামত-প্রাচুর্যের মাঝে বাস করবে। অথচ পিতামাতাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু মুখে ছেড়ে দেবে। দাদা-দাদিদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তারাও পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই পিতার অবর্তমানে দাদা তার স্থলবর্তী হয়ে থাকে। তাছাড়া এরা তো লোকটির জীবন লাভের মাধ্যম। সুতরাং এখন তারা পিতামাতার পর্যায়ে তার নিকটে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার হকদার হবে। ইমাম কুদূরী (র.) দারিদ্র্যের শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা, পিতা ধনবান হলে তার ভরণপোষণের ভার অন্যের মালের উপর আরোপ করার পরিবর্তে নিজের মালের উপর আরোপ করারই অগ্রাধিকার রয়েছে। আর ধর্মমতের ভিন্নতার কারণে ভরণপোষণ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। তার প্রমাণ আমাদের তেলাওয়াতকৃত উপরিউক্ত আয়াত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُنْفِقَ عَلٰى اَبَوَيْهِ الخ - **পিতামাতা, দাদা-দাদির ভরণপোষণ প্রসঙ্গে :** মানুষের উপর ওয়াজিব হলো দরিদ্র মা-বাবা, দাদা-দাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। যদিও তারা ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী হয়। পিতামাতার ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ .

অর্থাৎ 'তারা দুজন যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে এমন কাউকে শরিক করতে, যার পক্ষে কোনো দলিল নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না। আর দুনিয়াতে সদাচারের সঙ্গে তাদের সাহচর্য রক্ষা কর। আর যারা আমার দিকে ধাবিত, তাদের পথ অনুসরণ কর।' –[সূরা লোকমান]

এ আয়াত হযরত সা'আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মা জামিলা ছিল কাফের। হযরত সা'আদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে পানাহার বর্জন করে দেয়। তখন হযরত সা'আদ (রা.) রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পুরো বিষয়টি অবগত করালে উক্ত আয়াত নাজিল হয়, যার সারমর্ম হলো–

ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করো না, তবে দুনিয়াতে তার সঙ্গে সদাচরণ কর। আর এটা সদাচরণ হতে পারে না যে, নিজে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজিতে ডুবে থাকবে, আর পিতামাতা না খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে। এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, পিতামাতা যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সন্তানের উপর ওয়াজিব, যদিও তাদের ধর্ম ভিন্ন হয়।

হযরত শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) শরহে কাফীতে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তা হলো এভাবে যে, এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর প্রয়োজনের সময় তাদের চাহিদা পূরণ না করা, ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করা তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার পিতামাতার ভরণপোষণ ওয়াজিব। আর উক্ত আয়াতটি যেহেতু নিঃশর্ত, তাই পিতামাতা ভিন্ন ধর্মামতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভরণপোষণ দিতে হবে। তাছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন– إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِهِمْ অর্থাৎ, 'মানুষের সবচেয়ে উত্তম খানা হলো নিজ উপার্জিত খাওয়া, আর তার সন্তানও তার উপার্জন, সুতরাং সন্তানের উপার্জন থেকে তোমরা ভক্ষণ কর।' এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার ভরণপোষণ সন্তানের উপর ওয়াজিব।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে– وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا আয়াতে এমন পিতামাতার সাথে দুনিয়াতে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যারা হরবী তথা 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ' নয়। যদি পিতামাতা হরবী হয় আর সাময়িক সময়ের জন্য নিরাপত্তা নিয়েও যদি দারুল ইসলামে আসে, তাহলেও সন্তানকে বাধ্য করা হবে না তাদেরকে ভরণপোষণ দিতে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

অর্থাৎ, 'দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো জালিম।' –[সূরা মুমতাহিনা : ৮ - ৯]

এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধবাজদের সাথে সদাচরণ করা হবে না। তবে যে কাফের যুদ্ধবাজ নয় তাদের সাথে সদাচরণ করতে নিষেধ নেই। সুতরাং পিতামাতা যদি কাফের যুদ্ধবাজ না হয়, তাহলে সন্তান তাদেরকে ভরণপোষণ দেবে, আর যুদ্ধবাজ হলে ভরণপোষণ দেবে না।

পিতামাতা ব্যতীত দাদা-দাদিদের ভরণপোষণ আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ হলো, তাঁরাও পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত। তাইতো পিতামাতা না থাকলে দাদা-দাদি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান। আর দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, দাদা-দাদিও মানুষের দুনিয়ায় আসার মাধ্যম। সুতরাং পিতামাতার মতো তাদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে এসবের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, তারা দরিদ্র হতে হবে। কেননা, তারা যদি সচ্ছল হয়, তাহলে নিজ সম্পদ থেকেই নিজ ভরণপোষণ ভার বহন করা উত্তম। রাসূল ﷺ -ও বলেছেন– كُلْ مِنْ كَدِّ يَمِيْنِكَ وَعَرَقِ جَبِيْنِكَ অর্থাৎ 'নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ থেকে ভক্ষণ কর।' আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি ভরণপোষণের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তার দলিল হলো, উক্ত আয়াত– وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا আয়াত সুস্পষ্টভাবে বুঝায় যে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে, যদিও তারা কাফের হয়। ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ إِخْتِلَافِ الدِّيْنِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْاَبَوَيْنِ وَالْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ اَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعَقْدِ لِاِحْتِبَاسِهَا لِحَقٍّ لَهُ مَقْصُوْدٍ وَهٰذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاِتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَاَمَّا غَيْرُهَا فَلِاَنَّ الْجُزْئِيَّةَ ثَابِتَةٌ وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِيْ مَعْنٰى نَفْسِهٖ فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ نَفْسِهٖ بِكُفْرِهٖ لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ جُزْئِهٖ اِلَّا اَنَّهُمْ اِذَا كَانُوْا حَرْبِيِّيْنَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَاِنْ كَانُوْا مُسْتَامِنِيْنَ لِاَنَّا نُهِيْنَا عَنِ الْبِرِّ فِيْ حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّيْنِ ـ

অনুবাদ : ধর্মমতের ভিন্নতা থাকা অবস্থায় শুধু স্ত্রী, পিতামাতা, দাদা-দাদি এবং সন্তান ও সন্তানের সন্তান ব্যতীত আর কারো ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব হওয়ার কারণ আমরা বলে এসেছি যে, এটা তো আবশ্যক সাব্যস্ত হয় বিবাহের আকদের কারণে। কেননা, সে পুরুষের এমন একটি হক পূরণের জন্য আবদ্ধ থাকে, যা বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তা ধর্মমতের অভিন্নতার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দৈহিক আংশিকতা সাব্যস্ত রয়েছে। আর মানুষের অংশ তার সত্তারই সমার্থক। সুতরাং নিজের কুফরির কারণে মানুষের নিজের ভরণপোষণ যেমন বাধাগ্রস্ত হয় না, তেমনি তার অংশের ভরণপোষণও বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তবে তারা যদি দারুল হরবের বাসিন্দা হয়, তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে বাস করলেও মুসলমানদের উপর তাদের ভরণপোষণের কর্তব্য বর্তাবে না। কেননা, ধর্মের প্রশ্নে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, তাদের সাথে সদাচার করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ إِخْتِلَافِ الدِّيْنِ الخ : ধর্মমতের ভিন্নতা থাকা অবস্থায়ও যাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হয় : ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী, মা-বাবা, দাদা-দাদি এবং সন্তান বা সন্তানের সন্তান -এর ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। এছাড়া অন্যান্যদের ভরণপোষণ ধর্মের ভিন্নতা অবস্থায় ওয়াজিব হবে না।

ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ আকদে নিকাহ বিশুদ্ধ হওয়া। কেননা, স্ত্রী তার স্বামীর মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবদ্ধ থাকে, বিধায় এখানে ধর্ম এক বা ভিন্ন হওয়ার বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়।

আর স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দেহের অংশ হওয়াটা প্রমাণিত। আর মানুষের অংশ তার সত্তারই সমার্থক। সুতরাং কোনো ব্যক্তি কাফের হওয়ার কারণে নিজের ভরণপোষণ যেমন রহিত হয় না, ঠিক এমনিভাবে যাদের সাথে অংশ হওয়া প্রমাণিত, তাদের ভরণপোষণও রহিত হবে না, বিধায় তারা দরিদ্র হলে সবার ভরণপোষণ দিতে হবে।

তবে তারা যদি হরবী হয়, মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, তাহলে তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না। যদিও তারা নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করুক। কেননা, যারা ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সাথে লড়াই করে তাদের সাথে সদাচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মোটকথা, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হরবী না হলে নাফকা পাবে; আর হরবী হলে নাফকা পাবে না।

وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ وَكَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ اَخِيْهِ النَّصْرَانِيِّ لِاَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْاِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمِلْكِ لِاَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ وَلِاَنَّ الْقَرَابَةَ مُوْجِبَةٌ لِلصِّلَةِ وَمَعَ الْاِتِّفَاقِ فِى الدِّيْنِ اٰكَدُ وَ دَوَامُ مِلْكِ الْيَمِيْنِ اَعْلٰى فِى الْقَطِيْعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ فَاعْتَبَرْنَا فِى الْاَعْلٰى اَصْلَ الْعِلَّةِ وَفِى الْاَدْنٰى اَلْعِلَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ فَلِهٰذَا اِفْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : খ্রিস্টানের জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ মুসলমানের উপর খ্রিস্টান ভাইয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। কেননা, কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ভরণপোষণের সম্পর্ক হলো উত্তরাধিকারের সাথে, আর মালিকানা লাভের সময় মাহরাম আত্মীয়দের মুক্ত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মুক্তির বিষয়টি আত্মীয়তা ও মাহরামের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া নিকটাত্মীয়তা সদয় সম্পর্ক রক্ষার দাবি করে। আর ধর্মমতের ঐক্যের সময় সে দাবি অধিকতর জোরদার হয়। অন্যদিকে দাসত্বগত মালিকানা অব্যাহত থাকা সম্পর্ক কর্তনের ক্ষেত্রে ভরণপোষণের বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে গুরুতর। সুতরাং গুরুতর ক্ষেত্রে আমরা মূল কারণ বিবেচনা করেছি। আর লঘুতর ক্ষেত্রে অধিকতর জোরদার হওয়ার কারণটি বিবেচনা করেছি। সুতরাং এ কারণেই উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ الخ - **ধর্মের ভিন্নতার কারণে যাদের ভরণপোষণ দিতে হয় না :** দরিদ্র ভাই যদি ভিন্ন ধর্মমতের হয়, তাহলে তার ভরণপোষণ দেওয়া আবশ্যক নয়। তাই খ্রিস্টান ভাইয়ের উপর মুসলমান ভাইয়ের ভরণপোষণ অথবা মুসলমান ভাইয়ের উপর খ্রিস্টান ভাইয়ের ভরণপোষণ দেওয়া আবশ্যক নয়। এর কারণ হলো, কুরআনের ভাষ্য عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ -"ওয়ারিশের উপর অনুরূপ আবশ্যক" এ সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ভরণপোষণের সম্পর্ক মিরাসের সাথে। অর্থাৎ, যাদের পরস্পর মিরাসের সম্পর্ক আছে তাদের মাঝে ভরণপোষণ হবে। আর মুসলমান ও জিম্মির মাঝে যেহেতু মিরাসের সম্পর্ক নেই সুতরাং একে অন্যের থেকে ভরণপোষণও পাবে না।

তবে মুসলমান যদি তার খ্রিস্টান ভাইকে ক্রয় করে তাহলে মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, আজাদ হওয়ার বিষয়টি আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কিত। তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয় মাহরাম ব্যক্তির মালিক হবে, সে তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে।' সুতরাং এখানে যেহেতু দুটোই পাওয়া গেছে অর্থাৎ, নিকটাত্মীয়তা আর মাহরাম হওয়া, তাই আজাদ হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় দলিল হলো, নিকটাত্মীয় হওয়াটা ইহসান ও দয়া করাকে আবশ্যক করে। এর সাথে সাথে ধর্মের দিক থেকেও যদি এক হয়ে যায় অর্থাৎ, দুজন মুসলমান হয় তাহলে ঐ দয়া করার দায়িত্বটা আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আর কোনো নিকটাত্মীয়কে সব সময় নিজের দাস বানিয়ে রাখার মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ করার বিষয়টি বিদ্যমান যা ভরণপোষণ না দেওয়ার মাঝে নেই। তাই আমরা নিকটাত্মীয়তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছি যে, মালিক হলেই আজাদ হয়ে যাবে- ধর্মমতের হোক বা না হোক। তবে ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্কের দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাই এক ধর্মের হলে ভরণপোষণ পাবে, অন্যথায় নয়। অতএব দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِيْ نَفَقَةِ اَبَوَيْهِ اَحَدٌ لِاَنَّ لَهُمَا تَاوِيْلًا فِيْ مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ وَلَا تَاوِيْلَ لَهُمَا فِيْ مَالِ غَيْرِهِ وَلِاَنَّهُ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِمَا فَكَانَ اَوْلٰى بِاِسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ وَهِيَ عَلَى الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْمَعْنٰى يَشْمُلُهُمَا ـ

অনুবাদ : পিতামাতার ভরণপোষণের ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে অন্য কেউ শরিক হবে না। কেননা, হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী সন্তানের সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু অন্যকোনো আত্মীয়ের সম্পদে তাদের জন্য এ বিবরণ নেই তাছাড়া সন্তান পিতামাতার নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং সন্তানের উপর তাদের ভরণপোষণের হকের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী পিতামাতার ভরণপোষণ পুত্র-সন্তান ও কন্যা-সন্তান উভয়ের উপর সমভাবে আরোপিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, হাদীসের ব্যাখ্যা উভয়কে সমভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِيْ نَفَقَةِ اَبَوَيْهِ الخ - **পিতামাতার ভরণপোষণ একক সন্তানের দায়িত্ব :** পিতামাতা যদি দরিদ্র হয়, আর তাদের সন্তান সম্পদশালী হয়, তাহলে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সন্তানের উপর ওয়াজিব হবে। ভরণপোষণ দানের ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে অন্য কেউ শরিক হবে না। কেননা, হাদীসের ভাষ্য– اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ [তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য] অনুযায়ী সন্তানের সম্পদ পিতার নিজস্ব সম্পদ বলা যায়, কিন্তু অন্যের সম্পদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না। বিধায় সন্তানের সম্পদ দ্বারা তাদেরকে সচ্ছল গণ্য করা হবে, আর সচ্ছল ব্যক্তির ভরণপোষণ অন্যের উপর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তাদের ভরণপোষণে অন্য কেউ শরিক হবে না।

আর দ্বিতীয় দলিল হলো, ভরণপোষণ হাদিয়া-উপঢৌকনমূলক বস্তু, যা নৈকট্যের কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং যে পিতামাতার বেশি নিকটতম হবে সে-ই ভরণপোষণ দানের অধিক দায়িত্বশীল হবে। আর সন্তানই যেহেতু পিতামাতার অধিক নিকটতম তাই তাদের উপরই ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। আর পিতামাতার ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয় সমান। জাহিরে রেওয়ায়েতে বিষয়টি এভাবেই রয়েছে এবং এটাই বিশুদ্ধ। সুতরাং পিতা যদি অসচ্ছল হয়, আর তার ছেলেমেয়ে সচ্ছল হয় তাহলে তাদের দুজনের উপর অর্ধেক করে ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। কেননা, ভরণপোষণের কারণ দুজনের ক্ষেত্রে সমভাবে বিদ্যমান। তবে ভাইয়ের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ, কোনো দরিদ্র ভাইয়ের যদি একজন ভাই ও একজন বোন সচ্ছল থাকে তাহলে ঐ দরিদ্র ভাইয়ের ভরণপোষণকে তিন ভাগ করে দুই ভাগ খরচ সচ্ছল ভাই আর এক ভাগ খরচ সচ্ছল বোন বহন করবে; যেমনটি মিরাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা, এখানে নাফকা ওয়াজিব হওয়ার [সবব] কারণ হলো মিরাসের সম্পর্ক হওয়া। সুতরাং সে হিসেবেই ভরণপোষণকে ভাগ করা হবে।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) বলেন, পিতার ভরণপোষণ-খরচও ছেলেমেয়ের মাঝে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। অর্থাৎ, দুই ভাগ খরচ ছেলের উপর আর এক ভাগ মেয়ের উপর। ইমাম সারাখসী (র.) ভরণপোষণকে মিরাসের সাথে তুলনা করেন। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ [পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ পাবে।] নীতি অবলম্বন করেছেন।

وَالنَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِىْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا أَوْ كَانَتْ اِمْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيْرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيْرًا زَمِنًا أَوْ أَعْمٰى لِأَنَّ الصِّلَةَ فِى الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ وَاجِبَةٌ دُوْنَ الْبَعِيْدَةِ وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَفِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) وَعَلَى الْوَارِثِ ذِى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ وَالصِّغَرُ وَالْأُنُوْثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمٰى أَمَارَةُ الْحَاجَةِ لِتَحَقُّقِ الْعِجْزِ فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ غَنِىٌّ بِكَسْبِهٖ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهٗ يَلْحَقُهُمَا تَعَبُ الْكَسْبِ وَالْوَلَدُ مَأْمُوْرٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدْرَتِهِمَا عَلَى الْكَسْبِ قَالَ وَيَجِبُ ذٰلِكَ عَلٰى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ وَلِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ وَالْجَبْرُ لِإِيْفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ .

অনুবাদ : আর যে-কোনো মাহরাম আত্মীয়ের জন্য ভরণপোষণ সাব্যস্ত হয়, যদি সে ছোট ও দরিদ্র হয়। কিংবা প্রাপ্তবয়স্কা নারী দরিদ্র হয়। কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দরিদ্র ও পঙ্গু বা অন্ধ হয়। কেননা, নিকটাত্মীয়তার ক্ষেত্রে সহানুভূতি ওয়াজিব; দূরবর্তী আত্মীয়তার ক্ষেত্রে নয়। আর দূর ও নিকটের মাঝে পার্থক্যকারী হলো মাহরাম আত্মীয়তা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ "আর ওয়ারিশের উপর অনুরূপ ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে।" আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে রয়েছে– وَعَلَى الْوَارِثِ ذِى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذٰلِكَ [সুতরাং বুঝা গেল যে, ওয়াজিব দ্বারা মাহরাম আত্মীয় উদ্দেশ্য]। আর [নাফকা ওয়াজিব হওয়ার জন্য] অভাবগ্রস্ত হওয়া জরুরি। আর অল্পবয়স্কতা, নারীত্ব, পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব হলো অভাবগ্রস্ত হওয়ার আলামত। কেননা, এগুলো দ্বারা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। কারণ, উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি তো তার উপার্জনের মাধ্যমে অভাবমুক্ত। পিতামাতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাতে তাদেরকে উপার্জনের কষ্ট ভোগ করতে হবে। অথচ সন্তান তাদের কষ্ট দূর করতে শরিয়তের পক্ষ হতে আদিষ্ট। সুতরাং উপার্জন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব। ইমাম কুদূরী বলেন, আর নাফকা মিরাসের পরিমাণ অনুপাতে সাব্যস্ত হবে এবং তা প্রদানে বাধ্য করা হবে। কেননা, ওয়ারিশ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ পরিমাণ অনুপাতের বিষয়টি বিশেষভাবে অবহিত করে। আর দায়দায়িত্ব লাভ অনুপাতেই সাব্যস্ত হয়। আর বাধ্য করার কারণ হলো যাতে সে পূর্ণ হক আদায় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাহরাম আত্মীয়দের ভরণপোষণ : মাহরাম আত্মীয় যদি নাবালক দরিদ্র হয়, অথবা সাবালক মহিলা দরিদ্র হয়, অথবা সাবালক পুরুষ দরিদ্র, পঙ্গু অথবা অন্ধ হয়, তাহলে তাকে ভরণপোষণ দেওয়া আবশ্যক।

ذِىْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ - মাহরাম আত্মীয় হলো ঐ আত্মীয়, যার সাথে চিরতরের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। এখানে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে– আত্মীয় ও মাহরাম। কেননা, যদি কেউ আত্মীয় হয় কিন্তু মাহরাম না হয়; যেমন– চাচাতো ভাই, অথবা মাহরাম হয়, কিন্তু আত্মীয় না হয় যেমন– দুধ ভাই-বোন, অথবা দুটোই পাওয়া যায়, কিন্তু নিকটতম হওয়াটা পাওয়া না যায় যেমন– চাচাতো ভাই যিনি আবার দুধভাইও, এ শ্রেণীর লোকদের ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়।

মোটকথা, উপরোল্লিখিত লোকদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, নিকটতম আত্মীয় হওয়াটা ইহসান ও অনুগ্রহ করাকে আবশ্যক করে, দূরের আত্মীয়তা তা আবশ্যক করে না। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ অর্থাৎ, 'ওয়ারিশদের জন্য অনুরূপ আবশ্যক।' আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে– وَعَلَى الْوَارِثِ ذِى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'প্রত্যেক এমন ওয়ারিশের উপর যার সাথে সর্বসময়ের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক নাজায়েজ তাদের উপর অনুরূপ ওয়াজিব।' আর নিকটতম আত্মীয় ও দূরের আত্মীয় এ দুয়ের মাঝে ব্যবধানকারী বিষয় হলো মাহরাম আত্মীয় হলো নিকটতম আত্মীয়, আর অন্যথায় দূরবর্তী আত্মীয়।

আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য দরিদ্র হওয়া জরুরি। আর নাবালক হওয়া, মহিলা হওয়া, পঙ্গু হওয়া, অন্ধ হওয়া দরিদ্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা, এসব বিষয় দ্বারা উপার্জনে অক্ষম হয়ে যায়। কারণ, যে ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে, সে তার উপার্জন দ্বারা সক্ষম। তবে পিতামাতার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তারা উপার্জনে সক্ষম হলেও সন্তানদের উপর তাদের ভরণপোষণ আবশ্যক। কেননা, উপার্জন করতে পিতামাতার কষ্ট হবে। অথচ সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিতামাতাকে কষ্ট না দিতে। সুতরাং পিতামাতা উপার্জনে সক্ষম হলেও সন্তানের উপর তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجِبُ ذٰلِكَ عَلٰى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ الخ - **ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ :** ভরণপোষণ মিরাসের পরিমাণ হিসেবে ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ, যে পরিমাণ মিরাস পাওয়া যায় সে পরিমাণ ভরণপোষণ দেওয়াও ওয়াজিব হবে। সে পরিমাণ নাফকা দিতে তাকে বাধ্য করা হবে। **দলিল হলো :** কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে– وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ বলাটা উক্ত বিষয়কে সুস্পষ্ট করে। তাছাড়া আরেকটি দলিল হলো, লাভ প্রাপ্তি হিসেবে জরিমানা ওয়াজিব হয়– এই নীতির আলোকে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ত্যাজ্য সম্পদ যে হিসেবে পাবে, তার জীবদ্দশায়ও তার প্রয়োজন সে হিসেবেই আদায় করতে হবে।

قَالَ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْاِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْاِبْنِ الزَّمِنِ عَلٰى اَبَوَيْهِ اَثْلَاثًا عَلَى الْاَبِ الثُّلُثَانِ وَعَلَى الْاُمِّ الثُّلُثُ لِاَنَّ الْمِيْرَاثَ لَهُمَا عَلٰى هٰذَا الْمِقْدَارِ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْخَصَّافِ وَالْحَسَنِ (رح) وَفِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْاَبِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَصَارَ كَالْوَلَدِ الصَّغِيْرِ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى اَنَّهٗ اِجْتَمَعَتْ لِلْاَبِ فِى الصَّغِيْرِ وِلَايَةٌ وَمُؤْنَةٌ حَتّٰى وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهٖ فَاخْتَصَّ بِنَفَقَتِهٖ وَلَا كَذٰلِكَ الْكَبِيْرُ لِاِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيْهِ فَتُشَارِكُهُ الْاُمُّ وَفِىْ غَيْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيْرَاثِ حَتّٰى تَكُوْنَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْاُمِّ وَالْجَدِّ اَثْلَاثًا وَنَفَقَةُ الْاَخِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْاَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُوْسِرَاتِ اَخْمَاسًا عَلٰى قَدْرِ الْمِيْرَاثِ غَيْرَ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَهْلِيَّةُ الْاِرْثِ فِى الْجُمْلَةِ لَا اِحْرَازُهٗ فَاِنَّ الْمُعْسِرَ اِذَا كَانَ لَهٗ خَالٌ وَابْنُ عَمٍّ تَكُوْنُ نَفَقَتُهٗ عَلٰى خَالِهٖ وَمِيْرَاثُهٗ يَحْرِزُهٗ اِبْنُ عَمِّهٖ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ لِبُطْلَانِ اَهْلِيَّةِ الْاِرْثِ وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা এবং [প্রাপ্তবয়স্ক] পঙ্গু পুত্রের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাদের পিতামাতার উপর তিন ভাগ ভিত্তিতে বর্তাবে। অর্থাৎ, পিতার দায়িত্ব হবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাতার দায়িত্ব হবে এক-তৃতীয়াংশ। কেননা, তাদের জন্য মিরাস এ অনুপাতেই সাব্যস্ত হয়। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুদূরী যা উল্লেখ করেছেন তা ইমাম খাসসাফ ও হাসান (র.)-এর বর্ণনা। পক্ষান্তরে জাহিরে রেওয়ায়েত মতে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ হলো পিতার দায়িত্বে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ - 'যার জন্য সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, তার কর্তব্য হলো তাদের ভরণপোষণ।' এভাবে সে [প্রাপ্তবয়স্ক পঙ্গু পুত্র] অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সমতুল্য হয়ে গেল। প্রথম বর্ণনা মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, ছোট সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার অভিভাবকত্ব ও দায়দায়িত্ব এ দুটোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এজন্যই ছোট সন্তানের সাদাকাতুল ফিতর পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং তার ভরণপোষণের ক্ষেত্রেও পিতা একক হবেন। পক্ষান্তরে বয়স্ক পুত্র তেমন নয়। কেননা, তার উপর অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং পিতার সঙ্গে মাতাও অংশীদার হবে। পক্ষান্তরে পিতা ছাড়া অন্যদের উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব অপরজনের ক্ষেত্রে মীরাসের পরিমাণ অনুপাত বিবেচ্য। সুতরাং মা ও দাদির উপর শিশুর ভরণপোষণ তিনভাগ ভিত্তিতে হবে। দরিদ্র ভাইয়ের ভরণপোষণ [আপন কিংবা বাপ-শরীক কিংবা মা-শরীক] বিভিন্ন প্রকার সচ্ছল বোনদের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ, পাঁচভাগ মিরাসের পরিমাণ অনুপাতে বর্তাবে। তবে বিবেচ্য হলো মিরাস লাভের 'নীতিগত' যোগ্যতা; 'সংরক্ষিত' যোগ্যতা নয়। যেমন দরিদ্র লোকটির যদি সচ্ছল মামা এবং সচ্ছল চাচাতো ভাই থাকে, তাহলে ভরণপোষণের দায়িত্ব হবে মামার। [কেননা, মামা হলো মাহরাম আত্মীয়; আর চাচাতো ভাই তা নয়] অথচ তার মিরাস সংরক্ষণ করবে চাচাত ভাই। ধর্মমতের ভিন্নতার অবস্থায় মাহরাম আত্মীয়ের ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। কেননা, মিরাসের যোগ্যতা বাতিল হয়ে গেছে, অথচ তা বিবেচনায় রাখা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ الخ : প্রাপ্তবয়স্ক মাজুর সন্তানের ভরণপোষণ প্রদান পিতামাতার দায়িত্ব : প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার ভরণপোষণ এবং প্রাপ্তবয়স্ক পঙ্গু পুত্রের ভরণপোষণ পিতামাতার উপর তিনভাগ ভিত্তিতে আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ পিতার উপর আর এক-তৃতীয়াংশ মাতার উপর বর্তাবে। এর প্রমাণ হলো, সন্তান যদি সম্পদ রেখে মারা যায়, তাহলে তার ত্যাজ্য সম্পদ উক্ত তিনভাগেই বিভক্ত হয়। সুতরাং ভরণপোষণও ঐ হিসেবে আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ هٰذَا الَّذِيْ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) যে মাসআলাটি বয়ান করলেন তা হচ্ছে, ইমাম খাসসাফ (র.) এবং ইমাম হাসান (র.)-এর বর্ণনা। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু আমাদের জাহিরে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পিতার উপরই পূর্ণ নাফকা ওয়াজিব হবে। এ বর্ণনার দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ এ আয়াতে সন্তানকে পিতার দিকে ধাবিত করা হয়েছে কেননা, আয়াতে لَامٌ [লাম] শব্দটি নির্দিষ্ট হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ সম্পর্কটি পিতার সাথেই নির্দিষ্ট। আর নাফকা সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই ওয়াজিব হবে, বিধায় পিতার উপরই পূর্ণ নাফকা ওয়াজিব হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক] পঙ্গু পুত্র নাবালক সন্তানের মতোই। সুতরাং নাবালক সন্তানের নাফকা যেমন পিতার উপরই এককভাবে ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে এর নাফকাও এককভাবে পিতার উপর ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম খাসসাফ (র.)-এর বর্ণনা মতে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আর অপ্রাপ্তবয়স্কের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার উপর অভিভাবকত্ব ও দায়দায়িত্ব এ দুটোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে, তাই নাবালক সন্তানের সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং নাবালকের ভরণপোষণ শুধু পিতার উপরই ওয়াজিব হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের বিষয়টি এমন নয়। সুতরাং তার ভরণপোষণের ক্ষেত্রে মাও শরিক হবে। আর পিতা ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মিরাসের পরিমাণের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাইতো কোনো সন্তানের যদি পিতা না থাকে; বরং দাদা এবং মা থাকে, তাহলে তার ভরণপোষণ তিন ভাগে বিভক্ত করে দাদা দেবেন দুই-তৃতীয়াংশ আর মা দেবেন এক-তৃতীয়াংশ।

قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الْأَخِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الخ : যদি কারো এক ভাই অসচ্ছল আর তার তিন বোন থাকে সচ্ছল। আর তাদের এক বোন আপন, আরেকজন মা-শরীক, আরেকজন বাপ-শরীক বোন হয়, তাহলে মিরাস হিসেবে তাদের উপর ভরণপোষণ পাঁচভাগে আবশ্যক হবে। আপন বোন দেবেন তিনভাগ, আর তারা দেবে এক-এক ভাগ করে। তবে এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে যে, পিতা ছাড়া অন্যদের উপর ভরণপোষণ পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মিরাস পাওয়ার যোগ্য হলেই হবে; বাস্তবে মিরাস পাওয়া জরুরি নয়। কেননা, এক দরিদ্র ব্যক্তির মামা এবং চাচাতো ভাই যদি সচ্ছল হয় তাহলে ঐ দরিদ্র ব্যক্তির ভরণপোষণ তার মামার উপর ওয়াজিব হবে। অথচ সে মারা গেলে বাস্তবে তার চাচাতো ভাই তার মিরাস নিয়ে যাবে।

এ কথার প্রমাণ হলো, মামা মাহরাম আত্মীয়। তাইতো এ সন্তান যদি কন্যা হয় তাহলে তার মামার সাথে কখনো বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। চাচাতো ভাইয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে আত্মীয়, কিন্তু মাহরাম নয়। তাইতো তার সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ। আর নাফকা ওয়াজিব হয় মাহরাম আত্মীয়ের উপর। সুতরাং মামার উপরই নাফকা ওয়াজিব হবে; চাচাতো ভাইয়ের উপর নয়।

وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ لِاَنَّهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا عَلٰى غَيْرِهٖ فَكَيْفَ تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّهٗ اِلْتَزَمَهَا بِالْاِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ اِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَظِمُ دُوْنَهَا وَلَا يَعْمَلُ فِيْ مِثْلِهَا الْاِعْسَارُ ثُمَّ الْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ فِيْمَا رُوِىَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهٗ قَدَّرَهٗ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهٖ وَعِيَالِهٖ شَهْرًا اَوْ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ كَسْبِهِ الدَّائِمِ كُلَّ يَوْمٍ لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ اِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ دُوْنَ النِّصَابِ فَاِنَّهٗ لِلتَّيْسِيْرِ وَالْفَتْوٰى عَلَى الْاَوَّلِ لٰكِنَّ النِّصَابَ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ ـ

অনুবাদ : দরিদ্রের উপর ভরণপোষণ ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা সদয় আচরণ হিসেবে ওয়াজিব হয়। অথচ সে নিজে অন্যের নিকট ভরণপোষণ লাভের অধিকারী। সুতরাং তার উপর অন্যের ভরণপোষণ কিভাবে সাব্যস্ত হতে পারে? স্ত্রীর এব ছোট সন্তানের ভরণপোষণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিবাহের আকদ অনুষ্ঠানে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে সে ভরণপোষণের দায়ি গ্রহণ করে নিয়েছে। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ভরণপোষণ ছাড়া সুষ্ঠু হয় না। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে অসচ্ছলতা কার্যকর হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সচ্ছলতা নেসাব দ্বারা নির্ধারিত হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সচ্ছলতা নির্ধারণ করেছেন এমন পরিমাণ দ্বারা, যা তার নিজের পরিবার-পরিজনের এক মাসে ভরণপোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে। কিংবা এমন পরিমাণ দ্বারা, যা নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের পর তার প্রতিদিনে স্থায়ী আয় থেকে উদ্বৃত্ত হয়। কেননা, হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে আসল বিবেচ্য হলো সামর্থ্য থাকা নেসাব নয়। কেননা, নেসাবে উদ্দেশ্য হলো সহজতা আনয়ন। অবশ্য ফতোয়া হলো প্রথমোক্ত মতের উপর। তবে নেসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদক জাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার নেসাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ الخ : দরিদ্র ব্যক্তির উপর যাদের নাফকা ওয়াজিব হয় না : [ছেলেমেয়ে, পিতামাতা, দাদা-দাদি ব্যতীত] অন্যান্য আত্মীয়দের ভরণপোষণ দরিদ্র ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, আত্মীয়দের ভরণপোষণ ওয়াজি হয় সদয় আচরণ হিসেবে, আর দরিদ্র ব্যক্তি সে নিজেই অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী, এমতাবস্থায় তার উপর আবার কি করে অন্যের নাফ ওয়াজিব হবে? তবে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী, নাবালক সন্তানের নাফকা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে যখন বিবাহের জন্য আগ্রহী হয়েছে ত নাফকা দেওয়াকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। কেননা, নাফকা দেওয়া ছাড়া বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ এবং এ জীবনযাপনের আনন্দ লাভ সম্ভব নয়। আর এমতাবস্থায় অসচ্ছল হওয়াটা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখবে না। আর সন্তানের নাফকা ওয়াজি হওয়ার কারণ হলো, নাবালক সন্তান হুকুমের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সমতুল্য। সুতরাং অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাফকা ওয়াজিব হবে। হাদীে আলোকে যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মানদণ্ড : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, সচ্ছলতার পরিমাণ হলো নেসা অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ আছে সে সচ্ছল।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তির নিকট নিজের ও পরিবার-পরিজনের এক মাসের ভরণপোষণের পর উদ্বৃ সম্পদ থাকে, সে সচ্ছল অন্যথায় অসচ্ছল।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে আরেকটি মত রয়েছে যে, যার দৈনন্দিন উপার্জন থেকে স্থায়ীভাবে ভরণপোষণের পর কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হয়- সে সচ্ছল। কেননা, বান্দার হকের ক্ষেত্রে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট; নিসাব পরিমাণ হওয়া জরুরি নয়। কেননা, নেসাব আবশ্যক হয় সহজতা জন্য। তবে এ মাসআলায় ফতোয়া প্রথম রায়ের উপরই। কিন্তু নেসাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এতটুকু পরিমাণ সম্পদ থাকা, যার কারণে সে অন্যের থেকে জাকাত ও সদকা গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুইশত দিরহাম উদ্বৃত্ত থাকবে।

وَإِذَا كَانَ لِلْاِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيْهِ بِنَفَقَةِ اَبَوَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ وَاِذَا بَاعَ اَبُوْهُ مَتَاعَهُ فِيْ نَفَقَتِهٖ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَاِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزْ وَفِيْ قَوْلِهِمَا لَا يَجُوْزُ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِاَنَّهٗ لَا وِلَايَةَ لَهٗ لِاِنْقِطَاعِهَا بِالْبُلُوْغِ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ حَالَ حَضْرَتِهٖ وَلَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِيْ دَيْنٍ لَهٗ سِوَى النَّفَقَةِ ـ

অনুবাদ : নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সম্পদ থাকলে তাতে পিতামাতার নাফকা নির্ধারণ করা হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। পিতা যদি নিজ ভরণপোষণের প্রয়োজনে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কোনো মাল-সামান বিক্রি করে, তবে তা জায়েজ। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবিও। কিন্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, তবে তা জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের মতে, কোনো ক্ষেত্রেই বিক্রি করা জায়েজ হবে না এবং এটাই সাধারণ কিয়াসের দাবি। কেননা, বালেগ হওয়ার পর পুত্রের উপর পিতার অভিভাবকত্ব থাকে না। এ কারণেই পুত্রের উপস্থিতিতে পিতার তা করার অধিকার নেই। আর পুত্রের কাছে নাফকা ছাড়া পিতার প্রাপ্য ঋণ উসূলের জন্য পিতা তা বিক্রি করতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا بَاعَ اَبُوْهُ مَتَاعَهُ فِيْ نَفَقَتِهٖ الخ - পিতার নিজ খোরপোশের জন্য সন্তানের সম্পদ বিক্রি : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পিতা নিজ খোরপোশের জন্য নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সম্পদ বিক্রি করতে পারবে। বিক্রি করা পিতার জন্য জায়েজ। ইস্‌তিহসানের উপর ভিত্তি করে তিনি এ বিধানটি দিয়েছেন। তবে সন্তানের স্থাবর সম্পদ তথা জমিন, ঘর ইত্যাদি বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে, স্থাবর-অস্থাবর কোনো সম্পদ বিক্রি করা পিতার জন্য জায়েজ নেই। কিয়াস তথা বাহ্যিক যুক্তির কথা এটাই।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দ্বারা তার সম্পদ থেকে পিতার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেছে। এ কারণেই সাবালক সন্তান উপস্থিত থাকা অবস্থায় পিতা তার সন্তানের সম্পদ বিক্রি করতে পারে না। এমনিভাবে ভরণপোষণ ব্যতীত অন্য কাজের জন্যও বিক্রি করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে ভরণপোষণের জন্যও বিক্রি করতে পারবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : পিতা তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সম্পদ সংরক্ষণ করার অধিকার রাখেন। আর এ ধরনের অধিকার বলে 'অসী' অধিকার রাখেন যে, সে নিরুদ্দিষ্ট সাবালক ওয়ারিশের সম্পদ বিক্রি করে দেবেন। তাহলে সংরক্ষণের জন্য অসীর যদি বিক্রি করার অধিকার থাকে, তাহলে পিতার এ অধিকার থাকবে না কেন? অবশ্যই এ অধিকার থাকবে। কেননা, অসীর তুলনায় পিতার দয়া অনেক বেশি। আর অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করা সংরক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে অস্থাবর সম্পদের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, স্থাবর সম্পদ নিজে নিজেই সংরক্ষিত। সুতরাং পিতা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন, কিন্তু স্থাবর সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন না।

আর পিতা ছাড়া অন্য আত্মীয় কোনো সম্পদই বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, নাবালক অবস্থায়ও তাদের অধিকার ছিল না, বিধায় সাবালক হওয়ার পরও তাদের উক্ত অধিকার থাকবে না। মোটকথা, পিতা যখন বিক্রি করার অধিকার বলে বিক্রি করেন তখন ঐ মূল্যটা তাঁর প্রাপ্য ভরণপোষণের সমশ্রেণী হয়ে যাওয়ার কারণে তা ভরণপোষণ হিসেবে ব্যয় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য উসূল করে নিজ ভরণপোষণে তা ব্যয় করবে। যেমনটি সে নাবালক সন্তানের সম্পদের ক্ষেত্রে করতে পারে।

وَكَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّ لِلْأَبِ وِلَايَةُ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ ذٰلِكَ فَالْأَبُ أَوْلَى لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَلَا كَذٰلِكَ الْعَقَارُ لِأَنَّهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ مِنَ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ أَصْلًا فِي التَّصَرُّفِ حَالَةَ الصِّغَرِ وَلَا فِي الْحِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَإِذَا جَازَ بَيْعُ الْأَبِ وَالثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَلَهُ الْإِسْتِيفَاءُ مِنْهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ لِكَمَالِ الْوِلَايَةِ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِنَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَأَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَّهُمَا إِسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ وَقَدْ أَخَذَا جِنْسَ الْحَقِّ۔

অনুবাদ : তদ্রূপ মাতাও ভরণপোষণের জন্য পুত্রের সামানপত্র বিক্রি করতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাল হেফাজতের দায়িত্ব পিতার রয়েছে। লক্ষ্য করছ না যে, 'অসী'-এর সে অধিকার রয়েছে। সুতরাং পিতা স্নেহশীলতার আধিক্যের কারণে পিতা অধিকতর হকদার হবে। আর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা সংরক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি এরূপ নয়। কেননা, তা স্বকীয়ভাবেই সংরক্ষিত। আর পিতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ও মূলত হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার তাদের নেই। আর প্রাপ্তবয়স্কতার পরও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অধিকার নেই। আর পিতার জন্য যখন পুত্রের মাল-সামান বিক্রি করা জায়েজ হলো, আর মূল্য বাবদ লব্ধ অর্থ তার হক তথা নাফকার সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন তা থেকে হক উসূল করা তার জন্য বৈধ হবে। যেমন পূর্ণ অভিভাবকত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে। অতঃপর সে তার ভরণপোষণ বাবদ তা থেকে খরচ করতে পারে। কেননা, সেটা তার হক-এর সমশ্রেণীভুক্ত। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কোনো সম্পদ যদি পিতামাতার হাতে থাকে, আর তা থেকে তারা খরচ করে, তাহলে তাদের এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, তারা তাদের প্রাপ্য হক উসূল করেছে। কারণ, আদালতের ফয়সালার পূর্বেই তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তারা তাদের হক -এর সমশ্রেণীভুক্ত জিনিস নিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ الخ : মাসআলা : সন্তান পিতামাতার নিকট নিজ সম্পদ রেখে যদি সফরে চলে যায়, অতঃ এমতাবস্থায় পিতামাতা দরিদ্র হয়, তাহলে অনুমতি ছাড়াই পিতামাতা ভরণপোষণ হিসেবে ঐ সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহার করলে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যকও হবে না। কেননা, তারা তাদের প্রাপ্য উসূল করে নিয়েছে। পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যে, কাজির ফয়সালা ছাড়াই পিতামাতার নাফকা সন্তানের উপর আবশ্যক হয়। আর এ ধরনের নাফকা অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, বিধায় পিতামাতাকেও দিতে হবে না।

وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِيْ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيْ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْحِفْظِ لَا غَيْرُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ الْقَاضِيْ لِأَنَّ أَمْرَهُ مُلْزِمٌ لِعُمُوْمِ وِلَايَتِهِ وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ .

অনুবাদ : আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাল থেকে থাকে, আর সে কাজির অনুমোদন ছাড়া তা থেকে পিতামাতার জন্য খরচ করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, এ হলো অভিভাবকত্বের অধিকার ছাড়াই অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা। কারণ, সে তো শুধু সংরক্ষণের ব্যাপারেই তার স্থলবর্তী ছিল; অন্যকিছুর জন্য নয়। পক্ষান্তরে কাজি তাকে আদেশ দিয়ে থাকলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, তার অভিভাবকত্ব ব্যাপক হওয়ার কারণে আদেশ অবশ্য কার্যকর। আর ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর সে নাফকা গ্রহণকারীর নিকট তা ফেরত দাবি করতে পারবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে সে প্রদত্ত অর্থের মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, সে নিজের মাল থেকে তা স্বেচ্ছায় দান করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ أَجْنَبِيٍّ الخ : **মাসআলা :** কোনো ব্যক্তি অন্যের নিকট সম্পদ রেখে যদি সফরে চলে যায়, তাহলে যার হাতে সম্পদ রেখে গেছে সে কাজির অনুমোদন ব্যতীত ঐ সম্পদ তার মালিকের পিতামাতার ভরণপোষণ হিসেবে ব্যয় করতে পারবে না। তারপরও যদি ব্যয় করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ তাকেই বহন করতে হবে এবং তাকে স্বেচ্ছায় দানকারী বলে গণ্য করা হবে।

এর কারণ এই যে, সে শুধু সম্পদ সংরক্ষণ করার অধিকারই পেয়েছিল; অন্য কিছুর নয়। কিন্তু সে তা সীমালঙ্ঘন করে অন্যত্র ব্যয় করেছে, বিধায় তাকেই তা বহন করতে হবে। তবে কাজির অনুমোদনক্রমে যদি ব্যয় করে থাকে, তাহলে আবার ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। কেননা, কাজির নির্দেশ মানা তার উপর আবশ্যক, বিধায় সে খরচ করলে তার জরিমানা আবশ্যক হবে না। আর কাজির ব্যাপক অধিকার বলে উক্ত নির্দেশ দেওয়ারও অধিকার রাখেন।

প্রথম সুরতে ঐ ব্যক্তি ব্যয়কৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণের পর ঐ লোক যে পরিমাণ জরিমানা দিয়েছে, তা ঐ পিতামাতা থেকে পুনরায় উসুল করতে পারবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দ্বারা সে ঐ বস্তুর মালিক হয়ে গেছে, তাই সে যেন নিজ বস্তুই কাউকে দান করল। আর স্বেচ্ছায় দান করার পর তা ফেরত নিতে পারে না।

وَاِذَا قَضَى الْقَاضِىْ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَ ذَوِى الْاَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ لِاَنَّ نَفَقَةَ هٰؤُلَاءِ تَجِبُ كِفَايَةً لِلْحَاجَةِ حَتّٰى لَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَقَدْ حَصَلَتْ بِمُضِىِّ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ اِذَا قَضٰى بِهَا الْقَاضِىْ لِاَنَّهَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُوْلِ الْاِسْتِغْنَاءِ فِيْمَا مَضٰى قَالَ اِلَّا اَنْ يَّأْذَنَ الْقَاضِىْ بِالْاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْقَاضِىَ لَهٗ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَصَارَ اِذْنُهٗ كَاَمْرِ الْغَائِبِ فَيَصِيْرُ دَيْنًا فِىْ ذِمَّتِهٖ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِىِّ الْمُدَّةِ ـ

অনুবাদ : আর যদি কাজি সন্তান, পিতামাতা ও মাহ্‌রাম আত্মীয়দের জন্য নাফকা নির্ধারণ করে এবং এরপর কিছুকাল অতিবাহিত হয়, তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, এদের নাফকা প্রয়োজন মেটানোর জন্য ওয়াজিব হয়। এ কারণেই তারা মালদার হলে ওয়াজিব হয় না। আর সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের অভাব শেষ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর নাফকা [সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে রহিত হয় না], যদি কাজি তা নির্ধারণ করে থাকেন। কেননা, স্ত্রীর নাফকা তো তার সচ্ছলতা সত্ত্বেও ওয়াজিব হয়। সুতরাং অভাবমুক্ত থাকার কারণে বিগত সময়ের নাফকা রহিত হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে কাযী যদি ঐ অবর্তমান ব্যক্তির নামে ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে থাকেন, [তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তা রহিত হবে না]। কেননা কাজীর কর্তৃত্ব ব্যাপক রয়েছে; সুতরাং তাঁর অনুমতি অবর্তমান ব্যক্তির নির্দেশ রূপে গণ্য হবে। তাই তার যিম্মায় ঋণ হিসেবে তা বিদ্যমান থাকবে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা রহিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا قَضَى الْقَاضِىْ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ الخ : **মাসআলা :** কোনো সচ্ছল ব্যক্তির উপর যদি কাজি ঐ ব্যক্তির ছেলেমেয়ে, পিতামাতা এবং নিকটতম অন্যান্য আত্মীয়দের নাফকা ধার্য করে দেন, অতঃপর তা না দেওয়া অবস্থায় যদি একটি কাল অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে অতিবাহিত এ সময়ের ভরণপোষণ আর দিতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) অনুরূপ মতই পোষণ করেছেন।

এর ব্যাপারে দলিল হলো, এসব লোকের ভরণপোষণ প্রয়োজন হিসেবে ওয়াজিব হয়, তাই তারা সচ্ছল হলে আর অন্যের উপর ওয়াজিব হয় না। আর সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা তার প্রয়োজন নিবারণ হয়ে গেছে। সুতরাং বিগত দিনের খরচাদি আর দিতে হবে না। পক্ষান্তরে কাজি যদি স্ত্রীর জন্য নাফকা নির্ধারণ করে দেন, তাহলে সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার দ্বারাও তার নাফকা রহিত হবে না; বরং বিগতটাও দিতে হবে। কেননা, স্ত্রীর নাফকাটা হলো ঋণের মতো। আর সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ঋণ রহিত হয় না, বিধায় স্ত্রীর নাফকা রহিত হবে না। তাই তো স্ত্রী সচ্ছল হলেও স্বামীর উপর নাফকা দেওয়ার আবশ্যকীয়তা থেকে যায়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাজি যদি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ঋণ করার নির্দেশ দেন, তাহলে সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা নাফকা রহিত হবে না। কেননা, কাজির ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কাজির নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হলো যেন সে নিজেই বিষয়টির অনুমতি দিল। সুতরাং এ ঋণ তাকে পরিশোধ করতে হবে, বিধায় সময় অতিবাহিত হলেও তা রহিত হবে না।

فَصْلٌ وَعَلَى الْمَوْلَى اَنْ يُنْفِقَ عَلَى اَمَتِهِ وَعَبْدِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَمَالِيْكِ اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فَاِنْ اِمْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اِكْتَسَبَا وَاَنْفَقَا لِاَنَّ فِيْهِ نَظْرًا لِلْجَانِبَيْنِ حَتّٰى يَبْقَى الْمَمْلُوْكُ حَيًّا وَيَبْقٰى فِيْهِ مِلْكُ الْمَالِكِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ بِاَنْ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا اَوْ جَارِيَةً لَا يُوَاجَرُ مِثْلُهَا اُجْبِرَ الْمَوْلٰى عَلٰى بَيْعِهِمَا لِاَنَّهُمَا مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَفِي الْبَيْعِ اِيْفَاءُ حَقِّهِمَا وَاِبْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلٰى بِالْخَلَفِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِاَنَّهَا تَصِيْرُ دَيْنًا فَكَانَ تَاخِيْرًا عَلٰى مَا ذَكَرْنَا وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوْكِ لَا تَصِيْرُ دَيْنًا فَكَانَ اِبْطَالًا وَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِحْقَاقِ فَلَا يُجْبَرُ عَلٰى نَفَقَتِهَا اِلَّا اَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ تَعْذِيْبِ الْحَيَوَانِ وَفِيْهِ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَفِيْهِ اِضَاعَتُهُ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ يُجْبَرُ وَالْاَصَحُّ مَا قُلْنَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : মনিবের জিম্মায় হলো আপন দাসী ও দাসের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করা। কেননা, দাসদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ - 'তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন। সুতরাং তোমরা যা আহার কর তাদের সেই আহার দান করবে এবং তোমরা যা পরিধান কর তাদের সেই বস্ত্র দান করবে। আল্লাহর বান্দাদের আজাব দিবেন না।' মনিব যদি খরচ দানে বিরত থাকে, আর তারা উপার্জনক্ষম হয়, তাহলে তারা উপার্জন করে নিজেদের জন্য ব্যয় করে। কেননা, এতে উভয় পক্ষের কল্যাণ রক্ষা হয়। অর্থাৎ দাসের জীবন রক্ষা হবে এবং তার মাঝে মনিবের মালিকানাও বজায় থাকবে। আর যদি দাস ও দাসী উপার্জনক্ষম না হয়; যেমন দাস পঙ্গু হয় কিংবা দাসী এমন হয় যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে দেওয়া যায় না, তাহলে মনিবকে বাধ্য করা হবে তাদের বিক্রি করতে। কেননা, তারা ভরণপোষণের অধিকারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর বিক্রি করাতে তাদের হক পূর্ণ করা হবে, আবার স্থলবর্তী [মূল্যের] দ্বারা মালিকের হকও বহাল থাকবে। কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার নাফকা ঋণ হয়ে থাকবে। সুতরাং হক বিলম্বিত হবে মাত্র। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি। পক্ষান্তরে দাসের ভরণপোষণ ঋণ হয়ে থাকবে না, ফলে তা বাতিল হয়ে যাবে। অন্যান্য প্রাণীর খরচের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, প্রাণী অধিকারের যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। সুতরাং সেগুলোর জন্য খরচ করতে মালিককে বাধ্য করা যাবে না। তবে আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সম্পর্কের দাবিতে তাকে খরচ করতে আদেশ দেওয়া হবে। কেননা, রাসূল ﷺ প্রাণীদের কষ্ট দিতেও নিষেধ করেছেন। এতে তাদের কষ্ট রয়েছে। তাছাড়া তিনি [নবীজী ﷺ] সম্পদ নষ্ট করতেও নিষেধ করেছেন। আর তাতে সম্পদ নষ্ট করা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মালিককে বাধ্য করা হবে। তবে আমরা উপরে যা বলেছি তা-ই হলো বিশুদ্ধতর। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَوْلَى اَنْ يُنْفِقَ الخ : মাসআলা : মনিবের উপর আবশ্যক হলো দাস-দাসীর ভরণপোষণ প্রদান করা। কেননা, রাসূল ﷺ অধীনস্থদের ব্যাপারে বলেছেন– اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ. অর্থাৎ, 'তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন। সুতরাং তোমরা যা আহার কর তাদের সেই আহার দান করবে এবং তোমরা যা পরিধান কর তাদের সেই বস্ত্র দান করবে। আল্লাহর বান্দাদের আজাব দিবে না।'

এ হাদীস দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, মনিবের উপর দাস-দাসীদের ভরণপোষণ ওয়াজিব। তবে হাদীসের মূল ভাষ্য হলো, তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক প্রদান করা। মনিব যেই মানের খানা খাবে দাস-দাসীদেরও সেই মানের খাবার দেওয়া এবং মনিব যেই মূল্যের কাপড় পরিধান করবে দাস-দাসীদের সেই মূল্যের বস্ত্র প্রদান করা আবশ্যক নয়। সুতরাং দাস-দাসীকে যদি সুতি কাপড় প্রদান করে, আর মনিব নিজে আরো বেশি মূল্যের কাপড় পরিধান করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ اِمْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ الخ : মাসআলা : মনিব যদি দাস-দাসীর ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দেখা হবে যে, দাস-দাসী উপার্জন করতে সক্ষম কিনা? যদি সে উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে উপার্জন করে নিজের প্রয়োজন নিবারণ করবে। কেননা, এতে মনিব ও দাস উভয়েরই কল্যাণ রয়েছে। দাসের কল্যাণ হলো এভাবে যে, খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রাণ রক্ষা পেল আর মনিবের কল্যাণ হলো এভাবে যে, দাসের মাঝে তার মালিকানা বহাল রইল– ইচ্ছা করলেই বিক্রি করতে পারবে। আর যদি দাস-দাসী উপার্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেমন– দাস পঙ্গু অথবা দাসী এমন হয় যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো কাজে লাগানো যায় না, তাহলে মনিবকে বাধ্য করা হবে এ দাস-দাসীদেরকে বিক্রি করতে। কেননা, দাস-দাসী নাফকা পাওয়ার অধিকার রাখে আর বিক্রি করার মাঝে তা বজায় থাকে। আর এতে মনিবও মূল্য পেয়ে লাভবান হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِاَنَّهَا تَصِيْرُ الخ : তবে স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, স্ত্রীর নাফকা স্বামীর উপর ঋণ হয়ে যায়। সুতরাং দিতে অস্বীকার করলে তা স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয়ে থাকবে, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু দাস-দাসীর ভরণপোষণ মনিবের উপর ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয় না। সুতরাং তাদেরকে নগদ প্রদান করলে তাদের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর কারো অধিকার বাতিল করা জায়েজ নেই। এ কারণে মনিবকে বিক্রি করাতে বাধ্য করা হবে।

এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, মনিবকে যদি দাস-দাসী বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে মনিব দাস-দাসীর বিনিময়ের মালিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ যদিও দাস-দাসী তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু সে তো এগুলোর মূল্যের মালিক হচ্ছে। তা হলো মনিব ও দাস-দাসী কারো অধিকারই বাতিল হলো না। কিন্তু বিক্রি করতে বাধ্য না করা হলে দাস-দাসীর অধিকার বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, তাদের হক ঋণ হিসেবে মনিবের উপর আবশ্যক হবে না।

আর স্ত্রীকে যদি তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে কোনো বিনিময় ছাড়া স্বামীর হক বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আর তালাক না দেওয়ার মাঝে কারো হক বাতিল হচ্ছে না। কেননা, তার অধিকার ঋণ হিসেবে মনিবের উপর আবশ্যক হয়ে থাকবে। সুতরাং দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الخ : মনিব যদি তার অধীনস্থ কোনো প্রাণীর চারা-খাবার না দেয়, তাহলে মনিবকে চারা দিতে অথবা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে না। কেননা, বাধ্য করার অর্থ হলো একটি ফয়সালা করে দেওয়া। আর [কাযা] ফয়সালার জন্য আবশ্যক হলো যার জন্য ফয়সালা করা হবে সে তার যোগ্য হতে হবে। আর প্রাণী যেহেতু ফয়সালা পাওয়া বা চাওয়ার যোগ্যতা রাখে না, সুতরাং মনিবকে বাধ্য করা যাবে না। তবে দিয়ানত হিসেবে তথা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক হিসেবে মনিবকে উপদেশ দেওয়া হবে, যেন সে প্রাণীর চারার ব্যবস্থা করে অথবা বিক্রি করে দেয়। যদি সে দুটি বিষয়ের কোনোটাই না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামি হয়েছে– সে বিড়ালটিকে বেঁধে কষ্ট দিয়ে মেরেছিল। সে বিড়ালটিকে স্বাধীনভাবে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়নি আবার নিজেও বিড়ালটির খাবারের ব্যবস্থা করেনি।

তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ প্রাণীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। আর চারা না দেওয়ার মাঝে প্রাণীর কষ্ট রয়েছে। এমনিভাবে রাসূল ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, আর খাবারের ব্যবস্থা না করে প্রাণী মেরে ফেলার মাঝে সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মনিবকে প্রাণীর চারা দিতে বাধ্য করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনা হলো যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, চারা দিতে বা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে না, তবে উপদেশ দেওয়া হবে।

كِتَابُ الْعِتَاقِ

অধ্যায় : গোলাম আজাদ করা

ভূমিকা : তালাক আর আজাদ দুটো দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধীনস্থতা শেষ হয়ে যায়, তবে গোলামের ক্ষেত্রে তার পুরো ব্যক্তির উপর থেকে মালিকানা শেষ হয়, আর তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর থেকে উপভোগ সংক্রান্ত মালিকানা শেষ হয়। আজাদ করে দেওয়ার অর্থ হলো গোলামকে যেন জীবন দান করা। কেননা, দাস থাকা অবস্থায় সে মৃতের ন্যায় অন্যের অধীনস্থ থাকে। অতঃপর আজাদ করার পর গোলাম মানবতাপূর্ণ মর্যাদা অর্জন করে। আগে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না, এখন গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া আরো অনেক ক্ষেত্রেই সে প্রাণ পাওয়া তুল্য হয়ে যায়।

* عِتْق [আজাদ]-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– শক্তি, পাখির বাচ্চা শক্তিশালী হলে আহলে আরব বলেন– عَتَقَ الْفَرْخُ এমনিভাবে ঘোড়া দৌড়পাল্লায় আগে বেড়ে গেলে বলেন– فَرَسٌ عَتِيْقٌ সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, শক্তি ব্যতীত এসব কাজ অর্জিত হয় না। এমনিভাবে কা'বাকে بَيْتٌ عَتِيْقٌ বলা হয়। কেননা, আল্লাহপ্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে সে তার ধ্বংসকারীদেরকে প্রতিহত করে।

* আর শরিয়তের পরিভাষায় عِتْق বলা হয়– قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَصِيْرُ الْمَرْأُ بِهَا اَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ অর্থাৎ, মানবীয় এমন শক্তিকে عِتْق বলে যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্যদান, কর্তৃত্ব ও কাজি [বিচারক] হওয়ার যোগ্যতা পায়।

عِتْق অর্থ– স্বাধীনতা, اَعْتَاق অর্থ– আজাদ করা, স্বাধীন করা, مُعْتِق (بِكَسْرِ التَّاءِ) অর্থ– আজাদকারী, مُعْتَق (بِفَتْحِ التَّاءِ) অর্থ– স্বাধীনতা অর্জনকারী।

আজাদ হওয়ার سَبَب বা কারণ : আজাদ স্বাভাবিকভাবে দুই কারণে হতে পারে। ১. আবশ্যতাকমূলক স্বাধীনতা, ২. স্বেচ্ছাধীন স্বাধীনতা। আবশ্যতাকমূলক স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত হলো– কোনো অপরাধের কাফফারায় গোলাম আজাদ করা, মানতের কারণে গোলাম আজাদ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গোলাম আজাদ করা হচ্ছে ওয়াজিব। আর স্বেচ্ছাধীন স্বাধীনতা আবার দু-ভাবে হতে পারে– প্রথম হলো কোনো ব্যক্তি ছওয়াবের জন্য গোলাম আজাদ করা। দ্বিতীয় হলো নিকটাত্মীয় গোলাম হওয়ার কারণে স্বাধীন হয়ে যাওয়া।

আজাদ করার শর্তাবলি : আজাদকারী ব্যক্তি–

১. নিজে স্বাধীন হতে হবে,
২. বিবেকসম্পন্ন হতে হবে,
৩. সাবালক হতে হবে,
৪. গোলামের মালিক হতে হবে।

عِتْق-এর রুকন ও হুকুম : عِتْق-এর রুকন হলো এমন বিষয়, যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আর হুকুম হলো– পরাধীনতা দূর হয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া।

আজাদের প্রকারভেদ : স্বাধীনতা কয়েকভাবে হতে পারে। যথা–

১. মনিব তাৎক্ষণিকভাবে তার গোলামকে আজাদ করে দেওয়া।
২. শর্তসাপেক্ষে আজাদ করা, তাহলে যেই শর্তসাপেক্ষে আজাদ করবে সেই শর্ত পাওয়া গেলে আজাদ হবে।
৩. মনিব তার মৃত্যু পরবর্তী আজাদ করা। এটা কোনো কিছুর বিনিময়েও হতে পারে, আবার বিনিময় ছাড়াও হতে পারে।

–[ইনায়া, ফাতহুল কাদীর]

اَلْاِعْتَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيُّمَا مُسْلِمٍ اَعْتَقَ مُؤْمِنًا اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ وَلِهٰذَا اسْتَحَبُّوْا اَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةُ الْاَمَةَ لِيَتَحَقَّقَ مُقَابَلَةَ الْاَعْضَاءِ بِالْاَعْضَاءِ قَالَ اَلْعِتْقُ يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِىْ مِلْكِهٖ شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ لِاَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ اِلَّا فِى الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ لِلْمَمْلُوْكِ وَالْبُلُوْغَ لِاَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهٖ لِكَوْنِهٖ ضَرَرًا ظَاهِرًا وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ وَالْعَقْلَ لِاَنَّ الْمَجْنُوْنَ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ اَعْتَقْتُ وَاَنَا صَبِيٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهٗ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ اَعْتَقْتُ وَاَنَا مَجْنُوْنٌ وَجُنُوْنُهٗ كَانَ ظَاهِرًا لِوُجُوْدِ الْاِسْنَادِ اِلٰى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ كُلُّ مَمْلُوْكٍ اَمْلِكُهٗ فَهُوَ حُرٌّ اِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُّ لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِقَوْلٍ مُلْزِمٍ وَلَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْعَبْدُ فِىْ مِلْكِهٖ حَتّٰى لَوْ اَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهٖ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهٗ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ اٰدَمَ ـ

অনুবাদ : গোলাম আজাদ করা মোস্তাহাব কাজ। রাসূল ﷺ বলেছেন– اَيُّمَا مُسْلِمٍ اَعْتَقَ مُؤْمِنًا اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ 'যে-কোনো মুসলমান যদি কোনো মু'মিন [দাস-দাসী]-কে আজাদ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আজাদকারীর [অনুরূপ] অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন।' এ কারণেই কোনো পুরুষের জন্য দাসকে আজাদ করা এবং মহিলার জন্য তার দাসীকে আজাদ করা ফকীহগণ মোস্তাহাব বলেছেন। যাতে 'অঙ্গ বিনিময়' বিষয়টি পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ-মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি আপন মালিকানার গোলাম আজাদ করলে তা শুদ্ধ হবে। আজাদকারী স্বাধীন হওয়ার শর্ত এ কারণে যে, মালিকানা ছাড়া আজাদ করা বৈধ নয়। আর অন্যের মালিকানাধীন ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানা নেই। প্রাপ্তবয়স্কতার শর্ত এজন্য যে, গোলাম আজাদ করা বাহ্যত [আর্থিক] ক্ষতির কারণ, বিধায় নাবালক এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী নয়। এ কারণেই নাবালকের অভিভাবকও তা করতে পারে না। সুস্থ-মস্তিষ্ক হওয়ার শর্ত এজন্য যে, পাগল কোনো ধরনের কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত নয়। এ ধরনের শর্ত আরোপের কারণেই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি বলে, আমি নাবালক অবস্থায় তাকে আজাদ করেছি ,তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ যদি বলে যে, আমি বিকৃত-মস্তিষ্ক অবস্থায় আজাদ করেছি, আর তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রকাশ্য ছিল, তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে আজাদ করার বিষয়টিকে বিপরীত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তদ্রূপ নাবালক যদি বলে, 'যে গোলামের আমি মালিক, যখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হব তখন সেগুলো আজাদ।' এ আজাদ করা সহীহ হবে না। কেননা, সে 'দায়' সাব্যস্তকারী কোনো বক্তব্য প্রদানের যোগ্য নয়। আজাদকৃত গোলাম নিজের মালিকানাধীন হওয়া জরুরি। সুতরাং অন্যের গোলাম আজাদ করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ اٰدَمَ - [আদম সন্তান যার মালিক নয়, তাকে আজাদ করা গ্রহণযোগ্য নয়]। –[আবূ দাউদ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْإِعْتَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাস-দাসী আজাদ করা পছন্দনীয় মোস্তাহাব কাজ। তার সমর্থনে একটি হাদীস তিনি পেশ করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এ শব্দেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে–

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتّٰى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ (تِرْمِذِيْ اَزْ نَفْعُ الْقَدِيْرِ)

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান দাস অথবা দাসীকে আজাদ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে আজাদকারীর প্রত্যেকটি অঙ্গকে দাস-দাসীর অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করবেন, এমন কি আজাদকারী মহিলার লজ্জাস্থানকে দাসীর লজ্জাস্থানের পরিবর্তে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।'

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম পুরুষের জন্য দাস আর মহিলাদের জন্য দাসী আজাদ করাকে মোস্তাহাব-বলে আখ্যা দিয়েছেন।

قَوْلُهُ قَالَ الْعِتْقُ يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الخ : আলোচ্য মাসআলায় عِتْق শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো إِعْتَاقٌ অর্থাৎ আজাদ করা। ইমাম কুদূরী (র.) আজাদ করা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. আজাদকারী ব্যক্তি নিজে আজাদ হতে হবে। ২. আজাদকারী সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে। ৩. আজাদকারী প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। ৪. গোলামটি আজাদকারীর অধীনস্থ হতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, দাস আজাদ করা বিশুদ্ধ হবে না– আজাদকারী ব্যক্তি স্বাধীন, সুস্থ-মস্তিষ্ক, সাবালক হওয়া ছাড়া এবং গোলামটি তার নিজ অধীনস্থ হওয়া ছাড়া।

আজাদকারী নিজে আজাদ হতে হবে, এর কারণ হলো, আজাদকারী নিজে গোলামের মালিক হতে হয়। আর নিজে স্বাধীন না হলে মালিক হতে পারে না, বিধায় নিজে স্বাধীন হতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে এজন্য শর্ত করা হয়েছে যে, নাবালকের মাঝে আজাদ করার যোগ্যতা থাকে না। কেননা, আজাদ করাটা বাহ্যত একটি আর্থিক ক্ষতি। এ কারণেই নাবালকের অভিভাবক এবং অসীও নাবালকের গোলাম আজাদ করার অধিকার রাখেন না। আর আজাদকারী সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়াকে এজন্য শর্ত করা হয়েছে যে, পাগল কোনো ধরনের কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত নয়।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ اَعْتَقْتُ الخ : নাবালক ব্যক্তির কার্য গ্রহণযোগ্য নয়, বিধায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি বলে, আমি নাবালক অবস্থায় তাকে আজাদ করেছি, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, আর গোলামও আজাদ হবে না। কেননা, সে আজাদ করাকে এমন সময়ের দিকে সম্পর্কিত করেছে যে অবস্থায় আজাদ করাটা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে সে বাহ্যত আজাদ করার বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, বিধায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আজাদকারী যেহেতু বিবেকসম্পন্ন হতে হয় বিধায় সে যদি বলে যে, আমি এ গোলামকে যখন আজাদ করেছি তখন আমি পাগল ছিলাম, আর লোকেরাও তার পাগল হওয়ার বিষয়টা জানে, তাহলে তার কথা গ্রহণ করা হবে, সুতরাং ঐ গোলাম আজাদ হবে না। এর দলিলও উপরোল্লিখিত কথা-ই। অর্থাৎ, সে আজাদ করাকে সম্পর্কিত করেছে এমন সময়ের দিকে যে সময়টা আজাদ করার পরিপন্থি, তাই সে যেন আজাদ করাকে অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর কথাকে গ্রহণ করা হয় বিধায় তার কথাকেও গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ الخ : এমনিভাবে আজাদ করাটা বিশুদ্ধ হবে না নাবালক বাচ্চার এ কথার দ্বারা যে, "আমার অধীনস্থ যত গোলাম আছে আমি সাবালক হলে তার সব আজাদ ।" কেননা, নিজের উপর কোনো বস্তুকে আবশ্যক করে নেওয়ার যোগ্যতা নাবালক বাচ্চার নেই। কেননা, এ ধরনের কাজ থেকে শরিয়ত তাকে বারণ করেছে।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْعَبْدُ فِيْ مِلْكِهِ الخ : এমনিভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেই গোলামকে আজাদ করতে চাচ্ছে সেই গোলাম আজাদকারীর অধীনস্থ হতে হবে। তাই অন্যের গোলাম আজাদ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত অনুরূপই। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) বলেন, পিতা তাঁর নাবালক সন্তানের গোলামকে আজাদ করতে পারেন, তবে সাবালক সন্তানের গোলামকে আজাদ করতে পারেন না।

জমহুরের স্বপক্ষে দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী– لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ অর্থাৎ, মানুষ যার মালিক নয় তাকে সে আজাদ করতে পারবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি অন্যের গোলামকে আজাদ করে তবে তা বাস্তবায়ন হবে না। এ কথা বলা হয়নি যে, আজাদ করাটাই বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং আজাদ করাটা বিশুদ্ধ, কিন্তু বাস্তবায়ন হওয়াটা মনিবের অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে।

وَاِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ اَوْ اَمَتِهٖ اَنْتِ حُرٌّ اَوْ مُعْتَقٌ اَوْ عَتِيْقٌ اَوْ مُحَرَّرٌ اَوْ قَدْ حَرَّرْتُكَ اَوْ قَدْ اَعْتَقْتُكَ فَقَدْ عَتَقَ نَوٰى بِهِ الْعِتْقَ اَوْ لَمْ يَنْوِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِاَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيْهِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَاَغْنٰى ذٰلِكَ عَنِ النِّيَّةِ وَالْوَضْعُ وَاِنْ كَانَ فِى الْاِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَ اِنْشَاءً فِى التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِى الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْاِخْبَارَ الْبَاطِلَ اَوْ اَنَّهٗ حُرٌّ مِنَ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً لِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُهٗ وَلَا يُدَيَّنُ قَضَاءً لِاَنَّهٗ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

অনুবাদ : যদি আপন দাস বা দাসীকে বলে যে তুমি স্বাধীন কিংবা তুমি মুক্ত কিংবা তুমি বন্ধনমুক্ত কিংবা তুমি আজাদ, তদ্রূপ যদি বলে, আমি তোমাকে আজাদ করলাম, কিংবা আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে– আজাদ করার নিয়ত করুক বা না করুক। কেননা, এগুলো হচ্ছে গোলাম আজাদ করার জন্য স্পষ্ট শব্দ। শরিয়ত ও প্রচলিত উভয় ক্ষেত্রেই শব্দগুলো এ অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং তা নিয়তের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত। আর যদিও কথাগুলো সংবাদ প্রদানের জন্য নির্ধারিত, তবু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরিয়ত সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এগুলোকে কর্মসম্পাদক বাক্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন– তালাক, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। আর যদি সে বলে যে, [উপরিউক্ত কথা দ্বারা] মিথ্যা সংবাদ প্রদানের নিয়ত করেছি কিংবা কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তির কথা বুঝিয়েছি, তাহলে দিয়ানত হিসেবে [আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে] সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা, কথাগুলো এ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু আইনত সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এটা বাহ্য অর্থের পরিপন্থি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ اَوْ اَمَتِهٖ الخ : মনিব যদি তার দাস অথবা দাসীকে বলে– তুমি স্বাধীন বা তুমি মুক্ত বা আমি তোমাকে স্বাধীন করে দিয়েছি, অথবা মুক্ত করে দিয়েছি, তাহলে উক্ত কথার দ্বারা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে– এসব শব্দ দ্বারা মনিব আজাদ করার ইচ্ছা করুক বা না করুক। কেননা, এসব শব্দ আজাদ করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়, শরিয়ত এবং প্রচলিত উভয় দিক থেকে শব্দগুলো আজাদ করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট। আর স্পষ্ট শব্দ দ্বারা কোনো বিষয়ের হুকুম আরোপিত করতে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এসব শব্দ বলে আজাদ করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। গঠনগতভাবে যদিও শব্দটা সংবাদ দেওয়ার অর্থে ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হিসেবে এখন তাকে اِنْشَاءٌ [সংঘটিত হওয়া-এর] অর্থে নেওয়া হয়েছে। যেমন– তালাক, বায় [بَيْعٌ] -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণ : اَنْتِ طَالِقٌ "তুমি তালাক" একটা সংবাদমূলক বাক্য। কিন্তু প্রয়োজন হিসেবে এখন তা সংঘটিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْاَخْبَارَ الْبَاطِلَ الخ : মনিব যদি বলেন যে, উক্ত বাক্য দিয়ে আমি মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, অথবা বলে, যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলা যে, তুমি কাজ থেকে স্বাধীন, আমি তোমার থেকে কোনো কাজ নেব না, তাহলে দিয়ানত [আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সম্পর্ক] হিসেবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। কেননা, মূল অর্থ হিসেবে শব্দগুলো দ্বারা উক্ত কথা উদ্দেশ্য নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু আদালতের আইন হিসেবে তার কথা মেনে নেওয়া হবে না। কেননা, উক্ত শব্দগুলো এই অর্থে ব্যবহার হওয়া বাহ্য-পরিপন্থি। আর বাহ্যিক পরিপন্থি বিষয় আইনত গ্রহণযোগ্য হয় না।

وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيقُ يُعْتَقُ لِأَنَّهُ نِدَاءٌ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْعِتْقِ وَهُوَ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ هٰذَا هُوَ حَقِيقَتُهُ فَيَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوَصْفِ وَإِنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَهُ تَصْدِيقًا لَهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرُّ لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِعْلَامُ بِاسْمِ عَلَمِهِ وَهُوَ مَا لَقَّبَهُ بِهِ وَلَوْ نَادَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَا آزَادُ وَقَدْ لَقَّبَهُ بِالْحُرِّ قَالُوْا يُعْتَقُ وَكَذَا عَكْسُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ فَيُعْتَبَرُ إِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ .

অনুবাদ : আর যদি দাস-দাসীকে হে স্বাধীন বা হে মুক্ত বলে ডাক দেয়, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এখানে এমন শব্দযোগে আহ্বান করা হয়েছে, যা স্বাধীনতার স্পষ্ট অর্থ বহনকারী। আর আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে উক্ত গুণসহ [চিন্তায়] উপস্থিত করা। [কিংবা উল্লিখিত গুণে ভূষিত সাব্যস্ত করা] এটাই হচ্ছে আহ্বানের হাকীকত। সুতরাং উক্ত আহ্বান উল্লিখিত গুণের সাব্যস্ততা অনিবার্যরূপে দাবি করে। আর তা তার পক্ষ থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং মনিবের প্রদত্ত সংবাদের সত্যতা বিধানের জন্য উল্লেখকৃত গুণটি অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হবে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা পর্যালোচনা করব। তবে যদি সে তার নাম রেখে থাকে 'স্বাধীন' তারপর তাকে 'স্বাধীন' বলে ডাক দেয় [তাহলে আজাদ হবে না]। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হলো তার নামবাচক শব্দ দ্বারা তাকে সম্বোধন করা। আর যদি ফারসি বা অন্য ভাষায় ডাক দেয় যে, হে আজাদ অথচ সে নাম রেখেছিল 'হুর' তাহলে ফকীহগণের মতে, আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এটা নামবাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন নয়। সুতরাং সাব্যস্তকৃত গুণ সম্পর্কে সংবাদ প্রদানের দিকটি বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيقُ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গোলামকে 'হে স্বাধীন' বলে আহ্বান করে, তাহলে ঐ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত শব্দটা আজাদ হওয়াকে বুঝায়। আর আহ্বান বলা হয় যাকে ডাকা হয় বা আহ্বান করা হয় তাকে ডাকের গুণের সাথে উপস্থিত করা। সুতরাং যাকে ডাকা হচ্ছে তার মাঝে উক্ত গুণ থাকাটা বাক্যের দাবি। আর উক্ত মাসআলায় যে ব্যক্তি গোলামকে 'হে স্বাধীন' বলে আহ্বান করছেন তার পক্ষ থেকে গোলামের মাঝে স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত করা সম্ভব। সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ হওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান নেই, বিধায় গোলাম তার মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। আর মনিব যদি নিজে কোনো গোলামের নাম রাখেন "হুর" বলে অতঃপর উক্ত নাম নিয়ে তাকে আহ্বান করেন, তাহলে গোলাম আজাদ হবে না। কেননা, এ সময় আহ্বান দ্বারা গোলামের মাঝে আজাদ হওয়ার গুণ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এই নামে তাকে আহ্বান করা হলো উদ্দেশ্য। তবে নাম 'হুর' রাখার পর ফারসি বা অন্য ভাষায় 'হুর'-এর অর্থবোধক শব্দ দিয়ে আহ্বান করলে মাশায়েখে কেরাম বলেন, এর দ্বারাও আজাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি 'আজাদ' নাম রাখার পর 'হুর' বলে আহ্বান করা হয়, তাহলেও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এসব অবস্থায় নাম নিয়ে ডাকা পাওয়া যায়নি। সুতরাং এতে ধরা হবে যে, মনিব তাকে যে গুণবাচক শব্দ দিয়ে আহ্বান করেছে সেই গুণটি তার মাঝে সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

وَكَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ أَوْ وَجْهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ بَدَنُكَ أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ فَرْجُكِ حُرٌّ لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ وَقَدْ مَرَّ فِى الطَّلَاقِ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلٰى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِيْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَسَيَأْتِيْكَ الْإِخْتِلَافُ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنْ أَضَافَهُ إِلٰى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَالْكَلَامُ فِيْهِ كَالْكَلَامِ فِى الطَّلَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : আর তেমনি যদি বলে, তোমার মাথা আজাদ, কিংবা তোমার চেহারা আজাদ, কিংবা তোমার গর্দান আজাদ, কিংবা তোমার দেহ আজাদ, কিংবা দাসীকে বলল তোমার লজ্জাস্থান আজাদ [তাহলে আজাদ হয়ে যাবে]। কেননা, [লোক প্রচলনে] এ সকল শব্দ দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। তালাক প্রসঙ্গে এ কথা আলোচিত হয়েছে। আর যদি আজাদ করার বিষয়টিকে অনির্ধারিত অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে এ অংশে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হবে। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কিত মতপার্থক্য পরবর্তীতে আসছে। আর যদি [আজাদ হওয়ার বিষয়কে] নির্দিষ্ট এমন কোনো অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত করে, যা দ্বারা সমগ্র মানুষ বুঝানো হয় না; যেমন– হাত ,পা তাহলে আমাদের মতে আজাদ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এ সম্পর্কিত বক্তব্য তালাক সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুরূপ। আর আমরা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ الخ : মনিব যদি তার গোলামকে বলে, তোমার মাথা আজাদ, অথবা তোমার চেহারা আজাদ, অথবা বলল, তোমার গর্দান আজাদ, অথবা বলল, তোমার শরীর আজাদ, অথবা দাসীকে বলল, তোমার লজ্জাস্থান আজাদ তাহলে এসব শব্দ বলা দ্বারা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, লোক প্রচলনে এসব অঙ্গ বলে পুরো শরীরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তালাক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর যদি আজাদ হওয়াকে শরীরে অনির্ধারিত কোনো অঙ্গের দিকে সম্পর্কিত করেন; যেমন– তোমার অর্ধেক আজাদ অথবা তোমার এক-তৃতীয়াংশ আজাদ ইত্যাদি, তাহলে সর্বপ্রথম অনির্ধারিত এতটুকু অঙ্গ আজাদ হবে অতঃপর ক্রমশ আজাদ হওয়ার গুণটি পুরো শরীরে বিস্তৃত হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে সাহেবাইনের যে দ্বিমত রয়েছে, তা পরে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلٰى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গোলাম আজাদ করার বিষয়কে এমন অঙ্গের দিকে সম্পর্কিত করেন, যা দ্বারা পুরো শরীর বুঝানো হয় না; যেমন মনিব বলল– তোমার হাত আজাদ, অথবা তোমার পা আজাদ ইত্যাদি, তাহলে এসব বলার দ্বারা গোলাম আজাদ হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নিকট এসব বলার দ্বারাও আজাদ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তালাক পতিত হওয়ার অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

وَلَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ وَنَوٰى بِهِ الْحُرِّيَّةَ عُتِقَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يُعْتَقْ لِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ اَنَّهٗ اَرَادَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ لِاَنِّيْ بِعْتُكَ وَيَحْتَمِلُ لِاَنِّيْ اَعْتَقْتُكَ فَلَا يَتَعَيَّنُ اَحَدُهُمَا مُرَادًا اِلَّا بِالنِّيَّةِ قَالَ وَكَذَا كِنَايَاتُ الْعِتْقِ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهٖ خَرَجْتَ مِنْ مِلْكِيْ وَلَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكَ وَلَا رِقَّ لِيْ عَلَيْكَ وَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيْلَكَ لِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيْلِ وَالْخُرُوْجَ عَنِ الْمِلْكِ وَتَخْلِيَةَ السَّبِيْلِ بِالْبَيْعِ اَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَحْتَمِلُ بِالْعِتْقِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ وَكَذَا قَوْلُهٗ لِاَمَتِهٖ قَدْ اَطْلَقْتُكِ لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ خَلَّيْتُ سَبِيْلَكِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) بِخِلَافِ قَوْلِهٖ طَلَّقْتُكِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ وَنَوَى الْعِتْقَ لَمْ يُعْتَقْ لِاَنَّ السُّلْطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ وَسُمِّيَ السُّلْطَانُ بِهٖ لِقِيَامِ يَدِهٖ وَقَدْ يَبْقَى الْمِلْكُ دُوْنَ الْيَدِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ لَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكَ لِاَنَّ نَفْيَهٗ مُطْلَقًا بِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ لِاَنَّ لِلْمَوْلٰى عَلَى الْمُكَاتَبِ سَبِيْلًا فَلِهٰذَا يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ.

অনুবাদ : যদি বলে, তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই, আর এ কথার দ্বারা আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। আর নিয়ত না করলে আজাদ হবে না। কেননা, উপরিউক্ত কথার মধ্যে দুটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যথা– তোমার উপর কোনো মালিকানা নেই, কেননা তোমাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি, কিংবা তোমাকে আজাদ করে দিয়েছি। সুতরাং নিয়ত ছাড়া দুটি অর্থের কোনো একটি উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'স্বাধীনতা' অর্থের ইঙ্গিত সংবলিত শব্দগুলো সম্পর্কেও একই হুকুম। যেমন বলল– তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছ, কিংবা তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই, কিংবা তোমার উপর আমার কোনো বন্ধন নেই, কিংবা আমি তোমার পথ ছেড়ে দিয়েছি। কেননা, মালিকানা থেকে বের হওয়া, অধিকার শেষ হওয়া এবং পথ ছেড়ে দেওয়া আজাদ করার মাধ্যমে হওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি বিক্রির মাধ্যমে এবং কিতাবতের মাধ্যমে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং নিয়ত করা আবশ্যক। তদ্রূপ যদি দাসীকে বলে যে, তোমাকে বন্ধনমুক্ত করলাম, [নিয়তসাপেক্ষে আজাদ হবে] কেননা, এটাও তোমার পথ ছেড়ে দিলাম-এর সমপর্যায়ের। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ ধরনের মতামতই বর্ণিত হয়েছে। দাসীর উদ্দেশ্যে, 'তোমাকে তালাক দিলাম' বক্তব্যটি এর বিপরীত। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব। আর যদি বলে, তোমার উপর আমার কোনো ক্ষমতা নেই, আর এ কথা দ্বারা আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, 'সুলতান' [ক্ষমতা] শব্দ নিয়ন্ত্রণ অধিকার বুঝায়। আর 'সুলতান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কায়েম থাকার উপর। আর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যতীতও কখনো মালিকানা থাকতে পারে। যেমন মুকাতাবের [চুক্তিবদ্ধ দাসের] ক্ষেত্রে হয়। 'তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই।' বক্তব্যটি এর বিপরীত। কেননা, সঠিকভাবে অধিকার রহিত হওয়া, মালিকানা রহিত হওয়া দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। এজন্যই চুক্তিবদ্ধ গোলামের উপর মনিবের অধিকার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এ কথা দ্বারা আজাদ করার অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ وَنَوٰى بِهِ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গোলামকে সম্বোধন করে বলে যে, 'তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই' এ বক্তব্য দ্বারা মনিব যদি আজাদ করার নিয়ত করেন, তাহলে আজাদ হবে, আর যদি আজাদ করার নিয়ত না করেন, তাহলে আজাদ হবে না। এর প্রমাণ হলো, উক্ত বক্তব্যটি ইঙ্গিতমূলক কথা। কেননা, তার এ কথার মাঝে দুই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে– এক হলো, তোমার উপর আমার মালিকানা এ কারণে নেই যে, আমি তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছি। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, আমার মালিকানা নেই এ কারণে যে, আমি তোমাকে আজাদ করে দিয়েছি। সুতরাং বুঝা গেল, এ বাক্যটি আজাদ করার জন্য সুস্পষ্ট নয়; বরং ইঙ্গিতমূলক কথা। আর ইঙ্গিতমূলক কথার দ্বারা কোনো হুকুম সাব্যস্ত করতে হলে নিয়ত করতে হয়, বিধায় উক্ত মাসআলায় নিয়তসাপেক্ষে গোলাম আজাদ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَكَذَا كِنَايَاتُ الْعِتْقِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তদ্রূপ বিধান হলো অন্যান্য ইঙ্গিতমূলক শব্দ দ্বারা আজাদ করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, আজাদ করার নিয়তে যদি ইঙ্গিতমূলক শব্দ বলে তাহলে আজাদ হবে, অন্যথায় আজাদ হবে না। যেমন– মনিব তার গোলামকে বলল, তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছ, অথবা দাসীকে বলল, তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছ, অথবা বলল, আমার জন্য তোমার ব্যাপারে কোনো পথ নেই, অথবা তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই, অথবা আমি তোমার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি ইত্যাদি।

উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ হলো এই যে, এসব শব্দের মাঝে আজাদ করার অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, আমি আজাদ করে দিয়েছি এ কারণে তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছ, অথবা আমার আজাদ করার কারণে তোমার উপর আমার মালিকানা নেই ইত্যাদি অর্থের যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপ এ অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমি তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছি, অথবা তোমার সাথে কিতাবাত [অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তি] করেছি, বিধায় আমার মালিকানা নেই। সুতরাং একটা অর্থকে নির্ধারণের জন্যই নিয়তের আবশ্যকীয়তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং নিয়ত পাওয়া গেলে আজাদ হবে, আর নিয়ত পাওয়া না গেলে আজাদ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ لِاَمَتِهِ قَدْ اَطْلَقْتُكِ الخ : এমনিভাবে মনিব যদি তার দাসীকে বলে যে, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি, তাহলে নিয়তসাপেক্ষে দাসী আজাদ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু "আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি"-এর হুকুম ভিন্ন। এ অবস্থায় নিয়ত থাকা সত্ত্বেও আজাদ হবে না। কেননা, এ শব্দটি তালাকের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা আজাদ হওয়া সাব্যস্ত হবে না। এ সম্পর্কে সামনে আরো বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا سُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গোলামকে বলে যে– لَا سُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ - 'তোমার উপর আমার কোনো ক্ষমতা নেই' আর এর দ্বারা আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, ক্ষমতা শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ন্ত্রণ-অধিকার। আর বাদশাহকেও সুলতান এজন্যই বলা হয় যে, দেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ-অধিকার থাকে। আর এ অধিকার মালিকানার জন্য আবশ্যক নয়; বরং মালিকানা থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ-অধিকার নাও থাকতে পারে। যেমন মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكَ الخ : তবে মনিব যদি বলে যে– لَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكَ - 'তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই' আর এ কথার দ্বারা আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, পরিপূর্ণভাবে অধিকারকে নাকচ করা ঐ সময়-ই হয় যখন মালিকানা থেকে সে বের হয়ে যায়। আর মুকাতাবের উপর যেহেতু মনিবের এক ধরনের অধিকার থাকে সুতরাং لَا سَبِيْلَ لِيْ عَلَيْكَ দ্বারা আজাদ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَلَوْ قَالَ هٰذَا ابْنِىْ وَثَبَتَ عَلٰى ذٰلِكَ عُتِقَ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَإِذَا كَانَ لَا يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ذَكَرَهُ بَعْدَ هٰذَا ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الدَّعْوَةِ بِالْمِلْكِ ثَابِتَةٌ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّسَبِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِذَا ثَبَتَ عُتِقَ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلٰى وَقْتِ الْعُلُوْقِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ وَيُعْتَقُ إِعْمَالًا لِلَّفْظِ فِيْ مَجَازِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ إِعْمَالِهِ بِحَقِيْقَتِهِ وَ وَجْهُ الْمَجَازِ نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : যদি বলে যে, 'এ আমার পুত্র' অতঃপর এ দাবির উপর সে অটল থাকে, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। মাসআলাটির অর্থ এই যে, যদি গোলাম এমন হয়ে থাকে যে, ঔরসজাত হতে পারে [বয়সগত দিক থেকে]। আর বয়সগত দিক থেকে যদি এ ধরনের গোলাম তার ঔরসজাত হতে না পারে, [তাহলে কি হবে?] তিনি এ মাসআলাটি পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন। আর যদি গোলামের প্রতিষ্ঠিত কোনো বংশ-পরিচয় না থাকে, তাহলে বক্তব্যদাতার সাথে গোলামের বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, মালিকানার কারণে ঔরসজাত হওয়ার দাবি করার অধিকার তার রয়েছে। আর গোলামটিতো বংশ-পরিচয়ের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তার থেকে তার বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হবে। আর বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হলে অনিবার্যভাবেই সে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, বংশের সূচনা গর্ভসঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যদি গোলামের সুস্যাব্যস্ত বংশ-পরিচয় থাকে, তাহলে তার থেকে তার বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তা অসম্ভব। তবে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, শব্দটিকে মূল ও প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হবে। আর রূপক অর্থটির দৃষ্টিকোণ ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে উল্লেখ করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ هٰذَا ابْنِىْ وَثَبَتَ عَلٰى ذٰلِكَ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গোলামের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, এটা আমার পুত্র এবং এই দাবির উপর অটল থাক, তাহলে গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় وَثَبَتَ عَلٰى ذٰلِكَ 'এ দাবির উপর অটল থাকে' কথাটি কথা-প্রবাহে বলা হয়েছে। কেননা, ইয়ানাবীয় নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ বক্তব্যের উপর অটল থাকা জরুরি নয়, তাইতো মাবসূত নামক গ্রন্থে উক্ত মাসআলা আলোচনা করার ক্ষেত্রে এ কথটুকু উল্লেখই নেই। কিন্তু আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)-এর নিকট বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দাবির উপর অটল থাকা শর্ত; তবে আজাদ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বিধায় 'এটা আমার পুত্র' বলার পর সাথে সাথে যদি বলে যে, 'আমি ভুল বলেছি' তারপরও গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। তার পরবর্তী কথাটাকে মেনে নেওয়া হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– যে গোলামকে সম্বোধন করে 'এটা আমার পুত্র' বলা হয়েছে ঐ গোলামটির বয়স এমন হতে হবে যে বয়সের সন্তান মনিবের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর তা না হয়ে যদি এমন হয় যে, এ বয়সের সন্তান মনিবের পুত্র হতে পারে না; যেমন– মনিবের বয়স বিশ বছর আর গোলামের বয়স পঁচিশ বছর, তাহলে সে অবস্থায় কি হবে? সামনে তা আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ الخ : অতঃপর ঐ গোলামের যদি সুপরিচিত অন্য কোনো বংশ-পরিচয় না থাকে তাহলে মনিব থেকে এ সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, মনিব এ গোলামের মালিক হওয়ার সূত্রে ছেলে হওয়ার দাবি করার অধিকার রাখেন। আর এ গোলামেরও বংশ-পরিচয়ের দরকার আছে। বিধায় মনিব থেকে তার বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যখন বংশ সাব্যস্ত হবে তখন আজাদও হয়ে যাবে। কেননা, বংশের সম্পর্ক গর্ভাশয় থেকেই– সুতরাং তখন থেকেই সে আজাদ। তাইতো রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ, যে তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মালিক হবে, সে তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ الخ : আর যদি ঐ গোলামের বংশ-পরিচয় থাকে, তাহলে মনিবের কথার দ্বারা তার থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অন্যের থেকে এ গোলামের বংশ সাব্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় মনিব থেকে বংশ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। তবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। যাতে করে শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার হওয়া সম্ভব হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলে আখ্যা দেওয়া যায়। আর রূপক অর্থ এভাবে যে, পুত্র হওয়া আজাদ হওয়ার سَبَبٌ [কারণ]। আর سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সুতরাং রূপকের এ নিয়মে গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে।

وَلَوْ قَالَ هٰذَا مَوْلَايَ اَوْ يَا مَوْلَايَ عُتِقَ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّ اِسْمَ الْمَوْلٰى وَاِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَابْنَ الْعَمِّ وَالْمُوَالَاةَ فِى الدِّيْنِ وَالْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ فِى الْعِتَاقَةِ اِلَّا اَنَّهُ تَعَيَّنَ الْاَسْفَلَ فَصَارَ كَاِسْمٍ خَاصٍّ لَهُ وَهٰذَا لِاَنَّ الْمَوْلٰى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوْكِهٖ عَادَةً وَلِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ فَانْتَفَى الْاَوَّلُ وَالثَّانِىْ وَالثَّالِثُ نَوْعُ مَجَازٍ وَالْكَلَامُ لِحَقِيْقَتِهٖ وَالْاِضَافَةُ اِلَى الْعَبْدِ تُنَافِىْ كَوْنَهُ مُعْتِقًا فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْاَسْفَلُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ وَكَذَا اِذَا قَالَ لِاَمَتِهٖ هٰذِهٖ مَوْلَاتِىْ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْمَوْلٰى فِى الدِّيْنِ اَوِ الْكِذْبَ يُصَدَّقُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يُصَدَّقُ فِى الْقَضَاءِ لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَلِاَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْاَسْفَلُ مُرَادًا اِلْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ وَبِالنِّدَاءِ بِاللَّفْظِ الصَّرِيْحِ يُعْتَقُ بِاَنْ قَالَ يَا حُرُّ يَا عَتِيْقُ فَكَذَا النِّدَاءُ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا يُعْتَقُ فِى الثَّانِىْ لِاَنَّهُ يَقْصُدُ بِهِ الْاِكْرَامَ مَنْزِلَةَ قَوْلِهٖ يَا سَيِّدِىْ يَا مَالِكِىْ قُلْنَا اَلْكَلَامُ لِحَقِيْقَتِهٖ وَقَدْ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهٖ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ لِاَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْعِتْقِ فَكَانَ اِكْرَامًا مَحْضًا .

অনুবাদ : আর যদি বলে, এ হলো আমার 'মাওলা' কিংবা হে আমার মাওলা, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। প্রথমটির কারণ এই যে, [দাস-দাসীর প্রসঙ্গে] 'মাওলা' শব্দটি যদিও সাহায্যকারী, চাচাতো ভাই ও ধর্মভাই অর্থে আসে এবং মনিব কিংবা আজাদকৃত দাস বা দাসীও বুঝায়। কিন্তু এখানে আজাদকৃত অর্থই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর তা এজন্য যে, মনিব সাধারণত তার দাস থেকে সাহায্য গ্রহণ করে না। আর এ দাসের বংশ-পরিচয় রয়েছে। সুতরাং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থটি রূপক হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার বক্তব্য প্রকৃত অর্থে ধর্তব্য। আর এখানে আজাদকারী মনিব অর্থটি সম্ভাব্য না হওয়ার কারণ হচ্ছে, গোলামের সাথে শব্দটির সম্বন্ধকরণ। সুতরাং শব্দটি স্বাধীনতার স্পষ্ট অর্থ ধারণকারী শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে গেল। তেমনি যদি সে তার দাসীকে বলে, সে আমার মাওলা এর কারণ আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আর যদি সে বলে যে, মাওলা শব্দটি দ্বারা আমি ধর্মীয় বন্ধুত্ব বুঝাতে চেয়েছি কিংবা শব্দটি মিথ্যারূপে বলেছি, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর মধ্যে সত্য বলে গণ্য হবে, কিন্তু আদালতের দৃষ্টিতে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তার এ দাবি শব্দটির বাহ্য অর্থের পরিপন্থি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে, শব্দটি যখন আজাদকৃত গোলাম অর্থে উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত হয়ে গেল তখন তা স্পষ্ট শব্দ হয়ে গেল। আর স্পষ্ট শব্দযোগে সম্বোধন করলে গোলাম স্বাধীন হয়ে যায়। যেমন সে 'হে স্বাধীন' কিংবা 'হে মুক্ত' বলে সম্বোধন করল। সুতরাং আলোচ্য শব্দযোগে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আজাদ হবে না। কেননা, এমন সম্বোধন দ্বারা সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন 'হে আমার সর্দার' বা 'হে আমার মালিক' সম্বোধন দ্বারা করা হয়ে থাকে। আমাদের দলিল এই যে, বক্তব্য প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত। আর এখানে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-কথিত সম্বোধন দুটি ভিন্ন। কেননা, তাতে এমন কোনো অর্থবহ শব্দ নেই, যা গোলাম আজাদ করার সাথে সুনির্দিষ্ট। সুতরাং এটি নিছক সম্মান প্রদান অর্থেই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ هٰذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার দাসের প্রতি সম্বোধন করে বলে যে, هٰذَا مَوْلَايَ - 'এ আমার মাওলা' অথবা বলে يَا مَوْلَايَ - 'হে আমার মাওলা' তাহলে নিয়ত ব্যতীতই গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, নিয়ত ব্যতীত আজাদ হবে না।

هٰذَا مَوْلَايَ - 'এটা আমার মাওলা' এ কথা বললে যে আজাদ হবে এর প্রমাণ হলো এই যে, مَوْلًى [মাওলা] শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ হলো– সাহায্যকারী যেমন ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ অর্থাৎ 'কাফেরদের সাহায্যকারী কেউ নেই।' –[সূরা মুহাম্মদ] আবার চাচাতো ভাইয়ের অর্থেও ব্যবহার হয়। ইরশাদ হচ্ছে– وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ অর্থাৎ, 'আমার মৃত্যুর পর চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।' –[সূরা মারইয়াম] এমনিভাবে ধর্মীয় সম্পর্কের [মুয়ালাতে দীনি] অর্থেও মাওলা শব্দটি ব্যবহার হয়। মুয়ালাতের পদ্ধতি হলো, আজাদ বিবেকসম্পন্ন, সাবালক মুসলমান অন্য কাউকে বলল যে, তুমি আমার মাওলা, আমি মারা গেলে তুমি আমার উত্তরাধিকার হবে, আর জরিমানামূলক কোনো অপরাধ আমার পক্ষ থেকে হয়ে গেলে তুমি তা পরিশোধ করবে। অপরজন বলল, আমি এ চুক্তি কবুল করলাম। সুতরাং এর দ্বারা কবুলকারী ঐ ব্যক্তির মাওলা হয়ে যাবে এবং ঐ চুক্তি হিসেবে সে মারা গেলে অপরজন মিরাস পাবে, আর অপরাধ করলে জরিমানা দেবে। এমনিভাবে মাওলা শব্দটি আজাদকারীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার আজাদকৃত গোলামের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় মাওলা শব্দটি আজাদকৃত গোলামের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা গোলামের একটি বিশেষণে পরিণত হয়েছে। আর তা খাস হওয়ার কারণ হলো এই যে, এখানে মাওলা শব্দটি সাহায্যকারীর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, সাধারণত মনিব তার গোলাম থেকে সাহায্য কামনা করে না; বরং সে কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। আর গোলামের বংশ যেহেতু পরিচিত, তাই মাওলা বলে চাচাতো ভাই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াও সম্ভব নয়। আর মুয়ালাত উদ্দেশ্যটাও হলো রূপক অর্থ। আর এখানে আলোচনা হচ্ছে প্রকৃত অর্থ নিয়ে। সুতরাং এ অর্থটি উদ্দেশ্য হতে পারে না। আর এ ব্যক্তি গোলামকে যেহেতু মাওলা বলেছেন সুতরাং আজাদকারী অর্থ হতে পারবে না। কেননা, গোলাম আজাদকারী হতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আজাদকৃত অর্থটাই প্রযোজ্য হবে। আর এটা স্পষ্ট শব্দের ন্যায়। আর স্পষ্ট শব্দ বলে কোনো হুকুম সাবেত করতে নিয়তের প্রয়োজন হয় না, বিধায় هٰذَا مَوْلَايَ 'এটা আমার মাওলা' বললে নিয়ত ছাড়াই আজাদ হয়ে যাবে।

কিন্তু মনিব যদি বলে যে, আমি উক্ত বাক্য দ্বারা পরস্পর সন্ধি হওয়াকে বুঝিয়েছি অথবা অহেতুক বলেছি, তাহলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সম্পর্ক হিসেবে তার কথাকে মেনে নেওয়া হবে, কিন্তু আইনত আদালতে তার কথা মেনে নেওয়া যাবে না। কেননা, শব্দটি বাহ্য অর্থের পরিপন্থি দাবি করছে। আর আদালতে এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য হয় না।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الخ : দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ 'হে আমার মাওলা' দ্বারা আজাদ হওয়ার দলিল হলো এই যে, যখন মাওলা দ্বারা আজাদকৃত গোলাম উদ্দেশ্য হয় তখন তা আজাদের জন্য স্পষ্ট শব্দের মতো হয়ে গেল। আর স্পষ্ট শব্দের দ্বারা ডাকলে আজাদ হতে নিয়ত প্রয়োজন হয় না; যেমন 'হে আমার আজাদকৃত!' এ ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও নিয়ত ব্যতীতই আজাদ হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ দ্বিতীয় অবস্থায় আজাদ হবে না। কেননা, 'হে আমার মাওলা' বলে অনেক সময় সম্মান-মর্যাদাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; যেমন– 'হে আমার সরদার!', 'হে আমার মালিক!' বলে সম্মান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কিন্তু আমরা তার উত্তরে বলব যে, আলোচনা হচ্ছে শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে, আর এখানে সেই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সম্ভবও, সুতরাং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে না। তবে 'হে আমার সর্দার!' অথবা 'হে আমার মালিক!'-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ শব্দদ্বয়ে আজাদ করার কোনো অর্থ নেই। সুতরাং এগুলোতে শুধু সম্মানই উদ্দেশ্য হবে। আর শুধু সম্মানের দ্বারা আজাদ হয় না। সুতরাং একটাকে অপরের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না।

وَلَوْ قَالَ يَا اِبْنِىْ اَوْ يَا اَخِىْ لَمْ يُعْتَقْ لِاَنَّ النِّدَاءَ لِاِعْلَامِ الْمُنَادٰى اِلَّا اَنَّهُ اِذَا كَانَ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ اِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِتَحْقِيْقِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ فِى الْمُنَادٰى اِسْتِحْضَارًا لَهُ بِالْوَصْفِ الْمَخْصُوْصِ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ يَا حُرُّ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ وَاِذَا كَانَ النِّدَاءُ بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ اِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلْاِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ دُوْنَ تَحْقِيْقِ الْوَصْفِ فِيْهِ لِتَعَذُّرِهِ وَالْبُنُوَّةُ لَا يُمْكِنُ اِثْبَاتُهَا حَالَ النِّدَاءِ مِنْ جِهَتِهِ لِاَنَّهُ لَوْ اِنْخَلَقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ لَا يَكُوْنُ اِبْنًا لَهُ بِهٰذَا النِّدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرَّدِ الْاِعْلَامِ وَيُرْوٰى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) شَاذًّا اَنَّهُ يُعْتَقُ فِيْهِمَا وَالْاِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَوْ قَالَ يَا اِبْنُ لَا يُعْتَقُ لِاَنَّ الْاَمْرَ كَمَا اَخْبَرَ فَاِنَّهُ اِبْنُ اَبِيْهِ وَكَذَا اِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ اَوْ يَا بُنَيَّةَ لِاَنَّهُ تَصْغِيْرُ لِلْاِبْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ غَيْرِ اِضَافَةٍ وَالْاَمْرُ كَمَا اَخْبَرَ .

অনুবাদ : যদি বলে 'হে আমার পুত্র' কিংবা 'হে আমার ভাই', তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, নেদা বা আহ্বানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহবানকৃত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা। তবে নেদা বা আহ্বান যদি এমন কোনো গুণ উল্লেখপূর্বক হয়, আহ্বানকারীর দিক থেকে যা সাব্যস্ত করা সম্ভব। তখন আহ্বানের উদ্দেশ্য হবে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে উক্ত গুণ সাব্যস্ত করা এবং ঐ বিশেষ গুণে ভূষিত অবস্থায় তাকে উপস্থিত করা। আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী 'হে স্বাধীন ব্যক্তি' এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। পক্ষান্তরে আহবান যদি এমন কোনো গুণ উল্লেখপূর্বক হয়, যা সম্বোধনকারীর দিক থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, তখন আহ্বানের উদ্দেশ্য হবে শুধু অবহিত করা। তার মাঝে কোনো গুণ সাব্যস্তকরণ নয়। কেননা, তা সম্ভব নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে পুত্রত্বের গুণটি যেহেতু সম্বোধনের অবস্থায় সম্বোধনকারীর দিক থেকে সম্ভব নয়। কেননা, যদি সে অন্যের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এ সম্বোধনের কারণে সে তার পুত্র হয়ে যাবে না। সেহেতু এই সম্বোধনটি শুধু অবহিত করাই উদ্দেশ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বিরল বর্ণনা রয়েছে যে, উভয় সম্বোধনের ক্ষেত্রে সে আজাদ হয়ে যাবে, অবশ্য জাহিরে রেওয়ায়েতটি নির্ভরযোগ্য। যদি বলে 'হে পুত্র', তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, তার সম্বোধন বাস্তবানুগ হয়েছে। কারণ, সে তার পিতার পুত্র বটে। আর তেমনি যদি বলে, হে বৎস বা হে বৎসা, [আজাদ হবে না]। কেননা, এতে নিজের দিকে সম্বোধন না করে ছোট বেটা-বেটি হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে। আর বাস্তবেও তা-ই, যা সে বলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ يَا اِبْنِىْ اَوْ يَا اَخِىْ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার দাসকে বলে যে, 'হে আমার পুত্র' কিংবা 'হে আমার ভাই', তাহলে এ কথার দ্বারা গোলামটি আজাদ হবে না। আর পূর্বের মাসআলায় এ কথা আলোচিত হয়েছে যে, মনিব তার গোলামকে 'হে আজাদ' বলে আহ্বান করলে আজাদ হয়ে যাবে। এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধানের কারণ এই যে, আহ্বান করা যদি এমন কোনো গুণের সাথে হয় যা আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত হতে পারে, তাহলে যাকে আহ্বান করা হলো তার

মাঝে ঐ গুণটি সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য থাকবে অর্থাৎ এ কথা বলা হবে যে, আহ্বানকারী তার মাঝে এই গুণটি সাব্যস্ত করল যাতে এ গুণের সাথে আহ্বানকৃত ব্যক্তি তার সামনে উপস্থিত হয়। যেমন বলল, 'হে আজাদ!' আজাদী বা স্বাধীনতা এমন একটি গুণ যা আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা যায়, তাহলে বলা হবে, মনিব তার গোলামের মাঝে আজাদ হওয়ার গুণকে সাব্যস্ত করে তার সামনে উপস্থিত করতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ النِّدَاءُ بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ الخ : আর আহ্বান করা যদি এমন গুণের সাথে হয়, যা আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, তাহলে আহ্বান করার অর্থ হবে শুধু তাকে জানানো; ঐ গুণটা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য হবে না কেননা, এ গুণটা সাব্যস্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর আলোচ্য মাসআলায় পুত্র হওয়াটা এমন একটা গুণ যা আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে আহ্বানের সময় সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা, অন্যের থেকে যদি এই গোলামের বংশ-পরিচিতি থাকে, তাহলে মনিবের আহ্বান দ্বারা মনিবের পুত্র হতে পারে না। সুতরাং এই আহ্বানের উদ্দেশ্য হবে শুধু অবগত করা। এ হলো জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী। আর হযরত হাসান (র.) সূত্রে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি শায বর্ণনা রয়েছে যে, এ দুটি অবস্থা অর্থাৎ 'হে আমার পুত্র' কিংবা 'হে আমার ভাই' এর দ্বারা আজাদ হয়ে যাবে।

মোটকথা, তিনভাবে ডাকা যায়– 'হে হুর! হে আজাদ, হে আমার মাওলা-এর দ্বারা আজাদ হয়ে যাবে। এটা হলো জাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী। আর ইমাম হাসান (র.) সূত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট পাঁচ শব্দের দ্বারা আহ্বান করলে আজাদ হয়ে যাবে। উক্ত তিনটার সাথে হে আমার ছেলে কিংবা হে আমার ভাই-এর দ্বারাও আজাদ হয়ে যাবে। তবে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো প্রথমটি-ই। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ يَا ابْنُ لَا يُعْتَقُ الخ : **মাসআলা :** মনিব যদি তার গোলামকে বলে যে, 'হে পুত্র!' কিন্তু আমার ইত্যাকার শব্দ না বলে, তাহলে ঐ গোলামটি আজাদ হবে না। কেননা, মনিব বাস্তব কথাই বলেছে। কারণ, এ গোলামটি কারো না কারো তো পুত্র। এমনিভাবে মনিব যদি বলে, 'হে বৎস বা বৎসা' তাহলেও আজাদ হবে না। কারণ, সে আমার বলেনি। আর বাস্তবেও এ ছেলেটি বা মেয়েটি তার পিতার বৎস-বৎসা।

وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ هٰذَا إِبْنِيْ عُتِقَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يُعْتَقُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَهُمْ أَنَّهُ كَلَامٌ مُحَالٌ بِحَقِيْقَتِهِ فَيُرَدُّ وَيَلْغُوْ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ كَلَامٌ مُحَالٌ بِحَقِيْقَتِهِ لٰكِنَّهُ صَحِيْحٌ بِمَجَازِهِ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ حُرِّيَّتِهِ مِنْ حِيْنِ مِلْكِهِ وَهٰذَا لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ فِي الْمَمْلُوْكِ سَبَبٌ لِحُرِّيَّتِهِ إِمَّا إِجْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ وَإِطْلَاقُ السَّبَبِ وَإِرَادَةُ الْمُسَبَّبِ مُسْتَجَازٌ فِي اللُّغَةِ تَجَوُّزًا أَوْ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْبُنُوَّةِ فِي الْمَمْلُوْكِ وَالْمُشَابَهَةُ فِيْ وَصْفٍ لَازِمٍ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ عَلٰى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَحَرُّزًا عَنِ الْإِلْغَاءِ بِخِلَافِ مَا اسْتُشْهِدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ فِي الْمَجَازِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْغَاءُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ قَطَعْتُ يَدَكَ فَأَخْرَجَهُمَا صَحِيْحَتَيْنِ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَالْتِزَامِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الْمَالِ لِأَنَّ الْقَطْعَ خَطَأً سَبَبٌ لِوُجُوْبِ مَالٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ الْأَرْشُ وَأَنَّهُ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي الْوَصْفِ حَتّٰى وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِيْ سَنَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِدُوْنِ الْقَطْعِ وَمَا أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ فَالْقَطْعُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لَهُ أَمَّا الْحُرِّيَّةُ لَا تَخْتَلِفُ ذَاتًا وَحُكْمًا فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْهُ .

অনুবাদ : আর যদি বয়সগতভাবে তার ঔরসজাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন গোলামকে বলে যে, সে আমার পুত্র, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। আর সাহেবাইনের মতে আজাদ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এ মত। তাদের দলিল এই যে, প্রকৃত অর্থের দিক থেকে এটা অসম্ভব কথা। সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল হবে। যেমন যদি সে বলল, আমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কিংবা তুমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি আজাদ করেছি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, প্রকৃত অর্থের দিক থেকে এটা অসম্ভব হলেও রূপক অর্থে তা সঠিক। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে, মালিকানা লাভের মুহূর্ত থেকে "সে স্বাধীন" এ সংবাদ প্রদান করা। কেননা মালিকানাধীন গোলামের পুত্রত্ব হলো তার স্বাধীনতা লাভের কারণ। কেননা, এর উপর ইজমা ব উম্মতের ঐক্যমত্য রয়েছে। কিংবা এটা আত্মীয়তার সৌজন্যের কারণে। আর রূপকভাবে কারণ উল্লেখ করে কার উদ্দেশ্য করার ভাষাগত বৈধতা রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা হচ্ছে দাসের পুত্রত্ব সম্পর্কের অনিবার্য ফল, আর উসূলশাস্ত্র অনুযায়ী অনিবার্য গুণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হচ্ছে রূপক অর্থ গ্রহণের একটি পন্থা। সুতরাং 'হে আমার পুত্র' কথাটি স্বাধীনতার রূপক অর্থে গ্রহণ করা হবে, যাতে তা নিরর্থকতায় পর্যবসিত না হয়। পক্ষান্তরে নজিররূপে উল্লেখকৃত বক্তব্যটি ভিন্ন। কেননা, [যেহেতু 'আমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তোমাকে আজাদ করেছি' এ বক্তব্য দাসের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে না] এখানে রূপক অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং বক্তব্যটির অর্থহীনতা নির্ধারিত হয়ে গেল। আর যদি কাউকে সম্বোধন করে বলে যে, আমি তোমার হস্ত কর্তন করেছি, অথচ উভয় হস্ত অক্ষত দেখা গেল, তখন এ বক্তব্যকে রূপক অর্থে আর্থিক দায়ের স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করা হবে না, যদিও হস্তকর্তন আর্থিক দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। কেননা, ভুলক্রমে হস্তকর্তন বিশেষ ধরনের আর্থিক দায় তথা দিয়ত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ, আর গুণগতভাবে তা সাধারণ আর্থিক দায় থেকে ভিন্ন। এ কারণেই দিয়তের অর্থদণ্ড দুই বছর সময়সীমায় عَاقِلَة [আত্মীয়-প্রতিবেশী] বর্গের উপর ওয়াজিব হয়, আর যা সাব্যস্ত করা সম্ভব, তার জন্য হস্তকর্তন কারণ নয়। আর স্বাধীনতা গুণটি সত্তাগত ও গুণগতভাবে ভিন্ন নয়। সুতরাং 'আমার পুত্র' এ বক্তব্যকে রূপক অর্থে মুক্তিদান সাব্যস্ত করা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُوْلَدُ مِثْلُهُ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার থেকে বয়সে বড় এমন গোলামকে বলে যে, এটা আমার পুত্র, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ও সাহেবাইন বলেন, গোলাম আজাদ হবে না।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : মনিবের কথাকে প্রকৃত অর্থে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যাকে সে নিজের পুত্র বলছে সে বয়সে মনিব থেকে বড়, বিধায় মনিবের কথাটা অনর্থক এবং বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তার গোলামকে বলে যে, 'আমার সৃষ্টির পূর্বে অথবা তোমার সৃষ্টির পূর্বে তোমাকে আজাদ করে দিয়েছিলাম' তার এ কথার কোনো অর্থ নেই, বিধায় এটা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। এমনিভাবে নিজ থেকে বয়সে বড় ব্যক্তিকে নিজের ছেলে বলা কথাটাও বাতিল হয়ে যাবে, বরং রূপক অর্থ হিসেবে আজাদ উদ্দেশ্য নেওয়াটাও সঠিক হবে না। কেননা, রূপক অর্থটা হলো প্রকৃত অর্থের খলিফা তথা স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং মূল আমল অসম্ভব হলে রূপকও অসম্ভব হবে, বিধায় রূপকও উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না। আর ব্যক্তি থেকে যখন প্রকৃত ও রূপক কোনো অর্থেই প্রযোজ্য করা যাচ্ছে না, বিধায় তার কথা বাতিল ও অনর্থক না হওয়ার কোনো উপায় নেই।

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ كَلَامٌ مُحَالٌ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের স্বপক্ষে দলিল হলো, যদিও তার কথাটি প্রকৃত অর্থে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু রূপক অর্থে নেওয়া সম্ভব। তাই আজাদ হওয়া উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। অর্থাৎ, যেন মনিব তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বলেছে যে, যখন থেকে আমি এই গোলামের মালিক হয়েছি তখন থেকেই এ গোলামটি আজাদ। কেননা, ছেলে হওয়াটা আজাদ হওয়ার কারণ [সবব]। মনিবের জন্য এ গোলামটি আজাদ হলেই ছেলে হতে পারে। মোটকথা, ছেলে হওয়া আজাদ হওয়ার সবব। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, ইজমায়ে উম্মত তথা সর্বসম্মতিক্রমে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা আবশ্যক হওয়ার কারণে ছেলে হওয়াটা আজাদ হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং এখানে ছেলে তথা সবব বলে আজাদ তথা মুসাববাব উদ্দেশ্য হবে। আর এমন একটি বলে অন্য কিছু উদ্দেশ্য নেওয়াই হলো মাজায তথা রূপক। সুতরাং রূপক হিসেবেই মনিবের কথা সঠিক ধরে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল : তা হলো, গোলাম ছেলে হওয়ার জন্য আজাদ হওয়াটা অনিবার্য। কেননা, ছেলে তার পিতার গোলাম হতে পারে না। সুতরাং ছেলে হওয়া মালযূম [যার জন্য আবশ্যক] আর আজাদ হওয়া হলো লাযিম। আর পরস্পর দুটোর মাঝে অনিবার্য সম্পর্ক হলে একটা বলে অপরটা উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। সুতরাং তার কথাকে বাতিল না করে উক্ত পদ্ধতিতে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, বিধায় গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) নজির হিসেবে যে মাসআলা পেশ করেছেন তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সৃষ্টির পূর্বে আজাদ করা সম্ভব নয় এবং রূপক অর্থে নেওয়ারও কোনো নিয়ম নেই, বিধায় তাদের কথাটি অনর্থক ও বাতিল হয়ে যাবে।

একটি প্রশ্নের উত্তর :

প্রশ্ন : ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে নীতির আলোকে আলোচ্য মাসআলায় প্রকৃত অর্থ সম্ভব না হওয়ার কারণে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অপর এক মাসআলায় নিজেই তার পরিপন্থি কথা বলেছেন। তা এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর একজনকে বলল যে, আমি ধোঁকায় পড়ে তোমার হাত কেটে দিয়েছি, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি তার হাত বের করে বলল, কোথায় আমার উভয় হাত তো অক্ষত। এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এখানে হাত কেটে দেওয়ার স্বীকারকারীর কথাকে রূপক অর্থে নিয়ে তার উপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। অর্থাৎ, এ কথা বলা হবে যে, সে হাত কাটার কথা স্বীকার করে নিজের উপর মূলত জরিমানাকে আবশ্যক করে নিয়েছে। অথচ উক্ত নীতির আলোকে তা করার দরকার ছিল। কেননা, হাত কাটা হলো سَبَبْ [সবব] আর জরিমানা হলো মুসাববাব।

উত্তর : ভুলবশত হাতকাটা এক বিশেষ জরিমানা তথা দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব; সাধারণ জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার সবব নয়। আর উক্ত জরিমানা বিশেষ গুণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সাধারণ জরিমানা থেকে ভিন্ন। আর ঐ বিশেষ জরিমানাটা নিজ عَاقِلَة -এর উপর দুই বৎসরে পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। আর সাধারণ জরিমানার মাঝে এমন কোনো সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই। তাহলে ঐ বিশেষ জরিমানা উদ্দেশ্য নেওয়া যাচ্ছে না হাতকাটা না পাওয়ার কারণে, আর সাধারণ জরিমানা উদ্দেশ্য নেওয়া যাচ্ছে না হাতকাটার মুসাববাব না হওয়ার কারণে।

মোটকথা, উক্ত বাক্যে প্রকৃত অর্থ এবং রূপক অর্থ দুটির কোনোটাই সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থ এজন্য অসম্ভব যে, হাতকাটা পাওয়া যায়নি, তা অক্ষত। আর প্রকৃত অর্থ এজন্য অসম্ভব যে, বিশেষ জরিমানা আর সাধারণ জরিমানার মাঝে ভিন্নতা রয়েছে, আর সে দুটির কোনোটাই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় আজাদ হওয়ার মাঝে ভিন্নতা নেই, বিধায় ছেলে বলে আজাদ উদ্দেশ্য নেওয়াটা সম্ভব।

وَلَوْ قَالَ هٰذَا اَبِيْ وَاُمِّيْ وَمِثْلُهُ لَا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ صَغِيْرٍ هٰذَا جَدِّيْ قِيْلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيْلَ لَا يُعْتَقُ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ لَا مُوْجَبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ اِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْاَبُ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيْ كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ اَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُوْجَبِ بِخِلَافِ الْاُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ لِاَنَّ لَهُمَا مُوْجَبًا فِي الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَلَوْ قَالَ هٰذَا اَخِيْ لَا يُعْتَقُ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهُ يُعْتَقُ وَ وَجْهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَّاهُ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهٖ هٰذَا اِبْنَتِيْ فَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ قِيْلَ هُوَ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْمُشَارَ اِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمّٰى فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْمُسَمّٰى وَهُوَ مَعْدُوْمٌ فَلَا يُعْتَبَرُ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي النِّكَاحِ ـ

অনুবাদ : আর বয়সগত অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও তার দাস-দাসী সম্বন্ধে মনিব যদি বলে যে, ইনি আমার পিতা বা মাতা, তাহলে উপরে বর্ণিত কারণে একই মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি ছোট শিশু সম্বন্ধে বলে– এ আমার দাদা, তাহলে কারো কারো মতে [একই কারণে] একই মতপার্থক্য রয়েছে। অন্য মতে, এ বক্তব্য দ্বারা মুক্তিদান সাব্যস্ত না হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে। কেননা, পিতার মাধ্যম ছাড়া এ বক্তব্যের অর্থ মালিকানাধীন দাসের সাথে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। আর তা তার কথার মাঝে উল্লেখ নেই। সুতরাং রূপক অর্থে আজাদ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব গুণ দুটি ভিন্ন। কেননা, মালিকানাধীন দাসের মাঝে মাধ্যম ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেই উক্ত গুণ দুটির জন্য স্বাধীনতা অনিবার্য রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, আজাদ হয়ে যাবে। উভয় মতামতের কারণ আমরা উল্লেখ করেছি। যদি আপন দাস সম্পর্কে বলে যে, এ আমার কন্যা তাহলে কোনো কোনো মতে, এটিও ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে অন্য মতে, আজাদ না হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। কেননা, ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তি উল্লেখকৃত ব্যক্তির জাতিভুক্ত নয়, সুতরাং হুকুমের সম্পর্ক হবে উল্লেখকৃত ব্যক্তির সাথে, আর তা অবিদ্যমান। সুতরাং বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য হবে না। বিবাহ অধ্যায়ের [মোহর প্রসঙ্গে] বিষয়টি আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ هٰذَا اَبِيْ وَاُمِّيْ الخ : মাসআলা : মনিব যদি এমন দাস অথবা দাসীকে যার থেকে সে জন্ম নিতে পারে না, তার সম্পর্কে বলে যে, এটা আমার পিতা, অথবা আমার মা। অথচ তারা মনিব থেকে বয়সে ছোট অথবা তার সমবয়সের অথবা এক দুই বছরের বড়, তাহলে উক্ত মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত বক্তব্য দ্বারা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে, আর সাহেবাইনের মতে আজাদ হবে না। উভয় পক্ষের দলিল পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ صَغِيْرٍ هٰذَا جَدِّيْ الخ : আর মনিব যদি তার ছোট গোলামকে সম্বোধন করে বলে যে, এটা আমার দাদা, তাহলে এ অবস্থায়ও কোনো কোনো মাশায়েখের নিকট এতেও উক্ত মতবিরোধ রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে আজাদ হবে না। এর প্রমাণ হলো, মনিবের উক্ত বক্তব্য দ্বারা পিতার মাধ্যম ব্যতীত কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় না। অর্থাৎ, যখন পিতার মাধ্যম থাকবে তখন দাদার হক সাব্যস্ত হবে, অথচ মনিবের কথার মাঝে পিতার মাধ্যমের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ বাক্যকে রূপকভাবেও আজাদ করার অর্থে নেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু 'ইনি আমার পিতা বা পুত্র' এটার বিষয় ভিন্ন। কেননা, এ দুটির ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যম ছাড়াই আজাদ হওয়া সম্ভব।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ هٰذَا أَخِيْ الخ : আর মালিক যদি গোলামকে বলে যে, এটা আমার ভাই, তাহলে জাহিরুর রিওয়ায়াত অনুযায়ী আজাদ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এর দ্বারা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। দুটো বর্ণনার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهٖ هٰذَا اِبْنَتِيْ الخ : আর যদি দাসকে বলে যে, 'এটা আমার মেয়ে', তাহলে কোনো কোনো মত অনুযায়ী এ অবস্থায়ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইনের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। আর কারো কারো মতে, সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত অবস্থায় আজাদ হবে না। **আজাদ না হওয়ার দলিল** : মহর অধ্যায়ে যা আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এক বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে যদি মুখে অন্য বস্তুর নাম নিয়ে কথা বলে তাহলে মুখে যেই নাম নেওয়া হবে তার সাথেই হুকুম প্রয়োগ হবে। আর উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার দিক থেকে পুরুষ ও মহিলার জাত ভিন্ন, এজন্য আলোচ্য অবস্থায় مُشَارٌ اِلَيْهِ [যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে] হলো মহিলা, আর মুখে যার নাম নিয়েছে সে হলো পুরুষ। সুতরাং মুখের কথার সাথেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর তা যেহেতু বাস্তবে অবিদ্যমান, তাই তার কথা বাতিল হয়ে যাবে।

وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَمَّرِيْ وَنَوٰى بِهِ الْعِتْقَ لَمْ تُعْتَقْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تُعْتَقُ إِذَا نَوٰى وَكَذَا عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ سَائِرُ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ عَلٰى مَا قَالَ مَشَائِخُهُمْ لَهُ أَنَّهُ نَوٰى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مُوَافَقَةً إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكُ الْعَيْنِ أَمَّا مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا مِلْكُ النِّكَاحِ فِيْ حُكْمِ مِلْكِ الْعَيْنِ حَتّٰى كَانَ التَّأْبِيْدُ مِنْ شَرْطِهِ وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ وَعَمَلُ اللَّفْظَيْنِ فِيْ إِسْقَاطِ مَا هُوَ حَقُّهُ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلِهٰذَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ فِيْهِ بِالشَّرْطِ أَمَّا الْأَحْكَامُ تَثْبُتُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا وَلِهٰذَا يَصْلُحُ لَفْظَةُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيْرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكْسُهُ.

অনুবাদ : দাসীকে যদি [তালাক জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে] বলে, তুমি তালাক কিংবা তুমি বায়েন কিংবা তুমি নিজেকে ওড়না দ্বারা আবৃত কর, আর এসব কথা দ্বারা আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিয়ত করলে আজাদ হবে। তালাকের যাবতীয় স্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ সম্পর্কে এই মতপার্থক্য রয়েছে বলে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, এমন অর্থই সে উদ্দেশ্য করেছে, যাকে উল্লিখিত শব্দটি সম্ভাবনার পর্যায়ে ধারণ করে। কেননা, বিবাহ সূত্রের মালিকানা এবং দাসত্ব সূত্রের মালিকানার মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ, উভয় সূত্রই ব্যক্তি-সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। দাস সূত্রের মালিকানার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। বিবাহ সূত্রের মালিকানাও সত্তাগত মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। এ কারণেই বিবাহের বৈধতার জন্য শর্ত হলো, স্থায়ী হওয়া এবং সাময়িকতার শর্ত বিবাহের বৈধতাকে নাকচ করে। আর মুক্তিদান ও তালাক প্রদান উভয় প্রকার শব্দগুলোর মূল ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া হলো [স্বামীর বা মনিবের], হক তথা মালিকানা রহিতকরণ। এ কারণেই [তালাকের ন্যায়] মুক্তিদানকে শর্তযুক্ত করা বৈধ। পক্ষান্তরে মুক্তিলাভের ফলশ্রুতিতে যে সকল হুকুম সাব্যস্ত হয় সেগুলো পূর্ব থেকে বিদ্যমান কারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, আর তা হলো [মানুষ হওয়ার সূত্রে] উক্ত দাসের মুকাল্লাফ [হুকুম প্রয়োগের যোগ্য] হওয়া। এ কারণেই মুক্তি ও স্বাধীনতার শব্দগুলো তালাকের ইঙ্গিতে ব্যবহারযোগ্য। বিপরীত ক্ষেত্রেও ব্যবহারযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার দাসীকে বলে যে, তুমি তালাক কিংবা তুমি বায়েন কিংবা তুমি নিজেকে ওড়না দ্বারা আবৃত কর, ইত্যাকার তালাক জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে আজাদ করার নিয়ত করে, তাহলে আজাদ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এসব কথা বলে যদি আজাদ করার নিয়ত করে তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। এমন মতবিরোধ রয়েছে তালাকের অন্যান্য শব্দের মাঝে– তালাকের স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করুক বা ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করুক। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতবিরোধ রয়েছে। একটি অভিমত হলো হানাফীদের মত, অপরটি হলো শাফেয়ীদের মত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : মনিব তার বক্তব্য দ্বারা এমন অর্থের নিয়ত করেছেন, শব্দের মাঝে যার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, বিবাহ সূত্রের মালিকানা এবং দাস সূত্রের মালিকানার মাঝে সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা, উভয় সূত্রই ব্যক্তি-সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। দাস সূত্রের মালিকানার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। বিবাহ সূত্রের মালিকানাও সত্তাগত মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। এ কারণেই বিবাহের বৈধতার জন্য শর্ত হলো, স্থায়ী হওয়া এবং সাময়িকতার শর্ত বিবাহের বৈধতাকে নাকচ করে। তাহলে বুঝা গেল, বিবাহ সূত্রের মালিকানা সত্তাগত মালিকানার পর্যায়ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَعَمَلُ اللَّفْظَيْنِ فِىْ إِسْقَاطِ الخ -এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, আজাদ করার অর্থ হলো গোলামের মাঝে একটি শক্তি অর্জিত হওয়া। তাইতো আজাদ করার দ্বারা গোলামের মাঝে এমন কিছু বিধান সাব্যস্ত হয়, আজাদ হওয়ার পূর্বে যা তার মাঝে ছিল না। যেমন– আজাদ হওয়ার পর গোলাম ক্রয়-বিক্রয়ের মালিক হয়ে যায়, কোনো ঝগড়া-বিতণ্ডার নিরসনের জন্য সাক্ষী হতে পারে, নিজে বিচারক হতে পারে ইত্যাদি। অর্থাৎ, শরিয়ত কর্তৃক সে একটি শক্তির অধিকারী হয়ে যায়। আর তালাক বলে প্রতিবন্ধকতা দূর করাকে। অর্থাৎ, তালাকের দ্বারা কেবল স্বামীর বৈবাহিক বন্ধন রহিত হয়ে যায়। বিধায় তালাক ও আজাদীর মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং তালাকের শব্দ দ্বারা কিভাবে আজাদ হওয়াকে বুঝাবে?

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, طَلَاقٌ ও إِعْتَاقٌ [আজাদ করা] শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটার মাঝে তার হক রহিতকরণের অর্থ বিদ্যমান। যেভাবে তালাক দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এমনিভাবে আজাদ করা দ্বারাও দাসত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এমনিভাবে দুটোকে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। অর্থাৎ, তালাককে যেমন শর্তযুক্ত করা যায় তেমনিভাবে আজাদ করাকেও শর্তযুক্ত করা যায়। মোটকথা, তালাক এবং আজাদকরণের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তালাক শব্দকে রূপক হিসেবে আজাদ করার অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত, বিধায় আজাদ করার শব্দ দ্বারা রূপকভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক যেভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় সেভাবে তালাকের শব্দাবলি দ্বারাও আজাদ করার অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। অর্থাৎ, যেভাবে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে اَنْتِ حُرَّةٌ 'তুমি আজাদ' বললে উদ্দেশ্য ও নিয়ত হিসেবে তালাক পতিত হয়ে যায় তেমনিভাবে নিজ দাসীকে اَنْتِ طَالِقٌ 'তুমি তালাকপ্রাপ্তা' বলে আজাদ করার অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। বাকি তালাক ও আজাদের মাঝে একটি ব্যবধান রয়েছে যে, তালাকের দ্বারা যে বিধান আরোপিত হয় আজাদ করার দ্বারা তা আরোপিত হয় না। এর উত্তর এই যে, বিধান আরোপিত হওয়াটা পূর্বকার কারণ হিসেবে নয়, আর সেই কারণ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আকেল-বালেগ ও আজাদ হওয়া, কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে সেই বিধান আরোপিত হয় না। সুতরাং এতটুকু ব্যবধানের কারণে এক ধরনের শব্দ বলে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নিতে কোনো অসুবিধা নেই।

وَلَنَا اَنَّهُ نَوٰى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ لِاَنَّ الْاِعْتَاقَ لُغَةً اِثْبَاتُ الْقُوَّةِ وَالطَّلَاقَ رَفْعُ الْقَيْدِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْعَبْدَ اُلْحِقَ بِالْجَمَادَاتِ وَبِالْاِعْتَاقِ يُحْيٰى فَيَقْدِرُ وَلَا كَذٰلِكَ الْمَنْكُوْحَةُ فَاِنَّهَا قَادِرَةٌ اِلَّا اَنَّ قَيْدَ النِّكَاحِ مَانِعٌ وَبِالطَّلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ فَيَظْهَرُ الْقُوَّةُ وَلَا خَفَاءَ اَنَّ الْاَوَّلَ اَقْوٰى وَلِاَنَّ مِلْكَ الْيَمِيْنِ فَوْقَ مِلْكِ النِّكَاحِ فَكَانَ اِسْقَاطُهُ اَقْوٰى وَاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَجَازًا عَمَّا هُوَ دُوْنَ حَقِيْقَتِهٖ لَا عَمَّا هُوَ فَوْقَهُ فَلِهٰذَا اِمْتَنَعَ فِى الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ وَانْسَاغَ فِىْ عَكْسِهٖ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল এই যে, যে অর্থ সে উদ্দেশ্য করেছে, আলোচ্য শব্দগুলো সে অর্থের সম্ভাবনা ধারণ করে না। কেননা, মুক্তিদানের আভিধানিক অর্থ হলো শক্তি প্রতিষ্ঠা করা আর তালাক অর্থ বন্ধন মুক্ত করা। কেননা, দাস তো জড়বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল, মুক্তিদানের মাধ্যমে যেন তাকে জীবন দান করা হয়েছে। ফলে সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বিবাহিতা স্ত্রী এমন নয়। কেননা, সেও ক্ষমতার অধিকারিণী, তবে বিবাহ-বন্ধন প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তালাকের মাধ্যমে প্রতিবন্ধক দূর হওয়ার পর উক্ত ক্ষমতা প্রকাশ লাভ করে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথমটি [মুক্তিদান] দ্বিতীয়টি [তালাক প্রদান] থেকে অধিকতর শক্তিশালী। তাছাড়া দাসত্ব সূত্রের মালিকানা বিবাহ সূত্রের মালিকানা থেকে উচ্চতর। সুতরাং দাসত্ব সূত্রের মালিকানা রহিতকরণ হলো অধিকতর শক্তিশালী। আর যে কোনো শব্দ তার চেয়ে নিম্নতর অর্থের জন্য রূপক হতে পারে; তার চেয়ে উচ্চতরের জন্য নয়। এ কারণেই বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রেই রূপক অর্থ নেওয়া বৈধ নয়, আর বিপরীত ক্ষেত্রে তা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّهُ نَوٰى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ الخ - **আমাদের দলিল :** মনিব তার দাসকে اَنْتِ طَالِقٌ বা اَنْتِ بَائِنٌ ইত্যাকার তালাকের শব্দ ব্যবহার করে এমন অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে, যা তার শব্দ বুঝায় না। অর্থাৎ, তালাকের শব্দ আর আজাদ করার শব্দের মাঝে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। কেননা, অভিধানে তালাকের অর্থ হলো বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, আর আজাদ করার অর্থ হচ্ছে শক্তি দেওয়া। কেননা, দাস জড়পদার্থের ন্যায় হয়ে যায়, মানবীয় শক্তি তার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর আজাদ করার দ্বারা সে ঐ শক্তি পুনরায় অর্জন করে। যেন সে পুনরায় জীবন ফিরে পেল। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর অবস্থা এরকম নয়। সে স্ত্রী থাকা অবস্থায়ই নিজ মানবীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম। তবে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তা একটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এরপর যখন তালাক দিয়ে দেওয়া হয় তখন সে অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে নিজস্ব ক্ষমতা বলে পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এ আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, শক্তি অর্জনের দিক থেকে আজাদ করাটা উর্ধ্বে, আর তালাক হলো নিম্ন পর্যায়ের। আর নিয়ম আছে যে, নিম্ন পর্যায়ের বিষয়কে উর্ধ্ব পর্যায়ের বিষয়ের জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের বিষয়কে নিম্ন পর্যায়ের জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করা যায়, বিধায় আজাদ বলে তালাক উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে, কিন্তু তালাক বলে আজাদ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না।

তাছাড়া দাসত্বের অধীনস্থতা বিবাহের অধীনস্থতা থেকে উর্ধ্বে। কেননা, দাসত্বের অধীনস্থতা দ্বারা ঐ অঙ্গেরও মালিক হয়ে যায় যা বিবাহের দ্বারা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিবাহ দ্বারা ঐ সব অঙ্গের মালিক হয় না, যা দাসত্বের দ্বারা হয়ে থাকে। সুতরাং দাসত্বের অধীনস্থতা যেমন উচ্চে, ঠিক তা বিদূরিত করাও উচ্চেই হবে। আর শব্দ তার নিজস্ব মূল অর্থের উচ্চের বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না, বিধায় তালাক শব্দ দ্বারা আজাদ করা যাবে না।

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ لَمْ يُعْتَقْ لِاَنَّ الْمِثْلَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُشَارَكَةِ فِيْ بَعْضِ الْمَعَانِيْ عُرْفًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَلَوْ قَالَ مَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ عُتِقَ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ اِثْبَاتٌ عَلٰى وَجْهِ التَّاكِيْدِ كَمَا فِيْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ قَالَ رَاْسُكَ رَاْسُ حُرٍّ لَا يُعْتَقُ لِاَنَّهُ تَشْبِيْهٌ بِحَذْفِ حَرْفِهِ وَلَوْ قَالَ رَاْسُكَ رَاْسٌ حُرٌّ عُتِقَ لِاَنَّهُ اِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ فِيْهِ اِذِ الرَّاْسُ يُعَتَبَرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ .

অনুবাদ : যদি সে আপন দাসকে বলে, 'তুমি স্বাধীনের মতো', তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, 'মতো' শব্দটি প্রচলিত অর্থে আংশিক গুণের ক্ষেত্রে শরিকানা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্বাধীনতার বিষয়টি [উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে] সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল। আর যদি বলে, 'তুমি স্বাধীন ছাড়া অন্য কিছু নও', তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এ ধরনের না-বাচক উক্তির বিপরীতে ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার বক্তব্যকে জোরদারভাবে সাব্যস্ত করে যেমন কালিমায়ে শাহাদাতের ক্ষেত্রে। আর যদি বলে 'তোমার মাথা তো স্বাধীন ব্যক্তির মাথার মতো', তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, এটা হলো অব্যয় উহ্য করে প্রদত্ত উপমা। আর যদি বলে যে, 'তোমার মাথা স্বাধীন মাথা', তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, যেহেতু মাথা দ্বারা সমগ্র দেহ বুঝানো হয়, সেহেতু এ কথার অর্থ হলো, গোলামের মাঝে স্বাধীনতা গুণটি সাব্যস্তকরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার দাসকে বলে যে, "তুমি আজাদের মতো", তাহলে এ কথার দ্বারা দাস আজাদ হবে না। কেননা, مثل [মতো] শব্দটি বিভিন্ন গুণের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। মনিব কোন দিক থেকে 'মতো' বলেছে তা সুস্পষ্ট নয়, বিধায় সন্দেহের সাথে আজাদ হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে না। সুতরাং উক্ত কথার দ্বারা দাস আজাদ হবে না।

ইনায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, লেখকের উক্ত কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ কথার দ্বারা কোনো অবস্থায়ই আজাদ হবে না– চাই আজাদ করার নিয়ত করুক বা না করুক।

আর মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নিয়ত না করলে উক্ত কথার দ্বারা দাস আজাদ হবে না ঠিক, কিন্তু নিয়ত করলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, আজাদ না হওয়ার হুকুম লাগানো হয়েছিল সন্দেহ থাকার কারণে, কিন্তু যখন সে নিয়ত করে ফেলবে তখন আর সন্দেহ থাকবে না, বিধায় দাস আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ مَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ عُتِقَ الخ : আর মনিব যদি তার দাসকে বলে যে– مَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ - 'তুমি অন্য কিছু নও, কেবল আজাদই' তাহলে দাস আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, একই বাক্যে نَفِيْ তথা নেতিবাচক কথার পর ইতিবাচক কথার দ্বারা দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত হওয়াকে বুঝায়। যেমন– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - অর্থাৎ, "কোনো মাবুদ নেই আল্লাহ ব্যতীত।" এর মর্ম হলো, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মাবুদ। ঠিক এমনিভাবে مَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ -এর অর্থ হবে, তুমি অবশ্যই আজাদ।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ رَاْسُكَ رَاْسُ حُرٍّ الخ : তবে মনিব যদি বলে– رَاْسُكَ رَاْسُ حُرٍّ - 'তোমার মাথা আজাদের মাথা', তাহলে দাস আজাদ হবে না। কেননা, এখানে সাদৃশ্যমূলক শব্দ উহ্য আছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদৃশ্যমূলক অর্থ প্রদানকারী শব্দ দ্বারা আজাদ করলে কার্যত গোলাম আজাদ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ رَاْسُكَ رَاْسٌ حُرٌّ الخ : আর মনিব যদি বলেন যে– رَاْسُكَ رَاْسٌ حُرٌّ - 'তোমার মাথা আজাদ মাথা', অর্থাৎ গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করে যদি বলেন, তাহলে দাস আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এ বাক্যে 'মাথা'-এর মাঝে আজাদ হওয়ার গুণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর মাথা বলে পুরো শরীরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। আর পূর্বে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত অঙ্গ দ্বারা পুরো শরীরকে বুঝানো যায়, এমন অঙ্গের উপর কোনো হুকুম আরোপ করার অর্থ পুরো শরীরের উপরই আরোপ করা।

فَصْلٌ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ وَهٰذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ وَاللَّفْظُ بِعُمُوْمِهِ يَنْتَظِمُ كُلَّ قَرَابَةٍ مُؤَبَّدَةٍ بِالْمُحَرَّمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرَهُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِهِ لَهُ أَنَّ ثُبُوْتَ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيْهِ وَالْأُخُوَّةُ وَمَا يُضَاهِيهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ وَالْإِسْتِدْلَالُ وَلِهٰذَا اِمْتَنَعَ التَّكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِيْ غَيْرِ الْوِلَادِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ فِيْهِ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيْبَةً قَرَابَةً مُؤَثِّرَةً فِي الْمُحَرَّمِيَّةِ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهٰذَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْأَصْلِ وَالْوِلَادُ مُلْغًى لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِيْ يَفْتَرِضُ وَصْلُهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا حَتّٰى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَحَرُمَ النِّكَاحُ -

অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হলে উক্ত মাহরাম তার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। এ বাক্য [হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতো] নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হলে সে আজাদ হয়ে যাবে। –[নাসাঈ] হাদীসে বর্ণিত মাহরাম শব্দটির অর্থের ব্যাপকতার কারণে জন্মদান সূত্রের এবং অন্যান্য সূত্রের সকল স্থায়ী মাহরাম আত্মীয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) অন্যান্য সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল এই যে, মালিকের সম্মতি ছাড়া মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের পরিপন্থি কিংবা কিয়াস তা দাবি করে না। আর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক ও অন্যান্য সম্পর্ক জন্মদান সূত্রের সম্পর্কের চেয়ে নিম্নস্তরের। সুতরাং অন্যগুলোকে এর সাথে সংযুক্ত করা এবং দলিলরূপে পেশ করা অগ্রাহ্য হবে। এজন্যই অন্যান্য সূত্রের মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে মুকাতাব গোলামের উপর অনিবার্য কিতাবাতের হুকুম আরোপিত হয় না। পক্ষান্তরে জন্মদান সূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। আমাদের দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এজন্য যে, সে এমন আত্মীয়ের মালিক হয়েছে, যে আত্মীয়তা মাহরাম হওয়ার কারণ। সুতরাং মালিকের পক্ষ থেকে ঐ আত্মীয় আজাদ হয়ে যাবে মূল মাসআলাটির ক্ষেত্রে এটাই হলো কার্যকরী; জন্মদান সম্পর্কের বিষয়টি গৌণ। কেননা, যে আত্মীয়তা মাহরাম সম্পর্কের কারণ, সেটাই রক্ষা করা এবং ছিন্ন করা হারাম। এ কারণেই ভরণপোষণ আবশ্যক হয়ে থাকে এবং বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : ইতঃপূর্বে আলোচনা ছিল স্বেচ্ছায় দাস আজাদ করা সম্পর্কে। গ্রন্থকার এখন এ অনুচ্ছেদে অনিচ্ছায় আজাদ করা সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ الخ : মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি নিজ নিকটতম মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে নিজ পক্ষ থেকে ঐ নিকটতম মাহরাম আত্মীয় আজাদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এ মাসআলাটি হাদীস শরীফেও বর্ণিত রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন- مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হলে সে আজাদ হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.) উল্লিখিত হাদীসটি যেই শব্দে ব্যক্ত করেছেন তাও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে ইমাম নাসায়ী (র.) বর্ণনা করেছেন। আর হিদায়া গ্রন্থকার (র.) فَهُوَ حُرٌّ শব্দে যা বর্ণনা করেছেন তা সুনানের চারও কিতাবে হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসে উল্লিখিত رَحِمٍ ও مَحْرَمٍ শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। رَحِمٍ শব্দটি মৌলিকভাবে মায়ের গর্ভের ভিতর বাচ্চা থাকার পাত্রকে বলে। এক কথায় গর্ভাশয়কে রেহেম বলে। অতঃপর আরো ব্যাপকতা হিসেবে জন্মসূত্রের সম্পর্ককেই রেহেম বলা হয়, এর থেকে আত্মীয়কে ذُو الرَّحِمِ বলা হয়।

আর مَحْرَمٌ [মাহরাম] বলা হয়, একজন পুরুষ আর অপর একজন মহিলা, আর তাদের পরস্পর বিবাহ জায়েজ হয় না। -[ইনায়া] হাদীসের শব্দ ব্যাপক, যা এমন আত্মীয়তাকে বুঝায়, যার সাথে কখনোই বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েজ নেই। চাই এটা জন্মসূত্রের আত্মীয়তার কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক। জন্মসূত্রে যেমন- ছেলেমেয়ে, পিতামাতা, দাদা-দাদি প্রমুখ। আর অন্য সূত্রের যেমন- ভাই-বোন, অথবা তাদের সন্তানগণ। এদের মালিক হলে তারা আজাদ হয়ে যাবে। জন্মসূত্র ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়দের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, জন্মসূত্রে অন্যদের মালিক হলে তারা আজাদ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মালিকের ইচ্ছা ব্যতীত দাস আজাদ হয়ে যাওয়া যুক্তি পরিপন্থি। আর যে বস্তু যুক্তি পরিপন্থি হয় তার উপর তুলনা করে অন্য কোনো হুকুম সাব্যস্ত করা যায় না। তাই সন্তান সূত্রে লোক আজাদ হয়ে যাওয়ার উপর অন্য সূত্রের আত্মীয়কে তুলনা করে আজাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না, বিধায় ভাই-চাচা-মামা ইত্যাকার আত্মীয়গণের মালিক হলে তারা আজাদ হবে না। তাছাড়া সন্তান সূত্রের আত্মীয়দের তুলনায় অন্যান্য আত্মীয়দের স্তর নিম্নে; এ দু'শ্রেণীর আত্মীয়তা সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং দালালাতুন্ নাস হিসেবেও ভাই-চাচা-মামাদের আজাদ হওয়ার বিষয়কে সাব্যস্ত করা যাবে না। এ ব্যবধানের কারণে মুকাতাব যদি নিজ ভাই অথবা তার সমতুল্য কোনো আত্মীয়কে ক্রয় করে অথবা অন্যসূত্রে মালিক হয়, তাহলে তারা তার মুকাতাব হয় না, অথচ মুকাতাব গোলাম যদি নিজ সন্তান বা পিতার মালিক হয়, তাহলে ঐ সন্তান বা পিতাও মুকাতাব হয়ে যায়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সন্তানসূত্রে আত্মীয় আর অন্য আত্মীয় সমান নয়।

قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيبَةً الخ - **আমাদের দলিল :** আমাদের সর্বপ্রথম দলিল হলো উল্লিখিত হাদীস। অর্থাৎ, مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ -এ হাদীসটি যেহেতু ব্যাপক, তাই এ হাদীসের আলোকে সন্তানসূত্রে মাহরাম আত্মীয়ও আজাদ হবে এবং অন্যসূত্রে মাহরাম আত্মীয়ও আজাদ হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, কোনো ব্যক্তি যখন নিজের নিকটতম মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তখন ঐ আত্মীয় আজাদ হয়ে যায়। আর এ আজাদ হওয়ার মূল কারণ হলো মাহরাম আত্মীয় হওয়া। অর্থাৎ, এমন আত্মীয় হওয়া যার কারণে স্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। সন্তান সূত্রে হওয়াটা আজাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। সুতরাং যেই সূত্র ধরে আজাদ হয় সেইসূত্র যেখানেই পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রেই আজাদ হওয়ার হুকুম লাগানো হবে। আর এ সূত্র যেমন সন্তানসূত্রে মাহরাম আত্মীয়ের মাঝে পাওয়া যায়, এমনিভাবে অন্যসূত্রে মাহরাম আত্মীয়ের মাঝেও পাওয়া যায়, বিধায় দু ধরনের আত্মীয়ই আজাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে এ মাহরাম আত্মীয় হওয়াটাই সম্পর্ক বজায় রাখা ফরজ হওয়া এবং ছিন্ন করা হারাম হওয়ার কারণ। তাইতো নিকটতম মাহরামের নাফকা দেওয়া সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর আবশ্যক।

وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِعُمُوْمِ الْعِلَّةِ وَالْمُكَاتَبُ إِذَا اشْتَرٰى أَخَاهُ وَمَنْ يَجْرِيْ مَجْرَاهُ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَامٌّ يَقْدِرُهُ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْإِفْتِرَاضُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ الْوِلَادِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيْهِ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابَةِ فَامْتَنَعَ الْبَيْعُ فَيُعْتَقُ تَحْقِيْقًا لِمَقْصُوْدِ الْعَقْدِ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَى الْأَخِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ إِبْنَةَ عَمِّهِ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمِيَّةَ مَا ثَبَتَ بِالْقَرَابَةِ وَالصَّبِيُّ جُعِلَ أَهْلًا لِهٰذَا الْعِتْقِ وَكَذَا الْمَجْنُوْنُ حَتّٰى عُتِقَ الْقَرِيْبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ فَشَابَهَ النَّفَقَةَ ـ

অনুবাদ : মালিক [এবং ক্রীতদাস] দারুল ইসলামে বিদ্যমান অবস্থায় মুসলমান হোক কিংবা কাফের হোক, তবে বিধানে কোনো পার্থক্য হবে না। কেননা, [বিবাহ হারামকারী রক্ত সম্পর্কের] কারণটি উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর মুকাতাব গোলাম যদি তারপরই বা সমশ্রেণীর অন্য কোনো আত্মীয়কে [গোলাম চাচা, মামা ইত্যাদিকে] খরিদ করে, তাহলে তার উপর অনিবার্য কিতাবতের হুকুম আরোপিত হয় না। কেননা, তার পূর্ণাঙ্গ মালিকানা নেই, যা তাকে মুক্তিদানের অধিকারী করতে পারে। আর স্বাধীনতা অনিবার্য হয় যখন পূর্ণ ক্ষমতা থাকে। জন্মদান সূত্রের সম্পর্কের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ হচ্ছে কিতাবাত-চুক্তির উদ্দেশ্যভুক্ত। সুতরাং [খরিদকৃত পিতামাতা বা সন্তানকে] বিক্রি নিষিদ্ধ হবে এবং কিতাবত-চুক্তির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে আজাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাইয়ের [ও অন্যান্য মাহরাম সম্পর্কের] ক্ষেত্রে কিতাবতের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং এটা সাহেবাইনের অভিমত। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রের পার্থক্যের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারি। পক্ষান্তরে যদি সে আপন চাচাতো বোনের মালিকানা লাভ করে, যে তার দুধবোনও বটে তাহলে এই বোন আজাদ হবে না। কেননা, এখানে মাহরাম সম্পর্ক আত্মীয়তার কারণে সাব্যস্ত হয়নি [বরং দুধ সম্পর্ক দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে]। বালক ও পাগল উভয়কে এ ক্ষেত্রে মুক্তিদানের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং [তাদের কোনো পদক্ষেপ ছাড়া মিরাস, দান বা অন্য কোনো সূত্রে] মালিকানা লাভের সময় ঐ নিকটাত্মীয় তাদের পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এ মুক্তির সাথে বান্দার হক সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং এটা ভরণপোষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দারুল ইসলামে কোনো ব্যক্তি যদি নিকটতম মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে অধীনস্থ ঐ ব্যক্তি আজাদ হয়ে যাবে– মালিক মুসলমান হোক বা কাফের হোক এমনিভাবে দাস মুসলমান হোক বা কাফের। উক্ত মাসআলায় দারুল ইসলামের সাথে হুকুমকে সম্পর্কযুক্ত করার কারণ হলো, মুসলমান যদি তার হরবী গোলামকে দারুল হরবে আজাদ করে তাহলে সেই গোলাম তার মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ হবে না। এমনিভাবে হরবী পুরুষ যদি দারুল হরবে নিজ নিকটতম মাহরাম ব্যক্তির মালিক হয়, তাহলেও ঐ দাস তার পক্ষ থেকে আজাদ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ إِذَا اشْتَرَاهُ أَخَاهُ وَمَنْ يَجْرِىْ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে উত্তরের সারকথা হলো, সর্বপ্রথম আমরা এ কথাই মানি না যে, মুকাতাব তার ভাই, মামা প্রমুখের মালিক হলে তারা মুকাতাব হবে না; বরং তারাও মুকাতাব হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বিবরণটি এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। আর মুকাতাবের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্ত কথা যদি মেনেও নেওয়া হয় তাহলেও বলা হবে যে, মুকাতাব না হওয়ার কারণ হলো, মুকাতাবের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত হয় না, যার দ্বারা সে আজাদ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি আজাদ করার ক্ষমতা রাখে না তার পক্ষ থেকে কেউ আজাদ হতে পারে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوِلَادِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيْهِ الخ :

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সন্তানসূত্রের আত্মীয়ও তো গোলাম থাকা অবস্থায় কাউকে আজাদ করতে পারে না, তাই সে আজাদ না হওয়ার কথা, অথচ সে আজাদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) بِخِلَافِ الْوِلَادِ -এর দ্বারা সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন।

উত্তর : এর উত্তর হলো এই যে, সন্তানসূত্রে আত্মীয়কে আজাদ করাটা আকদে কিতাবাত অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার সন্ধির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, নিজেকে আজাদ করা যেমন সন্ধির উদ্দেশ্য থাকে তেমনিভাবে সন্তানসূত্রে আত্মীয়কে আজাদ করাও সন্ধির উদ্দেশ্য থাকে। কেননা, কোনো ব্যক্তি নিজে অন্যের দাস থাকা যেমন লজ্জাকর মনে করেন তেমনিভাবে সন্তান সূত্রে আত্মীয় অন্যের দাস থাকাকেও লজ্জাকর মনে করেন, বিধায় ব্যক্তি সন্ধিচুক্তি করার দ্বারা তার সন্তানসূত্রের আত্মীয়ও সেই সন্ধির আওতাভুক্ত হয়ে যাবে, এমনিভাবে মুকাতাব তার সন্তানসূত্রে আত্মীয়কে ক্রয় করার দ্বারা ঐ আত্মীয়গণও চুক্তির আওতাভুক্ত হয়ে যাবেন।

তবে সন্তানসূত্রে আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয় এ বিধানের আলোকে মুকাতাব হিসেবে পরিগণিত হবে না। কেননা, ছেলে বা পিতা দাস হওয়াকে মানুষ যেমন লজ্জাকর মনে করেন, ভাই দাস হওয়াকে ততটুকু লজ্জাকর মনে করেন না। -[ইনায়া-আইনী]

তাছাড়া আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা বলেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ব্যক্তি মুকাতাব হওয়ার দ্বারা তার ভাইও মুকাতাব হয়ে যাবে এবং সাহেবাইনের অভিমতও এটাই। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) যার উপর ভিত্তি করে মাসআলা বলেছিলেন, তা আর ঠিক রইল না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَمِّهِ الخ : ইবারত দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, নিকটতম মাহরামের মালিক হওয়াই যদি আজাদ হওয়ার কারণ হয় তাহলে চাচাতো বোন যে তার দুগ্ধপোষ্য বোনও বটে, সে যদি তার চাচাতো ভাইয়ের অধীনে আসে, তাহলে আজাদ হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ চাচাতো ভাই তাকে ক্রয় করলে সে আজাদ হয় না।

উত্তর : এর উত্তর হলো, এমন মাহরাম হওয়াটা আজাদ হওয়ার কারণ হবে, যার উপর আত্মীয় হওয়াটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আত্মীয়তা প্রভাব সৃষ্টি করেনি; বরং দুগ্ধপোষ্য হওয়াটা প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং আজাদ হবে না।

قَوْلُهُ وَالصَّبِيُّ جُعِلَ أَهْلًا لِهٰذَا الْعِتْقِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি শিশু বাচ্চা অথবা পাগল ব্যক্তি নিজ নিকটতম কোনো মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে সেই আত্মীয়ও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বান্দার অধিকার এবং আজাদ হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে। এ কারণে সে আজাদ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা নাফকা সদৃশ্য হয়ে গেল। অর্থাৎ, গরিব অসহায় মাহরাম আত্মীয়ের নাফকা বাচ্চা বা পাগলের সম্পদ থেকে দেওয়া আবশ্যক হয়, এমনিভাবে এখানেও ঐ আত্মীয় আজাদ হয়ে যাবে।

وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ لِلشَّيْطَانِ اَوْ لِلصَّنَمِ عُتِقَ لِوُجُوْدِ رُكْنِ الْاِعْتَاقِ مِنْ اَهْلِهٖ فِىْ مَحَلِّهٖ وَ وَصْفُ الْقُرْبَةِ فِى اللَّفْظِ الْاَوَّلِ زِيَادَةٌ فَلَا يَخْتَلُّ الْعِتْقُ بِعَدَمِهٖ فِى اللَّفْظَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ وَعِتْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ لِصُدُوْرِ الرُّكْنِ مِنَ الْاَهْلِ فِى الْمَحَلِّ كَمَا فِى الطَّلَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَاِنْ اَضَافَ الْعِتْقَ اِلٰى مِلْكٍ اَوْ شَرْطٍ صَحَّ كَمَا فِى الطَّلَاقِ اَمَّا الْاِضَافَةُ اِلَى الْمِلْكِ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِىْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَاَمَّا التَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ فَلِاَنَّهٗ اِسْقَاطٌ فَيَجْرِىْ فِيْهِ التَّعْلِيْقُ بِخِلَافِ التَّمْلِيْكَاتِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِىْ مَوْضِعِهٖ وَاِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِىِّ اِلَيْنَا مُسْلِمًا عُتِقَ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ عَبِيْدِ الطَّائِفِ حِيْنَ خَرَجُوْا اِلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ وَلِاَنَّهٗ اَحْرَزَ نَفْسَهٗ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَا اِسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسْلِمِ اِبْتِدَاءً .

অনুবাদ : কেউ যদি আল্লাহর নামে কিংবা শয়তানের নামে কিংবা দেবতার নামে কোনো গোলাম আজাদ করে তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, মুক্তিদানের মূল বক্তব্যটি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির [সুস্থ-মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির] পক্ষ থেকে এবং যথার্থ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। আর প্রথম বক্তব্যে ছওয়াবের গুণটি হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়। সুতরাং পরবর্তী বক্তব্য দুটিতে উক্ত গুণের অবিদ্যমানতার দ্বারা বিঘ্নিত হবে না। নেশাগ্রস্ত ও বাধ্যকৃত ব্যক্তির মুক্তিদান কার্যকর হবে। কেননা, মুক্তিদানের শব্দ যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ হতে যোগ্য পাত্রে উচ্চারিত হয়েছে; যেমন তালাকের ক্ষেত্রে হয়। যদি মুক্তিদানের বিষয়কে মালিকানার সাথে কিংবা কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে; যেমন তালাকের ক্ষেত্রে হয়। মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে; তালাক-পর্বে এটা আমরা বর্ণনা করেছি। শর্তের সাথে যুক্ত করা এজন্য গ্রহণযোগ্য যে, মুক্তিদান অর্থ মালিকানা রহিতকরণ। সুতরাং এতে শর্তায়ন চলতে পারে, কিন্তু মালিকানা সাব্যস্তকরণের বিষয়বস্তু ভিন্ন। যথাস্থানে [উসূলুল ফিকহশাস্ত্রে] তা আলোচিত হয়েছে। কোনো হরবী দাস যদি মুসলমান হয়ে আমাদের নিকট [দারুল ইসলামে] চলে আসে, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, তায়েফের দাসদল যখন মুসলমান হয়ে নবী ﷺ-এর নিকট চলে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ 'তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত।' কেননা, মুসলিম হয়ে নিজেকে সে সুরক্ষিত করেছে। আর কোনো মুসলমানের উপর প্রাথমিক পর্যায়ে দাসত্ব আরোপ করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তার দাসকে আল্লাহর নামে আজাদ করে দেয়, অথবা শয়তান বা দেবতার নামে আজাদ করে দেয় তাহলে সর্বাবস্থায় দাস আজাদ হয়ে যাবে। তার দলিল হলো, আজাদ করার রোকন এতে বিদ্যমান। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আজাদ করতে পারে এবং যাকে আজাদ করা যায়, তার ক্ষেত্রে আজাদ করার কথাটা ব্যবহৃত

হয়েছে। আজাদকারী ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন এবং দাসের মালিক। তবে কথা হলো, আল্লাহর নামে বা অন্যান্য কারো নামে আজাদ করার বিষয় নিয়ে। এ ব্যাপারে বক্তব্য হলো, এগুলো আজাদ করা থেকে অতিরিক্ত একটি কাজ এগুলো বলা ছাড়াও আজাদ হয়ে যায়, বিধায় উল্লেখ করার কারণে আজাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্নতার সৃষ্টি করবে না। তবে পরের দুই অবস্থায় অর্থাৎ, শয়তানের নামে বা দেবতার নামে আজাদ করার কারণে গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ وَعِتْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ الخ : কাউকে যদি নিজ গোলাম আজাদ করতে বাধ্য করা হয়, আর বাধ্য হয়েই সে আজাদ করে দেয়, অথবা কোনো ব্যক্তি যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজ দাসকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ঐ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, আজাদ করার রোকন প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং গোলামের দিকেই সম্পর্কিত হয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা তালাক অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا اَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ الخ : **মাসআলা** : যদি কেউ আজাদ করাকে নিজ মালিকানার দিকে সম্পর্কিত করে যেমন- إِنْ مَلَكْتُكَ فَاَنْتَ حُرٌّ - 'আমি যদি তোমার মালিক হই, তাহলে তুমি আজাদ।' অথবা যদি কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে বলে যে- إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَاَنْتَ حُرٌّ - 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি আজাদ।' তাহলে এর দ্বারাও আজাদ হয়ে যাবে। যেমন তালাককে শর্ত বা মালিক হওয়ার দিকে সম্পর্ক করাটা বিশুদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার সাথে যুক্ত করার বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর মতে, "আমি মালিক হলে তুমি আজাদ" এ কথার দ্বারা আজাদ হবে না। তবে আমাদের নিকট তা বিশুদ্ধ। এ মাসআলাটি তালাক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর আজাদ হওয়াকে কোনো শর্তের সাথে সংযুক্ত করা জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, আজাদ করার অর্থ হলো ইচ্ছা করে নিজের অধিকার রহিত করা, যদিও তার মাঝে শক্তি অর্জিত হওয়ার অর্থ গৌণভাবে বিদ্যমান রয়েছে, আর রহিতকরণকে শর্তযুক্ত করা জায়েজ আছে। সুতরাং আজাদ করাকে সংযুক্ত করাও জায়েজ।

তবে মালিক হওয়াকে কোনো শর্তের সাথে সম্পর্কিত করা জায়েজ নেই; যার আলোচনা উসূলুল ফিকহে রয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا الخ : **মাসআলা** : হরবী কাফেরের গোলাম যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। এর দলিল এই যে, একদা তায়েফ থেকে তেইশজন দাস মুসলমান হয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা আল্লাহর নামে আজাদ। **দ্বিতীয় দলিল** : ঐ গোলাম মুসলমান হয়ে নিজকে দারুল ইসলামে এসে সংরক্ষিত করেছে, আর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর প্রারম্ভিকভাবে কাউকে গোলাম বানানো যায় না। সুতরাং সে আজাদ হয়ে যাবে।

وَإِنْ أَعْتَقَ حَامِلًا عُتِقَ حَمْلُهَا تَبْعًا لَهَا إِذْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عُتِقَ دُونَهَا لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى إِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا وَلَا إِلَيْهِ تَبْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ ثُمَّ إِعْتَاقُ الْحَمْلِ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ نَفْسَهُ شَرْطٌ فِي الْهِبَةِ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدْ ذٰلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجَنِينِ وَشَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِعْتَاقِ فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : যদি গর্ভবতী দাসীকে আজাদ করে, তাহলে তার অনুগামী হিসেবে গর্ভস্থ সন্তানও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত গর্ভ তার সাথে [অঙ্গের ন্যায়] সংযুক্ত। আর যদি শুধু গর্ভস্থ সন্তানকে আজাদ করে তাহলে গর্ভধারিণীকে বাদ দিয়ে শুধু গর্ভস্থ সন্তান আজাদ হবে। কেননা, যেহেতু গর্ভধারণকারিণীর সঙ্গে মুক্তিদানকে সম্পর্কিত করেনি, সেহেতু স্বতন্ত্রভাবে তাকে আজাদ করা সম্ভব নয়, আবার অনুগামীরূপেও আজাদ করা সম্ভব নয়। কেননা, তাতে প্রকৃত অবস্থানকে পাল্টে দেওয়া হয়। গর্ভস্থ সন্তানকে আজাদ করা বৈধ হলেও বিক্রি করা বা দান করা বৈধ নয়। কেননা, দানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অর্পণ করা হলো শর্ত। আর বিক্রির ক্ষেত্রে অর্পণের সক্ষমতা থাকা শর্ত। অথচ গর্ভ সন্তানের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে মুক্তিদানের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই শর্ত নয়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ حَامِلًا عُتِقَ الخ : মাসআলা : মনিব যদি তার গর্ভবতী দাসীকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার অনুগামী হিসেবে গর্ভস্থ সন্তানও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, দাসীর গর্ভও তারই একটি অংশ। সুতরাং দাসী আজাদ করা দ্বারা যেভাবে তার অন্যান্য অঙ্গ আজাদ হয়ে যায়, ঠিক সেভাবে তার গর্ভও আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি শুধু গর্ভস্থ সন্তানকে আজাদ করে তাহলে শুধু গর্ভের সন্তানই আজাদ হবে। তার মা, অর্থাৎ দাসী আজাদ হবে না। কেননা, এ অবস্থায় দাসী আজাদ হওয়ার সুযোগ নেই। তার কারণ হলো, দাসী আজাদ হওয়ার সম্ভাব্য দুটি অবস্থা হতে পারে। প্রথমটি হলো ইচ্ছাপূর্বক বাঁদি আজাদ করা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গর্ভস্থ সন্তানের অনুগামী হিসেবে গর্ভধারিণী আজাদ হওয়া।

কিন্তু এখানে এ দুই অবস্থার কোনোটিই হতে পারে না। প্রথমটি না হওয়ার কারণ হলো, আজাদ হওয়াকে দাসীর দিকে সম্পর্কিত না করা, আর দ্বিতীয়টি না হওয়ার কারণ হচ্ছে এর দ্বারা বিষয়কে উল্টো করা আবশ্যক হয়। এতে করে গর্ভস্থ যা অনুগামী ছিল তা মূল, আর দাসী যা মূল ছিল তা অনুগামী হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এটা নিয়ম পরিপন্থি, তাই দাসী আজাদ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, গর্ভস্থ সন্তানকে আজাদ করা জায়েজ আছে; কিন্তু তাকে বিক্রি করা বা দান করা জায়েজ নেই। কেননা, দানের ক্ষেত্রে দানকৃত বস্তুটি অর্পণ করা আবশ্যক, আর বিক্রির ক্ষেত্রে অর্পণযোগ্য হওয়া আবশ্যক। আর গর্ভস্থ সন্তান এ দুটির কোনোটারই যোগ্য নয়। কেননা, তাকে অর্পণ করাও সম্ভব নয়, আর অর্পণ করার সক্ষমতাও নেই। সুতরাং গর্ভস্থ সন্তান বিক্রি করাও জায়েজ নেই, আবার দান করাও জায়েজ নেই। তবে আজাদ করার জন্য উল্লিখিত দুটি আবশ্যকীয় বিষয় থেকে কোনোটিই জরুরি নয়। সুতরাং তাকে আজাদ করা যাবে, বিধায় আজাদ হওয়া আর দান ও বিক্রির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

وَلَوْ اَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلٰى مَالٍ صَحَّ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ اِذْ لَا وَجْهَ اِلٰى اِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِيْنِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَلَا اِلٰى اِلْزَامِهِ الْاُمَّ لِاَنَّهُ فِىْ حَقِّ الْعِتْقِ نَفْسٌ عَلٰى حِدَةٍ وَاشْتِرَاطُ بَدْلِ الْعِتْقِ عَلٰى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوْزُ عَلٰى مَا مَرَّ فِى الْخُلْعِ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الْحَبْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ اِذَا جَاءَتْ بِهٖ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْهُ لِاَنَّهُ اَدْنٰى مُدَّةِ الْحَمْلِ قَالَ وَ وَلَدُ الْاَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌّ لِاَنَّهُ مَخْلُوْقٌ مِنْ مَائِهٖ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ هٰذَا هُوَ الْاَصْلُ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيْهِ لِاَنَّ وَلَدَ الْاَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكٌ لِسَيِّدِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْاُمِّ بِاِعْتِبَارِ الْحَضَانَةِ اَوِ الْاِسْتِهْلَاكِ مَائِهٖ بِمَائِهَا وَالْمُنَافَاةُ مُتَحَقِّقَةٌ وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِىَ بِهٖ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمَغْرُوْرِ لِاَنَّ الْوَالِدَ مَا رَضِىَ بِهٖ وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ حُرٌّ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لِاَنَّ جَانِبَهَا رَاجِحٌ فَيَتْبَعُهَا فِىْ وَصْفِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِى الْمَمْلُوْكِيَّةِ وَالْمَرْقُوْقِيَّةِ وَالتَّدْبِيْرِ وَاُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ ـ

অনুবাদ : যদি গর্ভস্থ সন্তানকে মালের বিনিময়ে আজাদ করে, তাহলে আজাদ করা বৈধ হবে। কিন্তু উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, গর্ভস্থ সন্তানের উপর যেহেতু অভিভাবকত্ব নেই, সেহেতু তার উপর অর্থের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার উপায় নেই। তদ্রূপ গর্ভধারণকারিণী মাতার উপরও আরোপ করার উপায় নেই। কেননা, মুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত গর্ভস্থ সন্তান হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তা। আর মুক্তিপ্রাপ্ত সত্তা ছাড়া অন্য কারো উপর মুক্তির বিনিময় পরিশোধের শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। খোলা' প্রসঙ্গে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আজাদ করার সময় শর্ত বিদ্যমান থাকার বিষয়টি জানা যাবে, যদি উক্ত সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভধারিণী এ সন্তান প্রসব করে। কেননা, এটাই হলো গর্ভের সর্বনিম্ন মুদ্দত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাসীর গর্ভে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান স্বাধীন হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, সে মনিবের বীর্য দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং সে মনিবের পক্ষে আজাদ হয়ে যাবে। এটাই হলো মূলনীতি। আর এতে বিপরীত কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, দাসীর সন্তান মনিবের পক্ষ থেকে। দাসীর সন্তান তার স্বামীর পক্ষ থেকে হলে সে তার মনিবের দাস বলে গণ্য হবে। কেননা, প্রতিপালনের অধিকার [মাতার; পিতার নয় এই দিক] বিবেচনা করলে মাতার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করে। কিংবা এ কারণে যে, স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের [ডিম্বের] মধ্যে বিলোপ হয়ে যায়। আর স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। আর স্বামী সন্তানের পরিণতির উপর সম্মত রয়েছে। প্রতারিত ব্যক্তির উপর সন্তানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা [যেহেতু স্বামী প্রতারিত হয় অর্থাৎ না জেনে বিবাহ করেছে সেহেতু বলা যায় যে,] সন্তানের এ পরিণতির ব্যাপারে সে সম্মত নয়। স্বাধীন স্ত্রীলোকের সন্তান সর্বাবস্থায় স্বাধীন। কেননা, [পূর্বোল্লিখিত কারণে] স্ত্রীর দিকটি প্রবল। সুতরাং স্বাধীনতা গুণের ক্ষেত্রে সন্তান তার অনুগামী হবে। যেমন– দাস হওয়ার ক্ষেত্রে, মুদাববার হওয়ার ক্ষেত্রে, উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কিতাবাতের ক্ষেত্রে সন্তান মাতার অনুগামী হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلٰى مَالٍ صَحَّ الخ : মাসআলা : গর্ভস্থ সন্তানকে যদি মালের বিনিময়ে আজাদ করে, তাহলে এ আজাদ করাটা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ঐ মাল পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। কেননা, মাল আবশ্যক করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। হয়তো গর্ভস্থ ঐ সন্তানের উপরই মাল আবশ্যক করা হবে, অথবা ঐ সন্তানের মায়ের উপর আবশ্যক করা হবে। দুই পদ্ধতির কোনোটাই কার্যকর করা সম্ভব নয়। প্রথমটা সম্ভব না হওয়ার কারণ এই যে, গর্ভস্থ সন্তানের উপর কারো দখল নেই, সুতরাং তার উপর মাল আবশ্য করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়টি সম্ভব না হওয়ার কারণ এই যে, আজাদ হওয়ার দিক থেকে গর্ভস্থ সন্তান ভিন্ন একটি সত্তা। আর যে আজাদ হবে তাকে ভিন্ন কারো উপর মুক্তিপণ আবশ্যক করার নিয়ম নেই। এর বিশদ আলোচনা খোলা' অধ্যায়ে হয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, উক্ত উক্তিটি ঠিক নয়। তবে সম্ভবত গ্রন্থকার কিফায়াতুল মুনতাহির-এ খোলা' অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছেন। উল্লেখ থাকে যে, আজাদ করার সময় গর্ভে সন্তান থাকার বিষয়টি ঐ সময়ই সুস্পষ্ট, আজাদ করার সময় থেকে যদি ছয় মাস কমের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কেননা, গর্ভস্থ থাকার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ছয় মাস।

قَوْلُهُ قَالَ وَوَلَدُ الْاَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا الخ : মাসআলা : মনিব থেকে দাসীর যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, সেই সন্তান আজাদ বলে পরিগণিত হবে। কেননা, সন্তান মনিবের বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আর মনিবের বীর্য থেকে যে সন্তান সৃষ্ট হয় সে আজাদ হয়, সুতরাং এ সন্তানও আজাদ হবে। আর মূলনীতিও এটাই যে, সন্তান বীর্যের অধিকারী ব্যক্তির হয়ে থাকে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে অন্য কিছু হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। কেননা, দাসীর বীর্যও মনিবের বীর্য বলেই পরিগণিত, সুতরাং উভয় বীর্য যেন মনিবেরই, তাই সন্তান আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكٌ الخ : মাসআলা : স্বামী থেকে যদি দাসীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে ঐ সন্তান মনিবের অধীনস্থ দাস বলে গণ্য হবে। কেননা, এখানে দুইপক্ষ রয়েছে। কারণ, সন্তান দুজনের বীর্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়– এমতাবস্থায় মাতার দিককে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে এ সন্তানটি দাসীর মনিবের দাস হয়ে যাবে, আর যদি পিতার দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে মনিবের দাস হবে না। উভয় অবস্থায় যেহেতু বিপরীত দিক রয়েছে, সুতরাং প্রাধান্য দেওয়ার পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

আর কয়েকটি কারণে মাতার দিককেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। তা হচ্ছে এই যে, প্রথমত, লালন-পালনের অধিকার মাতার। দ্বিতীয়ত, স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর স্ত্রীর বীর্য নিজ জায়গায়ই রয়েছে। তৃতীয়ত, সন্তান যে পর্যন্ত মাতার গর্ভে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের দৃষ্টিতে এবং বাহ্যিকভাবেও তা মাতার অংশবিশেষ। বাহ্যিকভাবে এভাবে যে, গর্ভস্থ সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার চাহিদা মাতার মাধ্যমেই পূরণ হয়, মাতার চলাফেরার সাথেই তার চলাফেরা তাই তো জন্মের সময় কাঁচি দিয়ে কেটে মাতা থেকে তাকে পৃথক করতে হয়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে এভাবে যে, গর্ভবতী মহিলা আজাদ হওয়ার দ্বারা সন্তানও আজাদ হয়ে যায়। চতুর্থ কারণ এই যে, সন্তান হুকুম ও প্রকৃত উভয় দিক থেকে মাতার বীর্য, আর শুধু হুকুমের দিক থেকে পিতার বীর্য দ্বারা সৃষ্ট। প্রাধান্য দেওয়ার এসব কারণে মাতার দিককেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এ প্রাধান্য দেওয়ার ফলাফল এই যে, মাতা যার দাসী, সন্তানও তার দাস হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِهِ : এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে–

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো এই যে, এর দ্বারা স্বামীর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কেননা, তার সন্তান অন্যের দাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, স্বামী তার সন্তানকে অন্যের দাস বানাতে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট। কেননা, দাসীকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত হওয়ার অর্থই হলো, সে তার সন্তানকে দাস বানাতে রাজি রয়েছে। তবে প্রতারণার বিষয়টি ভিন্ন। যেমন বিবাহ করার সময় কেউ দাসীর ব্যাপারে বলল যে, এই মহিলা স্বাধীন কারো বাঁদি নয়। তখন তার সন্তান অন্যের দাস হবে না। তবে ঐ মনিবকে সন্তানের দাম দিতে হবে। যেমন– স্ত্রীলোকটি খালিদকে বলল যে, আমি স্বাধীন, আমাকে বিবাহ কর। খালিদ তার কথা বিশ্বাস করে বিবাহ করার পর সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়েছে অথচ এ মহিলা হামিদের দাসী ছিল। তাহলে এ সন্তান হামিদের দাস হবে না। কেননা, খালিদ এ বিষয়ে রাজি হয়নি যে, তার সন্তান অন্যের দাস হবে, তবে খালিদ হামিদকে ঐ সন্তানের মূল্য পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ حُرٌّ عَلٰى كُلِّ حَالٍ الخ : মাসআলা : স্বাধীন মহিলার গর্ভজাত সন্তান স্বাধীন বলেই পরিগণিত হবে। তার স্বামী অন্যের দাস হোক বা আজাদ স্বাধীন ব্যক্তি হোক। এর দলিল পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ, মহিলার দিকটি প্রাধান্য পাবে। সুতরাং মা আজাদ হওয়ার কারণে সন্তানও আজাদ হবে। যেমন মাতা অন্যের দাসী হলে বাচ্চাও দাস হয়ে যায়। এমনিভাবে মনিব যদি তার সাথে অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তিবদ্ধ দাসীকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয়, আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে ঐ বাচ্চা মাতার অনুগামী হবে। এমনিভাবে মনিব যদি মুদাব্বারা দাসীকে কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, আল্লামা কাকী (র.) মুদাব্বারা ও মুকাতাবা উভয়টি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ দুটির মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মাঝে অধীনস্থতা পূর্ণ রয়েছে এবং দাসত্ব হলো অসম্পূর্ণ। আর মুকাতাবের মাঝে অধীনস্থতা অসম্পূর্ণ আর দাসত্ব পূর্ণ রয়েছে

بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

وَإِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلٰى بَعْضَ عَبْدِهٖ عُتِقَ ذٰلِكَ الْقَدْرُ وَيَسْعٰى فِىْ بَقِيَّةِ قِيْمَتِهٖ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يُعْتَقُ كُلُّهٗ وَاَصْلُهٗ اَنَّ الْاِعْتَاقَ يَتَجَزّٰى عِنْدَهٗ فَيُقْتَصَرُ عَلٰى مَا اَعْتَقَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزّٰى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِضَافَتُهٗ اِلَى الْبَعْضِ كَاِضَافَتِهٖ اِلَى الْكُلِّ فَلِهٰذَا يُعْتَقُ كُلُّهٗ لَهُمْ اَنَّ الْاِعْتَاقَ اِثْبَاتُ الْعِتْقِ وَهُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ وَاِثْبَاتُهَا بِاِزَالَةِ ضِدِّهَا وَهُوَ الرِّقُّ الَّذِىْ هُوَ ضُعْفٌ حُكْمِىٌّ وَهُمَا لَا يَتَجَزَّيَانِ فَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْاِسْتِيْلَادِ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْاِعْتَاقَ اِثْبَاتُ الْعِتْقِ بِاِزَالَةِ الْمِلْكِ اَوْ هُوَ اِزَالَةُ الْمِلْكِ لِاَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهٗ وَالرِّقَّ حَقُّ الشَّرْعِ اَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ وَحُكْمُ التَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ اِزَالَةُ حَقِّهٖ لَا حَقِّ غَيْرِهٖ وَالْاَصْلُ اَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلٰى مَوْضِعِ الْاِضَافَةِ وَالتَّعَدِّىْ اِلٰى مَا وَرَاءَهٗ ضَرُوْرَةَ عَدَمِ التَّجَزِّىْ وَالْمِلْكُ مُتَجَزٍّ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَبْقٰى عَلَى الْاَصْلِ .

পরিচ্ছেদ : এমন দাস প্রসঙ্গে যার কিছু অংশ আজাদ করা হয়

অনুবাদ : মনিব যদি তার গোলামের কোনো অংশ আজাদ করে, তাহলে সেই পরিমাণ আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মনিবের অনুকূলে অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, সম্পূর্ণই আজাদ হয়ে যাবে। মতভিন্নতার মূল এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুক্তিদান খণ্ডিত হতে পারে। সুতরাং মনিব যতটুকু মুক্তিদান করবে, তা ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে মুক্তিদান বিভাজ্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই অভিমত। সুতরাং গোলামের সাথে মুক্তিদানের আংশিক সম্বন্ধ তার সমগ্রের সাথে সম্বন্ধের সমতুল্য। এ কারণেই সম্পূর্ণ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল এই যে, মুক্তিদানের অর্থ দাস-সত্তার মাঝে স্বাধীনতা গুণটি সাব্যস্তকরণ। আর স্বাধীনতা হলো শরিয়তের একটি বিধানগত শক্তি। এই বিধানগত শক্তি সাব্যস্ত হতে পারে তার বিপরীত গুণ তথা পরাধীনতা দূরীকরণের মাধ্যমে। আর পরাধীনতা হচ্ছে বিধানসম্মত একটি দুর্বলতা। স্বাধীনতা ও পরাধীনতা গুণদুটি বিভাজ্য হতে পারে না। সুতরাং মুক্তিদানের বক্তব্যটি তালাক প্রদান, কিসাসের দাবি মাফ করে দেওয়া এবং দাসীর উম্মে ওয়ালাদ বানানো-এর মতো হলো [এগুলো খণ্ডিত ও বিভাজ্য হয় না]। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মুক্তিদান অর্থ মালিকানা অপসারণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সাব্যস্তকরণ কিংবা এর অর্থ হলো নিছক মালিকানা অপসারণ। কেননা, মালিকানা হচ্ছে মুক্তিদানকারীর নিজস্ব হক ও অধিকার। পক্ষান্তরে দাসত্ব হচ্ছে শরিয়তের হক কিংবা সাধারণের হক। [মুক্তিদান হচ্ছে একটি হস্তক্ষেপ] আর কর্ম সম্পাদনের হুকুম ঐ বিষয়ে প্রযোজ্য হয় যা কর্ম সম্পাদনকারীর কর্তৃত্বাধীন থাকে। সুতরাং এখানে মুক্তিদানের অর্থ হলো তার নিজস্ব হক রহিতকরণ; অন্যের হক রহিতকরণ নয়। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে-কোনো কর্ম সম্পাদন সম্পর্কিত স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্পর্ক বহির্ভূত স্থানে তার সম্প্রসারণ হয় অবিভাজ্যতার অনিবার্য প্রয়োজনে। আর মালিকানা যেহেতু বিভাজনযোগ্য বিষয়, যেমন বিক্রি ও দানের ক্ষেত্রে, সেহেতু এটা মূলনীতির উপর বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : পূর্ণ গোলাম আজাদ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর এ পরিচ্ছেদে গোলামের আংশিক আজাদ করা সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلٰى بَعْضَ عَبْدِهٖ الخ : মনিব যদি তার দাসের অংশবিশেষকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঐ অংশটুকুই আজাদ হবে, আর বাকি অংশের মুক্তির জন্য সে উপার্জন করবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত অবস্থায় পুরো গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। মতভিন্নতার মূলভিত্তি হলো এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে, সুতরাং মনিব যতটুকু আজাদ করবে ততটুকুই আজাদ হবে।

আর সাহেবাইনের মতে, আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সাহেবাইনের সাথে একমত ঐ সময় যখন দাসের মনিব একজন হবে। আর মনিব যদি দুজন হয়, তাহলে আজাদকারী মনিবের সচ্ছলতার শর্তে বাকি অংশ আজাদ করাও তার দায়িত্বে থাকবে, আর অসচ্ছল হলে গোলাম নিজে উপার্জন করে বাকি অংশ আজাদ হয়ে যাবে। মোটকথা, সাহেবাইনের নিকট আজাদ হওয়াটা বিভক্ত হতে পারে না। আর যে বস্তু বিভক্ত হতে পারে না, তার আংশিকের দিকে কোনো হুকুম সম্পর্কিত করার অর্থ পুরো বস্তুর দিকেই করা। সুতরাং আংশিক আজাদ করলে পুরোটাই আজাদ হয়ে যাবে।

মীযান গ্রন্থকার বলেছেন, আজাদ হওয়াটা বিভক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আজাদকারীর কথা বিভক্ত হয়ে যায়, অথবা তার হুকুমটা বিভক্ত হয়ে যায়। কেননা, এ দুটি বিষয়ই অসম্ভব; বরং তার উদ্দেশ্য হলো আজাদ করার হুকুম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থানটা বিভক্ত হওয়া। অর্থাৎ, যদি গোলামের অর্ধেক আজাদ করা হয়, তাহলে স্বাধীন হওয়ার হুকুমটা গোলামের অর্ধেকের সাথেই প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) আর সাহেবাইনের মধ্যকার দ্বিমতের সারকথা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার দাসের অর্ধেক আজাদ করে দেয়, তাহলে দাসত্ব গোলাম থেকে দূর হবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাসত্ব দূর হবে না; বরং যে পরিমাণ আজাদ করা হয়েছে সে পরিমাণ মালিকানা মনিব থেকে দূর হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে, গোলাম থেকে পুরো দাসত্ব দূর হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَهُمْ اَنَّ الْاِعْتَاقَ اِثْبَاتُ الْعِتْقِ الخ : সাহেবাইন এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, আজাদ করার অর্থ হলো স্বাধীনতা সাব্যস্ত করা। আর স্বাধীনতা হচ্ছে শরিয়তের একটি বিধানগত শক্তি। অর্থাৎ, শরিয়তের পক্ষ থেকে দাসের জন্য বিভিন্ন লেনদেনের শক্তি অর্জিত হয়ে যায়। আর সেই শক্তি এভাবে সাব্যস্ত হয় যে, তার বিপরীতে যা রয়েছে তাকে দূর করে দেওয়া, আর স্বাধীনতার বিপরীতে রয়েছে পরাধীনতা, যা শরিয়তের দিক থেকে একটি দুর্বলতা। আর এ দুটি বস্তু অর্থাৎ শরিয়তের পক্ষ থেকে শক্তি আর দুর্বলতা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না, বিধায় আজাদ করাও বিভক্ত হতে পারে না। সুতরাং তালাক দেওয়া কিসাসের বিনিময়ে মাফ করে দেওয়ার ন্যায় হয়ে যাবে। স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক দেওয়া, অর্ধেক কিসাস মাফ করে দেওয়া যেমন সম্ভব নয় এবং অর্ধেক দাসীকে উম্মে ওয়ালাদা বানানো যায় না, তেমনিভাবে আজাদ করাও বিভক্ত হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْاِعْتَاقَ اِثْبَاتُ الْعِتْقِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, আজাদ করার অর্থ হলো দাসত্ব দূর করার মাধ্যমে স্বাধীনতা সাব্যস্ত করা। কেননা, আজাদকারীর মালিকানা থাকার কারণে অধিকার তারই হবে। আর দাসত্ব হলো শরিয়তের অধিকার। কেননা, কাফের যখন আল্লাহ তা'আলার গোলাম হতে অস্বীকার করেছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে শাস্তি দিয়েছেন যে, তাদেরকে নিজের বান্দাদের গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, দাসত্ব সাধারণ লোকদের অধিকার। কেননা, মুজাহিদগণ যেভাবে গোলাম ব্যতীত অন্যান্য সামানপত্র বণ্টন করে নেন তেমনিভাবে যুদ্ধে প্রাপ্ত গোলামকেও বণ্টন করে নেবে এবং এ গোলামের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। এমনিভাবে নিজের অধিকার দূর করে দেওয়ারও অনুমতি থাকবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনিব শুধু মালিকানা দূর করতে পারে, দাসত্ব দূর করতে পারে না। আর মালিকানার বিষয়টি বিভক্তিযোগ্য, সুতরাং আজাদ করার বিষয়টিও বিভক্তিযোগ্য হবে। যেমন– কেনাকাটা, দান-অনুদানের ক্ষেত্রে বিভক্তি হতে পারে। অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা অথবা দান করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে, এমনিভাবে আজাদ করার বিষয়টিও অর্ধেক করার সুযোগ থাকবে।

وَيَجِبُ السِّعَايَةُ لِاحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعٰى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْضِ تُوجِبُ ثُبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمْنَعُهُ فَعَمِلْنَا بِالدَّلِيْلَيْنِ بِإِنْزَالِهِ مُكَاتَبًا إِذْ هُوَ مَالِكٌ يَدًا لَا رَقَبَةً وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ وَلَهُ خِيَارٌ أَنْ يُعْتِقَهُ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِعْتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ إِلَى الرِّقِّ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لَا إِلَى أَحَدٍ فَلَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُودَةِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَأَثْبَتْنَاهُ فِي الْكُلِّ تَرْجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ وَالْإِسْتِيلَادُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ حَتَّى لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَفِي الْقِنَّةِ لَمَّا ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِفْسَادِ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَكَمُلَ الْإِسْتِيلَادُ ـ

অনুবাদ : উপার্জনপূর্বক পরিশোধ ওয়াজিব হবে। কেননা, গোলামের নিকট আংশিক স্বত্বাধিকার আবদ্ধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উপার্জনের দায় আরোপকৃত গোলাম কিতাবত-চুক্তিতে আবদ্ধ গোলামের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, কিছু অংশের সাথে মুক্তিদানের সম্পর্ক গোলামের সমগ্র সত্তায়, 'আত্ম-মালিকানা' স্বত্ব সাব্যস্ত করে। অথচ কিছু অংশের উপর অন্যের মালিকানা মেটাতে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং আমরা উভয় দলিলের দাবি কার্যকর করছি তাকে 'কিতাবত-চুক্তিবদ্ধ'-এর পর্যায়ভুক্ত করে। কেননা, কিতাবত-চুক্তির গোলাম কর্মগত দিক থেকে আত্ম-অধিকারসম্পন্ন, সত্তাগত দিক থেকে নয়। আর শ্রমলব্ধ উপার্জন হবে কিতাবত-চুক্তির নির্ধারিত বিনিময়ের সমতুল্য। সুতরাং মনিবের অধিকার থাকবে মূল্য উসুলের জন্য তাকে শ্রমে নিযুক্ত করার। আর তাকে আজাদ করে দেওয়ার অধিকারও তার রয়েছে। কেননা, চুক্তিবদ্ধ গোলামও মুক্তিদানের উপযুক্ত পাত্র। তবে পার্থক্য এই যে, অংশত মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে দাস অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। কেননা, [অংশত হলেও] মুক্তিদানের অর্থ হচ্ছে পক্ষবিহীন অবস্থায় মালিকানা পরিত্যাগ। [আর দুটি পক্ষ ছাড়া বিনিময় সাব্যস্ত হয় না] সুতরাং [বিনিময়হীনতার কারণে] তা রহিতযোগ্য হবে না। উদ্দিষ্ট কিতাবত-চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটা হচ্ছে বিনিময়-চুক্তি। সুতরাং তা প্রত্যাহার ও রহিতযোগ্য। তালাক প্রদান ও কিসাস ক্ষমার ক্ষেত্রে যেহেতু মধ্যবর্তী অবস্থা নেই [মুক্তি ও দাসত্বের মাঝে যেমন কিতাবত-চুক্তির মধ্যবর্তী অবস্থা রয়েছে] সেহেতু হারামের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের নিমিত্তে তালাক ও কিসাস ক্ষমাকে পূর্ণভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিভাজনযোগ্য। এ কারণেই শরিকানাধীন মুদাববার দাসীর গর্ভে একজন মালিক যদি সন্তান উৎপাদন করে বসে তাহলে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিষয়টি এ মালিকের অংশের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। [অপর মালিকের ক্ষেত্রে কথাপূর্বক মুদাববার থেকে যাবে] সাধারণ দাসীর ক্ষেত্রে [বিভাজিত না হওয়ার কারণ এই যে,] যেহেতু দাসীকে নষ্ট করার কারণে সন্তান উৎপাদনকারী ব্যক্তি অপর শরিকের অংশের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে, সেহেতু সে সমগ্র দাসীর মালিক হয়ে গেছে। ফলে সন্তান উৎপাদনের বিষয়টি পূর্ণ মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে. [যেন সে আপন দাসীর গর্ভেই উৎপাদন করেছে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجِبُ السِّعَايَةُ لِإِحْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الخ : তবে বাকি অংশ যা আজাদ করা হয়নি তার ব্যাপারে গোলামের নিজ শ্রম-চেষ্টার বিষয়টি এজন্য যে, যেই অংশকে আজাদ করা হয়নি তার মূল্য গোলামের নিকট আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং তার থেকেই তা উসুল করা হবে। আর যেই গোলাম উপার্জনের মাধ্যমে নিজেকে আজাদ করে নেবে সে মুকাতাব গোলামের ন্যায়। কেননা, আজাদ করার কোনো অংশকে যখন গোলামের দিকে সম্পর্কিত করা হবে তখন যেন সে পুরো নিজ সত্তার মালিক হয়ে গেল, সুতরাং আজাদ হওয়াটা বিভক্ত হলো না। আর কোনো অংশে মনিবের মালিকানা অবশিষ্ট থাকা বুঝায়, সে পুরোটার মালিক নয়, সুতরাং আমরা উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছি যে, গোলাম মুকাতাবের ন্যায় হয়ে যাবে। কেননা, সে নিজ উপার্জনের মালিক; নিজ দেহ ও সত্তার মালিক নয়। আর তার উপার্জন চুক্তি বিনিময়ের মতো, বিধায় মনিবের এখতিয়ার থাকবে যে, তার দ্বারা উপার্জন মাধ্যমে বাকি মূল্য উসুল করে নেবে। আবার আজাদ করে দেওয়ারও এখতিয়ার থাকবে। কেননা, মুকাতাবকে মনিব ইচ্ছা করলে আজাদ করে দিতে পারে। তবে মুকাতাব আর উক্ত গোলামের মাঝে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, মুকাতাব যদি তার চুক্তি পরিমাণ সম্পদ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সে গোলাম হিসেবেই বাকি থাকবে। আর এ গোলাম যার কিয়দংশ আজাদ করা হয়েছে সে যদি বাকি টাকা উপার্জন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে পুরো গোলাম বলা যাবে না। কেননা, মালিকানা কারো দিকে যাওয়ার মতো নয়। সুতরাং তা রহিতকরণকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু কিতাবতের বিষয় রহিতকরণকে গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِى الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ الخ : আর তালাক এবং কিসাসের বিনিময় মাফ করার ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়ে পুরোর দিকে সম্পর্কিত করা হবে। অতএব, আলোচ্য মাসআলা এ মাসআলার সাথে তুলনা করা যাবে না। এমনিভাবে উম্মে ওয়ালাদের সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উম্মে ওয়ালাদ বানানো বিভক্তিকে গ্রহণ করে। যেমন বিভক্ত হতে পারে আজাদ হওয়াটা। সুতরাং কোনো মুদাব্বারা দাসীকে যদি কেউ উম্মে ওয়ালাদ বানায়, তাহলে ততটুকু অংশই উম্মে ওয়ালাদ হবে। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, যায়েদ এবং খালিদ দুজন যদি একজন দাসীর মালিক হয়, আর ঐ দাসীর সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এমতাবস্থায় যায়েদ দাবি করে যে, এ সন্তান আমার ঔরস থেকে হয়েছে, তাহলে অর্ধেক বাঁদি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে, কিন্তু সে খালিদের অংশও বিনষ্ট করে ফেলেছে। কেননা, উম্মে ওয়ালাদ করাটা আজাদের মতো, তাই তাকে এ অবস্থায় বিক্রি করা জায়েজ নেই, বিধায় যায়েদের উপর আবশ্যক হলো খালিদের অংশের জরিমানা প্রদান করা।

জরিমানা দিয়ে যখন সে পূর্ণ দাসীর মালিক হয়ে গেল তখন পুরো দাসীই তার উম্মে ওয়ালাদে পরিণত হবে, যেমনটি হয়ে থাকে নিজের একক দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর ক্ষেত্রে। আর দুজন শরিকানা দাসী যদি দুজনের মুদাব্বারা হয় অর্থাৎ, দুজন বলেছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ, তাহলে এমতাবস্থায় যে দাবি করবে যে, এ বাচ্চা আমার, উম্মে ওয়ালাদ তার বন্টনেই থাকবে, আর বাকি অংশ মুদাব্বারা হিসেবে থাকবে বিধায় প্রমাণিত হলো যে, উম্মে ওয়ালাদ বিভক্ত হতে পারে।

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عُتِقَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكُهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدَ فَإِنْ ضَمِنَ رَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَإِنْ اَعْتَقَ أَوْ اِسْتَسْعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدَ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَبْتَنِي عَلَى حَرْفَيْنِ اَحَدُهُمَا تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالثَّانِي أَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ سِعَايَةَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : যদি কোনো গোলাম দুই শরিকানাধীন হয় এবং এর মধ্যে একজন তার অংশকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ঐ অংশটুকু আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর আজাদকারী মালিক যদি সচ্ছল হয়, তাহলে অপর শরীকের এখতিয়ার হবে, ইচ্ছা করলে নিজের অংশকে সে আজাদ করে দেবে, আবার ইচ্ছা করলে নিজের অংশের মূল্যের পরিশোধ দায় আজাদকারীর উপর আরোপ করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে। যদি আজাদকারীর উপর দায় আরোপ করে তাহলে আজাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের নিকট থেকে উসুল করে নেবে। আর পরবর্তীতে 'ওয়ালা' সম্পর্ক আজাদকারীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি দ্বিতীয় শরিক তার অংশ আজাদ করে দেয়, কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করে তাহলে উভয়ের সাথে 'ওয়ালা' সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে আজাদকারী অসচ্ছল হলে অপর শরিকের দুটি এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে আজাদ করে দেবে কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। উভয় অবস্থায় 'ওয়ালা' সম্পর্ক উভয় মনিবের সাথে হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে, সচ্ছলতার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ আদায় এবং অসচ্ছলতার অবস্থায় উপার্জনে নিযুক্ত করা ছাড়া দ্বিতীয় শরিকের আর কোনো সুযোগ থাকবে না। আর আজাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের নিকট থেকে উসুল করতে পারবে না। অবশ্য 'ওয়ালা'-এর সম্পর্ক আজাদকারীর সাথেই হবে। আলোচ্য মাসআলাটির ভিত্তি হলো দুটি মূলনীতির উপর। প্রথমত মুক্তিদান বিভাজ্য কিনা, যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর দ্বিতীয়ত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আজাদকারীর সচ্ছলতা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার বৈধতা রহিত করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَبْتَنِي عَلَى حَرْفَيْنِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আজাদকারী নিজ শরিককে জরিমানা আদায় করার পর দাস থেকে তা ফেরত নেওয়া দুটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। প্রথম মূলনীতি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে, আর সাহেবাইনের নিকট তা বিভক্ত হতে পারে না, যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, আজাদকারী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে তার এ সচ্ছলতা গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে বাধ সাধবে না, এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের নিকট তা বাধ সাধবে।

وَعِنْدَهُمَا يَمْنَعُ لَهُمَا فِى الثَّانِىْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيْبَهُ إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا سَعٰى فِىْ حِصَّتِهِ الْاٰخَرِ قَسَّمَ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِى الشَّرِكَةَ وَلَهُ اَنَّهُ إِحْتَبَسَتْ مَالِيَّةُ نَصِيْبِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ اَنْ يَضْمَنَهُ كَمَا إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ بِثَوْبِ إِنْسَانٍ وَاَلْقَتْهُ فِىْ صَبْغِ غَيْرِهِ حَتّٰى إِنْصَبَغَ بِهِ فَعَلٰى صَاحِبِ الثَّوْبِ قِيْمَةُ صَبْغِ الْاٰخَرِ مُوْسِرًا كَانَ اَوْ مُعْسِرًا لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هٰهُنَا إِلَّا اَنَّ الْعَبْدَ فَقِيْرٌ فَيَسْتَسْعِيْهِ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ يَسَارُ التَّيْسِيْرِ وَهُوَ اَنْ يَمْلِكَ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ قِيْمَةِ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ لَا يَسَارُ الْغِنَاءِ لِاَنَّ بِهِ يَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِتَحْقِيْقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنَ الْقُرْبَةِ وَإِيْصَالُ بَدْلِ حَقِّ السَّاكِتِ إِلَيْهِ ـ

অনুবাদ : কিন্তু সাহেবাইনের মতে রহিত করে। দ্বিতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ আপন অংশ আজাদকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যদি সে ধনী হয় তাহলে ক্ষতিপূরণের দায় গ্রহণ করবে, আর যদি অসচ্ছল হয় তাহলে অপর শরিকের অংশ পরিশোধে গোলাম উপার্জন করবে। মূল হাদীস إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا سَعٰى فِىْ حِصَّتِهِ - اَخْرَجَهُ الْاَئِمَّةُ السِّتَّةُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) এখানে নবী করীম ﷺ দুটি বিষয়কে [আজাদকারীর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মাঝে] ভাগ করে দিয়েছেন। আর বিভাজন একত্রিকরণের পরিপন্থি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, দ্বিতীয় শরিকের অংশের মূল্য গোলামের নিকট আবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং গোলামকে সে জামিন বানাতে পারে। যেমন কারো কাপড় বাতাসে উড়ে গিয়ে অন্যের রংয়ের পাত্রে পড়ল এবং রঙিত হয়ে গেল, সে অবস্থায় রঞ্জনের মূল্য কাপড়ওয়ালার উপর সাব্যস্ত হয়। সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল– ঐ কারণে যা আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং এখানেও তা-ই হবে। তবে গোলাম যেহেতু দরিদ্র, সেহেতু তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করা হবে। আর সচ্ছলতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সচ্ছলতাই হলো বিবেচ্য। অর্থাৎ, অপর শরিকের হিস্সার মূল্যের সমপরিমাণ [উদ্বৃত্ত] অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া; প্রাচুর্যের সচ্ছলতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ন্যূনতম সচ্ছলতা দ্বারাই উভয় পক্ষের স্বার্থের সমন্বয় হয়। অর্থাৎ, আজাদকারীর ছওয়াব হাতে পৌঁছানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُمَا فِى الثَّانِىْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : দ্বিতীয় মূলনীতির ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল : যুক্তির আলোকে দুটি বিষয়ের একটি হবে। একটি হলো আজাদকারী সচ্ছল হবে অথবা অসচ্ছল হবে। উভয় অবস্থায় আজাদকারীর উপর নিজ শরিক ব্যক্তির জরিমানা আবশ্যক হবে। কেননা, সে নিজের অংশ আজাদ করার দ্বারা শরিক ব্যক্তির অংশ বিনষ্ট করে ফেলেছে। কারণ, সে এখন ইচ্ছা করলেই নিজের অংশ বহাল বা প্রয়োগ করতে পারছে না। আর জরিমানা হওয়াটা ব্যক্তির সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে ব্যবধান হয় না।

দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে, আজাদকারীর উপর কোনো অবস্থাতেই জরিমানা আবশ্যক হবে না। কেননা, আজাদকারী নিজ অংশের মধ্যেই নিজস্ব অধিকার প্রয়োগ করেছে। আর নিজ অধিকার প্রয়োগকারী সীমালঙ্ঘনকারী হয় না, তাই তার উপর জরিমানাও আবশ্যক হবে না– যদিও তার আজাদ করার কারণে অন্যের ক্ষতি হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজ জমিনের খরকুটো কাটার পর আগুন দিয়ে জ্বালানোর সময় যদি পাশের জমিওয়ালারও কিছু জ্বলে যায়, তাহলে সে কারণে জরিমানা আবশ্যক হয় না।

উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধী। এজন্য সাহেবাইন উভয় যুক্তি পরিহার করে হাদীসের উপর আমল করেছেন। যে হাদীসটি সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের অংশ আজাদ করে দিয়েছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন– إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا سَعَى فِيْ حِصَّتِهِ আজাদকারী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে অপর শরিকের অংশের জামিন হবে, আর যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে গোলাম নিজে উপার্জন করবে। এ হাদীসে রাসূল ﷺ বিষয়টিকে ভাগ করে দিয়েছেন দুই অবস্থার উপর। আর বিভাজন শরিক হওয়ার বিপরীত। অর্থাৎ, আজাদকারী যদি সচ্ছল হয় তাহলে সে শুধু জামিনই হবে, গোলামের উপর উপার্জনের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। আর আজাদকারী যদি অসচ্ছল হয় তাহলে গোলামকেই উপার্জন করতে হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আজাদকারী সচ্ছল হলে গোলামকে উপার্জন করতে হবে না। তার সচ্ছলতা গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ كَمَا إِذَا هَبَّتِ الرِّيْحُ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, শরিকের অংশের মূল্য গোলামের নিকট বন্ধ হয়ে রইল। সুতরাং শরিকের জন্য অনুমতি থাকবে যে, সে গোলাম থেকে উপার্জনের মাধ্যমে তার জরিমানা উসুল করে নেবে, তাহলে বিষয়টা এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তির কাপড় বাতাসে উড়িয়ে অন্যের রংয়ের পাত্রে গিয়ে পড়ল, যার ফলে কাপড় রঙ্গীন হয়ে গেল। এমতাবস্থায় কাপড়ের মালিকের উপর আবশ্যক হলো, রংয়ের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। কাপড়ের মালিক সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। কেননা, কাপড়ের মালিকের নিকট কিছু রং আটক হয়ে গেছে, সুতরাং রংয়ের মালিক তার জরিমানা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। অনুরূপ হুকুম আলোচ্য মাসআলায়। তবে এখানে গোলামের মাধ্যমে উপার্জন করানোরও একটি সুযোগ রয়েছে।

আর সাহেবাইন যে হাদীস পেশ করেছেন তার উত্তর এই যে, রাসূল ﷺ শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, উপার্জনকে আজাদকারীর অসচ্ছলতার উপর শর্তযুক্ত করেছেন। আর এটা অসচ্ছলতা না থাকার সময়ের বিপরীত নয়। কেননা, যে বস্তুকে কোনো শর্তযুক্ত করা হয় শর্ত পাওয়ার সময় ঐ বস্তু পাওয়া আবশ্যক; কিন্তু শর্ত না পাওয়া গেলে ঐ বস্তুও না পাওয়াটা জরুরি নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে বলল যে, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আজাদ, এমতাবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলে নিঃসন্দেহে আজাদ হয়ে যাবে; কিন্তু প্রবেশ না করার সময় আজাদ না হওয়াটা জরুরী নয়। বরং আজাদ হতে পারে– এভাবে যে, মনিব তাকে বিনা শর্তে أَنْتَ حُرٌّ - 'তুমি আজাদ' বলে দিয়েছে, ফলে সে আজাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও আজাদকারীর সচ্ছলতা সত্ত্বেও গোলামের মাধ্যমে উপার্জন করানো যায়।

উল্লেখ্য যে, আজাদকারী যার উপর জরিমানা আবশ্যক হয়, তার সচ্ছলতার ক্ষেত্রে সহজতম সচ্ছলতাই যথেষ্ট; ধনাঢ্য সচ্ছলতা জরুরি নয়। আর সহজতম সচ্ছলতা হচ্ছে এতটুকু সম্পদের মালিক হওয়া যার দ্বারা শরিকের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে পারে। আর এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাদির অতিরিক্ত হতে হবে। এটাই জাহিরে রেওয়ায়েত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তবে কোনো কোনো মাশায়েখ নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকাকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু গ্রহণযোগ্য অভিমত জাহিরে রেওয়ায়েতেরটাই।

তার প্রমাণ এই যে, সহজের সাথে মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থার দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ, আজাদকারীর উদ্দেশ্য হলো ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, তা যেন সে অর্জন করতে পারে আবার অপর শরিক যে তার অংশ আজাদ করেনি, সেও যেন নিজ প্রাপ্য পেয়ে যায়।

ثُمَّ التَّخْرِيْجُ عَلٰى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوْعِ الْمُعْتِقِ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَايَةِ فِىْ حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِاَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِهٖ لِعَدَمِ التَّجَزِّىْ وَاَمَّا التَّخْرِيْجُ عَلٰى قَوْلِهٖ فَخِيَارُ الْاِعْتَاقِ لِقِيَامِ مِلْكِهٖ فِى الْبَاقِىْ اِذِ الْاِعْتَاقُ يَتَجَزّٰى عِنْدَهٗ وَالتَّضْمِيْنُ لِاَنَّ الْمُعْتِقَ جَانٍ عَلَيْهِ بِاِفْسَادِ نَصِيْبِهٖ حَيْثُ اِمْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِمَّا سِوَى الْاِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهٖ وَالْاِسْتِسْعَاءِ لِمَا بَيَّنَّا وَيَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِاَنَّهٗ قَامَ مَقَامَ السَّاكِتِ بِاَدَاءِ الضَّمَانِ وَقَدْ كَانَ لَهٗ ذٰلِكَ بِالْاِسْتِسْعَاءِ فَكَذٰلِكَ لِلْمُعْتِقِ وَلِاَنَّهٗ مَلَكَهٗ بِاَدَاءِ الضَّمَانِ ضِمْنًا فَيَصِيْرُ كَاَنَّ الْكُلَّ لَهٗ وَقَدْ اَعْتَقَ بَعْضَهٗ فَلَهٗ اَنْ يُعْتِقَ الْبَاقِىْ اَوْ يَسْتَسْعِىْ اِنْ شَاءَ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ لِاَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهٗ مِنْ جِهَتِهٖ حَيْثُ مَلَكَهٗ بِاَدَاءِ الضَّمَانِ ـ

অনুবাদ : মূলনীতি অনুযায়ী যে হুকুম ব্যক্ত করা হয়েছে, তা সাহেবাইনের মত অনুযায়ী সুস্পষ্ট। কেননা, আজাদকারী যে দায় পরিশোধ করেছে তা গোলামের নিকট থেকে ফেরত না নেওয়ার কারণ এই যে, সচ্ছলতার অবস্থায় গোলামের উপর উপার্জনের দায়িত্ব নেই। আর 'ওয়ালা' সম্পর্ক সর্বতোভাবে আজাদকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, যেহেতু মুক্তিদান বিভাজ্য নয় সেহেতু [প্রথমোক্ত মূলনীতির আলোকে] মুক্তিদান সম্পূর্ণরূপে তার পক্ষ হতেই সাব্যস্ত হচ্ছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাখ্যা এই যে, যেহেতু গোলামের অবশিষ্ট অংশে অপর পক্ষের মালিকানা বহাল রয়েছে, সেহেতু তার আজাদ করার এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুক্তিদান বিভাজনযোগ্য। আর মুক্তিদাতার উপর অর্থ পরিশোধের মালিকানা আরোপের অধিকার এজন্য যে, মুক্তিদাতা তার অংশের মালিকানা নষ্ট করার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। কারণ, নিজের মালিকানাভুক্ত অংশকে আজাদ করা এবং এ জাতীয় কর্ম ব্যতীত বিক্রি দান ইত্যাদি তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার লাভের কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আজাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের কাছ থেকে ফেরত নেবে এজন্য যে, দায় পরিশোধের মাধ্যমে সে নীরবতা অবলম্বনকারীর স্থলবর্তী হয়েছে। আর নীরবতা অবলম্বনকারীর উপার্জনে নিযুক্ত করার মাধ্যমে অর্থ উসূল করার অধিকার ছিল। সুতরাং আজাদকারীর সে অধিকার থাকবে। তাছাড়া সে তো দায় পরিশোধের মাধ্যমে প্রকারান্তরে গোলামের মালিকানা লাভ করেছে, সুতরাং যেন সম্পূর্ণ গোলামই তার মালিকানাধীন এবং সে অবস্থায় সে গোলামের একাংশ আজাদ করেছে, সুতরাং অপরাংশ আজাদ করার কিংবা ইচ্ছা করলে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার তার রয়েছে। আর [দায় পরিশোধের] এক্ষেত্রে 'ওয়ালা' সম্পর্ক মুক্তিদাতার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, দায় পরিশোধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গোলামের মালিক হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ মুক্তিদান তার পক্ষ থেকে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ التَّخْرِيجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি যেহেতু দুটি মূলনীতির আলোকে আবিষ্কৃত, তাই সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়েছে যে, সাহেবাইনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মাসআলার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। কেননা, সাহেবাইন বলেছেন যে, আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে না, এজন্য পূর্ণ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর আজাদকারীর সচ্ছলতা হওয়া যেহেতু গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, তাই অংশীদারের অংশের দায় তার উপরই বর্তাবে। আর আজাদকারী গোলাম থেকে ঐ জরিমানা এজন্য উসুল করতে পারবে না যে, যখন সচ্ছলতা অবস্থায় সে নিজে জরিমানা দিয়েছে তখন গোলামের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক ছিল না, যা দ্বিতীয় মূলনীতি দ্বারা সুস্পষ্ট। আর 'ওয়ালা' আজাদকারীর হয়ে যাবে। কেননা, পূর্ণ গোলাম তার পক্ষ থেকেই আজাদ হয়েছে। তাই আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারবে না, যা প্রথম মূলনীতি দ্বারা সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّخْرِيجُ عَلَى قَوْلِهِ فَخِيَارُ الخ : তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী উক্ত মূলনীতির বক্তব্য হলো, দ্বিতীয় শরিকেরও নিজ অংশ আজাদ করার অধিকার আছে। কেননা, নিজ অংশে তার মালিকানা বহাল রয়েছে। কারণ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে। আবার দ্বিতীয় শরিকের এ অধিকারও আছে যে, সে আজাদকারী থেকে নিজ অংশের জরিমানা উসুল করে নেবে। কেননা, আজাদকারী তার অংশের মাঝে জুলুম করেছে যে, তার অংশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কেননা, আজাদকারী নিজ অংশ আজাদ করার কারণে অপর শরিক এখন নিজ ইচ্ছায় নিজ অংশ বিক্রি বা দান করতে পারছে না, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বাকি আজাদকারী জরিমানা হিসেবে যা পরিশোধ করল, তা গোলাম থেকে ফেরত নিতে পারবে। এ কারণে যে, যখন তার অপর শরিককে অংশ দিয়ে দিল তখন সে ঐ শরিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। আর অপর শরিকের অধিকার ছিল যে, সে গোলাম থেকে উপার্জনের মাধ্যমে নিজের অংশ পূর্ণ করে নেবে, সুতরাং আজাদকারীরও সেই অধিকার থাকবে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজাদকারী দায় পরিশোধ করার কারণে সে গোলামের মালিক হয়ে গেছে যদিও তা গৌণভাবেই হোক। তাহলে এখন যেন পূর্ণ গোলামই তার হয়ে গেল– এমতাবস্থায় সে তার এক অংশ আজাদ করে দেওয়ায় বাকি অংশে তার স্বাধীনতা থাকবে– ইচ্ছা করলে আজাদও করে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে উপার্জনের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে নিবে। জরিমানা আদায় করা অবস্থায় পূর্ণ 'ওয়ালা' আজাদকারীর হবে। কেননা, দায় পরিশোধ করার মাধ্যমে সে পূর্ণ গোলামের মালিক হয়ে গেছে।

وَفِىْ حَالِ إِعْسَارِ الْمُعْتِقِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِنْ شَاءَ إِسْتَسْعٰى لِمَا بَيَّنَّا وَالْوَلَاءُ لَهُ فِى الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَسْعِىْ عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا أَدّٰى بِإِجْمَاعٍ بَيْنَنَا لِأَنَّهُ يَسْعٰى لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ أَوْ لَا يَقْضِىْ دَيْنًا عَلَى الْمُعْتِقِ إِذْ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ بِخِلَافِ الْمَرْهُوْنِ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ لِأَنَّهُ يَسْعٰى فِىْ رَقَبَتِهِ قَدْ فُكَّتْ أَوْ يَقْضِىْ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهٰذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رح) فِى الْمُوْسِرِ كَقَوْلِهِمَا وَقَالَ فِى الْمُعْسِرِ يَبْقٰى نَصِيْبُ السَّاكِتِ عَلٰى مِلْكِهِ يُبَاعُ وَيُوْهَبُ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلٰى تَضْمِيْنِ الشَّرِيْكِ لِإِعْسَارِهِ وَلَا إِلَى السِّعَايَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِجَانٍ وَلَا رَاضٍ بِهِ وَلَا إِلٰى إِعْتَاقِ الْكُلِّ لِلْإِضْرَارِ بِالسَّاكِتِ فَتَعَيَّنَ مَا عَيَّنَّاهُ قُلْنَا إِلَى الْإِسْتِسْعَاءِ سَبِيْلٌ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْجِنَايَةِ بَلْ يَبْتَنِىْ عَلٰى إِحْتِبَاسِ الْمَالِيَّةِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْمُوْجِبَةِ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالضُّعْفُ السَّالِبُ لَهَا فِىْ شَخْصٍ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে মুক্তিদাতার অসচ্ছলতা অবস্থায় নীরবতা অবলম্বনকারী ইচ্ছা করলে তার হিস্সা আজাদ করতে পারে। কেননা, তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। আবার আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারে। উভয় অবস্থায় 'ওয়ালা' সম্পর্ক নীরবতা অবলম্বনকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, [অবশিষ্ট অংশের] মুক্তিদান তার পক্ষ হতে সাব্যস্ত হয়েছে। আর উপার্জনে নিযুক্ত গোলামের পরিশোধকৃত অর্থ আমাদের সকলের মতেই মুক্তিদাতার নিকট থেকে ফেরত পাবে না। কেননা, সে তো নিজের দাসত্ব মোচনের উদ্দেশ্যে উপার্জন করেছে এবং মুক্তিদাতার উপর আরোপিত কোনো ঋণ সে পরিশোধ করেনি। কেননা, অসচ্ছলতার কারণে তার উপর কোনো ঋণ সাব্যস্ত হয়নি। আর অসচ্ছল বন্ধক দানকারী ব্যক্তি কর্তৃক বন্ধকী গোলাম আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে তো এমন সত্তার দায় পরিশোধ করছে যে, সত্তা মুক্তি লাভ করে ফেলেছে। কিংবা কারণ এই যে, সে তো বন্ধক দানকারীর ঋণ-পরিশোধ করছে। সুতরাং পরিশোধকৃত অর্থ সে তার কাছ থেকে ফেরত নেবে। সচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত সাহেবাইনের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি বলেন, নীরব শরিকদের হিসেবে তার মালিকানায় বহাল থাকবে এবং সেটা বিক্রি করা ও দান করা যাবে। কেননা, অসচ্ছলতার কারণে মুক্তিদাতা শরিকদারের উপর দায় আরোপ করার অবকাশ নেই। তদ্রূপ গোলামকে দায় পরিশোধে বাধ্য করার অবকাশ নেই। কেননা, সে অপরাধী নয় এবং মুক্তি গ্রহণে রাজিও নয়। তদ্রূপ সম্পূর্ণ গোলামকে মুক্তিদানের অবকাশ নেই। কেননা, তাতে নীরব পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সুতরাং তা-ই নির্ধারিত হয়ে গেল, যা আমরা বলেছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, গোলামকে শ্রমের মাধ্যমে দায় পরিশোধে নিযুক্ত করার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার মুখাপেক্ষী নয় এবং এর ভিত্তি হচ্ছে অর্থমূল্য আবদ্ধ হয়ে থাকার উপর। সুতরাং একই ব্যক্তির সত্তায় মালিকানা সাব্যস্তকারী শক্তি এবং মালিকানা রহিতকারী দুর্বলতা একত্র করার পন্থা গ্রহণ করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِىْ حَالِ إِعْسَارِ الْمُعْتِقِ إِنْ شَاءَ الخ : পূর্বের সব আলোচনা ছিল আজাদকারীর সচ্ছল অবস্থা সম্পর্কে। আর আজাদকারী যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে নীরবতা অবলম্বনকারী শরিকের স্বাধীনতা থাকবে– ইচ্ছা করলে সে নিজ অংশ আজাদ করে দিতে পারে। কেননা, নিজ হিস্সায় তার মালিকানা বহাল রয়েছে, আবার ইচ্ছা করলে গোলাম থেকে উপার্জনও করাতে পারে। কেননা, তার হিস্সার মূল্য গোলামের নিকট আবদ্ধ রয়েছে। আর এ দুই অবস্থায় নীরবতা অবলম্বনকারী শরিক গোলামের 'ওয়ালার' অধিকারী হবে। কেননা, এতটুকু অংশে আজাদ করাটা তার দিকেই সম্পর্কিত হয়। আর যে অবস্থায় গোলাম থেকে উপার্জন গ্রহণ করা হবে, সে অবস্থায় গোলাম তার আদায়কৃত টাকা পূর্বে আজাদকারী মনিব থেকে ফেরত নিতে পারবে না। এতটুকু বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) একমত। কেননা, গোলাম নিজ সত্তাকে স্বাধীন করানোর জন্যই উপার্জন করেছে। সে তার উপার্জন দ্বারা অন্যের ঋণ পরিশোধ করেনি, যে পরবর্তীতে তার থেকে তা ফেরত নিতে পারে। কেননা, আজাদকারী অসচ্ছল অবস্থায় তার উপর অতিরিক্ত কোনো দায়ভার আরোপিত হয় না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَرْهُوْنِ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ الخ : তবে বন্ধক রাখা গোলামের বিষয় ভিন্ন। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি নিজের উপর আরোপিত ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে ঋণের পরিবর্তে তার নিকট একটি গোলাম বন্ধক রাখল, পরবর্তীতে বন্ধক রাখা এই গোলাম নিজে উপার্জন করে মনিবের ঋণ যদি পরিশোধ করে দেয়, তাহলে এ পরিশোধকৃত এই টাকা আবার সে তার মনিব থেকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা, সে তার উপর আরোপিত ঋণ পরিশোধ করেনি; বরং বন্ধককারীর ঋণ পরিশোধ করেছে বিধায় তা ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رح) فِى الْمُوْسِرِ كَقَوْلِهِمَا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আজাদকারী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত সাহেবাইনের অনুরূপ। কিন্তু আজাদকারী যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, নীরবতা অবলম্বনকারীর অংশ সম্পূর্ণভাবে অক্ষত থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তার অংশ বিক্রিও করতে পারবে, ইচ্ছা করলে কাউকে দানও করতে পারবে। কেননা, নীরবতা অবলম্বনকারী নিজের হিস্সার ব্যাপারে আজাদকারীকে জামিন বানাতে পারবে না। কারণ, আজাদকারী তো অসচ্ছল। আবার গোলামের মাধ্যমেও উপার্জন করতে পারবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে গোলাম কোনো অপরাধ করেনি এবং আজাদ করার ক্ষেত্রে তার কোনো দখলও ছিল না। গোলামের অজ্ঞাতেই মনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছে। আবার পুরো গোলামকে স্বাধীন করে দেওয়ারও সুযোগ নেই। কেননা, এতে নীরবতা অবলম্বনকারী মনিবের ক্ষতি হবে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি তা-ই সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, নীরবতা অবলম্বনকারীর অংশে তার মালিকানা অক্ষত থাকবে এবং এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন।

قَوْلُهُ قُلْنَا إِلَى الْإِسْتِسْعَاءِ سَبِيْلٌ الخ : কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ বক্তব্যের উত্তর এই যে, নীরবতা অবলম্বনকারীর জন্য গোলাম থেকে উপার্জন করানোর একটি পদ্ধতি রয়েছে। কেননা, উপার্জন করার জন্য কোনো জুলুম ও অপরাধ করার প্রয়োজন নেই; বরং এই দৃষ্টিতে উপার্জন করবে যে, মনিবের অধিকার তার নিকট আবদ্ধ রয়েছে সুতরাং তার মাধ্যমে উপার্জন করানো যখন সম্ভব হলো তখন এক গোলামের মাঝে দুটি বিষয় একত্র হলো না। অর্থাৎ কিয়দংশ আজাদ হওয়ার কারণে তার একটি শক্তি হওয়া আবার কিয়দংশ আজাদ না হওয়ার কারণে শক্তি না হওয়া।

قَالَ وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلٰى صَاحِبِهٖ بِالْعِتْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيْبِهٖ مُوْسِرَيْنِ كَانَا اَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَكَذَا اِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاٰخَرُ مُعْسِرًا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعَمُ اَنَّ صَاحِبَهٗ اَعْتَقَ نَصِيْبَهٗ فَصَارَ مُكَاتَبًا فِيْ زَعْمِهٖ عِنْدَهٗ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْاِسْتِرْقَاقُ فَيُصَدَّقُ فِيْ حَقِّ نَفْسِهٖ فَيَمْتَنِعُ مِنْ اِسْتِرْقَاقِهٖ وَيَسْتَسْعِيْهِ لِاَنَّا تَيَقَّنَّا بِحَقِّ الْاِسْتِسْعَاءِ كَاذِبًا كَانَ اَوْ صَادِقًا لِاَنَّهٗ مُكَاتَبُهٗ اَوْ مَمْلُوْكُهٗ فَلِهٰذَا يَسْتَسْعِيَانِهٖ وَلَا يَخْتَلِفُ ذٰلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْاِعْسَارِ لِاَنَّ حَقَّهٗ فِي الْحَالَيْنِ فِيْ اَحَدِ شَيْئَيْنِ لِاَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهٗ وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّضْمِيْنُ لِاِنْكَارِ الشَّرِيْكِ فَتَعَيَّنَ الْاٰخَرُ وَهُوَ السِّعَايَةُ وَالْوَلَاءُ لَهُمَا لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُوْلُ عِتْقُ نَصِيْبِ صَاحِبِيْ عَلَيْهِ بِاِعْتَاقِهٖ وَوَلَاؤُهٗ لَهٗ وَعِتْقُ نَصِيْبِيْ بِالسِّعَايَةِ وَوَلَاؤُهٗ لِيْ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উভয় শরিকদার যদি অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, সে গোলাম আজাদ করে দিয়েছে, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের অনুকূলে তার অংশের অর্থ পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে– শরিকদ্বয় সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল হোক। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর একই হুকুম যদি শরিকদ্বয়ের একজন সচ্ছল আর অপরজন অসচ্ছল হয়। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকের দাবি এই যে, অপর পক্ষ তার হিস্সা আজাদ করে দিয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই উক্ত গোলাম 'মুকাতাব'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাকে গোলাম বানিয়ে রাখা তার জন্য হারাম হয়ে পড়েছে। সুতরাং তার নিজের ব্যাপারে তাকে সত্যবাদী বিবেচনা করা হবে এবং উক্ত গোলামকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তাকে বারণ করা হবে। অতঃপর গোলামকে সে দায় পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য করবে। কেননা, সে সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী, উভয় অবস্থায় তার উপার্জনে বাধ্য করার অধিকার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। কেননা, [নিজের দাবিতে সে সত্যবাদী হলে] গোলামটি তার মুকাতাব হবে। কিংবা [মিথ্যাবাদী হলে] তার মালিকানাধীন দাস হবে। সুতরাং উভয়ে তাকে উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে উক্ত হুকুম ভিন্ন হবে না। কেননা, উভয় অবস্থায় মনিবের হক দুটির যে-কোনো একটিতে স্থির হবে। [অপর শরিককে দায়বদ্ধ করা] কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার প্রতিবন্ধক নয়। এদিকে শরিকদারের অস্বীকৃতির কারণে একে জামিন করা সম্ভব নয়। সুতরাং অপর দিকটি অর্থাৎ উপার্জনে বাধ্য করার দিকটি নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর 'ওয়ালার' হক উভয়ে লাভ করবে। কেননা, উভয়ে এ দাবি করছে যে, আমার প্রতিপক্ষের হিস্সা তার মুক্তিদানের কারণে মুক্ত হয়ে গেছে এবং সে তার 'ওয়ালার' অধিকারী হয়েছে। পক্ষান্তরে আমার হিস্সার মুক্তি উপার্জনের মাধ্যমে দায় পরিশোধ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তার 'ওয়ালার' হক আমার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ الخ : মাসআলা : দুই শরিকদারের প্রত্যেকেই যদি অপরের ব্যাপারে দাবি করে যে, সে গোলাম আজাদ করে দিয়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় গোলামের উপর আবশ্যক হলো, প্রত্যেকের হিস্সাকে উপার্জন করে পরিশোধ করে দেবে– তারা উভয়ে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। এ ফয়সালা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী।

অনুরূপ হুকুম দুজনের একজন সচ্ছল আর অপরজন অসচ্ছল হলেও। এর দলিল এই যে, উভয়ের প্রত্যেকেরই দাবি হলো, অপরজন স্বীয় অংশ আজাদ করে দিয়েছে। সুতরাং তাঁর দাবি মতে, গোলাম মুকাতাব চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছে, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সুতরাং এখন এ গোলামকে একান্ত দাস বানানো সম্ভব নয়। যদিও একজনের ব্যাপারে অপরের ধারণা সঠিক নয়, তারপরেও নিজের ব্যাপারে তা যথাযোগ্য। এজন্য তাকে বলা হবে সে যেন এ গোলামকে একান্ত দাস হিসেবে ব্যবহার না করে; বরং তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। কেননা, এটা নিশ্চিত যে, সে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার রাখে– চাই সে নিজ দাবিতে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী। কারণ, সে যদি নিজ দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে গোলাম মুকাতাব হবে, আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে গোলাম নিজ অধীনস্থ দাস হিসেবে থাকবে, আর দাসের উপার্জন তার মনিবের জন্য হয়ে থাকে। এজন্য গোলাম তার মুকাতাব হবে অথবা অধীনস্থ দাস হিসেবে থাকবে। মোটকথা, উভয়ে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারবে। আর তাদের এ অধিকার সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে কোনো রকম ব্যবধান হবে না। কেননা, উভয়ের মাঝে একজন অপরের ব্যাপারে নিজ হিস্সা আজাদ করে দেওয়ার দাবি করছে। উভয় অবস্থায় দুটি বিষয়ের একটি হবে। অর্থাৎ, সচ্ছলতার অবস্থায় জরিমানা গ্রহণ করা অথবা উপার্জন করানো। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সচ্ছলতার কারণে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে কোনো বাধা নেই। আর এখানে জরিমানা নেওয়া অসম্ভব। কেননা, তার শরিক আজাদ করাকে অস্বীকার করছে; বরং তার বিপরীতে এ দাবি করছে যে, অপর শরিকই তার অংশ আজাদ করে দিয়েছে। সুতরাং জরিমানা গ্রহণ যখন অসম্ভব হলো তখন আর বাকি থাকে দ্বিতীয় বিষয়টি, আর তা হচ্ছে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা। আর এ গোলামের 'ওয়ালা' দুটো শরিকের জন্য হবে। কেননা, প্রত্যেকেই বলছে যে, অপরের অংশ সে নিজে আজাদ করার কারণে আজাদ হয়েছে। যার ওয়ালা সে নিজেই পাবে। আর আমার অংশ উপার্জন করে পরিশোধ করার কারণে আজাদ হয়েছে।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْرَأُ عَنْ سِعَايَتِهِ بِدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهِ لِاَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا اِلَّا اَنَّ الدَّعْوٰى لَمْ تَثْبُتْ لِاِنْكَارِ الْاٰخَرِ وَالْبَرَاءَةُ عَنِ السِّعَايَةِ قَدْ تَثْبُتُ لِاِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَاِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعٰى لَهُمَا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ اَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ اِذِ الْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاٰخَرُ مُعْسِرًا سَعٰى لِلْمُوْسِرِ مِنْهُمَا لِاَنَّهُ لَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلٰى صَاحِبِهِ لِاِعْسَارِهِ وَاِنَّمَا يَدَّعِيْ عَلَيْهِ السِّعَايَةَ وَلَا يَتَبَرَّأُ عَنْهُ وَلَا يَسْعٰى لِلْمُعْسِرِ مِنْهُمَا لِاَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلٰى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُوْنُ مُبَرِّئًا لِلْعَبْدِ عَنِ السِّعَايَةِ وَالْوَلَاءُ مَوْقُوْفٌ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ عِنْدَهُمَا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحِيْلُهُ عَلٰى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَتَبَرَّأُ عَنْهُ فَيَبْقٰى مَوْقُوْفًا اِلٰى اَنْ يَتَّفِقَا عَلٰى اِعْتَاقِ اَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয়ে সচ্ছল হলে গোলামের জন্য উপার্জন আবশ্যক হবে না। কেননা, শরিকদ্বয়ের উভয়ে অপর পক্ষের উপর দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবি করার মাধ্যমে গোলামকে উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। কেননা, সাহেবাইনের মতে, মুক্তিদাতার সচ্ছলতা গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করার প্রতিবন্ধক। তবে অপর পক্ষের অস্বীকারের কারণে উক্ত দাবি সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু উপার্জনের দায় থেকে মুক্ত ঘোষণা করা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটা হচ্ছে নিজেরই বিপক্ষে নিজের স্বীকৃতি। পক্ষান্তরে উভয়ে অসচ্ছল হলে গোলাম উভয়ের অনুকূলে উপার্জন করবে। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকে গোলামের বিপক্ষে দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবি করছে। আপন বক্তব্যে তারা সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যাবাদী; যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। কেননা, মুক্তিদাতা অসচ্ছল। আর যদি একজন সচ্ছল এবং অপরজন অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছল জনের অনুকূলে গোলাম উপার্জনে নিযুক্ত হবে। কেননা, অপর পক্ষ যেহেতু অসচ্ছল সেহেতু সে তার উপর দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবি করছে না; বরং গোলামের বিপক্ষে উপার্জন ও দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবি করছে– তাকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছে না। অসচ্ছল জনের অনুকূলে গোলামকে উপার্জন করতে হবে না। কেননা, যেহেতু অপর পক্ষ স্বচ্ছ, সেহেতু সে তার বিপক্ষে দায় পরিশোধের আবশ্যকতা দাবি করছে। সুতরাং গোলামকে সে উপার্জনের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত ঘোষণাকারী সাব্যস্ত হবে। সাহেবাইনের মতে, এ সকল ক্ষেত্রে 'ওয়ালার' হক মওকুফ থাকবে। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকে 'ওয়ালার' হক অপর পক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ অপর পক্ষ নিজেকে তা থেকে মুক্ত বলে দাবি করছে। সুতরাং উভয়ে কোনো একজনের মুক্তিদানের ব্যাপারে একমত হওয়া পর্যন্ত তা মওকুফ থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٌ (رح) الخ : আর এ মাসআলায় সাহেবাইন বলেছেন যে, যদি উভয় শরিক সচ্ছল হয়, তাহলে গোলামকে উপার্জন করতে হবে না। কেননা, প্রত্যেকেই গোলামকে উপার্জন থেকে মুক্ত ঘোষণা করছে। কেননা, একে অন্যের উপর জরিমানার দাবি করছে। কারণ, সাহেবাইনের মতে আজাদকারী সচ্ছল হলে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার সুযোগ থাকে না; বরং তার দাবি অপরের উপর এ কারণে সাব্যস্ত হয়নি যে, সে তা অস্বীকার করছে; আর গোলাম উপার্জন থেকে মুক্তির ঘোষণা হয়েছে। কেননা, নিজের ব্যাপারে নিজ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعٰى لَهُمَا الخ : আর যদি উভয় শরিক অসচ্ছল হয়, তাহলে উভয়ের জন্য গোলাম উপার্জন করবে। কেননা, প্রত্যেক শরিক এ গোলামের উপার্জনের দাবিদার– তারা তাদের দাবিতে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী। কারণ, আজাদকারী অসচ্ছল হওয়াতে গোলামের উপর উপার্জন আবশ্যক হওয়াটা নিশ্চিত।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مُوْسِرًا الخ : আর দুজনের একজন যদি সচ্ছল আর অপরজন অসচ্ছল হয়, তাহলে গোলাম সচ্ছল ব্যক্তির জন্য উপার্জন করবে। কেননা, সে তার শরিকের অসচ্ছলতার উপর জরিমানার দাবিদার নয়; বরং গোলামের উপর উপার্জনের দাবিদার। সুতরাং গোলাম উপার্জন থেকে মুক্ত হবে না। আর অসচ্ছল শরিকের জন্য গোলাম উপার্জন করবে না; কেননা, সে তার অপর শরিকের উপর জরিমানার দাবিদার। কারণ, শরিক তো সচ্ছল। সুতরাং অসচ্ছল শরিক গোলামকে উপার্জন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

আর সাহেবাইনের নিকট ঐ গোলামের 'ওয়ালা' সর্বাবস্থায় মওকুফ থাকবে। কেননা, প্রত্যেকেই আজাদ করার বিষয়কে অপরের উপর আরোপ করে আর অপর তা অস্বীকার করে, এ কারণে গোলামের 'ওয়ালা' মওকুফ থাকবে। যতক্ষণ তাদের কেউ আজাদ করার উপর স্বীকৃতি না দেবে। যে আজাদ করার কথা মেনে নেবে সেই 'ওয়ালা' পাবে।

وَلَوْ قَالَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ اِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ هٰذِهِ الدَّارَ غَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ دَخَلَ فَهُوَ حُرٌّ فَمَضَى الْغَدُ وَلَا يُدْرٰى دَخَلَ اَمْ لَا عُتِقَ النِّصْفُ وَسَعٰى لَهُمَا فِى النِّصْفِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَسْعٰى فِىْ جَمِيْعِ قِيْمَتِهٖ لِاَنَّ الْمَقْضٰى عَلَيْهِ بِسُقُوْطِ السِّعَايَةِ مَجْهُوْلٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهُوْلِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهٖ لَكَ عَلٰى اَحَدِنَا اَلْفُ دِرْهَمٍ فَاِنَّهٗ لَا يُقْضٰى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ كَذَا هٰذَا وَلَهُمَا اِنَّا تَيَقَّنَّا بِسُقُوْطِ نِصْفِ السِّعَايَةِ لِاَنَّ اَحَدَهُمَا حَانِثٌ بِيَقِيْنٍ وَمَعَ التَّيَقُّنِ لِسُقُوْطِ النِّصْفِ كَيْفَ يُقْضٰى بِوُجُوْبِ الْكُلِّ وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِالشُّيُوْعِ وَالتَّوْزِيْعِ كَمَا اِذَا اَعْتَقَ اَحَدَ عَبْدَيْهِ لَا بِعَيْنِهٖ اَوْ بِعَيْنِهٖ وَنَسِيَهٗ وَمَاتَ قَبْلَ التَّذَكُّرِ اَوِ الْبَيَانِ وَيَتَاَتّٰى التَّفْرِيْعُ فِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْيَسَارَ هَلْ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ اَوْ لَا يَمْنَعُهَا عَلَى الْاِخْتِلَافِ الَّذِىْ سَبَقَ .

অনুবাদ : শরিকদ্বয়ের একজন যদি বলে, অমুক গোলামটি যদি আগামীকাল এ ঘরে প্রবেশ না করে, তাহলে সে আজাদ, পক্ষান্তরে অপরজন বলে, যদি সে প্রবেশ করে, তাহলে সে আজাদ। অতঃপর আগামীকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু জানা যায়নি যে, সে প্রবেশ করেছে কিনা? তাহলে অর্ধেক অংশ আজাদ হয়ে যাবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য উভয়ের অনুকূলে উপার্জন করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের জন্যই উপার্জন করবে। কেননা, উপার্জন নিযুক্তির অধিকার রহিত হওয়ার ফয়সালা যার বিপক্ষে দেওয়া হবে, সে অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয়টি এমনই যে, অন্য একজনকে সে বলল, আমাদের দুজনের একজনের নিকট তুমি এক হাজার দিরহাম পাবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে কোনো কিছু ফয়সালা করা হবে না। সুতরাং এখানেও অনুরূপ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, উপার্জনে দায়িত্ব অর্ধেক রহিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের কাছে নিশ্চিত। কেননা, দুজনের একজনের শর্ত সুনিশ্চিতভাবেই পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আর অর্ধেকের উপার্জন সুনিশ্চিত রহিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে পূর্ণ ওয়াজিব হওয়ার ফয়সালা দেওয়া যেতে পারে? আর [মুক্ত অংশের] সার্বিকীকরণ এবং [অর্ধেক অধিকার রহিত হওয়ার বিষয়টিকে] বণ্টনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূরীভূত হবে। যেমন কেউ অনির্ধারিতভাবে দুটি গোলামের একটিকে আজাদ করল কিংবা নির্ধারিতভাবে আজাদ করার পর কোনটিকে করেছিল তা ভুলে গেল এবং স্মরণে আসার কিংবা নির্ধারণ করার পূর্বেই সে মারা গেল [তখন উভয় গোলামের অর্ধেক আজাদ হবে] এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য উভয়ে উপার্জনে নিযুক্ত হবে]। মনিবের সচ্ছলতা উপার্জনের নিযুক্তির অধিকার রহিত করে কিনা? এ সম্পর্কে যে মতভিন্নতা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত বের হবে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ الخ : দুই ব্যক্তি যদি একটি গোলামের মালিক হয়, আর তাদের একজন যদি বলে যে, গোলামটি যদি এই ঘরে আগামীকাল প্রবেশ না করে, তাহলে সে আজাদ। আর অপর শরিক বলে যে, যদি সে আগামী দিন এই ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে সে আজাদ। অতঃপর আগামীকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু গোলামটি ঘরে প্রবেশ করেছিল কিনা? তা জানা যায়নি, তাহলে এমতাবস্থায় হুকুম হলো এই যে, গোলামের অর্ধেক আজাদ হয়ে যাবে, আর বাকি অর্ধেকের জন্য গোলাম উপার্জন করে উভয় মনিবকে বণ্টন করে দেবে। ফলে সে পূর্ণভাবে আজাদ হয়ে যাবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলাম তার পূর্ণ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে, তবে শর্ত হলো, উভয় মনিব অসচ্ছল হতে হবে। আর যদি উভয়জন সচ্ছল হয় তাহলে কারো জন্য উপার্জন করবে না। আর যদি একজন সচ্ছল ও অপরজন অসচ্ছল হয় তাহলে সচ্ছলের অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জন করবে, আর অসচ্ছলের জন্য উপার্জন করবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمَقْضِىْ عَلَيْهِ بِسُقُوْطِ السِّعَايَةِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, উপার্জন রহিত হয়ে যাবে, সে অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত ব্যক্তির উপর কোনো হুকুম আরোপ করা যায় না। তাহলে বিষয়টি এমন হলো যে, কেউ অপরকে বলল, আমাদের মধ্যে কোনো একজনের নিকট তুমি এক হাজার টাকা পাবে। এ ক্ষেত্রে যার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্যক, সে অজ্ঞাত হওয়ার কারণে হুকুম আরোপ করা যাচ্ছে না। আলোচ্য মাসআলাও অনুরূপ

قَوْلُهُ وَلَهُمَا اِنَّا تَيَقَّنَّا بِسُقُوْطِ الخ : শায়খাইনের দলিল : আমরা অর্ধেক উপার্জন রহিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। কেননা, এ শরিকের যে-কোনো একজন নিশ্চিত শপথ ভঙ্গকারী। অর্থাৎ, ঘরে প্রবেশ করা বা না করার ব্যাপারে। এ দুটি বিষয়ের যে-কোনো একটি অবশ্যই পাওয়া গেছে। আর এক শর্ত পাওয়ার কারণে অর্ধেক গোলাম নিশ্চিত আজাদ হয়ে যাবে। আর যে অর্ধেক আজাদ হলো তার জন্য উপার্জনের প্রয়োজন নেই। সুতরাং পূর্ণ মূল্যের জন্য উপার্জনের ফয়সালা করা যুক্তিযুক্ত নয়, বিধায় অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য গোলাম উপার্জন করে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِالشُّيُوْعِ الخ : এর দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা হলো এই যে, যার জন্য উপার্জনের নির্দেশ দেওয়া হবে সে অজ্ঞাত, এ কথাটি ঠিক আছে, কিন্তু যখন আজাদকৃত অর্ধেককে দুজনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলো তখন উভয় মনিব ফয়সালার স্থানে পরিণত হলো। আর দুজনকে ফয়সালার স্থানে পরিণত করাতে কোনো অজ্ঞতা নেই। আর অজ্ঞতা যখন দূরই হয়ে গেল তখন গোলাম বাকি অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করতে কোনো বাধা রইল না। আর উপার্জিত ঐ পয়সা দুজনের মাঝে বণ্টন করে দেবে। এর একটি উদাহরণ এমন যে, কোনো এক ব্যক্তি তার দু'টি গোলামের একটিকে অনির্দিষ্টভাবে আজাদ করে দিল, অথবা একজনকে নির্দিষ্টভাবে আজাদ করল, কিন্তু সে ঐ নির্ধারিত গোলামটির কথা ভুলে গেল, আর সে বলার পূর্বে অথবা স্মরণে আসার পূর্বে মারা গেল, তাহলে এ দুই গোলামের প্রত্যেকই অর্ধেক আজাদ হবে, আর উভয়জনই বাকি অর্ধেকের জন্য উপার্জন করবে।

এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও আসে যে, সচ্ছল হওয়া উপার্জনের জন্য প্রতিবন্ধক কিনা? এ ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট প্রতিবন্ধক নয়, আর সাহেবাইনের নিকট প্রতিবন্ধক।

وَلَوْ حَلَفَا عَلٰى عَبْدَيْنِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاَحَدِهِمَا لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِاَنَّ الْمَقْضٰى عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ مَجْهُوْلٌ وَكَذٰلِكَ الْمَقْضٰى لَهٗ فَتَفَاحَشَتِ الْجَهَالَةُ فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ وَفِى الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْضٰى بِهٖ مَعْلُوْمٌ فَغَلَبَ الْمَعْلُوْمُ الْمَجْهُوْلَ وَاِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ اِبْنَ اَحَدِهِمَا عُتِقَ نَصِيْبُ الْاَبِ لِاَنَّهٗ مَلَكَ شِقْصَ قَرِيْبِهٖ وَشِرَاؤُهٗ اِعْتَاقٌ عَلٰى مَا مَرَّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلِمَ الْاٰخَرُ اَنَّهُ ابْنُ شَرِيْكِهٖ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذٰلِكَ اِذَا وَرِثَاهُ وَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ نَصِيْبَهٗ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا فِى الشِّرَاءِ يَضْمَنُ الْاَبُ نِصْفَ قِيْمَتِهٖ اِنْ كَانَ مُوْسِرًا وَاِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْاِبْنُ فِىْ نِصْفِ قِيْمَتِهٖ لِشَرِيْكِ اَبِيْهِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اِذَا مَلَكَاهُ بِهِبَةٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ وَصِيَّةٍ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلَانِ وَاَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِتْقِهٖ اَنِ اشْتَرٰى نِصْفَهٗ لَهُمَا اَنَّهٗ اَبْطَلَ نَصِيْبَ صَاحِبِهٖ بِالْاِعْتَاقِ لِاَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيْبِ اِعْتَاقٌ وَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اَجْنَبِيَّيْنِ فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهٗ ـ

অনুবাদ : যদি দুই মনিব নিজ নিজ স্বতন্ত্র মালিকানায় দুই গোলামের সম্বন্ধে অনুরূপ শর্তযুক্ত কথা বলে [আর আগামীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রবেশ করা-না করা জানা যায়নি] তাহলে দুই গোলামের একজনও আজাদ হবে না। কেননা, যার গোলাম আজাদ হওয়ার ফায়সালা করা হবে, সে অজ্ঞাত। তদ্রূপ যে গোলামের অনুকূলে আজাদ হওয়ার ফয়সালা করা হবে সেও অজ্ঞাত। ফলে অজ্ঞতার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং ফয়সালা প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে [দুই শরিকদারের] এক গোলামের ক্ষেত্রে যার অনুকূলে ফয়সালা হচ্ছে সে নির্ধারিত। ফলে নির্ধারিত ও জ্ঞাত বিষয় অজ্ঞাত বিষয়ের উপর প্রবল হয়ে যাবে। দুই ব্যক্তি যদি তাদের একজনের গোলাম পুত্রকে শরিকানায় খরিদ করে, তাহলে তার পিতার হিস্সা আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, সে তার নিকট আত্মীয়ের অংশের মালিক হয়েছে। আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিকটাত্মীয়কে খরিদ করার পরিণতি মুক্তিদান করা। আর পিতার উপর কোনো দায় সাব্যস্ত হবে না– অপরপক্ষ এ কথা জানুক কিংবা না জানুক যে, এ গোলাম তার শরিকদারের পুত্র। তদ্রূপ একই হুকুম হবে, যদি তারা দুজন ওয়ারিশ সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয়। অপর শরিকের অধিকার রয়েছে, ইচ্ছা করলে নিজের অংশকে সে আজাদ করে দেবে, আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচ্ছল হলে পিতা সচ্ছলতার অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জামিন হবে। পক্ষান্তরে পিতা অসচ্ছল হলে পুত্র তার পিতার শরিকদারের অনুকূলে নিজের অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। উভয়ে যদি দান বা সদকা অথবা অসিয়ত সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয় তখনও অনুরূপ মতপার্থক্য হবে। তদ্রূপ একই হুকুম হতো যদি দুজন লোক একটি গোলাম খরিদ করে, অথচ তাদের

একজন এমন শপথ করে রেখেছিল যে, যদি সে উক্ত গোলামের অর্ধেক খরিদ করে, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে সাহেবাইনের দলিল এই যে, পুত্রকে খরিদ করার মাধ্যমে পিতা অপর শরিকদারের হিস্সা নষ্ট করে দিয়েছে কেননা, মাহরাম আত্মীয়কে খরিদ করার পরিণতি মুক্তিদান। বিষয়টি এমনই হলো যে, একটি গোলাম [ঐ গোলামের] দুই অনাত্মীয়ের শরিক মালিকানায় ছিল। অতঃপর তাদের একজন নিজের অংশ আজাদ করে দিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَا عَلٰى عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ الخ : দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব গোলাম রয়েছে। এমতাবস্থায় একজন বলল যে- إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ هٰذَا الدَّارَ غَدًا فَعَبْدِيْ حُرٌّ অর্থাৎ, 'যায়েদ যদি আগামীকাল এ ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে আমার গোলাম আজাদ।' আর অপরজন বলল- إِنْ لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ هٰذِهِ الدَّارَ غَدًا فَعَبْدِيْ حُرٌّ অর্থাৎ, 'যায়েদ যদি আগামীকাল এ ঘরে প্রবেশ না করে, তাহলে আমার গোলাম আজাদ।' অতঃপর আগামীকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু যায়েদ প্রবেশ করা-না করা সম্পর্কে জানা যায়নি, তাহলে এ অবস্থায় কোনো গোলামই আজাদ হবে না। এটা সর্বসম্মত অভিমত। এর প্রমাণ এই যে, যেই মনিবের উপর ফয়সালা দেওয়া হবে যে, তার গোলাম আজাদ, সে অজ্ঞাত। এমনিভাবে যেই গোলাম আজাদ হবে, সেও অজ্ঞাত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। এ কারণে কাজি কোনো ফয়সালা দিতে পারবে না। কিন্তু এ বিষয়টি যদি এক গোলামকে কেন্দ্র করে হতো, তাহলে যে আজাদ হবে সে জ্ঞাত থাকত, শুধু অজ্ঞতা মনিবের ব্যাপারে। সুতরাং এ অবস্থায় জ্ঞাতকে অজ্ঞাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে কাজি ফয়সালা দিতে পারত।

قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ إِبْنَ اَحَدِهِمَا الخ : মাসআলা : পিতা আর অন্য এক ব্যক্তি শরিকানায় যদি গোলাম পুত্রকে ক্রয় করে, তাহলে ক্রয় করতেই পিতার হিস্সাটুকু আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, সে নিকটাত্মীয়ের এক অংশের মালিক হয়েছে। আর নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করা আজাদ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ অতিবাহিত হয়েছে- (فَصْلٌ مَنْ مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ) আর এমতাবস্থায় পিতার উপর অন্য শরিকের অংশের দায়ভার আবশ্যক হবে না- চাই অপর শরিক ছেলে হওয়ার বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানুক বা না জানুক। অনুরূপ হুকুম হলো, তারা দুজন যদি মিরাস সূত্রে পেয়ে থাকে অর্থাৎ, পিতার হিস্সা আজাদ হয়ে যাবে। এর সুরত এই হতে পারে যে, এক মহিলা তার স্বামীর পুত্রকে ক্রয় করল অতঃপর এই মহিলা মারা গেল, আর ওয়ারিশ হিসেবে রইল তার স্বামী ও ভাই, তাহলে গোলামের অর্ধেক স্বামী আর অর্ধেক তার ভাই পাবে। আর স্বামীর অংশ আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর অন্য শরিক ইচ্ছা করলে নিজ অংশ আজাদ করে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে নিজ অংশের জন্য গোলামকে উপার্জনে নিযুক্তও করতে পারে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য।

قَوْلُهُ وَقَالَا فِى الشِّرَاءِ يَضْمَنُ الْاَبُ الخ : আর সাহেবাইনের মতে, মিরাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিতা যদি সচ্ছল হয়, তাহলে পুত্রের অর্ধেক মূল্যের জন্য সে জামিন হবে। আর পিতা যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে পুত্র অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জন করবে। অনুরূপ দ্বিমত রয়েছে যদি পিতা এবং অন্য শরিক হিবা সূত্রে পুত্রের মালিক হয়। তা হলো এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি পিতা ও অন্য আরেকজনকে একটি গোলাম দান করল, অথবা কেউ তার গোলাম দুজনকে সদকা করে দিল অথবা তারা দুজন অসিয়ত সূত্রে মালিক হলো ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّهُ اَبْطَلَ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ الخ : সাহেবাইনের দলিল এই যে, পিতা নিজ অংশ আজাদ করার মাধ্যমে অন্য শরিকের অংশ বিনষ্ট করে দিয়েছে। কেননা, নিকটাত্মীয় ক্রয় করাই আজাদ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি যেন এমনই হলো যে, দুই ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করে একজন তার নিজস্ব অংশ আজাদ করে দিল। সাহেবাইনের নিকট আজাদ করাটা যেহেতু বিভক্ত হতে পারে না, এ কারণে আজাদকারী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে সে তার অপর শরিকের জামিন হবে। আর যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে বাকি অর্ধেকের জন্য গোলাম উপার্জন করবে।

وَلَهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ كَمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ صَرِيحًا وَ دَلَالَةُ ذٰلِكَ أَنَّهُ شَارَكَهُ فِيمَا هُوَ عِلَّةُ الْعِتْقِ وَهُوَ الشِّرَاءُ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إِعْتَاقٌ حَتّٰى يَخْرُجَ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَنَا وَ هٰذَا ضَمَانُ إِفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا حَتّٰى يَخْتَلِفَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَسَقَطَ بِالرِّضَاءِ وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ هٰذَا الطَّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْآمِرِ وَلَا يَعْلَمُ الْآمِرُ بِمِلْكِهِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, অপর শরিকদার তো [যৌথ খরিদির সময় প্রকারান্তরে] প্রতিপক্ষ কর্তৃক তার হিস্সা নষ্ট করার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছে। সুতরাং সে পিতাকে জামিন বানাতে পারে না। যেমন পারে না যদি সে অনাত্মীয় শরিকদারকে তার হিস্সা আজাদ করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়। আর নিজের হিস্সা নষ্ট করার ব্যাপারে তার সম্মতির প্রমাণ এই যে, তাকে সে এমন কাজে শরিক করেছে, যা মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। কেননা, নিকটাত্মীয়কে খরিদ করার পরিণতি মুক্তিদান। এ কারণেই তো আমাদের মতে, নিকটাত্মীয়কে খরিদ করা দ্বারা সে কাফ্ফারা থেকে দায়মুক্ত হতে পারে। আর সাহেবাইনের বক্তব্যের 'প্রকাশিত বর্ণনায়' এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটা হচ্ছে অপর পক্ষের মালিকানা নষ্ট করা-জনিত ক্ষতিপূরণ। তাই সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে বিষয়টি ভিন্ন হয়। সুতরাং সম্মতি প্রকাশ পাওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণের দায় রহিত হবে। [পক্ষান্তরে মালিকানা অর্জন-জনিত ক্ষতিপূরণ হলে সম্মতির কারণে তা রহিত হবে না], আর আত্মীয়তার বিষয়টি জানা ও না জানার কারণে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত জাহিরে রেওয়ায়েত। কেননা, বিধান আবর্তিত হয় কারণকে কেন্দ্র করে। যেমন কেউ অন্য একজনকে বলল, তুমি এ খাবার খাও আর উক্ত খাদ্য আদেশদাতার মালিকানাভুক্ত, কিন্তু আদেশদাতা তার মালিকানাভুক্তির কথা জানে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, শরিক নিজ অংশ বিনষ্ট করার জন্য রাজি রয়েছে। আর রাজি থাকা অবস্থায় জুলুম হতে পারে না। সুতরাং সে পিতা থেকে জরিমানা নিতে পারবে না। যেমন দুই শরিকের একজন অপরজনকে নিজ ইচ্ছায় নিজ অংশ আজাদ করার অনুমতি প্রদান করে দিল। আলোচ্য মাসআলায় অপর শরীক নিজ অংশ বিনষ্টের ব্যাপারে রাজি থাকার প্রমাণ হলো, অপর শরীক গোলামের পিতার সাথে এমন ব্যাপারে শরিক হলো, যা পিতার অংশ আজাদ হওয়ার কারণ।

এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো এই যে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) নিকটাত্মীয় ক্রয়কে আজাদ হওয়ার কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। মূলত তা নয়; বরং ক্রয় করাটি হলো মালিক হওয়ার কারণ, আর মালিক হওয়াটি হলো আজাদ হওয়ার কারণ। তাহলে ক্রয় করাটি আজাদ হওয়ার সরাসরি কারণ নয়; বরং কারণের কারণ। তবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) সরাসরি কারণ, বলাতেও যে মারাত্মক ভুল হয়েছে, তা বলা যাবে না। কেননা, হুকুমকে যেভাবে কারণের দিকে সম্পর্কিত করা যায় অনুরূপ কারণের কারণের দিকেও করা যায়। যাই হোক নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করলে সে আজাদ হয়ে যাবে। তাই কারো উপর যদি কাফ্ফারা আবশ্যক হয়ে থাকে, তাহলে নিকটাত্মীয় গোলাম ক্রয় করলেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের জাহিরী রায় হলো, এটা বিনষ্ট করে দেওয়ার জরিমানা; মালিক হওয়ার জরিমানা নয়, যার কারণে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে ব্যবধান হবে। মোটকথা, শরিক যখন নিজ অংশ বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাজি, তাই জরিমানার বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بَيْنَ الْعِلْمِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শরিক চাই পুত্র হওয়ার বিষয়টি জানুক বা না জানুক, উভয় অবস্থায় একই হুকুম। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে জাহিরে রেওয়ায়েত। কেননা, হুকুম নির্ভর করে কারণের উপর। যেমন কেউ অপরকে বলল যে, এই খানা খেয়ে নাও। আর সেই খানাটি নির্দেশদাতারই মালিকানা। কিন্তু সে তা জানে না যে, এটা তারই খানা নির্দেশ মতে অপরজন সেই খানা খেয়ে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় তাকে এ খানার জরিমানা দিতে হবে না। যদিও এ বিষয়ে না জানার কারণে সে রাজি ছিল না।

وَاِنْ بَدَأَ الْاَجْنَبِيُّ فَاشْتَرٰى نِصْفَهٗ ثُمَّ اشْتَرَى الْاَبُ نِصْفَهُ الْاٰخَرَ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَالْاَجْنَبِيُّ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْاَبَ لِاَنَّهٗ مَا رَضِيَ بِاِفْسَادِ نَصِيْبِهٖ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْاِبْنَ فِيْ نِصْفِ قِيْمَتِهٖ لِاِحْتِبَاسِ مَالِيَّتِهٖ عِنْدَهٗ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهٗ وَقَالَا لَا خِيَارَ لَهٗ وَيَضْمَنُ الْاَبُ نِصْفَ قِيْمَتِهٖ لِاَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا وَمَنِ اشْتَرٰى نِصْفَ اِبْنِهٖ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يَضْمَنُ اِذَا كَانَ مُوْسِرًا وَمَعْنَاهُ اِذَا اشْتَرٰى نِصْفَهٗ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلَّهٗ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهٖ شَيْئًا عِنْدَهٗ وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : যদি অনাত্মীয় লোকটি প্রথমে [অপর পক্ষের পুত্রের] অর্ধেক খরিদ করে, অতঃপর তার পিতা অবশিষ্ট অর্ধেক খরিদ করে এবং পিতা সচ্ছল হয়, তাহলে আত্মীয় শরিকদার এখতিয়ার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে সে পিতাকে জামিন বানাতে পারে। কেননা, সে তার নিজের হিস্সা [পরবর্তীতে খরিদকারী পিতা কর্তৃক] নষ্ট করার ব্যাপারে সম্মত ছিল না। আর ইচ্ছা করলে পুত্রকে তার মূল্যের অর্ধেক পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য করতে পারে। কেননা, তার অর্থ গোলামের নিকট আবদ্ধ রয়েছে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা, তাঁর মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার পথে প্রতিবন্ধক নয়। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তার কোনো এখতিয়ার থাকবে না এবং পিতা অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য জামিন হবে। কেননা, তাঁদের মতে মুক্তিদাতার সচ্ছলতা উপার্জনে বাধ্য করার পথে প্রতিবন্ধক। কেউ যদি তার গোলাম পুত্রের অর্ধেক খরিদ করে আর সে সচ্ছল হয় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তার উপর কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি সে সচ্ছল হয় তবে সে জামিন হবে। অর্থাৎ যদি সে পুত্রের অর্ধেক অংশ এমন ব্যক্তি হতে খরিদ করে, যে সম্পূর্ণ গোলামের মালিক ছিল। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, খরিদকারী পিতা ক্রেতাকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। এর কারণ ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ بَدَأَ الْاَجْنَبِيُّ فَاشْتَرٰى الخ : মাসআলা : প্রথমে এক অনাত্মীয় কোনো গোলামের অর্ধেক ক্রয় করল অতঃপর ঐ গোলামের পিতা বাকি অর্ধেক ক্রয় করল। আর পিতা হলো সচ্ছল, তাহলে এ অবস্থায় অনাত্মীয় ব্যক্তির এখতিয়ার হবে যে, সে ইচ্ছা করলে গোলামের পিতা থেকে অর্ধেক মূল্যের জরিমানা গ্রহণ করতে পারে। কেননা, এ ক্ষেত্রে অনাত্মীয় ব্যক্তি নিজ অংশ বিনষ্ট করার ব্যাপারে কোনোভাবেই রাজি ছিল না। আবার ইচ্ছা করলে অর্ধেক মূল্যের জন্য গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারে। কেননা, গোলামের সত্তার উপর তার মূল্য আবদ্ধ রয়েছে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সচ্ছল হওয়া উপার্জনে নিযুক্ত করার প্রতিবন্ধক নয়। আর সাহেবাইনের মতে, অনাত্মীয় গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারবে না; বরং পিতাকেই জামিন বানাবে। কেননা সাহেবাইনের মতে সচ্ছল হওয়াটা উপার্জনে নিযুক্ত করার প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهٗ وَمَنِ اشْتَرٰى نِصْفَ اِبْنِهٖ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস্ সাগীরে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি পূর্ণ একটি গোলামের মালিক। তার থেকে গোলামের পিতা অর্ধেক গোলাম ক্রয় করল এমতাবস্থায় যে, পিতা সচ্ছল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিক্রেতার জন্য পিতার উপর জরিমানা আবশ্যক হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বাকি অর্ধেক মূল্যের জন্য পিতা জামিন হবে। শর্ত হলো তার সচ্ছল হওয়া। এর বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلٰثَةِ نَفَرٍ فَدَبَّرَ اَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوْسِرٌ ثُمَّ اَعْتَقَهُ الْاٰخَرُ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَاَرَادُوا الضَّمَانَ فَلِلسَّاكِتِ اَنْ يَضْمَنَ الْمُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيْمَتِهٖ قِنًّا وَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقَ وَلِلْمُدَبِّرِ اَنْ يَضْمَنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيْمَتِهٖ مُدَبَّرًا وَلَا يَضْمَنُهُ الثُّلُثَ الَّذِىْ ضَمِنَ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا اَلْعَبْدُ كُلُّهٗ لِلَّذِىْ دَبَّرَهٗ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَيَضْمَنُ ثُلُثَىْ قِيْمَتِهٖ لِشَرِيْكَيْهِ مُوْسِرًا كَانَ اَوْ مُعْسِرًا .

অনুবাদ : আর যদি গোলাম তিনজনের শরিকানাধীন হয় এবং তাদের একজন সচ্ছল অবস্থায় গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করে অতঃপর অন্য একজন শরিকদার তাকে আজাদ করে এবং সেও সচ্ছল হয়। অতঃপর তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে চায়, তাহলে নীরব পক্ষ মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে পূর্ণ গোলাম অবস্থায় তার মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের জন্য জামিন বানাবে। মুক্তিদানকারীকে জামিন বানাতে পারবে না। পক্ষান্তরে মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুক্তিদানকারীকে মুদাব্বার অবস্থায় গোলামের মোট মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের জন্য জামিন বানাবে। কিন্তু সে নিজে যে তৃতীয়াংশের জন্য জামিন হয়েছে, তার দায় সে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর উপর আরোপ করতে পারবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সম্পূর্ণ গোলাম ঐ ব্যক্তির হবে, যে প্রথমে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে। আর সে সচ্ছল বা অসচ্ছল যাই হোক অপর দুই শরিকের অনুকূলে দুই-তৃতীয়াংশের জন্য জামিন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلٰثَةِ نَفَرٍ الخ : মাসআলা : সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সাধারণ গোলামের দুই-তৃতীয়াংশের মূল্য হয়ে থাকে মুদাব্বারের, বিধায় সাধারণ গোলামের মূল্য যদি হয় সাতাশ দিনার, তাহলে মুদাব্বার গোলামের মূল্য হবে আঠারো দিনার।

আলোচ্য মাসআলা হলো এই যে, তিন ব্যক্তি যদি এক গোলামের মালিক হয়, আর তাদের একজন যদি গোলামকে মুদাব্বার বানিয়ে দেয় আর সে সচ্ছলও বটে। আর অপর এক শরিক গোলামকে আজাদ করে দেয় এবং সেও সচ্ছল হয়। অতঃপর নীরব শরিক আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী শরিক যদি আজাদকারীর নিকট জরিমানা চায়, তাহলে নীরব শরিকের অধিকার থাকবে যে, সে মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে সাধারণ গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যের জামিন বানাবে, আর আজাদকারী শরিককে জামিন বানাবে না। আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী শরিকের অধিকার থাকবে যে, সে আজাদকারী থেকে মুদাব্বারের এক-তৃতীয়াংশের জরিমানা গ্রহণ করবে। আর নীরব শরিককে সে যে জরিমানা প্রদান করেছে, তা আজাদকারী থেকে ফেরত নিতে পারবে না। যেমন সাধারণ গোলামের মূল্য যদি হয় সাতাশ দিনার, তাহলে মুদাব্বারের মূল্য হবে আঠারো দিনার। তাই মুদাব্বারের এক-তৃতীয়াংশ ছয় দিনার হবে। আর সাধারণ গোলামের এক-তৃতীয়াংশের মূল্য নয় দিনার হবে। সারকথা হলো, মুদাব্বার ঘোষণাকারী আজাদকারী থেকে ছয় দিনার জরিমানা গ্রহণ করতে পারবে; আর নয় দিনার গ্রহণ করতে পারবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কিন্তু সাহেবাইন (র.) বলেন, যে মুদাব্বার ঘোষণা করেছিল, পূর্ণ গোলাম তারই হবে। আর পরে আজাদ করাটা বাতিল হয়ে যাবে। আর মুদাব্বার অপর দুই শরিককে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করবে- চাই সে সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল।

وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ التَّدْبِيْرَ يَتَجَزّٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا كَالْاِعْتَاقِ لِاَنَّهٗ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِهٖ فَيَكُوْنُ مُعْتَبَرًا بِهٖ وَلَمَّا كَانَ مُتَجَزِّيًا عِنْدَهٗ اِقْتَصَرَ عَلٰى نَصِيْبِهٖ وَقَدْ اَفْسَدَ بِالتَّدْبِيْرِ نَصِيْبَ الْاٰخَرَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يُدَبِّرَ نَصِيْبَهٗ اَوْ يُعْتِقَ اَوْ يُكَاتِبَ اَوْ يَضْمَنَ الْمُدَبِّرَ اَوْ يَسْتَسْعِىَ الْعَبْدَ اَوْ يَتْرُكَهٗ عَلٰى حَالِهٖ لِاَنَّ نَصِيْبَهٗ بَاقٍ عَلٰى مِلْكِهٖ فَسِدًا بِاِفْسَادِ شَرِيْكِهٖ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الْاِنْتِفَاعِ بِهٖ بَيْعًا وَهِبَةً عَلٰى مَا مَرَّ فَاِذَا اخْتَارَ اَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقُّهٗ فِيْهِ وَسَقَطَ اِخْتِيَارُ غَيْرِهٖ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبَا ضَمَانٍ تَدْبِيْرِ الْمُدَبِّرِ وَاِعْتَاقُ هٰذَا الْمُعْتِقِ غَيْرَ اَنَّ لَهٗ اَنْ يَضْمَنَ الْمُدَبِّرَ لِيَكُوْنَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ اِذْ هُوَ الْاَصْلُ حَتّٰى جُعِلَ الْغَصَبُ ضِمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلٰى اَصْلِنَا وَاَمْكَنَ ذٰلِكَ فِى التَّدْبِيْرِ لِكَوْنِهٖ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ اِلٰى مِلْكٍ وَقْتَ التَّدْبِيْرِ وَلَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِى الْاِعْتَاقِ لِاَنَّهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ مُكَاتَبٌ اَوْ حُرٌّ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْاَصْلَيْنِ وَلَابُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْمُكَاتَبِ بِفَسْخِهٖ حَتّٰى يُقْبَلَ الْاِنْتِقَالُ فَلِهٰذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرَ ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ اَنْ يَضْمَنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيْمَتِهٖ مُدَبَّرًا لِاَنَّهٗ اَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيْبَهٗ مُدَبَّرًا وَالضَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيْمَةِ الْمُتْلَفِ وَقِيْمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُثَا قِيْمَتِهٖ قِنًّا عَلٰى مَا قَالُوْا ـ

অনুবাদ : এ মাসআলার মূলভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুক্তিদানের ন্যায় মুদাব্বার ঘোষণাও বিভাজন গ্রহণ করে। আর এতে সাহেবাইন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, মুদাব্বার ঘোষণাগত মুক্তিদানের একটি [বিলম্বিত] প্রকারবিশেষ। সুতরাং একেও তার উপর কিয়াস করা হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যেহেতু মুদাব্বার বানানো বিভাজনযোগ্য সেহেতু তা তার অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যেহেতু সে মুদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে অপর দুই শরিকের অংশ নষ্ট করে দিয়েছে সেহেতু এখন উভয়ের প্রত্যেকে নিজের অংশকে হয় মুদাব্বার ঘোষণা করবে কিংবা আজাদ করে দেবে কিংবা কিতাবাত-চুক্তিতে আবদ্ধ করবে কিংবা মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে দায়বদ্ধ করবে কিংবা গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করবে কিংবা তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবে। কেননা, দুজনের প্রত্যেকের অংশ নিজ মালিকানায় বহাল রয়েছে, তবে শরিকদার কর্তৃক বিনষ্ট করার কারণে বিনষ্ট অবস্থায় রয়েছে। কেননা, বিক্রি ও দান করার মাধ্যমে ঐ গোলাম থেকে উপকৃত হওয়ার পথ তাদের জন্য সে রুদ্ধ করে দিয়েছে; যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পরবর্তী দুই শরিকের একজন যখন মুক্তিদানকেই গ্রহণ করল, তখন তার হক তাতেই নির্ধারিত হয়ে গেল এবং অন্যান্য দিক গ্রহণের এখতিয়ার রহিত হয়ে গেল। এখন [তৃতীয়] নীরব শরিকের দিকে অভিমুখী হলো ক্ষতিপূরণ গ্রহণের দুটি কারণ। প্রথমত, প্রথম শরিকের মুদাব্বার ঘোষণা, দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় শরিকের মুক্তিদান। কিন্তু সে শুধু মুদাব্বার ঘোষণাকারীকেই দায়বদ্ধ করতে পারবে, যাতে ক্ষতিপূরণটা বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ হয়। কেননা, ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সেটাই হলো আসল। এ কারণেই আমাদের মূলনীতি মোতাবেক জবরদখল-জনিত ক্ষতিপূরণকে বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর মুদাব্বার

ঘোষণার ফলে আরোপিত ক্ষতিপূরণকেই বিনিময়ভিত্তিক ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা সম্ভব। কেননা, মুদাব্বার ঘোষণার সময় উক্ত তৃতীয় শরিকের অংশটিকে এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় হস্তান্তরযোগ্য। কিন্তু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেননা, ভিন্ন দুটি মূলনীতির আলোকে আংশিক আজাদকৃত গোলাম হয় মুকাতাব অথবা স্বাধীন। আর কিতাবাত নাকচ করার জন্য মুকাতাবের সম্মতি অপরিহার্য, যাতে হস্তান্তরের উপযুক্ত হয়। এ কারণেই নীরব পক্ষ [তৃতীয় শরিক] মুদাব্বার ঘোষণাকারীকেই দায়বদ্ধ করবে। অতঃপর মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুদাব্বার অবস্থায় উক্ত গোলামের যে মূল্য তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য মুক্তিদানকারীকে দায়বদ্ধ করবে। কেননা, সে মুদাব্বার গোলামের উপর তার বিদ্যমান মালিকানাকে নষ্ট করেছে। আর ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় নষ্টকৃত বস্তুর মূল্যের ভিত্তিতে। আর ফকীহগণের বক্তব্য মতে, মুদাব্বার গোলামের মূল্য হচ্ছে নির্ভেজাল গোলামের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ التَّدْبِيْرَ يَتَجَزّٰى الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মতবিরোধের মূল ভিত্তি হলো এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুদাব্বার বানানোটা বিভাজনযোগ্য। আর সাহেবাইনের নিকট তা বিভাজনযোগ্য নয় যেমনটি ছিল আজাদ করার বিষয়ে। অর্থাৎ, সাহেবাইনের নিকট আজাদ করাটা বিভাজনযোগ্য নয় আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিভাজনযোগ্য। আর মুদাব্বার বানানোটা আজাদ করারই অংশবিশেষ, সুতরাং আজাদ করার উপরই উক্ত মাসআলা নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ مُتَجَزِّيًا عِنْدَهُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুদাব্বার করাটা যেহেতু বিভাজনযোগ্য, তাই তা শুধু মুদাব্বার ঘোষণাকারীর অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর এ ঘোষণার কারণে বাকি দুই শরিকের অংশ যেহেতু বিনষ্ট করে দিয়েছে সুতরাং ঐ দুই শরিকের প্রত্যেকেরই অধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে তারা তাদের অংশ আজাদ করে দেবে, অথবা মুদাব্বার বানাবে, অথবা মুকাতাব বানাবে, অথবা মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে জরিমানা নেবে, অথবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে, অথবা পূর্ব অবস্থায় রেখে দেবে। কেননা, প্রত্যেকের নিজস্ব অংশে মালিকানা বহাল রয়েছে, তবে এক শরিক তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে বিক্রি করা অথবা দান করার সুযোগকে বন্ধ করে দিয়েছে, যার প্রভাব অন্যান্য শরিকদের অংশেও পড়বে। আর এর সাথে আরেক শরিক আবার নিজ হিস্সা আজাদ করে দিয়েছে যা তার স্বেচ্ছাধীন ছিল তা গ্রহণ করার কারণে অন্যান্য সুযোগ যথা উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ فَتَتَوَجَّهُ لِلسَّاكِتِ سَبَبَا ضَمَانٍ تَدْبِيْرِ الْمُدَبِّرِ الخ : আর তৃতীয় শরিক, যিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন তার সামনে দুটি কারণ, দুটি পথ খুলে গেছে– একটি হলো প্রথম শরিক কর্তৃক মুদাব্বার ঘোষণা করা, আর দ্বিতীয়টি হলো অপর শরিক কর্তৃক আজাদ করা। তবে এ তৃতীয় শরিক মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে জরিমানা গ্রহণ করার অধিকার রাখবে, আজাদকারী থেকে জরিমানা গ্রহণের অধিকার রাখবে না। যাতে করে তার গৃহীত জরিমানাটা বিনিময়ের জরিমানায় পরিণত হয়। কেননা, জরিমানার ক্ষেত্রে বিনিময়ের জরিমানাই আসল। আর বিনিময়ের জরিমানা আসল হওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারা যে বস্তুর জরিমানা দেওয়া হয় ঐ বস্তুটি জরিমানা আদায়কারীর মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়। আর এটা বিনিময়ের জরিমানায়ই হয়ে থাকে। অপরাধ বা বিনষ্টকারীমূলক জরিমানায় তা পাওয়া যায় না। আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে যেই জরিমানা গ্রহণ করা হয় তা বিনিময়ের জরিমানা। এ কারণে নীরবতা অবলম্বনকারী শরিক শুধু মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকেই জরিমানা গ্রহণ করতে পারবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى جُعِلَ الْغَصَبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ الخ : আর বিনিময়ের জরিমানা যেহেতু আসল, তাই আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার জরিমানাকেও বিনিময়ের জরিমানা বলে আখ্যা দেওয়া হবে। আর এ রকম জরিমানা মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে নেওয়াই সম্ভব। কেননা, মুদাব্বার গোলাম হস্তান্তর হয়, আর আজাদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আজাদ করার সময় এ গোলাম মুকাতাব হয়ে যায়। আর সাহেবাইনের মতে গোলামটি আজাদ হয়ে যায়। আর মুকাতাব-চুক্তি ভঙ্গ করতে মুকাতাবের সম্মতির প্রয়োজন, যাতে সে হস্তান্তরযোগ্য হয়। মোটকথা, মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকেই জরিমানা গ্রহণ করা হবে। তার জরিমানা দেওয়ার পর মুদাব্বার ঘোষণাকারীর অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে আজাদকারী থেকে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মুদাব্বার হিসেবে উসুল করে নেবে। কেননা, গোলাম মুদাব্বার অবস্থায় তার অংশ বিনষ্ট হয়েছে। আর জরিমানার ক্ষেত্রে বিনষ্ট পরিমাণ জরিমানাই আবশ্যক হয়ে থাকে। আর সাধারণ গোলাম থেকে মুদাব্বারের দাম দু-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সাধারণ গোলাম থেকে এক-তৃতীয়াংশ কম হয়ে থাকে, ফকীহগণ যা বর্ণনা করেছেন।

وَلَا يَضْمَنُهُ قِيمَةُ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا وَلِهٰذَا ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِيْنِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ اَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ وَالثُّلُثُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْعَبْدَ عُتِقَ عَلٰى مِلْكِهِمَا عَلٰى هٰذَا الْمِقْدَارِ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيْرُ مُتَجَزِّيًا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِلْمُدَبِّرِ وَقَدْ اَفْسَدَ نَصِيْبَ شَرِيْكَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا فَيَضْمَنُهُ وَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَاَشْبَهَ الْاِسْتِيْلَادَ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ .

অনুবাদ : মুদাব্বার ঘোষণাকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে নীরব পক্ষের যে অংশের মালিকানা লাভ করেছিল, তার জন্য মুক্তিদানকারীকে সে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণকৃত অংশের মালিকানা মুদাব্বার ঘোষণার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সাব্যস্ত হবে। আর তা এক হিসেবে [ক্ষতিপূরণ প্রদানের দিক লক্ষ্য করে] কার্যকর, কিন্তু অন্য হিসেবে [মুদাব্বার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে] কার্যকর নয়। সুতরাং এ বিঘ্নিত মালিকানা অন্যকে দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। আর 'ওয়ালা'র হক মুক্তিদানকারী ও মুদাব্বার ঘোষণাকারী উভয়ের মাঝে তিন ভাগে বণ্টন করা হবে। দুই-তৃতীয়াংশ মুদাব্বার ঘোষণাকারী এবং এক-তৃতীয়াংশ মুক্তিদানকারীর। কেননা, গোলাম তাদেরই মালিকানাতেই এই হারে আজাদ হয়েছে। তবে সাহেবাইনের মতে, যেহেতু মুদাব্বার ঘোষণা বিভাজনযোগ্য নয়, সেহেতু সম্পূর্ণ গোলাম মুদাব্বার ঘোষণাকারীর মুদাব্বাররূপে গণ্য হবে। আর আমাদের পূর্ববর্ণিত কারণে সে অপর দুই শরিকের হিস্সা বিনষ্ট করেছে। তাই সে উভয়ের হিসাবের জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে ভিন্ন হবে না। কেননা, এটা হচ্ছে মালিকানা লাভের ক্ষতিপূরণ। সুতরাং এটা সন্তান উৎপাদনজনিত ক্ষতিপূরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো। মুক্তিদানজনিত ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটা হচ্ছে অপরাধের কারণে আরোপিত ক্ষতিপূরণ। আর 'ওয়ালা'র হক সম্পূর্ণটুকু মুদাব্বার ঘোষণাকারীর হবে। এর কারণ সুস্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ قِيمَةُ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ الخ : আর মুদাব্বার নীরবতা অবলম্বনকারীকে যে পরিমাণ জরিমানা প্রদান করেছে, আজাদকারী থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সে যখন মুদাব্বার ঘোষণা করেছে, তখনই সে জরিমানা আদায়করণ-সাপেক্ষে গোলামের মালিক হয়ে গেছে। তবে তার এ মালিকানা জরিমানা আদায়ের কারণে হয়েছে; আসল অবস্থা হিসেবে মালিক নয়। সুতরাং এ মালিকানার কারণে আজাদকারী থেকে জরিমানা গ্রহণ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُدَبِّرِ اَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ الخ : আর এ গোলামের 'ওয়ালা' আজাদকারী এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারী দুজনের মাঝে তিনভাবে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ পাবে মুদাব্বার ঘোষণাকারী, আর এক-তৃতীয়াংশ আজাদকারী। কেননা, গোলামের মালিকানা এ দুজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيْرُ مُتَجَزِّيًا الخ : আর সাহেবাইনের মূলনীতি অনুযায়ী মুদাব্বার ঘোষণা করা বিভাজনযোগ্য নয়, বিধায় মুদাব্বার ঘোষণাকারী যখনই গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে তখনই পূর্ণ গোলাম তার মুদাব্বার গোলামে পরিণত হয়েছে। আর অপর দুই শরিকের অংশ বিনষ্ট করেছে। এর বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সে তার জরিমানা প্রদান করবে। আর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার কারণে তাতে কোনো ব্যবধান হবে না। অর্থাৎ, উভয় অবস্থায় জরিমানা দিতে হবে। কারণ, এ জরিমানা মালিক হওয়ার বিনিময় হিসেবে আরোপিত হচ্ছে সুতরাং তা উম্মে ওয়ালাদ বানানোর ন্যায় হয়ে গেল। অর্থাৎ, দুই শরিকের একজন যদি দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে, তাহলে দাবিদারের উপর অপর শরিকের অর্ধেক মূল্যের জরিমানা আবশ্যক হবে। কিন্তু আজাদ করার বিষয় ভিন্ন। কেননা, তা এক অন্যায়ের জরিমানা। আর পূর্ণ 'ওয়ালা' মুদাব্বারের হবে, যা পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী সুস্পষ্ট হয়েছে।

وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَعَمَ اَحَدُهُمَا اَنَّهَا اُمُّ وَلَدٍ لِصَاحِبِهٖ وَاَنْكَرَ ذٰلِكَ الْاٰخَرُ فَهِيَ مَوْقُوْفَةٌ يَوْمًا وَيَوْمًا تَخْدِمُ لِلْمُنْكِرِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا اِنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ اِسْتَسْعَى الْجَارِيَةَ فِيْ نِصْفِ قِيْمَتِهَا ثُمَّ تَكُوْنُ حُرَّةً لَا سَبِيْلَ عَلَيْهَا لَهُمَا اَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ اِنْقَلَبَ اِقْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ كَاَنَّهُ اِسْتَوْلَدَهَا فَصَارَ كَمَا اِذَا اَقَرَّ الْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ اَنَّهُ اَعْتَقَ الْمَبِيْعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يُجْعَلُ كَاَنَّهُ اَعْتَقَ كَذَا هٰذَا فَيَمْتَنِعُ الْخِدْمَةُ وَنَصِيْبُ الْمُنْكِرِ عَلٰى مِلْكِهٖ فِي الْحُكْمِ فَيَخْرُجُ اِلَى الْاِعْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كَاُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ اِذَا اَسْلَمَتْ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صَدَقَ كَانَتِ الْخِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ وَلَوْ كَذَبَ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْخِدْمَةِ فَيَثْبُتُ مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ بِهٖ وَهُوَ النِّصْفُ وَلَا خِدْمَةَ لِلشَّرِيْكِ الشَّاهِدِ وَلَا اِسْتِسْعَاءَ لِاَنَّهُ يَتَبَرَّأُ عَنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ بِدَعْوَى الْاِسْتِيْلَادِ وَالضَّمَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ يَتَضَمَّنُ الْاِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَهٰذَا اَمْرٌ لَازِمٌ وَلَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَلَا يُمْكِنُ اَنْ يُجْعَلَ الْمُقِرُّ كَالْمُسْتَوْلِدِ.

অনুবাদ : দুই ব্যক্তির শরিকানায় যদি কোনো দাসী থাকে আর একজন দাবি করে যে, উক্ত দাসী তার প্রতিপক্ষের উম্মে ওয়ালাদ [সন্তানের মা], কিন্তু প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করে, তাহলে একদিন সে [সেবার দায়িত্ব থেকে] বিরত থাকবে। আরেকদিন অস্বীকারকারীর সেবা করবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, অস্বীকারকারী ইচ্ছা করলে দাসীকে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে, অতঃপর সে আজাদ হয়ে যাবে। তার উপরে অস্বীকারকারী শরিকের কোনো অধিকার থাকবে না। সাহেবাইনের দলিল এই যে, অপর পক্ষ যখন তার দাবিকে সত্য বলে স্বীকার করল না তখন এ স্বীকারোক্তি স্বীকারকারীর প্রতি পাল্টে যাবে, যেন সে-ই তাকে সন্তান উৎপাদনে ব্যবহার করেছে। যেমন– ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিপক্ষে দাবি করে যে, বিক্রেতা বিক্রীত দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছে, তখন সাব্যস্ত করা হয় যেন [একথা বলে] সে নিজে মুক্তিদান করেছে। এখানেও তা-ই হবে। সুতরাং সেবা গ্রহণের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর অস্বীকারকারীর অংশ আইনত তার মালিকানায় বহাল রয়েছে। সুতরাং সে উপার্জনে বাধ্য করার মাধ্যমে মুক্তিদান পর্যন্ত উপনীত হবে; যেমন– নাসরানী উম্মে ওয়ালাদ যদি ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, স্বীকারকারীর বক্তব্য যদি সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে অপর পক্ষের উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে সম্পূর্ণ সেবার অধিকার অপর পক্ষ লাভ করবে। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলে গ্রহণ করা হলে অপর পক্ষ অর্ধেক সেবার অধিকারী হবে। অর্থাৎ, অর্ধেক সেবার অধিকার নিশ্চিত। সুতরাং তা অস্বীকারকারীর অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। অন্যদিকে স্বীকারকারী অপর শরিক সেবা অধিকার পাবে না এবং উপার্জনে নিযুক্ত করারও অধিকার পাবে না। কেননা, সে সন্তান জন্মদাতা এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করে সব কিছু থেকেই অধিকারমুক্ত হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষের উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যে বংশ-সম্পর্ক স্বীকার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তা অবশ্য সাব্যস্ত স্বীকৃতি, যা প্রত্যাখ্যাত হয় না। সুতরাং স্বীকারকারী পক্ষকে সন্তান জন্মদানকারী সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ الخ : দুজনের মাঝে যদি এক দাসী শরিক থাকে, তাদের একজন দাবি করে যে, বাঁদিটা অপর পক্ষের উম্মে ওয়ালাদ, আর অপর পক্ষ তা অস্বীকার করে, তাহলে এ দাসী একদিন খেদমত করা থেকে বিরত থাকবে, আর দ্বিতীয় দিন অস্বীকারকারী মনিবের খেদমত করবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, অস্বীকারকারী ইচ্ছা করলে ঐ বাঁদিকে উপার্জনে নিযুক্ত করে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করে নেবে। আর বাঁদি যদি উপার্জন করে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করে ফেলে, তাহলে এ বাঁদি আজাদ হয়ে যাবে। আর স্বীকারকারী মনিব তার থেকে কিছুই চাইতে পারবে না।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ الخ - সাহেবাইনের দলিল : প্রতিপক্ষের দিকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর দাবি করার পর সে যখন অস্বীকার করল তখন দাবিকারীর উপরই বিষয়টি বর্তাবে। অর্থাৎ, সে যেন স্বীকার করে নিল যে, আমি উম্মে ওয়ালাদ বানিয়েছি। তাহলে বিষয়টি যেন এমন হলো যে, ক্রেতা স্বীকার করল, বিক্রেতা বিক্রি করার পূর্বেই বিক্রীত গোলামকে আজাদ করে দিয়েছিল। অথচ বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে, তাহলে এমতাবস্থায় এ গোলামটি ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রেতার অস্বীকারের কারণে আজাদ করার বিষয়টি ক্রেতার উপরই প্রত্যাবর্তন করবে। অনুরূপ আলোচ্য মাসআলায়ও হবে।

সুতরাং দাবিকারীর উপরই যখন বিষয়টি গড়িয়ে আসল তখন আর সে ঐ গোলাম থেকে খেদমত নিতে পারবে না। কেননা, তার ধারণা মোতাবেক এ দাসী অন্যের উম্মে ওয়ালাদ। আর ঐ ব্যক্তির অস্বীকারের কারণে তার অংশের মালিকানা অক্ষত রয়েছে, সুতরাং আজাদ হওয়ার জন্য দাসীকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। যেমন– খ্রিস্টান ধর্মের কোনো লোকের উম্মে ওয়ালাদ মুসলমান হয়ে গেলে তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করানো হয়ে থাকে। কেননা, মুসলমান উম্মে ওয়ালাদ খ্রিস্টানের দাসী হিসেবে থাকতে পারে না; বরং তাকে বলা হবে যে, তুমি উপার্জন করে আজাদ হয়ে যাও।

قَوْلُهُ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صَدَّقَ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো এই যে, প্রতিপক্ষের উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবিকারী যদি তার দাবিতে সত্য হতো, তাহলে অস্বীকারকারীর জন্য পূর্ণ দাসী সাব্যস্ত হয়ে যেত। সুতরাং পূর্ণভাবে তার খেদমত করতে হতো। কেননা, অপর পক্ষের দাবি হিসেবে সে তার উম্মে ওয়ালাদ। আর যদি দাবিকারীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অস্বীকারকারী শরিকের জন্য অর্ধেক খেদমত করতে হবে। কেননা, দাসীটি উভয়ের শরিকানা। সুতরাং নিশ্চিত অর্ধেক খেদমত অস্বীকারকারীর জন্য আর অপরের জন্য কোনো খেদমত করতে হবে না। সুতরাং এ দাসী একদিন অস্বীকারকারী শরিকের খেদমত করবে আর আরেক দিন বিরত থাকবে। অর্থাৎ, কারো খেদমত করবে না। আর স্বীকারকারী মনিব তাকে উপার্জনে নিযুক্তও করতে পারবে না। কেননা, তার থেকে দাসী মুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَالْاِقْرَارُ بِاُمُوْمِيَّةِ الْوَلَدِ يَتَضَمَّنُ الْاِقْرَارَ الخ : এ বাক্যের দ্বারা সাহেবাইনের দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারকথা এই যে, উম্মে ওয়ালাদ সম্পর্কে স্বীকার করাটা সন্তানের বংশ স্বীকার করাকে শামিল করে, আর এটা আবশ্যকীয় বিষয়। তাই প্রত্যাখ্যান করার দ্বারাও তা রদ হবে না। সুতরাং এখন আর এই সম্ভাবনা নেই যে, স্বীকারকারী শরিককে উম্মে ওয়ালাদকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। যেমনটি সাহেবাইন (র.) বলেছেন।

وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَاعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهَا لِأَنَّ مَالِيَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ عِنْدَهُ وَمُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَى هٰذَا الْأَصْلِ تَبْتَنِيْ عِدَّةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ أَوْرَدْنَاهَا فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ وَجْهُ قَوْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْيًا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَهٰذَا هُوَ دَلَالَةُ التَّقَوُّمِ وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ تَقَوُّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ أَلَا تَرٰى أَنَّ أُمَّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَهٰذَا اٰيَةُ التَّقَوُّمِ غَيْرَ أَنَّ قِيْمَتَهَا ثُلُثُ قِيْمَتِهَا قِنَّةً عَلٰى مَا قَالُوْا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ الْفَائِتَ مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ أَمَّا السِّعَايَةُ وَالْإِسْتِخْدَامُ فَبَاقِيَانِ .

অনুবাদ : দাসী যদি উভয় শরিকের উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যায় [যেমন– উভয়ে দাসীর সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করল] অতঃপর তাদের একজন সচ্ছল অবস্থায় নিজের অংশকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তার উপর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে না। সাহেবাইন বলেন, সে দাসীর অর্ধেক মূল্যের ক্ষতিপূরণের দায়ী হবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উম্মে ওয়ালাদ মূল্যযোগ্য সম্পদ নয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে উম্মে ওয়ালাদও মূল্যযোগ্য সম্পদ। এ মূলনীতির উপর কতিপয় মাসআলার ভিত্তি রয়েছে, যেগুলো আমি 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি। সাহেবাইনের দলিল এই যে, উম্মে ওয়ালাদের দ্বারা উপকার হাসিল করা জায়েজ রয়েছে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবায় নিয়োগ করার মাধ্যমে। আর তা মূল্যবান সম্পদ হওয়ার প্রমাণ। আর বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তার মূল্যযোগ্যতা রহিত হয় না; যেমন– মুদাব্বার গোলামের ক্ষেত্রে। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নাসরানীর উম্মে ওয়ালাদ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন উপার্জন করা তার জন্য আবশ্যক। আর এটা হলো মূল্যসম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ। অবশ্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত মতে, তার অর্থমূল্য সাধারণ দাসী অবস্থার অর্থমূল্যের এক-তৃতীয়াংশ। কেননা, এখানে বিক্রয়যোগ্য হওয়ার সুবিধা এবং মনিবের মৃত্যুর পর [ওয়ারিশদের ও পাওনাদারের অনুকূলে] উপার্জনের সুবিধা রহিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুদাব্বার গোলামের [অর্থমূল্য হচ্ছে সাধারণ দাস অবস্থার দুই-তৃতীয়াংশ। কেননা,] শুধু বিক্রয়যোগ্যতার সুবিধা রহিত হয়েছে, কিন্তু উপার্জনে বাধ্য করার এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা বহাল রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا الخ : মাসআলা : দুজনের শরিকানা এক দাসী থেকে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আর উভয় শরিক নিজ সন্তান বলে দাবি করে, তাহলে দুজনের থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে এবং এ দাসীকে দুজনের উম্মে ওয়ালাদ বলে গণ্য করা হবে। এরপর দুজনের একজন যদি উক্ত দাসীকে আজাদ করে দেয় আর সে সচ্ছল হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা

(র.)-এর রায় মোতাবেক তার উপর কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, অস্বীকারকারী মনিবের উপর অপর শরিকের অর্ধেক মূল্যের জরিমানা আবশ্যক হবে। এ দ্বিমতের ভিত্তি হলো এই কথার উপর যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদ মূল্যবান সম্পদ নয়, আর সাহেবাইনের মতে তা মূল্যবান সম্পদ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে অনেক মাসআলায় তাঁদের মাঝে দ্বিমত প্রকাশ পেয়েছে। 'কিফায়াতুল মুনতাহী' নামক গ্রন্থে যার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যেমন– দুই শরিকের একজন যদি মারা যায়, তাহলে সাহেবাইনের মতে অন্য শরিকের জন্য উম্মে ওয়ালাদ উপার্জন করবে অথচ ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে, উপার্জন করবে না। সাহেবাইনের যুক্তি হলো এই যে, উম্মে ওয়ালাদ দ্বারা মনিব উপকৃত হতে পারে, তাইতো মনিবের জন্য উম্মে ওয়ালাদের সাথে সঙ্গম করা বৈধ রয়েছে। এমনিভাবে ভাড়ায় দেওয়া জায়েজ, তার থেকে খেদমত নেওয়া জায়েজ ইত্যাদি। আর এসব বিষয় দাস-সত্তায় মালিকানা ব্যতীত সম্ভব নয়; আর মূল্যবান হওয়া ছাড়া দাস সত্তার মালিকানাও অযৌক্তিক। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, উম্মে ওয়ালাদ মূল্যবাদ সম্পদ।

قَوْلُهُ وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا الخ : এ বাক্যের দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। **প্রশ্ন:** প্রশ্নটি হলো, উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা নিষেধ। আর বিক্রি নিষেধ হওয়াটা প্রমাণ করে তা মূল্যবান না হওয়াকে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ মূল্যবান সম্পদ নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, উম্মে ওয়ালাদ বিক্রি নিষেধ হওয়াটা তা মূল্যবান না হওয়াকে আবশ্যক করে না। যেমন মুদাব্বারের বিক্রি নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও তা মূল্যবান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। তাইতো চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নাসরানীর উম্মে ওয়ালাদ যদি মুসলমান হয়ে যায় তখন উপার্জনের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। আর উম্মে ওয়ালাদের উপর উপার্জন আবশ্যক হওয়াটা প্রমাণ করে মূল্যবান সম্পদ হওয়াকে। তবে উম্মে ওয়ালাদের মূল্য সাধারণ দাসীর এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। মাশায়েখগণ এর কারণ এই ব্যক্ত করেছেন যে, তাকে বিক্রি করা এবং মনিবের মৃত্যুর পর উপার্জনে নিযুক্ত করার উপকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে মুদাব্বারের বিষয় ভিন্ন। তা হলো এই যে, তার থেকে শুধু বিক্রি করার উপকারিতা রহিত হয়ে যায়। তবে উপার্জন করানো, খেদমত নেওয়া ইত্যাদি উপকারিতা বহাল থাকে। তাই মনিবের মৃত্যুর পর মনিবের পাওনাদারের জন্য সে উপার্জন করার বিধান রয়েছে এবং মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত খেদমতও করবে।

وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ التَّقَوُّمَ بِالْإِحْرَازِ وَهِيَ مُحْرَزَةٌ لِلنَّسَبِ لَا لِلتَّقَوُّمِ وَالْإِحْرَازُ لِلتَّقَوُّمِ تَابِعٌ وَلِهٰذَا لَا تَسْعٰى لِغَرِيْمٍ وَلَا لِوَارِثٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَ هٰذَا لِأَنَّ السَّبَبَ فِيْهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْجُزْئِيَّةُ الثَّابِتَةُ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِيْ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَمَلُهُ فِيْ حَقِّ الْمِلْكِ ضَرُوْرَةَ الْاِنْتِفَاعِ فَعَمِلَ السَّبَبُ فِيْ إِسْقَاطِ التَّقَوُّمِ وَفِي الْمُدَبَّرِ يَنْعَقِدُ السَّبَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَامْتِنَاعُ الْبَيْعِ فِيْهِ لِتَحَقُّقِ مَقْصُوْدِهٖ فَافْتَرَقَا وَفِيْ أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ قَضَيْنَا بِمُكَاتَبَتِهَا عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لَا يَفْتَقِرُ وُجُوْبُهُ إِلَى التَّقَوُّمِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মূল্য সাব্যস্ত হয় অর্থ লাভের জন্য সংরক্ষণের মাধ্যমে। অথচ উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে অর্থ লাভের জন্য নয়; বরং বংশ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থ লাভের বিষয়টি এখানে গৌণ বা মূল উদ্দেশ্যের অনুগত। এ কারণেই [মনিবের মৃত্যুর পর] সে ওয়ারিশ বা পাওনাদার কারো অনুকূলে উপার্জনে বাধ্য নয়। আর মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, উম্মে ওয়ালাদের মাঝে কারণটি বর্তমানেই বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো, সন্তানের মাধ্যমে [উভয়ের মাঝে] বংশত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্পর্ক। যেমন বিবাহ বন্ধনের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সম্ভোগের প্রয়োজনের নিরিখে মালিকানা [রহিতকরণের] ক্ষেত্রে কারণটির কার্যকারিতা প্রকাশ পায়নি। সুতরাং অর্থমূল্য রহিতকরণের ক্ষেত্রে কারণটি কার্যকর। [কেননা, এক্ষেত্রে অনিবার্য কোনো প্রয়োজন নেই] আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে মনিবের মৃত্যুর পরই কারণটি সংঘটিত হয়। আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নিষিদ্ধতার কারণ হলো, মুদাব্বার ঘোষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়া। সুতরাং ক্ষেত্র দুটি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেল। আর নাসরানী মনিবের [ইসলাম গ্রহণকারিণী] উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে আমরা মুকাতাব হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত করেছি উভয় পক্ষের ক্ষতি নিরসনের জন্য। আর কিতাবাতের বিনিময় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অর্থমূল্য বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ التَّقَوُّمَ بِالْإِحْرَازِ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ঐ বস্তুর মূল্য ধার্য করা হয় যা মূল্যবান হওয়ার কারণে নিজের অধীনে রাখা হয়। অথচ উম্মে ওয়ালাদকে শুধু বংশ রক্ষার জন্যই নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, সম্পদ হিসেবে রাখা হয় না। এ কারণেই মনিবের মৃত্যুর পর সে কোনো পাওনাদার বা ওয়ারিশের জন্য উপার্জন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন; কেননা, মুদাব্বারকে বংশ সংরক্ষণের জন্য নয়; বরং সম্পদ হিসেবেই তাকে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মাঝে ব্যবধান হয়ে গেল। আর এ ব্যবধানের কারণ হলো উম্মে ওয়ালাদের মাঝে সম্পর্ক বহাল রয়েছে। অর্থাৎ, সন্তানের মাধ্যমে মনিব ও উম্মে ওয়ালাদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। হুরমতে মুসাহারায় এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে এ সম্পর্কের কারণে মালিকানা রহিত হওয়াটা সুস্পষ্ট নয়। কেননা, এখনো উম্মে ওয়ালাদ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজন তার রয়েছে। এখনই যদি সে আজাদ হয়ে যায়, তাহলে আর তাকে সাথে রাখা বৈধ হবে না। এ কারণে এ ক্ষেত্রে তার মালিকানা এখনও বহাল থাকবে। তবে মূল্য নির্ধারণকরণ হিসেবে মনিবের অধিকার রহিত হয়ে গেছে। আর মুদাব্বারের মাঝে স্বাধীন হওয়ার কারণ মৃত্যুর পর প্রকাশ পাবে, যা এখন বিদ্যমান নেই। তবে তাকে বিক্রি করা যায় না– তার কারণ হলো, মুদাব্বার ঘোষণা করার উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হতে পারে। সুতরাং এ দুজনের মাঝে ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَفِيْ أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ قَضَيْنَا الخ : তবে নাসরানীর উম্মে ওয়ালাদ সংক্রান্ত মাসআলার বিধান হলো, নাসরানীর পক্ষ থেকে সে মুকাতাব হয়ে গেছে, যেন নাসরানী বা উম্মে ওয়ালাদ কারো কোনো ক্ষতি না হয়। আর বদলে কিতাবাতের জন্য মূল্যবান হওয়া জরুরি নয়।

بَابُ عِتْقِ اَحَدِ الْعَبْدَيْنِ

وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ اِثْنَانِ فَقَالَ اَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ وَ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ عُتِقَ مِنَ الَّذِىْ اُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِهٖ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاٰخَرَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) كَذٰلِكَ اِلَّا فِى الْعَبْدِ الْاٰخِرِ فَاِنَّهٗ يُعْتَقُ رُبُعُهٗ اَمَّا الْخَارِجُ فَلِاَنَّ الْاِيْجَابَ الْاَوَّلَ دَائِرٌ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الثَّابِتِ وَهُوَ الَّذِىْ اُعِيْدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ـ

পরিচ্ছেদ : দুই গোলামের একটিকে আজাদ করা

অনুবাদ : কারো যদি তিনটি গোলাম থাকে আর তাদের দুটি তার সামনে উপস্থিত হয় আর সে বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ। অতঃপর তাদের একজন বের হয়ে যায় এবং অন্য একজন প্রবেশ করে, আর মনিব [পুনরায়] বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ, অতঃপর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পূর্বেই মনিব মারা যায়, তাহলে যার উপস্থিতিতে বক্তব্যটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে তার চার ভাগের তিন ভাগ এবং অপর গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক আজাদ হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) [প্রথম ও দ্বিতীয় গোলামের ক্ষেত্রে] একই মত প্রকাশ করেন, কিন্তু তৃতীয় গোলামের ক্ষেত্রে তাঁর মত এই যে, মাত্র এক-চতুর্থাংশ আজাদ হবে। যে গোলাম বের হয়ে গেল তার অর্ধেক আজাদ হওয়ার কারণ এই যে, প্রথম বক্তব্যটি তার এবং অবস্থানকারী গোলাম অর্থাৎ, যার উপস্থিতিতে বক্তব্যটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে এ দুজনের মাঝে আবর্তিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ كَانَ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি তিন গোলামের মালিক হয়, আর তার সামনে দুই গোলাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ। অতঃপর তাদের থেকে একজন বের হয়ে যায়, আরেকজন নিজ অবস্থানে মনিবের সামনেই বিদ্যমান থাকে, আর এমতাবস্থায় তৃতীয়জন প্রবেশ করে আর মনিব তাদেরকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ– এ কথা বলার পর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পূর্বেই মনিব মারা যায়, তাহলে পূর্ব থেকে উভয় কথার সময় বিদ্যমানকারী গোলামের এক-চতুর্থাংশ আজাদ হয়ে যাবে। আর বাকি দুই গোলামের প্রত্যেকের অর্ধেক করে আজাদ হবে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন, বাকি তাঁর মতে পরে প্রবেশকারী তৃতীয় গোলামের এক-চতুর্থাংশ আজাদ হবে।

আলোচ্য মাসআলায় যদি মনিব জীবিত থাকত, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, আপনি প্রথম বক্তব্য দ্বারা কোন গোলামকে আজাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন? যদি সে বলে যে, আমার কথার পর যে গোলাম বের হয়ে চলে গেছে, আমি তাকে উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে তার উদ্দেশ্য মোতাবেক এ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মনিবকে আবার জিজ্ঞাসা করা হবে দ্বিতীয় বক্তব্যের ব্যাখ্যা। এবারও যার কথা বলবে সে-ই আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম কথার ব্যাখ্যায় বলে যে, যেই গোলাম বিদ্যমান তাকে আজাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি, তাহলে পূর্ণভাবে আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় গোলাম প্রবেশের পর যখন বলল তখন তার অর্থ হবে পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করা এবং সংবাদ দেওয়ার অর্থ বহন করবে। আর মনিব যদি সর্বপ্রথম দ্বিতীয় কথার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন যে, আমার উদ্দেশ্য তৃতীয় গোলামকে আজাদ করা, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রথম কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে– উত্তরে যার মুক্তির কথা বলবে সে-ই আজাদ হবে।

فَاَوْجَبَ عِتْقَ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فَيُصِيبُ كُلًّا مِنْهُمَا النِّصْفُ غَيْرَ اَنَّ الثَّابِتَ اِسْتَفَادَ بِالْاِيْجَابِ الثَّانِيْ رُبْعًا اٰخَرَ لِاَنَّ الثَّانِيَ دَائِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاخِلِ فَيَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا غَيْرَ اَنَّ الثَّابِتَ اِسْتَحَقَّ نِصْفَ الْحُرِّيَّةِ بِالْاِيْجَابِ الْاَوَّلِ فَشَاعَ النِّصْفُ الْمُسْتَحَقُّ بِالثَّانِيْ فِيْ نِصْفَيْهِ فَمَا اَصَابَ الْمُسْتَحِقَّ بِالْاَوَّلِ لَغَا وَمَا اَصَابَ الْفَارِغَ بَقِيَ فَيَكُوْنُ لَهُ الرُّبْعُ فَتَمَّتْ لَهُ ثَلٰثَةُ الْاَرْبَاعِ وَلِاَنَّهُ لَوْ اُرِيْدَ هُوَ بِالثَّانِيْ يُعْتَقُ نِصْفُهُ وَلَوْ اُرِيْدَ بِهِ الدَّاخِلُ لَا يُعْتَقُ هٰذَا النِّصْفُ فَيَتَنَصَّفُ فَيُعْتَقُ مِنْهُ الرَّابِعُ بِالثَّانِيْ وَالنِّصْفُ بِالْاَوَّلِ وَاَمَّا الدَّاخِلُ فَمُحَمَّدٌ (رح) يَقُوْلُ لَمَّا دَارَ الْاِيْجَابُ الثَّانِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّابِتِ وَقَدْ اَصَابَ الثَّابِتَ مِنْهُ الرُّبْعُ فَكَذٰلِكَ يُصِيْبُ الدَّاخِلَ وَهُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا وَقَضِيَّتُهُ التَّنْصِيْفُ وَاِنَّمَا نَزَلَ اِلَى الرَّابِعِ فِيْ حَقِّ الثَّابِتِ لِاسْتِحْقَاقِهِ النِّصْفَ بِالْاِيْجَابِ الْاَوَّلِ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَا اِسْتِحْقَاقَ لِلدَّاخِلِ مِنْ قَبْلُ فَيَثْبُتُ فِيْهِ النِّصْفُ ـ

অনুবাদ : সুতরাং প্রথম বক্তব্যটি উভয়ের মাঝে সমানভাবে একটি দাস-সত্তার মুক্তিদান আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে, ফলে তা উভয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক অংশে কার্যকর হবে। তবে অবস্থানকারী দাস দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে আরো চতুর্থাংশের আজাদী অর্জন করবে। কেননা, দ্বিতীয় বক্তব্যটি তার এবং প্রবেশকারী [তৃতীয়] দাসের মাঝে আবর্তিত। সুতরাং দ্বিতীয় বক্তব্যটি উভয়ের মাঝে অর্ধেক খণ্ডিত হবে। তবে অবস্থানকারী দাস যেহেতু প্রথম বক্তব্য দ্বারাই অর্ধেক অংশের মুক্তির অধিকারী হয়েছে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে প্রাপ্য অর্ধেকের মুক্তি তার উভয় অর্ধেকে ব্যাপ্ত হবে, সেহেতু যতটুকু প্রথম বক্তব্য দ্বারা মুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে, ততটুকু অকার্যকর থাকবে। [কেননা, মুক্তকে পুনরায় মুক্তিদান সম্ভব নয়]। আর যতটুকু অমুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে, ততটুকু কার্যকর হবে। এভাবে তার অনুকূলে চতুর্থাংশের মুক্তি অর্জিত হবে এবং সর্বমোট তার তিন-চতুর্থাংশের মুক্তি সম্পন্ন হবে। তাছাড়া [দ্বিতীয় মুক্তি এই যে,] দ্বিতীয় বক্তব্যটি দ্বারা যদি তাকেই [অর্থাৎ, অবস্থানকারী দাসকেই] উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অবশিষ্ট অর্ধেক আজাদ হবে আর যদি প্রবেশকারী [তৃতীয়] দাসকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অবশিষ্ট অর্ধেক আজাদ হবে না। সুতরাং তা অর্ধাঅর্ধি হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা [অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক তথা] এক-চতুর্থাংশ আজাদ হবে। আর প্রথম বক্তব্য দ্বারা অর্ধেক আজাদ হবে। প্রবেশকারী [তৃতীয়] দাসটি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় বক্তব্যটি যেহেতু তার ও অবস্থানকারী দাসের মাঝে আবর্তিত হয়েছে। আর অবস্থানকারী দাস এই বক্তব্য থেকে চতুর্থাংশ লাভ করেছে, সেহেতু [সমতার ভিত্তিতে] প্রবেশকারী দাসও চতুর্থাংশের আজাদী লাভ করবে। শায়খাইন (র.) বলেন, দ্বিতীয় বক্তব্যটি তাদের উভয়ের মাঝে আবর্তিত। আর আবর্তনের দাবি হলো অর্ধেকীকরণ। তবে অবস্থানকারী দাস যেহেতু প্রথম বক্তব্য দ্বারা অর্ধেক অংশের মুক্তির অধিকারী হয়েছে, সেহেতু তার ক্ষেত্রে এ বক্তব্যকে চতুর্থাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে প্রবেশকারী দাসের ইতঃপূর্বে কোনো প্রাপ্য হয়নি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে অর্ধেক সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُمَا يَقُوْلَانِ اِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا الخ : শায়খাইনের দলিল হলো এই যে, প্রথম যেই দু গোলাম উপস্থিত ছিল তাদের নির্দিষ্ট কারো ব্যাপারে মনিবের পক্ষ থেকে কোনো ইঙ্গিত না থাকার কারণে দুজনই অর্ধেক অর্ধেক আজাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রেও এক গোলাম আজাদ হওয়াকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান গোলাম এবং প্রবেশকারী গোলামের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন করে দেওয়া হবে। বাকি বিদ্যমান গোলাম যেহেতু প্রথম কথার দ্বারাই অর্ধেক স্বাধীন হয়ে গেছে আর অর্ধেক দাসত্বে রয়েছে, তাই ঐ অর্ধেকের অর্ধেক আজাদ হবে। তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় কথার আলোকে বিদ্যমান গোলাম চারভাগের তিনভাগ আজাদ হয়ে যাচ্ছে, আর অপর দুজন অর্ধেক করে আজাদ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় কথার দ্বারা বিদ্যমান গোলামের যেহেতু এক-চতুর্থাংশ আজাদ হচ্ছে, তাই প্রবেশকারী গোলামেরও এক-চতুর্থাংশ আজাদ হবে।

قَالَ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قُسِمَ الثُّلُثُ عَلَى هٰذَا وَشَرْحُ ذٰلِكَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِتْقِ وَهِيَ سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَتِهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى ثَلٰثَةِ الْأَرْبَاعِ فَنَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الثَّابِتِ ثَلٰثَةُ أَسْهُمٍ وَمِنَ الْآخَرَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَيَبْلُغُ سِهَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلُّ نَفَاذِهَا الثُّلُثُ فَلَابُدَّ أَنْ يَجْعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذٰلِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَجَمِيعُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ فَيُعْتَقُ مِنَ الثَّابِتِ ثَلٰثَةٌ وَيَسْعٰى فِي أَرْبَعَةٍ وَيُعْتَقُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَيَسْعٰى فِي خَمْسَةٍ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর মনিবের এ বক্তব্য যদি মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় হয়ে থাকে [আর এ তিনটি দাস ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ না থাকে], তাহলে এক-তৃতীয়াংশকে এই হারে বণ্টন করা হবে, এর ব্যাখ্যা এই যে, আজাদকৃত হিসাবগুলো একত্রিত করা হবে। আর তা হলো সাত হিস্‌সা– শায়খাইনের মতে, কেননা, তিন-চতুর্থাংশ নির্ধারণের প্রয়োজনে আমরা প্রত্যেক দাসকে চার হিস্‌সায় ভাগ করব। অতঃপর আমাদের বক্তব্য হবে এই যে, অবস্থানকারী দাসের তিন হিস্‌সা আজাদ হবে এবং অপর দুজনের প্রত্যেকের দুই হিস্‌সা করে আজাদ হবে এভাবে আজাদকৃত হিস্‌সা সাত হবে। আর মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় আজাদ করা অসিয়তের হুকুম রাখে। আর অসিয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র হলো এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং ওয়ারিশদের হিস্‌সা তার দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। এ কারণে প্রত্যেক দাসকে সাত হিস্‌সায় ভাগ করা হবে এবং সমগ্র সম্পদ হবে একুশ ভাগ। তখন অবস্থানকারী দাসের তিন হিস্‌সা আজাদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট চার হিস্‌সার জন্য সে উপার্জনে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দুজনের প্রত্যেকের দুই হিস্‌সা আজাদ হবে এবং পাঁচ হিস্‌সার জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আলোচ্য বিষয়টি যদি মনিব মৃত্যুশয্যা অবস্থায় বলে এবং সেই অসুস্থ অবস্থায়ই মারা যায়, আর তার অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ আজাদ হওয়াকে পূর্বোল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী তিন গোলামের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ কথার ব্যাখ্যা হলো এই যে, শায়খাইনের বক্তব্যানুযায়ী আজাদকৃত অংশগুলোকে একত্র করা হবে। আর উক্ত মাসআলায় যেহেতু আমাদেরকে এক গোলামের এক-চতুর্থাংশ বের করতে হবে, তাই প্রত্যেক গোলামকে চার ভাগ করে বিদ্যমান গোলামের চার ভাগের তিন ভাগ আর বাকি দুই গোলামের দুই ভাগ করে এই মোট সাত ভাগ আজাদ হয়ে যাবে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুশয্যায় আজাদ করাটা অসিয়তের অর্থ বহন করে। তাহলে যেন মনিব ঐ গোলামদের জন্য এ পরিমাণ অসিয়ত করেছে। আর মৃত ব্যক্তির অসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের মাঝে কার্যকর হয়ে থাকে। সুতরাং সে হিসেবে ওয়ারিশদের জন্য পূর্ণ সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ রেখে দিতে হবে। আর মৃত ব্যক্তির পূর্ণ সম্পদ যেহেতু এই তিন গোলামই সুতরাং প্রত্যেক গোলামের সাত ভাগ করা হবে, বিধায় পূর্ণ সম্পদ একুশ ভাগ হবে। আর বিদ্যমান গোলাম তিন ভাগ আজাদ হয় আর বাকি চার ভাগের জন্য উপার্জন করবে। আর বাকি দুই গোলামের প্রত্যেক গোলামের দুই ভাগ আজাদ হবে আর পাঁচ ভাগের জন্য উপার্জন করতে হবে। এভাবে হিসাব করলে দুই-তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ সঠিকভাবে বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ, তিন গোলামের জন্য সাত ভাগ আর ওয়ারিশদের জন্য চৌদ্দ ভাগ হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, প্রত্যেক গোলামকে ছয় ভাগ করা হবে। কেননা, তাঁর নিকট তৃতীয় গোলামের শুধু এক অংশ আজাদ হবে। সুতরাং আজাদ হওয়ার অংশ সাত না হয়ে ছয় হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ যখন ছয় হবে, তখন পূর্ণ সম্পদ আঠারো অংশ হবে।

فَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجُمِعَتْ اِسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سِتَّةٍ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ مِنَ الدَّاخِلِ عِنْدَهُ سَهْمٌ فَنَقَصَتْ سِهَامُ الْعِتْقِ بِسَهْمٍ وَصَارَ جَمِيْعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَبَاقِي التَّخْرِيْجِ مَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ هٰذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُوْلَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبُعُهُ وَمِنْ مَهْرِ الثَّابِتَةِ ثَلٰثَةُ أَثْمَانِهِ وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ ثُمُنُهُ قِيْلَ هٰذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) خَاصَّةً وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُهُمَا أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ وَتَمَامُ تَفْرِيْعَاتِهَا فِي الزِّيَادَاتِ .

অনুবাদ : এভাবে চিন্তা করে যদি সকল হিস্‌সা একত্র করা হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ-এর হিসাব সঠিক হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রত্যেক দাসকে ছয় হিস্‌সায় ভাগ করা হবে। কেননা, তাঁর মতে প্রবেশকারী [তৃতীয়] দাসের এক হিস্‌সা আজাদ হবে। ফলে মুক্তিযোগ্য হিস্‌সা একটি কম হবে এবং সমগ্র সম্পদ আঠারো হিস্‌সায় বিভক্ত হবে। অবশিষ্ট ভাগ-বণ্টন পূর্বে বর্ণিত অনুযায়ী হবে। আর এই সম্পূর্ণ বিষয়টি যদি তালাকের ক্ষেত্রে হয় আর স্ত্রী তিনজন অসহবাসকৃতা হয় এবং স্বামী তালাকের পাত্রী নির্দিষ্ট করার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে নির্গমনকারিণীর মহর থেকে চতুর্থাংশ রহিত হবে এবং অবস্থানকারিণীর মহর থেকে তিন-অষ্টমাংশ রহিত হবে এবং প্রবেশকারিণীর মহর থেকে এক-অষ্টমাংশ রহিত হবে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। اَلزِّيَادَاتُ [আয-যিয়াদাত]-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে [মুক্তিদান ও তালাক প্রদানের] পার্থক্য এবং আনুষঙ্গিক মাসআলাসমূহ আমরা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ هٰذَا فِي الطَّلَاقِ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তির যদি তিনজন স্ত্রী থাকে, আর তিনজনই অসহবাসকৃতা হয় এমতাবস্থায় স্বামীর সামনে উপস্থিত দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে যদি বলে যে, তোমাদের একজন তালাক। অতঃপর একজন বের হওয়ার পর অপরজন স্বামীর নিকট উপস্থিত হলে স্বামী আবার বলল যে, তোমাদের একজন তালাক। উল্লেখ্য যে, সহবাসপূর্ব তালাক প্রদান করলে স্ত্রী অর্ধেক মহর প্রাপ্য হয়। সে হিসেবে তারা মহরের অধিকারী হবে, যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবে মহর বণ্টনের এ পদ্ধতি ঐ সময় কার্যকর হবে যদি স্বামী তার অস্পষ্ট কথা স্পষ্ট করার আগেই মারা যায়। কারো কারো মন্তব্য হলো, এটা কেবল ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একক অভিমত, আবার কেউ এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ আজাদ করা আর তালাক দেওয়া দুটি এক বিষয় নয়; বরং এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। তা এই যে, আজাদ করার সময় যে গোলাম উভয় বক্তব্যের সময় বিদ্যমান ছিল সে মুকাতাবের ন্যায়। কেননা, মনিব যখন অনির্দিষ্ট একজনের আজাদ হওয়ার কথা বলেছেন তখন তার নির্দিষ্ট করা সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি তা করার পূর্বেই মারা গেছেন, বিধায় দুই গোলামের প্রত্যেকেই এক হিসেবে আজাদ আর আরেক হিসেবে গোলাম। তাহলে বিদ্যমানকারী মুকাতাবের ন্যায় হলো, অতঃপর আগন্তুক ও মুকাতাবের মাঝে আজাদ হওয়ার কথা পুনরায় বলেছেন। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে প্রথম যে দুজনকে সম্বোধন করে বলেছে যে, তোমাদের একজন তালাক, আর এর দ্বারা যদি যে স্ত্রী বিদ্যমান তাকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে তৃতীয়জন আগমনের পর আবার তালাকের কথা উচ্চারণ করা হচ্ছে। আর আজনবী তৃতীয় এক মহিলাকে সম্বোধন করে– কারণ, পূর্ব বিদ্যমান স্ত্রী তো এখন আর স্ত্রী নেই, তাহলে স্বামীর দ্বিতীয় কথাটি বিশুদ্ধ হচ্ছে না। আর যদি প্রথম বক্তব্য দ্বারা যে স্ত্রী বের হয়ে গেছে তাকে উদ্দেশ্য করে, তাহলে তার দ্বিতীয় বক্তব্য সঠিক হয়। মোটকথা, তালাকের ক্ষেত্রে এক হিসেবে দ্বিতীয় বক্তব্য সঠিক হয় আরেক হিসেবে সঠিক হয় না। সুতরাং দুই মাসআলায় ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ اَحَدُكُمَا حُرٌّ فَبَاعَ اَحَدَهُمَا اَوْ مَاتَ اَوْ قَالَ لَهُ اَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِى عُتِقَ الْاٰخَرُ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْعِتْقِ اَصْلًا بِالْمَوْتِ وَلِلْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهٖ بِالْبَيْعِ وَلِلْعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالتَّدْبِيْرِ فَتَعَيَّنَ الْاٰخَرُ وَلِاَنَّهُ بِالْبَيْعِ قَصَدَ الْوُصُوْلَ اِلَى الثَّمَنِ وَبِالتَّدْبِيْرِ اِبْقَاءَ الْاِنْتِفَاعِ اِلٰى مَوْتِهٖ وَالْمَقْصُوْدَانِ يُنَافِيَانِ الْعِتْقَ الْمُلْتَزَمَ فَتَعَيَّنَ لَهُ الْاٰخَرُ دَلَالَةً وَكَذَا اِذَا اسْتَوْلَدَ اِحْدٰهُمَا لِلْمَعْنَيَيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْقَبْضِ وَبِدُوْنِهٖ وَالْمُطْلَقِ وَبِشَرْطِ الْخِيَارِ لِاَحَدِ الْمُعَاقِدَيْنِ لِاِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ وَالْمَعْنٰى مَا قُلْنَا وَالْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ مُلْحَقٌ بِهٖ فِى الْمَحْفُوْظِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَّسْلِيْمُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ لِاَنَّهُ تَمْلِيْكٌ.

অনুবাদ : কেউ যদি তার দুই গোলামকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজন আজাদ, অতঃপর দুজনের একজনকে বিক্রি করে কিংবা দুজনের একজন মারা যায় কিংবা তাকে বলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ, তাহলে অপরজন আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, মৃত্যুর কারণে উক্ত গোলাম সত্তাগত দিক থেকেই মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। তদ্রূপ বিক্রির কারণে উক্ত বক্তব্য উচ্চারণকারীর দিক থেকে মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। তদ্রূপ মুদাব্বার ঘোষণার কারণে পূর্ণ মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য অপরজন নির্ধারিত হয়ে গেল। তাছাড়া বিক্রির মাধ্যমে মনিব মূল্য লাভের ইচ্ছা করেছে এবং মুদাব্বার ঘোষণা দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত গোলামের দ্বারা উপকৃত হওয়া অব্যাহত রাখার ইচ্ছুক হয়েছে; আর এ উদ্দেশ্য দুটি অনিবার্য মুক্তির পরিপন্থি। সুতরাং [আচরণগত] প্রমাণের ভিত্তিতে অপরজন মুক্তিলাভের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। তদ্রূপ যদি দুই দাসীর একজনের গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে উপরিউক্ত দুই কারণে মুক্তিলাভের জন্য অপর দাসীটি নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ বিক্রয় শুদ্ধ হোক কিংবা অশুদ্ধ হোক এবং কবজসহ হোক কিংবা কবজ ছাড়া হোক, তদ্রূপ শর্তহীন হোক কিংবা দুপক্ষের কারো অনুকূলে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের শর্তে হোক, তাতে সিদ্ধান্তের কোনো পার্থক্য হবে না। কেননা, জামিউস সাগীর কিতাবে নিঃশর্তভাবে বিক্রয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তা-ই, যা আমরা বলেছি [অর্থাৎ, বিক্রয় দ্বারা মূল্য লাভের ইচ্ছা হয়েছে]। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করাও বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে। সমর্পণসহ দান করা ও সমর্পণসহ সদকা করা বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা, [বিক্রয়ের ন্যায়] এটাও মালিকানা প্রদান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ اَحَدُكُمَا حُرٌّ الخ : মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি তার দুই গোলামকে অনির্দিষ্টভাবে বলে যে, তোমাদের দুজনের একজন আজাদ, অতঃপর একজনের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলল, যার দ্বারা ঐ গোলাম আজাদ হওয়ার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়; যেমন– একজনকে বিক্রি করে ফেলল অথবা একজন মারা গেল অথবা একজনকে বলল যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ, তাহলে অপর গোলাম নিশ্চিতভাবে পূর্বের কথার দ্বারা আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, 'তোমাদের একজন আজাদ' এ কথা বলার পর অন্য গোলামের ব্যাপারে উক্ত কাজ করাটাই যেন মনিবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বয়ান হয়ে গেল যে, অপরজন আজাদ।

وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ لِاِمْرَأَتَيْهِ اِحْدٰكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَتْ اِحْدٰهُمَا لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ وَطِىَ اِحْدٰهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ وَلَوْ قَالَ لِاَمَتَيْهِ اِحْدٰكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَامَعَ اِحْدٰهُمَا لَمْ يُعْتَقِ الْاُخْرٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا يُعْتَقُ لِاَنَّ الْوَطْىَ لَا يَحِلُّ اِلَّا فِى الْمِلْكِ وَاِحْدٰهُمَا حُرَّةٌ فَكَانَ بِالْوَطْىِ مُسْتَبْقِيًا الْمِلْكَ فِى الْمَوْطُوْءَةِ فَتَعَيَّنَتِ الْاُخْرٰى لِزَوَالِهِ بِالْعِتْقِ كَمَا فِى الطَّلَاقِ ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ যদি দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে যে, তোমাদের একজন তালাক, অতঃপর একজন মারা যায় [তাহলে অপরজন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে]। এর কারণ আমরা বলে এসেছি। তেমনি যদি তাদের একজনের সাথে সহবাস করে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করব। যদি দুই দাসীকে লক্ষ্য করে বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ, অতঃপর দুজনের একজনের সাথে সহবাস করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অপরজন আজাদ হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, আজাদ হয়ে যাবে। তাদের দলিল এই যে, মালিকানার অধিকার ছাড়া সহবাস বৈধ নয়, অথচ দুজনের একজন তো মুক্ত। সুতরাং সহবাসের মাধ্যমে সহবাসকৃতাকে সে মালিকানায় বহাল রেখেছে বলে গণ্য হবে। আর আজাদীর মাধ্যমে মালিকানা বিলুপ্তির জন্য অপর দাসীটি নির্ধারিত হয়ে যাবে; যেমন তালাকের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ لِاِمْرَأَتَيْهِ اِحْدٰكُمَا الخ : **মাসআলা :** কোনো ব্যক্তি যদি তার দুই স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের একজন তালাক, আর এ কথা বলার পর একজন মারা যায় অথবা একজনের সাথে সহবাস করে, তাহলে এ কাজই প্রমাণ বহন করবে যে, অপরজনকেই তালাক প্রদান করেছে। আজাদ হওয়ার ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আর যদি মনিব তার দুই দাসীকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের একজন আজাদ অতঃপর একজনের সাথে সহবাস করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মনিবের এই কাজ অপর দাসী আজাদ হওয়ার প্রমাণ বহন করবে না। কিন্তু সাহেবাইন (র.) বলেন, অপরজন আজাদ হয়ে যাবে।

সাহেবাইনের দলিল হলো, নিজ মালিকানা ব্যতীত সহবাস করা বৈধ নয় সুতরাং অনির্দিষ্ট একজন আজাদ করার পর যেমন নির্দিষ্ট একজনের সাথে সহবাস করল, তখন এ সহবাসই প্রমাণ বহন করবে যে, সহবাসকৃতার মালিকানা বহাল রয়েছে, আর অপরজন আজাদ হয়ে গেছে।

وَلَهُ اَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِى الْمَوْطُوْءَةِ لِاَنَّ الْاِيْقَاعَ فِى الْمُنْكَرَةِ وَهِىَ مُعَيَّنَةٌ فَكَانَ وَطْيُهَا حَلَالًا فَلَا يُجْعَلُ بَيَانًا وَلِهٰذَا حَلَّ وَطْيُهُمَا عَلٰى مَذْهَبِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُفْتٰى بِهِ ثُمَّ يُقَالُ الْعِتْقُ غَيْرُ نَازِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ اَوْ يُقَالُ نَازِلٌ فِى الْمُنْكَرَةِ فَيَظْهَرُ فِىْ حَقِّ حُكْمٍ تَقْبَلُهُ وَالْوَطْىُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ الْاَصْلِىَّ مِنَ النِّكَاحِ الْوَلَدُ وَتَقْصُدُ الْوَلَدُ بِالْوَطْىِ يَدُلُّ عَلٰى اِسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ فِى الْمَوْطُوْءَةِ صِيَانَةً لِلْوَلَدِ اَمَّا الْاَمَةُ فَالْمَقْصُوْدُ مِنْ وَطْيِهَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ دُوْنَ الْوَلَدِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْاِسْتِبْقَاءِ۔

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, যার সাথেই সহবাস করা হবে তার মালিকানা বিদ্যমান থাকবে। কেননা, মুক্তিদাতা তো হয়েছে অনির্ধারিত দাসীর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে সহবাস হয়েছে নির্ধারিত দাসীর সাথে। সুতরাং তার সাথে সহবাস [নীতিগতভাবে] বৈধ হবে। [কেননা, নির্ধারিত দাসীতে মুক্তিদান সাব্যস্ত হয়নি]। কাজেই এটাকে ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব মতে উভয়ের সাথে সহবাস করা বৈধ। তবে এ বৈধতার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করা হয় না। অতঃপর বলা হবে যে, ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে মুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা, মুক্তির বিষয়টি ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। কিংবা বলা হবে যে, মুক্তি অনির্ধারিত দাসীর মাঝে কার্যকর। সুতরাং এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে, যা অনির্ধারিত অবস্থাকে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সহবাস তো নির্ধারিত দাসীর সাথেই যুক্ত রয়েছে। তালাকের বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ যেখানে এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস অন্য স্ত্রীর তালাকের জন্য প্রমাণ হবে]। কেননা, বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তান লাভ। সুতরাং সহবাস দ্বারা সন্তান লাভে চেষ্টা সহবাসকৃতা স্ত্রীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছা প্রমাণ করে, যাতে সন্তান রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়; বরং যৌন চাহিদা চরিতার্থকরণ। সুতরাং দাসীর সাথে সহবাস উক্ত দাসীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার প্রমাণ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِى الْمَوْطُوْءَةِ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, যার সাথে সহবাস করেছে তার বৈধ কাজ বলে গণ্য হবে, আর এ ধরনের কাজ অপর অস্পষ্ট বিষয়ের বর্ণনাকারী হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ কথার উপর ফতোয়া নয়।

وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُ فِيهِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا وُلِدَ أَوَّلًا عُتِقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامُ عَبْدٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالٍ وَهُوَ مَا إِذَا وُلِدَتِ الْغُلَامُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اَلْأُمُّ بِالشَّرْطِ وَالْجَارِيَةُ لِكَوْنِهَا تَبْعًا لَهَا إِذِ الْأُمُّ حُرَّةٌ حِيْنَ وَلَدَتْهَا وَتَرِقُّ فِي حَالٍ وَهُوَ مَا إِذَا وُلِدَتِ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَيُعْتَقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ দাসীকে বলে যে, তুমি যে সন্তানটি প্রথম প্রসব করবে, তা যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করল, কিন্তু কোনটি প্রথম তা জানা গেল না, তাহলে মাতার এবং মেয়ের অর্ধেক মুক্ত হবে। আর ছেলেটি পূর্ণ গোলাম থাকবে। কেননা, দাসী ও তার কন্যা সন্তান উভয়ে একটি অবস্থায় অর্থাৎ ছেলেটি প্রথমে জন্ম লাভ করার অবস্থায় আজাদ বিবেচিত হবে। দাসীর আজাদী হবে শর্তের অস্তিত্ব লাভের কারণে। আর কন্যা সন্তানটি আজাদী লাভ করবে মাতার অনুবর্তিণী হিসেবে। কেননা, কন্যা প্রসবের সময় তো দাসীটি আজাদ। আর অন্য অবস্থায়, অর্থাৎ প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসবের সময় শর্তের অনুপস্থিতির কারণে দাসত্ব বহাল থাকে। সুতরাং দাসী ও কন্যা উভয়ের অর্ধেক আজাদ হবে এবং বাকি অর্ধেকের জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ الخ : অনুবাদ দ্বারাই মাসআলাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান জমানায় কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবটি দুষ্প্রাপ্য। তবে জামিউস সাগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত মাসআলার ছয়টি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে চার সুরত এখানে উল্লেখ রয়েছে, যা এ মাসআলার আলোচ্য বিষয় ছিল। আর পঞ্চম সুরত হলো দাসী-মনিব এবং কন্যা সন্তান সবাই একই কথা বলল যে, প্রথমে কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেছে। আর ষষ্ঠ সুরত হলো সবাই একমত হয়ে বলল যে, প্রথমে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে, তাহলে তার হুকুম হলো এ অবস্থায় মাতাও আজাদ হবে, আবার কন্যা সন্তানও আজাদ হবে। তবে পুত্র সন্তান আজাদ হবে না।

أَمَّا الْغُلَامُ يَرِقُّ فِي الْحَالَيْنِ فَلِهٰذَا يَكُوْنُ عَبْدًا وَإِنِ ادَّعَتِ الْأُمُّ أَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْمَوْلُوْدُ أَوَّلًا وَأَنْكَرَ الْمَوْلٰى وَالْجَارِيَةُ صَغِيْرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِيْنِ لِإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْعِتْقِ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ نَكَلَ عُتِقَتِ الْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ لِأَنَّ دَعْوَى الْأُمِّ حُرِّيَّةَ الصَّغِيْرَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِكَوْنِهَا نَفْعًا مَحْضًا فَاعْتُبِرَ النُّكُوْلُ فِيْ حَقِّ حُرِّيَّتِهِمَا فَعُتِقَتَا وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ كَبِيْرَةً وَلَمْ تَدَّعِ شَيْئًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا عُتِقَتِ الْأُمُّ بِنُكُوْلِ الْمَوْلٰى خَاصَّةً دُوْنَ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ دَعْوَى الْأُمِّ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِيْ حَقِّ الْجَارِيَةِ الْكَبِيْرَةِ وَصِحَّةُ النُّكُوْلِ تَبْتَنِيْ عَلَى الدَّعْوٰى فَلَمْ يَظْهَرْ فِيْ حَقِّ الْجَارِيَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْكَبِيْرَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِسَبْقِ وِلَادَةِ الْغُلَامِ وَالْأُمُّ سَاكِتَةٌ يَثْبُتُ عِتْقُ الْجَارِيَةِ بِنُكُوْلِ الْمَوْلٰى دُوْنَ الْأُمِّ لِمَا قُلْنَا وَالتَّحْلِيْفُ عَلَى الْعِلْمِ فِيْمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ اِسْتِحْلَافٌ عَلٰى فِعْلِ الْغَيْرِ وَبِهٰذَا الْقَدْرِ يُعْرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوْهِ فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে ছেলে সন্তানটি তো উভয় অবস্থাতেই দাস থাকছে, তাই সে পূর্ণ দাস থাকবে। দাসী মাতা যদি দাবি করে যে, ছেলেটি প্রথমে জন্ম নিয়েছে আর মনিব তা অস্বীকার করে, আর কন্যা সন্তানটি ছোট [অপ্রাপ্তবয়স্ক], তাহলে কসম করার শর্তে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মনিব আজাদীর শর্ত অস্তিত্ব লাভের দাবি অস্বীকার করছে। মনিব যদি কসম করে, তাহলে কেউ আজাদ হবে না। আর কসম করতে অস্বীকার করলে দাসী ও কন্যা আজাদ হবে। কেননা, মাতার পক্ষ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার আজাদীর দাবিটি যেহেতু কন্যার জন্য শুধুমাত্র কল্যাণজনক, সেহেতু তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে এবং [দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে] উভয়ের আজাদী লাভের ব্যাপারে মনিবের কসম করতে অস্বীকৃতির বিষয়টি ধর্তব্য হবে। সুতরাং উভয়ে আজাদ হয়ে যাবে। আর কন্যা যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয় আর সে নিজে কোনো কিছু দাবি না করে আর মাসআলাটির স্বরূপও এই হয় [অর্থাৎ দাসী দাবি করে যে, ছেলেটি প্রথমে জন্ম লাভ করেছে, আর মনিব তা অস্বীকার করে], তাহলে কসমের ব্যাপারে মনিবের অস্বীকৃতির কারণে শুধু দাসী আজাদ হবে; কন্যা সন্তানটি আজাদ হবে না। কেননা, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার ব্যাপারে মাতার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। আর কসমের অস্বীকৃতির ধর্তব্যতা নির্ভর করে দাবীর উপর। সুতরাং মনিবের কসম করতে অস্বীকার করার বিষয়টি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না; আর যদি পুত্র সন্তানের প্রথম জন্ম লাভের দাবিটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা নিজেই করে থাকে আর মাতা নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে কসমের বিষয়ে মনিবের অস্বীকৃতির কারণে শুধু কন্যা আজাদ হবে– মাতা আজাদী লাভ করবে না; যার কারণ আমরা উপরে বলেছি। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মনিবকে কসম করানো হবে 'আমার জানা মতে' শব্দ দ্বারা। কেননা, এটা হচ্ছে অন্যের কর্ম সম্পর্কে কসম। মাসআলাটির অন্যান্য যে সকল সম্ভাব্যরূপ আমরা 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর হুকুম এই পরিমাণ আলোচনা দ্বারাই জানা যাবে।

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلٰى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ وَصِيَّةٍ إِسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ فِي الْعِتَاقِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدٰى نِسَائِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدٰهُنَّ وَهٰذَا بِالْإِجْمَاعِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٌ (رح) اَلشَّهَادَةُ فِي الْعِتْقِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَأَصْلُ هٰذَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلٰى عِتْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَالشَّهَادَةُ عَلٰى عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقُ الْمَنْكُوْحَةِ مَقْبُوْلَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوٰى بِالْإِتِّفَاقِ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوْفَةٌ وَإِذَا كَانَ دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْطًا عِنْدَهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّ الدَّعْوٰى مِنَ الْمَجْهُوْلِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ إِنْعَدَمَ الدَّعْوٰى أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَعَدَمُ الدَّعْوٰى لَا يُوْجِبُ خَلَلًا فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيْهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে বলেন, দুজন লোক যদি এক লোকের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করে যে, সে তার দুই গোলামের একটিকে আজাদ করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এর সাক্ষ্য বাতিল। তবে অসিয়তের ক্ষেত্রে হলে তা বাতিল হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে 'গোলাম আজাদ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর যদি তারা দুজন সাক্ষ্য দান করে যে, সে তার স্ত্রীদের একজনকে তালাক প্রদান করেছে, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং স্বামীকে স্ত্রীদের একজনকে তালাক প্রদানে বাধ্য করা হবে। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুক্তিদানের ক্ষেত্রেও প্রদত্ত সাক্ষ্য তালাকের সাক্ষ্যের অনুরূপ। এ মতপার্থক্যের মূল এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন ছাড়া গোলামের মুক্তি বিষয়ক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, আর সাহেবাইনের মতে, তা গ্রহণযোগ্য। আর দাসীর মুক্তি বিষয়ক সাক্ষ্য এবং স্ত্রীর তালাক বিষয়ক সাক্ষ্য সর্বসম্মতিক্রমেই দাবি উত্থাপন ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। এ মাসআলাটি সুপরিচিত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, গোলামের পক্ষ থেকে যখন দাবি উত্থাপনের শর্ত রয়েছে, তখন জামিউস সাগীর কিতাবে বর্ণিত মাসআলায় তা পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং সাক্ষ্য প্রদানও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সাহেবাইনের মতে দাবি উত্থাপন যেহেতু শর্ত নয়, দাবির অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে দাবির অনুপস্থিতি সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা শর্ত নয়।

وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ أَعْتَقَ إِحْدَى أَمَتَيْهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّعْوَى شَرْطًا فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَشَابَهَ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقُ الْمُبْهَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَهٰذَا كُلُّهُ إِذَا شَهِدَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ أَمَّا إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ شَهِدَا عَلَى تَدْبِيرِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ وَأَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُقْبَلُ اِسْتِحْسَانًا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ حَيْثُمَا وَقَعَ وَقَعَ وَصِيَّةً وَكَذَا الْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوْصِي وَهُوَ مَعْلُومٌ وَعَنْهُ خَلَفٌ وَهُوَ الْوَصِيُّ أَوِ الْوَارِثُ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَيِّنًا وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ قَدْ قِيلَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ وَقِيلَ تُقْبَلُ لِلشُّيُوعِ.

অনুবাদ : যদি সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যে, সে তার দুই দাসীর একটিকে আজাদ করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও দাসীর ক্ষেত্রে দাবি উত্থাপন শর্ত নয়। কেননা, দাসীর ক্ষেত্রে দাবি উত্থাপনের শর্ত না থাকার কারণ এই যে, তাতে যৌনাঙ্গ হারাম হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ফলে তা তালাকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে। আর পূর্বে আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট অনির্ধারিত মুক্তিদান যৌনাঙ্গের হারাম হওয়া সাব্যস্ত করে না। সুতরাং এটা দুটি গোলামের একটিকে আজাদ করা সম্পর্কিত সাক্ষ্য দানের মতো হলো। এ সকল সিদ্ধান্ত হবে তখন যখন তার সুস্থতার অবস্থায় সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে, সে তার দুটি গোলামের একটিকে আজাদ করেছে। কিন্তু যদি তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় এই মর্মে দুজন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার দুটি গোলামের একটিকে আজাদ করেছে। কিংবা এই মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে, সে সুস্থ অবস্থায় বা মৃত্যুকালীন অসুস্থতার অবস্থায় দুটি গোলামের একটিকে মুদাব্বার বানিয়েছে, তবে সাক্ষ্য প্রদান পর্বটি অসুস্থতার অবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মুদাব্বারের ঘোষণা যে অবস্থাতেই সম্পন্ন হোক তা অসিয়তরূপেই সম্পন্ন হবে। অদ্রূপ মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় মুক্তিদানের অর্থ হলো অসিয়ত করা। আর অসিয়তের ক্ষেত্রে অসিয়তকারীই হলো [অসিয়ত বাস্তবায়নের] বাদী পক্ষ : আর সে তো নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং তার পক্ষ থেকে একজন স্থলবর্তী রয়েছে। আর সে হচ্ছে অসী বা ওয়ারিশ। তাছাড়া [দ্বিতীয় কারণ এই যে,] মৃত্যুকালীন অসুস্থতার মুক্তিদান তার মৃত্যুর পর উভয় গোলামের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করবে। ফলে উভয়ের প্রত্যেকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিপক্ষ হবে। যদি সাক্ষী দুজন তার মৃত্যুর পর এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, লোকটি সুস্থতার অবস্থায় বলেছিল যে, তোমাদের একজন আজাদ, তাহলে কারো কারো মতে, এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না : কেননা, এটা অসিয়ত নয়। আর কারো কারো মতে, ব্যাপকতার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

* অনুবাদ দ্বারাই মাসআলাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

بَابُ الْحَلْفِ بِالْعِتْقِ

وَمَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ يَوْمَئِذٍ فَهُوَ حُرٌّ وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوْكٌ فَاشْتَرٰى مَمْلُوْكًا ثُمَّ دَخَلَ عُتِقَ لِاَنَّ قَوْلَهُ يَوْمَئِذٍ تَقْدِيْرُهُ يَوْمَ إِذْ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْفِعْلَ وَعَوَّضَهُ بِالتَّنْوِيْنِ فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخُوْلِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيْ مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفِ عَبْدٌ فَبَقِيَ عَلٰى مِلْكِهِ حَتّٰى دَخَلَ عِتْقٌ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيْ يَمِيْنِهِ يَوْمَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ لِاَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوْكِ فِيْ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَى الْجَزَاءِ تَأَخَّرَ إِلٰى وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيُعْتَقُ إِذَا بَقِيَ عَلٰى مِلْكِهِ إِلٰى وَقْتِ الدُّخُوْلِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْيَمِيْنِ۔

পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত মুক্তি

অনুবাদ : কেউ যদি বলে, যখন আমি গৃহে প্রবেশ করব তখন আমার সে দিনের মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ, অথচ শর্তারোপের সময় তার মালিকানাধীন কোনো গোলাম ছিল না, পরে সে একটি গোলাম খরিদ করল এবং এরপর গৃহে প্রবেশ করল, তাহলে ঐ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, তার বক্তব্য 'সেদিন'-এর অর্থ হলো গৃহে প্রবেশ করার দিন। সুতরাং গৃহে প্রবেশের সময় মালিকানা বিদ্যমান থাকাই হবে শর্ত। তদ্রূপ যদি শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় কোনো গোলাম থাকে, আর সে সময় পর্যন্ত তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে গৃহে প্রবেশ করল, তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। কারণ তা-ই যা আমরা বলেছি। যদি শর্তারোপের সময় 'সেদিন' শব্দটি ব্যবহার না করে, তাহলে আজাদ হবে না। কেননা, এ অবস্থায় 'আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম' দ্বারা বর্তমান মালিকানা উদ্দেশ্য হবে এবং পরিণতি হবে মালিকানাধীন গোলামের তাৎক্ষণিক মুক্তি। কিন্তু পরিণতির সাথে যখন শর্ত আরোপ করল তখন শর্তের অস্তিত্ব লাভ পর্যন্ত তা বিলম্বিত হবে। সুতরাং গৃহে প্রবেশের সময় পর্যন্ত যদি তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু শর্তারোপের পর যে গোলাম খরিদ করে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

* অনুবাদেই মাসআলাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ ذَكَرٌ فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يُعْتَقْ وَهٰذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْحَالِ وَفِيْ قِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْيَمِيْنِ إِحْتِمَالٌ لِوُجُوْدِ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَهُ وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوْكَ الْمُطْلَقَ وَالْجَنِيْنُ مَمْلُوْكٌ تَبْعًا لِلْأُمِّ لَا مَقْصُوْدًا وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوْكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُوْنَ الْأَعْضَاءِ وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ وَفَائِدَةُ التَّقْيِيْدِ بِوَصْفِ الذُّكُوْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ تَدْخُلُ الْحَامِلُ فَيَدْخُلُ الْحَمْلُ تَبْعًا لَهَا وَإِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ وَلَهُ مَمْلُوْكٌ فَاشْتَرٰى أٰخَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدٍ عُتِقَ الَّذِيْ فِيْ مِلْكِهِ يَوْمَ حَلْفٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيْقَةً يُقَالُ أَنَا أَمْلِكُ كَذَا وَكَذَا وَيُرَادُ بِهِ الْحَالُ وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ وَلِلْاِسْتِقْبَالِ بِقَرِيْنَةِ سِيْنٍ أَوْ سَوْفَ فَيَكُوْنُ مُطْلَقُهُ لِلْحَالِ فَكَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَالِ مُضَافًا إِلٰى مَا بَعْدَ الْغَدِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيْهِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ ـ

অনুবাদ : যদি বলে, আমার যত পুরুষ দাস রয়েছে তা আজাদ, অথচ তার একটি গর্ভবতী দাসী ছিল, আর সে একটি পুত্র প্রসব করল, তাহলে ঐ পুত্র আজাদ হবে না। যদি ছয় মাস বা তার পরে প্রসব করে, তাহলে তো মুক্তিলাভ না করার বিষয়টি পরিষ্কার। কেননা, উচ্চারিত শব্দটি বর্তমানবাচক আর শর্তারোপের সময় গর্ভ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, শর্তারোপের পর সর্বনিম্ন গর্ভকাল বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রূপ যদি ছয় মাসের কম সময়ে প্রসব করে। কেননা, উচ্চারিত শব্দটি পূর্ব মালিকানাধীন গোলামকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে; আর গর্ভস্থ সন্তান মায়ের অনুগামী হিসেবে মালিকানাধীন রয়েছে; স্বতন্ত্রভাবে নয়। তাছাড়া তা এক হিসেবে মায়ের অংশবিশেষ, অথচ গোলাম শব্দটি পূর্ণ সত্তাকে বুঝায়; কোনো অঙ্গকে বুঝায় না। এ কারণেই গর্ভস্থ সন্তানকে আলাদা বিক্রি করা যায় না। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করার সার্থকতা এই যে, যদি শুধু আমার মালিকানাধীন সমস্ত দাস বলে, তাহলেও গর্ভবতী দাসীও অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং তার অনুগামীরূপে গর্ভস্থ সন্তান অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি বলে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত দাস আগামী পরশু আজাদ, কিংবা যে সমস্ত ক্রীতদাসের আমি মালিক রয়েছি সেগুলো আগামী পরশু আজাদ আর অবস্থা এই যে, বক্তব্য উচ্চারণকালে তার মালিকানাধীন একটি দাস ছিল, এরপর সে অন্য একটি দাস খরিদ করল, এরপর পরশু এর আগমন হলো, তাহলে বক্তব্য উচ্চারণের দিন তার মালিকানায় যে গোলাম ছিল তা আজাদ হবে। কেননা, 'মালিক রয়েছি' কথাটা প্রকৃত বর্তমানজ্ঞাপক। সুতরাং উক্ত বক্তব্যের পরিণতি হবে আগামী পরশুর সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় বর্তমান মালিকানাধীন গোলামের মুক্তি। সুতরাং শর্তারোপের পর যা খরিদ করবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

* অনুবাদেই মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ اَمْلِكُهُ اَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِىْ وَلَهُ مَمْلُوْكٌ فَاشْتَرٰى مَمْلُوْكًا اٰخَرَ فَالَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ وَقْتَ الْيَمِيْنِ مُدَبَّرٌ وَالْاٰخَرُ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَاِنْ مَاتَ عُتِقَا مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) فِى النَّوَادِرِ يُعْتَقُ مَا كَانَ فِىْ مِلْكِهِ يَوْمَ حَلْفٍ وَلَا يُعْتَقُ مَا اسْتَفَادَ بَعْدَ يَمِيْنِهِ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ اِذَا مُتُّ فَهُوَ حُرٌّ لَهُ اَنَّ اللَّفْظَ حَقِيْقَةٌ لِلْحَالِ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ فَلَا يُعْتَقُ بِهِ مَا يَمْلِكُهُ وَلِهٰذَا صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُوْنَ الْاٰخَرِ وَلَهُمَا اَنَّ هٰذَا اِيْجَابُ عِتْقٍ وَاِيْصَاءٌ حَتّٰى اُعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ وَفِى الْوَصَايَا تُعْتَبَرُ الْحَالَةُ الْمُنْتَظَرَةُ وَالْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ .

অনুবাদ : যদি বলে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আমার মৃত্যুর পর আজাদ কিংবা যত ক্রীতদাসের আমি মালিক আমার মৃত্যুর পর তার আজাদ। তখন তার মালিকানাধীন একটি গোলাম ছিল, অতঃপর সে আরেকটি গোলাম ক্রয় করল, তাহলে শর্তারোপের সময় যে গোলাম তার মালিকানায় ছিল সেটাই শুধু মুদাব্বার হবে; দ্বিতীয়টি মুদাব্বার হবে না। আর যদি লোকটি মারা যায়, তাহলে উভয় গোলাম এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আজাদ হবে। নাওয়াদিরের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় যে গোলাম ছিল সেটাই শুধু আজাদ হবে। এরপরে যে গোলাম সে হাসিল করেছে, সেটা আজাদ হবে না। একই মতপার্থক্য হবে যদি সে বলে যে, আমি যখন মারা যাব তখন আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল এই যে, আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী উচ্চারিত শব্দটির প্রকৃত অর্থ বর্তমানের জন্য। সুতরাং [শর্তারোপের] পরবর্তীতে যে গোলামের মালিক হবে সেটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এজন্যই তো শর্তারোপকালে বিদ্যমান গোলামটি মুদাব্বার হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এই যে, উচ্চারিত বক্তব্যটি যুগপৎ মুক্তিদান ও অসিয়তকরণের সমার্থক। এ কারণেই মুদাব্বারের মুক্তির বিষয়টি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের গণ্ডিতে বিবেচিত হয়। আর অসিয়তের ক্ষেত্রে [অসিয়তকালীন] বর্তমান সময় এবং [মৃত্যু পর্যন্ত] প্রতীক্ষিত সময় উভয়টি বিবেচ্য হয়ে থাকে।

اَلَا يُرٰى اَنَّهٗ يَدْخُلُ فِى الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ مَا يَسْتَفِيْدُهٗ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَفِى الْوَصِيَّةِ لِاَوْلَادِ فُلَانٍ مَنْ يُوْلَدُ لَهٗ بَعْدَهَا وَالْاِيْجَابُ اِنَّمَا يَصِحُّ مُضَافًا اِلَى الْمِلْكِ اَوْ اِلٰى سَبَبِهٖ فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ اِيْجَابُ الْعِتْقِ يَتَنَاوَلُ الْعَبْدَ الْمَمْلُوْكَ اِعْتِبَارًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَيَصِيْرُ مُدَبَّرًا حَتّٰى لَا يَجُوْزُ بَيْعُهٗ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ اِيْصَاءٌ يَتَنَاوَلُ الَّذِىْ يَشْتَرِيْهِ اِعْتِبَارًا لِلْحَالَةِ الْمُتَرَبَّصَةِ وَهِىَ حَالَةُ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ حَالَةُ التَّمَلُّكِ اِسْتِقْبَالٌ مَحْضٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْظِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَصِيْرُ كَاَنَّهٗ قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ اَوْ كُلُّ مَمْلُوْكٍ اَمْلِكُهٗ فَهُوَ حُرٌّ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ بَعْدَ غَدٍ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ لِاَنَّهٗ تَصَرُّفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اِيْجَابُ الْعِتْقِ وَلَيْسَ فِيْهِ اِيْصَاءٌ وَالْحَالَةُ مَحْضُ اِسْتِقْبَالٍ فَافْتَرَقَا وَلَا يُقَالُ اِنَّكُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ لِاَنَّا نَقُوْلُ نَعَمْ لٰكِنْ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اِيْجَابُ عِتْقٍ وَ وَصِيَّةٍ وَاِنَّمَا لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : লক্ষ্য করছ না যে, মালের অসিয়তের ক্ষেত্রে অসিয়তের পরে অর্জিত মালও অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং অমুকের সন্তানদের জন্য অসিয়ত করার ক্ষেত্রে অসিয়তের পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে মুক্তিদানের বিষয়টি বিশুদ্ধ হবে মালিকানার সঙ্গে কিংবা মালিকানার কারণ [অর্থাৎ ক্রয়]-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায়। সুতরাং উচ্চারিত বক্তব্যটির অর্থ হলো মুক্তিদান। এ হিসেবে বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় [শর্তারোপকালে] মালিকানাধীন গোলামই শুধু অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং [অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে] উক্ত গোলামটি মুদাব্বার হবে এবং তাকে বিক্রি জায়েজ হবে না]। আর উচ্চারিত বক্তব্যটির মধ্যে অসিয়ত মর্ম রয়েছে। এ হিসেবে পরবর্তী প্রতীক্ষিত অবস্থা বিবেচনায় ঐ গোলামটিও অন্তর্ভুক্ত হবে, যাকে সে খরিদ করবে। আর প্রতীক্ষিত অবস্থা হলো মৃত্যুর অবস্থা। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পূর্বে মালিক হওয়ার অবস্থাটি সর্বতোভাবে ভবিষ্যৎ অবস্থার। তাই তা উচ্চারিত শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর [মৃত্যুর সময় যেহেতু দ্বিতীয় গোলামটি মালিকানায় ছিল, সেহেতু] ধরা হবে যেন মৃত্যুর সময় সে বলেছে, আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ। কিংবা আমি যত গোলামের মালিক তারা আজাদ। আর যদি বলে 'আগামীকাল আজাদ' তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। কেননা, এখানে কর্ম একটিই : আর তা হলো মুক্তিদানের কথা উচ্চারণ। অসিয়তের বক্তব্য তাতে নেই। আর [মালিকানা লাভের] অবস্থাটি হলো নিছক ভবিষ্যৎকাল [যা উচ্চারিত পূর্ববর্তী বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তখন মালিকানা ছিল না] সুতরাং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হয়ে গেল। এ আপত্তি করা যাবে না যে, এখানে তো তোমরা উচ্চারিত বক্তব্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালকে একত্র করেছ [অথচ একই শব্দে উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে না]। কেননা, জবাবে আমরা বলব যে, দুটি কাল একত্র করেছি ঠিকই, তবে ভিন্ন দুটি কারণে। একটি হলো মুক্তিদান এবং আর একটি অসিয়ত। আর একই কারণের ভিত্তিতে একত্র করা বৈধ নয়।

بَابُ الْعِتْقِ عَلٰى جُعْلٍ

وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهٗ عَلٰى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عُتِقَ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ اَنْ تَقُوْلَ اَنْتَ حُرٌّ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ وَاِنَّمَا يُعْتَقُ بِقَبُوْلِهٖ لِاَنَّهٗ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ اِذِ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهٗ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبُوْتُ الْحُكْمِ بِقَبُوْلِ الْعِوَضِ لِلْحَالِ كَمَا فِى الْبَيْعِ فَاِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّٰى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهٖ بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِاَنَّهٗ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِىْ وَهُوَ قِيَامُ الرِّقِّ عَلٰى مَا عُرِفَ وَالطَّلَاقُ لَفْظُ الْمَالِ يَنْتَظِمُ اَنْوَاعَهٗ مِنَ النَّقْدِ وَالْعَرْضِ وَالْحَيَوَانِ وَاِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهٖ لِاَنَّهٗ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ ـ

পরিচ্ছেদ : অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান

অনুবাদ : কেউ যদি আপন গোলামকে মালের বিনিময়ে মুক্তি দান করে আর গোলাম তা কবুল করে, তাহলে সে [কবুল করা মাত্র] আজাদ হয়ে যাবে। যেমন মনিব বলল, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তুমি আজাদ। কবুল করার দ্বারা আজাদ হয়ে যাওয়ার কারণ এই যে, এটা হচ্ছে সম্পদ এবং অসম্পদের বিনিময়। কেননা, গোলাম নিজে তার মালিক নয়। আর বিনিময়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে [প্রতিপক্ষের বিনিময়ের] দায় দেনা গ্রহণ করত সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির হুকুম বা ফল সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া [আর তা হচ্ছে মুক্তিলাভ] যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়। সুতরাং যখন সে কবুল করল তখন সে আজাদ হয়ে গেল এবং শর্তকৃত অর্থ তার জিম্মায় ঋণরূপে সাব্যস্ত হবে। তাই ঐ ঋণের ব্যাপারে কাউকে জামিনদার [কফীল] নিযুক্ত করা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কিতাবাত ও চুক্তির বিনিময় এর বিপরীত। কেননা, সেটা প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও গোলামের জিম্মায় সাব্যস্ত হচ্ছে। আর প্রতিবন্ধকটি হচ্ছে দাসত্ব বিদ্যমান থাকা। কিতাবাত অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। [উল্লিখিত বক্তব্যে]। মাল শব্দটি নিঃশর্ত ব্যবহার হওয়ার কারণে এতে সকল প্রকার মাল অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন নগদ অর্থ, দ্রব্যাদি আর পশু– যদিও তা নির্ধারিত না করা হয়। কেননা, এটা হলো যা মাল নয়, তার সাথে মালের বিনিময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهٗ عَلٰى مَالٍ الخ : جُعْل [জুউল] প্রত্যেক ঐ সম্পদ বা মালকে বলা হয়, যা কোনো বস্তুর বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়, বিনিময়ে প্রদান করা হয়। আলোচ্য মাসআলায় عَلٰى مَالٍ অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে যদি গোলাম আজাদ করা হয়– এ বাক্যে সম্পদ শব্দটি ব্যাপক। তাই যে-কোনো ধরনের সম্পদই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর মনিবের প্রস্তাব গ্রহণ করার সাথে সাথেই গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এটা এমন চুক্তি যাতে সম্পদের বিনিময়ে অসম্পদকে ধার্য করা হয়েছে। কেননা, এর অর্থ তো হচ্ছে দাসত্ব রহিতকরণ। সুতরাং এই চুক্তি দ্বারা তার হাতে সম্পদ লাভ হয়নি। [বেশির] চেয়ে বেশি বলা যায় যে, এর মাধ্যমে সে শরিয়ত স্বীকৃত একটি শক্তি [স্বাধীনতা ও মুক্তি] লাভ করেছে। কিন্তু সেটা কোনো সম্পদ নয়। তাই গোলাম তাৎক্ষণিক আজাদ হয়ে যাবে, আর যে পরিমাণ টাকার কথা মনিব উল্লেখ করেছেন, তা তার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে।

তবে কিতাবাত-চুক্তির বিষয় এর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, কিতাবাতের ক্ষেত্রে টাকা পরিশোধ করার পর আজাদ হবে।

فَشَابَهَ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصُّلْحَ مِنَ الْعَمْدِ وَكَذَا الطَّعَامُ وَالْمَكِيْلُ وَالْمَوْزُوْنُ إِذَا كَانَ مَعْلُوْمَ الْجِنْسِ وَلَا تَضُرُّهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ لِأَنَّهَا يَسِيْرَةٌ قَالَ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَأْذُوْنًا وَ ذٰلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ صَحَّ أَنَّهُ يُعْتَقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيْرَ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيْ تَعْلِيْقِ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِنْتِهَاءِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُوْنًا لِأَنَّهُ رَغَّبَهُ فِي الْإِكْتِسَابِ بِطَلَبِهِ الْأَدَاءَ مِنْهُ وَمُرَادُهُ التِّجَارَةُ دُوْنَ التَّكَدِّيْ فَكَانَ إِذْنًا لَهُ دَلَالَةً ـ

অনুবাদ : সুতরাং এটা বিবাহের ও তালাকের এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার পরে সমঝোতার সদৃশ। একই হুকুম হবে খাদ্যসামগ্রী এবং পাত্র পরিমাপিত ও বাটখারা পরিমাপিত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, যখন দ্রব্যটির প্রকার নির্ধারিত থাকে. গুণের অজ্ঞতা এক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয়। কেননা, এটা মামুলি বিষয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি দাসের মুক্তিকে মাল পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করে, তাহলে তা বৈধ হবে এবং সে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসরূপে গণ্য হবে। যেমন মনিব বলল– তুমি যদি আমাকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ কর, তাহলে তুমি আজাদ। আর বৈধ হওয়ার অর্থ এই যে, শর্তের অর্থ পরিশোধ করার পর সে আজাদ হবে। সে মুকাতাব হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা, বক্তব্যটি মুক্তির বিষয়টিকে পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। যদিও তাতে পরিণতির পর্যায়ে বিনিময়ের অর্থ রয়েছে। বিষয়টি ইনশাআল্লাহ আমরা পরে আলোচনা করব। দাসটি অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ এই যে, মনিব অর্থ পরিশোধের দাবি করে দাসকে উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর [উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে] তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করা; মজদুরিতে উদ্বুদ্ধ করা নয়। [কেননা, এটা মনিবের জন্য লজ্জাকর] সুতরাং এটা তার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদানের ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হবে।

* অনুবাদেই মাসআলাটি সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

وَاِنْ اَحْضَرَ الْمَالَ اَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلٰى قَبْضِهٖ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَمَعْنَى الْاِجْبَارِ فِيْهِ وَفِيْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ اَنَّهٗ يُنَزَّلُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِاَنَّهٗ تَصَرُّفُ يَمِيْنٍ اِذْ هُوَ تَعْلِيْقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَفْظًا وَلِهٰذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى قَبُوْلِ الْعَبْدِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَا جَبْرَ عَلٰى مُبَاشَرَةِ شُرُوْطِ الْاَيْمَانِ لِاَنَّهٗ لَا اِسْتِحْقَاقَ قَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لِاَنَّهٗ مُعَاوَضَةٌ وَالْبَدْلُ فِيْهَا وَاجِبٌ وَلَنَا اَنَّهٗ تَعْلِيْقٌ نَظَرًا اِلَى اللَّفْظِ وَمُعَاوَضَةٌ نَظَرًا اِلَى الْمَقْصُوْدِ لِاَنَّهٗ مَا عَلَّقَ عِتْقَهٗ بِالْاَدَاءِ اِلَّا لِيَحُثَّهٗ عَلٰى دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالُ الْعَبْدُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ وَالْمَوْلَى الْمَالَ بِمُقَابَلَتِهٖ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ وَلِهٰذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطَّلَاقِ فِيْ مِثْلِ هٰذَا اللَّفْظِ حَتّٰى كَانَ بَائِنًا فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيْقًا فِي الْاِبْتِدَاءِ عَمَلًا بِاللَّفْظِ وَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَوْلٰى حَتّٰى لَا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ بَيْعُهٗ وَلَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ اَحَقَّ بِمَكَاسِبِهٖ وَلَا يَسْرِيْ اِلَى الْوَلَدِ الْمَوْلُوْدِ قَبْلَ الْاَدَاءِ وَ جَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً فِي الْاِنْتِهَاءِ عِنْدَ الْاَدَاءِ دَفْعًا لِلْغُرُوْرِ عَنِ الْعَبْدِ حَتّٰى يُجْبَرُ الْمَوْلٰى عَلَى الْقَبُوْلِ.

অনুবাদ : দাস যদি শর্তকৃত অর্থ উপস্থিত করে, তাহলে বিচারক মনিবকে অর্থ গ্রহণে এবং দাসকে মুক্তিদানে বাধ্য করবেন। এ ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য হকের ক্ষেত্রে বাধ্যকরণের অর্থ হলো, অর্থ গ্রহণের সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়ে তাকে গ্রহণকারীরূপে ঘোষণা করবেন। [যদিও সে গ্রহণ না করে]। ইমাম যুফার (র.) বলেন, গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। এটাই কিয়াসের দাবি। কেননা, এটা হলো শর্তায়নমূলক বক্তব্য। কেননা, এখানে শব্দগতভাবে মুক্তিদানকে শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই গোলামের গ্রহণ করার উপর বিষয়টি নির্ভর করে না। আর তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর শর্তযুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে শর্ত সম্পাদনের ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। কেননা, শর্তের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে অপর পক্ষের কোনো হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কিতাবাত-চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটা হলো বিনিময়। আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময়রূপে সাব্যস্ত জিনিসটি আবশ্যকীয় হয়ে থাকে। আমাদের দলিল এই যে, শব্দগত দিক বিবেচনায় এটা শর্তায়নকৃত বক্তব্য, কিন্তু উদ্দেশ্য বিবেচনায় এটা বিনিময়। কেননা, মুক্তিদানকে অর্থ পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দাসকে অর্থ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করে, আর মনিব তার বিপরীতে অর্থ লাভ করতে পারে। যেমন কিতাবাত-চুক্তির ক্ষেত্রে। এ কারণেই এ ধরনের শব্দযোগে উচ্চারিত বক্তব্য তালাকের ক্ষেত্রে বিনিময়রূপে বিবেচ্য হয় এবং এভাবে প্রদত্ত তালাকটি বায়েন তালাক হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় শব্দগত দিক বিবেচনায় এবং মনিবের ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার লক্ষ্যে বক্তব্যটিকে আমরা শর্তায়ন বলে সাব্যস্ত করেছি। এ কারণেই গোলামটিকে বিক্রি করা মনিবের জন্য নিষিদ্ধ নয় এবং গোলাম তার উপার্জিত মালের ব্যাপারে মনিবের চেয়ে অধিক হকদার নয়। আর [দাসীর ক্ষেত্রে] অর্থ পরিশোধের পূর্বে তার গর্ভে জন্মলাভকারী সন্তানের উপর মুক্তিদান আরোপিত হবে না। পক্ষান্তরে পরিণতি পর্বে অর্থ পরিশোধের সময় বক্তব্যটিকে আমরা বিনিময় বলে সাব্যস্ত করেছি, যাতে গোলামের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করা যায়। এ কারণেই মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে।

فَعَلٰى هٰذَا يَدُوْرُ الْفِقْهُ وَيُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ نَظِيْرُهُ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَوْ اَدّٰى الْبَعْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُوْلِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْكُلَّ لِعَدَمِ الشَّرْطِ كَمَا اِذَا حَطَّ الْبَعْضَ وَاَدّٰى الْبَاقِيْ ثُمَّ لَوْ اَدّٰى اَلْفًا اِكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَّعْلِيْقِ رَجَعَ الْمَوْلٰى عَلَيْهِ وَعُتِقَ لِاِسْتِحْقَاقِهَا وَلَوْ كَانَ اِكْتَسَبَهَا بَعْدَهُ لَمْ يَرْجِعِ الْمَوْلٰى عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مَاذُوْنٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْاَدَاءِ مِنْهُ ثُمَّ الْاَدَاءُ فِيْ قَوْلِهِ اِنْ اَدَّيْتَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِاَنَّهُ تَخْيِيْرٌ وَفِيْ قَوْلِهِ اِذَا اَدَّيْتَ لَا يَقْتَصِرُ لِاَنَّ اِذَا تُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ بِمَنْزِلَةِ مَتٰى وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ فَالْقَبُوْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِاِضَافَةِ الْاِيْجَابِ اِلٰى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ اَنْتَ حُرٌّ غَدًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ حَيْثُ يَكُوْنُ الْقَبُوْلُ اِلَيْهِ فِي الْحَالِ لِاَنَّ اِيْجَابَ التَّدْبِيْرِ فِي الْحَالِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ لِقِيَامِ الرِّقِّ قَالُوْا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ فِيْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَاِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ الْوَارِثُ لِاَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِاَهْلٍ لِلْاِعْتَاقِ وَهٰذَا صَحِيْحٌ.

অনুবাদ : উভয় দিকের এই সমন্বয়ের উপরই ফিকহী মাসায়েল আহরণ আবর্তিত হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে বিনিময়ের শর্তে হেবা। আর গোলাম যদি আংশিক অর্থ পরিশোধ করে, তাহলে মনিবকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে, তবে সমগ্র অর্থ পরিশোধের পূর্বে মুক্তিলাভ করবে না। কেননা, শর্ত পূর্ণ হয়নি। যেমন মনিবের যদি আংশিক অর্থ রহিত করে গোলাম আংশিক অর্থ পরিশোধ করে [তাহলে সমগ্র শর্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত গোলাম মুক্তিলাভ করবে না]। আর যদি গোলাম শর্তযুক্ত বক্তব্য উচ্চারণের পূর্বে উপার্জিত এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে, তাহলে মুক্তি লাভ করবে এবং পূর্ব উপার্জিত এক হাজার দিরহামের ব্যাপারে মনিব গোলামের নিকট থেকে তা পুনরায় উসুল করবে। কেননা, সে তো এটার হকদার হয়ে আছে। পক্ষান্তরে যদি এটা পরবর্তীতে উপার্জন করে থাকে, তাহলে মনিব গোলামের কাছে রুজু করতে পারবে না। কেননা, ঐ অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সে মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে। মনিব যদি বলে, 'যদি পরিশোধ কর' তাহলে পরিশোধের বিষয়টি মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। [পরিশোধ করার পরে তুমি আজাদ]। কেননা, এ বক্তব্যের অর্থ হলো তাকে এখতিয়ার প্রদান করা। পক্ষান্তরে যদি বলে 'যখন তুমি পরিশোধ করবে' তাহলে মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে না। কেননা, 'যখন' শব্দটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি তার গোলামকে বলে, আমার মৃত্যুর পর তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ, তাহলে প্রস্তাবটি গ্রহণের সময় হবে মৃত্যুর পর। কেননা, প্রস্তাবটিকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন বলা হলো– আগামীকাল তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত। পক্ষান্তরে যদি বলে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তুমি মুদাব্বার হবে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ, প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি বর্তমানের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। কেননা, মুদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি বর্তমানের সাথে যুক্ত। তবে দাসত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। মাশায়েখগণ বলেছেন, জামিউস সাগীর কিতাবে বর্ণিত। মাসআলায় মনিবের পক্ষ থেকে গোলামটি আজাদ হবে না। যদিও মৃত্যুর পর সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, যতক্ষণ না ওয়ারিশ তাকে মুক্তি দান করে। কেননা, মৃত ব্যক্তি মুক্তিদানের অধিকারী নয়। এটাই সঠিক।

قَالَ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلٰى خِدْمَتِهِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عُتِقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ نَفْسِهِ فِىْ مَالِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) قِيْمَةُ خِدْمَتِهِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَمَّا الْعِتْقُ فَلِاَنَّهُ جَعَلَ الْخِدْمَةَ فِىْ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ عِوَضًا فَيَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِالْقَبُوْلِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَزِمَتْهُ خِدْمَةُ اَرْبَعِ سِنِيْنَ لِاَنَّهُ يَصْلُحُ عِوَضًا فَصَارَ كَمَا اِذَا اَعْتَقَهُ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْخِلَافِيَّةُ فِيْهِ بِنَاءٌ عَلٰى خِلَافِيَّةٍ اُخْرٰى وَهِىَ اَنَّ مَنْ بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّتِ الْجَارِيَةُ اَوْ هَلَكَتْ يَرْجِعُ الْمَوْلٰى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيْمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَبِقِيْمَةِ الْجَارِيَةِ عِنْدَهُ وَهِىَ مَعْرُوْفَةٌ وَ وَجْهُ الْبِنَاءِ اَنَّهُ كَمَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيْمُ الْجَارِيَةِ بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ يَتَعَذَّرُ الْوُصُوْلُ اِلَى الْخِدْمَةِ بِمَوْتِ الْعَبْدِ وَكَذَا بِمَوْتِ الْمَوْلٰى فَصَارَ نَظِيْرَهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এই শর্তে তার গোলামকে আজাদ করে যে, সে চার বছর তার খেদমত করবে, আর গোলাম তা গ্রহণ করে, তবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে ঐ মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, গোলামের নিজের মাল থেকে তার 'দাস-সত্তার' মূল্য পরিশোধ্য। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার উপর চার বছরের খেদমতের মূল্য পরিশোধ্য হবে। মুক্তি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, মনিব নির্ধারিত সময়ের খেদমতকে মুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণের সাথে মুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হবে। আর প্রস্তাব গ্রহণ পাওয়া গেছে এবং তার উপর চার বছরের খেদমত অবশ্যই সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, [শরিয়তের দৃষ্টিতে] এটা বিনিময় হওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং বিষয়টি এক হাজার দিরহামের শর্তে মুক্তিদানের মতো হলো। অতঃপর গোলাম মারা গেল, তাই অন্য ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের ভিত্তিতে আলোচ্য মতপার্থক্য হয়েছে। আর তা এই যে, কেউ যদি তার গোলামের কাছে তার 'দাস-সত্তাকে' নির্দিষ্ট একটি দাসীর বিনিময়ে বিক্রি করে অতঃপর [দাসীটিকে অর্পণের পূর্বে] দাসীটির কোনো দাবিদার বের হয় কিংবা দাসীটি মরে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, মনিব তার গোলামের কাছ থেকে তার 'দাস-সত্তার' মূল্য উসুল করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দাসীর মূল্য উসুল করবে। মাসআলাটি সুপরিচিত। এর উপর ভিত্তির কারণ এই যে, মৃত্যুর কারণে বা দাবিদার বের হওয়ার কারণে দাসীটি অর্পণ করা যেমন অসম্ভব হয়ে গেছে, তেমনি দাসের মৃত্যুর কারণে খেদমত লাভ করা অসম্ভব হয়ে গেছে। মনিবের মৃত্যুতেও অনুরূপ হুকুম রয়েছে। সুতরাং এটা গোলামের মৃত্যুর সদৃশ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلٰى خِدْمَتِهِ الخ : মাসআলা : মনিব তার গোলামকে চার বৎসর খেদমত করার শর্তে আজাদ করল, আর গোলামও তা গ্রহণ করে নিল, এমতাবস্থায় পরস্পর কথা সম্পন্ন হওয়ার পর খেদমতের পূর্বে গোলাম মারা গেল, তাহলে এমতাবস্থায় গোলামকে কোনো বিনিময় ছাড়াই আজাদ ধরা হবে নাকি, তার ব্যক্তি-সত্তার মূল্য পরিশোধ শর্তে, নাকি চার বছরে খেদমতের বিনিময় পরিশোধ শর্তে আজাদ ধরা হবে?

যেহেতু মনিব গোলামকে তার হাতে খেদমত করার বিনিময়ে আজাদ করেছেন, তাই আজাদ হওয়ার বিনিময় খেদমত সাব্যস্ত হবে। আর গোলাম যদি ঐ নির্ধারিত সময় জীবিত থাকত, তাহলে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে সে আজাদ হয়ে যেত, কিন্তু যেহেতু সে চুক্তি গ্রহণ করার পর খেদমত করার সুযোগ পায়নি, তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট গোলামের সম্পদ থেকে তার ব্যক্তি-সত্তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট নির্ধারিত দিনের খেদমতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : নির্দিষ্টকৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করার কারণ এই যে, কোনো বস্তু নির্ধারিত করার অর্থ হলো তা বিনিময় হওয়া, অথচ তা মাল নয়। অর্থাৎ, আজাদ হওয়ার বিনিময়। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে আজাদ হওয়াটা মাল নয়। সুতরাং বস্তুর নির্দিষ্টকরণ তার আসলকে বুঝায়, সুতরাং তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

আর শায়খাইনের দলিল এই যে, নির্দিষ্ট বস্তুটা গোলামের বিনিময়; আজাদের বিনিময় নয়। কেননা, গোলাম মূল্যবান বস্তু এজন্যই গোলাম তার মনিবের প্রস্তাব গ্রহণের পর খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহলে গোলামের সম্পদ থেকে তার ব্যক্তি-সত্তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর গোলাম মনিবের প্রস্তাব গ্রহণ করার সাথে সাথেই আজাদ হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তার দৃষ্টান্ত এই যে, মনিব এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলামকে আজাদ করেছে, আর গোলাম এ প্রস্তাব গ্রহণের পর বিনিময় পরিশোধের পূর্বেই মারা গেল।

এ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যে, আলোচ্য বিষয়টি বিনিময়ের হুকুমের আওতাভুক্ত যে, গ্রহণ করার দ্বারাই আজাদ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, শায়খাইন এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পরস্পর মতবিরোধের মূল ভিত্তি হলো অন্য মাসআলার উপর : মনিব নিজ গোলামকে তার নিজের হাতেই নির্দিষ্ট এক দাসের পরিবর্তে বিক্রি করল, আর গোলামও তা গ্রহণ করে আজাদ হয়ে গেল। অতঃপর ঐ দাসের উপর অন্য কারো অধিকার সাব্যস্ত হলো বা সে হালাক হয়ে গেল, এমতাবস্থায় শায়খাইনের নিকট মনিব তার নিজ গোলাম থেকে নিজ ব্যক্তি-সত্তার মূল্য উসূল করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ঐ দাসের মূল্য পরিশোধ করবে। কেননা, খেদমত এমন বস্তুর বিনিময়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে যা মাল নয়। অর্থাৎ, তা আজাদের বিনিময়। আর তার মূল্য নেই। সুতরাং খেদমত করা সম্ভব নয়, বিধায় খেদমতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অথচ শায়খাইন (র.) বলেন, খেদমতের বিনিময় রয়েছে। কেননা, এটা গোলামের ব্যক্তি-সত্তার বিনিময়, আর গোলামকে মাল হিসেবেই গণ্য করা হয়। আর খেদমতকে যখন বিনিময় হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না, তাই গোলামের মূল্য প্রদান করাই যথাযথ। তবে গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা, আজাদ করা রহিতকরণকে গ্রহণ করে না, তাই তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اَعْتِقْ اَمَتَكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ عَلٰى اَنْ تُزَوِّجَنِيْهَا فَفَعَلَ فَاَبَتْ اَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْاٰمِرِ لِاَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهٖ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَامُوْرِ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهٖ طَلِّقْ اِمْرَأَتَكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْاَلْفُ عَلَى الْاٰمِرِ لِاَنَّ اِشْتِرَاطَ الْبَدَلِ عَلَى الْاَجْنَبِيِّ فِي الطَّلَاقِ جَائِزٌ وَفِي الْعِتَاقِ لَا يَجُوْزُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার জিম্মায় এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার দাসীকে মুক্ত কর এই শর্তে যে, তাকে আমার কাছে বিবাহ দেবে। মনিব তা-ই করল, কিন্তু দাসী প্রস্তাবককে বিবাহ করতে অস্বীকার করল, তাহলে মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবকের উপর কোনো কিছুই সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামকে মুক্ত কর। আর লোকটি তা-ই করল, তাহলে আদেশদাতার উপর কোনো অর্থ সাব্যস্ত হবে না; বরং আদিষ্ট মনিবের পক্ষ থেকেই গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি অন্য একজনকে বলে, আমার দায়িত্বে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর, আর লোকটি তা-ই করল, তাহলে আদেশদাতার জিম্মায় এক হাজার দিরহাম সাব্যস্ত হবে। কেননা, তালাকের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের উপর বদল বা বিনিময়ের শর্ত আরোপ করা জায়েজ রয়েছে, কিন্তু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। ইতঃপূর্বে আমরা বিষয়টি প্রমাণ করেছি।

জ্ঞাতব্য : খোলা' অধ্যায়ে এই মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি পিতা নিজ মাল দ্বারা ছোট মেয়ের খোলা' করে, তাহলে পিতার উপরই তা আবশ্যক হবে। কেননা, তৃতীয় ব্যক্তির উপরই যখন মাল আবশ্যক হতে পারে তাহলে পিতার উপর স্বাভাবিকভাবেই তা হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اَعْتِقْ اَمَتَكَ عَلٰى الخ : এক ব্যক্তি অপর কাউকে বলল যে- اَعْتِقْ اَمَتَكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ عَلٰى اَنْ تُزَوِّجَنِيْهَا অর্থাৎ 'তোমার দাসীকে আমার উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে দাও, তবে শর্ত হলো তাকে আমার নিকট বিবাহ দেবে।' মনিবও তার কথা মোতাবেক আজাদ করে দিল, তাহলে দাসীটি আজাদ হয়ে যাবে, তবে নির্দেশদাতার উপর কোনো বিনিময় আবশ্যক হবে না। যেমন- কোনো ব্যক্তি অপরকে বলল যে, তোমার গোলামকে আমার উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে দাও, আর মনিবও আজাদ করে দিল, তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে, কিন্তু আদেশদাতার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্যক হবে না। কেননা, নিজের মালিকানা বস্তুকে অন্যের মালের পরিবর্তে শর্তযুক্ত করা ঠিক নয়। সুতরাং দাসী আজাদ হয়ে যাবে। তবে এ বিষয়ের হুকুম ভিন্ন যে, কোনো ব্যক্তি অপরকে বলবে, তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও আমার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্যক হওয়ার শর্তে, আর স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে আদেশদাতার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্যক হবে। কেননা, খোলা'র মাঝেও তালাকের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়, আর তা জায়েজ আছে। আলোচ্য মাসআলাকেও তার সাথে তুলনা করা হবে।

وَلَوْ قَالَ اَعْتِقْ اَمَتَكَ عَنِّيْ عَلَى اَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا قُسِمَتِ الْاَلْفُ عَلَى قِيْمَتِهَا وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَمَا اَصَابَ الْقِيْمَةُ اَدَّاهُ الْاٰمِرُ وَمَا اَصَابَ الْمَهْرَ بَطَلَ عَنْهُ لِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِّيْ تَضَمَّنَ الشِّرَاءُ اِقْتِضَاءً عَلَى مَا عُرِفَ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ قَابَلَ الْاَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاءً وَبِالْبُضْعِ نِكَاحًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا وَ وَجَبَتْ حِصَّةُ مَا سُلِّمَ لَهُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَبَطَلَ عَنْهُ مَالَمْ يُسَلَّمْ وَهُوَ الْبُضْعُ فَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَجَوَابُهُ اَنَّ مَا اَصَابَ قِيْمَتَهَا سَقَطَ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ وَهِيَ لِلْمَوْلٰى فِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ وَاَمَّا مَا اَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ .

অনুবাদ : কেউ যদি বলে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার পক্ষ থেকে তোমার দাসীকে আজাদ কর; আর মাসআলাটি যথাপূর্ব হয় [অর্থাৎ বিবাহের শর্তারোপ করা হলো, আর দাসীটি অস্বীকার করল], তাহলে উক্ত এক হাজার দিরহাম দাসীর মূল্য ও তার মহরে মিছিলের মাঝে বণ্টিত হবে। আর মূল্যের বিপরীতে যে পরিমাণ দিরহাম সাব্যস্ত হবে তা আদেশদাতা আদায় করবে। পক্ষান্তরে মহরের বিপরীতে যা সাব্যস্ত হবে তা আদেশদাতা থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা, আদেশদাতা যখন 'আমার পক্ষ থেকে' বলেছে তখন বক্তব্যের অনিবার্য দাবি হিসেবে তাতে ক্রয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন উসূলে ফিকহশাস্ত্রে বলা হয়েছে। বিষয়টি যখন অনুরূপ হলো তখন যেন আদেশদাতা এক হাজার দিরহামকে ক্রয়ের দিক থেকে দাসীর দাস-সত্তার বিপরীতে এবং বিবাহের দিক থেকে তার সম্ভোগ-অঙ্গের বিপরীতে সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এক হাজার দিরহাম উভয়ের বিপরীতে বণ্টিত হবে এবং আদেশদাতার অনুকূলে সংরক্ষিত দাস-সত্তার [বিপরীতে নির্ধারিত] অংশটুকু তার উপর সাব্যস্ত হবে। আর যে সম্ভোগ-অঙ্গ সমর্পিত হলো না, তার বিপরীতে নির্ধারিত অংশটুকু আদেশদাতা থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর দাসী যদি নিজে তার সাথে বিবাহে বসে যায়, তাহলে কি হুকুম হবে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেননি। এর উত্তর এই যে, প্রথম মাসআলায় দাসীর মূল্যের বিপরীতে নির্ধারিত অংশটুকু রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাসআলায় সেটা মনিবের প্রাপ্য হবে, আর মহরে মিছিলের বিপরীতে যা নির্ধারিত হবে, তা উভয় ক্ষেত্রে মহররূপে দাসীর প্রাপ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَعْتِقْ اَمَتَكَ عَنِّيْ عَلَى اَلْفِ دِرْهَمٍ الخ : মাসআলা : বাস্তব একটি উদাহরণ– যায়েদ হাসানকে বলল যে, তুমি তোমার দাসীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে দাও এ শর্তে যে, আমার নিকট বিবাহ দিবে, যায়েদ তা-ই করল, তাহলে এক হাজার দিরহামকে দাসীর মহর এবং মূল্যের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। অতঃপর মূল্যের বিনিময় যা আসে তা হাসানকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। কেননা, তার কথার মূল ব্যাখ্যা এমন যে, সে যায়েদকে যেন বলল, তুমি তোমার গোলাম আমার নিকট বিক্রি কর ! অতঃপর আমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তাকে আজাদ করে দাও! যায়েদ তা-ই করেছে, বিধায় মূল্য পরিশোধ করা হাসানের উপর আবশ্যক। আর মহরের বিনিময়ে যে পরিমাণ মাল আবশ্যক হবে তা হাসানকে পরিশোধ করতে হবে না। কেননা, দাসী বিবাহকে অস্বীকার করেছে।

بَابُ التَّدْبِيْرِ

إِذَا قَالَ الْمَوْلٰى لِمَمْلُوْكِهِ إِذَا مُتُّ فَانْتَ حُرٌّ أَوْ اَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّىْ أَوْ اَنْتَ مُدَبَّرٌ وَقَدْ دَبَّرْتُكَ فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا لِأَنَّ هٰذَا اَلْفَاظٌ صَرِيْحٌ فِى التَّدْبِيْرِ فَإِنَّهُ إِثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ لَى الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِى الْكِتَابَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ .

পরিচ্ছেদ : মুদাব্বার ঘোষণা

অনুবাদ : মনিব যদি তার ক্রীতদাসকে বলে, আমি যখন মারা যাই তখন তুমি আজাদ, কিংবা যদি বলে, আমার পরে তুমি আজাদ, কিংবা যদি বলে, তুমি মুদাব্বার, কিংবা তোমাকে মুদাব্বার ঘোষণা করলাম, তাহলে গোলামটি মুদাব্বার হয়ে যাবে। কেননা, এ শব্দগুলো মুদাব্বার বানানোর ব্যাপারে স্পষ্ট। কারণ, মুক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে তার পশ্চাতে। এরপর উক্ত গোলামকে বিক্রি করা কিংবা দান করা কিংবা অন্য কোনোভাবে আপন মালিকানা থেকে বের করা জায়েজ নয়, কিন্তু আজাদ করে দিতে পারে। যেমন কিতাবাত-চুক্তির ক্ষেত্রে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ الخ : মুদাব্বার ঘোষণার হুকুমের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতামত এবং তাঁদের দলিলের সারকথা হলো, জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের নিকট মুদাব্বারকে একজনের মালিকানা থেকে অন্যজনের মালিকানায় পরিবর্তন করা যায় না। কেননা, তার মাঝে আজাদ হওয়ার কারণ বর্তমানেই বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, কেউ যদি তার গোলামকে মুদাব্বার বানায় আর সে তার মনিবের মৃত্যুর পর আজাদ হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার আজাদ হওয়ার কারণ এটাই যে, মনিব জীবদ্দশায় তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে, কিন্তু এ কারণটি মনিবের মৃত্যুর পর প্রকাশ পাবে। এমতাবস্থায় মনিবের উক্ত বক্তব্যের পরও যদি গোলামকে বিক্রি করা, হেবা করা ইত্যাদি জায়েজ হয়, তাহলে আজাদ হওয়ার কারণকে রহিতকরণ লাযিম আসে। অথচ তা জায়েজ নেই। সুতরাং বুঝা গেল, মুদাব্বারকে বিক্রি করা, হেবা করা কোনোটাই জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ الخ : কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ যুক্তির বিপক্ষে হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেন যে, অনুসারীদের কোনো এক ব্যক্তি তাঁর গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছিল। অথচ তার নিকট এছাড়া আর কোনো সম্পদ ছিল না। এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমার নিকট থেকে এ গোলামটি কে ক্রয় করবে? অতঃপর নুআঈম ইবনে আব্দুল্লাহ একশত দিরহামের বিনিময়ে গোলামটি ক্রয় করে নিল, আর ঐ দিরহাম আনসারীকে প্রদান করা হলো। আর বললেন, এর থেকে ঋণ পরিশোধ কর। এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র.) ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত অনুরূপই।

তবে আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, রাসূল ﷺ তার মুদাব্বার ঘোষণাকে সঠিক সাব্যস্ত করেননি। আর সে মুদাব্বার ঘোষণার ইচ্ছা পোষণ করেছিল মাত্র। তবে এ ব্যাখ্যায় কিছু প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু জমহুরের মাযহাব তা-ই, যা কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

لِاَنَّهُ تَعْلِيْقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ كَمَا فِى سَائِرِ التَّعْلِيْقَاتِ وَكَمَا فِى الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ وَلِاَنَّ التَّدْبِيْرَ وَصِيَّةٌ وَهِىَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ ذٰلِكَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ وَلِاَنَّهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ لِاَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا سَبَبَ غَيْرُهُ ثُمَّ جَعَلَهُ سَبَبًا فِى الْحَالِ اَوْلٰى لِوُجُوْدِهِ فِى الْحَالِ وَعَدَمِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِاَنَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حَالُ بُطْلَانِ اَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ فَلَا يُمْكِنُ تَاخِيْرُ السَّبَبِيَّةِ اِلٰى زَمَانِ بُطْلَانِ الْاَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّعْلِيْقَاتِ لِاَنَّ الْمَانِعَ مِنَ السَّبَبِيَّةِ قَائِمٌ قَبْلَ الشَّرْطِ لِاَنَّهُ يَمِيْنٌ وَالْيَمِيْنُ مَانِعٌ وَالْمَنْعُ هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَاَنَّهُ يُضَادُّ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَاَمْكَنَ تَاخِيْرُ السَّبَبِيَّةِ اِلٰى زَمَانِ الشَّرْطِ لِقِيَامِ الْاَهْلِيَّةِ عِنْدَهُ فَافْتَرَقَا وَلِاَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ خِلَافَةٌ فِى الْحَالِ كَالْوِرَاثَةِ وَاِبْطَالُ السَّبَبِ لَا يَجُوْزُ فِى الْبَيْعِ وَمَا يُضَاهِيْهِ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : কেননা, এটা হলো মুক্তিদানকে শর্তের সাথে সংযুক্তকরণ। সুতরাং অন্যান্য শর্তারোপের মতো এবং শর্তযুক্ত মুদাব্বারের মতো এখানেও বিক্রয় এবং দান নিষিদ্ধ হবে না। তাছাড়া এ কারণে যে, মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ হলো অসিয়ত করা। আর অসিয়ত অসিয়তকারীকে বিক্রয় ও দান জাতীয় পদক্ষেপ থেকে বাধা দেয় না। আমাদের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ অর্থাৎ, মুদাব্বার গোলামকে বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং তার উপর উত্তরাধিকার প্রয়োগ করা যাবে না; বরং এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে সে আজাদ হবে। তাছাড়া কারণ এই যে, মুদাব্বার ঘোষণাই হচ্ছে মুক্তিলাভের কারণ। কেননা, মৃত্যুর পর মুক্তি সাব্যস্ত হচ্ছে, আর এটা ছাড়া অন্যকোনো কারণও নেই। অতঃপর বক্তব্যটিকে উচ্চারণকালেই কারণরূপে সাব্যস্তকরণ উত্তম। কেননা, উচ্চারণকালেই বক্তব্যটি বিদ্যমান রয়েছে, মৃত্যুর পরে তা বিদ্যমান নেই। তাছাড়া মৃত্যুর পর হচ্ছে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা বাতিল হওয়ার অবস্থা। সুতরাং বক্তব্যের কারণত্বকে যোগ্যতা বাতিল হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। আর অন্য সকল শর্তায়নের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, কারণ রোধকারী বিষয়টি শর্তের পূর্বেই বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু এটা হলো ইয়ামীন [বা প্রত্যক্ষ শর্তারোপ] আর ইয়ামীন হচ্ছে বাধাদানকারী এবং বাধা দেওয়াই হচ্ছে ইয়ামীনের উদ্দেশ্য। তা তালাক ও মুক্তি বিরোধী; আর কারণকে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব। কেননা, তখন [তার প্রস্তাব উচ্চারণের] যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল। তাছাড়া মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ হলো অসিয়ত করা। আর অসিয়ত হলো বক্তব্য উচ্চারণের সময় স্থলবর্তীকরণ। যেমন উত্তরাধিকারের বিষয়টি। আর মুক্তির কারণকে অকার্যকর করা জায়েজ নয়। অথচ বিক্রয় ও অনুরূপ অন্যান্য পদক্ষেপগুলোতে তা-ই হয়ে থাকে।

قَالَ وَلِلْمَوْلٰى اَنْ يَسْتَخْدِمَهٗ وَيُؤَاجِرَهٗ وَاِنْ كَانَتْ اَمَةً وَطِيَهَا وَلَهٗ اَنْ يُزَوِّجَهَا لِاَنَّ الْمِلْكَ فِيْهِ ثَابِتٌ لَهٗ وَبِهٖ يُسْتَفَادُ وِلَايَةُ هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَاِذَا مَاتَ الْمَوْلٰى عُتِقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهٖ لِمَا رَوَيْنَا وَلِاَنَّ التَّدْبِيْرَ وَصِيَّةٌ لِاَنَّهٗ تَبَرُّعٌ مُضَافٌ اِلٰى وَقْتِ الْمَوْتِ وَالْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِى الْحَالِ فَيَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ حَتّٰى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهٗ يَسْعٰى فِىْ ثُلُثَيْهِ وَاِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلٰى دَيْنٌ يَسْعٰى فِىْ كُلِّ قِيْمَتِهٖ لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْضُ الْعِتْقِ فَيَجِبُ رَدُّ قِيْمَتِهٖ وَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ وَعَلٰى ذٰلِكَ نُقِلَ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (رضـ) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিবের অধিকার রয়েছে মুদাব্বার থেকে খেদমত গ্রহণ করার এবং পারিশ্রমিক নিযুক্ত করার, আর যদি দাসী হয়, তাহলে তাকে সম্ভোগ করার এবং তাকে বিবাহ দেওয়ারও তার অধিকার রয়েছে। কেননা, তার মধ্যে মনিবের অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। আর মালিকানা দ্বারাই এ সকল ক্রিয়াকর্মের অধিকার অর্জিত হয়ে থাকে। আর মনিব যদি মারা যায়, তাহলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে উক্ত মুদাব্বার আজাদ হয়ে যাবে। প্রমাণ হলো আমাদের ইতঃপূর্বে বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ অসিয়ত করা। কেননা, এটা হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি স্বেচ্ছাদান। আর ঘোষণার হুকুম বর্তমানে সাব্যস্ত নয়। সুতরাং এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যেই তা কার্যকর হবে। এমন কি যদি মুদাব্বার ছাড়া তার অন্য কোনো মাল না থাকে, তাহলে মুদাব্বার তার দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের ব্যাপারে উপার্জনে বাধ্য হবে। আর যদি মনিবের জিম্মায় কোনো ঋণ থাকে, তাহলে মুদাব্বার তার সমগ্র মূল্যের ব্যাপারেই উপার্জনে বাধ্য হবে। কেননা, ঋণ অসিয়তের উপর অগ্রাধিকার রাখে। আর মুক্তির অসিয়ত ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। মুদাব্বার দাসীর সন্তানও মুদাব্বার হবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

وَاِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيْرَ بِمَوْتِهٖ عَلٰى صِفَةٍ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ اِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِىْ هٰذَا اَوْ سَفَرِىْ هٰذَا اَوْ مِنْ مَرَضٍ كَذَا فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَيَجُوْزُ بَيْعُهٗ لِاَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِى الْحَالِ لِتَرَدُّدٍ فِىْ تِلْكَ الصِّفَةِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ لِاَنَّهٗ تَعَلَّقَ عِتْقُهٗ بِمُطْلَقِ الْمَوْتِ وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ فَاِنْ مَاتَ الْمَوْلٰى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا عَتَقَ كَمَا يُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ مَعْنَاهُ مِنَ الثُّلُثِ لِاَنَّهٗ ثَبَتَ حُكْمُ التَّدْبِيْرِ فِىْ اٰخِرِ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهٖ لِتَحَقُّقِ تِلْكَ الصِّفَةِ فِيْهِ فَلِهٰذَا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَمِنَ الْمُقَيَّدِ اَنْ يَقُوْلَ اِنْ مُتُّ اِلٰى سَنَةٍ اَوْ عَشْرِ سِنِيْنَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اِلٰى مِائَةِ سَنَةٍ وَمِثْلُهٗ لَا يَعِيْشُ اِلَيْهِ فِى الْغَالِبِ لِاَنَّهٗ كَالْكَائِنِ لَا مَحَالَةَ .

অনুবাদ : যদি মুদাব্বার ঘোষণাকে তার মৃত্যুর বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে; যেমন বলল– যদি আমি এ অসুস্থতার মধ্যে মারা যাই কিংবা এ সফরে মারা যাই কিংবা অমুক রোগে মারা যাই, এ ধরনের বক্তব্যে সে মুদাব্বার হবে না। সুতরাং তাকে বিক্রি করাও জায়েজ হবে। কেননা, ঐ গুণটির অস্তিত্বের ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কারণে বর্তমানে মুক্তির কারণ সাব্যস্ত হয়নি। সাধারণ মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এখানে তার মুক্তির বিষয়টি নিঃশর্ত মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর তা সংঘটিত হওয়া অনিবার্য। আর মনিব যদি উল্লেখকৃত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মুক্ত হয়ে যাবে; যেমন সাধারণ মুদাব্বার মুক্ত হয়। অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে মুক্ত হবে। কেননা, মনিবের জীবনের সর্বশেষ অংশে উল্লেখকৃত ঐ অবস্থাটি সাব্যস্ত হওয়ার কারণে মুদাব্বার হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে। শর্তযুক্ত মুদাব্বার ঘোষণার একটি সুরত হচ্ছে এ কথা বলা যে, যদি এক বছর বা দশ বছরের মধ্যে আমি মারা যাই। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি [অর্থাৎ, দ্বিধা থাকায়]। পক্ষান্তরে যদি সে একশ বছরের কথা বলে, আর অবস্থা এই হয় যে, তার মতো মানুষ সাধারণত এতদিন বাঁচবে না, তাহলে হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা, এটাই অবশ্যম্ভাবী ঘটার মতো ব্যাপার।

بَابُ الْإِسْتِيلَادِ

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيكُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ـ

পরিচ্ছেদ : দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া

অনুবাদ : দাসী যদি তার মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করে, তাহলে সে মনিবের উম্মে ওয়ালাদ [সন্তানের মাতা] হয়ে যাবে। আর তাকে বিক্রয় করা কিংবা অন্যের মালিকানায় প্রদান করা জায়েজ হবে না। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন- اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا তার সন্তান তাকে আজাদ করে দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْاِسْتِيلَادِ : اِسْتِيلَاد -এর আভিধানিক অর্থ- সন্তান লাভ করা। কিন্তু পারিভাষায় اِسْتِيلَاد বলা হয় নিজ দাসীর সাথে সহবাসপূর্বক তার থেকে সন্তান লাভ করাকে। এমতাবস্থায় মনিব যদি সন্তানের নসবকে মেনে নেয়, তাহলে মনিব থেকেই সন্তানের বংশ-পরিচয় হবে; অন্যথায় নয়। আর এমতাবস্থায় ঐ দাসী মনিবের সন্তানের মাতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتْ الخ : দাসী থেকে সন্তান হওয়ার পর দাসী মনিবের সন্তানের মাতায় পরিণত হয়ে যায়। এ কারণেই এ দাসীকে এখন বিক্রি করা বা কাউকে হেবা করা জায়েজ নেই। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন- اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا অর্থাৎ, 'তার সন্তান তাকে আজাদ করে দিয়েছে।'

জ্ঞাতব্য : উল্লিখিত হাদীস ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী এবং হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ -এর নিকট তাঁর পুত্র-সন্তান হযরত ইবরাহীমের মাতা হযরত মারিয়া কিবতিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাঁর সন্তান তাঁকে আজাদ করে দিয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার এ হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবে হাদীসের সনদে কিছু দ্বিমত রয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আছারে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ মিম্বরের উপর উচ্চ আওয়াজে বলেছেন যে, উম্মে ওয়ালাদ দাসীদেরকে বিক্রি করা হারাম। মনিব থেকে দাসীর সন্তান হলে সে আজাদ। এরপর আর সে সাধারণ দাসী থাকে না। এ সনদটি বিশুদ্ধ। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ কথা বর্ণনা করেছেন। এরই অর্থবোধক কথাকে ইবনে মাজাহ এবং ইমাম আহমদ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম আবূ দাউদ হযরত মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা.) থেকে। তা হচ্ছে এই যে, যে দাসী মনিব থেকে সন্তান প্রসব করবে তাকে বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না; বরং যতদিন জীবিত থাকবে মনিব তাকে সম্ভোগ করবে। আর মারা গেলে দাসী আজাদ হয়ে যাবে। এ সনদটিও বিশুদ্ধ। শায়খ খাত্তাবী (র.) বলেছেন, এর দলিল এটাও যে, বিশুদ্ধ সনদে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা নবীগণ কারো উত্তরাধিকারী নই এবং কেউ আমাদেরও উত্তরাধিকারী নয়, আমরা যাই রেখে যাই তা আল্লাহর রাস্তায় সদকা। অথচ রাসূল ﷺ মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে রেখে গেছেন আর, সে ছিল রাসূল ﷺ -এর উম্মে ওয়ালাদ। যদি উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জায়েজ হতো, তাহলে হযরত মারিয়ার বিক্রিমূল্যও সদকা হয়ে যেত, অথচ তা সম্ভব নয়।

أَخْبَرَ عَنْ إِعْتَاقِهَا فَيَثْبُتُ بَعْضُ مَوَاجِبِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوْءَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَائَيْنِ قَدِ اخْتَلَطَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَيْزُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ إِلَّا أَنَّ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ تَبْقَى الْجُزْئِيَّةُ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً فَضَعُفَ السَّبَبُ فَأَوْجَبَ حُكْمًا مُؤَجَّلًا إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَقَاءُ الْجُزْئِيَّةِ حُكْمًا بِاعْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُوَ مِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ فَكَذَا الْحُرِّيَّةُ تَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ لَا فِي حَقِّهِنَّ حَتَّى إِذَا مَلَكَتِ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ لَا يُعْتَقُ بِمَوْتِهَا وَثُبُوتُ عِتْقٍ مُؤَجَّلٍ يُثْبِتُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ فَيَمْتَنِعُ جَوَازُ الْبَيْعِ وَإِخْرَاجُهَا لَا إِلَى الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوْجِبُ عِتْقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ بَعْضُهَا مَمْلُوْكًا لَهُ لِأَنَّ الْإِسْتِيْلَادَ لَا يَتَجَزَّى فَإِنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ فَيُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ .

অনুবাদ : এখানে রাসূল ﷺ তার আজাদীর খবর দান করেছেন। সুতরাং মুক্তির কতিপয় অনিবার্য ফল সাব্যস্ত হবে, যেমন বিক্রয়ের নিষিদ্ধতা। তাছাড়া এ কারণে যে, সন্তানের মাধ্যমে সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, বীর্য ও ডিম্ব এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে, তা পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, যেমন বিবাহজনিত নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তবে সন্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অংশত্ব তত্ত্বগতভাবে বিদ্যমান থাকে, বস্তুগতভাবে বিদ্যমান থাকে না। ফলে কারণটি দুর্বল হয়ে যায় এবং মুক্তির হুকুমটি সৃষ্ট পরবর্তী সময় পর্যন্ত মুলতবি অবস্থায় সাব্যস্ত হয়। আর বস্তুগতভাবে অংশত্ব বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নসব বা পরিচয়ের বিবেচনায় হয়ে থাকে; আর বংশ-পরিচয় পুরুষদের দিক থেকে হয়। সুতরাং মুক্তিলাভের বিষয়টিও পুরুষদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে; স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে নয়। তাই স্বাধীন নারী যদি তার স্বামীর মালিকানা লাভ করে, আর অবস্থা এই যে, সে তার ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুক্তি লাভ করবে না। আর [মৃত্যুর মেয়াদে] মুলতবিকৃত মুক্তির সাব্যস্ততা বর্তমানকালে মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং তাকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হবে এবং মুক্তিদান ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাকে বর্তমানে নিজ মালিকানা থেকে বের করা নিষিদ্ধ হবে। আর তা মৃত্যুর পর তার মুক্তি ওয়াজিব করবে। আর তেমনি দাসী তারই উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে, যদি তার অংশবিশেষ মনিবের মালিকানাধীন থাকে। কেননা, সন্তান জন্মের বিষয়টি বিভাজন গ্রহণ করে না। কারণ, এটা বংশ-পরিচয়ের অনুবর্তী। সুতরাং সেটা মূলের সাথেই বিবেচ্য হবে।

قَالَ وَلَهُ وَطْيُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيْجُهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيْهَا قَائِمٌ فَأَشْبَهَتِ الْمُدَبَّرَةَ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْعَقْدِ فَلَأَنْ يَثْبُتَ بِالْوَطْيِ وَأَنَّهُ أَكْثَرُ إِفْضَاءٍ أَوْلَى وَلَنَا أَنَّ وَطْيَ الْأَمَةِ يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ دُوْنَ الْوَلَدِ لِوُجُوْدِ الْمَانِعِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الدَّعْوَةِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ وَطْيٍ بِخِلَافِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَعَيَّنُ مَقْصُوْدًا مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الدَّعْوَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِغَيْرِ إِقْرَارٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ اِعْتِرَافٍ مِنْهُ بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بِدَعْوَى الْوَلَدِ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الْوَلَدُ مَقْصُوْدًا مِنْهَا فَصَارَتْ فِرَاشًا كَالْمَعْقُوْدَةِ بَعْدَ النِّكَاحِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিব তাকে সম্ভোগ করতে পারবে, তার থেকে খেদমত তলব করতে পারবে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং বিবাহ দান করতে পারবে। কেননা, তার মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সে মুদাব্বার দাসীর সদৃশ্য হয়ে গেল। মনিবের স্বীকৃতি ছাড়া তার সাথে দাসীর সন্তানটির বংশ সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মনিব পিতৃত্ব দাবি না করলেও সন্তানটির বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বিবাহ-বন্ধন দ্বারাই যখন বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সহবাস দ্বারা বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত হওয়া আরো স্বাভাবিক। কেননা, এটা তো সন্তান জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ। আর আমাদের দলিল এই যে, দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়; বরং যৌন চাহিদা পূরণ করা। কেননা, সন্তান লাভের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রয়েছে। [আর তা হলো দাসীর অর্থমূল্য রহিত হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া] সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে দাবি আবশ্যক; যেমন সহবাস ব্যতীত দাসীর মালিকানার ক্ষেত্রে। বিবাহ-বন্ধনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্যরূপে সন্তান লাভের বিষয়টি নির্ধারিত। সুতরাং দাবির কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর যদি দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করে তখন মনিবের স্বীকারোক্তি ছাড়াই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মনিবের পক্ষ থেকে প্রথম সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার নেওয়ার পর। কেননা, প্রথম সন্তানটির বংশ পরিচয় দাবি করার পর ঐ দাসী দ্বারা সন্তান জন্মগ্রহণ বিষয়টি উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ তারই শয্যাশায়িনী গণ্য হবে; যেমন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নারীর ক্ষেত্রে।

إِلَّا إِذَا نَفَاهُ يَنْتَفِي بِقَوْلِهِ لِأَنَّ فِرَاشَهَا ضَعِيفٌ حَتَّى يَمْلِكَ نَقْلَهُ بِالتَّزْوِيجِ بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ حَيْثُ لَا يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِنَفْيِهِ إِلَّا بِاللِّعَانِ لِتَأَكُّدِ الْفِرَاشِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ إِبْطَالَهُ بِالتَّزْوِيجِ وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حُكْمٌ فَأَمَّا الدِّيَانَةُ فَإِنْ كَانَ وَطِيَهَا وَحَصَّنَهَا وَلَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَيَدَّعِيَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُحَصِّنْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ لِأَنَّ هٰذَا الظَّاهِرَ يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ آخَرُ هٰكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَفِيهِ رِوَايَتَانِ أُخْرَيَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي وَإِنْ زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ يَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ كَالتَّدْبِيرِ أَلَا يُرَى أَنَّ وَلَدَ الْحُرَّةِ حُرٌّ وَوَلَدَ الْقِنَّةِ رَقِيقٌ. وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنَ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا إِذِ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ وَلَوْ إِدَّعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْتَقُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِإِقْرَارِهِ.

অনুবাদ : তবে মনিব যদি দ্বিতীয় সন্তানকে অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকৃতির কারণে তার বংশ-সম্পর্ক নাকচ হয়ে যাবে। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের 'শয্যা-সম্পর্ক' দুর্বল, এ কারণেই মনিব অন্যত্র বিবাহ দানের মাধ্যমে তার শয্যা হস্তান্তর করতে পারে। বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে লি'আন বা 'কসম বিনিময়' ছাড়া শুধু অস্বীকৃতির দ্বারা সন্তানের বংশ-সম্পর্ক নাকচ হয় না। কেননা, স্ত্রীর শয্যা-সম্পর্ক সুদৃঢ়। এ কারণেই স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ দানের মাধ্যমে নিজ শয্যা বাতিল করতে পারে না। এই যে সিদ্ধান্ত আমরা উল্লেখ করলাম, এটা হলো আইনগত বিধান। পক্ষান্তরে দিয়ানত বা হাক্কুল্লাহর দাবি এই যে, যদি মনিব তার সাথে সহবাস করে থাকে আর তার সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা করে থাকে এবং 'আযল না করে থাকে, তাহলে সন্তানের সম্পর্ক দাবি করা ও স্বীকার করে নেওয়া তার জন্য আবশ্যক। কেননা, দৃশ্যত সন্তান তার ঔরসেই জন্ম লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যদি আযল করে থাকে কিংবা তার সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা না করে থাকে, তাহলে তার জন্য সন্তানের সম্পর্ক অস্বীকার করার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে আরেকটি বাহ্যিক অবস্থা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে আলাদা আলাদা দুটি বর্ণনা রয়েছে। 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে আমরা তা উল্লেখ করেছি। আর মনিব যদি তাকে বিবাহ দেয় এবং সে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে সন্তান তার মায়ের অনুবর্তী হবে। কেননা, স্বাধীনতার অধিকার সন্তানের মাঝেও সংক্রমিত হয়। যেমন মুদাব্বার ঘোষণার ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান স্বাধীন এবং দাসীর সন্তান দাস হয়। আর বংশ-সম্পর্ক স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে। কেননা, শয্যা অধিকার তার, যদিও বিবাহটি ফাসেদ হয়ে থাকে। কেননা, বিধানের ক্ষেত্রে নিকাহে ফাসিদ বিশুদ্ধ বিবাহের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। আর যদি মনিব সন্তানটির সম্পর্ক দাবি করে, তাহলে তার থেকে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। কেননা সন্তানটি অন্যজন থেকে সুসাব্যস্ত বংশ-সম্পর্কের অধিকারী। আর সন্তানটি স্বাধীন হবে এবং মনিবের স্বীকৃতির কারণে তার মাতা মনিবের উম্মে ওয়ালাদ হবে।

وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلٰى عُتِقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنَ الثُّلُثِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَّةٌ فَتُقَدَّمُ عَلٰى حَقِّ الْوَرَثَةِ وَالدَّيْنِ كَالتَّكْفِينِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِ . وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا فِي دَيْنِ الْمَوْلٰى لِلْغُرَمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ حَتّٰى لَا تُضْمَنَ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعٰى فِي قِيمَتِهَا وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبَةِ لَا تُعْتَقُ حَتّٰى تُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ وَقَالَ زُفَرُ (رح) تُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَالسِّعَايَةُ دَيْنٌ عَلَيْهَا .

অনুবাদ : আর মনিব যখন মারা যাবে তখন উম্মে ওয়ালাদ তার সমগ্র সম্পদ থেকেই আজাদ হয়ে যাবে। এর দলিল হলো হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত হাদীস যে, রাসূল ﷺ উম্মে ওয়ালাদগণের মুক্তির ফয়সালা দান করেছেন এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের বিক্রি না করার এবং তাদের মুক্তির বিষয়কে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গণ্য না করার আদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এ কারণে যে, সন্তান লাভ হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। সুতরাং তা ঋণ পরিশোধের এবং ওয়ারিশদের হকের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। যেমন– কাফন-দাফনের বিষয়টি। মুদাব্বার গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটা হলো অসিয়ত এমন ব্যাপারে, যা তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত। মনিবের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে পাওনাদারের অনুকূলে উপার্জন করা উম্মে ওয়ালাদের উপর ওয়াজিব নয়। প্রমাণ হলো আমাদের পূর্ববর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, উম্মে ওয়ালাদ অর্থমূল্য-সম্পন্ন মাল নয়। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, গসবের কারণে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদের সাথে পাওনাদারের হক সম্পৃক্ত হবে না; যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে। মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মুদাব্বার হচ্ছে অর্থমূল্য-সম্পন্ন মাল। খ্রিষ্টান মনিবের উম্মে ওয়ালাদ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে নিজের অর্থমূল্য পরিশোধের জন্য তার উপর উপার্জন ওয়াজিব হবে। আর সে কিতাবত-চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর সমপর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা পর্যন্ত সে আজাদ হবে না। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তৎক্ষণাৎই আজাদ হয়ে যাবে এবং উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ তার জিম্মায় ঋণরূপে সাব্যস্ত হবে।

وَهٰذَا الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا عُرِضَ عَلَى الْمَوْلَى الْإِسْلَامُ فَأَبٰى فَإِنْ أَسْلَمَ تَبْقٰى عَلٰى حَالِهَا لَهُ أَنَّ إِزَالَةَ الذُّلِّ عَنْهَا بَعْدَ مَا أَسْلَمَتْ وَاجِبٌ وَ ذٰلِكَ بِالْبَيْعِ أَوِ الْإِعْتَاقِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ فَتَعَيَّنَ الْإِعْتَاقُ وَلَنَا أَنَّ النَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِيْ جَعْلِهَا مُكَاتَبَةً لِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ الذُّلُّ عَنْهَا لِصَيْرُوْرَتِهَا حُرَّةً يَدًا وَالضَّرَرُ عَنِ الذِّمِّيِّ لِانْبِعَاثِهَا عَلَى الْكَسْبِ نَيْلًا لِشَرَفِ الْحُرِّيَّةِ فَيَصِلُ الذِّمِّيُّ إِلٰى بَدَلِ مِلْكِهِ أَمَّا لَوْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مُفْلِسَةٌ تَتَوَانٰى فِى الْكَسْبِ وَمَالِيَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتَقِدُهَا الذِّمِّيُّ مُتَقَوَّمَةً فَيُتْرَكُ وَمَا يَعْتَقِدُهُ وَلِأَنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَقَوَّمَةً فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ وَهٰذَا يَكْفِيْ لِوُجُوْبِ الضَّمَانِ كَمَا فِى الْقِصَاصِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِيْنَ ـ

অনুবাদ : আর এ মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রেও রয়েছে যে, যখন মনিবের সামনে ইসলাম পেশ করা হয়, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে উম্মে ওয়ালাদ নিজের অবস্থায় বহাল থাকবে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ইসলাম গ্রহণ করার পর তার থেকে অপমান দূর করা অপরিহার্য আর সেটা সম্ভব বিক্রির মাধ্যমে কিংবা আজাদ করার মাধ্যমে। উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে বিক্রির অবকাশ যেহেতু নেই সেহেতু আজাদ করাই নির্ধারিত। আমাদের দলিল হলো, তাকে কিতাবত-চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর সমপর্যায়ভুক্ত করার মধ্যেই উভয় পক্ষের কল্যাণ রয়েছে। কেননা, কর্মক্ষমতার দিক থেকে স্বাধীন হওয়ার কারণে তার অপমান দূর হয়ে গেল। আবার স্বাধীনতার মর্যাদা লাভের জন্য উপার্জনে বাধ্য হওয়ার মাধ্যমে জিম্মির ক্ষতিগ্রস্ততা দূরীভূত হলো। সুতরাং জিম্মি তার মালিকানার বদল গ্রহণ করবে। আর যদি সে অর্থহীন অবস্থায় আজাদ হয়, তাহলে [উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে] উপার্জনের ব্যাপারে গড়িমসি করতে পারে। আর খ্রিস্টান মনিব তো উম্মে ওয়ালাদের অর্থমূল্য-সম্পন্ন হওয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং তাকে তার বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া উম্মে ওয়ালাদের সম্পদগত দিকটি যদিও অর্থমূল্য– সম্পন্ন নয়, কিন্তু তা সম্মানযোগ্য ও মূল্যবান অবশ্যই। ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। যৌথ কিসাসের ক্ষেত্রে যেমন একজন হকদার যদি মাফ করে দেয়, তাহলে অন্য হকদারের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْقِصَاصِ الْمُشْتَرَكِ الخ : আমরা একথা মানি যে, খ্রিস্টান মনিবের উম্মে ওয়ালাদের জন্যও মূল্যসম্পন্ন মাল নেই তারপরও সে সম্মানযোগ্য অবশ্যই। আর এ সম্মানযোগ্য হওয়াটাই জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন যৌথ কিসাসের ক্ষেত্রে একজন হকদার যদি মাফ করে দেয়, তাহলে অন্য হকদারের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে।

জ্ঞাতব্য : নিহত ব্যক্তির কিসাস নেওয়ার ক্ষেত্রে হকদার যদি কয়েকজন হয়, আর তাদের একজন কিসাসকে মাফ করে দেয় তাহলে বাকি অন্যান্য হকদার কিসাসের দাবি করতে পারবে না। তারপরও নিহত ব্যক্তি যেহেতু সম্মানযোগ্য এ কারণে তার রক্ত বৃথা যাবে না; বরং অন্যান্য লোকদের জন্য মালের দিয়ত আবশ্যক হবে। এমনিভাবে খ্রিস্টানের উম্মে ওয়ালাদ সম্মানযোগ্য। তাই তাকে যখন তার খ্রিস্টান মনিব থেকে পৃথক করা হবে তখন মনিবকে মাল দিতে হবে।

وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهَا عُتِقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ عَجَزَتْ فِيْ حَيَاتِهٖ لَا تُرَدُّ قِنَّةً لِأَنَّهَا لَوْ رُدَّتْ قِنَّةً اُعِيْدَتْ مُكَاتَبَةً لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهٖ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهٗ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهٗ وَلَوِ اسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ ثُمَّ مَلَكَهَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهٗ عِنْدَنَا وَلَهٗ فِيْهِ قَوْلَانِ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغْرُوْرِ لَهٗ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِرَقِيْقٍ فَلَا تَكُوْنُ أُمَّ وَلَدٍ لَهٗ كَمَا إِذَا عَلِقَتْ مِنَ الزِّنَاءِ ثُمَّ مَلَكَهَا الزَّانِيْ وَهٰذَا لِأَنَّ أُمُوْمِيَّةَ الْوَلَدِ بِاعْتِبَارِ عُلُوْقِ الْوَلَدِ حُرًّا لِأَنَّهٗ جُزْءُ الْأُمِّ فِيْ تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْجُزْءُ لَا يُخَالِفُ الْكُلَّ وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْجُزْئِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ إِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ فَيَثْبُتُ الْجُزْئِيَّةُ بِهٰذِهِ الْوَاسِطَةِ بِخِلَافِ الزِّنَاءِ لِأَنَّهٗ لَا نَسَبَ فِيْهِ لِلْوَلَدِ إِلَى الزَّانِيْ وَإِنَّمَا يُعْتَقُ عَلَى الزَّانِيْ إِذَا مَلَكَهٗ لِأَنَّهٗ جُزْؤُهٗ حَقِيْقَةً بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ـ

অনুবাদ : আর তার খ্রিস্টান মনিব যদি মারা যায়, তাহলে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ ছাড়াই সে 'আজাদ' হয়ে যাবে। কেননা, সে উম্মে ওয়ালাদ। আর মনিবের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণকারিণী উম্মে ওয়ালাদ যদি উপার্জনের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে পূর্ণ দাসীর অবস্থায় ফেরত দেওয়া হবে না। কেননা, তাকে পূর্ণ দাসীর অবস্থায় ফেরত দেওয়া হলে সে কিতাবত-চুক্তিকে আবদ্ধ দাসীর অবস্থায় ফেরত যাবে। কেননা, কিতাবত-চুক্তির অনিবার্যকরণ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ যদি বিবাহের মাধ্যমে অন্যের দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় অতঃপর তার মালিকানা লাভ করে তাহলে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। আর যদি মালিকানার মাধ্যমে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় অতঃপর দাসীর অসৎ দাবিদার বের হয়, পরে মনিব তার মালিকানা লাভ করে, তাহলে আমাদের মতে, সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দুটি মত রয়েছে। আর এ সন্তানটি হলো ধোঁকাগ্রস্ত লোকের সন্তান। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল এই যে, অন্যের দাসীটি একটি দাস সন্তানে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। সুতরাং সে গর্ভ সঞ্চারকারীর উম্মে ওয়ালাদ হবে না। যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়, অতঃপর ব্যভিচারী ঐ দাসীর মালিকানা লাভ করে। এর কারণ এই যে, উম্মে ওয়ালাদ হওয়া যায় স্বাধীন সন্তানের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা, ঐ অবস্থায় সে তার মাতার অংশ। আর অংশ সমগ্রের বিপরীত হতে পারে না। আমাদের দলিল এই যে, ইতঃপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, অংশত্বই হলো কারণ। আর পিতামাতা উভয়ের মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয় একটি সন্তান উভয়ের প্রত্যেকের সাথে [সৃষ্টিগত উপাদানের মাধ্যমে] পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত দ্বারা। আর [এখানে বিবাহের মাধ্যমে] নসব ও বংশ-পরিচয় সাব্যস্ত রয়েছে; সুতরাং এ সংযোগের মাধ্যমে অংশত্বও সাব্যস্ত হবে। ব্যভিচারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর সাথে সন্তানের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয় না। আর ব্যভিচারী যদি সন্তানটির মালিক হয়, তাহলে সন্তানটি তার প্রতিকূলে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ এই যে, সন্তানটি বংশ-সম্পর্কের মাধ্যম ছাড়া প্রকৃতই তার অংশ।

نَظِيْرُهُ مَنِ اشْتَرٰى اَخَاهُ مِنَ الزِّنَاءِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ يُنْسَبُ اِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْوَالِدِ وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَاِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ اِبْنِهٖ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهٗ مِنْهُ وَصَارَتْ اُمَّ وَلَدٍ لَهٗ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرُهَا وَلَا قِيْمَةُ وَلَدِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَ الْمَسْاَلَةَ بِدَلَائِلِهَا فِيْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ وَاِنَّمَا لَا يَضْمَنُ قِيْمَةَ الْوَلَدِ لِاَنَّهُ اِنْعَلَقَ حُرَّ الْاَصْلِ لِاِسْتِنَادِ الْمِلْكِ اِلٰى مَا قَبْلَ الْاِسْتِيْلَادِ وَاِنْ وَطِئَ اَبُ الْاَبِ مَعَ بَقَاءِ الْاَبِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ لِاَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ حَالَ بَقَاءِ الْاَبِ وَلَوْ كَانَ الْاَبُ مَيِّتًا يَثْبُتُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثْبُتُ نَسَبُهٗ مِنَ الْاَبِ لِظُهُوْرِ وِلَايَتِهٖ عِنْدَ فَقْدِ الْاَبِ وَكُفْرُ الْاَبِ وَرِقُّهٗ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهٖ لِاَنَّهٗ قَاطِعٌ لِلْوِلَايَةِ.

অনুবাদ : এর উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তি যার মাধ্যমে জন্ম লাভকারী তার ভাইকে খরিদ করল, এমতাবস্থায় তার ভাইটি তার পক্ষ থেকে আজাদ হবে না। কেননা, ভাইটি তো তার সাথে সম্পৃক্ত হবে পিতার সাথে নসবের সম্পৃক্তির মাধ্যমে, আর তা এখানে সাব্যস্ত নয়। যদি আপন পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর দাসী সন্তান প্রসব করে আর সহবাসকারী সন্তানটির পিতৃত্ব দাবি করে, তাহলে তার সাথে সন্তানটির বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে আর সে সহবাসকারীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে দাসীর মহর এবং দাসীর সন্তানের মূল্য তার উপর সাব্যস্ত হবে না। এই কিতাবের বিবাহ অধ্যায়ে মাসআলাটি আমরা প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করেছি। সন্তানটির মূল্যের জামিন না হওয়ার কারণ এই যে, মূল স্বাধীন অবস্থায় সে গর্ভে সঞ্চারিত হয়েছে। কেননা, সন্তান উৎপাদনের পূর্ববর্তী সময়ের সাথে মালিকানা সম্পৃক্ত হবে। পিতার পিতা [দাদা] যদি বাঁদির সাথে পিতার বর্তমানে সহবাস করে, তাহলে তার সঙ্গে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। কেননা, পিতার বর্তমানে দাদার অভিভাবকত্ব নেই। আর পিতা যদি মৃত হয়, তাহলে দাদা থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে, যেমন পিতা থেকে বংশ সাব্যস্ত হয়। কেননা, পিতার অবর্তমানে দাদার অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়। আর পিতা কাফের হওয়া এবং গোলাম হওয়া তার মৃত্যুর সমতুল্য। কেননা, এগুলো অভিভাবকত্ব-বিচ্ছিন্ন করে।

وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ فِيْ نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِيْ ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّى لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّى وَهُوَ الْعُلُوْقُ إِذِ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِنْ مَائَيْنِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ الْاِسْتِيْلَادَ لَا يَتَجَزَّى عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) يَصِيْرُ نَصِيْبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ إِذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا لِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً إِذِ الْمِلْكُ يَثْبُتُ حُكْمًا لِلْاِسْتِيْلَادِ فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِيْ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ شَرْطًا لِلْاِسْتِيْلَادِ فَيَتَقَدَّمُهُ فَصَارَ وَاطِئًا مِلْكَ نَفْسِهِ وَلَا يَغْرَمُ قِيْمَةَ وَلَدِهَا لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إِلٰى وَقْتِ الْعُلُوْقِ فَلَمْ يَنْعَلِقْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلٰى مِلْكِ الشَّرِيْكِ وَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا مَعْنَاهُ إِذَا حَمَلَتْ عَلٰى مِلْكِهِمَا .

অনুবাদ : আর যদি দাসী দুজনের শরিকানাধীন হয়, আর সে সন্তান প্রসব করে এবং দুজনের একজন সন্তানটির পিতৃত্ব দাবি করে, তাহলে তার থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। কেননা, পিতৃত্ব দাবিকারী মালিকানার সাথে সংযুক্তির কারণে সন্তানটির অর্ধেক অংশে যখন বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হলো তখন অবশিষ্ট অংশেও অনিবার্যভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বংশ-পরিচয়ের কারণ তথা গর্ভসঞ্চার বিভাজ্য হয় না। কেননা, একটি সন্তান মাতৃগর্ভে দুই বীর্য সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং বংশ-পরিচয় বিভাজ্য হতে পারে না। আর এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা, সাহেবাইনের মতে, উম্মে ওয়ালাদ হওয়া বিভাজিত হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দাবিকারীর অংশটি উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অতঃপর শরিকদারের অংশটির সে মালিক হয়ে যাবে। কেননা, সেটা মালিকানার উপযুক্ত। আর দাবিকারী দাসীর অর্ধেক মহরের জন্য দায়ী হবে। কেননা, সে শরিকানাভুক্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে। ফলে সন্তান জন্মের অনিবার্য হুকুমরূপে মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং সহবাসের পর বর্তাবে। অপর শরিকদারের অংশের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে পিতা যদি তার পুত্রের দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে অনিবার্য শর্তরূপে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মালিকানা সন্তান উৎপাদন থেকে অগ্রবর্তী হবে। এভাবে পিতা নিজস্ব মালিকানায় সহবাসকারী হবে। আর দাবিকারী দাসীর সন্তানের মূল্যের জামিন হবে না। কেননা, গর্ভসঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সন্তানের বংশ-সম্পর্ক দাবিকারী থেকে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানের গর্ভসঞ্চার কোনোভাবেই শরিকদারের মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি। আর উভয়ে এক সাথে যদি সন্তানের দাবি করে, তাহলে উভয়ের সাথেই বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, দাসী যদি উভয়ের মালিকানায় গর্ভবতী হয়।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْخَلِقُ مِنْ مَائَيْنِ مُتَعَذِّرٌ فَعَمِلْنَا بِالشُّبْهَةِ وَقَدْ سَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فِيْ أُسَامَةَ (رضـ) وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ (رضـ) إِلَى شُرَيْحٍ فِيْ هٰذِهِ الْحَادِثَةِ لَبَّسَا فَلَبَّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَا لَبُيِّنَ لَهُمَا وَهُوَ إِبْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِيْ مِنْهُمَا وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رضـ) وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِأَنَّهُمَا اِسْتَوَيَا فِيْ سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيْهِ وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزّٰى وَلٰكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مُتَجَزِّئَةٌ فَمَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ يَثْبُتُ فِيْ حَقِّهِمَا عَلَى التَّجْزِئَةِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُمَا يَثْبُتُ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمُلًا كَانَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ أَبًا لِآخَرَ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا لِوُجُوْدِ الْمُرَجِّحِ فِيْ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَفِيْ حَقِّ الْأَبِ وَهُوَ مَالَهُ مِنَ الْحَقِّ فِيْ نَصِيْبِ الْاِبْنِ .

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পিতৃ-সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের শরণাপন্ন হবে। কেননা, আমরা যেহেতু নিশ্চিত জানি যে, দুই বীর্য দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হয় না। সেহেতু দুই ব্যক্তি থেকে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেব। এ ঘটনা সত্য যে, হযরত উসামা (রা.)-এর পিতৃ-সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্যে রাসূল ﷺ আনন্দিত হয়েছিলেন। আমাদের দলিল এই যে, এ ধরনের ঘটনায় কাজি শোরাইহের উদ্দেশ্যে লিখিত হযরত ওমর (রা.)-এর ফরমান। [তিনি বলেছেন, এরা দুজন বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেছে, তাই তুমিও উভয়ের ব্যাপারে বিষয়টিকে খুলে দাও। তারা যদি বিষয়টিকে পরিষ্কার করত, তাহলে তাদের জন্যও তা পরিষ্কার করে দেওয়া হতো। সে উভয়ের পুত্র হবে এবং উভয়ের ওয়ারিশ হবে। আর উভয়ে তার ওয়ারিশ হবে। পরবর্তীতে দুজনের যে জীবদ্দশায় থাকবে সে তারই পুত্র হবে– لَبَّسَا فَلَبَّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَا لَبُيِّنَ لَهُمَا وَهُوَ إِبْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِيْ مِنْهُمَا এ সিদ্ধান্ত সাহাবায় কেরামের উপস্থিতিতে ছিল। হযরত আলী (রা.) থেকেও এরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে। তাছাড়া এ কারণে যে, পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণ তথা মালিকানার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। সুতরাং উভয়েই পিতৃত্বের অধিকারে সমান হবে। আর বংশ-সম্পর্ক যদিও বিভাজ্য নয়, কিন্তু তার সাথে এমন সকল বিধান সংশ্লিষ্ট রয়েছে, যা বিভাজনযোগ্য। সুতরাং যা বিভাজনযোগ্য তা বিভাজনের ভিত্তিতে উভয়ের জন্যও সাব্যস্ত হবে। আর যা বিভাজনযোগ্য নয়, তা উভয়ের প্রত্যেকের স্বপক্ষে এমনভাবে 'পূর্ণরূপে' সাব্যস্ত হবে যেন তার সাথে অন্য কেউ নেই। তবে যদি দুই শরিকের একজন অপরজনের পিতা হয় কিংবা দুজনের একজন যদি মুসলমান হয়, আর অপরজন জিম্মি হয় [তাহলে পিতা কিংবা মুসলমান অগ্রাধিকার লাভ করবে]। কেননা, মুসলমানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কারণরূপে ইসলাম বিদ্যমান রয়েছে। আর পিতার পক্ষে অগ্রাধিকারের কারণরূপে পুত্রের অংশের মাঝে পিতার স্বীকৃত অধিকার বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الْقَافَةِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, একই সন্তানের ব্যাপারে যখন তার মা-এর দুই মনিব দাবিদার হয় আর তাদের কোনো একজনকে প্রাধান্য দেওয়ার ভিন্ন যুক্তি না থাকে, তাহলে বাচ্চা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথার উপর ভিত্তি করে বাচ্চাকে একজনের দিকে সম্পর্কিত করবে। তাইতো রাসূল ﷺ হযরত উসামা (রা.)-এর ব্যাপারে অভিজ্ঞদের মন্তব্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞাতব্য : হযরত উসামা (রা.) হযরত যায়েদ (রা.)-এর পুত্র হওয়ার ব্যাপারে কাফের লোকেরা অভিযোগ করত। তার ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَدْرِيْ أَنَّ مُجَزِّزَ الْمُدْلَجِيْ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَيْدٌ عَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هٰذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ .

অর্থাৎ "হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদা রাসূল ﷺ আনন্দিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আয়েশা ! তুমি কি জান, মুজায-যায মুদলাজী কি বলেছে? সে আমার নিকট এসেছিল, আর তখন উসামা ও যায়েদ আমার কাছে ছিল। চাদর মুড়ি দিয়ে তারা দুজন শুয়েছিল– মাথা ঢাকা আর পা খোলা ছিল। তখন মুজায-যায দেখে বলল, এ পা-সমূহের অধিকারীদের মধ্যে পরস্পর পিতা-সন্তানের সম্পর্ক।" এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তায় রয়েছে। আর ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, হযরত যায়েদ (রা.) সাদা বর্ণের আর হযরত উসামা (রা.) কালো বর্ণের ছিলেন।

এ ঘটনায় রাসূল ﷺ -এর আনন্দিত হওয়ার বিষয়কেই ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর পক্ষে দলিল বানিয়েছেন যে, লোক পরিচয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ (رضـ) إِلَى شُرَيْحٍ الخ : আর আমাদের দলিল হলো হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক শোরাইহ (র.)-এর প্রতি প্রেরিত চিঠি। এ ধরনের ঘটনায় কাজি শোরাইহের বরাবর হযরত ওমর (রা.) লিখেন যে, তারা দুজন বিষয়টি অস্পষ্ট করে দিয়েছে সুতরাং তোমরাও অস্পষ্ট রেখে দাও। তারা দুজন যদি বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করত, তাহলে ফয়সালাও সুস্পষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং এ সন্তান উভয়জনের বলে সাব্যস্ত হবে। উভয়জনের উত্তরাধিকার হবে এবং তারা দুজন এ সন্তানের ওয়ারিশ হবে। আর বাচ্চা যদি মারা যায়, আর তাদের একজন জীবিত থাকে, তাহলে সেই পূর্ণ মিরাস পাবে। হযরত ওমর (রা.)-এর এ ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের সামনে করেছেন কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং হযরত আলী (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ইমাম বায়হাকী (র.) মুবারক ইবনে ফুযালার সূত্রে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ঘটনা হলো এই যে, দুই মনিব তাদের শরিকানা দাসীর সাথে ঋতুস্রাব মুক্তির পর সহবাস করার পর সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আর উভয়জনই সন্তানের দাবিদার হলে ফয়সালার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে পেশ করা হলো। তখন হযরত ওমর (রা.) তিনজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপস্থিত করালেন। আর তিনজন মন্তব্য করল যে, এ সন্তানে দুজনের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান আর হযরত ওমর (রা.) নিজেও পরিচয়-অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি বলেন, কুকুরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নরের রং পরিস্ফুট হয় কিন্তু মানুষের মাঝেও হতে পারে তা ইতঃপূর্বে আর দেখিনি। অতঃপর নির্দেশ দিলেন যে, এটা এ দুজনের সন্তান। দুজনই তার ওয়ারিশ এবং সে দুজনের ওয়ারিশ হবে। এ বাচ্চা আগে মারা গেলে তারা দুজনই মিরাস পাবে, আর একজন রেখে বাকি মারা গেলে একজনই মিরাস পাবে।

আর মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে এ ধরনের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে হযরত আলী (রা.) থেকে। আবার বায়হাকী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) যখন ইয়েমেনে ছিলেন তখন তিন ব্যক্তি এক মহিলার সাথে সহবাস করে, তখন তাদের মাঝে লটারি দিয়ে যার নাম এসেছিল তারই সন্তান বলে সাব্যস্ত করা হলো। দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত তার উপর আবশ্যক করে দেওয়া হলো। অতঃপর যায়েদ ইবনে আরকাম মদিনায় তাশরীফ এনে রাসূল ﷺ-কে অবহিত করলে রাসূল ﷺ হেসেছিলেন।

وَسُرُوْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْمَا رُوِيَ لِاَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوْا يَطْعَنُوْنَ فِيْ نَسَبِ اُسَامَةَ وَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقْطِعًا لِطَعْنِهِمْ فَسُرَّ بِهِ وَكَانَتِ الْاَمَةُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا لِصِحَّةِ دَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيْ نَصِيْبِهِ فِي الْوَلَدِ فَيَصِيْرُ نَصِيْبُهُ مِنْهَا اُمَّ وَلَدٍ تَبَعًا لِوَلَدِهَا وَعَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ قِصَاصًا بِمَا لَهُ عَلَى الْاٰخَرِ وَيَرِثُ الْاِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيْرَاثَ اِبْنٍ كَامِلٍ لِاَنَّهُ اَقَرَّ لَهُ بِمِيْرَاثِهِ كُلِّهِ وَهُوَ حُجَّةٌ فِيْ حَقِّهِ وَيَرِثَانِ مِنْهُ مِيْرَاثَ اَبٍ وَاحِدٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ كَمَا اِذَا اَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَاِذَا وَطِيَ الْمَوْلٰى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهٖ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَاِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : আর রাসূল ﷺ-এর আনন্দ প্রকাশের যে কথা বর্ণিত রয়েছে, তার কারণ এই যে, কাফেররা হযরত উসামা (রা.)-এর বংশ সম্পর্কে অভিযোগ করত। পিতৃ-সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্য ছিল তাদের অভিযোগ খণ্ডনকারী, তাই তিনি তার মন্তব্যে আনন্দিত হয়েছিলেন। আর দাসীটি উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা, সন্তানের নিজ নিজ অংশে উভয় শরিকদারের দাবি সঠিক। সুতরাং প্রত্যেকের শরিকানাভুক্ত দাসীর অংশটি তার সন্তানের অনুবর্তী হিসেবে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মহর সাব্যস্ত হবে এবং তা ঐ অর্ধেকের বিনিময়ে কাটা যাবে, যার অনুকূলে অপরজনের উপর সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ পুত্র উভয়ের প্রত্যেকের কাছ থেকে পূর্ণ পুত্রের মিরাস লাভ করবে। কেননা, প্রত্যেকে তার অনুকূলে পূর্ণ মিরাস লাভের স্বীকৃতি দান করছে। প্রত্যেকের স্বীকৃতি তার নিজের বিপক্ষে প্রমাণরূপে গণ্য। আর উভয় শরিকদার ঐ পুত্র থেকে একজন পিতার মিরাস [ভাগাভাগি করে] লাভ করবে। কেননা, পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। যেমন [কোনো অজ্ঞাত পরিচয় পুত্রের পিতৃত্বের দাবির স্বপক্ষে] উভয়ে সাক্ষ্য পেশ করলে উভয়কে সমানভাবে অধিকার প্রদান করা হয়। আর মনিব যদি তার মুকাতাব গোলামের দাসীর সাথে সহবাস করে আর দাসী কোনো সন্তান প্রসব করে এবং মনিব ঐ সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করে এমতাবস্থায় মুকাতাব যদি তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে মনিবের সাথে সন্তানটির বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيْقُهُ اِعْتِبَارًا بِالْاَبِ يَدَّعِيْ وَلَدَ جَارِيَةِ اِبْنِهِ وَ وَجْهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرْقُ اَنَّ الْمَوْلٰى لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيْ اِكْسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتّٰى لَا يَتَمَلَّكَهُ وَالْاَبُ يَمْلِكُ تَمَلُّكَهُ فَلَا مُعْتَبَرَ بِتَصْدِيْقِ الْاِبْنِ وَعَلَيْهِ عُقْرُهَا لِاَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ لِاَنَّ مَالَهُ مِنَ الْحَقِّ كَافٍ لِصِحَّةِ الْاِسْتِيْلَادِ لِمَا نَذْكُرُهُ وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا لِاَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْمَغْرُوْرِ حَيْثُ اِعْتَمَدَ دَلِيْلًا وَهُوَ اَنَّهُ كَسْبُ كَسْبِهِ فَلَمْ يَرْضَ بِرِقِّهِ فَيَكُوْنُ حُرًّا بِالْقِيْمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ وَلَا تَصِيْرُ الْجَارِيَةُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِاَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيْهَا حَقِيْقَةً كَمَا فِيْ وَلَدِ الْمَغْرُوْرِ وَاِنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ لِمَا بَيَّنَّا اَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيْقِهِ فَلَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ وَ زَوَالِ حَقِّ الْمُكَاتَبِ اِذْ هُوَ الْمَانِعُ .

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি পুত্রের দাসীর সন্তানের পিতৃত্ব দাবিকারী। পিতার উপর কিয়াস করে– তিনি এখানেও মুকাতাবের সত্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করেন না। জাহিরে রেওয়ায়েতের কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মনিব তার মুকাতাব গোলামের উপার্জিত মালের উপর তসরুফের অধিকারী নয়। এ কারণেই [প্রয়োজনের সময়] সে নিজেই তার মালিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। পক্ষান্তরে পিতা [প্রয়োজনের সময়] নিজেই মালিক হওয়ার অধিকার রাখে। এ কারণে পুত্রের সত্যায়নের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। আর দাসীর মোহর মনিবের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, মনিবের মালিকানা তার সহবাসের আগে সাব্যস্ত হয়নি। কারণ, গোলামের উপর তার যে অধিকার রয়েছে, সন্তান জন্মের বিষয়টি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেটাই যথেষ্ট। এর কারণ আমরা উল্লেখ করব। আর এ সন্তানের মূল্য মনিবের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, মনিব এখানে ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত এ হিসেবে যে, সে একটি দলিলের উপর নির্ভর করেছে। আর তা এই যে, এ সন্তান দাসীটি তার অর্জিত সম্পদের ফল। সুতরাং সে সন্তানটির দাসত্ব সম্বন্ধে সন্তুষ্ট নয়। তাই মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে সে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার সাথে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর দাসীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে দাসীটির উপর তার মালিকানা নেই। যেমন ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের মাতার ক্ষেত্রে [মালিকানা না থাকার কারণে উক্ত দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয় না]। আর মুকাতাব যদি মনিবের নসবের ব্যাপারে মনিবের দাবি অস্বীকার করে, তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা, আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, তার সত্যায়ন অপরিহার্য। অতঃপর যদি কোনো একদিন সে উক্ত সন্তানের মালিকানা লাভ করে তখন তার সাথে বংশ-সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, নসব সাব্যস্তকারী কারণ বিদ্যমান রয়েছে এবং মুকাতাবের অধিকার যা প্রতিবন্ধক ছিল, তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত